প্যারীর পতন

ইলিয়া এরেনবুর্গ

একত্রে তিন খণ্ড

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
কলিকাতা

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ
অক্টোবর ১৯৬০
তৃতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

প্রকাশক
সলিলকুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রক
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিঃ
৩৩ আলিমুদ্দীন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০১৬

বাঙলাদেশের পাঠকদের কাছে ইলিয়া এরেনবুর্গের বিশ্ববিখ্যাত বই পারীর পতনের নতুন করে পরিচয় উপস্থিত করা নিরর্থক। এই বহুজন-নন্দিত উপন্যাসটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়ে বাঙালী পাঠক-চিত্ত জয় করেছিল। বইটির পূর্বের সংস্করণগুলি নিঃশেষ হওয়ায় আর একটি সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এবং আমরা বইটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ একত্রে প্রকাশের আয়োজন করি। বইটির ছাপার কাজে আমরা বহুদিন পূর্বে হাত দিই, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেসের সমস্যা এবং কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে বইটির ছাপার কাজ অনেক দিন স্থগিত থাকে। পরে আবার বইটির নতুন করে ছাপার কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন সমস্যার ভিতর দিয়েও বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের দেশের পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে তবে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

—প্রকাশক

এক

রু শেরস্-মিদিতে আঁদ্রের স্টুডিও। রাস্তাটা পুরনো—দু-ধারে নোংরা বাড়ি, সামনের দিকের জানলার খড়খড়িতে কালো কালো দাগ; অনেকগুলো পুরাকালীয় জিনিসের রকমারি দোকান। বড়ো বড়ো লেখবার টেবিল, গোলগাল মুখওলা পরী, হাতির দাঁতের বোতাম, লাল পাথর বসানো নেকলেস, চীনদেশের মুদ্রা, চুলের গোছা লাগানো লকেট, আর আশ্চর্য কবচ—এই জিনিসগুলো প্রচুর রয়েছে প্রত্যেকটি দোকানে। এইসব হরেক মালের ব্যবসায়ী একদল গোবেচারা বুড়ো যাদের লাল্চে মুখ পরিষ্কার ভাবে কামানো আর মাথায় কালো রঙের বাটি-টুপি, কিংবা একদল গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোক। রাস্তার মোড়ে একটা তামাকের দোকান ও কাফে, নাম 'তামাকখোর কুকুর'। এখানে ঢুকলেই চোখে পড়ে, একটা বুড়ো ফক্স্-টেরিয়ার কুকুর সিগারেটের পাইপ চিবোতে চিবোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ক্রেতারা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করছে এই দৃশ্যে। প্রায় উল্টো দিকে একটা রেস্তোরাঁ—'আঁরি এ যোসেফিন'। যোসেফিন পাকা রাঁধুনী—বড়বাটি, হাঁসের মাংস আর কাবাব রান্নায় তার জুড়ি মেলে না।' আঁরি এক-একবার নিচে যায় মাটির নিচের ভাঁড়ার থেকে মদের বোতল নিয়ে আসার জন্যে আর শ্লেটের ওপরে বিলগুলো যোগ দিতে থাকে। লোকটা সব অবস্থাতেই হাসিখুশি, বৌয়ের রান্নার তারিফ করে, হেসে হেসে কথা বলে প্রত্যেকের সঙ্গে আর থাবার মতো চওড়া হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে। পাশের বাড়িতে একজন মুচীর দোকান। লোকটার বয়স যদিও ষাট পার হয়ে গেছে তবু জুতোর ওপরে হাতুড়ির ঘা দিতে দিতে এখনো 'দুর্ধর্ষ প্রেম'-এর গান করে। একটু দূরে একটা ফুলের দোকান— এনেমন, অ্যাস্টার এবং সুন্দর গোলাপী রঙের সব ফুলে সাজানো। দোকানটি চালায় দড়ি-পাকানো চেহারা, ছিমছাম এক বুড়ী। রোজ ভোরে দরজার ওপর এক-একজন ঋষির নাম লিখে রাখে সে—সেই বিশেষ দিনটি যে-ঋষির নামে উৎসর্গীকৃত। ফুটপাথের ওপরে খড়ি দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—'স্বর্গ', 'নরক', 'ইতালি' ও 'ইথিওপিয়া'। এটা বাচ্চাদের একটা খেলা। ভোরবেলা ফেরিওলার কান-ফাটানো চিৎকার শোনা যায়—'কমলালেবু', 'টমাটো'। ফেরি করে একদল গোঁফওলা বুড়ী। বাঁশি বাজিয়ে নিজের জানানি দিয়ে একজন পুরনো পোষাকের ব্যবসায়ী রাস্তাটা পার হয়; পাড়ার লোকেরা পুরনো জামা আর ছেঁড়া চাদর বার করে আনে। সন্ধ্যের দিকে রাস্তায় বেরোয় একদল বয়স্ক গাইয়ে বাজিয়ে। তারা গান গায় ও নাচে, ওপরতলার জানলা থেকে পয়সা পড়ে রাস্তার ওপরে।

কিন্তু বাড়িগুলোর ভেতর দিক নিশ্চুপ, থমথমে, আর কিছুটা যেন গুমোট। আসবাব ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা ঘরগুলো। অনেক পুরনো সব জিনিস কিন্তু কোনো-কিছুই ফেল্না নয়। আরামকেদারার ঢাকাগুলো জীর্ণ, তালিমারা। তাকের ওপরে পেয়ালাগুলো ভাঙা, আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। এখানে ঢুকে কেউ যদি একবার শুধু হাঁচে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লেবু-ফুলের চা কিংবা পাঁচমেশালী পানীয় আসে তার জন্যে, সর্ষের পুল্টিস তৈরি হয়। অনুপান সেঁক ও মালিশের জন্যে নানারকম লতাপাতা বিক্রি

হয় ওষ্ধের দোকানে। বেড়ালের চামড়াও পাওয়া যায়; ওতে নাকি বাত সারে। অগ্নতি মোটা মোটা খোজা বেড়াল—পথে দোকানে সব জায়গায়। দরোয়ানদের কুঠরিতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাংস রান্না হয়—সেখানেও বেড়ালগ্লোর দাপাদাপি সমানে চলে। সন্ধ্যের দিকে রাস্তাটা অদ্ভুত রকমের মনোরম হয়ে ওঠে; নীলাভ আলোয় সবকিছ্ ভাসছে যেন।

একেবারে ওপরতলায় আঁদ্রের স্ট্ডিও। চারদিকের দ্শ্য চমৎকার। ছাদের পর ছাদ—লালটালির সম্দ্র উঁচ্-নিচ্ ঢেউ যেন। পাতলা ধোঁয়া উঠছে ছাদের ওপরে আর দ্রের ফিকে কমলা-আভার ভেতর দিয়ে আভাস পাওয়া যাচ্ছে ঈফেল টাওয়ারের।

স্ট্ডিওর ভেতরে নড়ার জায়গা নেই। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছবির ফ্রেম, ভাঙা চেয়ার, রঙের টিউব, ছেঁড়া জ্তো, ধ্লোমাখা ফ্লদানি। জিনিসগ্লোর শ্ধ্ থাকা নয়, সেগ্লোর যেন শেকড় গজিয়েছে। কখনো কখনো এগ্লোকে দেখে বসন্তকালের ঝোপঝাড়ের কথা মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে মনে পড়ে যখন সমস্ত বাধা পেরিয়ে স্র্যের আলো চ্ইয়ে চ্ইয়ে ঢোকে স্ট্ডিওর ভেতরে আর তা দেখে আঁদ্রে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আর গ্ন্গ্ন্ করে খাপছাড়া সব ছড়া আবৃত্তি করে চলে। কখনো কখনো মনে হয়, স্ট্ডিওটা যেন একটা মিলিয়ে যাওয়া অরণ্য—সেখানে যেন সবকিছ্তে ঘ্ণ ধরেছে, সবকিছ্ ক্ষয়ে যাচ্ছে। আঁদ্রের চেহারাটা প্রকান্ড, ধীর স্বভাব, কথা বলে খ্ব কম—আঁদ্রেকে দেখে মনে হয়, সে নিজেও এক বনস্পতি। কাজ শ্র্ করে সকালে—বাড়ির ছাদ আঁকে কিংবা অ্যাস্টারফ্ল, ফ্লকপি আর বোতল মিলিয়ে একটা স্টিল্-লাইফ। সন্ধ্যে-বেলা প্রকান্ড পাইপটা ধরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়ায়, কখনো বা ঢ্কে পড়ে কোনো সিনেমায়, মিকি-মাউসের কৌতুক দেখে হাসে; তারপর বাড়ি ফিরে ঘ্ম।

ধীরেস্স্থে আঁদ্রের কাজকর্ম, ধীরেস্স্থে আঁদ্রের জীবন। বত্রিশ বছর বয়সেও সে প্রথম যৌবনের বিস্ময় নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকায়। ইতিমধ্যেই কুশলী চিত্রকর হিসেবে সে পরিচিত। কিন্তু তার নিজের ধারণা, তার কাজের এই তো সবে শ্র্। তার বাবা ছিলেন নর্মান চাষী; কতো আস্তে আস্তে আপেলগাছ বড়ো হয় আর কতো দীর্ঘ সময় পার হলে গাভীর বাঁটে দ্ধ আসে তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। এই একই ধৈর্য নিয়ে আঁদ্রে অপেক্ষা করে রঙে-রেখায় ছবি ফ্টিয়ে তুলতে।

সেদিন—পারীর উচ্ছল বসন্তের গোড়ার দিকের এক বিকেলে—আঁদ্রে এনেমন ফ্লের গ্চ্ছ আঁকছিল। দরজায় টোকা পড়তেই চোখ কঁ্চকে সে তাকাল। ঘরে ঢ্কছে তার প্রনো বন্ধ্ পিয়ের; ঘরের ভেতরে পা দেবার আগে থেকেই বক্‌বক করতে শ্র্ করেছে। পিয়েরের স্বভাবই এই—ম্খে কথার তুবড়ি ছোটে। অন্যমনস্ক ভাবে হাসে আঁদ্রে আর বারবার তাকায় ক্যানভাসটার দিকে। এইমাত্র তার নজরে পড়েছে, ছবির হলদে রঙের পোঁচগ্লো একেবারে খোলেনি।

আঁদ্রের পাশে পিয়েরকে এইট্কুন দেখায়। মান্ষটি সে পাখির মতো ছটফটে, তপ্ত কাঞ্চনের মতো গায়ের রঙ, বড়ো বড়ো ড্যাবডেবে চোখ, লম্বা লম্বা হাত। ভাঙা ভাঙা গলায় সে কথা বলছে আর ছবির ফ্রেম ও ফ্লদানিগ্লোর চারপাশে উসখ্স করে ঘ্রছে আর লাফাচ্ছে।

কর্ম-জীবনে পিয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। থিয়েটার সম্পর্কে তার আগ্রহ আছে; মাঝে একবার কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছিল, এমন কি ছোট একটা কবিতার বই প্রকাশও করেছিল ছদ্মনামে; সব সময়েই সে প্রেমে পড়ে যায় আর এ-ব্যাপারে গোলমাল হলেই আত্মহত্যা করার জল্পনা-কল্পনায় মাতিয়ে রাখে নিজেকে। আসলে জীবনে তার তীব্র

আসক্তি সর্বাঙ্গীনভাবে জীবনকে সে ভালোবাসে। তার মন বড়ো দুর্বল—যখন যেদিকে টানা যায় সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কান্ড করে বসে। একবার একটা কাফেতে একজন পিয়ানো-বাজিয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সে-সময়ে ফরাসী পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন চলছিল পারীতে; স্তাভিস্‌কি-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে অনেক ডেপুটি জড়িত, সে-খবরটা জানাজানি হয়ে যায়। জাতীয় 'সম্মান' সম্পর্কে যতো কথাবার্তা হয়েছিল তা রীতিমতো উত্তেজিত করে তুলেছিল তাকে—এবং হাঙ্গামার দিন রাত্রে প্লাস দ্য লা কঁকর্দ্‌-এ সে যোগ দিয়েছিল দাঙ্গাকারীদের দলে। ছ-মাস পরে একটি ফ্যাশিস্টবিরোধী সভায় সমাজতন্ত্রী ভীইয়ারের বক্তৃতা শুনে সেই পিয়ানো বাজিয়ের সঙ্গে তুমুল তর্ক করে জঙ্গীবাদের স্বরূপ খুলে দেয়। ডজন ডজন সংবাদপত্রের প্রতিটি লাইন সে গেলে এবং কোনো মিছিলই তার বাদ যায় না।

১৯৩৫ সাল। ফ্রান্সের জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। ফ্যাশিস্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামার অল্পকাল পরেই পপুলার ফ্রন্টের জন্ম—দেশের আশাভরসা ও সংগ্রাম রূপ পেল এই সংগঠনে। ১৪ই জুলাই-এ এবং বারবুসের মৃত্যু-দিন ৭ই সেপ্টেম্বর দশলক্ষ জনতা বেরিয়ে এল পারীর রাস্তায়। সংগ্রামের পথে পা বাড়াল জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাতের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন বলা হল আসন্ন নির্বাচন সকল সমস্যার সমাধান করবে। জনসাধারণের নজরে যুদ্ধের বিভীষিকা সেই প্রথম। জার্মানি সৈন্য পাঠিয়েছে রাইনল্যান্ডে, আবিসিনিয়া ইতালিয়ানদের অধিকারভুক্ত, আর ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ভর করছে কয়েকজন নগণ্য ব্যক্তির ওপর, প্রতিবেশী দেশগুলো সম্পর্কে তাদের যেমন ভয়, তেমনি ভয় দেশের জনসাধারণকে। নিজেদের সম্পর্কে তাদের মস্ত ধারণা। তারা মনে করে, চাল দেওয়ার ব্যাপারে তারা দুঁদে ওস্তাদ আর তাই যে-বৃটিশের কিছুমাত্র ভাবপ্রবণতা নেই তাদের মিষ্টি কথা বলে, আবার লন্ডনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে রোমকে। জ্ঞানীরা নির্বোধ হয়ে উঠেছে। একটির পর একটি ছোট রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিপক্ষে চলে গেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সময় ঘনিয়ে এসেছে ফ্রান্সের। কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্ত্রীদের কোনো চিন্তা নেই—তারা ব্যস্ত আগামী নির্বাচনের তোড়জোড়ে, তারা চেষ্টা করছে পপুলার ফ্রন্টের ভেতরে ভাঙন আনতে। শাসনকর্তারা ঘুষ দিচ্ছে দ্বিধান্বিতদের, ভয় দেখাচ্ছে দুর্বলচিত্তদের। প্রতিদিন রোজই নতুন নতুন ফ্যাশিস্ট সংগঠন গজিয়ে ওঠে। সন্ধ্যেবেলায় দেখা যায়, অভিজাত বংশের যুবকেরা রাজধানীর সমৃদ্ধ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে—'অনুমোদন নিপাত যাক!' 'ইংলন্ড ধ্বংস হোক!' 'মুসোলিনি জিন্দাবাদ!'. শহরের উপকণ্ঠে শ্রমিক-অঞ্চলে আসন্ন বিপ্লবের কথা শোনা যায়। আতঙ্কিত নাগরিকদের মনে ভয় জাগায় সবকিছু—গৃহযুদ্ধ ও জার্মান আক্রমণ, গুপ্তচর ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী, পল্টনী কাজের মেয়াদ-বৃদ্ধি ও হরতাল। নতুন বছরে চূড়ান্ত কিছু একটা ঘটবে বলে মনে করে সকলে।

আর এই সমস্ত ঘটনার আবর্তে পড়ে পিয়েরের দিন কাটছে পাহারাদার শান্ত্রীর মতো।

একসঙ্গে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আঁদ্রেকে পিয়েরের পছন্দ। কিন্তু দুজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ খুব কম। পিয়ের হো-হো করে দিন কাটায় কিন্তু আঁদ্রে কোনো কিছুতেই জড়িয়ে পড়তে চায় না। দু বন্ধুতে দেখা হলেই পিয়ের বন্ধুর কাছে বলতে শুরু করে যা নিয়ে ইদানীং সে মেতে রয়েছে—যেমন, নতুন কোনো গাড়ি বা আঁদ্রে ব্রেত'র কবিতা বা ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক কংগ্রেস।

আঁদ্রে হেসে ওঠে ওর কথা শুনে তারপর দুজনে 'তামাকখোর কুকুর'-এ ঢুকে বিয়ার বা ভারমুথ পানীয় নিয়ে বসে। আবার হয়ত এক বছর দুজনের দেখা হয় না।

আর একদিন পিয়েরের মনে পড়ে যায় আঁদ্রের কথা, ছুটে আসে স্টুডিওতে, চিৎকার করে বলে, 'কাল কি হয়েছে জান...?' এমনভাবে কথা বলে যেন আগের দিনও দুজনের দেখা হয়েছে।

এবারেও একই রকম।

পিয়ের বলে, 'ভাইয়ারের বক্তৃতা পড়েছ? ভাইয়ার বলেছে, জার্মানদের সামরিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও নিরস্ত্রীকরণের নীতি আমরা মেনে চলব।...সকলেই যুদ্ধের কথা বলছে, যুদ্ধ হবে কি হবে না—এই এক কথা। আমাদের কারখানার কর্তা জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করছেন। কুম্ভরাশি নাকি যুদ্ধের পক্ষে কিন্তু বৃষরাশি বিপক্ষে। যত সব বাজে কথা। অবশ্য হিটলারও পাগল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু পপুলার ফ্রন্ট যদি জেতে তাহলে কক্ষনো যুদ্ধ হবে না। তোমার কি মনে হয়?'

'জানি না, এ বিষয়ে আমি ভাবিনি।' আঁদ্রে বলে।

পিয়ের হঠাৎ দরজার দিকে ছুটে যায়।

'যাচ্ছ কোথায়?'

'কৃষ্টি পরিষদে। ওরা বলছে যে সবাইকে ওরা আজ অবাক করে দেবে। চলো, দুজনেই যাই! এই মেছো-হাটে আর টেঁকা যাচ্ছে না। আমি তো প্রায়ই যাই ওখানে। দারুণ জায়গা। সবাই আছে ওখানে শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, এমন কি তোমার সগোত্র শিল্পীরাও। আমারও এতেই বিশ্বাস। ডিরেক্টর-সাহেবকে বলে দিয়েছি একথা—সেজন্যে ঠিকুজি-কুষ্ঠীর দরকার হয়নি। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না।'

'কি?'

'কি আবার, বিপ্লব—। আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয় দেখে নিও। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে তাকে বাইরে নিয়ে যায়।

ভিড় ঠেলে বেশ কষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে পারল দুজনে। ঘরটা বড়ো তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক আবছা। ঝাড়বাতিগুলো তেলচিটে ঝাপসা দেখাচ্ছে, মুখগুলো যেন রঙ-করা আলোয় টিমটিম করছে। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানি ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন উদ্দীপ্ত যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে তর্ক করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, তরুণ কারিগর যে-সম্প্রতি একটা পদ্য লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে এখানে। 'ল্যা ফ্র পপুল্যার'- কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলা-সীসেম'-এর মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্ট একবার জিতলে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর তুলি খনি-মজুরের হাতে উঠবে, যে ঢিমেতেতালা লোকগুলো সবজির চাষ করে তারাও হবে পিকাসোর ছবির সমঝদার, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে জ্ঞানতপস্বীরা অমরতা লাভ করবে, আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সিয়েন নদীর তীরে দেখা দেবে নতুন এথেন্স।

আশপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে শুনছে যেন প্রত্যেকটি শব্দ গিলছে। হাই তুলছে যে লোকটা সে নিঃসন্দেহে সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক রয়েছে সভায়: সবাই ধূমপান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ছোটখাটো বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি একজন বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নিচু গলায় কথা বলছেন তিনি আর অনবরত কাশছেন। টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি, নতুন মানবতা...'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। তার স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজের মধ্যে ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছে জাগে হঠাৎ। তারপর মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই পিয়েরকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, 'আরে লুসিয় যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক করার' মতো ব্যাপারটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা মনে পড়ে আঁদ্রের। 'যবে কন্যা বাগে—হৃদয়ে প্রেম জাগে' কবিতাটি লুসিয় প্রায়ই আবৃত্তি করত আর বলে বেড়াত সে আফিংখোর। আর এখন কিনা সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয় শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আবেগের সঙ্গে আর কিছুটা ছাড়াছাড়া ভাবে লুসিয় বলে, 'বোমারু বৈমানিক' বা পিকার্ডি-রূঢ়-সীলেসিয়ান খনি শ্রমিক—পৃথিবীর ওপরে বা নিচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছশো ডেপুটি! একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে। কিন্তু ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে তখন মরা গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে কীটগুলো চলছে...'

হিটলার; যুদ্ধ আর বিপ্লব সম্বন্ধে অনেক কথা লুসিয় বলে। বক্তৃতা শেষ হবার পর খানিকক্ষণ চুপচাপ। লুসিয়র কণ্ঠস্বরের মোহ কাটেনি তখনো। তারপর হঠাৎ উল্লাসে ফেটে পড়ে সমস্ত হলঘরটা। হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দেয় পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে ওঠে—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার ছবি আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছে পেয়ে বসে আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে যায় তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপরকার ছোটখাটো বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে লুসিয়কে অভিনন্দন জানালেন। হঠাৎ একটি অল্পবয়সী রুগ্ন বিবর্ণ যুবক উঠে দাঁড়াল; বেশভূষা আটপৌরে কিন্তু বেশ ছিমছাম।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টার দিকে হাত বাড়ালেন।

'আপনার নাম?'

'গ্রিস্‌নে। আমার নাম শুনে বিশেষ কিছু জানতে পারবেন না। বরং সবশেষে যিনি বক্তৃতা দিলেন তাঁর নাম অনেক বেশি দরকারী। আমি যতোদুর জানি, এঁর বাবা মশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্তাভিস্‌কির কাছে আশি হাজার টাকা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই টাকা নিয়ে এখানে '

প্রচণ্ড হট্টগোলে বাকি কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রিস্‌নে লাঠি ঘোরাচ্ছে, স্নায়বিক উত্তেজনায় তার মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। তার পাশ থেকে একজন ষণ্ডামার্কা লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভিড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়র সঙ্গে একসঙ্গে কাফেতে যাব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যাব বলে মনে হয় না।'

লুসিয় বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন নয়?' চল একটু

বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতা দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার পক্ষে। ওরা যে গণ্ডগোল বাধাবে সে-বিষয়ে আমাকে আগেই সাবধান করা হয়েছিল।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমতো শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রিস্-নে লোকটাকে আমি চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা নিশিতে পাওয়ার মতো একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে ঘচাঘচ করে কাটছিল। ওর মতো লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠাবে তা তো জানা কথাই। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। একে তো নামজাদা সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তায় পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে! অবশ্য, তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু লোকের কাছে এটা জোর খবর। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এ-সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমতো চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মতো লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী আসছিল ওদের সঙ্গে। তার মাথায় কোঁকড়া চুল, টুপি নেই, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গি। চোখে কেমন একটা উদভ্রান্ত চাউনি—যেন নিশাচর পাখি। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে, কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ি হয়ে যাব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'ওঃ ভারি ভুল হয়ে গেছে। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি জেনেৎ ল্যাঁবেয়ার—অভিনেত্রী। আর এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের দ্যুবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রাণীটা যে আমার হাতে।' তৃষ্ণার্তের মতো ঢকঢক করে বিয়ার খেল আঁদ্রে। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জেনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু জমল না। এমন কি পিয়ের পর্যন্ত চুপচাপ। গুমোটে আর গোলমালে ওরা ক্লান্ত বোধ করল।

সামান্য একটু মাতাল দুটি লোক ঘরে ঢুকে দু'গেলাস বিয়ারের অর্ডার দিল। এদের মধ্যে একজনের মাথায় পিয়নের টুপি—বছর চল্লিশ বয়স হবে। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ধরো, ওরা যদি আমাদের পায়ের পাতাদুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম— কি বলো?'

'না হে কত্তা, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' সঙ্গের কমবয়সী লোকটি বলল।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটায় পয়সা ফেলল পিয়নটি। সেটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

পিয়ের গুনগুন করে গেয়ে উঠল, 'তোমাকেই খুঁজি হে ছলনাময়ী...মনে পড়ে?

গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গাইতাম। তখন আমরা ক্রিয়াবিশেষ্য নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছি। কি অদ্ভুত! সে-সময়ে লোকের মুখে কি রকম বড়ো-বড়ো কথা শোনা যেত মনে আছে? আর শুনলে তো—দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসেব। প্রথমে জার্মানদের বেশ করে দুইয়ে নিল—এই হল প্রথম অঙ্ক। তারপর বৈঠক বসল—তারা ক্ষতিপূরণ দেবে কি দেবে না! দেশের 'সমৃদ্ধি' ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে। ওদিকে কফি পোড়ানো হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি, এই ছিল দ্বিতীয় অঙ্ক। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা...এই হল গিয়ে তোমার তৃতীয় অঙ্ক। চতুর্থ অঙ্কে কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবি শোনা যাবে—স্ত্রাসবুর্গ আর লিইয় আমার চাই। তারপর ওরা বিলি করবে গ্যাস-মুখোশ আর টিনের খাবার। আমরা যে সভ্যতাকে রক্ষা করছি! বোমা পড়বে এই বাড়ির ওপর, তারপর তা চলতে থাকবে। লোকে যে এটা হতে দেবে তা অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না। এমন কি বুর্জোয়াদের মনেও ভীইয়ার রীতিমতো দাগ কেটেছে। এবারকার নির্বাচনে বামপন্থীরাই দলে ভারী হবে।'

লুসিয় মৃদু হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়কে হাসতে দেখে বিরক্ত হল। 'নাক উঁচু!' মনে মনে ভাবে। তবুও লুসিয়কে ওর ভালো লাগছে। অসাধারণ সুন্দর মুখ লুসিয়র। ফ্যাকাশে, সংবেদনশীল। ফিকে সবুজ চোখ, তামাটে চুল। লুসিয়কে দেখে মনে হয় মধ্যযুগীয় দস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ কোন অভিনেতা।

লুসিয় বলল, 'চমৎকার! কিন্তু তারপর? ভীইয়ার ঠিক আগের মতোই যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকবে। হয়তো আগের চেয়েও খারাপভাবে—কারণ ভীইয়ার দুর্বল-চিত্ত। কিন্তু আসল কথা তা নয়। এখন আমার বাবা দক্ষিণপন্থীদের দলে। তারাই এখন দলে ভারী। এবারেও বাবা নির্বাচনে জিতবেন। উনি দেখবেন উনি বামপন্থীদের দলে ভীড়ে গিয়েছেন। ব্যাপারটা অবশ্য আন্তরিকভাবেই ঘটবে। বুর্জোয়া হলেও উনি মানুষটা খাঁটি। সুতরাং উনি গতকাল যা করেছেন, আগামীকালও তাই করবেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওসব লোক কখনো বদলায় না। তুমি কি বলবে আমি জানি। কিন্তু বাঁচবার পথ মাত্র একটিই আছে। জনসাধারণ বিপ্লব আনবে, একথা যদি সত্যি হয়, তবে সেই বিপ্লবের প্রস্তুতি করবে সংগঠন—একথা সত্যি। এটা একটা আর্ট। তাই নয় কি আঁদ্রে?'

'আমার মতে আর্ট সম্পূর্ণ অন্য একটা জিনিস। ছবি আঁকা কিংবা বাগান তৈরি করা নিশ্চয়ই একটা আর্ট। কিন্তু বিপ্লবকে আমি বলব একটা দুর্ভাগ্য—এমন একটা দুর্ভাগ্য যার মধ্যে লোককে নিয়ে যেতে হয়। তোমরা পরিবর্তন চাও এবং সেজন্যে কোন সুযোগ হাতছাড়া করো না। কিন্তু আমি ভালবাসি জীবনের স্থির অচঞ্চল রূপ—কারণ সেই হচ্ছে সময় যখন খুশিমতো তাকিয়ে থাকা যায় আর সত্যিকার দেখাও হয় অনেক কিছু। বলতে গেলে সেজানের মতো। সেজানের সারা জীবন কাটল আপেল দেখে দেখে, সেই দেখায় তিনি কিছু পেয়েও ছিলেন। আমার মতে এই হচ্ছে আর্ট।'

পিয়ের তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

'শিবনেত্র হয়ে নিজের স্টুডিওতে বসে একথা বলা সহজ। কিন্তু যখন মেশিনগান উঁচিয়ে তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে—তখন? তখন আর চিন্তা করার অবসর থাকবে না। যুক্তি দিয়ে দেখতে পারাটাই তখন বড়ো কথা হবে—তাই নয় কি আঁদ্রে?'

একথার উত্তর দেবার ইচ্ছে আঁদ্রের ছিল না, কিন্তু কখন যে সে কথা বলতে শুরু করেছে নিজেই তা জানতে পারেনি। জেনেতের অবিশ্বাস্য রকমের বড়ো বড়ো দুই চোখের দৃষ্টি পড়েছে তার ওপর আর সেই দৃষ্টির প্রভাবে তার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে, নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে সে।

আঁদ্রে বলতে লাগল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়'কে আমি বুঝতে পারি না। দ্যাখ ঐ তারাগুলো—কি বিরাট ব্যাপার! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, সম্ভবত দর্শনের ওপরেও আছে এর ছাপ। কিন্তু এই তারাভরা আকাশ আঁকবার কথা কোনো শিল্পীরই মনে হবে না। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত শিল্পীরা নিবিষ্ট হয়ে কী দেখেছে? দেখেছে দেহ—সেই দেহের অমিল, তার চমকানো রূপ, তার ব্যগ্রতা আর তার পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা। কিংবা এমন কোনো নিসর্গ যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের ছুঁচলো চূড়ো, পাতার বিচিত্র রঙ, একটা বেড়ার সঙ্গে মিল খাওয়ানো আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো তখন তা কেবল একটা ধারণা, একটা কথা মাত্র। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়'র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। তাদের মুখ আমি দেখেছি, অনুভব করেছি তাদের বেদনা...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। এত কথা কেন বলছে ভেবে সে নিজেই অবাক হল। এসব কথার কোনোই সার্থকতা নেই, এভাবে সে বলতেও চায়নি। মেয়েটি কি ভাবে থাকে? লুসিয়' বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো নেহাৎ শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়' অবশ্য সত্যিই অভিনেতা। লুসিয়'র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকে...না বুঝেই আঁদ্রে ঈর্ষাতুর হয়ে পড়ল। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। যখন এক গ্লাস কোনিয়াক্ পানীয় চাইল জেনেৎ, আঁদ্রে বলে ওঠে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি তখন ভুলে যাবে যে...'

জেনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়' ব্যঙ্গ করে চোখ কোঁচকালো, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জেনেৎ, ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জেনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা রীতিমতো গালমন্দ শুরু করেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যের কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ বাধবেই!'

পিয়ানোর ধারে জেনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে পয়সা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রট সুরের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...ওদের হারিয়ে দেব আমরা। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর যাতে অনুশোচনা করতে না হয়।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজি না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোনো দিন নাচেনি। কেরানি আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'এক ঢোক গিলে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো করেছে। কিন্তু জেনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে ওঠে আঁদ্রে, জেনেতের শরীরের ছোঁয়া লেগে তার লাল লাল মস্ত হাত দুটো কেঁপে ওঠে। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখে কাফের মালিক। এক মিনিটও হয়নি জেনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই', চাপা ক্লান্ত গলায় বলে সে, 'লুসিয়', আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জেনেৎ চলে যাবার পর সিয়ের জিজ্ঞেস করে, 'ও কোন্ থিয়েটারে কাজ করে? কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলে, 'ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট পারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর যথেষ্ট প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভালো সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে—'চলো, আরো খানিকটা পানীয় খেয়ে গল্প করা যাবে।' পিয়ের তক্ষুনি রাজি, কিন্তু আঁদ্রে বলে, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চায় না—'আরে, চল, চল। আবার কবে দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়ায়—'যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ করো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভালো লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী', কথাটা শেষ করে না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে যায়।

দুই

আঁদ্রে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে তার যাবার রাস্তা। মোটর-হর্নের আর্তনাদে বাতাস চিরে যাচ্ছে, লাল-সবুজ-বেগুনি রঙের গোছা গোছা আলো জ্বলে উঠেছে চারদিকে। কাতারে কাতারে লোক—কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ বিক্রি করছে খবরের কাগজ আর নেকটাই, কেউ হোটেলে সান্ধ্য নাচের আসরের জন্যে খদ্দের যোগাড় করবার চেষ্টা করছে। ভাঙা ভাঙা গলায় করুণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে গণিকারা। একটা বন্ধ অন্ধকার গলির ভেতর থেকে লাউড-স্পীকারের গলা ভেসে এল : আবার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওঠা দরকার এজন্যে যে...এই হট্টগোল তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল আঁদ্রে, ডুবুরী যেমন করে ঘন কালো জলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে—তেমনিভাবে। তারপর সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল একটা ব্রিজের ওপর। নীচে সিয়েন নদীর কালির মতো কালো জলে প্রতি-ফলিত আলো যেন একটা দ্বিতীয় অস্পষ্ট জীবন পেয়েছে। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বইতে শুরু করে, তারপরেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। জেনেতের চোখদুটি মনে পড়ে আঁদ্রের। আশ্চর্য মেয়ে জেনেৎ। রু শের্স্-মিদির কোণে 'তামাকখোর কুকুর'-এ সে ঢুকল তামাক কেনবার জন্যে। ভেতরে রীতিমত হৈ-হল্লা চলছে। হঠাৎ এক গ্লাস কাল্‌ভাদো মদের হুকুম দিয়ে বসে পড়ে আঁদ্রে। মদ খেয়ে শরীরটা গরম হতেই রীতিমতো খুশি হয়ে ওঠে। মনের ভেতর যে-সব এলোমেলো চিন্তা জট পাকিয়ে রয়েছে, সেগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। মনের এই অবস্থা তার কাছে নতুন; এর কোনো হদিশ পাচ্ছে না সে। তিন গ্লাস কাল্‌ভাদো পান করে যখন সে উঠতে যাবে, একটি লোক এল তার কাছে। লোকটির চেহারা রোগা ধরনের, চোখের ভুরু ও পাতা শাদা, গায়ে প্রকাণ্ড ওভারকোট।

লোকটি বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমার ফরাসী উচ্চারণ একেবারে যাচ্ছেতাই। আপনাকে প্রায় রোজই দেখি, তবুও আপনার কাছে আসার আগে আমি অনেকদিন ইতস্তত করেছি। আপনি যেখানে থাকেন, সেখানেই আমি থাকি—মাদাম কোয়ার বাড়ির চার তলায়। 'সালোঁ'-তে আপনার আঁকা ছবি আমি দেখেছি এবং আমার খুবই ভালো লেগেছে, বিশেষ করে শহরতলীর নিসর্গদৃশ্য আর ঐ ধূসর রঙ...'

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি ইচ্‌থিওলজিস্ট। আমার নাম, এরিক নিইবুর্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে সরল চোখের দৃষ্টি, ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, কড়া মার দেওয়া কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'তা বলিনি। 'লজিস্ট' কথাটার আগের শব্দটার মানে জিজ্ঞেস করছি। আপনি যে-বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলে বললেন।'

'মাছ।'

আঁদ্রে চেঁচিয়ে হেসে উঠল; 'মাছ! যাক্, তাহলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে : আমার আঁকা ফোঁতনে-ও-রোজঁ-এর দৃশ্য আর বিশেষ করে তার ধূসর রঙ আপনার ভালো লেগেছে। আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনার আগ্রহ। সব মিলিয়ে এখনো তেমন কোনো অর্থ হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো খান? বেশ, বেশ! মাদাম কোয়ার আস্তাকুঁড়েই আছেন তাহলে! আপনাকে কি জার্মানি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎস্যবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি খুশি হলেন না!'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। কোনো কোনো মাছ দেখতে ভারি সুন্দর আর কোনো কোনো মাছ খেতে ভালো। বাদবাকি সম্পর্কে আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভালো লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভালো লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা ধরেছে। চকচক করছে জ্বলজ্বলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল, 'কার কি ভালো লাগছে সেটা বড়ো কথা নয়। পারী আমার ভালো লাগে। এমন কি আমার মনে হয় পারীকে আমি চিনতে পেরেছি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থান বাছাই করার ব্যাপারে কারও হাত নেই। যেমন ধরুন, আমার জন্মস্থান জার্মানি। এজন্যে জার্মান ভাষা, জার্মান গাছপালা, এমন কি জার্মান সসেজ পর্যন্ত আমি ভালোবাসি। আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালোবাসি? প্রায় না-ভালোবাসারই মতো। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে বা সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, 'আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স', 'স্বদেশ বিপন্ন'। কিন্তু আমরা ওসব কথায় শুধু হাই তুলি কিংবা হাসি। কেউ হয়তো বলবে, মস্কো এর চেয়ে ভালো। কেউ বলবে, লুবেক আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে এরা বাস করে মাত্র তার বেশি কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় সবাই এসব কথা সত্যি সত্যিই সাংঘাতিকভাবে বিশ্বাস করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: 'আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' কে জানে! ওদের হয়তো প্রতারণা করা হয়নি। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে লোকে 'ভিভ্ লা ফ্রাঁস' বলে চেঁচিয়েছিল। অবশ্য জার্মানরা তখন বেয়নেট উঁচিয়ে ধরেছে আর প্রুশিয়ানরা পেঁছে গেছে নরমান্ডিতে।... কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের মধ্যে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড়ো বড়ো দার্শনিক কথা বলতে সবাই খুব ভালোবাসে। আমার মনের এই অবস্থার জন্য ওরাই দায়ী। আর সবারই এমন মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যে শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। ওদের কারও মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে-কোনো মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল। আমাদের কপাল বলতে হবে যে আরো একটা বছর পাওয়া গেছে। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে পর পর দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়নি। যাই হোক, সময় থাকতে যে পারীকে দেখে নিয়েছি, সেজন্য আমি খুশি, কারণ...'

'কারণ?...'

'কারণ, এর পর পারীর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনিও একটি আস্ত পাগল। কালভাদো আপনার পেটে সয় না, তাই এসব বিভীষিকা আপনি কল্পনা করছেন। মাছের ব্যবসায়ে আপনার সাফল্য কামনা করি।'

আঁদ্রে বাইরে চলে এল। হঠাৎ জেনেতের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয়, বহুদূর থেকে জেনেতের গলার স্বর ভেসে আসছে আর অতি মামুলি কথাগুলো গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে। অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়িটা ছুটে পার হয়ে সে বেতার-যন্ত্রটার সামনে দাঁড়াল। যন্ত্রটার ভেতর থেকে একজন পুরুষ নাকি সুরে গমক দিয়ে গাইছে: বাল্ডোফ্লোরিন মিক্চারে মাথাধরা আর পিলে সারে...'

দু হাত মুখ ঢেকে একটা টুলের ওপরে বসে পড়ে। বহুক্ষণ বসে থাকে এভাবে। তারপর হঠাৎ চমকে ওঠে—একটা পরিচিত গলা ভেসে আসছে। জেনেতের চোখদুটো খোঁজে সে, কিন্তু রেডিওর আলো-জ্বালানো ডায়ালটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। 'লাইপজিগ', 'রোম', 'পোস্ট পারিসিয়েন'। শোনা যায়: 'আমার অনুভূতিকে যতোই গোপন করবার চেষ্টা করছি, ততোই আমার হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে...' তারপর জেনেৎ দুবার বলে: 'ছেলেখেলা।' তারপরেই হেঁড়ে গলায় শ্রোতাদের অনুরোধ জানানো হয়, তাঁরা যেন খাওয়ার পর মার্তিনি ভারমুথ পান করতে না ভোলেন। অনুরোধটা এমন আচমকা যে আঁদ্রেকে হাসতে হল। পায়চারি করতে করতে মনে মনে সে বলে, 'আচ্ছা বেশ। মার্তিনি খাব। হৃদয় উন্মুক্ত করব। ছেলেখেলা।' কিন্তু যন্ত্র শাসিয়ে ওঠে 'জার্মান বিমান-বাহিনী ...লীগ অব নেশনস্-এর সংকট...বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা...'

খোলা জানলার সামনে এসে আঁদ্রে দাঁড়ায়। মার্চ মাসের ঝোড়ো রাত। ক্যানেলের নৌকোগুলো টাল খাচ্ছে। রক্ষাকবচ মুঠো করে চেপে ধরছে ভয়ার্ত জেলেরা। সমুদ্রের হাওয়া পারী পেঁছে আছড়ে পড়ছে ঘরবাড়ির ওপর। বাতাসে নোন্তা স্বাদ। সমুদ্রের ধারে মানুষ হয়েছে আঁদ্রে। সে জানে—সেখানকার আপেল গাছগুলো এখন বিপর্যস্ত।

গুঁড়ি থেকে রস টেনে টেনে গাছগুলো বাড়ছে। হাওয়ার দাপটে পাগল হয়ে উঠেছে গাছগুলো। কী সৃষ্টিছাড়া বাতাস! নতুন মানবতা, গোবরে পোকা, বিদ্রোহ, যুদ্ধ! এসব কি সত্যি হতে পারে? জার্মান লোকটা বলেছিল—কারণ, এর পর পারীর অস্তিত্ব থাকবে না...আর —জেনেৎ! সে তো গাড়ি-চাপা পড়তে পারে কিংবা ঠান্ডা লেগে অসুখ হতে পারে ওর। পৃথিবীটা কী পলকা! ওর মতবাদ নিয়ে তর্ক করছিল—নিষ্প্রাণ পাথর, আকাশচারীর দল। নরমাণ্ডির ঝড়-বিক্ষুব্ধ উপকূলের আপেল গাছগুলোকেই একমাত্র ভালবাসা সম্ভব। আপেল গাছ আর জেনেৎ।

তিন

দামী আসবাবে সাজানো ঠান্ডা অস্বস্তিকর একটা ঘরে পিয়েরকে নিয়ে এল লুসিয়ঁ। ভেতরে ঢুকলে মনে হয় যেন এ-ঘরের মালিক অনবরত বদলাচ্ছে, ঘরের দামী আসবাবের ওপর কারও কোন মায়া নেই। লুসিয়ঁ থাকে তার বাপ-মার সঙ্গে। এ-ঘরটা সে ভাড়া নিয়েছে জেনেতের জন্যে, যদিও কথায় কথায় সে বলে—'আমার ফ্ল্যাট'। এঙ্গেল্‌স্-এর একটা বই আর রঙিন রেশমের তৈরি একটা পুতুল পড়ে আছে চওড়া সোফাটার ওপর।

অনেকগুলো বোতল বার করে পাঁচমেশালি পানীয় তৈরি করার কাজে লেগে গেল লুসিয়ঁ। নাটক সম্পর্কে কথা তুলল পিয়ের—শেক্‌স্‌পিয়রের উৎসাহী অনুরাগী সে।

বাধা দিয়ে লুসিয়ঁ বলল, 'এখন একশো বছর ওসব তুলে দিতে হবে। কাল জেনেৎ আবৃত্তি করছিল—তুমি হয়তো আমাকে নিজের করে নাও নিতে পারো, কিন্তু তুমি চাও বা না চাও আমি তোমার সেবিকা হবো...মিরান্ডার উচিত এখন চুপ করে থাকা। এখন কমরেড কালিবানের কথা বলার পালা।'

সিগারেটটা শেষ না হতেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর কথার সুর পালটে খানিকটা সহজ হয়ে ওঠার চেষ্টা করল—'বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। ব্যাপারটা সহজ হবে না। একে আজকের এই বক্তৃতা...তায় দিন কয়েকের মধ্যেই আমার নতুন বই বেরুবে...একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাকে! আঁদ্রের মতো লোককে আমি সত্যি বুঝি না। যখন বড়ো রকমের বাজি ধরেছ তখন আর খেলব না বলা চলে না।'

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেক লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সিয়েন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লেগেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে দেখতে গেলে সে আমাদের শত্রু, বাঘা বাঘা পুঁজিপতিদের একজন। ৬ই ফেব্রুয়ারির আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক জিনিস বুঝে ফেলেছে। যাতে

কোনো ভবিষ্যৎ নেই তা আঁকড়ে থাকবে এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটায় এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তোলবার পথ ওটা! সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক এক ভাবে আমাদের কাছে আসে। একথাটা না বুঝলে চলবে না। আমাদের কারখানায় মিশো বলে এক মিস্ত্রী আছে, আশ্চর্য চমৎকার লোক কিন্তু একেবারে কাঠগোঁয়ার। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল—'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চাইতে কমিউনিস্টদের বেশি পছন্দ করি, ওদের সাহস আছে। শুধু রাজনৈতিক ভেজালের মধ্যে পড়ে ওরাও বিষিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? মেরিয়ান মায়ের সেই পুরানো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—মাঝখানের ঘোড়া হল ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী আর ডান দিকের? হয়তো আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম পুরানো হবে। সহিষ্ণুতার জয়!' হঠাৎ লুসিয় হেসে উঠল—'স্কুলে যিনি আমাদের ইতিহাস পড়াতেন তাঁর কথা মনে পড়ছে। তিনি একবার খুব গুরুগম্ভীরভাবে বলেছিলেন—অসহিষ্ণুতাই আমাদের মহা-বিপ্লবকে ধ্বংস করেছিল। তখন মোটা ফ্রেদি দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল—আমার বাড়ির লোকেরা আমার ওপর বড় বেশি সহিষ্ণু, তাই আমি ধ্বংসের পথে চলেছি। ফ্রেদিকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা উঠেছিল, মনে আছে?'

অনেকদিন ফেলে-আসা ছেলেবেলার নানা দুষ্টুমির কথা নিয়ে আলাপ শুরু করল দুজনে। লুসিয় অনবরত পানীয় ঢালছে, কেমন কোমল হয়ে উঠেছে পিয়ের। আচমকা পিয়ের তার নতুন বান্ধবীর কথা বলতে শুরু করে।

'ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ কোরো। আমরা বিপ্লবের কথা বলি, কিন্তু দেখবে এই মেয়ে ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে। ওর বাবা মজুর, জোর-এর সঙ্গে পরিচয় ছিল, জেলও খেটেছেন। বেলভিইতে শিক্ষিকা ও। ওখানে ছোট-বড়ো সবাই ওকে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখে যদি দেখতে! ওখানকার সব কিছু ও বদলে দিয়েছে।'

লুসিয় হাসল—'তোমার ওপরে নিত্যি যে-সব হামলা চলে, এটিও কি তার মধ্যে একটি? না, এবার সত্যি সত্যি বিয়ে করবে ঠিক করেছ?'

'ঠাট্টা নয়, আমার কাছে এটা বাঁচা-মরার প্রশ্ন গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনো সেরকম কিছু হয়নি। এমন কি আনে এখনো আঁচ করতে পারেনি...'

'জুল লাফোর্গ কি বলেছে জান? নারী রহস্যময়ী হলেও প্রয়োজনীয় জীব।'

'তোমার কাছে প্রয়োজনীয়, এই বোধ হয় তুমি বলতে চাও।' পিয়ের রেগে উঠেছে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জেনেৎ ঘরে ঢোকায় সে আর কিছু বলে না।

টুপি ও দস্তানা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানা ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে নিজেকে দেখছে জেনেৎ। একটি কথাও না বলে একটা সিগারেট ধরায়, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আঁদ্রেকে আসতে বললে না কেন?'

লুসিয় চটে ওঠে কিন্তু জবাব দেয় না। একটা গ্লাস একপাশে সরিয়ে রেখে জেনেৎ পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়ঃ 'কি রকম অভ্যর্থনা পেলেন এখানে? এতক্ষণে কি বন্ধুর বাবার সম্পত্তির বিবরণ শুনছিলেন, না পানপাত্রে বিপ্লব গাঁজিয়ে উঠছিল?'

লুসিয় অবাক হয়ে জেনেতের দিকে তাকায়।

'কি হল তোমার? এত ঝাঁজ কেন?'

'ঝাঁজ? না, ঝাঁজ নয়। কিছু ভালো লাগছে না আমার।'

পিয়ের ছটফট করে উঠে বলে, 'এবার আমার যাওয়া উচিত। ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

চার

'বাঃ, পাটাটা বেশ তো।' উৎসাহের সঙ্গে মিশো বলে পিয়েরকে।

তারপর শুরু হয় রাজনীতির আলোচনা। যথারীতি পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভীইয়ারের। মিশো চুপচাপ শুনে যায়। মিশোর বয়েস বছর তিরিশ। গাট্টাগোট্টা চেহারা, ছাইরঙা সংশয়ী চোখ। নিচের ঠোঁটে সিগারেটের শেষটুকু লেগে রয়েছে। মাথায় টুপি, পরনে হাফ-হাতা শার্ট। হাতের উল্কি দেখা যাচ্ছে—একটা নোঙর আর হরতনের ছবি। এক সময়ে নৌ-বাহিনীতে কাজ করত। ভালো কর্মী হিসেবে সুনাম আছে কিন্তু তার জিবের ধার বড়ো বেশী। কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়ো। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানার খুব ইচ্ছে পিয়েরের। মিশো কিছু বলছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার বক্তৃতা দিতে ওস্তাদ।'

'তা হলে তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'এখনকার হাওয়াই হল গিয়ে পপুলার ফ্রন্ট। এটা হল ওপরকার ব্যাপার। যদি আমার কথা বলো তো আমার ঘাড় বা মনি-ব্যাগ ওর জিম্মায় রাখতে পারি। তাই বলে আমাদের আদর্শ নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই পাটাটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। পাটাটা সিয়েন-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। আমরা বোমারু তৈরির ইঞ্জিন বানাচ্ছি। অর্থাৎ যুদ্ধের ব্যাপারে খাটছি। পাটাটাকে ভালো বলতে তোমার বাধে না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই পাটাটা তো নিছক দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা হাতিয়ার—এবং রীতিমতো ভালো হাতিয়ার। আজ এটা আমাদের নয়, কাল হতে পারে। সেজন্য একে যত্ন করতে হবে। বোমারু তৈরির ব্যবসাটা খুব সৎ নয়। ওদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? তারা কারা আর লড়াইটার রূপই বা কি? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সবকিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা একসঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধে, আমাদেরও সুবিধে। এরপর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে। কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—আমরা যদি ওকে সময়মতো পেড়ে ফেলতে না পারি তবে ও আমাদের পাইকিরি ভাবে গুলি করে মারবে। ঠিক ভাই! যাক, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

ছুটির পরে আনের কাছে যাচ্ছিল পিয়ের। যেতে যেতে কথাগুলো ভাবে। তখন গোধূলির সেই আলো-আঁধারি যখন সবকিছুই ভাসা ভাসা আর স্বপ্নের মতো মনে হয়।

দিনের আলোয় যে বাড়িগুলোর গা দাগড়া দাগড়া হয়ে থাকে এখন তা নীল পাহাড়ের মতো লাগছে। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। দৃশ্যমান জগতের গায় শিল্প যেন যাদু বুলিয়ে দিয়েছে।

মিশোর কথাগুলো অসহ্য রকমের রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়তো মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সবকিছুই ফোলো হয়ে যায়—সংগ্রাম, জয়লাভ সবকিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ার কি করেছে না করেছে তা দেখলেই তো হয়। ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ—এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোস করবে ভীইয়ার সে লোকই নয়।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি সিধে, পাথর ফুঁড়ে চলা পাহাড়ী ঝরণার মতো। মিশো পাহাড়ীর লোক, একটু বেয়াড়া, এবং মানুষ হিসেবে কড়া। পিয়েরের জন্ম কিন্তু রুসিয়'র আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞ্চাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করতেন। সেখানকার মাটি লালচে, আলো চোখ-ধাঁধানো, আর গলা এনামেলের মতো গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের নিজে ভালোবাসে উচ্চকণ্ঠ হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গি, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, ফাঁসির মঞ্চ থেকে জ্যাকোবিনদের ধরনে জ্বালাময় বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য রূপ।

আবছা নীলিমায় বুলভারের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য; তাহলেও বোঝা যায়, বসন্ত শুরু হতেই তারা নড়েচড়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা।' নিজের লেখা প্রায় ছেলেমানুষি কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল : 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজানতেই আনের চিন্তা মনে এল—ও আজ কি ভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে ?

পিয়ের নিজের অস্তিত্বকে বড়ো বেশি জাহির করে, নিজের আবেগগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখতে ভালোবাসে। এমন যে পিয়ের সেও এই মেয়েটির জমাট স্তব্ধতার সামনে খেই হারিয়ে ফেলে।

'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে বলে সে। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়'র কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পায়নি সে। প্রায়ই সে যায় ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ি সম্পর্কে অনেক কথা বলে, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। তারপর হঠাৎ একসময়ে দুজনেই চুপ করে গিয়ে কান পেতে জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শোনে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা কি তোমার কখনো হয়েছে ?' নুট হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে তারা আলাপ করছিল। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন হচ্ছে।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্মম গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষার ছোঁয়া লেগেছে আর সে ধরে নিয়েছে যে আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ হল তার এই অজানা প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে আনের মন কেমন করা।

রু বেলভিলে পৌঁছতে পৌঁছতে রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করে। মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো শুয়োরের মাথাগুলো

বেগুনী আলোয় পাথরের মতো দেখাচ্ছে। একটা সিনেমায় ঢোকবার মুখে পোস্টারে রঙ-মাথা এক সুন্দরী একটি নায়িকের হাত চেপে ধরে বড়ো বড়ো ফোঁটায় চোখের জল ফেলছে। কাফেগুলোতে কাঁচের গ্লাশের মিষ্টি টুং-টাং আওয়াজ আর বিলিয়ার্ড টেবিলের সবুজ জমির ওপর বলের ছুটোছুটি। সন্ধ্যাবেলা এই রাস্তাটা রাংতার মতো ঝলমলে ও করুণ। দু দিকে নালার মতো সরু সরু অন্ধকার গলি বেরিয়েছে; মার্গারিণ, পেঁয়াজ আর প্রস্রাবের দুর্গন্ধে সেখানকার বাতাস ভারী। রাস্তার ছেলেগুলো খেলছে, বুড়ীগুলো গলা ফাটিয়ে একজন আরেকজনকে গাল দিচ্ছে, একপাল বাচ্চা আর বেড়াল তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। প্যারীর সবচেয়ে দরিদ্র এলাকাগুলোর মধ্যে এটা একটা। এ দারিদ্র্যের মধ্যে রোমান্স নেই। এখানে কেবলই জোড়াতালি দেওয়া, কোনোরকমে খুদকুঁড়ো জোটানো, প্রতিটি পাইপয়সার হিসেব করে চলা। একটা নোংরা গলির ভেতরে নতুন একটা বাড়ি তৈরি হয়েছে, দোকানদার, কর্মচারী আর চাকুরেদের জন্যে। ছোট ছোট ফ্ল্যাট। দেওয়ালে আঁটা রংবেরঙের কাগজ আর এখানে ওখানে সাজানো কয়েকটা উদ্ভট, আরাম-কেদারা—এটুকুই ফ্ল্যাটগুলোর আতিশয্যহীন বিলাস। বড়লোকদের বাড়ির মতো এই বাড়িরও সাততলায় চাকরদের জন্যে ছোট ছোট ঘর। কিন্তু দোকানদার ও আপিস কর্মচারীদের বৌরা নিজেরাই রান্নাবান্না করে, সুতরাং ছাদের ঘরগুলো ভাড়া দেওয়া হয়েছে পরিবার-পরিজনহীন গরীব লোকদের। একজন লোক যে আগে দোকানের খাতা লিখত এখন বেকার, এক বুড়ী যে নাপিতের দোকানে মাথা ধোয়া আর মালিশ করার কাজ করে, এক টহলদার ব্যবসায়ী যে নিজের ব্যবসাতে সুবিধে করতে পারেনি—এরা থাকে এখানে। আর থাকে পিয়েরের হৃদয়জয়ী আনে লেজাঁদর।

আনের ঘরের ভেতর একটা সরু ভাঁজ করা খাট, একগাদা স্কুলের খাতা বোঝাই একটা টেবিল, দুটো বেতের চেয়ার ও হাত-মুখ ধোবার জন্যে একটা গামলা। দেওয়াল গুলো ফাঁকা, ছবি বা ফটোগ্রাফশূন্য; বইয়ের তাকে কতকগুলো পাঠ্য পুস্তক, একটা অভিধান, 'মাদাম বোভারি' ও লুই মিসেল-এর জীবনী; ঘরের শেষ প্রান্ত জানলা দিয়ে তাকালে দেখা যায়, আবছা আর প্রায় নাটুকে ধরনের একটা চাঁদ আকাশে ভাসছে।

আনেকে ঠিক সুন্দরী বলা চলে না। ঢিপ্ কপাল, ক্ষীণদৃষ্টি কটা চোখ, বোঁচা নাক। কাজের মানুষের মতো লাল লাল হাত। তবুও আনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা দেখে আকৃষ্ট হতে হয়; সেটা হচ্ছে তার চাপা স্বভাব, ঐকান্তিকতা, কাজ করার ইচ্ছে এবং হয়তো বা সেজন্যে আত্মদান। হাসলেই মুখখানা সরল আর মিষ্টি দেখায়। সেই মেয়ের মতো যে সকালটা বনে বনে ট্যাঁপারি কুড়োতে ভালোবাসে, যে সহজেই প্রতারিত হয় আর ব্যথা পায়। খুব কম সময়েই হাসি দেখা যায় আনের মুখে। কিন্তু যখন সে হাসে তখন হাসে ঠিক ফুর্তির ভাব থেকে নয়, অন্তরের গভীর প্রশান্তি থেকে। খুব বড়ো রকমের আনন্দের মুহূর্তে তার চোখে জল আসে।

আনেকে এত মন খারাপ করে বসে থাকতে পিয়ের এর আগে আর কখনো দেখেনি। লুসিয়ঁর বক্তৃতার কথা বলতে আনে শুধু বলল, ঘেন্না ধরে গেল! ওরা সবাই ওর বাবার নাম ভাঙাচ্ছে।'

পিয়ের তর্ক করার চেষ্টা করে। লুসিয়ঁর সাধুতা, গত দু-পুরুষের মধ্যে বিরোধ, প্রচারের প্রয়োজনীয়তা—এসব কথা বোঝাতে চেষ্টা করে সে, কিন্তু আনের সেই এক কথা : 'রাজনীতি বড়ো হীন ব্যাপার। একটা খেলা মাত্র। সাধারণ লোক এখনো না খেয়ে মরছে।'

পিয়ের ভাবল, ও বোধ হয় কোন শিল্পীর প্রেমে পড়েছে। তার এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজে বার করতেই হবে।

সে বলল, 'তুমি যার কথা বলেছিলে সে লোকটি কে আমি জানতে চাই। কার কথা বলছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। সে কি কবি?'

'না, রাসায়নিক। কিন্তু ও কথা টেনে আনা কেন? আর দিন পেলে না,—আজই? ও ছাড়াও আমার অনেক দুশ্চিন্তা আছে।'

'তুমি কি ওর কথা ভাবছ?'

আনে উত্তর দিল না। পিয়েরের দিকে সে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টিতে সাধারণত কেমন একটা অসহায় ভাব—ক্ষীণদৃষ্টি লোকের যেমন থাকে। কিন্তু এখন সেই চোখ হয়ে উঠেছে কঠিন আর চোখের দৃষ্টিতে প্রায় বিদ্বেষ। ঠাণ্ডা গলায় সে বলল, 'আজ স্কুলে আমার বরখাস্তের খবর পেয়েছি। এর চেয়ে গদ্যময় চিন্তা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বোধ হয়।'

'বরখাস্ত করেছে?' পিয়ের চটে উঠেছে। ছোট্ট ঘরটার ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন।

'কে তোমায় বরখাস্ত করেছে? কার এত সাহস? এ অসম্ভব!' চিৎকার করে বলল সে।

আনে বলল যে, সম্প্রতি মন্ত্রী-দপ্তর থেকে একটি সার্কুলার জারি করার পর কোনো রাসায়নিক দোকানের মালিক এই অভিযোগ জানিয়েছেন যে স্কুলে তাঁর ছেলেকে 'বিপ্লবী রচনা' লিখতে বাধ্য করা হয়েছে।

'লেখাটা আমার কাছেই আছে। পড়ে দেখ। ছেলেটির বয়স আট বছর।'

পিয়ের চেঁচিয়ে পড়ল, "আমাদের ছটা কুকুরের বাচ্চা ছিল। পাঁচটা বাচ্চা মা জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলল। মা বলে যে দুধ নেই। রনে বলছিল যে ওর একটা বোন হবে। রনেদের বাড়িতেও দুধ নেই। রনের বোনটাকেও বোধ হয় ওরা ডুবিয়ে দেবে। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের অনেক দুধ ছিল। মা বলে যে আমি যখন বড়ো হব, আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। মা বলে যুদ্ধে গেলে আমি মরে যাব। আমি বল খেলতে আর ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসি।"

'আমি ছেলেদের বলেছিলাম, কি ভাবে তোমাদের দিন কাটে তাই নিয়ে একটা রচনা লেখ। কয়েকটা লেখা আশ্চর্য ভালো মনে হয়েছিল আমার, পড়ে দেখতে পার। মন্ত্রী-দপ্তরের চিঠিতে 'দেশপ্রেম-বিরোধী' মনোভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টর আজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার পড়াবার নীতি বদলাবে কথা দিলে তোমার চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করব। আমি রাজি হই নি।'

'আর তুমি কিনা রাজনীতি করার জন্যে আমাকে দোষো!'

'এটা তো আর রাজনীতি নয়, সত্যি ঘটনা। রাজনীতি আমি ভালোবাসি না। রাজনীতির সবকিছুই রবারের মত—চেপে ধরাও যায়, টেনে বাড়ানোও যায়। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ জানবার কোনো উপায় নেই। শুধু কথা আর কথা, কিন্তু সাধারণ লোক যেখানে থাকার সেখানেই থাকে।'

'এবার তাহলে তুমি কি করবে?'

'আমি সেলাই জানি। কোনো দোকানে কাজ নেব।' তারপর আবার বলে, 'কিন্তু সব চাইতে মুশকিল কি জান, পড়াতে আমি সত্যিই ভালোবাসি। আমার বাবাও এজন্যে কম ভোগেননি। যদিও তখন আমি খুব ছোট ছিলাম, কিন্তু সেই ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। রেনোর কারখানায় বাবা কাজ করতেন। একবার কারখানায় ধর্মঘট হল।

অনেক দিন ধরে চলল সেই ধর্মঘট। একদিন আমাদের খেতে দেবার মতো কিছু নেই ঘরে, মা কাঁদছিলেন, বাবা কিন্তু তাতে ভেঙে পড়েননি। ঘড়ি বাঁধা দিয়ে আমাদের মাংস খাইয়ে হাসি-ঠাট্টায় হৈ-হল্লায় মাতিয়ে রেখেছিলেন আমাদের। সে সময়ে জলহস্তী কি করে আইনসভার সভ্য হয়েছিল তা নিয়ে একটা মজার গান চালু ছিল। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ভেঙে গেল। কিন্তু আমার বাবাকে আর কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হল না, কারণ তিনি ছিলেন 'দলের সর্দার'। সারা শীতকাল বাবা বেকার বসে রইলেন। সেলাইয়ের কল সারানো বা এই ধরনের দু-একটা ছুট্‌কা-ছাট্‌কা কাজ মাঝে মাঝে পেতেন তিনি। কিন্তু কারখানার কাজেই তিনি ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন, এমন কি বিনা মাইনেতেও কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন। আমাদের কাছে প্রায়ই বলতেন যে কারখানার যন্ত্রকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। নিচের তলায় কে যেন এক আঙুলে পিয়ানো বাজাচ্ছে। 'তু ভা বিঁয়্যা, মাদাম লা মারকিস'—গানটার পরিচিত সুর ভেসে আসছে বাতাসে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছেলের খাতার দিকে তাকিয়েছিল পিয়ের। তাতে ছেলেটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন এঁকেছে—নীল সমুদ্র আর একটা ছোট জাহাজ। হঠাৎ মেয়েটির হাত ধরল পিয়ের।

'আনে!'...

গত কয়েক মাস ধরে সে মনস্থির করবার চেষ্টা করেছে। কি ভাবে কথা বলবে, বোঝাবে, প্রমাণ করবে—সবকিছু মনে মনে বহুবার কল্পনা করেছে। আর এখন শুধু নামটুকু ছাড়া আর কোনো কথাই তার মুখ থেকে বার হল না। কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে। কিন্তু আনের বুঝতে বাকি রইল না। পিয়েরের হাতের মুঠোয় তার হাত জবাব দিল।

'মিষ্টি!...'

'ডার্লিং!...তুমি জান, কত কষ্ট আমি সয়েছি। কি করে তোমায় কথাটা বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।' পিয়ের বলল।

'আর আমি ভেবেছিলাম ভালবাসার যন্ত্রণা শুধু আমিই পেয়েছি, তোমার দিক থেকে কিছু ছিল না। আমার মনে হয়েছিল আমি তোমার জীবনে সামান্য একটা ঘটনা মাত্র, অন্য কাউকে তুমি ভালোবাস। কিন্তু আমার সংগে কেন যে তুমি বারবার দেখা করতে আসতে বুঝতে পারতাম না।'

পিয়ানোর শব্দ বহুক্ষণ আগেই থেমে গেছে। সাততলা বাড়িটা ঘুমন্ত, নোংরা গলি-গুলো নিস্তব্ধ। যারা সিনেমায় বসে এতক্ষণ হেসেছে আর কেঁদেছে তারাও বাড়ি ফিরে এসেছে। শেষ বাস শব্দ করে চলে গেল। শুধু ছাদের ওপর চাঁদটা ঝুলছে—ভুলে যাওয়া বাতির মতো বেড়ালগুলো গলা ছেড়ে চিৎকার জুড়েছে। হঠাৎ পিয়েরের মনে পড়ল, আরো একজন প্রণয়ী ওর আছে। ও বলেছে সে রাসায়নিক। আর একটি রাসায়নিক দোকানের মালিক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুটো ঘটনার মিলটুকু কি কিছু নয়? না, ওই রাসায়নিক দোকানের মালিকই ওর প্রণয়ী। লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। কী ভীষণ লোক! নিজের ছোট ছেলের গায়ে চাবুক তুলতেও বোধ হয় ওর বাধে না। লোকটার নিশ্চয়ই গোঁফ আছে, খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা গোঁফ—আর লোকটা নিশ্চয়ই ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরে। আর হয়তো মস্ত এক নীতিবাগীশের মতো সরাসরি থানায় হাজির হয়েছিল। আর ঐ লোকের সংগেই কিনা ও থেকেছে! পিয়ের কি রকম কুঁজো হয়ে চুপ করে রইল, মাথা ঘুরছে যেন।

'পিয়ের, কি ভাবছ?'

'সেই লোকটার কথা, তুমি বলেছিলে সে রাসায়নিক।...'

'হ্যাঁ, তার নাম দ্যুভাল। সে-ই ইন্‌স্‌পেক্টরকে জানিয়েছিল।'

'সে কথা নয়। তোমার প্রণয়ীর কথা বলছিলাম।'

'বোকা কোথাকার! কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? তখন যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বলেছি—একজন রাসায়নিক।'

'কিন্তু সে কে?'

'তুমি। তোমার আগে কেউ ছিল না।'

দু হাতের মধ্যে ওকে টেনে নিল পিয়ের। হঠাৎ সে টের পায়, চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে।

'আনে, তুমি কাঁদছ?'

'দূর!'

পাঁচ

প্রকাণ্ড ঘরটার জানলা দিয়ে তাকালে খানিকটা অন্ধকার উঠোন দেখা যায়। মাঝে মাঝে ভোরবেলা আলো জ্বালতে হয় ঘরের ভেতর। বড় টেবিলটার ওপর ছড়ানো ফাইল, খবরের কাগজের কাটিং আর চিঠি। এই কাগজগুলোর তলা থেকে যে কোন জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে—পোড়া সিগারেটের টুকরো ভর্তি ছাইদানি, ডিটেকটিভ গল্পের বই, ছেঁড়া দস্তানা বা অন্য কিছু। টেবিল গুছিয়ে রাখা ঘরের মালিকের আদৌ পছন্দ নয়। পুরনো যুগের এম্পায়ার আলমারি, স্টীলের হাতল দেওয়া আধুনিক ধরনের আরাম-কেদারা, বেখাপ্পা কতকগুলো চেয়ার—ঘরের আসবাবের ভেতর কোন ছিরিছাঁদ নেই। দেওয়ালে টাঙানো মারকেতের আঁকা একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য: সবুজাভ ধূসর জলের ওপর নৌকা ভাসছে। তার পাশেই একটা মানচিত্র, আগাগোড়া লাল পেন্‌সিলে দাগা; গোল করে তেল ও ত্রিভুজ দিয়ে কয়লা-খনির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ঘরটির মালিক পুঁজিপতি জুল্ দেসের—ফ্রান্সের আসল শাসনকর্তাদের একজন।

দেসেরের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কেমন ফুলো ফুলো চেহারা, ঘন লম্বা ভুরুর তলায় চোখ-দুটো তীক্ষ্ম। মাঝে মাঝে তাকে আরো বুড়োটে লাগে। তখন অনায়াসেই চোখে পড়ে, তার শরীরটা শোথরুগীর মতো ফুলে উঠেছে, গায়ের চামড়ায় অসুস্থ বিবর্ণতা, ঝুলেপড়া কাঁধ। অন্য সময়ে তাকে দেখে মনে হয়, যেন চল্লিশ বছরও পার হয় নি। তার চলাফেরা যুবকের মতো, চোখদুটি আশ্চর্য রকমের প্রাণবন্ত। বেশভূষার দিকে বিশেষ নজর নেই, অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করে আর একটা কালচে বেঁটে পাইপ মুখে লাগানো থাকে সব সময়ে।

অন্যান্য পরাক্রান্ত পুঁজিপতিদের মতো জাঁকজমক পছন্দ করে না দেসের—রিপোর্টার বা ফটোগ্রাফারদের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে সোজাসুজি

অস্বীকার করে, কখনো বলে না যে রাষ্ট্রের ব্যাপারে তার কোনো হাত আছে—যদিও তার সায় না থাকলে কোনো মন্ত্রীসভার পক্ষে এক মাসও টি'কে থাকা সম্ভব নয়। পর্দার পেছন থেকে অদৃশ্য হাতে সে আইন-কানুনের নির্দেশ দেয়, বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে, মন্ত্রীসভার নির্বাচন ও পতন ঘটায়। এই উদ্দেশ্যে যেসব বিশ্বস্ত লোকের সাহায্য সে নেয়, তাদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দিতে ইতস্তত করে না।

দেসেরের ক্ষমতা এসেছে সংখ্যা থেকে—সংখ্যার সংযোগ ও বিরোধ থেকে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুঁজি—যে পুঁজি খাটছে পোলান্ডের রেল-পথে, আমেরিকার তেলে, ইন্দো-চীনের রবারে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিমান কারখানার মালিক, দ্রুত যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে যার স্বার্থসিদ্ধি; শেয়ার বাজারের দালাল, হিটলারের প্রত্যেকটি যুদ্ধ-বক্তৃতায় যে উল্লসিত; বক্সাইট-রাজা, জার্মানির কাছে যে কাঁচা মাল বিক্রি করে; জুতোর ব্যবসায়ীদের ট্রাস্ট, যারা স্বপ্ন দেখে জুতো-সম্রাট বাটাকে বাজার থেকে হটিয়ে দেবে আর বেনেস্‌কে হাতের মুঠোয় আনবে; উদারপন্থী সুতাকলের মালিক, যারা নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার স্বীকার করতে রাজি যদি নিগ্রোরা বিদেশ থেকে আমদানী করা প্যান্ট পরে; 'কমিতে দে ফোর্জ'-এর একগুঁয়ে পরিচালক মন্ডলী, যারা মজুরী কমিয়ে রাখবার জন্যে পোপের কাছে আবেদন করেছিল। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মোটর-পথ ও রেল-পথের বিরোধ—ট্রেনে যাত্রী না হওয়া আর মোটর বাস কোম্পানী উঠে যাওয়া ও জড়িয়ে আছে কানাডীয় গম চালানের ব্যবসাতে বড়োলোক হওয়া আটাকলের মালিক আর রক্ষণ-শুল্ক প্রয়োগের দাবিদার বোস্ জেলার উগ্র জাতীয়তাবাদী জমিদার। বিভিন্ন স্বার্থের একটা গোলক হৃৎপিন্ডের মত ধুক্‌ধুক্ করছে এখানে।

তুলো ও দস্তার শেষ মুহূর্তের দামটি পর্যন্ত দেসেরের নখদর্পণে। কোন্ মন্ত্রীকে কত দিতে হবে সব তার জানা। মৌমাছির গুঞ্জনের মত সংখ্যায় ঠাসা মাথার ভেতরটা। কিন্তু তবুও কোনোদিন সে নিজের লাভ খতিয়ে দেখেনি—ভাস্কর যেমন পাথরের ওপর কাজ করে, দেসের তেমনি করে টাকা নিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনে সে অত্যন্ত সাদাসিধে। পরিবার-পরিজন বলতে কিছু নেই, দানধ্যান করতে ভালবাসে না—তার যে কোনো কর্মচারীর বেতনেই তার নিজের খরচ স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। রবার ও তামা তার কাছে একটা নিরবয়ব ভাব মাত্র। সাইগন কোথায়, একথা সে একবার জিজ্ঞেস করেছিল। গম আর যবের পার্থক্য যে সে বলতে পারবে না, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পলিটেক্‌নিকাল স্কুল থেকে ডিগ্রী নেবার পর দেসের দু-বছর ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করেছিল, আর মনে মনে ভাবত যে পয়সাই তার সর্বনাশ করেছে। টাকার খাঁই মেটাবার জন্যে সে নিজের পেশাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। একটা অসুস্থ গুমরোনো উৎকণ্ঠা নিয়ে পিয়ের ও অন্য ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে সে এসব কথা বলে আর ওদের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু লোকটি সে দাম্ভিক, তাই মুখে বলে, 'আমার কথায় কান দিও না। চারুকলায় আমার অনুরাগটা নিতান্তই শৌখিন।'

দেসেরের মানসিক বৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত প্রবল। বিপদকে সে ভালবাসে। অনায়াসে সে টেস্ট পাইলট হতে পারত, হতে পারত অভিযাত্রী বা অগ্নিবক্তা বিপ্লববাজ। সত্য বলতে কি, এমন কি নিজের ব্যবসাতেও ঝুঁকি নিতে সে ভালবাসে; যেমন, মেয়েলি ছলাকলার মত লন্ডন বা নিউ ইয়র্কের শেয়ার-বাজারের আচমকা ওঠা-নামা, গতকালের বন্ধুকে না জানতে দিয়ে গতকালের শত্রুদের সঙ্গে মিতালি; কূটনীতিক আলোচনায় ভাঙন, এক কথায় এমন সব ঝুঁকি যেখানে সহজেই হিসেব ভুল হতে পারে।

এই ধরনের লোকের পক্ষে ফ্যাশিস্ট মতবাদ গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। ফ্যাশিস্টদের অদৃষ্টবাদ, এ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি ও সর্বনেশে প্রতীক সহজেই এদের আকৃষ্ট করে। ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেসেরও যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিয়েছে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'-র নেতাদের। অবশ্য এটা দেসেরের কাছে জুয়াব চালের মত, সে চেয়েছিল মন্ত্রীসভার পতন। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর সে তার নতুন বন্ধু ব্রতৈইকে শান্তভাবে বলেছিল, 'আজ থেকে আমার ঠিকানা ভুলে যেও।' পার্লামেন্টের লবীমহলের সর্বশেষ চমকপ্রদ খবর—এবার দেসের বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকেছে. এমন কি ভীইয়ারের সঙ্গে নাকি তার দহরম-মহরম চলেছে রীতিমতো। আসলে দেসেব ব্যাডিকাল-সমাজতন্ত্রীদের পছন্দ করত। 'সাধারণ নাগরিকদের' এই জগাখিচুড়ি দলটিতে জড়ো হয়েছে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী, ছোটখাটো ভাটিখানার মালিক, বিখ্যাত অধ্যাপক আর অর্ধ-শিক্ষিত দোকানদার। অসংখ্য বক্তা এই দলে, তারা অলিতে গলিতে দাতোঁ বা গ্যামবেতার মতো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই র‍্যাডিকাল দলটি সব চেয়ে বেশি ভয় করে র‍্যাডিকাল কাজকর্মকে। মর্যাদা বা কর্মক্ষমতার মাপকাঠিতে দেসের 'সাধারণ নাগরিক' নয়। কিন্তু ফ্রান্সের মাটি ও বাতাসের মতো সে ভালবাসে এইসব নিরীহ জ্যাকোবিনদের বকুনি, আর তার পরের পর্বের বিচক্ষণ ও কষ্টসাধ্য কাজকর্ম। নিজেকে সিনিক বলে প্রচার করে দেসের, তা সত্ত্বেও তার একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ আছে। ফ্রান্সকে সে টিকিয়ে রাখবে, যে ফ্রান্সকে সে ছেলেবেলা থেকে চিনেছে—ফ্রান্সের সম্পদ আর ধারাবাহিকতা; পারিবারিক জীবনের অটল ভিত্তি, যার মধ্যে আছে প্রগাঢ় নাটকীয়তা, প্রেমের চেয়েও তীব্র ঈর্ষা, সম্পত্তির অধিকার লাভের জন্যে স্মরণীয় মামলা-মোকদ্দমা; মফস্বল শহরের মধুর একঘেয়েমি; গিন্নীদের একদিকে উদাসীনতা অন্যদিকে টিপে টিপে খরচ করা বা এমন কি কঞ্জুস হওয়া; পরিশ্রমী স্বভাব, যেজন্যে অবস্থাপন্ন বৃদ্ধরাও নিজেদের হাতে সব্জি-বাগান তৈরি করে বা মাছের জাল সারায়; কোম্পানীর কাগজ-ভোগীদের ফুলের বাগিচা, সেখানকার মিষ্টি মটর আর সবুজ মটর পৃথিবীর সেরা; মাছ ধরার অদম্য উৎসাহ, যেজন্যে একটি পুঁটিমাছও ধরার আশা না রেখে জল দেখলেই ছিপ ফেলে বসে থাকা; চেম্বারের খাবারঘরে বিশ্ব-রাজনীতি আলোচনা আর খিদে-জাগানো মদের গুণাগুণ সম্পর্কে চুলচেরা তর্ক; পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার, তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক নিশ্চয়তা, সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতা যা ওপরতলার রাজনীতিতেও আরাম ও ঘনিষ্ঠতার আবহাওয়া এনেছে; আর সেই শ্লেষ যার কাছে ঈশ্বর ওষুধ ফ্রান্স এমন কি নিজের স্ত্রী পর্যন্ত অব্যাহতি পায় না।

অবশ্য দেসেরের এই মনোভাবের মূলে রয়েছে তার বাল্যজীবন। নিউ ইয়র্ক, এমন কি মেলবোর্নেও সে পরিচিত। কিন্তু তার বাবা ছিলেন আঁজের-এর একটি ছোট কাফের মালিক—'লা র‍্যাঁদেভু দেজামি'। পার্লামেন্টের নির্বাচনপ্রার্থীরা এখানে তাদের প্রচার-কার্য চালাত। বুড়োরা আলোচনা করত বিগত শতাব্দীর নানা গণ্ডগোলের ঘটনা; যেমন, বন্যা, চিড়িয়াখানার শেকলছেঁড়া বাঘ, যুদ্ধ। আর গ্যাসের অস্পষ্ট আলোর সুযোগ নিয়ে প্রেমিক প্রেমিকা গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরত পরস্পরকে। দেসেরের বাবা ছেলের এই চোখধাঁধানো ঐশ্বর্য দেখে যেতে পারেননি, গত যুদ্ধে টাইফাস রোগে তিনি মারা যান। কিন্তু কোটিপতি হবার পরেও দেসের শৈশবের অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারেনি। বাগানের পুরনো মালীর সঙ্গে দাবা খেলতে এখনো তার ভাল লাগে। খাবার সময়ে এখনো সে মাংসের ঝোলের শেষটুকু রুটিতে মাখিয়ে তুলে নেয়। সুযোগ পেলেই কোনো কোনো রবিবার সে আসে শহরের বাইরে গ্রামের দিকে। মার্ন ও সিয়েনের ধারে ধারে ছোট কাফেগুলো মনে করিয়ে দেয় র‍্যাঁদেভু দেজামির কথা। কোট খুলে হঠাৎ সে নাচতে শুরু

করে কোনো ঘেমে-ওঠা রঙ-মাখা মেয়ে-দর্জির হাত ধরে।

পারীর কাছে খানিকটা জায়গা-জমি আছে দেসেরের, সেখানে সে থাকে। ভোরবেলা ওঠে সে, রান্নাঘরে গিয়ে মদের সঙ্গে একটা টমাটো আর একটু চিজ্ খায়। খবরের কাগজ পড়ে, তারপর রওনা হয় পারীর দিকে। যাবার পথে স্কুলের ছেলেমেয়ে আর কুকুরের দিকে তাকিয়ে হাসে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মাথার ভেতরে সংখ্যা ছাড়া আর কিছু থাকে না। সকালের ডাকে চিঠি, টেলিগ্রাম, গোপন সংবাদ, অনেক কিছু আসে; তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে দশটা পর্যন্ত। দশটার পরে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করে। পারীর মন্ত্রী, কূটনীতিক, পুঁজিপতি—সকলেরই ঘন ঘন যাতায়াত আছে এখানে। দাঁতের ডাক্তারের রোগী বসবার ঘরের মতো সাজানো এই স্বাচ্ছন্দ্যহীন ঘরটির সঙ্গে সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত।

সেদিন সকালে পিয়ের যখন এল, তখন দুজন ব্যাঙ্ক-মালিক ও রুমানিয়ার দূতাবাসের পরামর্শদাতা অপেক্ষা করছিল দেসেরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। পিয়েরের কেমন মনে হল যে ওরা জানে কেন সে এসেছে। অস্বস্তিটা চাপা দেবার জন্যে সে খবরের কাগজটা খুলে জেনেভা-প্রস্তাবের ওপর একটা প্রবন্ধে ডুবে থাকবার ভান করল।

'মঁশিয় পিয়ের দুবোয়া' ভারিক্কী চাপা গলায় ঘোষণা করে দেসেরের চাকর। প্রথমে পিয়েরের সঙ্গেই দেখা করছে দেসের। পিয়েরকে তার ভালো লাগে, ভালো লাগে পিয়েরের দক্ষিণ-ফ্রান্সীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, গেঁয়ো কথাবার্তা, আর বিশেষ করে তার দারিদ্র্য। পিয়ের কৃতী ইঞ্জিনিয়ার, কোনো রকমে তার দিন চলে। পিয়েরকে দেখলে নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে দেসেরের। তাছাড়া, পিয়েরকে প্রথমে ডেকে পাঠাবার আর একটা উদ্দেশ্য ব্যাঙ্ক-মালিক ও কূটনীতিকদের জানিয়ে দেওয়া যে তারা দেসেরের কাছে অতিথি নয়, অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র।

পিয়েরকে সহজভাবে অভিবাদন জানায় দেসের। কি ভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে না পেয়ে একটু ইতস্তত করে পিয়ের, তারপরে খাপছাড়া এলোমেলো ভাবে আনের চাকরি যাবার ঘটনাটা দেসেরকে জানায়।

'ও আমার বান্ধবী বলে বলছি না। তাই বলে একথাও বলছি না যে ওর চাকরির ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ভীষণ একটা অবিচার যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।'

দেসের হাসেঃ 'বাপু হে, পৃথিবীতে ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই। যাই হোক, তোমার এই তরুণী বান্ধবীটির ব্যবস্থা আমি এক্ষুনি করছি।'

টেলিফোনটা তুলে একটা নম্বর ডায়াল করে সে।

'মঁশিয় তেসার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। আমি দেসের কথা বলছি। তা ভাই আছ কেমন? বৌয়ের খবর কি? ভালো তো? বেশ, বেশ। হ্যাঁ শোন, আমার জন্যে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। আজ পরিষদ সভায় তোমার সঙ্গে তো মন্ত্রীদের দেখা হবে, না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্যাপারটা কিছু নয়, আনে লেজাঁদর বলে একটি শিক্ষিকাকে 'জাতীয়তা-বিরোধী শিক্ষাদানের' জন্যে বরখাস্ত করা হয়েছে। যতো সব বেআক্কেলে কাণ্ড! তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, নির্বাচনের ঠিক মুখে এসব করতে নেই। তাছাড়া ব্যাপারটাও খুব জটিল... এভাবে চালালে কোন্‌দিন শুনব, আমরাও নাকি এ্যানার্কিস্ট বা কমিউনিস্ট-এর বিশ্বাসঘাতক। চমৎকার! আচ্ছা আজ দুপুরে কি আমার সঙ্গে খাবার সময় হবে তোমার? অনেক কথা আলোচনা করবার আছে। খুব ভালো কথা। ঠিক একটার সময় আমি তোমায় আনতে যাব।'

ছয়

তারপর পিয়েরের দিকে ঘুরে সে বলে, 'আর কোনো গোলমাল হবে না। শ্রীমতী লেজাঁদর্ যেমনভাবে খুশি শিক্ষাদান করতে থাকুন, তাঁর শিক্ষায় ছেলেমেয়েরা যা খুশি হয়ে উঠুক—কমিউনিস্ট বা টলস্টয়পন্থী বা বর্বর, বা যা হোক একটা কিছু। হ্যাঁ, তোমরা কি বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ ?'

'না। মানে, তা হ্যাঁ। . আমি জানি না। একথা কেন আপনার মনে হচ্ছে ?'

'আজ সন্ধ্যেবেলা তোমার কোনো কাজ নেই নিশ্চয়ই। আমার এখানে এস। আজকের রাতটা আমি শহরে কাটাব। তুমি এলে খানিকটা ঘুরে বেড়িয়ে গল্পগুজব করা যাবে। আচ্ছা, এবার আমাকে তিনটি হাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর আর কাস্তেলিয়' এসেছে পোলাণ্ডের ঋণ সম্পর্কে কথা বলতে। ওদের বলে দিতে হবে, 'ভুল ঘোড়ার ওপর তোমরা বাজি ধরেছ।' প্রথমত, ফরাসীদের কাছে ডান-জিগের দাম কড়ে আঙুলের সমানও নয়। দ্বিতীয়ত, পোলদের নিশ্বাস নেই, ওরা চুরি করে সাফ করে দিতে পারে। আর ওই কূটনীতিককে দেখেছ তো? উনি হচ্ছেন গিয়ে তোমাদের ওই ক্ষুদে মাসতুতো ভাইদের একজন। ওদিকে হাবসীদের তো ইতালিয়ানরা গিলে বসে আছে। ওদের মুখে হয়ত বলকান্‌কেও ছেড়ে দিতে হবে। কিছুই করার নেই—আমরা শান্তি চাই। আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা আবার দেখা হবে।'

ডেপুটি পল তেসার ভোজনবিলাসী বলে নাম আছে। দেসের তাকে নিয়ে ঢুকল 'আল্'-এর কাছে 'দগার্নো'তে। সাদাসিধে রেস্তোরাঁটার মতো কাটলেট আর মদ পানীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। মাংসের সমজদার বড়ো বড়ো পশু-ব্যবসায়ীরাও এখানে দুপুরে খেতে আসে। দেওয়ালের গায়ে একটা বোর্ড ঝোলানো; সেদিনকার মাংসের বাজার-দর আর বিক্রি-হওয়া মাংসের পরিমাণ লেখা তার ওপর। এখানে যারা নিত্য যাতায়াত করে তাদের মধ্যে আছে খুঁতখুঁতে স্বভাবের খাইয়ে লোক, ভোজনবিলাসী ক্লাবের সভ্য আর মাংস-ব্যবসায়ীদের কর্কশ ব্যবহার ও চড়া দামে বিরক্ত ফোতো বাবু। খাবারের তালিকাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে, শামুক, ঈলমাছের সুপ, 'কক ও ভ্যাঁ' আর অবশ্যই কাটলেট আনবার হুকুম দিল দেসের। ঠোঁট চেটে তেসা হেড-ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কাটলেটের সঙ্গে সেই ব্রেন-সসও পাওয়া যাবে তো ?'

'নিশ্চয়ই, মঁশিয়ে তেসা।'

পেটুকের মত খাওয়া সত্ত্বেও পল তেসা রোগা। ফ্যাকাশে লম্বাটে মুখ, খাড়া চিবুক, আর ছুঁচলো নাক। দেখে মনে হয়, অসুস্থ বা সাধু জাতীয় লোক। কিন্তু আসলে সে ভীষণ প্রাণবন্ত, এমন কি বলা চলে উদ্দাম। চেম্বারের খাবার-ঘরে যদি ফিস-ফিস কথাবার্তা আর ফেটে-পড়া হাসি শোনা যায় তাহলে বুঝতে হবে কোনো ফাজিল সহকর্মী আটান্ন বছরের বুড়ো পল তেসার প্রেমের কাহিনী নিয়ে কেচ্ছা জুড়েছে। অথচ পারিবারিক জীবনে তেসা ভারি চমৎকার মানুষ। নিজের মোটাসোটা বৌ আর দুটি ছেলেমেয়ের ওপরে তার যথেষ্ট টান। ছেলে লুসিয়ঁর জন্যে তেসার দুর্ভোগের সীমা নেই। মেয়ে দেনিস—লাজুক ও সুন্দরী, এখনো পড়ে। মেয়েটির তো রীতিমতো ভক্ত সে। অপেরা-গায়িকাদের গুপ্তকক্ষ থেকে হঠাৎ উঠে এসে যতোখানি স্বচ্ছন্দ ভাবে তেসা নিজের

শোবার ঘরে ঢোকে তেমন সচরাচর দেখা যায় না। কতকগুলি পেতলের মদন-মূর্তি নিয়ে সাজানো দুখানা খাট যেন ক্রুশের নিচে বেদীর মতো।

চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকলেও তেসার গলার স্বরে একটা সুরেলা আকর্ষণ আছে। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের মধ্যে সে একজন। রাজনীতিতে সে এসেছে অপেক্ষাকৃত দেরিতে; প্রথমে বিখ্যাত আইনজীবী হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। অর্থলোভী ভোঁতা বুদ্ধি-ওলা খুনীর পক্ষ সমর্থন করতে উঠে আবেগ-কম্পিত স্বরে সে বলতে পারে, 'ভদ্রমহোদয়-গণ, দেখুন, এই নিপীড়িত স্বর্ণবিল্যাসীটির দিকে চেয়ে দেখুন!' জুরীদের চোখে জল আসে এবং আসামীর পক্ষে নির্দোষ রায় দেয়।

র‍্যাডিকালদের পক্ষ থেকে পশ্চিমের একটি বিভাগে তেসা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। জয়লাভ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দুজন; একজন কমিউনিস্ট; রেলওয়ে ইয়ার্ডের কামারশালার মিস্ত্রী, একটু তোতলা, বক্তৃতায় বড়ো বড়ো প্রতিশ্রুতি না দেবার দিকে ঝোঁক। আর একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি; নাবালকদের বেত্রদণ্ড দেবার দাবি নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। চেম্বারের ভেতর তেসা বিশেষ কথাবার্তা বলে না। দু-বার সে মন্ত্রী হতে রাজি হয়নি। র‍্যাডিকাল দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা নেই, সুতরাং মন্ত্রী না হয়ে উপযুক্ত সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে তার মনে হয়েছে। লবীমহলে এমন কথাও উঠেছে যে তেসা র‍্যাডিকালদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোনো দক্ষিণপন্থী গ্রুপে যোগ দেবে।

চেম্বারের ডেপুটিপদ তেসার কাছে নতুন নতুন আয়ের পথ খুলে দিয়েছে। কণ্ট্রাক্টর ও অনুগ্রহপ্রার্থীদের কাছ থেকে সে টাকা নেয়, মোটা দক্ষিণা পেলে লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টর হতেও আপত্তি নেই। ভেনিজুয়েলার খনি, মার্তিনিকের বাগিচা—এ-ধরণের বহু সন্দেহজনক ব্যবসাতে সে তার নাম ধার দিয়েছে। টাকার ওপরে তেসার লোভ নেই কিন্তু আড়ম্বর করে থাকতে ভালোবাসে। পরিবারের বা নিজের রক্ষিতার কোন দাবি সে অপূর্ণ রাখে না এবং সহজেই ঋণে জড়িয়ে পড়ে।

'সমগ্র পারী' তেসার জানা, হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তার 'তুমি' সম্পর্ক। বিদেশী-দূত আর এটর্নিদের প্রায়ই সে ভোজে ডাকে, সাংবাদিকদের ঘুষ দেয়। নির্বাচক-মণ্ডলীর নানা অনুরোধ স্বেচ্ছায় পালন করে—হয়তো স্থানীয় শুল্ক পর্যবেক্ষকের জন্যে মন্ত্রী-দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো সম্মানপদকের ব্যবস্থা করে, বীর সৈনিকের বিধবা স্ত্রীর জন্যে তামাকের দোকানের লাইসেন্স করে দেয়, ধড়িবাজ-ধাপ্পাবাজের বিরুদ্ধে মামলা চেষ্টা করে তুলিয়ে নেয়।

একটা শামুক গিলে এক ঢোক মদ খেয়ে তেসা বলল, 'যে মাস্টারনীর কথা বলেছিলে, সে কি কমিউনিস্ট?'

'জানি না। কিন্তু তৃতীয় রিপাব্লিকের অস্তিত্বের পক্ষে খুব বিপজ্জনক বলেও তাকে মনে হয় না।'

'তুমি একটি সিনিক। মদটা কিন্তু চমৎকার! তাহলে তোমার মতে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। কথাটা ভুল। আমার মনে হয় আগামী নির্বাচনে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হবে! র‍্যাডিকালরা তো আত্মহত্যা করতে বসেছে। আর পপুলার ফ্রন্ট যদি জেতে, তবে তো তাদের গিলে ফেলবে ঠিক এইভাবে, বলেই সে একটা শামুক গিলে ফেলল, 'এমন কি পার্লামেণ্টারী ফ্রান্সেও এই চালের কাছে সবাই হার মেনেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এর বিরুদ্ধে, আগামী নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকাল হিসেবে আমি দাঁড়াচ্ছি কিন্তু

আমার ভয় হচ্ছে...' শামুকের ওপর লেবুর রস টিপে নিয়ে সকাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'আমার খুবই ভয় হচ্ছে, এবার আমাকে কেউ ভোট দেবে না।'

'তুমি কি নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছ?' দেসের জিজ্ঞেস করে।

'আগামী শনিবার প্রথম সভা ডাকা হয়েছে। আজই আমি রওনা হব।'

'তাহলে আর কোনো ভয় নেই, সব ঠিক আছে।'

'তার মানে? কি ঠিক আছে?'

'মানে খুব সহজ। পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করে তোমার বক্তৃতা দিতে হবে।'

হাতের একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে ন্যাপকিনটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বক্তৃতা দেবার ঢঙে তেসা চিৎকার করে বলল, 'অসম্ভব। এর চেয়ে ধ্বংস বা সর্বনাশ বা অন্য যা কিছু হোক, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই নয়! পপুলার ফ্রন্টের এই লোকগুলো ফ্রান্সের চিরকেলে শত্রু। ওই ব্লুম, ওর নামটা পর্যন্ত ফরাসী নয়, কী ধূর্ত আর খুনে লোক; তারপর ওই দরময়, কী ভীষণ কুচক্রী; মক্—সুযোগ পেলেই ও ফ্রান্সের যানবাহন ব্যবস্থা ধ্বংস করবে; মনে—কৃষির এত বড়ো শত্রু আর নেই; আর আছে ভীইয়ার—হিটলারকে দেখেও ওর শিক্ষা হয়নি, বলে কিনা নিরস্ত্রীকরণের নীতি মানতে হবে; এই ভীইয়ারই...'

'ভীইয়ারের কথা বাদ দাও। বোকার মত ও বড়ো বেশি কথা বলে। ওকে মন্ত্রী করে দাও—দেখবে ঢিট্ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু কমিউনিস্টরা?'

দেসের বলল, 'ফ্রান্স ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের দেশ—কোম্পানীর কাগজ-ভোগী, দোকানদার আর চাষী। তবুও রাম-শ্যাম দু-একজন কমিউনিস্টদের ভোট দেয় কেন? কারণ, রামকে হয়তো বেশি ট্যাক্স্ দিতে হয়েছে, শ্যামের ছেলে হয়তো স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পায়নি—কমিউনিস্টদের পক্ষে ভোট দিয়ে বিক্ষোভ জানায়, আর কিছু নয়।'

তেসা চুপ করে রইল, ঈলমাছের সুপ নিয়েই সে ব্যস্ত।

দেসের বলে চলল, 'তুমি কি মনে করো কমিউনিস্টরা কখনো তোমার ওপরে নির্ভর করবে! কক্ষনো না। কিন্তু তবুও নির্বাচনে তুমি তাদের সমর্থন পাবে— এ হচ্ছে অবস্থা বুঝে চাল দেবার চালাকি। আমরাই বা বোকামো করতে যাব কেন? পপুলার ফ্রন্টকে ওরা খাড়া করেছে এই মতলবে যে দক্ষিণপন্থীদের প্রথমে ওরা শেষ করবে তারপরে গিলতে আসবে আমাদের। কিন্তু ওরা হেরে যাবে। আমাদের প্যাঁচে। নির্বাচনে আমরা দক্ষিণপন্থীদের ছাতু করে দেব। আর সেই জোরে পাল্লা দেব কমিউনিস্টদের সঙ্গে।'

'এই ঈলমাছের সুপটা অতি চমৎকার! কিন্তু জুল আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, দক্ষিণপন্থীদের কেন ছাতু করতে হবে?'

'কারণ, আমরা যদি ঘা নাও দিই, তাহলেও ওরা টিঁকে থাকতে পারবে না। রাজনীতির গতি পেণ্ডুলামের মতো—একবার বাঁ দিকে দুলছে, তারপর ডানদিকে, আবার বাঁ দিকে। আমাদের শুধু এটুকু দেখতে হবে যে পেণ্ডুলাম যেন একই দিকে বড়ো বেশি চলে না যায়। ১৯২৪ সালে বামপন্থীরা জয়লাভ করেছিল। তার ফলে 'কার্তেল' ব্যবস্থা চালু হল, স্মৃতি-মন্দিরে পাঠানো হল জোরেের মৃতদেহ এবং লালঝাণ্ডা দেখা দিল দিকে দিকে। দু বছর পরে র‍্যাডিকালরা ঝুঁকল দক্ষিণপন্থীদের দিকে, তখন ক্ষমতা এল পোয়াঁকারের হাতে। ১৯৩২ সালে নির্বাচন মাঠে মারা গেল, কোনো মন্ত্রীসভার পক্ষেই টিঁকে থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দেশে দক্ষিণপন্থী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে রু স্যাঁ জেরম্যাঁতে রোজ মিছিল বার হত। 'ডেপুটিরা নিপাত যাক!' এই ছিল

তখনকার স্লোগান। দক্ষিণপন্থীদের টোপে কে ধরা দিয়েছিল? র‍্যাডিকালরা? স্তাভিস্‌কি সংক্রান্ত ব্যাপারে ওরা কি তোমাকে জড়াবার চেষ্টা করেনি? তারপর এল সেই ৬ই ফেব্রুয়ারী বইল রক্ত। ফ্রান্সের বাইরে সকলেই ভেবেছিল যে এখানে এবার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু রাজনীতির পেন্ডুলাম আচমকা ঘুরে গেল। ৯ই ফেব্রুয়ারি বেরিয়ে এল কমিউনিস্টরা। মাঝামাঝি একটা পথ পাওয়া গেল যখন বুড়ো দুমের্গ হঠাৎ মাথা তুলে শক্ত হাতে চেপে ধরে পেন্ডুলামটা। কিন্তু পেন্ডুলাম থেমে যায়নি, উঁচুতে উঠে এসেছে বলে আস্তে আস্তে চলছে, এখনো শেষ থামায় পৌঁছয়নি। পপুলার ফ্রন্টকে জিততেই হবে। এবং জিতবেও। কিন্তু আমাদের সাহায্য নিয়ে যদি পপুলার ফ্রন্ট জেতে তবে আর এক বছরের মধ্যেই র‍্যাডিকালরা দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝুঁকবে। তাহলে তিন-চার বছর কোনো গন্ডগোল হবে না। কিন্তু এস এবার একটু বোর্দো মদ খাওয়াই তোমাকে।'

তেসা বলল, 'তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে, আমাকে জিততে হলে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে হবে।'

'একটা চলতি কথা আছে—ঢালা মদ ফেলে রাখা চলে না। সেজন্যে মাঝে মাঝে মদের সঙ্গে জল মেশাতে হয়। অবশ্য এই "মুতোঁ-রথ্‌স্‌চাইল্ড"-এর সঙ্গে নয়...'

'কক্‌ ও ভ্যাঁ' দিয়ে গিল। রাজনীতির সমস্ত দুঃখ ভুলে গেল তেসা। কিছুক্ষণ সে সমস্ত মনোযোগ দিল খাবারের ওপর।

দেসের বলল, 'বলতে পার, এখানকার মতো এত ভাল 'কক্‌ ও ভ্যাঁ' আর কোথাও পাওয়া যায় না কেন? মোরগগুলো আসলে রাঁধুনীর দুর্ভোগ। কিন্তু বুড়ো মোরগের শক্ত মাংসকেও মদে সেদ্ধ করে কি ভাবে তা চমৎকার খাদ্য করে তোলা যায় তা আমরা ফরাসীরা বেশ ভালোভাবে শিখেছি। মোরগের চেয়ে মুরগীর মাংস অনেক বেশি ভালো। 'দোগার্নোর' 'কক্‌ ও ভ্যাঁ' এত ভালো হবার আসল কারণ এই যে এখানকার 'কক্‌ ও ভ্যাঁ' আসলে মোরগের মাংস নয়, মুরগির। এখানে মুরগির মাংসকে মোরগ বলে চালাবার কারণ কি? কারণ, বিনয়। অহংকারও হতে পারে। যাই হোক, এটা হল রাঁধুনীর মারপ্যাঁচ।' দেসের হাসল, তারপর আবার বলল, 'এই দৃষ্টান্তটি যদি মেনে চলতে পার তাহলে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। আসলে তুমি জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকাল, কিন্তু তোমাকে জাতীয় ফ্রন্টের সমর্থক হিসেবে চালানো হবে। এর নাম বিনয়। বা অহংকার...'

'এসব তো শুধু জল্পনা-কল্পনা। শেষ পর্যন্ত আমি ভোট পাব না। এটাই আসল কথা। ভালোভাবে নির্বাচনী প্রচার চালাবার মতো সময় আমার নেই, সামর্থ্যও নেই।'

'সময় তুমি ঠিকই পাবে। ফ্রান্সের সেবা করবার ইচ্ছে যখন তোমার আছে তখন সময় তোমাকে করে নিতেই হবে। আর সামর্থ্য সম্পর্কে ভেব না, তোমার নির্বাচনী প্রচারের সমস্ত খরচ আমি দেব।'

দেসেরের কৌশল তেসার ভাল লাগেনি, কিন্তু এই প্রস্তাবে সে খুশি হল, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। পর মুহূর্তেই আবার কালো হয়ে গেল: যাই হোক না কেন নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে হবে তো! টেবিলের ওপর কাটলেট আর ব্রেন-সসের আবির্ভাব তাকে খুশি করে তুলল আবার। তারপর বারগান্ডির আগমনে গোলাপী আভা ফুটে উঠল তেসার ফ্যাকাশে গালে। ইচ্ছে হল, কোনো একটা হাল্‌কা বিষয়ে কথা বলে—তার ছোট অভিনেত্রী পোলেতের কথা বা এই ধরনের অন্য কোনো কিছু। কিন্তু দেসেরের কাছে নিজের উল্লাস গোপন রাখবার জন্যে সে পারিবারিক অশান্তির কথা বলতে শুরু করে।

'আমার ছেলে লুসিয়' খুব খারাপ একটা বক্তৃতা দিয়েছে,' কান্নার সুরে সে বলে, সে সত্যিই দুঃখ পেয়েছে না অভিনয় করছে বোঝা গেল না, 'কাগজে আমার নামে যা-তা লেখা হচ্ছে।' ওর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলেছিলাম। ও কি বলে জান? বলে, এটা হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম। কী ভয়ানক কথা, আমার ছেলে শেষকালে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল!'

'কোনো চিন্তা কোরো না। লুসিয়' জমি তৈরি করছে। শ্রেণী-সংগ্রামই যদি হবে তো ও তোমার পয়সায় থাকবে কেন? তুমি দেখে নিও ও খুব তাড়াতাড়ি ডেপুটি হবে, এমন কি জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকালও হতে পারে। কিছুক্ষণ আগে 'মাক্সিম'-এ ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ভারী সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল ওর সঙ্গে।'

'মাক্সিম্'-এ লুসিয়? ওই হতচ্ছাড়ার আর কিছু হবে না। তিরিশ বছরের ধাড়ী, এখনো এক পয়সা রোজগার করতে পারে না। যত আজে-বাজে লেখা নিয়েই ব্যস্ত। ওর মত ছেলে এ্যানার্কিস্ট হতে পারে, গুণ্ডা হওয়াও আশ্চর্য নয়। নীতিজ্ঞান বলে কিছু নেই। তবু দেনিস আছে বলে সান্ত্বনা পাই। রীতিমতো কাজের মেয়ে। নীরস একটা বিষয় নিয়ে ও পড়ছে, বিষয়টা বোধহয় রোম-স্থাপত্য। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে ওর গভীর নিষ্ঠা। এই চিজ্‌টা তুমি খেয়ে দেখেছ? চমৎকার গন্ধ। আঃ, আর দশটা বছর যদি কোনো রকমে শান্তিতে কাটানো যেত। আমার ভয় হয় সব কিছু ভেঙে পড়বে! পপুলার ফ্রন্ট যদি জেতে, যুদ্ধ অনিবার্য।'

'বোধ হয় না। মিত্র ছাড়া যুদ্ধ সম্ভব নয়। জার্মানিকে আমরা ভয় দেখাচ্ছি, কিন্তু ইতালীর মন জুগিয়ে চলছি। বৃটিশরা মুসোলিনীকে তোষণ করছে কিন্তু হিটলারকে কোনো কথা বলছে না। এক কথায় তোষণ-নীতি মেনে চলতে হবে আমাদের।'

'অসম্ভব, আলসাস ছেড়ে দিতে ফ্রান্সের একটি লোকও রাজি হবে না।'

'আলসাস কেন? আমাদের স্কন্দে বন্ধুরা রয়েছে। ওদের খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি কি জন্যে? যদি কিছু হয়, চেক্‌দের প্রথমে উৎসর্গ করব। তারপর পোলাণ্ড। পোলাণ্ডকেও ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করা চলতে পারে।'

'কিন্তু সে আর কতদিন? পাঁচ বছর, বড়ো জোর দশ বছর।'

'ভবিষ্যতের কথা ভেবে লাভ কি? এখন ফ্রান্সকে বাঁচাতে হবে। ফ্রান্সের শান্তি আর সম্পদ বাঁচাতে হবে। সেটাই বড়ো কথা।'

'তোমার কাছে বড়ো কথা হতে পারে কারণ তোমার ছেলেমেয়ে নেই। দেনিস আর লুসিয়'র কি হবে ভাবতেও ভয় হয় আমার।' কথাগুলো তেসা বলল ভাল শোনাবে বলে।

কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে মনে মনে হেসে উঠেছে সে। তার নির্বাচনী প্রচারের সমস্ত খরচ দেসের দেবে, তার মানে সে আবার ডেপুটি হতে পারবে। আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার যে সমস্ত চিন্তার কথা সে বলেছে, সেগুলো আর কিছু নয়, চমৎকার একটা ভোজের সঙ্গে একটু বিষণ্ণ আবহাওয়া তৈরি করে নেওয়া মাত্র।

দেসের তার দিকে তাকায়। তেসার চোখ দুটো ঘোলাটে, উঁচু নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখে আত্ম-সন্তুষ্টির হাসি। তেসাকে একটু খ্যাপাবার লোভ সামলাতে পারে না দেসের, বলল, 'তোমার ছেলেমেয়ের জন্যে ভবিষ্যতে কি আছে জানতে চাও? হয়তো স্বর্গ তৈরি হবে—'পীকক্ ও ভ্যাঁ' মদে সেদ্ধ ময়ূর, গুয়াদেলুপ-এ বিমান-ভ্রমণ। কিংবা হয়তো সেই চিরন্তন যুদ্ধ, লেবর-ক্যাম্প, বন্দীশালা, মৃত্যু। খুব সম্ভব শেষেরটাই হবে। কিন্তু হতাশ হলে চলবে না, এখন তুমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। সভায় দাঁড়িয়ে যখন তুমি

বজ্র-মুষ্টি সেলাম ঠুকবে সেটা একটা চমৎকার দৃশ্য হবে কিন্তু।' দেসের জোরে হেসে ওঠে, তারপর তার এই স্থূল বিদ্রূপের আঘাত কাটিয়ে দেবার জন্যে তেসার পিঠ চাপড়ে বলে, 'রাজনীতির নোংরামি যথেষ্ট হয়েছে। পলেৎকে কাল দেখলাম। তুমি ভাগ্যবান। সত্যিই ও পারীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী।'

সাত

বিখ্যাত সংবাদপত্র 'লা ভোয়া নুভেল্'-এর সম্পাদক-প্রকাশক জলিওকে খাওয়ার পরে ডেকে পাঠাল দেসের। হাঁসফাঁস করতে করতে ছুটে এল মোটা জলিও; সে বুঝতে পেরেছিল কোনো বিশেষ জরুরি কাজে তার ডাক পড়েছে।

অনেক ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে জলিওর কর্মজীবন। অনেকবার তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে—কখনো জুয়াচুরির অপরাধে, কখনো বা মানহানির দায়ে। কিন্তু খালাস পেতে কখনো তাকে বেগ পেতে হয়নি। বিভিন্ন রাজনীতিকদের অতীত জীবন সম্পর্কে বড় বেশি জানে সে।

দক্ষিণদেশে জলিওর বাড়ি। তার বাবা মার্সাই-এ মাছের দালালি করত এবং চেষ্টা করে বড়ো বড়ো পশু ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল। এই ফাটকাবাজির আবহাওয়ায় জলিও মানুষ। কোনো নীতির ধার ধারত না, কিন্তু বড়ো বেশি কুসংস্কার ছিল তার—সরকারী কৌঁসিলীর চেয়েও বেশি ভয় তার কালো বেড়ালকে। যুবা বয়সে পারীতে আসার পর কিছুদিন একটা বীমা-কোম্পানীর দালালী করেছিল—বীমা কোম্পানীটা টিঁকে ছিল এই সহজ কারণের জন্যে যে কোন পলিসির ওপর টাকা দেওয়া হত না। তার পর সে কিছুদিন সাংবাদিকতা করল সেনেটর আর পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বটতলা জাতীয় কেচ্ছা লিখে। সাংবাদিক হিসেবে তার আয় কিন্তু নির্ভর করত সে কি লিখল তার ওপর নয়, লেখার ভেতর সে কি বাদ দিল তার ওপর—তার মুখ বন্ধ করবার জন্যে তাকে টাকা দেওয়া হত। তারপর সে নিজেই একটা কাগজ বার করল—শেয়ার বাজারের ওপর একটা কাগজ, নাম, 'লে ফিনাস'। একদিন এই কাগজটায় মস্ত বড়ো একটা বিজ্ঞাপন বার হল—'ক্রেদি দাল্জের' ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখুন। পরদিন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর জলিওকে টেলিফোনে বলল, 'তোমার কাগজে ঐসব ছাইভস্ম বিজ্ঞাপন বার করেছ কেন? আমরা তো ওই বিজ্ঞাপন দিইনি।' জলিও বলল, 'আমি তা জানি, কিন্তু আমার পাঠকদের ভালো ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' ঘণ্টাখানেক পরে বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর উঠে পড়ে লাগল জলিও। কিছুদিনের মধ্যেই বার হল 'ভোয়া নুভেল্'। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মতো অবস্থা—জলিও নিজেই সবকটা প্রবন্ধ লেখে

আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর বরাত খুলতে শুরু করে। নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্টার আর বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনে ভরে যায় কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচন্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখির মতো দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোনো ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর শমন। কোনো গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়তো, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে বাতিল চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বার বার বাসন বন্ধক দেবে। আর অনেক রাত পর্যন্ত একা একা গিটারে 'কারমেন' থেকে টুং টাং সুর তুলবে।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই কিছুটা যেন জমকালো। কমলা রঙের সিল্‌কের সার্ট, গমফুলের মতো নীল্‌চে টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাইপিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমতো চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত মত বক্‌ বক্‌ করা স্বভাব। আর বক্তব্য যতো বেশী জটিল কথার ভঙ্গিতে ততো বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। বলে, 'এই পাঁচভূতের পাগলামির ভেতর আমরাই শুধু আইন ও শৃংখলার আদর্শ তুলে ধরে আছি। মার্ক্‌সবাদের ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর লেব্যোফ্‌ যে প্রবন্ধ লিখেছে তা পড়েছেন? নির্বাচনের জন্যে আমি কতকগুলো চাঞ্চল্যকর লেখার ব্যবস্থা করেছি। সোবিয়েত রাশিয়ার ভেঙে-পড়া অবস্থার ওপর পর পর কতকগুলো প্রবন্ধ ফোঁতেনয়কে দিয়ে লেখানো হয়েছে। ফোঁতেনয় যেন মস্কো থেকে লিখছে এমনভাবে প্রবন্ধগুলো দেওয়া হবে। এজন্যে ফোঁতেনয়কে ওয়ার্‌স' যাবার ভাড়া দিতে হয়েছে আমাকে। তারপর ভীইয়ার সম্পর্কে একটা দলিল আমার হাতে এসেছে। যৌবনে ভীইয়ার এক ডাক-পিয়নের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে একজন বাড়িওলা এই মর্মে সাক্ষী দিতে রাজি। এই খবরটার জন্যে দশ হাজার খসবে কিন্তু। এই খবরে একেবারে হৈচৈ পড়ে যাবে! দুশেস্‌ন্‌-এর কলম সত্যিই দুঃসাহসী...'

বাধা দিয়ে দেসের বলল, 'তা হোক, কিন্তু ওকে এবার থেকে সব কিছু একেবারে ঘুরিয়ে লিখতে হবে। এইসব নতুন কলমে উল্‌টো দিকেও চমৎকার লেখা যায়। লেখাটা যা একটু মোটা হয় কিন্তু কলম আটকায় না। তাহলে এবার আসল কথায় আসা যাক 'লা ভোয়া নুভেলকে' এবার থেকে পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে লিখতে হবে।'

হাত দুটো নাটকীয় ভঙ্গিতে টান করে দিয়ে জলিও উঠে দাঁড়াল।

'অসম্ভব!' চাপা উত্তেজনায় তার গলা প্রায় বুজে গেছে, 'রাজনীতি কি, আমি জানি। আগে বার কয়েক আমাকে কিছু কিছু প্যাঁচ করতে হয়েছে, কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। মঁশিয় দেসের, আপনি শুনে রাখুন, কক্ষনো নয়!'

'চুপ করো। এটা সভামঞ্চ নয়! কাজের কথায় এস। ও সব বড়ো বড়ো ফাঁকা

কথা না বলে যদি থাকতে না পার, তবে শোন! পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভে ফ্রান্সের মঙ্গল! একটা বিপ্লবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যদি ঠিক সময়ে মুখ খুলে না দাও তবে বয়লার ফেটে যাবার সম্ভাবনা। ভাঁইয়ার পিয়নের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে কিনা সে সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ-কথা বিশ্বাস করি না। এমন কি ও কোনোদিন নিজের বৌয়ের সঙ্গে থেকেছে কিনা সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ও তো একটা হিজড়ে। কিন্তু ভাঁইয়ার যদি বিরুদ্ধে যায় তাহলে ভয়ের কথা। তখন ও সিংহের মত গর্জন করে। কিন্তু ওকে মন্ত্রীর গদীতে বসিয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার মত ডাক ছাড়বে।'

'কিন্তু কী ভয়ংকর কথা! অর্থাৎ কাল যারা ফ্রান্সের শত্রু ছিল, তাদের হাতেই ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে হবে!'

দেসের বলল, 'আমার কথাটা শোন আগে। তুমি একটা জরুরি প্রশ্ন তুলেছ। সত্যি কথা বলতে কি, এসম্পর্কে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। একটা সিগার ধরাও। 'লা ভোয়া নুভেল' যে পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করবে, সেবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি আছে। তাছাড়া তোমার কাগজকে আমি সাহায্য করতে কসুর করব না।'

'কিন্তু......'

'এবার আসল কথাটায় আসা যাক্। এই লোকগুলো দেশপ্রেমের জোয়ারে হাবুডুবু খাচ্ছে। ফ্যাসিজমকে ওরা ঘৃণা করে। খুবই ভালো কথা কিন্তু ওটা রীতিমতো বিপজ্জনক পথ। তোমার কাগজ হবে প্যাসিফিস্ট। জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ব, ইউরোপের অর্থনৈতিক একতা, শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা, মায়ের অশ্রু, এ-ধরণের যা খুশি লিখতে পার। আমাদের শুধু শান্তি চাই! শান্তির জন্য যে কোন দাম দিতে হবে!'

'কিন্তু ফ্রান্সের নিজস্ব নীতি কি হবে?......'

'কারথেজের ধ্বংসস্তূপের চেয়ে ছোট্ট সুখী আন্দোরা বা শান্তিপূর্ণ মনাকো অনেক ভালো। ফ্রান্সের জয় হবে, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি না। আমরা বড়ো ক্লান্ত। আমাদের এখন প্রেমে ক্লান্তি, ঈর্ষায় ক্লান্তি, ঝগড়ায় ক্লান্তি। প্রকৃতির নিয়মই এই। শুধু তোমাদের ওই তেস্যার মতো লোকেরাই ষাট বছর বয়সেও বসন্তের হুলো-বেড়ালের মত চালিয়ে যেতে পারে। তুমি ফরাসী জাতটাকে সাহসী বলবে? নিশ্চয়ই! একদিন তাদের 'মারসাইয়েস' গান সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল—স্কুলে একথা এখনো পড়ানো হয় ছেলেমেয়েদের। কিন্তু এখন আমরা থলথলে হয়ে গেছি। ভালো থেকে থেকে বড়ো বেশি আয়েসী হয়ে উঠেছি, ঝুঁকি নিতে ভয় পাই। মর্যাদা বা ন্যায়ের জন্যে কে লড়বে? লাভাল? মোরিস শেভালিএ? তুমি? এক কথায়—রেমার্ক যদি আর একটা উপন্যাস লেখে তবে যা হোক করে তার সর্বস্বত্ব কিনে নিও। টাকার জন্যে ভাবতে হবে না।'

জলিও একটু ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান।। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভালো মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরি করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র তৈরির শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্র তৈরি কমালে যে কোনো সময়ে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ,

এই গরম আবহাওয়াকে একটু ঠাণ্ডা করা। আমার কথাটা তোমাকে আবার বলছি—ওরা দেশপ্রেমে টইটম্বুর। কামান-ব্যবসায়ী আর দু'শো পরিবার যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

চেকটা হাতে নিয়ে বেশ সহজভাবে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—'দু-শো পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'এই তো, বোকার মতো অবান্তর কথা বললে। তার চেয়ে লেখ দু-শো পরিবারের পাণ্ডাদের মতো দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।' দেসের হাসল, 'আর কথাটা বোধ হয় খানিকটা সত্যি।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন-শো, না পাঁচ-শো করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। সমস্ত দিন বসে বসে নানা ধরনের হুকুম দিয়ে গেল: 'নামকরা বামপন্থী লেখকদের লেখা আন! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের জীবনের ওপর করুণ কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দ্যের বিভীষিকা! ফোঁতেনয়কে বলে দাও ব্যস্ত না হলেও চলবে... না, শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎ-এ রাতের খাওয়া সারল জলিও। বাড়ি ফেরে অনেক রাত করে। বৌকে ঘুম থেকে টেনে তুলে নৈশ ক্লাব থেকে আনা গোলাপ ফুল উপহার দেয়। শুকিয়ে যাওয়া ফুলগুলো থেকে কেমন বিশ্রী একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। বৌয়ের কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'চান লক্ষ! উঃ, ভাগ্যের কি খেলা!' তারপর জুতো খুলে বাড়িতে পরবার স্লিপার পায়ে দেয়। খনিজ জল খায় এক গ্লাশ। আর হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—নিজেই বুঝতে পারে না কেন এই বিষণ্ণতা। মনে মনে বলে, 'ফ্রান্সের আর কোনো আশা নেই! ফ্রান্স শেষ হয়ে গেল! আজ যে দুজন পাদরির সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেল তাতেই তো বোঝা যাচ্ছে এটা সর্বনাশের নির্ভুল চিহ্ন।'

আট

সেদিন সন্ধ্যায় সর্বশক্তিমান দেসের আর নির্বিরোধ ইঞ্জিনিয়ার পল দ্যুবোয়া সিয়েন নদীর ধারে চুপচাপ হেঁটে বেড়াল। পারীর সেই আশ্চর্য ধূসর রঙ নিস্তব্ধ সিয়েনের ওপর দু-একটা ভাসমান বজরার ছড়ানো-ছিটানো আলো, 'নৎর দাম্' গির্জার পাথর-বন যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সেখানে কথা বলতে ভালো লাগে না। 'আল্ ও-ভ্যাঁ'-র পাশ দিয়ে যাবার সময় মদের টক গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। 'জারদ্যাঁ দে প্লাঁ'-এর ঘেরা অন্ধকার জায়গাটা থেকে জান্তব চিৎকার শোনা যাচ্ছে—বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠেছে জন্তুগুলো। 'গার-দ্য-লিও'-র দিকে ব্রিজের ওপর দিয়ে জোরালো হেডলাইট

জবালিয়ে গাড়িগুলো ছুটে চলেছে। তারপর আবার ঘন হয়ে ওঠে সেই শান্ত নীলচে পাঁশুটে আবছায়া।

নদী ও বাড়িগুলোর মিল, সরু সরু পুরনো রাস্তাগুলোর রকমারি নাম—'কাঠের তলোয়ারের রাস্তা' 'সাধু বাবাজীর রাস্তা' 'দুই ঢালীর রাস্তা'—আর জীবন-চঞ্চল নগরীর রহস্য দুজনের মনে দু-রকম চিন্তা জাগিয়েছে। দেসের সারাটা দিন কাটিয়েছে তেসা আর জলিওর সংগে, জটিল অঙ্ক আর মিথ্যাচারের মধ্যে। এখন সে পথ চলছে মাথা নিচু করে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে। বিশ্রাম-শান্তনগরী তাকে মনেকরিয়ে দিচ্ছে যাত্রার আগে সেই মুহূর্তটির কথা যখন বাক্স-পেঁটরা বাঁধা হয়ে গেছে, বন্ধুবান্ধবরা চুপ করে বসে আছে চারপাশে—বিচ্ছেদের ব্যথা কাটিয়ে তোলবার জন্যে একটি কথাও খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। পিয়েরের কিন্তু ভালো লাগছে। আনের ঢাকারাখা, জানা-না-জানা সৌন্দর্যের মতো সে উপভোগ করছে এই সন্ধ্যা আর 'নৎর-দামের' পাথর-বন। ওভারকোটের বোতাম খুলে দিয়ে সর্বাঙ্গে তাজা বাতাসের ছোঁয়া লাগাচ্ছে সে, তার জীবনে এই প্রথম বসন্ত এসেছে যেন। এত তীব্র আর এত সহজ আনন্দ কোনো দিন সে অনুভব করেনি। মনে, হচ্ছে, যে-কোনো একটা গলি দিয়ে সে এখন ঢুকে পড়তে পারে, চিড়িয়াখানার জন্তু বা রাস্তার আলোর সামনে দাঁড়িয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিতে পারে আনের মাধুর্য মিষ্টি-স্বভাব আর বুদ্ধির কথা বলতে বলতে।

কিন্তু পিয়েরের এই টালমাটাল অবস্থা শুধু তার প্রেমের জন্যেই নয়। আরো অনেকের মতো সে বিশ্বাস করে যে আগামী বসন্তে দেশে নবজীবন আসবে। পিয়েরের বাবা ছিলেন, সমাজতন্ত্রী। মার কাছে সে গল্প শুনেছে, একবার ভাঁইয়ার পেরাপিএঁতে বক্তৃতা দিতে এসে তাদের বাড়িতে খেয়েছিল। পিয়েরের মনে আছে একবার তার বাবা রক্তমাখা শরীরে বাড়ি এসেছিলেন; ফেরের বলে একজন স্পেনদেশীয় লোকের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল বার হয়েছিল, সেই মিছিলের ওপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। পিয়েরের বয়স তখন সাত বছর। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে বাবার রক্তমাখা মুখ দেখে সে কেঁদে ফেলে। তার বাবা যুদ্ধে মারা যান। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্ত্রীর কাছে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন 'এসবের জন্যে গুণে গুণে শোধ দিতে হবে ওদের—বিপ্লব শুধু হল বলে!'

'বিপ্লব'—এই কথাটি কুয়াশার দিনের সূর্যের মতো উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল পিয়ের ও তার সংগীসাথীদের। গত যুদ্ধ যখন শুরু হল তখনো তারা শিশু, কিন্তু তবুও ভিড়ের সংগে যোগ দিয়ে 'ম্যাগগী' দুধের দোকানগুলো পুড়িয়ে ফেলতে গিয়েছিল, চিৎকার করে বলেছিল 'বার্লিন চলো', খুশি হয়েছিল সৈনিকদের থলের মতো ট্রাউজার দেখে আর উঁচু বিশ্রী গাড়ীতে মার্ন পর্যন্ত সৈন্য চলাচলের ব্যস্ততায়। পরে তারা দেখে আহতদের—কারও পা নেই, কেউ বিকলাঙ্গ, কারও বা গ্যাসের ক্রিয়ায় শরীর বিষিয়ে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনে কার্বলিকের ধোঁয়ায় ফ্রান্স ভরে যায়, কালো হয়ে ওঠে বিধবাদের শোক-বস্ত্রে। ছুটিতে যে সব সৈনিক বাড়ি আসে, তারা উকুন আর ট্রেঞ্চের কাদার গল্প বলে, বলে যেখানে-সেখানে পচে-ওঠা মড়ার কথা আর অবুঝের মত বারবার জানায়, 'বিপ্লব হবে।' সৈন্যদলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। 'অরোরা'-র ডাক এসে পৌঁছয়। শাঁপাঞ্জে'।

তারপর সন্ধি হবার পরে অল্প কিছুকালের জন্যে আনন্দের বান ডাকে, মাঠে মাঠে ছেলে-বুড়ো সারা রাত দল বেঁধে নেচে বেড়ায়। 'এবার তোমরা সুখী হবে'—একথা বলা হয় সবাইকে। কিন্তু সৈন্যরা বাড়ি ফিরে দেখে শুধুই তাচ্ছিল্য শুধুই নীচতা। হরতাল শুরু হয়। বিপ্লবকে বুনো জানোয়ারের মতো মেরে ফেলবার চেষ্টা করে আতঙ্কগ্রস্ত

বুর্জোয়া শ্রেণী। কুৎসা আর কাঁদুনে-গ্যাস্‌, উত্তেজক বক্তৃতা আর কারাদণ্ড—সমস্ত অস্ত্র কাজে লাগানো হয়। কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়ে পৌরাকারে ভয় পাইয়ে দেয় 'কাফে দ্য কমের্স'-এর নিয়মিত ক্রেতাদের আর চাষীদের।

বিপ্লব গুটিয়ে আসে পার্টি সেল-এ, শ্রমিক পরিবারের কপাটবন্ধ ঘরে, হতাশ হরিদ্রের তিক্ত স্মৃতিতে। মাঝে মাঝে বাইরের জগতে তার জানানি পাওয়া যায় দু-একটা খনি-হরতালে বা মিছিলে। ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন কেঁপে ওঠে রাজধানী—জনসাধারণের বিশাল হৃদয় ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানায় সাক্কো ও ভ্যান্‌জেত্তির মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। রাতাসে পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি চলে; মেহনতি জনতার রক্তে আর একবার লাল হয়ে ওঠে প্যারীর রাস্তা।

তারপর জীবন ক্রমেই আরো দুর্বহ হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সংকটের চাপে থেমে গেছে তাঁতীর তাঁত, রাত্রির অন্ধকারে অসংখ্য ছায়ামূর্তি গাদাগাদি করে শুয়েছে রাস্তার ফুটপাথে। সন্ধির পর পনেরো বছর পার হয়েছে, আবার বিপ্লবকে টের পাওয়া যাচ্ছে প্যারীর পথে পথে। 'আমাদের কি আবার যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে'—জীবন থেকে বঞ্চিত, অকালে বুড়িয়ে যাওয়া পিয়েরের সমবয়সী যুবকদের মুখে এই প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে।

রাজনীতি সম্পর্কে পিয়েরের ধারণা দুর্বল। অনেক সময় শুধু বুলিকেই সে আঁকড়ে ধরে। দু বছর আগে ১৯৩৪ সালে যে আদর্শের জন্যে সে প্রাণ দিতে বসেছিল তা তার নিজের নয়। ফেব্রুয়ারির সেই অন্ধকার রাতে মিথ্যা তার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছিল। পরে যতোবার এই ঘটনা মনে পড়েছে, কেমন অস্বস্তি বোধ করেছে আর লজ্জা পেয়ে মনে মনে বলেছে—'আমি মজুরের ছেলে'। মিশোর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারায় সে ভয় পায়। কিন্তু তার রক্তের ভেতর কি একটা তাকে আগের মতোই আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। মিশোর কথাবার্তা ভয়ানক বেশি কঠিন বলে মনে হয় তার। সে চায়, বিপ্লব আসুক মে মাসের বৃষ্টির মতো উল্লাস আর কলরব নিয়ে।

মেট্রো স্টেশনের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি মেয়ে তাদের নজরে পড়ল। মেয়েটি বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে আর ঘড়ি দেখছে। বোধ হয় অপেক্ষা করছে কারও জন্যে। অভিমানী শিশুর মতো মুখ-চোখের ভাব।

হঠাৎ দেসের বলে, 'তাহলে একজন শিক্ষিকাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ!'

এবার আর পিয়ের প্রশ্নটা এড়িয়ে যায় না। একথা কেন দেসেরের মনে হয়েছে, তাও সে জিজ্ঞেস করে না। ইচ্ছা হয়, চিৎকার করে আনের নাম বলে যতোক্ষণ না এই নিস্তব্ধ রাস্তা সে-নামে ভরে ওঠে।

সে বলে, 'হ্যাঁ। আনে'

দেসের দাঁড়ায়। পিয়েরের দিকে তাকায় সে—তাকায় তার কালো চোখের বড়ো সাদা অংশের দিকে, মুখের শান্তস্মিত মৃদু হাসির দিকে।

'তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়।' শান্ত গলায় বলে দেসের।

'কিন্তু কেন...' পিয়ের আমতা আমতা করে, 'আপনি কেন বিয়ে করছেন না?' এ প্রশ্ন সে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ঠিক সময়ে থেমেছে।

দেসের বলে, 'এ একটা রীতিমতো অভিশাপ। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। চোখের জল ফেলে ওরা আমাকে ভালবেসেছে, আত্মহত্যা করবে বলে শাসিয়েছে। কিন্তু সে ভালবাসা আমাকে নয়, আমার টাকাকে। আমি কি করব বলো? নিজের পরিচয় গোপন করব? অদৃশ্য পোশাক পরব?'

'অনায়াসে আপনি এই টাকা ছেড়ে দিতে পারেন। আপনি তো আর ফাটকাবাজ নন, আপনি ইঞ্জিনিয়ার। টাকা যদি আপনার কাছে বোঝা বলে মনে হয়......'

'না, টাকা আমি ভালবাসি। কেন? হয়তো এই কারণে যে, টাকাই হচ্ছে ক্ষমতা। শুধু খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা নয়, সত্যিকারের ক্ষমতা, সমস্ত দিক দিয়ে হাতের মুঠোয় আনবার ক্ষমতা। কিন্তু আমি তা চাই কেন? এ কথা আমি বুঝতে চেষ্টা করছি। এটা কি বোঝা? তা হোক, কিন্তু ভারি মিষ্টি বোঝা। অবশ্য এটা একটা বিষ, কোকেনের মতো যা আস্তে আস্তে শরীরকে বিষিয়ে দেয় আর সিফিলিসের মতো এ-বিষ মিশে যায় রক্তের সঙ্গে।'

একটা অন্ধকার রাস্তা দিয়ে তারা হেঁটে যাচ্ছিল। থানার লাল আলোটা জ্বলছে অসুস্থ লাল চোখের মতো। একটি মেয়ে নিচু হয়ে ডাস্টবিন ঘাটছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

দেসের বলে চলে, 'এই বিষ সবাইকেই বিষিয়ে দিয়েছে। সবাই ভুগছে এই রোগে। কেউ এই রোগ থেকে মুক্তি চায় না। 'দু-শো পরিবার'ও নয়, দু-কোটি জনসাধারণও নয়। যতোক্ষণ প্রাণ থাকে ওরা লড়বে। ফ্রান্সের জন্যে নয়, টাকার জন্যে। যুদ্ধ? যুদ্ধ হবে না। বিপ্লবও হবে না। জমানো টাকা খোয়াবার ভয় আছে সকলের। কিন্তু ওই মেয়েটিকে দেখ, ওর কিছুই নেই, তাই ওর ভয়ও নেই। কিন্তু ওর মতো মানুষ ক-জন? যে কজন আছে, তাদের ভয় দেখিয়ে চুপ করানো হবে, দরকার হলে গুলি করা হবে। অবশ্য, তার প্রয়োজন হবে না। আমাদের দেশের মানুষগুলো বোকা নয়। কত ধানে কত চাল তা ওরা ভালো করেই জানে।'

পিয়ের বলে, 'আমি সত্যি বুঝতে পারি না মানুষের ওপর এত ঘৃণা নিয়ে আপনি কি করে বেঁচে আছেন। আগেকার কালে মানুষকে ভুল বোঝানো যেত, কিন্তু এখন সবাই বুঝতে শিখেছে। কিসের আশায় রয়েছে ওরা? আর কিছু নয়—বিপ্লব! আমাদের কারখানায় হাজার হাজার লোক আছে যারা ভবঘুরের মতো সবকিছু খুইয়ে বসে নেই। তাদের কাজ আছে, পরিবার আছে, বাড়ি আছে, অনেকের জমানো টাকাও আছে। কিন্তু তারা সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি...' ডাস্টবিনের কাছে মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে, 'মানুষের ওই অবস্থা যাতে না হয় সেজন্য তারা সবকিছু ত্যাগ করবে। সময় সময় আমার মনে হয়, মানুষ কাদার মতো। অতীতে ভগবান ও পশুকে রূপ দিয়েছে মানুষ, এখন মানুষকে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা আমাদের।'

দেসের বলে, 'মানুষ কাদার মতো নয়, চিউয়িং গামের মতো। এজন্যেই সবকিছু বদলে যাচ্ছে, আবার সবকিছু একই অবস্থায় রয়েছে। সত্যি সত্যিই বদলে যায়, এমন কী আছে? শুধু নাম। আসল পরিবর্তন মৃত্যু। একমাত্র মৃত্যুই পরিবর্তন আনতে পারে। এজন্যেই মৃত্যুকে আমি ভয় করি। লোকে কেন আত্মহত্যা করে, আমি ঠিক বুঝি না। অবশ্য এটা আমার বলার কথা নয়। আমি বলতে চাই, যতোই তোমরা বিপ্লবের কথা বলো না কেন—বিপ্লব মানে মৃত্যু, শুধু আমার মৃত্যু নয়, কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। ছোট রাস্তাটার দু-পাশের বন্ধ জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উষ্ণ আলো চুইয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আসছে। একটা জানলা খোলা ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ে, বাড়ির লোক টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে খেতে বসেছে, আলোটা রয়েছে টেবিলের মাঝখানে আর সেই আলো পড়েছে একটি স্ত্রীলোকের সুন্দর গলায়

ও ক্লান্ত মুখের ওপর।

দেসের বলে, 'কত কিছু ধ্বংস হতে পারে ভাবতেও আমার আতঙ্ক হয়। 'নংরদাম' বা 'লুভ্‌র্'-এর মতো কতগুলো সুন্দর ও বিখ্যাত ঘরবাড়ি ধ্বংস হবে বলে শুধু নয়। আরো অনেক কিছু আছে যা ধ্বংস হলে এর চেয়েও বেশি দুঃখ আমি পাব। এসব বাড়ির ভেতরে যে সুখী পারিবারিক জীবন আছে, তার কথা আমি বলছি। সুখ বা সুখের একটা ভ্রম হতে পারে। যাই হোক, একটা উষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয়ই আছে আর আছে নিশ্চয়তা—পাশের ঘর থেকে ঘুমন্ত নিশ্বাস শুনে যা অনুভব করা যায়। খৃষ্টীয় নামকরণ, যখন চিনি দেওয়া বাদাম খেতে দেওয়া হয়; বিয়ে, যখন অজস্র ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয় সুখী দম্পতির পায়ের তলায়; এমন কি শবযাত্রা, যখন শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এসে খাবার ও মদ নিয়ে বসে—এসব থাকবে না বলে আমি দুঃখ পাই। এখনো এসব টিঁকে আছে, কিন্তু চোখের পলকে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে—বোমা, বন্দুকের আওয়াজ, হিটলারের পাগলামি, বজ্রমুষ্টি বা অন্য কোনো গোলমালের মধ্যে। অবশ্য একশো বছর পরে সকলে বলবে এই ঘটনা 'ঐতিহাসিক প্রয়োজন' হয়ে উঠেছিল...আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হবে।'

ভিজে ভিজে চামড়ার দস্তানা-পরা হাতটা পিয়েরের দিকে একবার বাড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে যায় দেসের। এই কথাবার্তা তাকে বিরক্ত করে তুলছে। এত বেশি কথা বলছে বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। প্রেমে অন্ধ এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মানবতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্‌বক্ করে কী লাভ।

শহরের কেন্দ্রের দিকে সে ফিরে চলে। রাস্তায় দিনের মতো আলো। দোকানের জানলার রংবেরঙের জিনিস ঝকঝক করছে। বাড়িগুলোর গায়ে নীলচে বেগুনী রঙের ছোট ছোট মূর্তি ও সাপ—খিদে-জাগানো মদ ও রোদজ্বলা মরক্কোয় বিলাস-ভ্রমণের বিজ্ঞাপন। রাস্তায় ভীষণ ভিড়, গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করছে সকলে—যেন আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই; কাঁচের পাত্রে জিইয়ে রাখা মাছের মতো এলোমেলো ঘোরাফেরা করছে। পত্রিকার দোকানে কুড়ি রকম ভাষার খবরের কাগজ আঁটা। সেখানে একবার থেমে দেসের চোখ বোলায় খবরের কাগজের হেডলাইনগুলোর ওপর—'পপুলার ফ্রন্টের দাবি...সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা...' ক্লান্তভাবে হাই তোলে সে। এখানে সবকিছু তার নিজের ভাষায় কথা বলছে—বাড়ি বা বিজ্ঞাপন বা শেয়ারের দাম তার জানা, মরক্কো রেল-কোম্পানীর ডিভিডেন্ড কত সে বলে দিতে পারে, বিখ্যাত জেতো-মিষ্টি পানীয়টি তার কাছে নতুন নয়। সবকিছুর মালিক সে—জমি, বাড়ি, খবরের কাগজ এমন কি মুখের হাসিটুকুরও। তার নিজের রাজ্যে সে দর্শক মাত্র, কোনো কিছুতে তার প্রয়োজন নেই, যাদুকরের মতো নিজেকে এক ঘন্টার জন্যে পুতুল বানিয়ে ফেলেছে...এই সমস্ত কিছুকে বাঁচাবার কোনো সার্থকতা নেই? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু হে ঈশ্বর, কী গভীর ক্লান্তি...

নয়

সেদিন সন্ধ্যায় অধ্যাপক মালের বক্তৃতার বিষয় ছিল—পোন্নাতুর রোমীয় স্থাপত্য। বক্তৃতায় সকলের প্রবেশাধিকার ছিল, সুতরাং ছাত্রদের সঙ্গে অন্য লোকও বেশ কিছু এসেছে। একদল এসেছে যারা সত্যিই স্থাপত্য-অনুরাগী এবং নিজেদের চেষ্টাতেই যা কিছু শিখেছে। এখানকার প্রতিটি বক্তৃতা তারা শুনতে আসে—হাতের পেটমোটা নোট-বইয়ের একই পাতায় সংস্কৃত ধাতুরূপ ও গণিতের দ্বিপদসূত্র পাশাপাশি লেখা। এমন দু-একজনও আছে যারা ভেতরে ঢুকেছে শরীর গরম করবার জন্যে আর একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে। কেউ কেউ অধ্যাপক মালের প্রতিটি কথা টুকে নিচ্ছে। কেউ বা হাই তুলছে আর নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে। একজন বৃদ্ধা পেছনের সব চেয়ে উঁচু বেঞ্চে বসে একমনে মোজা বুনছেন।

মালের বক্তৃতার একজন নিয়মিত শ্রোতা মিশো মিস্ত্রী। স্থাপত্য সম্পর্কে তার কৌতূহল ছেলেবেলা থেকে; বাড়ি ঘরের মাপজোখ ও মালমশলা সম্পর্কে তার ধারণা আছে। অনেক কিছু সে জানে। পছন্দসই কোনো বাড়ি দেখলে মিশো যে শুধু ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই বাড়িটির গঠন-সৌকর্য আর পারিপাট্যে মুগ্ধ হয় তাই নয়, একথাও তার মনে হয় যে স্থপতি-বিদ্যায় এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যা মানুষের জীবন্ত মুখের মতো বা অরণ্যের মতো তাকে আচ্ছন্ন করে। তার এই মোহের কারণ আবিষ্কার করবে বলেই সে স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাস পড়তে শুরু করেছে।

সবকিছু জানবার অতৃপ্ত আগ্রহ মিশোর। শিশু যেমন হাতের খেলনা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে, তেমনি এই জগতটাকে টেনে ছিঁড়ে ভালো করে দেখবার একটা প্রবল আগ্রহ আছে তার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়েছিল সামান্য লিখতে, পড়তে, আঁক কষতে শিখে এবং কতকগুলো নীতিকথা মুখস্ত করে। তারপর জীবনের পাঠশালায় ঢুকেছে। লুক মিশোর বাবা ছিলেন টুপি-ব্যবসায়ী। যুদ্ধের পরে টুপির ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে, টুপি মাথায় দেবার অভ্যেস ছেড়ে দেয় সবাই। শিক্ষানবিশ হিসেবেও লুককে কোথাও নেওয়া হয় না। তখন সে একটা তিন-চাকার সাইকেলে চড়ে বাড়ি বাড়ি ঘন-করা দুধ পৌঁছে দেবার কাজে লেগে যায়। পরে সে চামড়ার দুর্গন্ধওলা ট্যানারীতে কাজ করেছে। প্রচুর বই পড়ত সে কিন্তু পড়ার ভেতর কোন নিয়ম বা সামঞ্জস্য ছিল না। নৌ-বাহিনীতে থাকবার সময় টরপেডো-বোটে তাকে কাজ করতে হয়েছিল। সেখানে কোরিএ নামে একজন নক্‌সা-আঁকিয়ের সঙ্গে তার পরিচয়। পরে নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসেবে কোরিএ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই মিশোকে দলভুক্ত করে নেয় সে। 'সিয়েন' বিমান কারখানায় দুজনে আসে কাজ করতে। তারপর মিশো মিটিং-এ মিছিলে যোগ দিয়েছে, অর্থনীতি ও শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের ওপর বই পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নাড়াচাড়া করেছে গণিত নিয়ে, হাত পাকিয়েছে দক্ষ মিস্ত্রী হিসেবে। এখন সে ভালো রোজগার করছে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়, সে

কিছুই জানে না। ভাবতেই তীর একটা ব্যথা টনটনিয়ে ওঠে, জীবনটা নিরর্থক বোধ হয়। মনে হতে থাকে, যে-কোনো কারণেই হোক, সে একটা অমূল্য সুযোগ হারিয়েছে। কিন্তু তার সময় এত কম! এই সে ব্যস্ত পার্টি-সম্মেলন নিয়ে, এই সে যাচ্ছে কোন সভায়। থিয়েটারে যাবার বা যাদুঘর দেখবার ইচ্ছাটা পুরোপুরি আছে। মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোন্ দূর দেশের অস্পষ্ট দৃশ্য—রোমের ধ্বংসাবশেষ, তুর্কীস্তান-সাইবেরিয়ান রেলপথ...

গরম বাদাম-ভাজায় হাতের ঠান্ডা আঙুলগুলো গরম করতে করতে নভেম্বরের কুয়াশামোড়া সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে মিশো। ঝাপ্সা আলো খচিত প্যারীকে মনে হয় যেন একটা জাহাজ; এই বুঝি জাহাজে-ওঠার সিঁড়িটা তুলে নেবে! প্রায়ই সে সিনেমায় যায়। চারপাশে গায়ে গা লাগানো জোড়া-জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা আর বাতাসে কমলালেবুর গন্ধ। তারই মধ্যে বসে থাকে। কোনো হাবাটে অথচ চটকদার মার্কিনী অভিনেত্রীর ছবি পরদায় ফুটে উঠলে সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। একজন কমরেডের মেয়ের সঙ্গে তিন বছর ধরে তার প্রেম চলেছিল। মেয়েটির নাম মিমি, দেখতে ভালো, মন-কেড়ে-নেওয়া একটা চুলের গোছা ওর কপালে ঝুলত। মেয়েটির জন্যে সে নাচ শিখেছে, তাকে ফুলের তোড়া আর চকোলেট উপহার দিয়েছে, এমন কি কবিতা লেখার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে। কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ করে দিয়ে মিমি একজন দোকান-সরকারকে বিয়ে করে বসল। মিমি চেয়েছিল নিশ্চিন্ত শান্ত জীবন, মিশোর চিন্তাধারা আর উগ্রচণ্ডী মনোভাব তার মনে ভয় জাগাত।

মিশোর বয়স ঊনত্রিশ। শক্তসমর্থ, তবে একটু যেন বেমানান গড়ন। মাথাটা যেমন বড়ো তেমন ভারী। মুখের চামড়ায় শীতকালেও মেচেতার দাগ। পাঁশুটে কুতূহলী চোখদুটোর আকর্ষণ আছে। সাদা উঁচু দাঁত। মনে হয়, সব সময়েই হাসছে। হাত-দুটো কখনো স্থির থাকে না, সব সময়ে দুলছে। আর একটা মুদ্রাদোষ—কথায় কথায় বলে 'ঠিক তাই!'

মালের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনছে মিশো, মাঝে মাঝে একটা পুরনো ছেঁড়া নোট-বইয়ের পাতায় বক্তৃতার নোট নিচ্ছে। একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে বসেছে ঠিক তার পাশটিতে। বক্তৃতা শুরু হবার আগে মিশো দেখেছে মেয়েটিকে। বিশেষ করে লক্ষ্য করেছে চিত্র-তারকাদের মতো মেয়েটির চোখের বড়ো বড়ো কালো পাতা। তার পরেই মেয়েটির কথা ভুলে গিয়ে পোয়াতিয়েরের গির্জার সৌন্দর্যে ডুবে গেছে।

স্তম্ভের আলোচনা প্রসঙ্গে মালে একটা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করলেন। শব্দটা ধরতে না পেরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মিশো ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি দিয়ে সাজানো বললেন উনি?'

'লোহার জাল দিয়ে।'

বক্তৃতা শেষ হবার পর সামনের লোকের বেরিয়ে যাবার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ বসে থাকতে হল ওদের। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মিশো বলল, 'বক্তৃতার সময় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করেছি বলে রাগ করেননি আশা করি। আপনি বোধ হয় স্থপতিবিদ্যার ছাত্রী, কিন্তু আমি ও বিষয়ে একেবারেই আনাড়ী। আমার বিষয় হল ইঞ্জিনিয়ারিং।'

'আর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কিছু জানি না, একেবারেই কিছু জানি না।'

মিশো বলল, 'ইঞ্জিনিয়ারিংটা অবশ্য নেহাৎ যাকে বলে একটা 'বিশেষ বিদ্যা'। কিন্তু আর্ট বুঝতে না পারার মধ্যে একটা অভাব-বোধ আছে—ঠিক বুঝে ওঠা যায় না।

ঠিক তাই। জানেন, এক সময়ে আমি একটা আর্টকে বুঝতে চেষ্টা করতাম অন্য একটা আর্টের মারফৎ। যেমন ধরুন, বাজনা শুনতে শুনতে আমি সেটাকে কথায় রূপ দিতে চাইতাম; ভাবতাম, এই সুরটা কি 'প্রেমে পড়া' বোঝায়, ওই সুরটা কি বলতে চায় 'সামরিক বিজয়' কিংবা 'সমুদ্রে ঝড়'? বুঝতেই পারছেন, কোনো ফল হত না। কারণ এরকম ব্যাখ্যা হতেই পারে না। স্থাপত্য সম্পর্কেও এই কথা খাটে। অবশ্য আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন এবিষয়ে।'

হল থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এল দুজনে। দু দিনের ঝড়বৃষ্টির পর শহরের রূপ বদলে গেছে। বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে সবকিছুতে। ফুলে উঠেছে বাদাম গাছের কুঁড়ি-গুলো। নীলচে পাঁচের রাস্তায় একটা নতুন আলোর প্রতিফলন। শীতের ওভারকোট নেই, পাতলা ম্যাকিন্‌টস দেখা দিয়েছে তার জায়গায়। কাফেগুলোর ভেতর থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে ছাতে বসেছে। রাস্তার বাজিয়েরা দেখা দিয়েছে আবার। ছোট ছোট ছেলেরা আধ-ফোটা 'লিলি অফ দি ভ্যালি' বিক্রি করছে।

বুলভার স্যাঁ মিশেল পার হয়ে গেল ওরা। আলো-ঝলমলে, শব্দ-মুখর বুলভার স্যাঁ মিশেল। তরুণ-তরুণীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, প্রেম নিবেদন করছে, চুমুক দিচ্ছে ক্রীম দেওয়া কফির পেয়ালায় আর আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। বুলভার স্যাঁ জেরম্যাঁর রোমাঞ্চকর আবছা অন্ধকারে ছোট ছোট কুকুর নিয়ে ঝিরা বেরিয়েছে রাতের পাদচারণায়, ছায়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা জড়াজড়ি করছে। ঘড়িতে দশটা বাজল। মেয়েটির কাছে মিশো গল্প করে, কি ভাবে সে গ্রেনোব্‌ল্‌-এর তুষার-পাহাড় পার হয়েছিল। মেয়েটি হাসছে দেখে সে খুশি হল।

'আপনি খুশি হয়েছেন দেখে আমার ভালো লাগছে।' সে বলে।

'আমি সাধারণত খুব হাসিখুশি নই। বাড়ির সবাই বলে, আমি নাকি সব সময়েই মুখ ভার করে থাকি—সেজন্যে বকুনিও খাই মাঝে মাঝে। দাদা তো আমার নাম দিয়েছে 'ইঁদুরমুখী'।'

'না, না, ইঁদুরের মতো মোটেই নন আপনি। স্যাভয়এ কাকার সঙ্গে থাকবার সময় আমি একটা পাহাড়ী ইঁদুর ধরেছিলাম। ইঁদুরটাকে পেছনের দু পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়ে-ছিলাম। বুনো জন্তুর জীবন সত্যিই আশ্চর্য। পিঁপড়েদের সম্পর্কে কয়েকটা বই আমি হালে পড়েছি। আশ্চর্য বুদ্ধি ওদের! কী সংগঠনী শক্তি! তারপর ঈলমাছ। ওদের সম্বন্ধে কিছু জানেন? শোনা যায়, পৃথিবীর চারদিক থেকে এসে ওরা ওই সারগাসো সাগরে জড়ো হয়েছে। ভালোবাসার টানই ওদের ছুটিয়ে নিয়ে আসে, পাঁচ হাজার মাইল পথ সাঁতরে পার হয়। এমন কি মাঝে মাঝে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে। ডাঙায় ওঠার সময় লক্ষ লক্ষ মারা যায়, কিন্তু তবুও ওরা দমে না। একেই বলে আবেগ! মানুষ ও-রকম হয় না।' মেয়েটির কাছে সে মিমির কথা বলতে চেয়েছিল—প্রেমের চেয়েও দোকান-সরকারের মাইনে মিমির কাছে বড়ো হল, সে-কথা। কিন্তু কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এত কিছু জানবার আছে! রাজনীতি ও ইঞ্জি-নিয়ারিং ছাড়া আর কিছুই আমি জানি না।'

মেয়েটি বলল, 'রাজনীতির ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। বাড়িতে সব সময়েই শুধু রাজনীতি, আর কোনো কথা নেই। আমার বাবা...'

মেয়েটি একটু ইতস্তত করছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের কাছে কেন সে এত কথা বলছে? লোকের সঙ্গে মিশতে তার ভাল লাগে না,

বরাবর একা একা থেকেছে। আর এখন সে এমন একজন লোকের সঙ্গে অসংকোচে কথা বলছে যার সম্পর্কে সে এইটুকু মাত্র জানে যে সে ইঞ্জিনিয়ার। কি বিদ্ঘুটে ব্যাপার—ছেলেমানুষি! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, আজকের এই বসন্তের লোভ-জাগানো সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আকস্মিক পরিচয়ও শেষ হয়ে যাবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসে উঠতে হবে তাকে। কেমন একটু বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগল তার মনে।

শুকনো গলায় সে বলল, 'আমার বাবা একজন ডেপুটি। আপনি হয়তো তাঁর নাম শুনে থাকবেন। তাঁর নাম তেসা।'

মিশো জোরে হেসে উঠল, 'এটা একটা আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার বই কি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক তাই! কিন্তু আপনার বাবার কথা উঠছে কেন? আমি তো তাঁর সঙ্গে কথা বলছি না, আপনার সঙ্গে বলছি। ওঁরা যা কিছু রাজনীতির তালগোল পাকিয়ে তোলেন, তার মাথামুণ্ডু আমি তো কিছুই বুঝি না। সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার! আমি একেবারে অন্যকথা বলছি। এ কি, কোথায় যাচ্ছেন? চলুন আরেকটু হাঁটা যাক—অন্তত এর পরের বাস-স্টপ পর্যন্ত। আজকের সন্ধ্যেটা ভারি সুন্দর...'

দেনিস রাজি হল। তারপরেই আবার অবাক হল নিজের ব্যবহারে। কেন সে যাচ্ছে, কেন সে কথা শুনছে, আর কেনই বা সে হঠাৎ এত সহজ ও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে?

মিশো বলে চলল, 'রাজনীতি জিনিসটা আমি সম্পূর্ণ অন্যভাবে বুঝি। রাজনীতি মানে পৃথিবীকে নতুন করে গড়া। চারদিকে এত ঢিলেমি আর এতকিছু আছে যা ক্ষতি করে! লোকের কাণ্ডকারখানা দেখে সময়ে সময়ে আমি নিজেও লজ্জা পাই। কিন্তু তবুও সুখী, সুন্দর, প্রাণবন্ত জীবন সম্ভব, সত্যিই সম্ভব। আমার কাছে বিপ্লব এক রকমের স্থাপত্য। আপনি যদি শিল্পানুরাগী হন, তবে বিপ্লব-দরদী না হয়ে উপায় নেই।'

'আপনি কি কমিউনিস্ট?'

'কমিউনিস্ট না হয়ে আর কী হতে পারি আমি?'

'আমার দাদাও ঠিক আপনার মতো কথা বলে। কিন্তু দাদার কথা আমি বিশ্বাস করি না। শুধু মুখের কথার ওপর কোনো আস্থা নেই আমার।'

মিশো বলল, 'তার কারণ আপনার বাবা আইনজীবী। লোক যখন সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলে, আমারও কেমন সন্দেহ হয়। এখানেই আমরা অন্যদের থেকে আলাদা। আচ্ছা দেখুন, সামনের নির্বাচনের ওপরে আজ আমাদের একটা সভা আছে। চলুন না, আধ ঘণ্টার জন্যে সেখানে যাওয়া যাক। একবার গেলেই তফাতটুকু আপনি বুঝতে পারবেন! জায়গাটা খুব কাছেই—রু ফালগিয়ের একটা স্কুলে। তবে আপনার যদি ভালো না লাগে তো ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু একবার গেলেই বা মন্দ কি। আসুন, আসুন, সব বিষয়ে কৌতূহল থাকা ভালো। যাবেন?'

দেনিস মাথা নাড়ে। কিন্তু সে বুঝতে পারছে, শেষ পর্যন্ত সে যাবেই। এমন কি মনে মনে একবার বলে, 'বাড়ি ফিরে ভেবে দেখা যাবে'খন। এখন আমার ফুর্তি লাগছে এইটেই বড়ো কথা।'

সভায় এমন বহু ছেলেমেয়ে এসেছে যাদের ভোটারের তালিকায় নাম ওঠার বয়স হয়নি। সেই আশ্চর্য বসন্তে এই ধরনের সভা হাজার হাজার হয়েছিল, আর প্যারীর জনসাধারণ মমতা ও আবেগ নিয়ে বারবার বলেছিল—'পপুলার ফ্রন্ট'। হলের ভেতর বেশ গরম। অনেকেই কোট খুলে ফেলেছে। মাথার টুপি পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে ধূমপান করছে বসে বসে। চারপাশের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল দেনিস। দুঃখ,

দারিদ্র্য, রোগে ভরা এ এক জগৎ। একটি স্ত্রীলোক কোলের ঘুমন্ত শিশুকে দুধ দিচ্ছে—নিশ্চয়ই বাড়িতে এমন কেউ নেই যার কাছে শিশুটিকে রেখে আসা যায়। একটি বৃদ্ধের ঠান্ডা-লাগা লাল চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে—কাঁদছে বলে মনে হয়। কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নেই। এরা বেরিয়ে এসেছে নতুন এক ভ্রাতৃত্বের টানে বিরাট শহরের কুৎসিত অলিগলি থেকে। ন্যায়ের জন্যে সংগ্রামের কথা যখন বলা হল তখন হাজার বজ্রমুষ্টি তুলে গলায় গলা মিলিয়ে সাড়া দিল সবাই। বক্তৃতার ধরন তেসার মতো নয় একেবারেই। সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বক্তৃতা—কথাগুলো দমক দিয়ে বেরিয়ে আসে, মাঝে মাঝে তো-তো করে, যেন ঠিক শব্দটি খুঁজে পাচ্ছে না। কথাগুলোও নতুন ঠেকছে। ক্লান্ত মুখগুলোতে হাসি ফুটে উঠছে মাঝে মাঝে। ধোঁয়ায় আবছা হলের ভেতরটা থমথম করছে সন্তান-ধারণের ক্লান্তিতে, বাড়ন্ত জীবনের রহস্যে। একটি স্ত্রীলোক কুঁকড়ে যাওয়া শুকনো হাতের বজ্রমুষ্টি তুলে ধরেছে ওপরের দিকে—যেন অনেক সন্তান ধারণের বেদনা সয়ে আর সেই সন্তানদেরই কবরে শুইয়ে আসার ক্লান্তির শেষে খুঁজে পেতে চায় মুক্ত বাতাস, উত্তাপ ও অভ্যর্থনা, আর আঁকড়ে ধরতে চায় এমন একটা কথাকে যার সন্ধান এতদিন জানা ছিল না।

আধ ঘণ্টা কাটে। তারপর এক ঘণ্টা, এবং তারপর আরো এক ঘণ্টা। কিন্তু দেনিস চলে যায় না। মনোযোগ দিয়ে সবকিছু শোনে। কি শুনছে হয়তো সে নিজে আবার বলতে পারবে না। কিন্তু এটা তার কাছে এক আশ্চর্য নতুন জগৎ। যেন এদের বুকের ধুকপুকুনি সে শুনতে পাচ্ছে—অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় বৃতানির সমুদ্র প্রথম দেখে সে এমনিভাবেই কান পেতে ছিল। সভা শেষ হতে বারোটা। হঠাৎ দেনিস টের পায়, সেও 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে শুরু করেছে। গানের কথা জানা নেই, কেন গাইছে কি গাইছে কিছুমাত্র ভাবেনি, তবুও গাইছে।

একজন শ্রমিক আসে মিশোর কাছে। লম্বা বুড়োটে চেহারা, বসা চোখ, গালের ওপর একটা কাটা দাগ। বলে, 'আমাদের কারখানায় চারজন লোককে আজ আমরা সভ্য করেছি। শার্লকে বোলো যে ইস্তাহারগুলো কারখানার বিভাগ হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়াই ভালো। বেড়াগুলো বিজ্ঞাপন মারার কাজে লাগানো যেতে পারে।' তারপর দেনিসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কোন্ জেলা থেকে এসেছেন কমরেড?'

দেনিস লাল হয়ে ওঠে। মিশো তার হয়ে জবাব দেয়, 'এই কমরেড একজন ছাত্রী।'

দেনিস ভাবে, 'তাহলে ও আমাকে নিজেদের লোক বলে ভেবেছে।' যে জন্যেই হোক, কথাটা ভেবে সে খুশি হয়ে ওঠে।

দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। পারীর নীল্‌চে পাঁশুটে, গরম আর ছটফটে বাতাস বসন্তের কথা মনে করিয়ে দেয় আবার।

'ভাল লাগল?' মিশো জিজ্ঞেস করে।

'ঠিক বলতে পারছি না। শুধু ভাল লেগেছে বললে ঠিক বলা হয় না। আমি রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়েছি।'

'ঠিক বলেছেন। কেন জানেন—আজকের এই সন্ধ্যের মতো, বাতাসের এই অনুভূতির মতো রোমাঞ্চকর এই সভা'। আশা, সব কিছু বদলে দেবার আশা—এই একটিমাত্র কথায় একে প্রকাশ করা যায়।'

'দাদার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এই যে লোকটি আপনার কাছে এসেছিল তার কথায় হয়। লোকটির কথাগুলো খাঁটি। অন্য সকলের সম্পর্কে এই কথা বলা

চলে কিনা জানি না, কিন্তু ওর সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য আমাকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। হঠাৎ একেবারে সবকিছু বুঝে নেওয়া খুব শক্ত।'

মিশো আবার কথা বলে। বলে তার নিজের এবং অপরের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। এত বেশি কথা বলে যে দেনিস বিশেষ কান দেয় না তার কথায়। কিন্তু মিশোর গলার স্বর তার ভালো লাগছে। বিদায় নেবার সময় মিশোর পাংশুটে কুতূহলী চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে। 'ঠিক তাই!' সোৎসাহে বলে ওঠে মিশো।

দেনিস হাসে ঃ 'আবার আমাদের দেখা হবে। মালের বক্তৃতায়, বা আবার যদি কোনো সভা হয় তো আমাকে চিঠি লিখবেন, আমি আসব। ঠিক আছে? আচ্ছা যাই।'

অবশেষে বাড়ি। বারান্দার দেওয়ালে ছবি ঝুলছে, বিখ্যাত বিখ্যাত বিচারের ছবি। খুনী ও অপরাধীরা দুজন পাহারাদারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, আর রোগা আঙুল ওপরের দিকে তুলে আইনজীবীর পোশাকে তেসা বক্তৃতা দিচ্ছে।

এই ফ্লাট-বাড়িটা ডোবার মতো—ওপরটা থমথমে ও শান্ত কিন্তু নিচের দিকে দুরন্ত চাঞ্চল্য। দেনিসের বাবা এখনো বাড়ি আসেনি। সে বোধ হয় এখন পলেতের বুকে মাথা রেখে দেসেরের কূটবুদ্ধি ভুলতে চেষ্টা করছে। দেনিসের মা শোবার ঘরে। পেসেন্স খেলছেন আর স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছেন। মাদাম তেসা নেফ্রাইটিসের রুগী। মৃত্যুকে, বিশেষ করে নরককে ভয় করেন তিনি। খৃীষ্টধর্মে অচল বিশ্বাস। প্রথম জীবন কেটেছে নানা সাংসারিক কাজে, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করার কথা ভাবতে হচ্ছে। কনভেন্ট-এ ছেলেবেলার দিনগুলো মনে পড়ে আর ভাবেন, এবার শেষ বিচারের দিন আসছে, সবকিছুর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। চেম্বারে তেসার ধর্ম-বিরোধী বক্তৃতা, আধা-ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে তেসার কীর্তিকলাপ, ছেলে লুসিয়'র ধর্মে অবিশ্বাস ও নৈতিক অধঃপতন—সবকিছুর জন্যে। এসব থেকে কে তাঁকে বাঁচাবে? দেনিস? কিন্তু দেনিস তো প্রায় সব সময়েই চুপচাপ, কখনো গির্জায় যায় না, মা-র কথার জবাবও দেয় না কখনো। হয়ত দেনিসও তার বাবার মতো হয়ে উঠেছে...

'কে? দেনিস? আমি ভেবেছিলাম তোর বাবা। একবার শুনে যা, কোথায় গিয়েছিলি?'

'বুল-মিশ্-এর একটা কাফেতে আমি বসেছিলাম। আজকের রাতটা ভারি সুন্দর।' প্রথমে যে কথাটা মনে এসেছে তাই বলেছে দেনিস। সভার কথা বলে মার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তুলতে চায় না।

কিন্তু মাদাম তেসা কেঁদে ফেললেন।

'এ্যাঁ? বুল মিশ্-এ? তুইও তাহলে তোর বাবার মতো হয়ে উঠলি!'

নানা কথায় বুঝিয়ে মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে দেনিস। বলে যে মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গেই এতক্ষণ কাটিয়েছে সে। রাতে মার দরকার হবে বলে ভেরভ্যাঁর জল নিয়ে এসেছে। কিন্তু মাদাম তেসা তবুও অবুঝের মতো তাসের রাজারাণী ভিজিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

মাকে শুভরাত্রি জানাতে এল লুসিয়'। তার সঙ্গে দেনিস গেল লাইব্রেরিতে। সারাটা সন্ধ্যে লুসিয়' কাটিয়েছে স্যু-রিয়ালিস্ট্‌দের সঙ্গে। সে বলে, 'ওদের একটা ভারি মজার প্যাঁচ আছে। ওরা সবকিছুর যৌন প্রকৃতি খুঁজে বার করতে চায়। চিন্তা, রং, স্বপ্ন—কোনো কিছু বাদ দেয় না। বুঝতেই পারিস ওদের এসব কথা শুনে সকলেই কি রকম চটে উঠেছিল। বিশেষ করে কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টরা তো ফ্রয়েডের নাম পর্যন্ত

সহ্য করতে পারে না। একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট কিভাবে তর্ক করে, কোনোদিন শুনেছিস?'

দেনিস মাথা নাড়ে। বলী-দ্বীপের এক নর্তকীর কথা বলতে শুরু করে লুসিয়ঁ।

'ওকে দেখে গোগ্যাঁর ছবির তত্ত্বটা যেন বোঝা যায়। মনে হবে, পাশবিক কামনাই ওর কাছে একমাত্র বাস্তব সত্যি।'

'আমাকে এসব কথা কেন বলছ দাদা?'

'বলছি এজন্যে যে তোর বয়স এখন বাইশ হয়েছে, সতের নয়। ওই খুকীপনা আর মানায় না তোকে। নাকি তুইও মার মতো হবি ঠিক করেছিস—ব্রহ্মচারীদের জীবনী-পড়া আর 'পেসারী' ব্যবহার একসঙ্গে চলতে থাকবে?' তারপর দেনিসের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে, মিষ্টি গলায় বলে, 'রাগ করিস নে ইঁদুরমুখী। তোর মনে কষ্ট দেব বলে একথা বলিনি। চললাম!'

নিজের ঘরে ঢোকে দেনিস। জামাকাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। ঘড়িতে দুটো বাজে...আড়াইটে, তিনটে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। বাবা বাড়ি এসেছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় গান গাইছে গুন্ গুন করে—'তু ভা বিয়্যাঁ মাদাম লা মারকিস।' তারপর আবার সব চুপচাপ।

মনে হয়, সমস্ত বাড়িটা যেন একটা কবরখানা। ব্রিতানির স্কুল-জীবনের কথা মনে পড়ে। কত ছেলেমানুষি খেলায় তখন তারা মেতে থাকত। আর ব্রিতানির সেই সমুদ্র! বস্তার লাল কাপড়ের ট্রাউজার পরে জেলেরা ঘুরে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়। তাদের দেখাত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গলদা চিংড়ীর মতো। ঝড়ের সময় কেঁপে উঠত গোটা বাড়িটা—কাচের তাকে ঘড়িটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠত, ঝন্ ঝন্ করে নেচে উঠত তাকের ওপর প্লেটগুলো, আর আনন্দে ঢিপ ঢিপ করত মেয়েদের বুক।

স্কুল ছেড়ে বাড়ি আসার পর দেনিসের মনে হয়েছে, তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। দম আটকানো পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় হাঁপিয়ে উঠেছে সে। কোন কিছু গোপন নেই তার কাছে। বাবার কীর্তিকলাপ, লুসিয়ঁ ও জেনেভের কথা—সবই সে জানে। কিন্তু তবুও ওপর-ওপর একটা পারিবারিক আনুগত্যের ভাব বজায় আছে। রোজ একসঙ্গে খেতে বসে সকলে। পারিবারিক একতা বজায় রাখার একটা ঠাট আছে। সব মিলিয়ে পাঁকের মতো দলা পাকিয়ে থাকার একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে।

স্থাপত্য সম্বন্ধে অকৃত্রিম আগ্রহ দেনিসের। অতীতের মানুষরা তার মার মতো নয়; ওরা আবেগের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারত আর সে-বিশ্বাসের উৎস ছিল ওদের কান্নায় কানায় ভরা হৃদয়। ওদের চারকোনা গির্জাগুলো অনেকটা খামার-বাড়ির মতো। মনে হয় এইসব দালানের আনাচে-কানাচে কণা কণা বিশ্বাস এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে। এই অতীতের মধ্যেই আশ্রয় খোঁজে দেনিস। আশ্রয় খোঁজে বাবার সফরীবৃত্তি, মার সাড়ম্বর গোঁড়ামি আর দাদার এলোমেলো উচ্ছ্বাস থেকে।

কিন্তু আজ একটা অসামান্য ব্যাপার ঘটেছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, এর শেষ পর্যন্ত বুঝতে চেষ্টা করবে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করে, এসবের মানে কি? অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। সেই বৃদ্ধা মজুরনীর উদ্যত বজ্রমুষ্টি, সেই গালে কাটা-দাগ শ্রমিকটি যে তাকে কমরেড বলে ডেকেছিল, মিশোর সেই পাঁশুটে কৌতূহলী চোখ। বসন্তের বাতাস আর স্যাঁৎসেঁতে রাতের রাস্তার নীরবতার সঙ্গে সবকিছু মিশে যায় যেন। দেনিসের বুকটা ধড়াস ধড়াস করে ওঠে। আর ঠাণ্ডা ভোর গুটি গুটি নেমে আসে পরদার ফাঁক দিয়ে। পাঁশুটে কাঁপা-কাঁপা আবছা আলোয় আর অস্পষ্ট মূর্তিতে

ভরে যায় ঘরের ভেতরটা। দেনিসের মনে পড়ে, 'ঠিক তাই!' ঠোঁট টিপে হাসে দেনিস, আর সেই হাসিটুকু ঠোঁটে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

দশ

একটি কমিউনিস্ট সংবাদপত্রে নিজের বইয়ের সমালোচনা পড়ে লুসিয় চটে উঠল। বিশেষ করে খারাপ লাগল শেষ লাইনটা যেখানে সমালোচক লিখেছেন—'কয়েকটি উগ্র 'বিপ্লবী' অনুচ্ছেদ সন্দেহের সৃষ্টি করে।' গবেট! হ্যাঁ, গোটা দলটাই গবেট। সামাজিক অস্ত্রোপচারের ক্ষমতা ওদের নেই, ওরা জানে শুধু জোড়াতালি দিতে। দক্ষিণপন্থী সংবাদ-পত্রগুলো মহা উৎসাহে বইটির সমালোচনা করেছে। তারা চায় পল তেসার দুর্নাম, র‍্যাডিকাল ভাবধারায় মানুষ হবার ভয়ংকর পরিণতির একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে বই-টিকে তারা তুলে ধরছে। কিন্তু যে গণসংবাদপত্রগুলোর উচিত ছিল লুসিয়কে নিয়ে হৈ-চৈ করা আর লুসিয়কে গণস্বার্থের নায়ক ও এ-যুগের ভাল্‌ হিসেবে স্বাগত জানানো—তারাও বিশেষ প্রশংসা করল না বইটার। 'বইটিতে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়' এই ধরনের দু একটা মন্তব্য আর শেষ পর্যন্ত 'অবিশ্বাস'—এ ছাড়া লেখার মতো আর কিছু তারা পায়নি।

হঠাৎ লুসিয় হেসে ওঠে। হয়তো ওরা ঠিক কথাই বলেছে। অল্প কিছুদিন আগে সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে চেয়েছিল। তখন বন্ধুবান্ধবের কাছে জোর গলায় একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করত যে পার্টি-শৃঙ্খলা মেনে চলাই শ্রেষ্ঠ আত্মসংযম—বিধাতাপুরুষ সম্পর্কে গ্যেটে যে আত্মসংযমের কথা বলেছেন, তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এ একেবারে মার্কামারা লুসিয়—এই গরম, এই ঠাণ্ডা।

বাবার সম্পত্তি আছে, লুসিয় তাই রোজগার করার হাত থেকে বেঁচেছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে অনেক কিছু করবে ভেবেছিল। প্রথমে ভর্তি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্লাসে। এক বছর পরে শারীরতত্ত্ব অসহ্য মনে হওয়ায় আন্তর্জাতিক আইন পড়তে শুরু করে। তারপর সিনেমা জগতের ওপর ঝোঁক আসে, এবং সহকারী পরি-চালক হিসেবে কাজে লেগে যায়। ইচ্ছা ছিল, যন্ত্র-যুগের পতনের ওপর একটা অসাধারণ ছবি তুলবে কিন্তু তাকে তুলতে হল একটা ছবি যার ভেতর হাবাটে ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নেই। একই রকম দেখতে স্বামী ও প্রণয়ীকে চিনতে বারবার ভুল হচ্ছে নায়িকার, এই ছিল ছবির গল্প। ছবিতে অরুচি ধরে যায়। তারপর সে একজন মোহ-মুক্ত প্রতিভার মেজাজ নিয়ে সাহিত্যিকদের আড্ডায় ঘোরাঘুরি শুরু করে।

ছাব্বিশ বছর বয়সে লুসিয়র সঙ্গে অভিযাত্রী আঁরি লাগ্রাঁজের পরিচয়। সে সময় আঁরি লাগ্রাঁজ দক্ষিণ-মেরু অভিযানের তোড়জোড়ে ব্যস্ত। লুসিয় অনেক আগে থেকেই দুঃসাহসিকতার স্বপ্ন দেখছে; তাকে সঙ্গে নিতে লাগ্রাঁজকে রাজি করায়। ডায়েরিতে লুসিয় লিখেছে, 'পেঙ্গুইন পাখি দেখতে অনেকটা মিসতাঁগেতের মতো। টিনের খাবারে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। মোটামুটি ভালোই লাগছে, কিন্তু বড়ো একঘেয়ে।' বরেক

পাতা পরে আর একটা ছোট্ট লাইন : 'আজ সকাল চারটের সময় আঁরি মারা গেছে।' ঘায়ে পচ ধরে মারা যায় লাগ্রাঁজ, লুসিয়'র কোলে মাথা রেখে।

পারীতে ফিরে আসার পর আবার আগের মতোই দিন কাটানো। স্যু-রিয়ালিস্টদের প্রদর্শনী ও বৈঠকে নিয়মিত যাতায়াত। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের গল্পগুজবের মাঝখানে প্রায়ই চুপ করে বসে থাকত। মৃত্যু-আবিষ্ট হয়ে উঠেছিল সে।

এই মনোভাবের ভেতরে তার প্রথম উপন্যাস "মুখোমুখি"র জন্ম। অসম্ভব সমাদর পেল বইখানা। লেখার ধরনটা গমগমে আর এলোমেলো, ভাষায় চটুল চটক আর জায়গায় জায়গায় সত্যিকারের অনুভূতির বান-ডাকানো ঔজ্জ্বল্য। একটি লোকের মৃত্যু-কাহিনীর ওপর এই উপন্যাস—লোকটি পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি ভালবাসত অঙককে আর তার চার বছরের মেয়েকে; বরফের দেশে সে মারা যায়। ঔপন্যাসিক হিসেবে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল লুসিয়'। ভবিষ্যৎ প্ল্যান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে লুসিয়' বলল, পারিবারিক জীবনের ভাঙনের ওপর সে একটা বড়ো উপন্যাস লিখছে। আসলে সে কিছুই লিখছিল না, নিঙড়ানো লেবুর মতো মনে হচ্ছিল নিজেকে।

তারপর কয়েক বছর কাটল। লুসিয়' যে এক সময় লেখক ছিল সে-কথা ভুলে যেতে আরম্ভ করল সকলে। গোড়ার দিকে পল তেসাও বিশ্বাস করেছিল যে তার ছেলে বড়ো সাহিত্যিক হবে। কিন্তু তার মুখেও আবার লুসিয়'র কুঁড়েমি ও খরচে স্বভাবের জন্যে অনুযোগ শোনা যেতে লাগল। খরচ না করে লুসিয়' থাকতে পারে না, হাজার হাজার ফ্রাঁ দেখতে দেখতে উড়িয়ে দিতে পারে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে সব রেস্তোরাঁয় সে যাতায়াত করে সেগুলো বাইরে থেকে অতি সাধারণ, কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যাবে সবকিছুর দাম খুব বেশি। পানীয়ের তালিকায় যা সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য; তাই দিয়ে সে আপ্যায়িত করে বন্ধুদের এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'এই সামান্য একটু পানীয়।' যে সব মেয়েকে তার ভাল লাগে তাদের দামী উপহার দেয়। চড়া বাজি রেখে তাস খেলা তার কাছে দারুণ নেশা। পারীর প্রত্যেকটি জুয়োর আড্ডায় লুসিয়'র ফ্যাকাশে সুন্দর মুখ আর লালচে চুল খুবই চোখে পড়ে। এক রাত্তিরে কুড়ি হাজার বা ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ বাজি হেরেও হাসতে পারে সে। তার ফল হয় এই যে, শেষ পর্যন্ত সুদখোরদের কাছে হাত পাততে হয় তাকে, একজনের কাছে ধার নিয়ে আর একজনের ধার শোধ দিতে হয়। জীবনটা আবার কেমন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। সেই রকম একঘেয়েমি যা অসহ্য মনে হওয়াতে চার বছর আগে সে দক্ষিণমেরু গিয়েছিল, কিন্তু গিয়েও পার পায়নি, প্রাচীনা অভিনেত্রীর মতো দেখতে পেঙ্গুইন পাখি আর টিনের খাবারের বাসি স্বাদ সেই এক-ঘেয়েমিকে আবার জোরালো ভাবে ফিরিয়ে এনেছিল।

গ্রীষ্মকালে একদল টুরিস্টের সঙ্গে সে সোবিয়েত ইউনিয়নে গেল। ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক—একজন বন্ধুর সঙ্গে মিশরে যাওয়া ঠিক ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। এক সপ্তাহ থেকেছিল সে মস্কোতে। অন্য সবার মতো সেও ঘুরে-বেড়িয়ে কাটাল সময়টা। মস্কোর যাদুঘর, শিশুদের নার্সারি, পুরোকালের প্রাচীন স্মৃতি—যেমন সবাই দেখে দেখল। লুসিয়' কিন্তু এসবের ভেতর নতুন কিছু পেল না। সে মুগ্ধ হল সোবিয়েত জনসাধারণের প্রবল ইচ্ছা-শক্তি ও মানসগত যৌবন দেখে। একদিন ভূগর্ভ-রেলপথ তৈরির কাজে ব্যস্ত একদল শ্রমিকের ভেতর একটি মেয়ের ওপর চোখ পড়ে। মেয়েটির পায়ে ভারী বুট, মুখখানা রোগা আর ফ্যাকাশে, কিন্তু দুই চোখের দৃষ্টিতে জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞা; হঠাৎ লুসিয়' অনুভব করল—শুধু রেলপথ তৈরি নয়, তার চেয়েও

বৃহত্তর কিছু করছে মেয়েটি। মনের মধ্যে একটা উদ্দীপনা এল—যেমন এসেছিল লাগ্রাঁজের মৃত্যুর পর। নতুন মানুষ হয়ে প্যারী ফিরল সে।

তারপর লোত্রেয়াম ছেড়ে মার্কস ধরে। এই প্রথম সে আশেপাশের লোকগুলোর দিকে ভাল করে তাকায়। দেখে, সর্বত্র মিথ্যাচার, ভণ্ডামি আর বিতৃষ্ণা; তার ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই উপলব্ধি নিয়ে একটা পুস্তিকা লেখে; ভাসা-ভাসা বক্তব্য আর ব্যঙ্গোক্তির ভেতর দিয়ে বুর্জোয়া দর্শন, নীতি ও সৌন্দর্যবোধকে বিদ্রূপ। লুসিয়র কমিউনিস্ট মতবাদে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তেসা ভয় দেখায় যে ছেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু 'মেজোঁ দ্য কুলতুর'-এর তরুণদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, আসন্ন বিপ্লবের ওপর লুসিয়র বক্তৃতা তারা উৎসাহের সঙ্গে শোনে। জুয়ো-খেলা পর্যন্ত ভুলে যায় লুসিয়—এখনকার এ খেলা তার কাছে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়েছিল।

মাস ছয়েকের মধ্যেই লুসিয়র মনে সন্দেহ জাগে। কমিউনিস্টদের দেখে মনে হতে থাকে, একটা সাধারণ রাজনৈতিক দল ছাড়া আর কিছু নয় ওরা। পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ওরাও ভালবাসে, মোরিস শেভালিএর রোমান্টিক গানগুলো গুন গুন করে গাইতেও শোনা যায় ওদের। লুসিয়র ধারণা, সাহসে আর চালাকিতে তার জুড়ি কেউ নেই; মনে মনে সে বলে, 'আর একবার বোকা বনলাম আমি। এই চালেই হয়তো বাজি-মাত হবে, কিন্তু আমার জন্যে এ চাল নয়!'

লুসিয়র জীবনে পরবর্তী ঘটনা জেনেতের সঙ্গে প্রেম। নিজের অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেখবার অভ্যেস লুসিয়র নেই। কিন্তু জেনেতের সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলল বন্ধুবান্ধবের কাছে। আশা ছিল, প্রেমকে খাটো করবে বিদ্রূপ করে। কিন্তু এত সহজে প্রেম হার মানে না, জেনেতের নাম উচ্চারণ করতে গেলেই নিজের গলার স্বরে ধরা পড়ে যায়।

লুসিয় ও জেনেতের প্রকৃতি একেবারেই আলাদা, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় দুজনের অনেক মিল আছে। পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছে দুজনেই। জেনেতের বয়স তিরিশ, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেকে বুড়ী বলে মনে হয়। লিয়র একজন সলিসিটরের মেয়ে সে। শহরের একঘেয়ে ভণ্ডামির পরিবেশ আর বাপ-মার উগ্রতা ও সংকীর্ণতা তার শৈশবকে চেপে ধরেছিল চারদিক থেকে। টাকা ছাড়া আর কোনো চিন্তা ছিল না বাবা-মার। কি করলে টাকাপয়সার বাজে খরচ বন্ধ হয়, ঠিকমতো বিয়ে হওয়া কতখানি দরকার, বাড়ির বৌরা কি ভাবে আড়ালে দু-হাতে টাকা ওড়ায়, পর-পুরুষের সঙ্গে ঢলা-ঢলি করে বা ('জেনেৎ, বাইরে যাও তো') অসতী হয়—এই ছিল সকাল-সন্ধ্যে তাঁদের আলোচনা। আর একটি রোগামতো লোকের কথা তার মনে আছে—বাবা-মার খুবই শ্রদ্ধা ছিল এই লোকটির ওপর। বিরাট এক কারখানার মালিক লোকটি, চোখের মণিতে সাদা দাগ, শিকারী-বন্দুকের গুলিতে বৌয়ের ভালোবাসার লোককে খুন করেছিল কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকার দরুণ বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। বিচারে প্রমাণ হয় যে মৃত লোকটি সিঁদেল চোর, চুরি করার মতলবে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল। বাড়িতে আসবাব-গুলোর ঢাকনা সারা বছরে একবারও খোলা হত না। জেনেতের মা সব সময়ে তটস্থ হয়ে থাকতেন, এই বুঝি স্বামীর অসাবধানে মদের ফোঁটা পড়ে পরিষ্কার টেবিলক্লথগুলোতে দাগ ধরে যায়।

জেনেতের জীবনে প্রথম পুরুষ এসেছিল আঠারো বছর বয়সে। লোকটি ডাক্তার,

বিবাহিত। জেনেতের বেবার হাম হয়, এই ডাক্তারের চিকিৎসায় ছিল সে। আসলে জেনেৎ ডাক্তারকে ভালবাসেনি। ডাক্তার সম্বন্ধে তার মনে গভীর একটা অবজ্ঞা ছিল। এই নোংরা যোগাযোগের কথা জেনেতের বাবার কাছে গোপন থাকেনি। 'তোর উপযুক্ত জায়গা বেশ্যালয়ে' এই কথা বলে দূর করে দিয়েছিলেন মেয়েকে। ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পারী যাবার জন্যে চারশো ফ্রাঁ দিয়েছিল জেনেৎকে। সেদিন রাতে ট্রেনে বসে নিজেকে জেনেৎ বারবার এই প্রশ্ন করেছে, 'কেন আমি একাজ করলাম?' কিন্তু জবাব পায়নি। চেহারার দিক থেকে ডাক্তার এমন কিছু কন্দর্পকান্তি নয়। প্রকাণ্ড কণ্ঠমণি লোকটার, নোংরা গল্প লেগেই আছে মুখে সব সময়ে। তবুও যে সে সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছিল তার কারণ হয়তো এই যে সেদিন একনাগারে তিন ঘণ্টা তার মা চাকরকে এই বলে ধমকেছিল : 'বাজার থেকে যা কিনে এনেছিস, ওগুলো কি মাংস নাকি, ও তো শুধু হাড়।'

একটি বিভাগীয় দোকানে দোকান-কর্মচারীর কাজ পেল জেনেৎ। সকালবেলা যখন সে কাজে আসত, তার চোখের চারপাশে কালো দাগ দেখে অন্য মেয়েরা বলাবলি করত, উচ্ছৃংখল জীবন কাটাচ্ছে সে। আসলে কিন্তু সে অবসর সময়টুকুতে রাত জেগে বই পড়ত। প্রথমে আধুনিক লেখকদের বই সে ধরেছিল—আশা ছিল, নিজের সম্পর্কে যা সে জানতে চায় তার জবাব খুঁজে পাবে এইসব লেখার মধ্যে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সে স্তাঁদল, দস্তয়েভ্স্কি ও শেক্স্পিয়রের অনুরাগী হয়ে ওঠে। যে জীবনপ্রবাহ এতদিন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে মনে হত, এখন তা তাৎপর্য ও নাটকীয়তা মণ্ডিত ঘটনা হিসেবে ধরা দেয়। এতদিন সে বুঝতে পারত না, মানুষের মন কেন ছোট হয়, মানুষ কেন গা-ছাড়া ব্যবহার করে; বুঝতে পারত না বলে বরদাস্ত করতে পারত না; কিন্তু এখন এসবের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও সুকঠোর শৃংখলা খুঁজে পায়। তার সাংসারিক অভিজ্ঞতা খুবই কম, লোকের সংগে মিশতে সে ভালবাসে না; কিন্তু এই মহৎ শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে বহু বিষয়ে আরো গভীর উপলব্ধি ও জীবনের প্রতি আরো পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে সে।

নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার যতোখানি ভাবনা-চিন্তা ছিল, শিল্প বা সাহিত্য সম্পর্কে তা ছিল না। বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকুক বা গ্যালারিতে এসে বসুক—সব সময়ে তার সারা মন জুড়ে এই এক চিন্তা ; এ ছাড়া সে বাঁচতে পারত না। দোকানে খদ্দের না থাকলে চাপা ফিসফিসে গলায় অভিনয় শুরু করে দিত; নিজেকে কল্পনা করত রাসিনের নায়িকা বা স্বপ্নের ঘোর-লাগা বোকা-বোকা গাঁয়ের মেয়ের ভূমিকায়।

যে রেস্তোরাঁয় সে খেত, সেখানে ফিজে নামে একজন মাঝবয়সী অভিনেতার সংগে তার আলাপ হল। কিছুদিন পর একসংগে থাকতে শুরু করল দুজনে। দুজনের মধ্যে কিছুমাত্র ভালোবাসা ছিল না, শুধু একটা বিষয়ে মিল ছিল যে দুজনেই অসুখী ও নিঃসংগ। জেনেতের চেহারা দেখে ফিজে আকৃষ্ট হয়েছিল। জেনেতের চেহারার মধ্যেই এমন একটা টান আছে যে যেখানেই সে যায় সকলের চোখ পড়ে তার ওপরে। শান্ত মুখের ওপর দুটো বড়ো বড়ো বন্য চোখ দেখে যে কেউ ভাবতে পারে যে তাকে নিশিতে পেয়েছে। তাকে দেখে মনে হয় যেন সে এইমাত্র একটা দারুণ দুর্ঘটনার খবর পেয়েছে বা প্রেমের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছে বা এমন একটা আনন্দের মধ্যে রয়েছে যা মানুষের জীবনে মাত্র একবারই আসে। ফিজের আরো ভালো লেগেছিল এজন্যে যে মেয়েটি তাকে যত্ন করে। পাগলী মেয়েটার মনটা কিন্তু বড়ো নরম। জেনেতের বাবার বয়সী হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠাহীন, খুঁতখুঁতে ও এলোমেলো স্বভাবের অভিনেতাটিকে শিশুর মতো দেখাশোনা

করত জেনেৎ। লোকটিকে সে ভালবাসত না। কিন্তু একথাও কোনোদিন তার মনে হয়নি যে কাউকে সে সত্যিই ভালবাসতে পারে। উপন্যাস বা নাটকের জীবনের সংগে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে কোনোদিন সে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেনি। করেনি বলেই রাসিনের নায়িকা বাস্তব জগতে নিশ্চিত মনে ছেঁড়া মোজায় রিপু করেছে। মাসকয়েক পরে সে দোকানের চাকরি ছেড়ে দেয়, 'জিম্‌নাসে' থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসেবে ঢোকবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল ফিজে। ছোট ছোট ভূমিকায় সে নামত— হঠাৎ-ভয়-পাওয়া ঝি, গাঁয়ের বোকা মেয়ে বা এই ধরনের ছোটখাটো চরিত্র। বড়ো অভিনেত্রী হবার উচ্চাশা তার ছিল না। থিয়েটারের আবহাওয়ায় সে আনন্দ পেত আর জীবনের এই পরিবর্তনটুকুর জন্যে ফিজের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল।

এক বছর পর ফিজে তাকে ছেড়ে যায়। একজন নাম-করা গায়িকা-অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছিল ফিজে। জেনেতের কাছে কথাটা খুলে বলবার আগে মন ঠিক করতেই অনেক সময় লাগে। তার ভয় ছিল, একথা শুনে ঈর্ষা, অভিমান, আর চোখের জলে তুমুল একটা কাণ্ড করবে জেনেৎ। কিন্তু এমন একটা গা-ছাড়া ভাব নিয়ে জেনেৎ তার কথা শোনে যে রীতিমতো আহত স্বরে সে বলে ওঠে, 'আমার বিশ্বাসই হয় না তুমি আমাকে কোনোদিন ভালবেসেছিলে!' জেনেৎ স্বীকার করে, সে কোনোদিন ভালবেসেছে একথা সে নিজেও মনে করে না।

মারেশাল নামে 'মেজোঁ দ্য কুল্‌তুর'-এর একজন পরিচালকের খেয়াল হয়েছিল, একটা 'বিপ্লবী নাট্য সম্প্রদায়' গড়ে তুলবে। এই উদ্দেশ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পেশাদার অভিনেতারা কেউ যোগ দিতে চায় না; তাদের ভয় ছিল যে গোটা পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাবে। একদিন মঞ্চের সিঁড়িতে জেনেতের সংগে দেখা মারেশালের, দেখেই বুঝতে পারে যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে মেয়েটির মধ্যে। জেনেৎকে ডেকে পাঠিয়ে সে বোঝাতে চেষ্টা করে যে বিয়োগান্ত-নাটকের নায়িকা হবার সমস্ত গুণ তার মধ্যে আছে। বার বার বলে, 'কী চোখ! কী গলা! আপনি যদি শুধু নিজের গলাটা শুনতে পেতেন!' মারেশাল ঠিক করেছিল, 'নিস্ফল বসন্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ করবে। এই নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার প্রস্তাব করে জেনেতের কাছে। প্রথম কয়েকটা রিহার্শালের সময় জেনেতের অভিনয়ের আশ্চর্য সাদাসিদে ভাব আর আবেগ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সকলে। কিন্তু জেনেতের এমনই কপাল, ঠিক এই সময়েই কিনা নামডাকওয়ালা অভিনেত্রী জাভোগ-এর সংগে 'ওদেয়'-এর ম্যানেজারের ঝগড়া বাধে আর 'ওদেয়'-এর ম্যানেজারকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্যে রাগে ফুলতে ফুলতে জাভোগ ছুটে আসে মারশালের কাছে। জাভোগ একেবারেই দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রী, কিন্তু তার নামডাকের জন্যে প্রচারের দিক থেকে খানিকটা নিশ্চয়তা ছিল। জেনেতের যে-ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল সেটি তাকে দেওয়া হয়। এই বিপর্যয়কে নিঃশব্দে মেনে নেয় জেনেৎ এবং ছোট একটি চরিত্রে অভিনয় করতে সংগে সংগে রাজি হয়ে যায়। প্রথম রাতের অভিনয়ের পর নিজের ছোট ঘরটিতে ফিরে এসে অভিনয়ের ভংগিতে অনেকক্ষণ সে কথা বলেছিল, সেই সব কথা যা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলার সুযোগ সে পায়নি।

'বিপ্লবী নাট্য সম্প্রদায়' ভেঙে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। একটা টহলদারী দলের সংগে কিছুদিন ঘুরে বেড়ায় জেনেৎ, দুটো গ্রীষ্ম কাটে ফ্রান্সের গ্রামে গ্রামে। তারপর যখন শরীর ভেঙে পড়েছে, দু বেলা খাবার জোটে না এমনি অবস্থা, 'পোস্ট পারিসিয়েন' বেতারে একটা চাকরি জুটে যায়।

লুসিয়ঁ তাকে দেখেছিল 'বিপ্লবী নাট্য সম্প্রদায়'-এর রিহার্শালে। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমে পড়েছিল। ঘটনাটা ঘটে লুসিয়ঁর জীবনের সেই পর্বে যখন সে নিজেকে পুরোপুরি বিপ্লবী মনে করে। 'নিষ্ফল বসন্তের' কথাগুলোকে শোনায় যেন উত্তেজিত প্যারীর উন্মাদনাময় প্রকাশ। জেনেতের গলার স্বর সেই সব কথায় এমন একটা পরিপূর্ণতা ও গাম্ভীর্য এনেছিল যা লুসিয়ঁ কোনো রাজনৈতিক বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে খুঁজে পায়নি।

লুসিয়ঁকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছিল জেনেৎ। উপন্যাসের নায়কের মতো কথা বলে এমনি একজন পুরুষের সঙ্গে এই তার প্রথম দেখা। লুসিয়ঁ যখন সমাজের নীচতার নিন্দে করত আর এই নীচতা মুছে দেবার জন্যে আসন্ন ঝড়ের কথা বলত তখন লুসিয়ঁর চুলের আগুন রঙ, ফ্যাকাশে মুখ আর খাপছাড়া অঙ্গভঙ্গি, সবকিছু মিশে একাকার হয়ে যেত জেনেতের মনে। লুসিয়ঁর প্রত্যেকটি কথা সে বিশ্বাস করত। লুসিয়ঁ যেদিন প্রেম নিবেদন করে সেদিন সে নিজেকে সমর্পণ করে লুসিয়ঁর কাছে। এই আত্ম-সমর্পণের কারণ লুসিয়ঁর প্রতি তার প্রেম যদিও বা না হয়, তবে অন্তত একটা মানসিক আবেগ তো বটেই।

হয়তো তার মনে প্রেমই জাগত, কিন্তু লুসিয়ঁ সব রকমে তা দমিয়ে দিল। তার কাছে এলেই লুসিয়ঁ কেমন কৃত্রিম ও বাচাল হয়ে উঠত। জেনেতের বয়স আর একটু বেশি হলে সে লুসিয়ঁর হামবড়ায় হেসে উঠতে পারত। দিনের পর দিন এই একই ধরনের কাহিনী শুনে তার মনে সন্দেহ জাগে, লুসিয়ঁ তাকে সত্যিই ভালবাসে কিনা। লুসিয়ঁ কিন্তু দিনের পর দিন জেনেতের আরও অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। জেনেৎ সম্পর্কে তার মনোভাব অত্যন্ত জটিল। জেনেৎকে সে ভালবেসেছে নিজস্ব ধরনে; সে ভালবাসা অনেকটা যেন ঘটনার সঙ্গে মনের সায় থাকার মতো—যেমন ভালোবাসে লিরিক কবিতাকে বা সমুদ্রের পাখিকে। তাকে যদি জেনেতের জন্যে মরতে বলা হয়, সে ইতস্তত করবে না। কিন্তু জেনেৎ যখন একবার অসুস্থ হয়ে তাকে সকাল পর্যন্ত থাকতে বলেছিল তখন সে নানা রকম ওজর-আপত্তি তোলে—বাড়িতে সকলে তার জন্যে অপেক্ষা করছে, বাড়ি না গেলে মা ভাববে, ইত্যাদি। আসলে সত্যি কথাটা এই—নিশ্চিন্ত আরামে রাতটুকু ঘুমোতে চেয়েছিল সে।

'ফিজের মত লুসিয়ঁও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে'—এই কথাটা বারবার ভেবেছে জেনেৎ। একথাও মনে হয়েছে, তার নিজেরই উচিৎ লুসিয়ঁকে ছেড়ে চলে যাওয়া। কিন্তু বড়ো বেশি ঢিলে স্বভাবের মেয়ে বলে একাজ কখনো তার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। জেনেতের মতো মেয়ের পক্ষে কোনো পুরুষকে ছেড়ে যেতে হলে নিজের চেষ্টায় কখনো সম্ভব হবে না, অন্য কারুর সাহায্য নিতে হবে। কিংবা হয়তো এখনো সে খানিকটা আশা রাখে, লুসিয়ঁকে নিয়ে সে সুখী হবে, নির্ঝঞ্ঝাট ও ধোঁয়াটে শান্তিতে ভরে উঠবে অন্য সব মেয়েদের মতো।

আঁদ্রে ও পিয়েরের সঙ্গে যেদিন জেনেতের প্রথম দেখা হয়েছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত লুসিয়ঁ জেনেতের সঙ্গে দেখা করেনি। জেনেৎকে টেলিফোনে ডাকে লুসিয়ঁ। জেনেৎ জানায়, তার শরীর ভালো নয়। কয়েক মিনিট পরে জেনেৎ আবার টেলিফোন করে বলে যে লুসিয়ঁর সঙ্গে তার দরকারী কথা আছে। টেলিফোনে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হল জেনেৎকে। সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁর মনে একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে ওঠে—'আঁদ্রে!' তখুনি সাবধান হয়ে যায়। জেনেৎকে বলে যে তার সঙ্গে সে স্টুডিওতে দেখা করবে, সেখান থেকে 'ফুকেৎ'-এ গিয়ে রাত্তিরবেলা খাবে দুজনে।

বাইরে যাবার ইচ্ছা নেই জেনেতের, বলে, তার শরীর ভালো নয়, শুধু কয়েকটা দরকারী

কথা বলার জন্যে লুসিয়'কে নিরিবিলি পেতে চায়। লুসিয়' তবুও জোর করতে থাকে। রোজ সন্ধ্যায় সাহিত্যিক ও অভিনেতারা জড়ো হয় 'ফুকেৎ'-এ, আর সবাই যখন ঈর্ষাভরা চোখে জেনেতের দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে মনে খুশি হয় লুসিয়'।

বইয়ের বিরূপ সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও লুসিয়'র মনটা আজ খুব ভালো, খোশ-মেজাজে শামুক আর মদ আনার হুকুম দেয়। জেনেৎ চুপ করে আছে। লুসিয়' বলে, তার বইয়ের কে কি সমালোচনা করেছে। 'অবিশ্বাসী মন—তাই মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করে সে।

কোন কথা বলে না জেনেৎ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কোনো একটা চিন্তায় সে একেবারে তন্ময়। লুসিয়' সচেতন হয়ে ওঠে। তার ওপর কমিউনিস্টদের অবিশ্বাস, জেনেতের ওপর চারিদিকের বহু পুরুষের প্রশংসাভরা চোখ—সব কিছু ভুলে যায়। জেগে ওঠে ঈর্ষা ও সন্দেহ। জেনেৎ নিশ্চয়ই আঁদ্রের প্রেমে পড়েছে। মনে মনে ঠিক করে, আজই এ-ব্যাপারের যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে।

সে বলে, 'আসছে সোমবার থেকে আঁদ্রের ছবির প্রদর্শনী শুরু হবে। ওর আঁকা ল্যান্ডস্কেপগুলো নাকি বেশ ভালো। চলো না প্রদর্শনী শুরু হবার আগে ঘরোয়াভাবে একবার দেখে আসি!'

'যেতে পারব মনে হচ্ছে না। ছবি দেখার মতো মনের অবস্থাই নেই।'

কথাগুলো জেনেৎ এত স্বাভাবিক ও এত আলগাভাবে বলে যে লুসিয়' একেবারে হতভম্ব। আঁদ্রের সঙ্গে তাহলে এ-ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই! তারপর এক বোতল শাব্লি খাবার পরে সমস্ত ভয় আর আশঙ্কা একেবারে মুছে গেল মন থেকে। তখন সে আবার পুরনো কথায় ফিরে আসে, যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে।

সে বলে, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সেদিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি 'লুমানিতে' পত্রিকায় কাজ করেন, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে। চিরাচরিত প্রথামতো রোদ্যাঁর 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামতো খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্না নিয়ে আদিখ্যেতা করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে। বড়োটি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সবটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এ-ধরনের লোক শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন...'

তর্ক করতে জেনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে অনেকবার বলেছি, আমিও বরাবর এ-কথাই ভেবেছি। সংসারই স্ত্রীলোকের পুরো সুখ। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করার সাহস নেই...পরিবার-পরিজন ছাড়া জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়'। সে জীবন বড়ো নিঃসঙ্গ, বড়ো ফ্যাকাশে!'

লুসিয়' বলে, 'সব সময়ে নয়। এটা পুরোপুরি নির্ভর করে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করতে বলা হয় তাহলে আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সেজন্যে আমি মরতেও পারি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়।

এ়কি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, শরীরটা ভালো লাগছে না, বড্ড মাথা ধরেছে। এক প্লাশ জল দিতে বল, অ্যাস্‌পিরিন্‌ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলে, 'সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।' জেনেৎ কোনো মন্তব্য করে না; তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

'ফুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজে থেকে ঢুকল একটা সরু আধা অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জেনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। দোকানের ঝলমলে জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজ আলোয় জেনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখায়।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জেনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

লুসিয়ঁর মনটা করুণায় ভরে ওঠে, ব্যথার মতো তীব্র করুণা।

'ডাক্তারের কাছে না গেলেও তো চলতে পারে?' আমতা আমতা করে বলে সে।

চড়া গলায় হেসে ওঠে জেনেৎ: 'থাক, তোমার যা বলার ছিল তা তো বলেছ। আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে আসে। তাই দেখে রেগে ওঠে জেনেৎ। গলার স্বরের কৃত্রিম ঝলমলে ভাবটুকু বজায় রেখে সে বলে, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোনো কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন টহলদারী দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্‌সি ডেকে থামায় সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলে, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোনো দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? চললাম!'

জেনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ি ফিরতে আঁদ্রে সঙ্গে নেই দেখে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনিনি। হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে।

বৃষ্টির পর 'প্লাস দ্য লা কঁকর্দ' রাষ্ট্র-ভবনের পালিশ করা মেঝের মতো ঝকঝক্‌ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে গাড়ির চাকার কমলা ও বেগুনী রঙের আঁকাবাঁকা পাকানো দাগ। উঁচু উঁচু আলোগুলো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছের মতো রাস্তার ধারে জ্বলছে। তুইয়েরি বাগান থেকে গন্ধ ভেসে আসছে ভিজে মাটির, গাছের আর বসন্তের। মস্ত এক আনন্দমেলার তোড়জোর চলেছে যেন, কিন্তু তবুও চারদিকে কেমন একটা অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার থমথমে ভাব। রঙ-মাখা একটা বুড়ী বেশ্যা দাঁড়িয়েছিল, লুসিয়ঁকে দেখে হাতছানি দেয়। জোরে পা চালায় লুসিয়ঁ। নদীর ধারে

এসে হঠাৎ থেমে যায়, ডাক্তারখানার বাইরে দেখা জেনেতের সেই চোখদুটো মনে পড়েছে। লাগ্রাঁজ যেদিন তাকে বলেছিল, 'মিছে তর্ক কোরো না, আমি জানি আমার ঘায়ে পচ্ ধরেছে—তখন তার চোখদুটোও ঠিক এই রকম হয়েছিল। জেনেতের কাছে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসে লুসিয়ঁ।

বালিশে মাথা গুঁজে কাঁদছে জেনেৎ। পাশেই পড়ে আছে পুতুলটা। জেনেৎ কাঁদছে, কারণ রীতিমত আঘাত পেয়েছে সে আজ ঃ এই বানানো গল্প কি করে বিশ্বাস করল লুসিয়ঁ ? তার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি নেই লুসিয়ঁর মনে, আজ সে একেবারে নিঃসংগ। অবশ্য এর চেয়েও আরো অনেক বড়ো ব্যথা রয়েছে তার শরীরের মধ্যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমনি ব্যথা, কিন্তু সেজন্যে তো তার কান্না আসছে না। ডাক্তারখানার বাইরে জেনেতের চোখ যে মড়ার মতো দেখিয়েছিল, যা দেখে ভয় পেয়েছিল লুসিয়ঁ —তা তো এজন্যেই।

আর আজই সকালে কিনা জেনেৎ সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল!

লুসিয়ঁ ঘরে ঢুকতেই সে চোখ মুছে উঠে বসে, পাউডারের তুলিটা মুখে বুলিয়ে নিয়ে বলে—

'জান লুসিয়ঁ, সব চেয়ে ভয়ংকর কথাটা এই যে আমি তোমাকে ভালবাসি না।'

এগারো

দেনিস ও মিশোর কাছে অধ্যাপক মালের বক্তৃতায় যে পুরনো ও ঘুন-ধরা শহরটির পুরাকীর্তি বর্ণনা করা হয়েছিল, এখন তার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। আগে যেখানে নিত্যকার দৃশ্য ছিল অভিজাত মহিলাদের ভারিক্কি চালে পরচর্চা, রোমান ক্যাথলিক পাদরিদের খোলা ধর্মপুস্তক হাতে শান্ত চলাফেরা, আর ছেলেমেয়েদের ঘুঁটি খেলা— এখন সেখানে দেখা যাবে, লোকে হাত পা ছুঁড়ে তর্ক করছে। 'পপুলার ফ্রণ্ট', 'ফ্যাসিবাদ', 'আইন ও শৃঙ্খলা', 'যুদ্ধ'—কথাগুলো শোনা যাচ্ছে চারদিকে। সম্ভ্রান্ত বয়স্থা বিধবার গালের মতো কুঁকড়ানো পুরনো দেওয়ালগুলো হঠাৎ একদিনে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রাচীরপত্রে ছেয়ে গেছে। প্রস্রাবখানার দেওয়ালে বিজ্ঞাপন এঁটে বিভিন্ন প্রার্থীরা একে অপরের নামে কুৎসা রটিয়েছে, আর তা পড়ার জন্যে ভিড় জমে আছে সারাদিন। পুরনো গির্জাগুলোর অলিন্দে লম্বামুখ ঋষি-মূর্তি পাপীজনকে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, আর তাদের পাথরের তৈরি আঙুলের ওপর চঞ্চল বাবুইপাখি বারবার উড়ে বসছে।

পোয়াটুরের ডেপুটি হবার সম্মান লাভের জন্যে আরো তিনজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে তেসার বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে দুজন চার বছর আগে গত নির্বাচনেও তেসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। একজন কমিউনিস্ট প্রার্থী দিদিএ; অপরজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল গ্রম্যাজো, যে নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে প্রচার করছে। তাকে দাঁড় করিয়েছে শহরের রক্ষণশীল দল, অভিজাত শ্রেণী আর পাদরিরা। গতবারে তেসা তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনায়াসে পরাজিত করেছিল। কিন্তু এবার সে জয়লাভ সম্পর্কে মোটেই নিশ্চিত নয়। অবশ্য দেসের তার

কথা রেখেছে। তেসার সমর্থনে প্রচন্ডভাবে লিখতে শুরু করেছে 'লা ভোয়া নুভেল্' এবং আর তিনটি স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যে দুটোই কিনে নিয়েছে র‍্যাডিকালরা। কমিউনিস্ট-দের প্রভাব বেড়েছে গত কয়েক বছরে। দিদিএ চটকদার বক্তা নয়, তবুও তার সভায় প্রচুর লোক জড়ো হয়। তার ওপর এবার আরো একজন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত। তার নাম দুগার, 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কৃষিতত্ত্ববিদ। লোকটি কর্মঠ ও উৎসাহী, বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচারকার্য চালাচ্ছে এবং 'পুঁজিপতি, তান্ত্রিক সম্প্রদায় ও ইহুদীদের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে' সচেতন করে তুলতে চাইছে প্রত্যেককে। দোকানদার, কারিগর ইত্যাদি বহু শ্রেণীর লোক উৎসাহের সঙ্গে তাকে বাহবা দিচ্ছে—কারণ একচেটিয়া ব্যবসাদারদের বাঁধা দরের জন্যে সাধারণ দোকানদাররা ক্ষতিগ্রস্ত, বড়ো বেশি কর দিতে হয় বলে কারিগররা অসন্তুষ্ট, চাকরিজীবীদের বদ্ধমূল ধারণা যে বিদেশীরা তাদের কোণঠাসা করছে, স্তাভিনস্কি-কলঙ্কের পর কোম্পানীর কাগজভোগীরা বিমূঢ় আর তেসা নিজেও এই ব্যাপারে জড়িত!

সভাগুলোতে প্রচন্ড গোলমাল। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামীকে কি রকম খোঁটা সইতে হয় সেটা তেসার জানা, এই সব সভায় বক্তৃতা দেবার সময় অনেকবারই মনে হয়েছে যে সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। খুব একটা ধূর্ততার সঙ্গে দুগার যেন কথায় কথায় স্তাভিনস্কির লেখা একটা বিশেষ চেকের কথা উল্লেখ করে। অসৎ উপায়ে পাওয়া সেই আশি হাজার ফ্রাঁ কি ভাবে খরচ হয়েছিল এখন আর তা মনে নেই তেসার। কালবিলম্ব না করে সেও টেবিলে প্রচন্ড ঘুসি মেরে গর্জে ওঠে, 'ওই টাকা যুদ্ধে পঙ্গু সৈন্যদের জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছিল।' গ্রম্যাজোঁ জোর দিয়েছে তেসার দুর্নীতির ওপর আর লুসিয়ঁর বই থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে, 'এই দেখুন, এই তরুণ লেখক নিজের বাবার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কি লিখছে।' তেসার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দিদিএ-র কোন কৌতূহল নেই, তার বক্তৃতার বিষয়—কি ভাবে ঘুষ দিয়ে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হয়, কি ভাবে 'দুশো পরিবার' সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু তেসা ধরে নিয়েছে, এই কমিউনিস্ট তালা-কারিগরের বক্তৃতা তারই ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ। দিদিএ-র বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের মন্তব্য তার এই সন্দেহকে আরো বদ্ধমূল করেছে। দিদিএ যখন বলে কি ভাবে সংবাদপত্রকে কিনে নেওয়া হয়, শ্রোতাদের মধ্যে অমনি চিৎকার ওঠে, 'লা ভোয়া নুভেল্।' দু-শো পরিবারকে যখন সে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে তখন তার বক্তৃতাকে চাপা দিয়ে আওয়াজ ওঠে, 'দেসের! দেসের!'

দাঁড়-টানা জাহাজের ক্রীতদাসের মতো পরিশ্রম করছে তেসা। হাজার হাজার ভোট-দাতার সঙ্গে রোজ কথা বলছে; প্রত্যেকের কাছে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে, বৌয়ের স্বাস্থ্য কেমন, ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করেছে কিনা, মেয়েদের কবে বিয়ে হবে। কথা দিয়েছে শহরে একটা পুল ও দুটো পার্ক তৈরি করে দেবে, শহরের লোকদের জন্যে অবসর-ভাতা, সম্মান-পদক ও সরকারী চাকরির ব্যবস্থা করবে। দলাদিএ ও এরিওর দলের লালচে নাকওলা লোকদের সঙ্গে বার-এ বসে 'রিপাবলিকের উদ্দেশে!' 'বিজয়ের জন্যে!' মদ খেয়েছে। সভায় সভায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছে, পুস্তিকা লিখেছে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট সম্পাদনা করেছে, ব্যঙ্গচরিত্রের পরিকল্পনা দিয়েছে। ষোলটা রাত সে প্রায় ঘুমোয়নি, ভোজসভায় খেয়ে খেয়ে হজমশক্তি নষ্ট করে ফেলেছে আর পোলেতের মিষ্টি মিষ্টি আদরের কথা ভুলে গেছে একেবারে। শহরের একটা বড়ো কাফের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, 'পল তেসার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষে দিন-রাত্রি খোলা।' এই

কাফেতে তেসা বহু উপহার বিলি করে তার সমর্থকদের ভেতর—কাউকে ঘড়ি, কাউকে ফাউণ্টেন পেন, কাউকে একশো ফ্রাঁ-র নোট। পারী থেকে সিনেটের দুজন সভ্যকে আনিয়েছে তার হয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে। স্থানীয় একজন গায়ক গান বেঁধেছে তেসার নামে—

কুঁদুলে আর খোসামুদেরা তফাৎ যাও,
মাঝামাঝি রাস্তাই ভালো আমাদের পক্ষে।
দু বেলার পেটভরা খাবার আর সুখী জীবনযাপন—
তেসার আমলে আর কোনো ভাবনা থাকবে না আমাদের।

তেসা তার সবচেয়ে বড়ো চাল হাতে রেখেছিল শেষ মুহূর্তে বাজিমাত করার জন্যে। মাদাম আঁতোয়ান নামে একটি বিধবার সরকারী-চাকুরে ছেলে তহবিল তছরুপের অভি-যোগে দশ বছর কারাদণ্ডের শাস্তি পায়। আসলে আঁতোয়ানের দোষ ছিল না এবং তেসার চেষ্টায় এই মামলার পুনর্বিচার হয়েছিল। বিরাট এক সভায় এই ঘটনা প্রকাশ করা হল, বিধবা আঁতোয়ান চোখের জল ফেলে রুদ্ধ গলায় বললেন, 'পল তেসা মহাপুরুষ!'

ভোট গণনা হবার দিন সন্ধ্যায় তেসার আর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই। উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার জন্যে লেবুফুলের চা খেতেও কষ্ট হচ্ছে। এই অসহ্য উদ্বেগ নিয়ে সে জানলার সামনে দাঁড়ালো। খোলা জায়গাটায় ঠাসাঠাসি লোক; ভোটের ফলাফল জানার জন্যে হাঁ করে অপেক্ষা করছে সবাই। একটি মেয়েকে দেখে দেনিসের আদল আসে বলে মনে হয়। কেমন একটা বিষন্নতা মনের মধ্যে ঢেউ তোলে। কেন সে এই নোংরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? দুগার বা পপুলার ফ্রণ্ট —যে খুশি জিতুক, কি যায় আসে তাতে? সবটাই তো ফাঁকা বুলি! এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল বাড়িতে বৌয়ের সঙ্গে থাকা, দেনিসকে দেখতে পাওয়া আর মাঝে মাঝে একছুটে গিয়ে সুন্দরী পোলেতের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসা। ওই তো জীবন! এসব বক্তৃতা আর শ্লোগান বড় বেশি একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর।

জনতাকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হল। নির্বাচনে একজন প্রার্থীরও সুস্পষ্ট ভোটাধিক্য হয়নি—এক সপ্তাহ পরে আবার নির্বাচন। গত নির্বাচনের তুলনায় তেসা প্রায় তিন হাজার কম ভোট পেয়েছে, গ্রম্যাজোঁরও কমেছে, কমিউনিস্টদের ভোট গতবারের তুলনায় বেশি। সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে দুগার।

লোকে আবার জল্পনা-কল্পনায় মেতে ওঠে। 'ক্রোয়া দ্য ফা'-র সমর্থনে জেনারেল যদি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায় তবে দুগারের জেতার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তেসার সমর্থনে দিদিএ কি সরে দাঁড়াবে? নরমপন্থীরা কাকে ভোট দেবে? কাফেগুলোতে বসে বসে লোকের হিসেব-নিকেশের আর শেষ নেই।

বিরক্তির সঙ্গে হাই তোলে তেসা। আশা ছিল, আজই যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে। কাল বাড়ি ফিরবে। এখন আরো একটা সপ্তাহ থাকতে হবে এই শহরে। স্ত্রীর কাছে সে একটা টেলিগ্রাম পাঠায় : 'আবার ভোট হবে। বুধবার একটায় পোঁছব। তোমাকে, দেনিসকে আর লুসিয়কে ভালবাসা।' সামনের এক সপ্তাহ আবার সেই যন্ত্রণা। কমিউ-নিস্টরা যদি তার পক্ষে ভোট দিতে রাজি হয়, তাহলেও কিছু হবে না, ছ-হাজার করে ভাগ হয়ে দু পক্ষে আবার সেই সমান ভোট হবে। সবই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। আর কমিউনিস্টরা তাকে সমর্থন করবে কিনা সে-বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। কমিউনিস্টরা তেসাকে রীতিমতো ঘৃণা করে।

সেদিন বিকালে একটা সভা ডাকা হয়। র‍্যাডিকালরা কমিউনিস্টদের ডেকে পাঠায় সেই সভায়। দিদিএ কি বলবে শোনার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে সবাই।

তেসা নিজেই বক্তৃতা দিয়ে সভার কাজ শুরু করে। বলে, 'বন্ধুগণ, আপনারা আমার প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। আমি আপনাদের প্রত্যেককে ডাক দিচ্ছি—রিপাব্লিকের উন্নতি যাঁরা চান, শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের যাঁরা পক্ষপাতী, পাদরিশাসনকে যাঁরা বাধা দিতে চান—তাঁরা আমাকে ভোট দিন। আমাকেই একমাত্র প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছে—' এক মুহূর্ত থেমে ফেটে পড়ে সে, 'পপুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে।'

দিদিএ তার বক্তৃতায় বলে, 'কমিউনিস্ট পার্টি কাউকে ঘুষ দেয় না বা ছলনায় ভোলায় না। তাদের আবেদন যুক্তি ও বিবেকের কাছে। গত নির্বাচনে আমরা ছ-শো ভোট পেয়েছিলাম, এবার পেয়েছি দু হাজার তিন শো সত্তর। এ থেকে বোঝা যাবে আমাদের শক্তি কি ভাবে বাড়ছে। এখন আমাদের দুগার ও গ্রম্যাজোঁ আর ফ্যাশিস্টদের যে করে হোক বাধা দিতে হবে। তেসা পপুলার ফ্রন্টের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। ফ্রান্সের আজ বড়ো দুঃসময়। বাইরে থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে আর দেশের ভেতরে বিশ্বাসঘাতকরা রয়েছে। এই রকমই হয়। শুআঁরা ইংরেজ বা অস্ট্রীয়ানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, প্রুসিয়ানরাও ভের্সাইএর জন্যে দায়ী। এই সময়ে ফ্রান্সকে বাঁচাতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে ওঠে।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ—দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। একদিনের ভুঁইফোঁড় যতো সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজি হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড়ো রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে জানে! একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি? ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশি পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! মতলব কি ওর! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সে, পল তেসা—সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে!

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলে, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতেইকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক। তার সঙ্গে ব্রতেই-এর দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গেই তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ব্রতেই-এর সঙ্গেও তার সদ্ভাব। অন্য যে কোনো সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর

ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে ব্রুর্ব-তে তার আসনে দুগারের মতো একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈই না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈইকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একরোখা, উগ্রচণ্ডী স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ পর্যন্ত না করে ছাড়ে না। ঝানু খেলোয়াড়ের মতো চেহারা—ছ ফুটের ওপর লম্বা শরীর, ঋজু শিরদাঁড়া। রোদে পোড়া লালচে মুখ, পাকা চুল আর ছাঁটা গোঁফ। গত যুদ্ধে আহত হয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল উড়ে গেছে, আর কি করে যেন এই অঙ্গহানির একটা প্রতিফলন রয়ে গেছে মুখচোখের ভাবে। কাটা কাটা কথা, হুকুম দেওয়ার ভঙ্গিতে শব্দগুলোকে ছুঁড়ে মারে। কোনো কমিউনিস্ট বক্তৃতা দিতে উঠলেই সভা-গৃহ থেকে সে বেরিয়ে যায়। বলে, এই লোকগুলোর কথা সে সহ্য করতে পারে না। কোনো কোম্পানীর অংশীদার নয় সে, ফাটকা-বাজারের ধার ধারে না, অত্যন্ত সাদাসিধে তার চালচলন। নিজের উপার্জনের একটা অংশ সে খরচ করে প্রচার-কাজে। তরুণদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা তার একটা বাতিকের মতো; এজন্যে অনেক ফৌজী দল গড়েছে, সার বাঁধিয়ে কুচকাওয়াজ করিয়েছে ছেলেদের, আর জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা দিয়েছে শত্রুদের, জাতীয় রক্ষীদলের, আর সামরিক বাহিনীর। মায়ের আদুরে-গোপালদের ঘর থেকে বার করে এনে ঝড়-বৃষ্টির ভেতর মার্চ করিয়েছে, সামরিক শৃঙ্খলায় শিক্ষিত করে তুলেছে। একটি কুরূপা ও গরীব স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে শেষ বয়সে। পাঁচ বছরের খয়াটে খামখেয়ালী ছেলেটাকে আদর করে কূল পায় না। বোধ হয় এটাই তার একমাত্র দুর্বলতা।

কি বলবে, বুঝতে না পেরে তেসা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্রতৈই।

'কেমন আছ, পল? দেখে মনে হচ্ছে শরীরটা ভালো নয়। খুব ক্লান্ত, না?'

'খুব। কিন্তু এখানে কি মনে করে? অন্য কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'না। আমি পারী থেকে সোজা আসছি। তুমি জান বোধ হয়, এই দুগার আমার ছাত্র। বয়স অল্প হলে কি হবে, বুদ্ধি আছে। ওকে এখন একটু উৎসাহ দেওয়া দরকার।'

তেসা খেপে ওঠে। তাহলে ব্রতৈই এসেছে দুগারকে সাহায্য করতে। যাকগে, ওর ব্যাপার ওই বুঝবে। কিন্তু তেসার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা ওর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। বিশেষ করে তার ক্লান্ত শরীরের জন্যে সহানুভূতি দেখানো তো বোকামির পরিচয়।

তেসা বলে, 'আমাকে মাপ করো, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, শুয়ে পড়ব।'

'একটু সবুর করো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। কিন্তু এখানে সেটা হবে না। চল, তোমার ঘরে যাই।'

নিজের ঘরে ঢুকে টাই-জুতো খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে তেসা। ব্রতৈই দরজায় টোকা দিতে তেসা ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলে, 'আমার মনে হয়, এসব কথা পরে বলাই ভালো। এখন আমি ভয়ানক ক্লান্ত। নির্বাচনের পরে—'

ঘরের ভেতর ঢুকে বাধা দিয়ে ব্রতৈই বলে, 'তখন আর এ প্রশ্ন উঠবেই না। আমি জানি তুমি ক্লান্ত, কিন্তু আমি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেব না। যা হোক একটা সিদ্ধান্তে পোঁছতে হবে আমাদের। তুমি নিজেও জান, দুগারের জেতার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে, পাঁচ-ছ'-শো ভোটে জেতাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমি চাই না যে—'

'কি চাও না?' তেসা বলে।

'আমি তোমাকে নির্বাচিত করতে চাই। দ্যগার বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু ও তো আমাদের হাতেই রয়েছে। চেম্বারে ঢুকে ও বিশেষ কিছু করতে পারবে না। তোমার সঙ্গে ওর তুলনাই হয় না। তুমি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে তোমার, চমৎকার বক্তৃতা দিতে পার। তার ওপর তোমার নাম আছে। তুমি যদি হেরে যাও তাহলে সেটা দেশের দুর্ভাগ্য।'

তেসা বলে, 'শোন লুই, তোমার মতলবটা আমি ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। হঠাৎ এত প্রশংসা? তুমি তো দ্যগারের সমর্থক, আর ওই দ্যগার তো তিন সন্ধ্যে আমার গায়ে কাদা ছিটোচ্ছে।'

'আরে ওসব কথায় কান দিও না, নির্বাচনের সময় ওরকম কত কি বলে লোকে, ওসব কথা ছেড়ে দাও। পপুলার ফ্রন্টকে তো তুমি দারুণ মাথায় তুলেছ, না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে আর বলতে হবে না, আমি কি আর জানি না কমিউনিস্টদের তুমি কি মনে কর। কমিউনিস্টদের ওপর প্রেম কার বেশি, তোমার না আমার—এ বিচার ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল। এখন আমার কথাটা শোন পল, আমি চাই যে তুমিই এখান থেকে নির্বাচিত হও। তোমাকে পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক বলে ভাবতে দাও লোককে, তাতে কিছু যাবে আসবে না। মানুষটাই আসল কথা, ছাপটা কিছু নয়। শুধু তুমি স্বীকার করলেই হয়...'

'এক ঘণ্টা আগে বক্তৃতায় আমি পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়ে এসেছি।'

'বক্তৃতায় তুমি কি বলো আর না বলো সে প্রশ্ন উঠছে না। আমার কথাটা আবার বলছি—তোমার মুখের একটা স্বীকৃতি ছাড়া আমরা আর কিছু চাই না। আমি তোমার কাছে বাজে কথা বলতে আসিনি, আমার কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পার। আর পল, এটা তুমি নিশ্চয়ই বোঝ, দলাদলির সময় এখন নয়। দেশকে বাঁচাতে হবে! বেশ, এই কথা রইল, দ্যগার সরে দাঁড়াবে। অবশ্য, তোমার সমর্থনে কিছু বলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ওর সরে দাঁড়ানোটাই যথেষ্ট। আরো দু-তিন হাজার ভোট তোমার পক্ষে যাবে।'

'কিন্তু দ্যগারের সমর্থকরা আমার চেয়ে গ্রম্যাজোঁকে বেশি পছন্দ করবে।' তেসা বলে।

'কে? ওই বুড়ো জেনারেল? আমি ওকে ভালো করে জানি। একটু বোকা, কিন্তু ভদ্দর লোক। ওর সঙ্গে আমি কাল কথা বলে দেখব। আচ্ছা বেশ, আমি কথা দিচ্ছি, গ্রম্যাজোঁ সরে দাঁড়াবে। তারপর তুমিই একমাত্র প্রার্থী। ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্যে যে একতা দরকার, তার প্রতীক হবে তুমি!'

প্রস্তাবটা এত লোভনীয় আর সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আচমকা ঘটেছে যে তেসা বিড়বিড় করে খাপছাড়া কথা বলতে শুরু করল, 'প্রতীক! তুমি তো প্যারী থেকে সোজা আসছ, না? ওখানে কি গরম? এ গরম আমার সহ্য হচ্ছে না...'

ব্রতেই নির্বাক। আর তেসার ভাবনাগুলো কেমন অস্পষ্ট আর এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ঘোলাটে জলে মাছের ঝাঁকের মতো। শুধু একটা কথা সে স্পষ্টভাবে বুঝেছে—আবার সে ডেপুটি হবে। এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেয়ে ভিজে তোয়ালেটা কপালের ওপর বুলিয়ে নেয়, আস্তে আস্তে তার চেতনা ফিরে আসে, মনে মনে বলে, 'ফ্রান্সের বড় বিপদ। শত্রুরা ওঁৎ পেতে রয়েছে...দেশের ভেতরে বিশ্বাসঘাতকতা। জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হব

আমি। মানুষটাই আসল কথা, দলের ছাপটা কিছু নয়!' সে বুঝতেও পারে না যে একই মুখে সে একবার ব্রতেইর আর একবার দিদিএ-র কথা বলছে। শিশুকে কোনো আশ্চর্য খেলনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে যেমন হয়, তেমনি হয়ে উঠেছে তেসা। আমতা আমতা করে বলে, 'আচ্ছা শোন, আমাকে কি বলতে হবে?'

'শুধু একটিমাত্র কথা—তুমি রাজি।'

'হুঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর তাছাড়া, না বলার অধিকারও আমার নেই।'

তেসার হাতের ওপর জোরে চাপ দিয়ে ব্রতেই বলে, 'আমি জানি তুমি মানুষটা খাঁটি। আচ্ছা এবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও। চললাম।'

পরদিন অনেক দেরিতে তেসার ঘুম ভাঙল। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকেছে ঘরের ভেতর, সবুজ ভেলভেটের আর্মচেয়ারগুলোকে মনে হচ্ছে যেন ঘাসে ঢাকা টুকরো টুকরো জমি। হোটেলের বাইরে চোখ পড়তেই সদ্য সেঁটে দেওয়া একটা প্রাচীরপত্র চোখে পড়ে : 'জাক্ দুগার তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করে প্রার্থী হিসেবে নাম প্রত্যাহার করছেন। ফ্রান্স জিন্দাবাদ!' তেসা না হেসে থাকতে পারে না। এমন কি, একটি তরুণী ফুলওয়ালীর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল। মেয়েটির দিকে তাকাতেই মনে পড়ে পোলেতের অঙ্গসৌষ্ঠব। জীবনকে সুন্দর মনে হচ্ছে আবার। এই বিশেষ সকালটিতে ভালো লাগছে সব কিছু—রোমান গির্জা, দোকানের জানলায় সাজানো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, বাজারের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। সবাইকে চুমু খেয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছে। সত্যি, দুগার চমৎকার লোক। ওকে লাঞ্চ খেতে ডাকলে মন্দ হয় না, একসঙ্গে বসে একটু গল্পগুজব আর দু-একটা ঠাট্টা মশকরা জমানো যাবে। তেসার কোন জমিদারী নেই বলে দুঃখ হল, থাকলে দুগারকে নিশ্চয়ই একটা চাকরি দিত। আর দিদিএ লোকটাও ভারি ভদ্র—ঠিক সেই চিরকেলে নরম মন আর গোঁফওলা তালা-কারিগর। ওর মতো লোকেই তালা সারাতে পারবে। দলের ছাপে কি আসে যায়, মানুষটাই আসল কথা! প্রত্যেকটি প্রাচীরপত্র খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করে তেসা। নতুন ঘোষণাটা সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। গাড়ি থেকে নেমে একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার চেঁচিয়ে পড়ে লেখাটা, তারপর থুতু ফেলে বলে, 'শালা জোচ্চোর!' মন্তব্যটা শুনতে পেয়েও তেসার আনন্দে একটুও ভাঁটা পড়ে না, মনের খুশিতে সে উপচে উঠেছে! হঠাৎ সে ঠিক করে ফেলে, দু-একদিনের জন্যে পারী ঘুরে আসবে, একটা পুরো সন্ধ্যে কাটিয়ে আসবে পোলেতের সঙ্গে। মিষ্টির দোকানে ঢুকে এক বাক্স্ চকোলেট কেনে দেনিসের জন্যে। তারপর ছোট একটা কাফেতে ঢুকে ব্র্যান্ডি নিয়ে বসে। পাশের টেবিলের লোকটি সকাল না পেরতেই একটু বেসামাল। খবরের কাগজে মোড়া একটা রুটি থেকে টুকরো ছিঁড়ে চড়ুই পাখি-গুলোকে সে খাওয়াচ্ছিল। তেসার দিকে তাকিয়ে বলে, 'পাখির সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে। শহরে যা কাণ্ড শুরু হয়েছে—খালি নির্বাচন আর নির্বাচন...'

'আপনি কার পক্ষে?' সহজাত কৌতূহল বশে তেসা জিজ্ঞাসা করে।

'আমি? আমি নিজের পক্ষে। হ্যাঁ, শুধু নিজের পক্ষে। আর পাখিদের পক্ষে। কিন্তু ভোট দিতে আমি যাচ্ছি না। ও কেবল ধোঁকাবাজি!'

তেসা হাসে 'ঠিক কথা! কোন্ পানীয় আপনি পছন্দ করেন? আমি খাওয়াচ্ছি।'

চারটের গাড়ী ধরে তেসা পারী রওনা হল। তার এক ঘন্টা পরে ব্রতেই পা বাড়াল 'মারকিস দ্য নিও'-র বাড়ির দিকে। এখানেই পোয়াতিএর মাতব্বররা প্রতি মঙ্গলবার জড়ো হয়। অধিকাংশই লাটে যাওয়া জমিদার—টেনেটুনে চালাতে হলেও বড়োলোকী

গো। তুমি খাচ্ছ না যে?...স্যালাড খাওয়াও বারণ নাকি তোমার? নাও, খাওয়ার ব্যাপারে এত কড়াকড়ি নিয়ম সত্যিই ভয়ংকর! হ্যাঁ, লুসিয় বলতে পারলে না তো? দুগার পথ ছেড়ে দিল, এখন আমিই একমাত্র প্রার্থী। একেই বলে জাতীয় ঐক্য।'

লুসিয় আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে ওঠে, 'আর তুমি রাজি হলে! কি নোংরা ব্যাপার!'

তেসা চটে যায় : 'আমি এর মধ্যে এতটুকু নোংরামি দেখি না। সমস্ত দল একমত হয়ে আমাকে দাঁড় করিয়েছে। আমি মনে করি, এ বিষয়ে রীতিমতো গর্ব করা চলে। জাতীয় ঐক্য কি নোংরামি? এমন কি তোমার ঐ তালা-কারিগর পর্যন্ত সব সময় বলে —ফ্রান্স ফ্রান্স। তুমি কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারছ না বৎস!'

খাওয়াটা একেবারে মাঠে মারা গেল। তেসার নিজের বাড়ির লোকজনই তাকে ভুল বোঝে। তেসার স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। দেনিস তো এতক্ষণ কোনো কথাই শোনেনি, বেড়ালছানাটা নিয়ে খেলা করেছে; আর ওই চিরকেলে বজ্জাত লুসিয় আবার বোধ হয় কোনো নতুন ইতরামির মতলব আঁটছে। কফির পেয়ালা শেষ করে তেসা টেবিল ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, তার কাজ আছে। সবাই জানে দুপুরে খাবার পর তেসা ঘুমোয়, কিন্তু ঘুমোতে যাবার আগে রোজই বলে 'কাজ' আছে।

নিজের অসংযমের জন্যে লুসিয়র অনুশোচনা হল। বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ চাইবে বলে এতদিন সে বাবার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। জেনেৎকে অপারেশন করাতে হয়েছে আর এমন কেউ নেই যার কাছ থেকে লুসিয় এই টাকা ধার করতে পারে। বাবাকে এখন চটানো বোকামি ছাড়া আর কি? বাবা হয়তো এখন স্পষ্ট 'না' বলবে। কিন্তু জেনেতের চোখদুটোর কথা মনে পড়তেই সবকিছু ভুলে গিয়ে লুসিয় পড়ার ঘরে ঢুকল।

কোন ভূমিকা না করে সরাসরি পেতে বসল কথাটা।

'আমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিতে হবে। ভয়ানক দরকার।'

তেসা নিরুত্তর।

হঠাৎ লুসিয় বলল, 'আমার কথা শুনে তুমি এতটা বিচলিত হবে ভাবিনি। খামখা রাগ করছ কেন?'

সোফার ওপর তেসা শুয়ে ছিল। বিরক্তিতে পাখির মতো মুখের রেখাগুলো ধারালো হয়ে উঠেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ফ্যাকাশে মুখ আর হালকা শরীরের ভঙ্গি দেখে মড়ার মতো মনে হচ্ছিল তাকে।

'পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে কি করবে? আবার কোনো নতুন ইতরামি?'

লুসিয় উত্তর দিল না। লুসিয়র দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল তেসা। ওর মত ছেলে সব কিছু করতে পারে! ঠিক এই রকম লালচে বাদামী রঙের চুল ছিল ওর কাকার। পরিবারের কেউ এখন সে-কাকার নামও মুখে আনে না। নোট জাল করার জন্যে তার সাত বছর জেল হয়েছে।

উঠে বসে তেসা চেক লিখে দিল। চেকটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল লুসিয়।

আবার শুয়ে পড়ে তেসা। স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত করার জন্যে এখন একটু ঘুম দরকার। কিন্তু মাথার ভেতর নানা চিন্তা জট পাকিয়ে ঘুম আসছে না। বিরক্তিতে মনটা ভরে গেছে, পোয়াতিএর-এ ব্রতেইর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিন যেমন হয়েছিল। ব্রতেইর কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে হয়েছে বলে যে মানসিক কষ্ট সে ভোগ করেছে, তা কি

লুসিয় বুঝতে পারে না? হ্যাঁ, সমস্ত ব্যাপারটাই বিশ্রী। আরো বিশ্রী কমিউনিস্টদের সঙ্গে দহরম-মহরম। তালা সারাবার জন্যে ওদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু দেশের ভাগ্য স্থির করার জন্যে নয়! কল্পনা করাও অসহ্য—জীবনটাই এই! কী নোংরা খেলা! টাকার এপিঠ না ওপিঠ? চেম্বারে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা করার সময়...কয়েকটি ভোট 'পক্ষে' বা 'বিপক্ষে' যাওয়ার ওপর একটি মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে। আর জুরীদের বেলায়?...অপরাধীর গলা কেটে উড়িয়ে দেওয়া হবে কি হবে না? তাও নির্ভর করে কতকগুলো তুচ্ছ খুঁটিনাটির ওপর। তেসার বক্তৃতায় কি কোনো দোকানদার বিচলিত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে ভোরবেলা লোকটিকে ঘুম থেকে তুলে এক গ্লাশ মদ খেতে দেওয়া হবে, তারপর এক কোপে তার গলাটা কেটে নেওয়া হবে। লটারি! সকলেই জানে পপুলার ফ্রন্ট একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার। এক বছরও টিঁকবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য কোনো কিছুই চিরকাল টেঁকে না। সব কিছুতে ঘুণ ধরে গেছে! দূর ছাই! টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে সবকিছু। যদি পড়েই তবে তার ভারি মাথাব্যাথা! সন্ধ্যের সময় সে পোলেতের কাছে যাবে। পোলেৎকে মরতে হবে একদিন। সবাই মরবে।

সত্তার অবশ্যম্ভাবী বিনাশের চিন্তা তার মনের ওপর প্রলেপের মত কাজ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকার শব্দ শোনা যায় তার ঘর থেকে। আরো কিছুক্ষণ পরে নাক ডাকার শব্দটা দীর্ঘ একটানা শিসে পরিণত হয়।

লুসিয় দেনিসের সঙ্গে কথা বলছিল।

'তুই যাই বলিস না কেন, এটা যে খুবই নোংরা কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কমিউ-নিস্ট আর 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'——দু দলের সঙ্গে একই সময়ে থাকাটা সম্মানজনকও নয়, সাধুতার পরিচয়ও নয়।'

দেনিস বলে, 'বাবার জন্যে আমার দুঃখ হয়। গত এক বছরের মধ্যে বাবা কি ভয়ানক বুড়ো হয়ে গেছে।'

'এতে অবাক হবার কি আছে! বাবার যা বয়স—এই বয়সের লোকের সর্বনাশের জন্যে একা পোলেৎই যথেষ্ট।'

'লুসিয়!'

দেনিসের চোখের দিকে তাকিয়ে জেনেতের কথা মনে পড়ে যায় লুসিয়র। এই শান্তশিষ্ট মেয়েগুলো কেন যে...কিন্তু জেনেৎ তো তাকে ভালবাসে না, জেনেৎ নিজেই সে কথা বলেছে। কিন্তু কেনই বা জেনেৎ তাকে ভালোবাসবে?'

সে বলে, 'আমার জন্যেও দুঃখ জানাতে পার। হয়তো বাবাও একদিন মরবে, কিন্তু আমি মরব না। একটু একটু করে শুকিয়ে ঝরে যাবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় একটু পুরনো ধরনের আমোদপ্রমোদে নিজেকে মাতিয়ে রাখে তেসা। প্রথমে সে যায় পোলেতের কাছে, তারপর দুজনে 'মাক্সিম'-এ গিয়ে রাতের খাওয়ার জন্যে বসে। নাচের আসরে মেয়েদের পা উঠছে, নামছে—অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তেসা। এই তো জীবন—মনে মনে বলে সে। বসে বসে গ্লাশের পর গ্লাশ শ্যাম্পেন টানে, কিন্তু তবুও এতটুকু আমেজ আসে না। আজ সকাল থেকেই তার মন চিন্তাক্লিষ্ট আর এই মানসিক অবস্থা এখনো সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

দুটোর সময় সে বাড়ি ফিরে আসে। পেটের ওপর গরম জলের বোতল চেপে ধরে মাদাম তেসা রোজকার মত পেসেন্স খেলছেন। তেসাকে দেখে কেঁদে ফেললেন তিনি।

'ঠাকুর রক্ষা করেছেন—তুমি ফিরে এসেছ! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে আমার!'

'ও কমে যাবে আমালি। ডাক্তার বলেছে, সারতে আর বেশি দিন লাগবে না।'

'লাগবে। আমি জানি, এ-অসুখ সারবে না। আমি শিগগিরই মরব।'

'এসব বাজে কথা বলে লাভ কি? ডাক্তার বলেছে, অসুখ নিশ্চয়ই সারবে। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলেছি। এখনো অনেকদিন বাঁচবে তুমি।'

'কিসের জন্যে বেঁচে থাকব? এখন আর এতটুকু দাম নেই আমার। আজ তুমি এসেছ বলেই বিছানা ছেড়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দেখ, তাতে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। মরতে আমি আর ভয় পাই না। আমার ভয় অন্য কথা ভেবে। আমি জানি তুমি নাস্তিক ...কিন্তু একদিন শেষ বিচার হবে...এসব কথা ছেলেমেয়েদের সামনে আমি বলতে চাইনি... আজকাল কমিউনিস্টদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছ! আশ্চর্য, একটুও বাধে না? কালই খবরের কাগজে ওদের কীর্তিকলাপ পড়ছিলাম, মালাগাতে আটটা গির্জা ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে, বর্বরের দল! তুমি আমার স্বামী, আর তুমিই কিনা ওদের দলে!'

জামাকাপড় খুলে তেসা শুয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'তুমি বোধ হয় মনে করো, এসব কাজ আমার কাছে বিশ্রী লাগছে না। তোমার ধারণা একেবারে ভুল। রাজনীতি একটা নোংরা খেলা। এর চেয়ে ফাটকা বাজারের দালালী ঢের ভালো কাজ। কিন্তু তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন? আমাদের দুজনের জন্যে আর টাকার কি দরকার, আমাদের দিন কোনোরকমে কেটে যাবে। কিন্তু ছেলেমেয়েরাই আসল সমস্যা। আজ লুসিয় আমার কাছ থেকে আরো পাঁচ হাজার ফ্রাঁ নিয়েছে। ও যা চায় তা না পেলে কারুর গলা কাটতে পারে ও। তারপর দেনিস আছে, ও যে কোনোদিন কারও প্রেমে পড়তে পারে। আমি চাই না যে, বিয়ের পর দেনিস স্বামীর গলগ্রহ হয়ে থাকুক। আর ও যা অভিমানী মেয়ে! হাতে টাকা না থাকলে ওর দিনই চলবে না। আমি এমনিতেই মরে আছি আমালি, তুমি আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না।'

মাদাম তেসা স্বামীর কপালে চুমু খেয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

চিত হয়ে শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে তেসা। আজ আর তার চোখে ঘুম আসবে না। শ্যাম্পেনের বুদ্বুদের মত অনেকগুলো জ্বলজ্বলে কণিকা ভেসে বেড়াচ্ছে চোখের সামনে। হঠাৎ স্ত্রীর গলার চাপা গোঙানি শোনা যায়। 'আমালি!' চাপা গলায় ডাকে সে। কিন্তু উত্তর পাওয়া যায় না। ঘুমের ঘোরে ও গোঙাচ্ছে। হঠাৎ ভয় করে ওঠে তেসার। কিছুদিনের মধ্যেই আমালি মরে যাবে...আর সেও মরবে! তেসার মনে পড়ে, লারোশকে কি ভাবে মৃত্যুদন্ড দিতে হয়েছিল! একজন পুলিশকে খুন করে লারোশ কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। তখন হেমন্তকাল। বুলভারে হাঁটতে গিয়ে পায়ের তলায় পাতা-গুলো মর-মর করে উঠেছিল, লাল সূর্য উঠেছিল প্রকান্ড হয়ে। মদটুকু খেয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে লারোশ বলে, 'বাঃ বেশ!' সকলে ভাবে, লারোশ শান্তভাবে মরতে পারবে। কিন্তু গিলোটিনের কাছে নিয়ে যাবার সময় প্রাণপণে বাধা দেয় সে। টেনে হিঁচড়ে গিলোটিনের কাছে নিয়ে যেতে হয় তাকে। রাস্তার কুকুরের মতো সে চিৎকার করে। সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে তেসার; সেই বিকট চিৎকার এখনো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে যেন। ছোট ছোট জ্বলজ্বলে কণিকাগুলো ওপরের দিকে ভেসে বেড়াচ্ছে...আমালির কোনো দুঃখ নেই। ও নরক মানে। এও একটা পরিত্রাণের উপায়,—মনে বিশ্বাস থাকা চাই।...কিন্তু নরক নেই। আছে শুধু মৃত্যু, শূন্যগর্ভ ঠান্ডা অন্ধকার। তেসা চিৎকার করে ওঠে।

মাদাম তেসা জেগে উঠলেন।

'পল, কি হল তোমার?'
'কিছু না, একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।' অপরাধীর মতো বলল তেসা।

তেরো

জলিওর আজগুবী গল্পের নায়ক, পিয়েরের ভক্তির পাত্র, ওগুস্ত ভীইয়ারকে দেখে মনে হবে আত্মভোলা ভালো-মানুষ অধ্যাপক। চোখে প্যাশনে, চওড়া কালো টুপি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণপ্রবণতা, অলংকার-বহুল বাগ্মিতা—সব দিক থেকে মানুষটি বিগত যুগাশ্রয়ী।

জন্মস্থান শালো। সেই 'ভয়ংকর' বছরে তার জন্ম। শৈশবে তার দোলনার চারপাশ প্রুসিয়ানদের গুলির শব্দে সচকিত হয়ে থাকত। বাবা ছিলেন গোঁড়া রিপাব্লিকান, "ক্ষুদে নেপোলিয়" কে আক্রমণ করার অপরাধে দুবছর কারাবাস করেছিলেন। মারা, ব্লাকি, দ্যালেক্লুস্, এ'দের নাম এবং সমাজতন্ত্রের ওপর উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে ভীইয়ার।

পারীতে এসেছিল ছাত্রাবস্থায়, ইতিহাসে ডিগ্রী নেবার জন্যে। ইচ্ছে ছিল, রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজেকে সঁপে দেবে। কিন্তু সে যুগের অন্য সব যুবকের মতো শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠেছিল। ছাত্রাবস্থায় 'কার্তে ল্যাত্যাঁ'-এ থাকার সময় , পারীর একটি কাফেতে বৃদ্ধ ভেরলেনের সঙ্গে তার দেখা। মাতাল অবস্থায় মাঝে মাঝে ভেরলেনের মুখ থেকে আশ্চর্য কথার স্রোত বয়ে যেত—টেলিগ্রাফ তারে ঘা খাওয়া কোনো দেশান্তরী পাখির আর্তনাদের মতো সেই সব কথা! নিজের লেখা একটা কবিতার বই ভীইয়ার প্রকাশ করেছিল—কবিতায় স্বকীয়তা না থাকলেও প্রতিশ্রুতি ছিল। এক সময় বিভিন্ন পত্রিকায় শিল্প-প্রদর্শনীর আলোচনা লিখত—সমালোচক হবে আশা ছিল। তারপর দ্রেফুস সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে জোরেস শিষ্য হয়ে যায়। স্বভাবতই বিনয়ী বলে কোনো কাজে কখনো আপত্তি জানাত না। ছোট ছোট কাগজের জন্যে প্রবন্ধ লিখত, পাদারিদের মুখোশ খুলে দিত, গ্রামে গ্রামে ঘুরে সমরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাঁপা গলায় বক্তৃতা দিত, স্ত্রীলোকের সমান অধিকারের জন্যে দাবি তুলত। অবসর সময় কাটত প্রচুর বই পড়ে। শিল্পের ওপরে অনুরাগ অটুট ছিল—বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করে বলত 'এই যে আমাদের এথেনিয়ান'। যুদ্ধের কিছু আগে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় সে। প্রায় একই সময়ে একজন মহিলা-ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চেম্বারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার ভার তার ওপর কখনো দেওয়া হত না, কিন্তু বিভিন্ন কমিটিতে নেওয়া হত তাকে এবং সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ধরা হত। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে সে যোগ দিয়েছিল,—লেনিন, বেবেল ও প্লেখানভের সঙ্গে আলাপ ছিল তার। তখন তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, সমাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে পারলে দেশে বড়ো রকমের পরিবর্তন আসবে।

কিন্তু তার বদলে যুদ্ধ বাধে। এই প্রচণ্ড আঘাতে ভীইয়ারের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়। তবুও কিন্তু জিমেরওয়াল্‌ড্‌ সম্মেলনে যোগ দিতে সে রাজি হয় না; বলে, 'জাতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে দাঁড় করানো অসম্ভব।' 'পবিত্র মৈত্রী' সম্পর্কে কথাবার্তায় যেমন সে বিরক্ত হত তেমনি আকৃষ্টও হত। কিন্তু কাজের বেলায় সংবাদ-নিয়ন্ত্রণ ও বিনা-বিচারে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কিছু করেনি।

তারপর যুদ্ধশেষে আসে ঝড়ো বছরগুলো। রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানায় ভীইয়ার, কিন্তু কমিউনিস্টদের নিন্দে করে বলে, 'নিজেদের পথেই চলতে হবে আমাদের।' যুদ্ধের সময় রক্তপাতের আতঙ্ক তার আরো বেড়ে গেছে। সে বিশ্বাস করে, মানবতার অগ্রগতি শান্তিপূর্ণ পথেই হবে।

এখন সে সমাজতন্ত্রী দলের একজন নেতা। সে যে নেতা হয়েছে তার একটা বড়ো কারণ তার বয়স ও পাণ্ডিত্য। মনের দিক থেকে সে বুড়িয়ে ও শুকিয়ে গেছে। স্ত্রী বেঁচে নেই, ছেলেমেয়েরা সকলেই সংসারী, প্রকাণ্ড একটা ফ্ল্যাটে সঙ্গীহীন স্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবনটা কোনোরকমে কেটে যায়। ফ্ল্যাটের ঘরগুলো ছবির গ্যালারির মতো—তার শিল্পানুরাগ বেঁচে আছে এখনো। আজকাল প্রায়ই তার মন নির্জনতা খোঁজে। তখন সে যায় আভাল'তে। সেখানে লতায় ঘেরা গ্রাম্য কুটির আছে তার। বাগানের ভাঙা চাতালের ওপর বসে সে ব্যাং আর মুরগির ডাক শোনে। চেম্বারের অধিবেশনের পর ফিরে এসে তার মেয়ের ছবির সামনে বসে থাকে। ছবিটা রেনয়এর আঁকা; গোলাপী রংটা তার ভারি ভাল লাগে—টাটকা জ্যামের ওপরকার উষ্ণ ও মিষ্টি বুদবুদের মত সেই গোলাপী রং। অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় এতটুকু চাঞ্চল্য জাগাতে পারে এমন সবকিছুকে অত্যন্ত ভয় করে সে। এই ভয়ের প্রভাব আছে তার রাজনীতিতেও। দক্ষিণপন্থী ব্যঙ্গচিত্রকররা যে লোকটিকে দেখায় খোলা ছুরি দাঁতে চেপে ধরেছে, আসলে সে নিরীহ সংসারী জীব এবং নিতান্ত অভ্যেসবশেই বিপ্লবাত্মক বুলি আউড়ে যায়।

সমুদ্রের বাতাসের মতো একদিন আচমকা ঝড় ওঠে। আর কোথাও ঠাঁই খুঁজে না পেয়ে তরুণের দল ঝোঁকে চরমপন্থী দলগুলোর দিকে। ফেব্রুয়ারির দাঙ্গায় ভয় পেয়ে যায় ভীইয়ার। দেশের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বলে ব্রতেই-এর শিষ্যদের ওপর এমনিতেই ঘৃণা ছিল ভীইয়ারের। এই ঘটনার পর সে পপুলার ফ্রণ্টে যোগ দেয়, এমন কি কমিউনিস্ট-দের সঙ্গে তার পুরনো বিরোধের কথা ভুলে যায় একেবারে। আসলে এটাই ছিল তার কাছে তার বাড়িঘর-সম্পত্তি আর চেম্বারের আসন বজায় রাখার পথ।

নির্বাচন উপলক্ষে একটা বড়ো সভায় তাকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়াতে দেখে দশ হাজার লোক উৎসাহে হাততালি দিয়ে ওঠে। বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথমে সে বলে গণতন্ত্রের কথা, পুরো মজুরিতে ছুটি আর পৌর শান্তির কথা। আজন্ম বক্তা সে; কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে, লোকে কী শুনতে চাইছে। তার-পর; সেই আশ্চর্য বাগ্মিতার বালুচরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে জীবন্ত কথার ধারা-স্রোত। ভাঙা গলা জোরালো হয়ে ওঠে। স্পেনের কথা বলতে শুরু করে ভীইয়ার—সেই স্পেনের কথা যেখানে পপুলার ফ্রণ্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেছে।

'এস্‌ত্রামাদুরায় চাষীরা জমিদারের জমি দখল করে তাতে চাষ করছে। ধর্মপীঠে কোশাকুশির জায়গা নিয়েছে কাটাকম্পাস। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে শ্রমিকেরা রাইফেল হাতে নিয়েছে...'

দশ হাজার গলায় আওয়াজ ওঠে : 'পপুলার ফ্রণ্ট জিন্দাবাদ!'

গ্যালারির শেষ সারিতে মিশো আর দেনিস পাশাপাশি বসেছে। সকলের সঙ্গে মিশোও আওয়াজ তুলল আর হাততালি দিল। তারপর একটু হেসে দেনিসকে ফিসফিস করে বলল, 'অভিনন্দনটা ওকে নয়, স্পেনের লোকদের।...' তার পরের বক্তা একজন কমিউনিস্ট—নাম ল্যাগ্র্যা। দেনিস বলে ওঠে, 'আরে, ওকে আমি চিনি।' গালে কাটা দাগ যে শ্রমিকটি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন্ জেলা থেকে সে এসেছে—সে-ই মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে।

সে বলল, 'কমরেড্স্, ভোট দেওয়াটাই আজকের দিনে খুব বড়ো কথা নয়। বুক দিয়ে পপুলার ফ্রন্টকে বাঁচাতে হবে। কথা বলার দিন চলে গেছে, এখন কাজ করতে হবে—কঠিন কাজ! আমরা জয় করবই—হার মানব না আমরা...!'

ল্যাগ্র্যার দু হাত চেপে ধরল ভীইয়ার। ভীইয়ারকে এভাবে আবেগ জানাতে দেখে খুশি হল সকলে। মনে হল যেন বিগত যুগ তার কল্পনাবিলাসী আর স্বপ্নদর্শীদের নিয়ে এসে অভিনন্দন জানাচ্ছে জনসাধারণকে যারা শুধু আত্মত্যাগ করতেই জানে না বিজয়-গৌরবকে ছিনিয়ে আনতেও পারে।

দেনিস আর মিশো বেরিয়ে এল। বাইরে গুমোট গরম, ঝড় আসছে। কাফেগুলোর বারান্দায় বসে লোকে বিয়ার খাচ্ছে আর অলসভাবে মুখের ঘাম মুছচে।

রু ফালগিয়ের-এর সেই নির্বাচনী সভার পর মাত্র ছ-সপ্তাহ কেটেছে, কিন্তু দেনিস ও মিশো কথা বলছে অনেক কালের পুরনো বন্ধুর মতো।

দেনিস বলে, 'ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দেয়, কিন্তু ওর বক্তৃতায় কিসের যেন অভাব আছে।'

'ও যা বলে তাতে ওর বিশ্বাস নেই।'

'না, বিশ্বাস আছে কিন্তু আধখানা বিশ্বাস। আমি জানি, কেননা আমারও ওরকম হয়। কোন কথা খুব জোর দিয়ে বলার পর আমার মনে কেমন সন্দেহ জাগতে থাকে।' দেনিস হাসে, 'অবশ্য, সভায় দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা দিই না এই যা। ল্যাগ্র্যাকে আমার ভালো লাগে। ওর সমস্ত কথাতেই একাগ্রতা আছে।'

মিশো বলে, 'কথাকে কাজের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা চাই।'

'তা কি সম্ভব?'

'নিশ্চয়ই। রক্তের বদলে...'

হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে একটা বাজ ফেটে পড়ল, তারপরেই ঝর ঝর বৃষ্টি। একটা চালার তলায় আশ্রয় নিল দুজনে। বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ-চমকানির মধ্যে ঘন হয়ে দাঁড়ায় দুজনে, আশেপাশে কেউ নেই তবুও ফিসফিস করে কথা বলে।

দেনিস নিজের জীবনের কথা বলে, 'কেবল মিথ্যে আর মিথ্যে! বাবার বিষয়ে কোনো কথা তোমাকে বলতে চাই না, বলা উচিতও নয়। কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে ডাঙায় তোলা মাছের মতো মনে হয় নিজেকে। একটা কিছু করতেই হবে। মনে কোরো না তোমার কাছে উপদেশ চাচ্ছি। এমনি বললাম তোমাকে।'

'পথ তো সহজ...'

'না, আমার কাছে নয়। এ-পথ তোমার কাছে সহজ। এ জীবনে তুমি অভ্যস্ত। হয়তো এজন্যে কোনো চেষ্টার দরকার হয়নি। এমনও হতে পারে, এ জীবন তুমি পেয়েছ তোমার বাবার কাছ থেকে। যাই হোক না কেন, এভাবেই তুমি মানুষ। কিন্তু আমি একেবারে অন্যভাবে বড়ো হয়েছি। তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি একথা বুঝতে পারি না। কিন্তু

সভায় গেলেই এ সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। একটা কথা বোঝবার জন্যে সাতবার ভাবতে হয় আমাকে। তা যদি না ভাবি, আমিও বোধ হয় দাদার মতো হয়ে উঠব। দাদা যে খারাপ লোক তা আমি বলছি না, দাদার একমাত্র দোষ—বড়ো খাম-খেয়ালী। হয়তো কোনো মেয়ের সঙ্গে ভীষণভাবে প্রেম করবে কিন্তু পরে তার নামটুকু পর্যন্ত ভুলে যাবে। দাদার মতামত সম্পর্কেও একথা খাটে। কিন্তু আমি চিন্তার ব্যাপারে একটু খাটো বলতে হবে।'

'দেনিস, তুমি সত্যিই আশ্চর্য! এত বাজে কথাও বলতে পার তুমি! তোমার সঙ্গে যখন এসব বিষয়ে কথা বলি, নিজে কিছু বুঝে উঠতে পারি না। কেন বলতে পার? কেন এমন হয়? বলো না! আচ্ছা, বাজে কথা থাকুক। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তবে কথাটার যেন ভুল মানে করে বোসো না। যখনই তোমার কথা শুনি আমার মন নাড়া খেয়ে সজাগ হয়ে ওঠে। মনে হয় কি একটা যেন বুঝতে শুরু করেছি। শিল্প সম্পর্কেও এই একই কথা। আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম কেন শিল্প আমাকে নাড়া দেয়। কবিতা তো অজস্র আছে—কিন্তু কতগুলো কবিতা পড়েই আমরা ভুলে যাই, আবার এমন কবিতাও আছে যা আমাদের সত্তার গভীরে প্রবেশ করে। স্থপতি-বিদ্যাও আমি বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি। তার কারণ তুমি। মালের সাহায্য দরকার হয়নি। ঠিক তাই...!'

অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত নাড়ে মিশো তা দেখেও দেনিস হাসে না।

'এসব কথা এখন থাক, মিশো। আমি অন্য কথা ভাবছি...তুমিই আমাকে জীবনের সন্ধান দিয়েছ, তোমার কাছে শিখেছি, কি ভাবে বাঁচতে হয় কি ভাবে কথা বলতে হয়। যেটুকু শেখা বাকি আছে, তাও আমি শিখে নেব। হ্যাঁ, তখন কাজ সম্পর্কে কি বলছিলে? কিন্তু চেয়ে দেখ, এ বৃষ্টি থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'

মুখর বর্ষণের মধ্যে দুজনে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। ভিজে সপসপে হয়ে উঠে ওরা হাসছে দুজনে। দেনিসের মাথায় টুপি নেই, চুলগুলো পেছন দিকে পেঁচিয়ে টান করে বাঁধা। পরনে ছাইরঙা কোট ও স্কার্ট। দেনিসের সৌন্দর্যের তীব্রতা কেমন যেন সেকেলে। মিশোর চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে হাঁটছে দুজনে। দেনিসের বাড়ির কাছে এসে খুশিমনে বিদায় নিল পরস্পরের কাছে। বৃষ্টির যেন আর বিরাম নেই। বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো আছড়ে পড়ে রাস্তার বাঁধানো শানের ওপর ঝিকমিকে বুদবুদ ফোটাচ্ছে। বাতাসে ভিজে মাটি আর ঘাসের গন্ধ।

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে ভীইয়ারের মনে হল, বক্তৃতামঞ্চে বড় বেশি উদ্দীপনা দেখানো হয়ে গেছে। মদ খেয়ে বেসামাল হলে পরদিন যেমন হয় তেমনি লজ্জা হতে লাগল তার। কেন সে এই ধরনের বক্তৃতা দিল? পরে তার এই বক্তৃতার ফল ভোগ করতে হবে সরকারকে। এই বক্তৃতার প্রতিটি শব্দকে তখন খুঁটিয়ে বিচার করা হবে। গেঁয়ো অভিনেতার মতো হাত পা নাড়লেই মন্ত্রী হওয়া যায় না নিশ্চয়ই!

পুরু গদিওয়ালা একটা আর্ম-চেয়ারে ডুবে গিয়ে সে নিজেকে একটু অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করল। সামনের দেওয়ালে বোনার-এর আঁকা একটা ল্যান্ডস্কেপ। সবুজ আর ঘন ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে ফ্যাকাশে রোদকে ফোঁটা ফোঁটা মধুর মতো মনে হচ্ছে। ক্যানভাসের আশ্রয়ে গ্রীষ্মদিনের নিথর প্রবাহ থমকে আছে যেন। নতুন একটা জগৎ ঘিরে

ধরছে ভীইয়ারকে—সেই নিষ্কম্প নিশ্চল জগৎ যেখানে ভীইয়ার তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো কাটিয়েছে।

একটা রেকাবিতে বিকেলের চিঠিপত্র নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকল। মুগ্ধ আত্মবিস্মৃতি থেকে জেগে ওঠে ভীইয়ার। অনিচ্ছার সঙ্গে প্রথম চিঠিটা খুলে চোখের সামনে ধরতেই তার মুখের ভাব বদলে যায়। টাইপ-করা ছোট চিঠি ঃ 'ফ্রান্সকে শাসন করবার বিন্দুমাত্র সাহস যদি তুমি দেখাও, তোমাকে আমরা ইঁদুরের মত পুড়িয়ে মারব। পপুলার ফ্রণ্ট ধ্বংস হোক!—দেশপ্রেমিক!"

এই বেনামী চিঠি পেয়ে ভয় পেয়ে যায় ভীইয়ার। মরতে সে ভয় পায় না, ভয় দায়িত্ব নিতে। আর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আদেশ দিতে হবে, শাস্তিও দিতে হতে পারে। না, এ কাজের উপযুক্ত সে নয়। চিরকাল সে শুধু বিশ্লেষণ করেছে, সমালোচনা করেছে, নিজের ব্যক্তিগত মতামত জাহির করেছে। কিন্তু আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রথম প্রেমে-পড়ার মুহূর্তে কুমারী মেয়ের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে সে। একদিন সে ভেবেছিল, কোথাও কোনো জটিলতা নেই—নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হিসেবে বেরিয়ে আসবার পর তারা সমাজতন্ত্রের যুগ ঘোষণা করবে। হয়তো তখনকার পক্ষে বিশ্বাসটা সময়োপযোগী ছিল। যুদ্ধের আগে মানুষ ছিল অনেক বেশি সহজ ও সাধারণ। তখন কোনো কিছু নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না, বই পোড়ানো হত না, ফ্যাশিস্ট কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প ছিল না। আর আজ এই লোকটি লিখেছে—তোমাকে আমরা ইঁদুরের মতো পুড়িয়ে মারব...হ্যাঁ, ওরা তা পারে। উত্তেজনা, প্ররোচনা, তারপর গলির আনাচ কানাচ থেকে গুলি করা—ঠিক মাদ্রিদে যেমন হয়েছে। পপুলার ফ্রণ্টকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় ওরা। আর ভীইয়ারের মিত্রই বা কে? কমিউনিস্টদের কাছে সে তো 'বিশ্বাসঘাতক।' কমিউনিস্টরা দাবি তুলতে থাকবে, কড়া ব্যবস্থা নেবার কথা জোর দিয়ে বলবে, আর তার জন্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন করবে। আর র‍্যাডিকালরা? তেসার কাছে ভীইয়ার যা, ল্যাগ্র্যাও তাই ঃ দুজনে একই দলের। 'মার্কসবাদী' শব্দটা উচ্চারণ করতে হলে তেসার কথায় যে ঘৃণা প্রকাশ পায়, তা শোনাই তো যথেষ্ট। ভীইয়ার একেবারেই একা। আজ সে সকলের প্রশংসা পেয়েছে কারণ ল্যাগ্র্যার মতো বক্তৃতা দিয়েছে সে। যখন সে কিছু করতে চেষ্টা করবে তখন এরাই আবার তাকে বিদ্রূপ করবে!

কী লাভ এসবে? আর কতদিনই বা সে বাঁচবে? পাঁচ বছর? হয়তো তার চেয়েও কম। এর চেয়ে অনেক ভালো বোনার-এর ল্যান্ডস্কেপের দিকে তাকিয়ে থাকা, ভালো ভালো বই পড়া, আভাল'র কুটিরের সেই ফুল আর লাল মাছের মধ্যে চলে যাওয়া...কী জটিল আর বিরক্তিকর এখানকার এই জীবন! ঘরের ভেতরটা কী ঠাণ্ডা! যৌবনে লেখা কবিতার কয়েকটা লাইন কেন জানি মনে পড়ল ঃ

রাত্রির কুয়াশা, আর
মাঝে মাঝে বুকচাপা-আলো—
দেয়ালি-পোকার চোখে
মৃত্যুর হাতছানি ঘোর কালো।

সেই মে মাসের গরম সন্ধ্যাতেও হঠাৎ তার গা শির শির করে উঠল। ঘণ্টা টিপে চাকরকে ডেকে বলল, 'রব্যার, আমার কম্বলটা নিয়ে এসো তো।'

বাইরে এসে চাকরটা হাসতে হাসতে রাঁধুনীকে বলে, 'ভোটের বিজয়ের ফল—গাছের পাতাটিও নড়ছে না তবুও বাবুর শীত করছে।'

চৌদ্দ

রবিবার সন্ধ্যায় আনের সঙ্গে দেখা করল পিয়ের।

সে বলল, 'চল, বুলভারে বেড়িয়ে আসি। আজ ভোটের ফল জানা যাবে।'

ফলাফলের কথা চিন্তা করে উত্তেজনায় পিয়ের হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার করছে। শরীরটা ভালো নেই বলে বাইরে যাবার ইচ্ছে আনের ছিল না। তা ছাড়া নির্বাচন সম্পর্কে কোনো ঔৎসুক্য তার নেই। তবু শেষ পর্যন্ত বেরুতে রাজি হল।

সরু অন্ধকার অলিগলি থেকে জনস্রোত চলেছে শহরের মাঝখানটার দিকে। উত্তেজনাটা শুধু পিয়েরের একার নয়, শহরশুদ্ধ লোককে তা নাড়া দিয়েছে। চারদিকে শুধু প্রশ্ন, অনুমান, গুজব, আশা ও আশঙ্কা। কেন্দ্রীয় বুলভারে লোক গিজগিজ করছে, যতোদূর দেখা যায় শুধু শ্রমিকদের মাথার ক্যাপ। রাস্তার সাধারণ পথচারীরা আজ অদৃশ্য। সাজানো কাফেগুলোর বারান্দায় শুধু কয়েকজন বিদেশী লোক ও গণিকা বসে।

একটি সান্ধ্য কাগজের আপিসের সামনে পিয়ের ও আনে দাঁড়াল। তিনকোণা স্কোয়ারটিতে বিরাট জনতা অধৈর্য হয়ে উঠেছে—যবনিকা ওঠার আগে থিয়েটারের দর্শকদের মতো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা পর্দাটার ওপর নাম ও সংখ্যা ফুটে উঠে ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। দক্ষিণপন্থীরা জিতবে নাকি? অন্ধ আশঙ্কা থেকে নানারকম গুজবের জন্ম হতে লাগল। চাষীরা পপুলার ফ্রন্টকে ভয় করে, জেলাগুলোতে ফ্যাশিস্টরাই বেশি ভোট পেয়েছে, কমিউনিস্টদের ঘাঁটি পারীর শহরতলীতে পর্যন্ত বামপন্থীরা মোটেই ভোট পায়নি। পর্দাটার ওপর কয়েকটা নাম ফুটে উঠল, পারীর প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধিদলের নাম। সাগ্রহে সান্ধ্য কাগজ কিনছে সবাই, যদিও তারা জানে কাগজগুলোতে এখনো নির্বাচনের ফলাফল বার হয়নি। ভিড়ে ঠাসা মেলার মত মনে হচ্ছে স্কোয়ারটাকে। সময় কাটাবার জন্যে কে যেন 'মাদাম লা মারকিস' গানটা গেয়ে উঠল। বাদামভাজা চিবোচ্ছে অনেকে, গান গেয়ে গেয়ে ছাগলের লোমের তৈরি কম্বল ফেরি করছে একদল আরবদেশীয় লোক।

সন্ধ্যেটা বেশ গরম। আশেপাশের বারগুলোতে বিয়ার ও লেমনেড বিক্রীর মরশুম পড়েছে।

হঠাৎ লাউড-স্পীকারটা ফেটে পড়ে—

'তোরেজ মোরিস। নির্বাচিত...'

জবাবে মানুষের গলার স্বরের একটা ঝড় বয়ে যায়। তোরেজ অত্যন্ত জনপ্রিয়, স্কোয়ারের চারদিকে চিৎকার ওঠে, 'মোরিস জিন্দাবাদ।' তোরেজ যে নির্বাচিত হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। তবুও এই প্রথম সাফল্য জনতাকে উৎসাহে ভরিয়ে তোলে; জনতা 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে শুরু করে দেয়। ইতিমধ্যে আশেপাশে রাস্তাগুলোতে পর্যন্ত গাদাগাদি করে মানুষ দাঁড়িয়েছে। পুলিশ বৃথাই চেষ্টা করছে গাড়ি-

ঘোড়ার রাস্তাটুকু খোলা রাখতে। খুব যে জেদ করছে তাও নয়। কোন্ দল জিতবে এখনো বলা যায় না; ওরাও চালাক হয়ে উঠেছে।

'ফ্লাঁদ্যাঁ পিয়ের। নির্বাচিত...'

'ফ্যাশিস্টরা নিপাত যাক।'

'গুলি করে মারো এই বিশ্বাসঘাতকদের।'

'ব্লুম লেয়'। নির্বাচিত...'

'পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ!'

এক-একটি নাম উচ্চারিত হয় আর এক-একবার আনন্দধ্বনি ও হাততালি ওঠে, এক-একবার শিস ও ধিক্কার শোনা যায়। কিন্তু আনন্দধ্বনিটাই ক্রমে আরো বেশি ঘন ঘন শোনা যেতে লাগল, বিরূপ চিৎকার গেল কমে। দশটা বাজার আগেই স্পষ্ট বোঝা গেল, পপুলার ফ্রন্ট জিতেছে। লোকের মুখে হাসিটুকু লেগে থাকে। দক্ষিণপন্থীদের দু-একটা জেতার খবরে আর বিশেষ কেউ কান দেয় না। পপুলার ফ্রন্টের এই অনায়াস জয়লাভ একটা ভেল্কির মতো, প্রায় অলৌকিক ব্যাপার—যেন একটা আশ্চর্য লটারিখেলায় প্রত্যেকে পঞ্চাশ লাখ করে বাজি জিতেছে। জনসাধারণকে বাঁচিয়েছে বন্দুক নয়, কতগুলো টুকরো টুকরো ছাপানো ইস্তাহার। গত কয়েক যুগ ধরে ভোটাভুটির ব্যাপারটা একঘেয়ে অনুষ্ঠানের মত হয়ে উঠেছিল। র‍্যাডিকাল সমাজতন্ত্রী বা বামপন্থী রিপাব্লিকান—যে-ই জিতুক কি যায় আসে? কিন্তু এবারের নির্বাচনে একটা বিশেষত্ব আছে। এর জন্ম হয়েছে পারীর রাস্তায়, ৬ই ফেব্রুয়ারির রক্ত ও পাথরের মধ্যে, মিছিলের লালঝাণ্ডায়। মে মাসের সেই রাত্রি একটা আশার বাণী নিয়ে এল; পরিবর্তনের আশা, শুধু শাসনব্যবস্থায় নয় নিজেদের জীবনেও। পারীর স্কোয়ারে স্কোয়ারে, আর পারীর বাইরে দূর দূর দেশে—ধোঁয়াটে লীল্-এ, আনন্দভরা মার্শাই-এ, থমথমে আর নির্দয় লিয়'-তে, আটলাণ্টিকের উপকূলে, আল্পস্-এর নিম্নদেশে—লক্ষ লক্ষ লোক এই আশায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল।

'ভাঁইয়ার ওগুস্ত। নির্বাচিত...'

এত জোরে আওয়াজ তোলে পিয়ের যে আনে হাসতে হাসতে কানে আঙুল দেয়। পিয়েরের দেখাদেখি অন্যরাও আওয়াজ তুলছে, কিন্তু পিয়েরের কাছে তা যথেষ্ট বলে মনে হয় না। 'কমিউনিস্টের বেলা ওরা তো চিৎকার করে শহর মাথায় তুলতে পারে' ঈর্ষাভরা গলায় সে বলে।

'তেসা পল। নির্বাচিত...'

এই ঘোষণার জবাবে দু-একটা অনিচ্ছুক চিৎকার শোনা যায় : 'পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ!'

আনে বলে, 'চল যাওয়া যাক। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

বুলভারে ফিরে গিয়ে ছোট একটা কাফের বারান্দায় বসে দুজনে। চারদিকে ভিড়—গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে অভিনন্দন জানাবার পালা চলেছে।

পিয়ের বলল, 'কই, তোমার যে খুব আনন্দ হয়েছে তা তো মনে হচ্ছে না। এই উৎসবের দিনে চুপ করে আছ যে?'

'কিসের উৎসব? তেসা জিতেছে—এজন্যে? হ্যাঁ, ওই মুখপোড়া একবার আমার হয়ে দু-একটা কথা বলেছিল বটে, তাই বলে আমাকে উৎসব করতে হবে?'

'তেসার প্রশ্নই উঠছে না। ওসব খুঁটিনাটির ব্যাপার। আসল কথাটা হচ্ছে এই—পপুলার ফ্রন্ট জিতেছে।'

আনে বলে, 'তুমি আমাকে ভালো করেই জান। আমার কাছে জীবনটাই খ্ুটিনাটির ব্যাপার।'

'তেসা?'

'না। সোজা পথে এগিয়ে চলা। অকপটতা।'

সমস্ত দিনের নানা ঘটনার পর তর্ক করতে ভালো লাগছে না পিয়েরের। সে শুধু মাথা নাড়ে, তারপর অন্যাদের হৈ-হল্লার মধ্যে ছেড়ে দেয় নিজেকে।

কয়েকজন সৈনিক পাশের টেবিলে বসে চিৎকার জুড়েছিল। প্রত্যেকেরই নেশার একটু রঙ চড়েছে।

'কর্নেল তো এবার ট্রাউজার ভর্তি করে..

'হ্যাঁ, ওরা এখন শক্তহাতে চেপে ধরবে...'

'তুমি কি কাল স্ট্রাসবুর্গ যাচ্ছ?'

'পরশু। আরে ভাই, ওখানে এই তো সময়। জার্মানরা কি সব তৈরি করছে সব সময়ে, বল্লমের মত খাড়া আর সোজা...কতকগুলো কামান বসিয়েছে একেবারে শহরের দিকে মুখ করে...'

খবরের কাগজওয়ালা ছুটোছুটি করছে, 'বিশেষ সংখ্যা! বিশেষ সংখ্যা! পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভ!'

আনে বলল, 'পিয়ের, একটা ট্যাক্সি করা সম্ভব হবে কি? শরীরটা আর টানতে পারছি না আমি।'

বাড়ি ফিরেই আনে শুয়ে পড়ল।

পিয়ের বলল, 'তোমার কি হয়েছে বলো তো? ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি?'

অস্পষ্টভাবে হাসল আনে, বলল, 'না তা নয়। কিছু ভেব না। কোন অসুখ করেনি আমার। এরকম মাঝে মাঝে হয়। তুমি কি বুঝতে পারছ না?...কী হাঁদা তুমি!'

অবশেষে পিয়ের বুঝল। ছোট ঘরটার ভেতর লাফাতে শুরু করে দিল সে।

'চমৎকার! আর ঠিক আজকের মতো দিনেই কিনা এই খবর!...দেখে নিও, চমৎকার হবে এই বাচ্চা ছেলেটা! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছেলে হবে। তোমার জন্যে কিছু কিনে আনব? ওষুধ? কমলালেবু?'

আনে হাসল, 'কিছু দরকার নেই। তুমি আমার সামনে একটু বসো তো। হ্যাঁ, ঠিক এইভাবে।'

দু হাতে পিয়েরের মুখটা চেপে ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল আনে। তারপর হাতের আঙুল মেলে আলো থেকে আড়াল করল পিয়েরের চোখদুটোকে।

'এখানে শুধু তুমি আর আমি।' বলল আনে। হাসছে সে, এত হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে, এত শান্তি!

জানলা দিয়ে কার যেন গলা ভেসে এল। 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে—'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড...' কুঁজের মত উঁচু নীচু রাস্তা পার হয়ে বেলভিলের গরীব লোকরা ফিরে চলেছে তাদের অন্ধকার দুর্গন্ধ ঘরগুলোর দিকে। আজ তারা নতুন একটা রূপকথা দেখেছে —কোন আমেরিকান সুন্দরীর প্রেম-কাহিনী নয়, শহরতলীর কোন এক তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমার পর্দায় তৈরি করা দিবাস্বপ্ন নয়—তাদের নিজেদের সম্পর্কেই নতুন রূপকথা। বেলভিলের লড়াইয়ে তারা জিতেছে, এবার তারা সুখী হবে।

'মিলাবে মানব জাত...'

আনের মনে পড়ে কাফের সেই সৈনিকদের কথা। স্বাসহর্গের কথা যে বলেছিল তার গালদ্বটো বাচ্চা ছেলের মতো লালচে। চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল আনে, ক্ষীণদৃষ্টি চোখদ্বটো এত অসহায় আর কোনোদিন দেখায়নি।

'আচ্ছা পিয়ের, বল তো সত্যিই কি যুদ্ধ হবে?'

'না!'

'এখন না হোক, পরে?'

'এখনো না, পরেও না। কোনো সময়েই হবে না।'

পনের

পপ্‌লার ফ্রন্টের জয়লাভে কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ধর্মঘট, সংকট, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি নানা সম্ভাবনার কথা আলোচনা করল তারা। শঙ্কিত গলায় অবস্থাপন্ন গিন্নীরা কানাকানি করলেন, 'বাড়ীর ঝিটা তো এর মধ্যেই অবাধ্য হয়ে উঠেছে! দোকানদাররা মাল লুকিয়ে ফেলল। সরকারী চাঁইরা বিনীতভাবে নিবেদন করলেন যে তাঁরা নতুন মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করতে রাজি নন : 'আরে ওরা তো এক ঘণ্টার খলিফা মাত্র!' ব্রতেই সমস্ত 'খাঁটি ফরাসী'র কাছে আবেদন জানাল—পপ্‌লার ফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে তাঁরা যেন বাড়ি বাড়ি জাতীয় পতাকা তোলেন। কয়েকটা রাস্তায় কোনো কোনো বাড়িতে তিনরঙা পতাকা উঠল, আর লাল ঝাণ্ডা উঠল অন্য বাড়িগুলোতে। মনে হল—শুধু যে একদল লোক আর এক দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তা নয়, পাথরগুলো পর্যন্ত ঠোকাঠুকি করতে চায়। কারবারী মহলে দারুণ বিশৃঙ্খলা। গুজব উঠেছে, পুঁজির ওপর মোটা ট্যাক্‌স্‌ বসবে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হবে। পুঁজিপতিরা তাদের সমস্ত টাকা তাড়াহুড়ো করে আমেরিকায় চালান দিয়ে দিল।

শান্ত আছে শুধু দেসের। কোনো একজন ব্যাঙ্কার বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই রকম সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করছ কি করে?' দেসের জবাবে বলেছিল, 'আচ্ছা, আমাকে বুঝিয়ে বলতে পার ব্লুম আর সারোর ভেতর পার্থক্য কোথায়? আমার বুদ্ধিটা একটু মোটা, এত সূক্ষ্ম তফাৎ আমি তো ধরতে পারি না।'

ভীইয়ারকে মন্ত্রীপদ দেওয়া হয়েছে শুনে দেসের ঠিক করল তার সংগে বেশ খানিকটা কথাবার্তা বলবে; হাজার হোক এই লোকগুলো এখনো শিশু তো, ফস্‌ করে একটা কিছু করে বসতে পারে। টেলিফোনে ডেকে ভীইয়ারকে বলল, বহুদিন থেকে তার ইচ্ছে ভীইয়ারের ছবিগুলো একবার দেখবে সে।

সভায় বক্তৃতা দেবার সময় ভীইয়ার একাধিকবার দেসেরের নাম উল্লেখ করেছে ধানু ব্যবসায়ীদের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে। কিন্তু আজ দেসের আসবে শুনে গর্বভরে ভাবল, 'শেষ পর্যন্ত ধরতে গেলে দেসেরই তো আমাকে নির্বাচিত করেছে!' বক্তৃতায় লোকটির সম্পর্কে যা কিছু বলেছিল, সব ভুলে গেল সে। আজকাল ভীইয়ারের চালচলন একেবারে

বাজনদারদের হাতে পাঁচ সু' পয়সা গুজে দিয়ে দেসের একটি মেয়ের হাত ধরল। মুখে মেচেতা পড়া মোটাসোটা মেয়েটি, সস্তা পাউডারের গন্ধ গায়ে, নাচবার সময়ে গদগদ হয়ে চোখদুটোকে পাক খাওয়াতে থাকে। নাচ শেষ হলে দেসের মেয়েটিকে শেরি-ব্যাণ্ডি খাওয়াল।

'তুমি কি নাচতে ভালবাস?'

দেখা গেল মেয়েটি একটু বেশি কথা বলে : 'ভীষণ ভালবাসি! কিন্তু নাচবার সুযোগ পাই না বিশেষ। সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হয়। তারপরেও কিছু কাজ নিয়ে যেতে হয় বাড়িতে। জানেন, আমি কত মাইনে পাই? মাসে পাঁচশো পঞ্চাশ ফ্রাঁ। এই মাইনেতে চলে কখনো। সবাই বলছে এ অবস্থা আর থাকবে না। দরজিরা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, যদি মাইনে বাড়ানো না হয় তবে ধর্মঘট হবে। এখন পপুলার ফ্রন্টের যুগ, পুরনো দিনের মতো কেউ আর থাকতে চায় না। ঠিক বলিনি?'

পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে দেসের তার অস্বাভাবিক রকমের বড়ো ভুরু দুটো কুঁচকে তাকিয়ে রইল।

'নিশ্চয়ই, সব বদলে যাবে। যেমন ধরা যাক, এতদিন ধলারা কালোদের সঙ্গে নেচেছে—এবার ভাইয়ার হুকুম দেবে, কালোরা ধলাদের সঙ্গে নাচবে। আচ্ছা, বিদায় হে প্রিয়বান্ধবী! আমার যাবার সময় হয়েছে।'

ষোল

শনিবার 'সিরেন' বিমান-কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল। সারা সপ্তাহ ধরে শ্রমিকরা আপোসে মিটমাটের চেষ্টা করেছে। মাইনে বাড়ানোর দাবিতে আপত্তি নেই দেসেরের, কিন্তু অন্য দাবিগুলো সে সরাসরি না-মঞ্জুর করেছে। বিশেষ করে যে দুটো দাবি সম্পর্কে সে এতটুকু মাথা নোয়াতে রাজি নয় তা হচ্ছে মজুরির ব্যাপারে যৌথভাবে দরাদরি করার অধিকার আর পুরো মাইনেতে ছুটি। এক কথায় সে বলে দিয়েছে, 'এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হবে না।'

দেসের জানে মাঝে মাঝে ধর্মঘটকে কিছুতেই এড়ানো যায় না। এই ছোট ছোট যুদ্ধগুলোতে কখনো জেতে শ্রমিকরা কখনো বা দেসের। কিন্তু যে দল হারে তারা প্রত্যেক-বারেই প্রতিশোধের কথা চিন্তা করতে থাকে। সব সময়েই ধর্মঘটীদের দাবি শেষ পর্যন্ত একটা মূল কথায় এসে দাঁড়ায়—কাজের সময় কমানো আর মাইনে বাড়ানো। এ ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় দেসেরের। সে নিজে হাজার রকম উপায়ে টাকা উপায় করতে পারে কিন্তু শ্রমিকদের কাছে মাইনে বাড়ানোর একমাত্র রাস্তা—ধর্মঘট। বাকি যা কিছু সবটাই নির্ভর করে বিশেষ অবস্থা ও অনমনীয় মনোভাবের ওপর। কারখানায় যদি কাজ বেশি থাকে আর বেকার দক্ষ শ্রমিক যদি না পাওয়া যায় তবে দেসের আপোসে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে। আর কখন কাজ কম ও দালাল প্রচুর, দেসের কিছুতেই মাথা নোয়ায় না। এক বা দু সপ্তাহ পরে ধর্মঘটীরা উপোস সহ্য করতে না পেরে কাজে ফিরে আসে. কিংবা

দেসের পুরনো লোকদের মাইনে চুকিয়ে নতুন লোক নেয়। এই চিরকালের দ্বন্দ্বকে জীবনেরই নিয়ম বলে মনে করে সে; বিরোধীদের সম্পর্কে তার সহানুভূতিও নেই, বিদ্বেষও নেই।

নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট জয়লাভ করেছে এবং এই জয়লাভে দেসেরেরও কিছুটা হাত আছে। র‍্যাডিকালদের কূটকৌশলের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল দেসের। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন তার পুরনো বন্ধু। ভীইয়ারের কথাবার্তায় তার মনের সমস্ত ভয় কেটে গেছে। ভীইয়ার অনেক দিনের ঝানু বক্তা, এবার সে বক্তৃতার আগুন ছুটোতে পারবে। আগুনে বক্তৃতাতে ভয় পায় না দেসের—ফুলঝুরির ফুলকিকে অগ্নিকাণ্ড মনে করাটা অর্থ-হীন। ধর্মঘটের আশঙ্কা তার মনেও ছিল—শ্রমিকরা যে সুযোগ ছাড়বে না, তা জানত সে। সুতরাং সে প্রস্তুত হয়েই ছিল—দর কষাকষির কায়দা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু মিশো যে সব দাবি পেশ করেছে তাতে সে রীতিমত চটে গেছে। সে তো আর সরকারী দানছত্র খুলে বসেনি, ব্যবসা করতে নেমেছে। ভীইয়ার যদি মনে করে হাওয়া খাবার জন্যে শ্রমিকদের সমুদ্রের ধারে যাওয়া দরকার, তাতে আপত্তির কি আছে। বেশ তো, ভালো কথা। সরকারী টাঁকশাল থেকে খরচটা দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু যৌথভাবে দরাদরি করে মজুরি ঠিক করাটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

সে বলেছিল, 'না, তা হয় না, মশায় মিশো! স্বাধীনতার নীতিতে আমি বিশ্বাস করি। এই কারখানায় আপনার থাকা বা না-থাকা আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে, আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। তেমনি, এই কারখানায় আপনাকে রাখা বা না-রাখা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে, আমি যা ভালো মনে করব তাই করব।'

সেই শনিবার একটি লোকও কাজে হাত দিল না। আঠারো হাজার লোক জড়ো হল ঢালাই ঘরের সামনের উঠোনে। ল্যাগ্র্যা চিৎকার করে বলল, 'যাঁরা বিরুদ্ধে হাত তুলুন।'

শ্রমিকদের ভেতর কয়েকজন ভীরু প্রকৃতির লোক ছিল। ধর্মঘটে সায় ছিল না তাদের, অন্য শ্রমিকদেরও দলে টানতে চেষ্টা করেছিল। বাড়ির লোকের বকাবকিকে তারা ভয় করত, উপোস আর হেরে যাবার আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু এত লোকের সামনে তারা নিজেদের ভীরুতাকে প্রকাশ করতে চায় না, মুখ ভার করে চুপ করে থাকে। একটি হাতও ওঠে না।

সকলে গেটের দিকে এগিয়ে চলে। হঠাৎ মিশোর গলা শোনা যায় :

'কমরেড্স্, থামুন!...চলে যাবেন না!...'

একটা লরির ওপর দাঁড়িয়ে লাউড-স্পীকারে মুখ রেখে সে বলে, 'চলে যাবেন না!' প্রতিধ্বনির মত চারদিক থেকে আওয়াজ ওঠে, 'চলে যাবেন না!'

মিশো বলে, 'কমরেড্স্, যদি আমরা চলে যাই, ওরা দালাল এনে কাজ চালাবে। এখানে আমরা ঘাঁটি গেড়ে বসব, এখানে রাত কাটাব, এখানে থাকব—একদিন বা এক সপ্তাহ বা এক মাস, যতোদিনই হোক, না জেতা পর্যন্ত আমরা নড়ব না!'

সবাই অবাক। মিশো কি বলতে চাইছে ঠিক বুঝতে পারছে না কেউ।

'আমরা তো ধর্মঘট করেছি!'

'এখানে থাকলে খাব কি?'

'আর পুলিশ এসে গুঁতিয়ে বার করে দেবে আমাদের!'

লাউড-স্পীকারে মুখ রেখে মিশো বলে চলে, 'খাবার ব্যবস্থা কমিটি করবে। সেজন্যে ইউনিয়ন থেকে আমরা টাকা নেব। ওরা যদি আমাদের বার করে দিতে চেষ্টা করে তবে

তুমুল কাণ্ড হয়ে যাবে। চারদিকে পিকেট বসাতে হবে আমাদের। কোন দালালকে আমরা ঘেষ'তে দেব না। বড়োবাবুদের কারখানার বাইরে যেতে দেব কিন্তু ঢুকতে দেব না। কমরেড্স্, এরকম ধর্মঘট এর আগে আর হয়নি সত্যি কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব...'

মিশোর তরুণ বন্ধু, কারখানার টার্নার জেনো আপিসবাড়ির ছাদে উঠে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে দেয়। 'আমাদের দুর্গ-পতাকা!' নিচের লোকদের দিকে তাকিয়ে সে বলে।

এইভাবে যে অভূতপূর্ব ধর্মঘট শুরু হল তা কাঁপিয়ে তুলল সমস্ত দেশকে।

সারাদিন দলে দলে লোক ভিড় করল জেটির ধারে কারখানার চারপাশের রাস্তায়। টিনের টুপি মাথায়, পাশে গ্যাস-মুখোস ঝোলানো তিন হাজার পুলিশ সার বেঁধে দাঁড়াল কারখানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। কিন্তু সরকারী মতিস্থিরতা না থাকায় তারা আক্রোশ মেটাল কারখানায় প্রবেশেচ্ছুক মজুর-বৌ আর নিরীহ পথচারীদের ওপর। সন্ধ্যার সময়েও দেখা গেল দলে দলে স্ত্রীলোক ঢুকছে কারখানার ভেতর। সঙ্গে আনছে রুটি, মাংস, মাখন, ফল ও মদ। ফুটবল, দাবার ছক, বই আর গীটার বাজনাও এনেছে কেউ কেউ। কয়েকটা ডিম আর একটা বালিশ হাতে করে জেনোর মাও এসেছে। দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল জেনো, নিচ থেকে মা চিৎকার করে বলে, 'কি যে সব পাগলামি ঢোকে মাথায়, পাজি বেহায়া কোথাকার! বাড়ি এসে ঘুমোবি আয়!' জেনো বোকার মতো হাসে। ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একমাত্র পিয়ের যোগ দিয়েছে ধর্মঘটীদের সঙ্গে। ওয়ার্ক্‌স্ ম্যানেজার বলেছিলেন, 'সাবধান, জানেন তো দলত্যাগীদের কেউ পছন্দ করে না।'

'আপনি জেনে রাখুন মশায়, আমার বাবা মজুর ছিলেন।'

পিয়েরকে দলে পেয়ে খুশি হয়েছে জেনো। তার মনে একটা নিশ্চয়তা এসেছে যে ধর্মঘট জয়যুক্ত হবে। জেনোর বয়স উনিশ; ব্যারিকেড, বুলেট আর ঝাণ্ডার স্বপ্ন দেখে। এমন কি পিয়েরও স্বপ্ন-প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়।

রাত্রিবেলা কারখানাটাকে ফৌজী ছাউনির মতো মনে হল; ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে শান্ত্রী দাঁড়িয়েছে। জেনো আর পিয়ের ছিল বড় গেটের সামনে। পিয়েরের মনে হচ্ছে যেন সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ হতে পারে।

ফিস্‌ফিস্ করে জেনো বলে, 'ওরা যদি আক্রমণ করে? তোমার কাছে রিভলবার আছে তো?'

'আছে। কিন্তু রিভলবার ব্যবহার করা চলবে না। তার আগে মিশোকে জিগ্যেস করতে হবে।'

হঠাৎ একদিনে নেতা হয়ে গেছে মিশো। এতদিন কারখানার কয়েকজন সঙ্গী আর কমিউনিস্টরা ছাড়া বিশেষ কেউ চিনত না তাকে। এখন সবার মুখে এক কথা, 'মিশোকে জিগ্যেস কর...মিশো এই হুকুম দিয়েছে...মিশো এতে মত দেয়নি...'

আর অক্লান্ত পরিশ্রম করছে মিশো। রান্নাঘর বসিয়েছে, ব্যাণ্ড-বাজনার দল তৈরী করেছে, জেলা-কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, 'ল্যুমানিতে'র জন্যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। সহজেই ভেঙে পড়ে এমনি লোকদের উৎসাহিত করে বলে, 'আমরা জিতবই! ঠিক তাই!' মেশিনঘরে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে আসে ধ্বংসকার্যের বিরুদ্ধে।

সন্ধ্যার সময় ব্যাণ্ডের সুরে 'ইণ্টারন্যাশনাল' বেজে ওঠে। হাজার হাজার লোক গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। সেই শব্দ ভেসে চলে কারখানার সীমানা পার

হয়ে, পুলিশ প্রহরীর মাথার ওপর দিয়ে, নদী ডিঙিয়ে, উত্তেজিত শহরতলীর অন্ধকার বাড়িগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে। দূর থেকে ভেসে আসা গান শুনে বিছানায় এপাশ ওপাশ করে মজুর-বৌরা। কাল কি হবে? অনশন? রক্তপাত? সুখ? ধর্মঘটীরাও ঘুমাতে পারে না। গ্রীষ্ম-রাত্রির তারাঝলা আকাশের তলায় তারা জয়ের স্বপ্ন দেখে।

সংঘর্ষের আশঙ্কায় রাত্রিবেলা পুলিশবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হল। রবিবার কারখানায় ঢোকবার পথে আর কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু তবুও কারখানাটাকে অবরুদ্ধ দুর্গের মতো মনে হচ্ছে। কে অবরোধ করেছে? দেসের? দালালদের প্রেতাত্মা? অনশনের দুঃস্বপ্ন? জয়ের দিন পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা নিল সবাই।

সোমবার সন্ধ্যায় মিশো বিকেলবেলার কাগজ খুলেই চিৎকার করে ওঠে, 'অন্যরাও যোগ দিয়েছে! সবাই! ঠিক তাই!...'

সে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে ভালো করে কথা বলতে পারছে না। 'লা ভোয়া নুভেল্' খবর দিচ্ছে যে 'সিয়েন' কারখানার এই অসাধারণ ধর্মঘট সারা পারীতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কারখানার ভেতরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। বিভাগীয় দোকানগুলোতে পর্যন্ত ধর্মঘট চলছে। রাত্রিবেলা দোকানগুলো উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করতে থাকে—দোকানের মেয়ে-কর্মচারীরাও জায়গা ছাড়েনি। একটি সরকারী আপিসের কম-মাইনের কর্মচারীরা ধর্মঘট ঘোষণা করে আপিসের ভেতরেই বসে আছে। এই চমকপ্রদ ধর্মঘটের বিবরণ লিখেছে জলিও নিজে তার নিজস্ব আবেগময়ী ভঙ্গিতে: 'পারীর সাধারণ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে আভ'তিন্ পাহাড়ে।' বিবরণে বলা হয়েছে—পারীর শ্রমিক অঞ্চল জনশূন্য, স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া আর কাউকে রাস্তায় দেখা যায় না। বিবরণটা জলিও শেষ করেছে খানিকটা কবিত্ব করে—'দেখে মনে হয় যেন সেই যুদ্ধ-সময়ের দিনগুলো ফিরে এসেছে আবার। পুরুষরা চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে বহু দূরে—যুদ্ধক্ষেত্রে...'

ধর্মঘটের খবর শুনে দেসের দিন দুয়েক চুপচাপ তার বাগানবাড়িতে কাটিয়ে দিল। ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম ফেলে রাখে, বাড়ির টেলিফোন কেটে দেয়, আর অভিদ্-এর বই নিয়ে সারাটা দিন ঘরের ভেতর কাটিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। জোর করে কারখানা দখল করার কল্পনাও তার কাছে অসম্ভব। এত অসম্ভব যে এই ব্যাপারটার একটা দ্রুত পরিণতি হবে বলেই সে আশা করে। তার ধারণা, হয় শ্রমিকদের শুভবুদ্ধি ফিরে অসবে এবং তারা বাড়ি ফিরবে, নয়তো একটা বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। সোমবার দিন দেসেরকে জানানো হল যে ধর্মঘট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরদিন সকালে সে পারী গেল। কারখানার গেটের সামনে তার গাড়ি যখন থামল তখন নটাও বাজেনি। গেটের সামনে যে অল্পবয়সী শ্রমিকটি পাহারা দিচ্ছিল সে পথ আটকায়:

'বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'আমি বাইরের লোক নই। আমি এই কারখানার পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। আমার নাম দেসের।'

শ্রমিকটি হাসে, 'হ্যাঁ, নামটা শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু দেখুন মশিয় দেসের, আপনাকে যদি আমরা ঢুকতে দিই, আপনি আর বেরিয়ে আসতে পারবেন না। কারখানার ভেতরেই আপনাকে থাকতে হবে যতোদিন না...'

'যতোদিন না?'

'যতোদিন না ম'শিয় দেসের আমাদের পথ ছেড়ে দেন।'

দুজনেই হেসে ওঠে। কিন্তু মনে মনে খুবই রেগে গেছে দেসের।। কী আবদার। ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে কী চমৎকার ধারণা! ধর্মঘটী শ্রমিক মহাশয়দের যদি বাড়ি যেতে না দেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা মজাটা টের পান। কিন্তু বাইরে দেসের কোন রাগ বা অসন্তোষ দেখায় না, তেমনি প্রাণখোলা হেসে বলে ঃ

'তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান লোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু যাই হোক আমাকে ঢুকতে দিতেই হবে।'

শ্রমিকটি একজন কমরেডকে পাঠাল মিশোর কাছে নির্দেশ নেবার জন্যে। পাঁচ মিনিট পরে সে বলে ঃ

'আপনি ভেতরে আসতে পারেন। যখন খুশি চলে যাবার অধিকারও আপনার রইল। কিন্তু মেশিনঘরের ভেতরে আপনি ঢুকতে পারবেন না—কোনো গোলমাল যাতে না হয় সে জন্যেই এই ব্যবস্থা।'

শ্রমিকটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে দেসের বলে, 'বাঃ, কাজকারবার কি ভাবে চালাতে হয়, তাও শিখে ফেলেছ দেখছি। চমৎকার!'

জনশূন্য পরিত্যক্ত আপিস-ঘরগুলো পার হয়ে যায় দেসের। অনেক দিনের পুরনো পত্রবাহক লোকটি অপরাধীর মত আসে পেছনে পেছনে।

'এখানে কি কেউ নেই?' দেসের জিজ্ঞেস করে।

'ওরা সকলেই শনিবার চলে গেছেন। শুধু ম'শিয় দ্যুবোয়া এখনো আছেন। আর, মাফ করবেন হুজুর, তিনিও শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।'

'তিনি কি যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করছেন?'

'মাফ করবেন হুজুর, তিনি ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।'

দেসের হেসে ওঠে। তাহলে পিয়েরও কারখানা দখল করবে বলে ঠিক করেছে! 'ম'শিয় দ্যুবোয়াকে ডেকে আন।' সে বলে।

পিয়েরকে বসতে বলে সিগারেট বাড়িয়ে দেয় দেসের। তারপর বলে, 'তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। নেহাতই ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন। এই কারখানাটা তোমরা কি একেবারেই দখল করে নিলে, না মাত্র কিছুদিনের জন্যে? জানতে পারলে আমার সুবিধে হয়, কারণ তাহলে আমি আমার সময়টা কাটাবার একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারি।'

পিয়ের বলে, 'কারখানা কেউ দখল করেনি। এটা হচ্ছে ধর্মঘট। আর আমার মতে ধর্মঘটীদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য।'

'চমৎকার! তাহলে তোমার মতে এটা হচ্ছে ধর্মঘট? না বন্ধু, না। এর নাম জুলুম, হিংসা। মনে কোরো না, সম্পত্তি হারাবার ভয়ে আমি কাঁপছি। আমার ভয় ফ্রান্সের জন্যে। একবার যদি হিংসাত্মক কাজ শুরু হয়, তাহলে চলতেই থাকবে।'

'আপনি নিজেই বলছেন, অপরের সুখে আপনি বাদ সাধতে চান না। কারখানার শ্রমিকরা বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায় আরও ভালোভাবে, আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার ভেতর। এতে আপনি আপত্তি করবেন কেন?'

দেসের বলে, 'আমি তোমার আগেই বলেছি, সামান্য একটু অসাবধানতার ফলে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সমস্ত কিছুতেই এখন একটা জট-পাকানো অবস্থা। সবই এখন গড়ানে পথে যেন নিচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু আপনার ওপরেই তো সব কিছু নির্ভর করছে। শ্রমিকদের সঙ্গে আপোসের শর্তগুলো মেনে নিলেই তারা কারখানা ছেড়ে চলে যাবে।'

'তার মানেই আত্মসমর্পণ করতে বলছ? ওটা আমার ব্যবসাও নয়, স্বভাবও নয়। বরং আমি অপেক্ষা করব। ইচ্ছা করলেই আমি পুলিশ ডাকতে পারি। নিজের অধিকারকে বজায় রাখার জন্যে সরকারী সাহায্যও নিতে পারি। কিন্তু দুটোর কোনোটাই আমি করব না। কেন? পপুলার ফ্রণ্টকে আমি ভোট দিয়েছি—এজন্যেই হয়তো। কিন্তু তোমরা কি করছ? চারদিকে ধ্বংস ডেকে আনছ। দেশের সংস্কার করবার একটা সুযোগও ভীইয়ারকে তোমরা দিচ্ছ না।'

পিয়ের বলে, 'ঠিক তার উলটো। ভীইয়ারকে আমরা সাহায্য করছি। এখন জনসাধারণের আন্দোলনের ওপর আস্থা রাখতে পারবে ভীইয়ার। ভীইয়ার যে আমাদের সমর্থন করেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। তিনি...'

ছবি আর আসবাবের পরিবেশে প্যাশনে চোখে সেই বৃদ্ধ লোকটিকে মনে পড়ে দেসেরের। একটু হেসে সে বলে, 'তাই কি তোমার বিশ্বাস? তা যদি হয় তো ভালোই। তোমার সাফল্য কামনা করি। হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাল তো? বেশ, বেশ। এবার আমি কারখানার বাইরে যেতে পারি বোধ হয়? আচ্ছা চললাম।'

তার ও দেসেরের ভেতর যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে কমিটির কাছে খুলে বলে পিয়ের। তারপর মিশোকে বলে, 'আমি ভাবতেই পারিনি লোকটা এই রকম...।' কথাগুলো তার গলায় আটকে যায়।

মিশো হাসে।

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে দেসের ঠিক দেসেরের মতই হবে, এটা তুমি কোনোদিন ভাবনি?'

সন্ধ্যের সময় ঠিক হল, ধর্মঘটীদের আমোদপ্রমোদের জন্যে কিছু গানবাজনার বন্দোবস্ত করা হবে। 'মেজোঁ দ্য কুলতুর'-এ টেলিফোন করে মিশো জানতে চাইল, এ বিষয়ে তারা সাহায্য করতে পারে কিনা। অভিনেতা জড়ো করবার চেষ্টা করল মারেশাল। কয়েকজন অভিনেতা জানালেন, তাঁরা ব্যস্ত—কিন্তু জেনেৎ এক কথায় রাজী হয়ে গেল যদিও অপারেশনের পর তখনো তার শরীর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

আপিস ঘরের সামনে ছোট বাগানটায় মঞ্চ তৈরি হল। বাতাসে জুঁই ফুলের গন্ধ। আলোগুলোর ওপরে চিনে লণ্ঠনের ঝাড়। অর্কেস্ট্রা বাজিয়েরা সুর বাঁধছে। স্থানীয় উৎসবের দিনে মফস্বল শহরের স্কোয়ারের মত মনে হচ্ছে কারখানার উঠোনটাকে।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে। মারেশাল আবৃত্তি করে র‍্যাঁবোর মৃত সৈনিকের উদ্দেশ্যে লেখা শোকগাথা। কবিতার আশ্চর্য শব্দগুলো আচ্ছন্ন করে শ্রোতাদের, গভীর স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপর একটি মেয়ে গান গায়—রাভেলের প্রেমের গান। শ্রোতাদের অনুরোধে বারবার গাইতে হয় গানটা। ঢেউ-খেলানো লোহার পাত আর লালঝাণ্ডার পটভূমিকায় আঁকা হয়ে থাকে তার মুখের হাসিটুকু। কারখানার চুল্লীতে কয়লা যোগান দেয় যে শ্রমিকটি, সে গায় মোরিস শেভালিএ-র একটা গান : 'পারী আজো সেই পারী।'

সেই গানের সঙ্গে গলা মেলায় প্রত্যেকটি শ্রোতা। গায় আর হাসে। না, তা নেই। পারী বদলে গেছে। তারপর জেনেতের পালা।

এত উৎফুল্ল আর কোনোদিন হয়নি জেনেৎ। মাসের পর মাস কেটেছে মাইক্রো-ফোনের সামনে নীরব প্রাণহীন বিজ্ঞাপনের বুলি আউড়ে; আবার মনে হল, দীর্ঘকাল নির্বাক থাকার পরে আবার ফিরে পেয়েছে সে তার মুখের ভাষা। ছোট ছোট লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে জ্বলজ্বল করছে তার আয়ত চোখদুটো; গলার স্বরের দরদে বুঝি চোখের জল নামবে। 'নিষ্ফল বসন্ত' থেকে কিছুটা অংশ সে অভিনয় করল। অভিনয়ের শেষে প্রশংসা আর অভিনন্দনের ঝড় উঠল যেন। হাততালির শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল অনেক মানুষের চিৎকার। জেনেতের মনে হল, ফ্যাঁৎ অভেজুঁয়ার জনসাধারণ জেগে উঠেছে, এগিয়ে চলেছে জয়ের পথে—সে আর এখন সামান্য অভিনেত্রী জেনেৎ নয়, বীরনেত্রী আন্দালুসিয়া ডাক দিচ্ছে জনসাধারণকে। হঠাৎ জেনো মঞ্চের গোড়ায় ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এস, যাই!'

জেনো বলতে পারবে না, কেন বা কি জন্যে সে চিৎকার করে ডেকে উঠেছিল; সে শুধু জেনেতের দুই চোখের চাউনির সাড়া দিয়েছে। জেনেৎ হাসল—সুখী আর ক্লান্ত হাসি। এগিয়ে এসে জেনেতের হাত ধরল পিয়ের।

'আপনি চমৎকার আবৃত্তি করেছেন' বলল সে, 'আপনি এসে কী ভালই না হয়েছে! দেখলেন তো, এ'রাই আপনাকে সত্যিকার বুঝতে পারে। এ'রা তো আর শৌখিন থিয়েটার-দর্শক নয়, জীবন্ত জনসাধারণ। লুসিয়ঁ এলে ভাল হত। লুসিয়ঁ এল না কেন, অন্য কাজে ব্যস্ত বুঝি?'

'জানি না। ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় না। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

ক্ষণিকের জন্যে জেনেতের মন খারাপ হয়ে গেল। অনেক কথা মনে পড়ে গেছে—নিজের নিঃসঙ্গ জীবন, হোটেলের নোংরা ঘর যেখানে সে সম্প্রতি উঠে এসেছে, রেডিওর নিস্তব্ধ স্টুডিও আর অভিশপ্ত বিজ্ঞাপন ঘোষণা। হঠাৎ শোনা গেল শ্রমিকেরা গলা মিলিয়ে গান গাইছে—'শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা।' অরণ্যের সূর্যসন্ধানী শাখাপ্রশাখার মতো বা বন্দরের মাস্তুলের মতো হাজার হাজার বজ্রমুষ্টি উঁচু হয়ে ওঠে আকাশের দিকে। জেনেৎও তার ছোট্ট হাতের মুঠি তোলে। চারদিকের শব্দ আর তার নিজের চোখের জল তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনেৎ তারপর কারও দিকে না তাকিয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে যায়।

কারখানার আলো জ্বলে সারারাত ধরে আর মিশোর রাত কাটে শান্ত্রীদের রোঁদে ঘুরে ঘুরে।

সতেরো

যে-রাত্রে জেনেৎ সিয়েন কারখানায় অভিনয় করে, সে-রাত্রে লুসিয়ঁ তাসখেলায় চোদ্দ হাজার ফ্রাঁ হেরে যায়। ভাগ্য সেদিন তার ওপরে আগাগোড়া এত বিরূপ ছিল যে লোকে তার দিকে তাকাতেও শুরু করেছিল। 'শিল্পীসংঘ'টা আসলে একটা নিচুস্তরের জুয়োর আড্ডা। সুদখোর, ধড়িবাজ তেমুড়ে আর গণিকাদের ভিড় এখানে। উত্তেজনায় ও গরমে অবসন্ন জুয়াড়ীদের সঙ্গে তারা অবাধে মেলামেশা করে। হাজার ফ্রাঁ-র শেষ নোটটা ভাঙা-

বার পর হঠাৎ লুসিয়ঁর দম আটকে এল, খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়াল সে।

পেছনে কার যেন চাপা মন্তব্য শোনা গেল, 'নক্ষত্রের শোভা উপভোগ করা হচ্ছে নাকি ?'

লুসিয়ঁ জবাব দিল না। নিচে পারীর মুখর রাস্তা। একপাশে প্রস্রাবখানাটার মাথায় একটা সাইনবোর্ড জ্বলছে : "দেখন-হাসি গরু—বাজারের সেরা পনির।" হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঈথরের গন্ধ ভেসে আসতে হাসপাতালের অপারেশন ঘরের কথা মনে পড়ে যায় লুসিয়ঁর। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে, বার্জারের বোকা-বোকা মুখটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। বার্জারের মতলব বুঝতে একটুও দেরি হল না তার—ও এসেছে ধার শোধ দেবার কথা মনে করিয়ে দিতে।

'নাঃ, শেষ পর্যন্ত তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে দেখছি।' ক্রুদ্ধস্বরে বলে বার্জার।

তখন লুসিয়ঁ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে এক্ষুনি তাকে চলে যেতে হবে—দেশ ছাড়তে হবে একেবারে। কিছুদিন থেকে দারুণ মানসিক কষ্ট ভোগ করছে সে—সমস্ত আশা চুরমার হয়ে গেলে মানুষের যেমন হয়। তার উচ্চাশা গোপন ব্যাধির মতো তাকে নিঃশেষ করেছে, অত্যন্ত তীব্রভাবে মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। শব্দজগৎ নিস্তব্ধ, বস্তুজগৎ আবছা হয়ে গেছে, নাকে ঈথরের গন্ধটা কায়েমী হয়ে আছে যেন। রাত্রিবেলা রাস্তায় কোনো স্ত্রীলোককে দেখলে জেনেৎ বলে ভুল হয়, হঠাৎ পেছনে ছুটতে শুরু করে। অন্ধকারে কখনো জেনেতের চোখদুটো ভেসে ওঠে, আর সে বোকার মতো বারবার বলে, 'আমার দোষ নয়, আমার দোষ নয়।' মনে হয় বুঝি বা জেনেতের প্রেতাত্মা তাকে দুষছে। তার নিশ্চিত ধারণা, জেনেৎ আঁদ্রের সঙ্গেই আছে; ঐ মাথামোটা শিল্পীটাকে সে ঘৃণা করে। দেশ ছেড়ে চলে যাবার চিন্তাটা মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠতেই সে যেন মুক্তির পথ দেখতে পায়। এই একটিমাত্র চালেই নিজেকে সে মুক্ত করবে মৃত প্রেমের বন্ধন থেকে, 'মেজোঁ দ্য কুলতুর'-এর বিরক্তিকর জনতার সান্নিধ্য থেকে, পাওনাদারের হাত থেকে।

কিন্তু বাইরে যেতে হলে টাকা দরকার, প্রচুর টাকা দরকার। আর একবার সে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে, ঠিক করে। এবার আর তাসের চাল নয়, নির্ভর করবে বাবার দাক্ষিণ্যের ওপর। বাবার মনটাকে কি ভাবে নাড়া দেবে তাই নিয়ে মনে মনে অনেক পাঁয়তারা কষে। কিন্তু আসল সময়টিতে এসে সমস্ত ভুলে গিয়ে একেবারে বেপরোয়াভাবে মনের ঝাল ঝাড়ল।

'টাকাপয়সা আগলে বসে থাকাটা তো তোমার একটা স্বভাব, মাংসের হাড় নিয়ে কুকুর যেমন করে।' সে বলে।

তেসা চুপ। ছোট ছোট পাখির মতো চোখে তাকিয়ে থাকে লুসিয়ঁর দিকে।

লুসিয়ঁ বলে, 'আমি বাইরে চলে যেতে চাই। এখানে করবার মতো কিছু নেই। হয়তো আমেরিকাতেই একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। কিন্তু সেজন্যে টাকা দরকার। অন্তত পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ আমার চাই।'

তেসা হাই তোলে। 'চল মাক্‌সিম-এ যাওয়া যাক' হঠাৎ বলে ওঠে।

মাক্‌সিম-এ ঢুকে তারা দেখে, ফুলের মতো মেলা বসে গেছে মেয়েদের। সুন্দর সুন্দর মুখ, ঠান্ডা শরীর, চমৎকার সান্ধ্য পোশাক আর দামী প্রসাধনের গন্ধ। একটি মেয়েকে ভারি ভালো লাগে তেসার। মেয়েটির গায়ের রং চাপা, দো-আঁসলা হবে। তার

চোখের সাদা অংশটুকু আয়ত।

'খাসা মালটি, না?' ফিসফিস করে তেসা বলে।

লুসিয় ঘাড় নাড়ে। এই ইঙ্গিত বিনিময়ের পর আবার পুরনো বন্ধুর মতো পরস্পরের কাছাকাছি হল দুজনে। শ্যাম্পেন আসতে হৃদ্যতা আরও জমে উঠল। তখন ছেলের অনুরোধটা মনে পড়ল তেসার, বলল, 'কি জন্যে তুমি বাইরে যেতে চাও? এখনই তো সময় তোমার পক্ষে। বিপ্লব শুরু হল বলে! এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'না, বিপ্লব হবে না। আর একটি মন্ত্রীত্ব-সংকটের ভেতরেই সব কিছুর শেষ হবে। বিপ্লবের জন্যে যে জনসাধারণকে চাই, তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। ফ্রান্সের লোককে চিনতে আর বাকি নেই আমার। কমিউনিস্টদের দলে ঢোকবার সময় অন্য একটা ধারণা আমার মাথায় ছিল।'

'তাই নাকি, এ্যাঁ! আমি ভেবেছিলাম, তুমি এখনো কমিউনিস্ট। বেশ, বেশ, লুসিয়।'

'তোমার এত খুশি হবার কারণ কি? কমিউনিস্টরা তোমাদের জগৎকে যতো ঘৃণা করে তার চেয়েও আমি বেশি করি। মনে কোরো না, তোমাদের সঙ্গে আমি আপোস করব।'

সারাদিন তেসা বুকজ্বালায় ভুগেছে। এক গ্লাশ সোডা খেয়ে স্নিগ্ধ স্বরে সে বলল, 'তোমার বয়স বত্রিশ হল, কিন্তু এখনো ছেলেমানুষের মতো কথা বল তুমি। আঠার বছর বয়সে আমি ছিলাম অ্যানার্কিস্ট। এখন মনে হচ্ছে, সেটা বরং আরো সহজে ক্ষমা করা যেত।'।

'তার মানে, আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা হচ্ছে...'

'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার নির্বাচনের কথা শুনে তুমি বলেছিলে—কী নীচ কাজ! তবুও তুমি মনে কর—নিজের পরিবারের অর্থাৎ তোমার মা, দেনিস আর তোমার খাওয়াপরার খরচ আমাকেই চালাতে হবে। বলতে পার কে তোমার এই উচ্ছৃঙ্খলতার খরচ যোগাচ্ছে।'

চেঁচিয়ে হেসে উঠে লুসিয় বলল, 'তুমি।'

'আমাদের শাসনব্যবস্থাকে তুমি পছন্দ কর না? কেউ করে না। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার বদলে অন্য কী চাও তুমি? যাই চাও না কেন, সেটা আরো খারাপ হবে। জেলখানার নতুন তক্তার চাইতে পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া বিছানা ভালো। এদিকে তো বলছ "তোমাদের জগৎ"—কিন্তু তোমার যা-কিছু-সব তো এই জগতেই! প্রচার-পুস্তিকা লেখার প্রতিভা তোমার আছে, কিন্তু সেটা তুমি কাজে লাগাচ্ছ আমাদের নিজেদের সমাজকে ভেতর থেকে ঘা দেবার জন্যে। কমিউনিস্টরা আজ তোমাকে বাহবা দিতে পারে, কিন্তু জেনে রেখো ওদের সঙ্গে তোমার কোথাও এতটুকু মিল নেই। তুমি নিজেই এটা স্বীকার করেছ। তাই যদি হয়, তাহলে আমার মতে তোমার সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আছে। বাজে সময় নষ্ট না ক'রে কোনো একটা কাজে লেগে পড়া।'

'কিন্তু আমার অবস্থাটা এমনিতেই যথেষ্ট গোলমেলে।'

'সেটা তো ভালোই হয়েছে বলতে হবে। গোড়াতেই যারা বেশি মাতামাতি করে তাদেরই পছন্দ করি আমরা। যুদ্ধের সময়ে লাভাল ছিল কমিউনিস্ট—আমার সঙ্গে কথা বলত না তখন। তুমি বাইরে যেতে চাও? বেশ তো। কিন্তু আমার কাছে এখন টাকা নেই। দেসেরের কাছে যা পেয়েছিলাম, সবই নির্বাচনে খরচ হয়ে গেছে। আমার

কবে হাতে টাকা আসবে বলতে পারছি না। তোমার কাছে খোলাখুলি বললাম সব কথা। কিন্তু একটা পথ আমি বাতলে দিতে পারি। রাজনৈতিক বিভাগে ছোটখাটো সরকারী চাকরি লেখকরা তো ভালবাসে। ক্লোদেল, জিরোদু, মরাঁ—এ'দের কথা ভেবেই বলছি... তোমার জন্যে এক্ষুনি এ ধরনের একটা ব্যবস্থা করতে পারি।'

'ওই ব্লুম আর ভাইয়ারের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে?'

'কেন নয়? এজন্যে তোমার নিজের মতবাদ বিসর্জন দেবার দরকার নেই। নিজের খুশিমতো লিখতেও পারবে তুমি। আর অর্থকষ্ট থেকে এক্ষুনি রেহাই পাবে।'

লুসিয়ঁ মুখচোখের এমন একটা বিকৃত ভাব করল যেন সে তেতো ওষুধ গিলছে। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারের মত এই প্রস্তাবটাও তার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তার কি দোষ? সে তো বিপ্লবের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল. কিন্তু সবাই তাকে ভুল বুঝল। জেনেৎও। মৃত্যুর সময় লাগ্রাঁজ বলেছিল, 'বড় ঠাণ্ডা লাগছে লুসিয়ঁ।' এই জগৎটাই ঠাণ্ডা, কী ভীষণ ঠাণ্ডা! বেঁচে থাকতে হলে সিনিক না হয়ে উপায় নেই। যাই হোক, বাবার কাছে টাকার জন্যে বারবার হাত পেতে নিজেকে ছোট করার চেয়ে কূটনীতিক হওয়া ঢের ভালো। সমাজে যদি সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তবে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করবে, লুমানিতে কাগজের মোটাবুদ্ধি লোকটা পর্যন্ত। আর সুখ? সুখ বলে কিছু নেই। জেনেৎ রয়েছে আঁদ্রের সঙ্গে...

'বেশ। আমার আপত্তি নেই।' বিষণ্ণ গলায় বলল লুসিয়ঁ।

'আমি জানতাম, তোমার আপত্তি থাকবে না। আর যাই হোক, তুমি তো আমারই ছেলে। এসব ব্যাপার এখন আমি হাতে হাতে বুঝছি।'

তারপর রুমালটা দিয়ে ভিজে ভিজে মুখটা মুছে ফিসফিস করে তেসা বলল, 'ওই দো-আঁসলা মেয়েটাকে আমাদের টেবিলে ডাকলে কেমন হয়?'

পরের দিনটা লুসিয়ঁ কাটিয়ে দিল ঘরের ভেতর। মাথাধরা ছাড়বার জন্যে বড়ি খেল আর গুম মেরে তাকিয়ে রইল ঘরের দেওয়াল-কাগজের দিকে। বেঁচে থাকতে চায় না সে।

সন্ধ্যেবেলা খাবার সময়ে তেসা তার স্ত্রীকে বলল, 'শুনছ গো, একটা সুখবর আছে। তোমার ছেলে সালামাঙ্কার সহকারী বৈদেশিক প্রতিনিধির পদ পেয়েছে। কি বল লুসিয়ঁ, নিজের চোখে বিপ্লব দেখতে চাও তো তুমি, বৈদেশিক দূতের গদিতে বসে ওকাজটা অনেক আরামে সারতে পারবে।...আর স্পেনের মেয়েরা...' দেনিসের দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে তেসা চুপ করে গেল।

'বড় তাড়াহুড়ো করছ তুমি।' ক্লান্তভাবে লুসিয়ঁ বলল।

'ভাইয়ারকে ফোন করেছিলাম। ও এখন আমার চেয়েও এক কাঠি ওপরে ওঠে। সবই একেবারে তালে হরিবোল ব্যাপার।'

পরদিন অপেরার সামনে আঁদ্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লুসিয়ঁর। কোনো কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার ইচ্ছা ছিল লুসিয়ঁর, কিন্তু আঁদ্রে তাকে থামাল।

আঁদ্রে বলে, 'কী কাণ্ডই না হচ্ছে! ধরতে গেলে সবাই আজ ধর্মঘটী। শেষ পর্যন্ত কি হবে বলতে পার? তুমি বোধ হয় জান।'

'আর তিন দিনের মধ্যেই আমি স্পেনে চলে যাচ্ছি।'

'সত্যি? হ্যাঁ, কাগজে পড়লাম, ওখানেও তো কি সব গোলমাল হচ্ছে যেন।'

নিজের কূটনীতিক পদের কথা লুসিয়ঁ বলে না। এই হতভাগাটার কাছে কেন

নিজের গতিবিধিকে সন্দেহমুক্ত করবার জন্যে ব্রতৈই বহু খেলার ক্লাব খুলেছে আর মফঃস্বলের লোকদের জন্যে আড্ডার বৈঠক বসিয়েছে। এই কাজের জন্যে টাকা দরকার। পুঁজিপতিদের কাছে সে একাধিকবার হাত পেতেছে কিন্তু সেখানে ধমক ছাড়া আর কিছু পায়নি। কথাবার্তায় প্রচারকার্য শব্দটা ব্যবহার না করে সোজাসুজি অস্ত্রশস্ত্রের দাবি তোলে সে আর তার এই সাহসিকতায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে প্রত্যেকে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনায় তার এতদিনের উচ্চাশা প্রায় পেখম ধরেছে। বিভিন্ন ট্রাস্ট-এর পরিচালকরা এতদিন শুধু মন্ত্রীসভার ভাঙাগড়া নিয়েই মাথা ঘামিয়ে এসেছে। এবার তারা এই ধর্মঘট দেখে আতঙ্কিত আর ভরসা করতে শুরু করেছে ব্রতৈইর একরোখামির ওপর।

ছেলের বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রতৈই একবার হাত দিয়ে ক্রুশচিহ্ন করে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। তার গন্তব্যস্থান 'মেৎস্-বাসীদের ইউনিয়ন'। সেখানে জেনারেল পিকার্ তার সঙ্গে দেখা করবে। গ্রাঁদ বুলভারে দোকানের জানলায় আলো জ্বলছে, লাল ফিতে দিয়ে সাজানো ধর্মঘটীদের বিজ্ঞাপনগুলো ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে 'ধর্মঘটীদের ছেলেমেয়েদের জন্যে' লেখা বাক্স হাতে চাঁদা তুলছে মেয়েরা। ভুরু কুঁচকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ কেউ, দু-একটা পয়সা ফেলে দিচ্ছে কেউ বা। একটি মেয়ে ব্রতৈইর সামনে চাঁদার বাক্সটা বাড়িয়ে ধরতেই ব্রতৈই থামে, তারপর কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের বুঝি ক্যাম্পে কাজ করার তালিম দিয়ে রাখা হয়?'

জেনারেল পিকার্ অপেক্ষা করছিলেন। রোগা ধরনের লোকটি, বয়স পঁয়ষট্টি, ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অফিসারের মতো বাঁকা পা, বুকের ওপর সারি সারি পদক, মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। দালাদিএ, গ্যামল্যাঁ, ইংলণ্ডের রাজা, নিজের স্ত্রী, রঙ্গমঞ্চ, সংবাদপত্র, নির্বাচন—সব কিছুকে ঘৃণা করে সে। একমাত্র ব্রতৈই ছাড়া আর কাউকে সে বিশ্বাস করে না, আর তার ধারণা—ব্রতৈই ফ্রান্সকে ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীকে বাঁচাতে পারবে।

'তারপর, খবর কি?' ব্রতৈই কথা শুরু করে।

'কতকগুলো বোকা জুটেছে। বোকা আর ভীতু। ওদের ভয় হয়েছে, ব্লুম এবার সমস্ত চাঁইদের বিদেয় করবে।'

'আর সৈন্যদের রকম-সকম কি রকম?'

'খারাপ। কমিউনিস্টরা উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা বড়ো জোর এটুকু ভরসা রাখতে পারি যে সৈন্যরা কোনো দলে ভিড়বে না। অবশ্য, ঔপনিবেশিক বাহিনীকে আমি ধরছি না। হ্যাঁ ভালো কথা, দুটি মরক্কো বাহিনীকে ভ্যাঁসেন-এ পাঠানো গেছে।'

'শুধু মুরেরা যথেষ্ট নয়। 'মন্ত্রশিষ্য'দের ওপরেই আমি নির্ভর করছি। দুটি মাত্র পথ আছে—হয় তোমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র যোগাও, নয়তো ওদের কাছে যা পাওয়া যায় তাই আমরা নেব।'

'কাদের কাছে?'

অপলক চোখে তাকিয়ে ব্রতৈই ফুঁশে ওঠে, "কাদের' কাছে পাওয়া যাবে সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা 'কি' পাওয়া যাবে। ষাট হাজার রাইফেল, চারশো মেশিনগান আর গোলাবারুদ ড্যুসেলডর্ফ দেবে। তাই বলে আমরা মাথা বিকিয়ে দিচ্ছি না। আমাদের যা কাজ অর্থাৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তা আমরা ঠিকই করে যাব।'

খানিকক্ষণ ভেবে পিকার বলে, 'মন্দ নয়। অবশ্যি এ-ধরনের অভিযানে ব্যক্তিগতভাবে আমি 'অটোমেটিক' পছন্দ করি। যাই হোক, নিয়ে নাও। একটার জন্যে আর একটা আটকাবে না। আর অস্ত্রাগার থেকে কিছু কিছু অস্ত্র আমি নিজেও হাতিয়ে

আনতে পারব...'

'স্থানীয়ভাবে কাজ শুরু করতে হবে আমাদের। প্রথম কাজ এই সরকারকে অপদস্থ করা। ভীইয়ার চেষ্টা করছে কারখানা-দখল-করা ব্যাপারটার ওপর বৈধতার প্রলেপ দিতে। ওর বক্তৃতার সঙ্গে খানিকটা রক্ত মিশিয়ে দিতে চাই।...'

অনেকক্ষণ কথা বলে দুজনে। পাশের ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। ঘরের ভেতর 'বর্মধারী' গ্রি-নে অপেক্ষা করছে ব্রতৈইর জন্যে। বসে বসে হাই তুলছে আর উকো ঘষে ঘষে হাতের নখ পরিষ্কার করছে। এই গ্রি-নে লোকটাই একবার 'মেজোঁ দ্য কুলতুর'-এ তুমুল হট্টগোল বাধিয়েছিল। ব্রতৈইর ওপর অন্ধ বিশ্বাস লোকটির। ছোটবেলা কেটেছে অনাথআশ্রমে, বড়ো হয়ে মফঃস্বল শহরে শহরে ঘুরেছে বিকলাঙ্গদের জন্যে সাজসরঞ্জাম বিক্রির ব্যবসায়-সূত্রে। হাস্যকর রকমের ফুলবাবু লোকটি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় টাই বাছতে, তবুও ঠিক করতে পারে না তার সযত্নে ইস্ত্রি করা জোড়া পোশাকের সঙ্গে কোন্ টাইটা মানাবে; চেহারা কুৎসিত কিন্তু রূপসীর প্রেমের স্বপ্ন দেখে; গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কিন্তু স্পষ্ট বক্তব্য কিছু থাকে না। 'মন্ত্রশিষ্য'দের প্রথম বাহিনীর 'বর্মধারী' সে। ব্রতৈই তাকে সামরিক গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগিয়েছে।

ব্রতৈই বলে, 'পরশুদিন 'মন্ত্রশিষ্য'রা সিয়েন কারখানায় হানা দেবে। এমন ভাবে তারা যাবে যেন তারা বেকার, কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেখানে তোমার কাজ হবে অন্যের চোখ এড়িয়ে গেটের কাছাকাছি হাজির থাকা আর পিকেটারদের সঙ্গে ঝগড়া বাধানো। এমনিতে না হয়, গায়ে পড়ে ঝগড়া করবে। তাতেও যদি না হয় তো গুলি চালাবে। কাছাকাছি পুলিশ রাখবার বন্দোবস্ত আমি করব। সত্যিকারের সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলতে হবে, বুঝেছ ? 'মন্ত্রশিষ্য'দের 'খৃষ্টীয় শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর টিকেট দেওয়া হবে। কিন্তু কি ধরনের অভিযান হবে সেটা যেন তারা না জানতে পারে। তোমার তো আর বাচ্চাকাচ্চা নেই তাই তোমার ওপরেই এ কাজের ভার দিচ্ছি।'

'তাই হবে, কর্তা।'

হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে গ্রি-নে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ব্রতৈই তাকে গাঢ় আলি-ঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ধন্যবাদ।'

রাত দুটোর সময় ব্রতৈই বাড়ি ফিরে এল। হলঘরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা। স্ত্রী বলল, 'ওর নিউমোনিয়া হয়েছে।'

সকাল পর্যন্ত রুগ্ন ছেলের বিছানার পাশে বসে রইল ব্রতৈই। তারপর সারাদিন কাজ। প্রথমে চেষ্টা করল দেসেরের সঙ্গে দেখা করতে,—কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যদি ঘোষণা করা হয় যে কারখানায় নতুন লোক নেওয়া হবে, তবে আর কোনো গোলমাল থাকে না। কিন্তু দেসের তার সঙ্গে দেখা করল না। দেসের সন্দেহ করেছিল, ব্রতৈইর দেখা করতে আসার পেছনে কোন একটা অভিসন্ধি আছে। কিন্তু পুলিশের বড়োকর্তাকে হাত করল ব্রতৈই। ঠিক হল, কারখানার কাছে জেটির ধারে ধারে পুলিশ পাহারা দাঁড়াবে আর কোনো বিশৃঙ্খলা হলে হস্তক্ষেপ করবে। সন্ধ্যেবেলা ব্রতৈই আর একবার কথা বলল গ্রি-নের সঙ্গে এবং পরের দিনের অভিযানের সমস্ত খুঁটিনাটি আলোচনা করল। তারপর আবার সে রাতভোর জেগে বসে রইল রুগ্ন ছেলের বিছানার পাশে। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে, কিন্তু সে আশা ছাড়েনি, ভগবানে বিশ্বাস আছে তার। তার ঠোঁট দুটো নড়ছে, প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করছে সে।

গ্রীষ্মকালের সুন্দর সকাল। বাগানে পাখির গান শহরের কোলাহলে ডুবে যায়নি

এখনো। মাঝে মাঝে বাজারের সব্জী গাড়ি যাতায়াতের ঘড়ঘড় শব্দ। রুটিওয়ালীদের হাতে লম্বা লম্বা পাঁউরুটি, টাটকা রুটির গন্ধ বাতাসে। উঁচু উঁচু জানলাগুলোর ওপর উষ্ণ গোলাপী আলো এসে পড়েছে, মনে হয় আলোর উৎসটা ঘরের ভেতর। একে একে 'মন্ত্রশিষ্য'রা জড়ো হচ্ছে জাভেল ব্রিজের কাছে। গ্রি-নে নাম ডাকল, চারজন আসেনি। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছেচল্লিশজন লোক বিভিন্ন পথে কারখানার দিকে এগিয়ে চলল।

ধর্মঘটের আজ এগারো দিন। সকালবেলাটা শান্তিতে কেটেছে। পুরনো পাহারার জায়গায় নতুন পাহারা এল। রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে মিশো, এখন এক রাশ সাবানের ফেনা মেখে শব্দ করে মুখ ধুচ্ছে। বড়ো গেটটার কাছে দাঁড়িয়ে জেনো গান গাইছে, গানগুলো সেদিনকার জলসায় শোনা। পিয়েরও জেগেছে, একটুকরো রুটি চিবোবার কাজে সে ব্যস্ত। কি জানি কেন বার বার তার মনে পড়ছে ভেরলেন-এর সেই লাইনগুলো— 'ভোরের ম্লান তারা।' কিন্তু এরই মধ্যে সূর্যের তেজ বেড়েছে। কয়েকজন বুড়ো মজুর বিষণ্ণভাবে ভাবছে, 'আজ এগারো দিন! ধর্মঘট কবে শেষ হবে?' গুজব শোনা গেছে, সরকার নাকি জোর করে কারখানা থেকে ধর্মঘটীদের বার করে দেবে। গুজবটা শুনে মিশো হেসে বলেছে, 'বাজে কথা!'

'এসো হে জেনো এদিকে এসো। সেই মিসত্যাঙগেৎ কেমন করে সিঁড়ি দিয়ে নামে একবার দেখাও দিকি।'

সঙের মতো মুখের একটা ভঙ্গি করল জেনো—বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা যুবতী সাজলে যেমন হয়। আঙুলের ডগা দিয়ে পাৎলুনটাকে তুলে ধরল স্কার্টের মতো করে, তারপর পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে নামতে শুরু করল।

'কে?' হঠাৎ সে চেঁচিয়ে ওঠে। গেটের সামনে একদল লোক দাঁড়িয়ে।

'গেট খোল...!'

'এই কারখানার কাজে আমাদের নেওয়া হয়েছে। বেরিয়ে যা শালারা!'

'কমিউনিস্ট জোচ্চোর!'

জেনোও কিছু কম যায় না : 'তবে রে শুয়রের বাচ্চা! হারামী! ফ্যাশিস্ট! ভাল চাস তো পালা, নইলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব তোদের।'

ওদিকে শ-খানেক লোক একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। কি যে তারা বলছে, কিছু বোঝার উপায় নেই। বিশেষ করে গ্রী-নে অত্যন্ত রগচটা লোক, বারবার তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে আসছে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হড়বড় করে কি যেন বলছে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় মুখটা বিকৃত, মৃগীরোগীর মত মনে হচ্ছে তাকে। বৃথাই মিশো নানা যুক্তি দিয়ে সহকর্মীদের ফেরাতে চেষ্টা করল। ফ্যাশিস্টদের বেয়াদপি দেখে সবাই রাগে ফুঁসে উঠেছে।

গত কয়েকদিন ধরে মিশো এই ধরনের হামলা আশা করছিল। গেটের সামনে হোস্‌পাইপ লাগিয়ে আগুন নেবাবার দল তৈরি রেখেছিল যাতে কিছুতেই সংঘর্ষ না বাধে। গ্রি-নেকে দেখে হেসে ফেলল সে : 'পঞ্চাশটা কুচ্ছিৎ ভূতের ছানা! আমাদের আওয়াজে ওদের চিৎকার ডুবে যাবে।'...তারপর অন্য মজুররাও শান্তভাবে নিল ব্যাপার-টাকে। 'মন্ত্রশিষ্য'দের সমস্ত হাম্বিতম্বি বৃথা হল, কারণ ধর্মঘটীদের পক্ষ থেকে মৃদু ভর্ৎসনা বা দু-একটা টিটকিরি ছাড়া আর কোনো জবাব এল না।

গ্রি-নের পেছনে লাগে জেনো : 'আরে কমরেড, দেখ দেখ, ওই ব্যাটা মুরগীর ছানা-টার কাণ্ড দেখ..'

বন্দুকের শব্দ। জেনো মাটিতে পড়ে গেছে। পিয়েরের হাত থেকে থাবা মেরে পিস্তলটা ফেলে দেয় মিশো। চারদিকের গোলমাল ছাপিয়ে তার গলা শোনা যায় : 'খবরদার, কেউ গুলি চালিও না! হোস্‌পাইপ খুলে দাও!'

'মন্ত্রশিষ্য'দের ওপর তাক করে হোস্‌পাইপের মুখ খুলে দেয় আগুন নেবাবার দল। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় 'মন্ত্রশিষ্য'রা। থাকে শুধু গ্রি-নে। তাকে দেখে মনে হয়, তার কিছুই হয়নি। তারপর পুলিশ আসতেই গ্রি-নে গা-ঢাকা দেয়।

জেনোর ওপর ঝুঁকে পড়ে মিশো। জেনো হাসছে। কিন্তু পাথরে লাল রক্ত।

'জেনো!' এই হাসিখুশি ছেলেটি যে এমনভাবে মরতে পারে তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। মিশো চিৎকার করে ওঠে, 'ওরা ওকে খুন করেছে!'

অন্য সবার মুখের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন সে আশা করছে একসঙ্গে সবাই বলে উঠবে, 'না।' মাথার টুপি খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সকলে; ঝাপসা চোখে মিশো দেখে, পিয়েরের মুখটা ব্যথায় নীল হয়ে উঠেছে।

নদীর জলে নেমে ব্রিজের তলায় গা-ঢাকা দিয়েছে গ্রি-নে। শীতে আর রাগে কাঁপছে। একটা রাস্তার ছোঁড়া বলে ওঠে, 'মতলবটা কি? চান হচ্ছে নাকি?'

তার দিকে তাকিয়ে থুথু ফেলে গ্রি-নে। অনেকক্ষণ রোদে বসে থাকে; ভিজে পোশাকে ফিরে গেলে মুশকিল আছে। তারপর সে একটা নাপিতের দোকানে যায়। নাপিত তার দাড়ি কামায়, অ-ডি-কোলনের ছিটে দেয় সারা গায়ে, ক্রীম মাখিয়ে দেয় মাথার চুলে। কিন্তু বারবার অ-ডি-কোলন আর ক্রীম চাইতে থাকে গ্রি-নে। আসলে একটা বিস্মৃতির ভেতরে নিজেকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছে সে, কাঁচির শব্দটা মনে হচ্ছে যেন কোন সুরভি বাগানের ভেতর ঝিঁ-ঝিঁ পোকার কিচ্ কিচ্ শব্দ।

ব্রতৈইর কাছে যখন গেল, তখন বেলা এগারোটা। পড়বার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। ক্রুশের সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে ব্রতৈই, তার ছেলে মারা গেছে। গ্রি-নেকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

'কটা মরেছে?'

'একটাকে আমি শেষ করেছি।'

'আর 'মন্ত্রশিষ্য'দের দলে?'

'একজনও নয়। ওরা হোস্‌পাইপ ব্যবহার করেছিল।'

'একজনও নয়? মুখ দেখাবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল নাকি তোমাদের? সব ভেস্তে গেল!'

কিছুই বুঝতে পারল না গ্রি-নে। কিছুক্ষণ বোকার মত হাঁ করে ব্রতৈইর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'একজন 'বর্মধারী' হিসেবে 'মন্ত্রশিষ্য'দের প্রাণ বাঁচানো আমার কর্তব্য।'

'তুমি বর্মধারী নও, তুমি একটা আহাম্মক!'

ব্রতৈই আবার নতজানু হয়ে বসল। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল গ্রি-নে। হলঘরে বসে বাড়ির ঝি কাঁদছিল, গ্রি-নে তাকে বলল, 'তোমার কর্তাটি একজন মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বুঝতে পারছি।'

ঘোষণা করে যে, ব্রতেইর প্রশ্নের ওপর আলোচনা সন্ধ্যার অধিবেশন পর্যন্ত মুলতুবী রেখে এখন পশু-মড়ক নিবারণী বিলটি উপস্থিত করা হবে, তখন গ্যালারীর জনসাধারণ রীতিমতো হতাশ হয়। ব্রতেই চিৎকার করে বলে, 'র‍্যাডিকালরা ভয় খেয়ে গেছে, মস্কোর নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে ভীইয়ার।'

একজন সমাজতন্ত্রী ঘুষি পাকিয়ে ছুটে আসে ব্রতেইর দিকে। ব্রতেই তার গালে একটা চড় মারে। শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া একজন বেয়ারাকে মাড়িয়ে দেয় ডেপুটিরা। এরিও সমানে তার ছোট্ট ঘণ্টাটা বাজাতে থাকে। তারপর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বার-এ গিয়ে বসে ডেপুটিরা। মাত্র জনত্রিশেক উপস্থিত থাকে চেম্বারের অধিবেশনে এবং স্পীকারের একঘেয়ে বক্তৃতায় তারাও আর বিশেষ মনোযোগ দেয় না। কেউ খবরের কাগজ খুলে বসে, কেউ ভোটারদের কাছে চিঠি লিখতে শুরু করে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভীইয়ার দেসেরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বেরোবার আগে বহুক্ষণ সে ইতস্তত করেছে। বহুবার নিজের সঙ্গে তর্ক করেছে, এইভাবে দেখা করতে আসাটা তার আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর কিনা। পপুলার ফ্রন্টের মন্ত্রী সে, আর সে-ই কিনা হীনতা স্বীকার করছে এমন একজন পুঁজিপতির কাছে যার চালচলন সন্দেহজনক আর কিছুকাল আগেও যার সমর্থন ছিল ব্রতেইর গুণ্ডাদলের ওপর! কিন্তু কি করা যাবে? পুকুরের জলে ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে ধর্মঘট। গোটা ফ্রান্সই যেন ধর্মঘট করছে। পারীর সীমানা ছাড়িয়ে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছে মফঃস্বলে। বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বন্দরের জাহাজ নিশ্চল। রোজই নতুন নতুন বিস্ময়। থিয়েটার দখল করে বসেছে অভিনেতারা, ক্যাশিয়ারের হাতে ক্যাশবাক্স্ বন্ধ, কবর খুঁড়তে অস্বীকার করছে খননকারীরা। কিন্তু মালিকরা মাথা নোয়ায়নি। কেউ কেউ বলছে, 'ভালোই হয়েছে! চুলোয় যাক গে সব!' দেশের স্বাভাবিক জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে। তবুও দেসের পুঁজিপতিদের মধ্যে ভালো লোক। ওর সঙ্গে একটা কিছু বোঝাপড়া না করলে চলবে না, ওর আসল চালবাজিটা বুঝতে হবে।

কথা আরম্ভ করে দেসের সহানুভূতির সঙ্গে ভীইয়ারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়।

ভীইয়ার বলে, সে বড়ো ক্লান্ত।

দেসের বলে, 'তা তো হবেই। এত বড় একটা ধর্মঘট চালানো...'

ভীইয়ার বলে, 'এই ধর্মঘটের দরুন আপনি যতোটা ভুগেছেন আমরাও ঠিক ততোটাই ভুগছি। সেজন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি একটা খোলাখুলি আলোচনার জন্যে। বলুন তো, কি করা যায়?'

'আপনি হচ্ছেন মন্ত্রী আর আমি একজন সাধারণ লোক। আমি তো আপনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।'

ভীইয়ারের একবার ইচ্ছা হল, উঠে চলে যায়। কিন্তু দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা এই বিরক্তিকে জয় করল।

'আপনার এই ঠাট্টা আমি বুঝতে পারছি না।' নম্রভাবে সে বলে।

'ঠাট্টা নয়,—আত্মরক্ষা। আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন। যদি আমি বলি, ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক,—তাহলে আপনি মনে করতে পারেন, আমরা অর্থাৎ 'দু-শো পরিবার' আপনার ভূস্বর্গ রচনার কাজে বাধা দিচ্ছি। তার চেয়ে অপেক্ষা করা ভালো। হয়তো সত্যিই আপনারা যাদুকর। অবশ্য তা নাও হতে পারেন।

তখন শ্রমিকরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে আপনারা কোনো পরিবর্তন আনতে পারেননি। আর সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের পক্ষে কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভবও নয়। তাই আমি কোন বিষয়ে জোরজবরদস্তি করতে চাই না।'

'কিন্তু আজ তেসা দাবি তুলেছে, কারখানা ধর্মঘটীদের দখল থেকে মুক্ত করা হোক।'

'তা জানি। আমাদের বন্ধু তেসার মনটি এখনো যাকে বলে তরুণ। কিন্তু আমার মতে অপেক্ষা করাটাই ভালো। পুলিশ লাগানোর বিরুদ্ধে আমি নই, কিন্তু সময় বুঝে সব করতে হবে। আমার এই মার্কের ছবিটা কেমন লাগছে আপনার? অবশ্য আপনার-টার মতো অতো ভাল নয়, কিন্তু এই সবুজ রংটা...'

কথাবার্তার গতিকে শিল্প-আলোচনার দিকে ঘুরিয়ে দিল দেসের। ছবি নিয়ে আলোচনা করার মত মানসিক অবস্থা ভীইয়ারের নয়, সুতরাং সে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়।

কি করবে সে এখন? জটিল খেলোয়াড়ি চাল চেলেছে দেসের। আপাতত মনে হয় দেসেরের উদ্দেশ্য সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভাঙন সৃষ্টি করা। র‍্যাডিকালদের প্রায় অর্ধেক আজ তেসাকে সমর্থন করেছে। তাহলে সত্যিই কি কারখানা দখলমুক্ত করা উচিত? কিন্তু তা যদি করা হয় তবে শ্রমিকরা কমিউনিস্টদের দলে চলে যাবে। অর্থাৎ বিপ্লব। বিশ্রী একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেদিকেই যাওয়া যাক না কেন হার মানতে হয়। বহুক্ষণ ধরে ভাবে ভীইয়ার। ক্লান্তির অতল থেকে একটি স্বর তাকে যেন বলছে, 'অপেক্ষা করেই দেখ না?' এই অপেক্ষা করার খেলা সে তো ছেলেবেলা থেকেই বড়ো আপন করে জেনে এসেছে। সারা জীবনই কি সে অপেক্ষা করেনি? নির্বাচনে জয়-লাভের জন্যে অপেক্ষা করেছে, প্রগতির জয়যাত্রার জন্যে অপেক্ষা করেছে, বিশ্ব-নিরাপত্তার জন্যে অপেক্ষা করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তার অপেক্ষা সুখের জন্যে, প্রতিষ্ঠার জন্যে, শান্তির জন্যে। দেসের অপেক্ষা করে ঠিক কাজই করছে। হ্যাঁ, অপেক্ষা না করে উপায় কি! একদিন সকলেরই সুবুদ্ধি ফিরে আসবে। তার আগে অবিবেচকের মত কোনো কিছু না করাটাই আসল কথা।

সান্ধ্য অধিবেশন শুরু হবার আগে গোয়েন্দাবিভাগ থেকে একটা রিপোর্ট এল ভীইয়ারের কাছে। গুপ্তচরের খবরে প্রকাশ, ধর্মঘটীদের ভেতর ভাঙন দেখা দিয়েছে। অনেকেই চাইছে ধর্মঘট তুলে নিতে। 'সিয়েন' কারখানায় আপোসকামীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ক্রমশ। আত্মসন্তুষ্টির হাসি ফুটে ওঠে ভীইয়ারের মুখে, মনে মনে ভাবে, 'ধর্ম-ঘট যাতে পুরোপুরি ভেঙে না পড়ে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। নইলে তার সুযোগ নেবে দক্ষিণপন্থী র‍্যাডিকালরা। আর দেসেরও মিটমাটের দিকে ঝুঁকেছে। সুতরাং দু পক্ষের মধ্যে আপোস অসম্ভব নয়। কালের গতি আমাদের পক্ষে...'

র‍্যাডিকালদের কিছুই লাভ হল না। অধিবেশনের সময় সরকার পক্ষ থেকে ভীইয়ার ভাসা-ভাসা জবাব দেয়ঃ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা যেমন দরকার, তেমনি দরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বক্তৃতার উত্তরে দক্ষিণপন্থীদের প্রতিবাদ ও সমাজতন্ত্রী-দের সমর্থন শোনা যায়। র‍্যাডিকালরা চুপচাপ। চেম্বারে নিজের আসন থেকে তেসা চিৎকার করে বলে, 'যদি কারখানা ধর্মঘটীদের দখল থেকে মুক্ত না হয়, তবে জনসাধারণের প্রতিবাদের বন্যা আপনাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার তুমুল হাততালি ও প্রশংসাধ্বনি। ম্লান হাসে ভীইয়ার। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সে, গভীর ক্লান্তি!

কিন্তু তেসা হয়ে উঠল সেদিনের নায়ক। চারদিক থেকে সকলে অভিনন্দন

জানাচ্ছে তাকে, তুলনা করছে মিরাবো-লাফেৎ-গামবেত্তার সঙ্গে। নিজের বক্তৃতার সাফল্যে লাল হয়ে উঠেছে তেসা। নিজেকে মনে করেছে নির্ভীক যোদ্ধা, সত্যের উপাসক। সে বলে, 'স্রোতের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়িয়েছি

বাড়ি ফিরে আসার পর শরীরটা বড়ো দুর্বল মনে হতে লাগল। কিন্তু তার মনে আনন্দ আর ধরছে না! রোজকার মতো আজও তার স্ত্রী গরম জলের বোতল নিয়ে শুয়ে আছে। লুসিয় বাড়ি নেই—বিদেশযাত্রার আগে ফুর্তি করে নিচ্ছে। কিন্তু এখন তেসা চায়, কারও কাছে নিজের এই বিজয়কাহিনী শোনাতে। তাই সে গেল দেনিসের কাছে।

আগাগোড়া বক্তৃতাটা অঙ্গভঙ্গিসহকারে পুনরাবৃত্তি করল। 'এই জায়গায় সকলে পাগলের মতো হাততালি দিয়েছে'—বক্তৃতার ভেতরে এই ধরনের জনান্তিক কথাগুলো বলবার সময় গলার স্বর বদলিয়ে ফেলছিল।

এত আত্মহারা হয়ে উঠেছিল তেসা যে দেনিসের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেনি। বিকারগ্রস্তের মতো দেনিস বসে আছে। গত কয়েকদিন শুধু বাবার কথাই চিন্তা করেছে দেনিস। গত শীতেও সে রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না। তখন সে মনে করত, তার বাবার কাজটা বিরক্তিকর হলেও সম্মানজনক। কিন্তু এখন সে সমিতিতে যাতায়াত করছে, খবরের কাগজ পড়ে। রাতে খাবার টেবিলে বসে বাবার কথাবার্তা এখন অসহ্য মনে হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে তার বাবা একজন বেসামাল পটুয়া ছাড়া কিছু নয়, নিজের সুবিধার জন্যে যে কোনো দাম দিতে তিনি রাজি, এটা যেন ক্রমশই ধরা পড়ছে দেনিসের কাছে।

পারীর রাস্তার উত্তেজনা দেনিসকে নাড়া দিয়েছে। খবরের কাগজ পড়ে দেনিস জেনেছে যে মিশো 'সিয়েন' কারখানার ধর্মঘটীদের নেতা। মিশোর ওপরে তার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে আর ধর্মঘটকে সে মনে করে ন্যায়ের জন্যে সংগ্রাম। তরুণ শ্রমিকটির হত্যার কথা শুনে মনে পড়েছে, মিশো বলেছিল যে একমাত্র রক্তের বিনিময়েই কথা ও কাজের সমন্বয় সম্ভব। তার নিজের এখন কি করা উচিত তাই নিয়েই দেনিসের চিন্তা। স্বভাব তার চাপা, নিজেকে জাহির করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু সে করতে চায় যা তার সমস্ত অতীতকে একেবারে মুছে দেবে। এ বিষয়ে মিশোর উপদেশ নিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু মিশো ব্যস্ত অন্য কাজে। আর এই অবস্থায় তার বাবা এসেছে তার কাছে নিজের ঢাক পেটাতে। আর বাবার কাছে তাকে কিনা শুনতে হচ্ছে যে এই জবরদখল গুন্ডাগুলোর দোষেই যতো কিছু অশান্তি। বাধা দিয়ে হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে!'

অবাক হয়ে তেসা মেয়ের দিকে তাকাল। ব্যাপারটা কি? হঠাৎ কি হল মেয়েটার? তন্বী দীর্ঘাঙ্গী দেনিস, কেমন একটা তিতিক্ষা এসেছে তার সৌন্দর্যে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'কি হল তোমার?' তেসা বলে।

'এসব কথা শুনতে পারি না আমি। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি যা বলছ, তোমার পক্ষে তা অযোগ্য বলে আমার মনে হয়। হয়তো আমিও ঠিক ওদেরই মতো ভাবি, হয়তো এজন্যে আমাকে জীবনের ধারা বদলাতে হবে। কি জানি...কিন্তু এ কী যন্ত্রণা!...' ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যায় দেনিস।

তেসা মনে মনে চটে ওঠে। তারপর স্ত্রীর ঘরে ঢুকে বলে, 'তোমার মেয়েটি ঠিক তোমার মতোই হয়েছে। কতগুলি ধর্মের গোঁড়ামি ঢুকেছে ওর মনেও। স্বর্গ, নরক,

কে জানে আরো কত কী!'

'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে কি লাভ, পল?'

'আমি ঠাট্টা করছি না। তোমাদের সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি কারও মুখ চেয়ে কথা বলি না। আর আত্মশুদ্ধিতে আমি বিশ্বাস করি।'

সে চলে গেল পোলেতের কাছে। সেখানে মুখ ভার করে বসে রইল আর অনবরত ব্র্যাণ্ডি গিলতে লাগল। বৃথাই পোলেৎ চেষ্টা করল তার মন ফিরিয়ে আনতে। পোলেৎ যখন বলল, 'আমাকে একটি চুমু দাও তো দুষ্টু খোকা!' তখনও তার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল না। বিড়বিড় করে সে শুধু বলল, 'চুলোয় যাক গে সব!'

কড়ি

জেনোর মা ক্লেমাঁস দ্যভালের মেজাজটা খিটখিটে হলেও মনটা বড়ো ভাল। হাতে বাত ধরেছে, পাকা চুল হয়ে উঠেছে হলদেটে। জ্বলজ্বলে চোখ দেখে বোঝা যায় এককালে তিনি সুন্দরী ছিলেন। অতি কষ্টে তাঁর জীবিকানির্বাহ হয়—অবিবাহিত যুবকদের ঘর ঝাড়পোঁচ করা, মেঝে ধোয়া, জামাকাপড় ইস্ত্রি ও রিপু করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করতে হয় তাঁকে। এক সময়ে তাঁকে এর চেয়েও কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল। সন্ধির ঠিক আগে যখন স্বামীর মৃত্যু হয়, তাঁর কোলে দুটি ছোট ছোট শিশু। ক্লেমাঁস তাঁর দিদিমার কাছে থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন আটতলার ছোট একটি ঘর—পাথরের মেঝে, ধোঁয়ায় কালো চুল্লী, প্রকাণ্ড একটা তক্তপোষ। অভাব অনটন লেগেই থাকত, এক বালতি কয়লা কিনবার সামর্থ্যও ফুরিয়ে যেত সময়ে সময়ে, শীতে হিম হয়ে যেত শিশুদুটি; কিংবা হয়তো একটা পুরনো ছেঁড়া ট্রাউজার পরে কাটাতে হত জেনোকে। আনেৎ-এর স্কুলের খাতা কেনা আর হত না। কিন্তু তবুও ছেলেমেয়েকে নিজেদের পায়ে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন তিনি। বিয়ের পর আনেৎ লিয়'তে চলে গেল; যে লোকটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সে কোন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় জোড় দেবার কাজ করত। আর 'সিয়েন' কারখানায় ঢোকার সুযোগ পেয়ে গেল জেনো। এটা সত্যিই একটা সৌভাগ্য! এবং সে দিন যে তিনি এক বোতল লেবেল লাগানো মদ কিনে এনেছিলেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। জেনোর বয়সী কত যুবক তো প্যারীর শহরতলীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, চাকরির দরখাস্ত নিয়ে কারখানা থেকে কারখানায় ছোটে। সব জায়গায় সেই একই নোটিশ—'লোক চাই না।' এমন কি শিক্ষানবিস নেওয়া বন্ধ। তাঁর প্রতিবেশিনীদের মুখে সব সময়েই অনুযোগ যে তাঁদের ধাড়ি-ধাড়ি ছেলেরা সংসারের বোঝা। জেনো যে দিন প্রথম মাসের মাইনে নিয়ে ঘরে ফিরল, সেদিন নিজের চোখকে বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি তিনি।

নিজের এই প্রাণবন্ত তরুণ ছেলেটির জন্যে যেমন তিনি গর্ব অনুভব করতেন, তেমনি আবার অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিতও হয়ে উঠতেন। অপরের পেছনে লাগা, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানো—এ সব বিষয়ে তো জেনো ওস্তাদ, আর কতবার তো তিনি ওকে

সাবধান করে দিয়েছেন যে এর জন্যে ওকে দুঃখ পেতে হবে। তাঁর কাছে ও তো এখনো শিশু এবং ওর দু-একটা অবুঝ আবদার তাঁকে সহ্য করতে হবে বৈকি। জেনোকে সভায় যাতায়াত শুরু করতে দেখেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মন তাঁকে বলেছিল, এপথে বিপদ আছে। বারবার ওকে তিনি বলেছিলেন এপথ ছেড়ে দিতে, ভয়ও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু জেনো ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছে সব কথা। মে দিবসে জেনোকে তিনি দেখেছিলেন লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যেতে। যদিও তিনি গির্জায় যাতায়াত করেন না কারণ তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি থাকেও ঈশ্বরকে পাবার কোনো পথ নেই—কিন্তু সেদিন লালঝাণ্ডা-কাঁধে জেনোকে দেখে বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন করেছিলেন। কি জানি কেন তাঁর ভয় হয়েছিল যে জেনো ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

তারপর ধর্মঘট শুরু হল। আর সে কী ধর্মঘট! আগেকার দিনে শ্রমিকরা ধর্মঘট করত নিঃশব্দে, বাড়িতে বসে থাকত আর অপেক্ষা করত। এখন ওরা অবস্থান-ধর্মঘটের অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। এজন্যে হয়ত গ্রেপ্তার হতে পারে ওরা। ক্লেমাঁস চেষ্টা করেছিলেন ধমকে বুঝিয়ে জেনোকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু জেনো কান দেয়নি তাঁর কথায়। রোজ সন্ধ্যায় তিনি ডিম মাখন আর মাংস নিয়ে যেতেন। হাতে পয়সা নেই বলে কোনোদিন অনুযোগ করেননি। নিজের জন্যে তিনি ভাবেন না।

তারপর সেই ভয়ংকর খবর। সেই দিন থেকে বোবা হয়ে গেছেন তিনি। প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন বা জেনোর সহকর্মীদের মধ্যে কেউ তাঁর মুখে একটি কথাও শুনতে পায়নি। শবযাত্রার দিন নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে শবানুগামীদের আগে আগে গিয়েছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করেছিল জেনোর মাসী আর তার ছেলেমেয়েরা, কয়েকজন প্রতিবেশী আর মিশোর নেতৃত্বে 'সিয়েন' কারখানার একদল শ্রমিক-প্রতিনিধি।

ঠিক হয়েছিল, জয় না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা কারখানা ছেড়ে আসবে না আর তাই শবানুগামীদের সংখ্যা অল্প হয়েছিল। শহরতলীর কবরখানায় লোহার ক্রুশ আর পুঁটিমালার চিহ্ন দেওয়া অনেক কবরের ভিড়ে কবর দেওয়া হল জেনোকে। গ্রীষ্মকালের গুমোট সকাল, বাতাসে সুগন্ধি লতার গন্ধ, পাখির গান। কোন বক্তৃতা হল না, জেনোর সহকর্মীরা একে একে নিঃশব্দে করমর্দন করল ক্লেমাঁসের সঙ্গে। শুধু মিশোর হাতে মালার লাল ফিতেটুকুর রক্তিমতায় একটা ভয়ংকর ইতিহাস লেখা হয়ে রইল।

কারখানায় ফিরে যাবার পথে সিলভ্যাঁ নামে একজন টার্নার রাগত স্বরে বলল, 'ওদের মুখে বড়ো বড়ো বক্তৃতা আর কাজের বেলা খুন। পুলিশ ভীইয়ারকে মিথ্যে খবর দেয় নি। 'সিয়েন' কারখানার অবস্থা সত্যিই ঘোরালো। দু সপ্তাহের ধর্মঘটে অনেকের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়েছে। শ্রমিক-বৌদের মুখে এখন শুধু অনুযোগ। কারখানায় আসবার সময় এখন আর তারা খাবার আনে না। হাতের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে, দোকানদাররা ধার দেয় না। জেনোর মৃত্যু কয়েক ঘণ্টার জন্যে শ্রমিকদের আবার উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, তারা চেয়েছিল খুনেদের ওপর প্রতিশোধ নিতে, অনেক কষ্টে মিশো সবাইকে থামিয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই শ্রমিকদের মধ্যে আবার হতাশার ভাব এল। পরিবারপরিজন খেতে পাচ্ছে না, ধর্মঘট চলছে এত দিন ধরে—অথচ এ সবের পেছনে কোন কারণ নেই! মালিকপক্ষের পেটোয়া লোকেরা নানা রকম গুজব ছড়াতে শুরু করল : কাজের অভাবে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত কারখানা বন্ধ থাকবে, পুলিশ থেকে চরমপত্র দেওয়া হয়েছে যে ধর্মঘটীরা যদি কারখানা ছেড়ে না যায় তবে পুলিশ গ্যাস ব্যবহার করতে বাধ্য হবে, ইত্যাদি।

ধর্মঘটীদের মধ্যে এই বিরুদ্ধ দলটি জড়ো হল সিলভ্যাঁর আশেপাশে। সিলভ্যাঁ লোকটা উগ্রচণ্ডী ধরনের, কোনো ব্যাপারেই সামঞ্জস্য রাখতে পারে না। ধর্মঘটের শুরুতে সে প্রস্তাব করেছিল, কারখানা কর্তৃপক্ষের বদলে একটি কমিটি নির্বাচিত করে কারখানা চালু রাখা হোক। তার প্রস্তাবে সবাই হেসে উঠতেই সে খেপে গিয়ে বলেছিল, 'তাহলে আমাদের আর কোনো আশা নেই। দেসের অনায়াসে যতোদিন খুশি অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু আমরা তা পারি না।' তার স্ত্রী যেদিন তাকে বলে, হাতে আর একটি ফ্রাঁও নেই যে দুধ কেনে, সেদিন সে জ্বলে ওঠে একেবারে। বলে, 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার এই আহাম্মুকে ধর্মঘটটা শেষ করতে হবে।' বলতে বলতে চোখে জল এসে যায়, বিকারগ্রস্তের মতো হাত-পা নাড়ে। যতো দিন যায় ততোই বেশি বেশি উৎসাহের সঙ্গে লোকে তার কথা শুনতে শুরু করে। একদিন সে প্রস্তাব করল, শ্রমিকদের মতামত জানবার জন্যে গোপন ব্যালট নেওয়া হোক। তার দৃঢ় ধারণা ছিল যে আঠারো হাজার শ্রমিকের মধ্যে অন্তত দশ হাজার ধর্মঘট তুলে নেবার পক্ষে ভোট দেবে। প্রতিবাদে মিশো বলল, শ্রমিকদের আত্মসম্মানের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত সুতরাং প্রকাশ্যে ভোট নেওয়া হোক। কমরেডরা যে ধর্মঘট চালু রাখতে চায় একথা এখন জোর করে ভাবতে পারে না। পরাজয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে।

কারখানার ভেতর যা কিছু ব্যাপার ঘটছিল, দেসেরের তা জানতে বাকি ছিল না। সে ঠিক করে, ধর্মঘট ভাঙবার চেষ্টাটা একবার করে দেখবে। পিয়েরকে আর একবার ডেকে পাঠাল।

'এই যে অতি-উৎসাহী, কেমন আছ? কারখানার ভেতর আটকা থেকে শরীরের উন্নতি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায়। হ্যাঁ শোন, ধর্মঘট কমিটির কাছে আমি কতগুলো প্রস্তাব পাঠাতে চাই। শুনেছি, তুমি ঐ কমিটির একজন সভ্য। মাইনে ও কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে দাবি দুটো আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু যৌথ-মজুরি-নির্ধারণ ও পুরো বেতনে ছুটির দাবি আমি কোনো ক্রমেই মানতে রাজি নই। ওগুলো ভেলকিবাজির ব্যাপার। ভীইয়ারের ওপর এখনো তোমাদের বিশ্বাস অটুট আছে তো? হ্যাঁ, ভীইয়ারের পক্ষে একটা ভেলকির খেলা দেখানো অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু আমার কথাটা স্পষ্ট করে জানিয়ে রাখছি, যদি ধর্মঘট তুলে না নেওয়া হয় তবে কারখানা বন্ধ করে দেব আমি।'

'আমার মনে হয় না, আপনার এই প্রস্তাব ধর্মঘটীরা মানবে।'

স্বভাবত পিয়ের আবেগপ্রবণ, অল্পতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তার এই সংক্ষিপ্ত জবাবটা যে বিরূপ মনোভাবেরই পরিচয়, সেটা আঁচ করে নিল দেসের।

দেসের বলল, 'রাগ করছ কেন? আমি তো একজন পুঁজিপতি। এই শব্দটাতেই তো আমার সমস্ত পরিচয়। শ্রমিকরা তাদের দিক থেকে ঠিকই করেছে। কিন্তু তুমি কি? রুই-কাতলা তুমি নও, কিন্তু ঘাই মারবার শখটা তোমার কিছুমাত্র কম নয়। বেশ বাড়াবাড়ি রকমেরই আছে বলতে হবে। কী শখ! যৌথ-মজুরিনির্ধারণে তোমার কি লাভ? নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছ তুমি, কিন্তু আর সবাই যেমনটি থাকার তেমনটি থেকে যাচ্ছে।'

'ওদের ওপরে আমার বিশ্বাস আছে।' পিয়ের বলল।

'না, নেই। হয়তো তুমি ওদের পছন্দ কর, কিন্তু ওদের ওপরে তোমার বিশ্বাস নেই। জনসাধারণকে তোমরা রক্তলোলুপ স্বেচ্ছাচারিতার পথে নিয়ে যাচ্ছ। এর পরিণতি

কী দুঃখের ভাবো তো!'

পিয়ের চলে গেল। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেসের দেখল, আকাশ পরিষ্কার নীল, লালঝান্ডা উড়ছে, আপিসঘরের সামনে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে একটি যুবক। পিয়েরের ওপর হিংসে হল দেসেরের। পিয়ের বোকা হতে পারে কিন্তু পিয়ের সুখী। একটা কিছুর ওপর সে বিশ্বাস রাখতে পেরেছে। সেটা যাই হোক না কেন, কি আসে যায়? নিজেকে অত্যন্ত একা বলে মনে হল দেসেরের। প্রতিটি দিন কর্মব্যস্ত, মহাশূন্যের মত ফাঁকা, ঘুম থেকে উঠে সেই একই রকমের এক একটি দিনের শুরু—কী ভয়ংকর!

মিশোর কাছে পিয়ের দেসেরের প্রস্তাব বলতেই সে বলল, 'কাল সকাল পর্যন্ত এ সম্পর্কে একটি কথাও কাউকে বলবে না। কাল আমরা সবাইকে এক সঙ্গে ডেকে ভোট নেব।'

পিয়ের নিজেও ভেবেছে, এ বিষয়ে খুব সাবধানে কাজ করা দরকার। প্রত্যেককে ডেকে সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হবে। সব চেয়ে বড়ো কথা, দেসেরের এই প্রস্তাব সিলভ্যাঁর কানে কোনো রকমেই যেন না ওঠে। অনেকক্ষণ ধরে তারা আলোচনা করে। হঠাৎ মিশো আলিঙ্গন করে পিয়েরকে। এই আলিঙ্গনের অর্থ যে কত গভীর, তা বুঝতে পারে পিয়ের। কিন্তু সে নিজে এত উত্তেজিত যে মুখে একটি কথাও ফোটে না।

প্রথম প্রথম মিশো পিয়েরকে অবিশ্বাসের চোখে দেখত। রাগ হলে পিয়েরকে সে বলত ননীর পুতুল, কারণ পিয়েরের স্বভাবটা ছিল নরম। আর সমাজতন্ত্রীদের ওপর, বিশেষ করে ভীইয়ারের ওপর পিয়েরের অনুরাগ কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারত না। অবশ্য ধর্মঘটের পর থেকে পিয়েরকে সে ভালোভাবে জানতে পেরেছে। 'সিয়েন' কারখানার একজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার পিয়ের, আর সেই কিনা নিজের ভাগ্যকে জড়িয়েছে শ্রমিকদের সঙ্গে—এই একটি ঘটনাই তো তার বলিষ্ঠ স্বার্থত্যাগের প্রমাণ। প্রাত্যহিক জীবনে পিয়েরের দিকে সকলেই আকৃষ্ট হয়। অস্বাভাবিক রকমের কল্পনাবিলাসী সে, প্রায় সব সময়েই কোনো না কোনো অসম্ভব কল্পনা মাথায় ঘুরছে। কিন্তু মিশো যদি কখনো বলে যে তার পরিকল্পনাটা অচল, তাহলে সে রাগ করে না বা তর্ক করে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু ভাবতে বসে যায়। দক্ষিণ দেশের লোক সে, সব সময়েই হাসিখুশি, গভীরতম দুঃখের ভেতরেও মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে মার্সাইয়ের গল্প বলে, নেচে কুঁদে, পাগলামো করে। মিশোর চেয়ে পিয়ের দু-বছরের বড়, তবুও মিশো পিয়েরকে স্নেহভরে 'শিশু' বলে মনে করে।

মাঝে মাঝে তুমুল আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। পিয়েরের শিক্ষার জন্যেই হোক বা তার সংবেদনশীল ও বেপরোয়া মানসিক গঠনের জন্যেই হোক, ধ্যানধারণার দিক থেকে পিয়ের বিগত শতাব্দীর মানুষ এবং সেখান থেকে সহজে তাকে টলানো যায় না। সম্ভব হলে জলের ঝাঁঝরি নিয়ে ফুলের চাষ করার মতো মানুষকে সে অনুশীলন করত। সে বিশ্বাস করে, মানুষকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে দলে টানা যায়। আর তাই ভীইয়ারের পোক্ত গলাবাজিও সারগর্ভ মনে হয় তার কাছে। এই নিয়ে মিশো যখন তাকে ঠাট্টা করে, সে বিমর্ষভাবে হাসে—শখের খেলনা না-পাওয়া শিশুর মতো।

এবার মিশো তাকে বলে, 'দেসেরের সঙ্গে তোমার যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে, কালকের সভায় খুলে বলতে হবে। সেটা তুমি ভালোভাবেই করতে পারবে বলে মনে

হয়। দেসেরের অবস্থা যে খুব ভালো নয় তা আমি তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি।'

পিয়ের বলে, 'আচ্ছা বেশ। কিন্তু মজার ব্যাপারটা কি জান? দেসেরের অবস্থা সব দিক থেকেই খারাপ। ওর লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি ঠিকই আছে কিন্তু ওর কাছে ওর জীবনটার দাম দু পয়সাও নয়। একবার আমার সঙ্গে ও বেড়াতে বেরিয়েছিল, সেই সময়েই ও একথা বলেছে। আসলে ও কেবল ভেসে চলেছে।'

মিশো বলে, 'তুমি ঠিক বুদ্ধিজীবীদের মতো কথা বল। কিন্তু আমি জানি, আমরা যদি হেরেও যাই তবুও তুমি পিছিয়ে যাবে না। সঙ্গে এসে পাশাপাশি দাঁড়াবে। আর যদি আমরা জিতি তবে তোমার হয়ে আমিই সেদিন বলব। কিন্তু তোমার মধ্যে বিশ্বাস যতোটা না আছে, করুণা আছে তার দশগুণ। একটি মেয়েকে আমি জানি, মেয়েটি একজন ছাত্রী। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, মেয়েটির কাছে শক্তির চেয়ে দুর্বলতা বড়ো। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা মোটেই বুঝে উঠতে পারি না।... মেয়েটি নিজে কিন্তু খুব শক্ত। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক তাই!'

মিশো হাসে। স্বপ্ন ও লজ্জা মেশানো হাসি। আর পিয়ের খুশিতে ডগমগ। তাহলে মিশোরও এই উপলব্ধি আছে! অতোক্ষণে মিশো কিন্তু কারখানা টহল দিতে বেরিয়ে পড়েছে; সকলের সঙ্গে কথা বলছে, সকলকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করাচ্ছে।

দেসেরের প্রস্তাব সিলভ্যাঁর কাছে চাপা রইল না—কর্তৃপক্ষের গুপ্তচরেরা এ ব্যাপারে ঢিলে দেয়নি। আর একটুও সময় নষ্ট করেনি সিলভ্যাঁ। 'আপোস'—কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে কারখানায় আর ইয়ার্ডে। শুনে সকলেই উত্তেজিত। এই একটানা নিষ্কর্মা হয়ে কাটানো, পরিবার-পরিজনের অবস্থা ও তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থয়ে থাকা মানুষগুলোর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আপোসরফার ওপরে একটা সই-এর অপেক্ষা শুধু, তারপরেই এইভাবে কুকুরের মতো দিন কাটানো শেষ হবে! সিলভ্যাঁ বলে বেড়াল, 'ওরা এই কথাটা গোপন রাখতে চাইছে। কেন জান? রাজনীতি! আর এদিকে আমরা না খেয়ে মরে গেলেও ক্ষতি নেই।'

সন্ধ্যের দিকে অবস্থাটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। দেসেরের চালবাজি সম্পর্কে সবাইকে সাবধান করতে চেষ্টা করে পিয়ের কিন্তু সিলভ্যাঁর অনুগামীরা তার কথায় কান দেয় না; তাচ্ছিল্যভরে বলে, 'কি হে ইঞ্জিনিয়ার, কত টাকা জমিয়েছ ব্যাঙ্কে?' শোনা যায়, রাত দশটার সময় সিলভ্যাঁ একটা সভা ডেকেছে এবং ভোটের ফলাফল আপোসের শর্ত মেনে নেবার পক্ষে যাবে। মনমরা হয়ে পিয়ের ভাবে, আর কোনো আশা নেই। শুধু পিয়ের নয়, মিশোও। সে যে কি ভাবে নিজেকে শান্ত রেখেছে, এমন কি মুখে দু-একটা ঠাট্টা-তামাসা পর্যন্ত করছে, তা শুধু সে-ই জানে! মনে মনে সে বুঝতে পেরেছে যে একটা অত্যাশ্চর্য কিছু না ঘটলে আর বাঁচবার পথ নেই। সমস্ত দিক বিবেচনা করে একটা কিছু করতেই হবে তাকে। সহকর্মীদের এবং হয়তো বা পারীর সমস্ত ধর্মঘটের ভবিষ্যৎ এখন তার ওপরেই নির্ভর করছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পিয়েরকে মিশো বলল, 'শোন, এক ঘণ্টার জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি। কথাটা কাউকে বোলো না। শুনলে ওরা হয়তো রটাবে যে আমি পালিয়ে গেছি।'

'কোথায় যাচ্ছ? কমিটির কাছে?'

মিশো জবাব দিল না।

ধুলোর নোংরা জানলাটার সামনে মরা লতার মতো নিশ্চলভাবে ক্লেমাঁস বসে

আছেন। মিশো ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে তাঁর থলথলে হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিল, কিন্তু চেষ্টা করেও মিশো কথা বলতে পারল না। ক্লেমাঁসের কাছে সে এসেছিল সাহায্য চাইবার জন্যে কিন্তু তাঁর শোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে নিবিড় কুয়াশার মতো। যা কিছু বলতে এসেছিল ভুলে গেল। ভুলে গেল ধর্মঘটের কথা, সিলভ্যাঁর কথা, আপোসের কথা। তারই একজন সহকর্মী বন্ধুর মা-র চিন্তাটাই এখন একমাত্র চিন্তা হয়ে ওঠে। তারপর জেনোর কথা বলতে শুরু করে—মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেও জেনোর ঠাট্টা-তামাসা, জেনোর হাসিখুশি ভাব আর সাহস ও উৎসাহ। আবেগভরা গলায় থেমে থেমে কথা বলে। তার গলার স্বরে এত কাতরতা আর কোনোদিন প্রকাশ পায়নি।

অন্ধকার হয়ে এল। তবুও ক্লেমাঁস আলো জ্বাললেন না। অন্ধকার ঘরে জেনো আবার যেন বেঁচে উঠেছে। এখানেই জেনো বড়ো হয়েছে, এ ঘরেই বসে বসে মেঝের ইট নিয়ে খেলা করেছে, মা-র সঙ্গে কত গল্প করেছে—নিজের কমরেডদের কথা, মিছিল ও পুলিশের সংঘর্ষের কথা। ক্লেমাঁস বুঝতে পারেন যে তাঁর ছেলে ছোট কিন্তু ঘটনায় ভরা জীবন ছাপ রেখে গেছে সব কিছুতে। এই ঘরের বাইরে কারখানার জীবনের মধ্যেও রয়ে গেছে সেই জীবন। মিশো তাঁর কাছে একেবারেই অপরিচিত, তবুও মরা ছেলের সঙ্গে এই লোকটির বন্ধন ও নিকটত্ব এত জোরালো ভাবে অনুভব করেন তিনি যে উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবেন, 'ওরা ওকেও খুন করবে! ওরা উন্মাদ!'

হঠাৎ মিশো থেমে যায়। কারখানা, ল্যগ্র্যাঁ আর পিয়েরের কথা মনে পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'আপনার সাহায্য চাই আমরা।'

সঙ্গে সঙ্গে বিনা দ্বিধায় ক্লেমাঁস বেরিয়ে এলেন মিশোর সঙ্গে।

ধর্মঘটের প্রথম দিনের মতো শ্রমিকরা কারখানার উঠোনে জড়ো হয়েছে। মিশোর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সিলভ্যাঁ ঘোষণা করেছিল যে কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়েছে কিন্তু ধর্মঘট কমিটি চেষ্টা করছে কথাটা যেন চাপা থাকে। মিশো যখন এল তখন ভোট নেওয়া হচ্ছে আর চারদিক থেকে অনেক লোক চিৎকার করে ঘোষণা করছে যে অধিকাংশ ভোট আপোসের পক্ষে। কথাটা সত্যি কিনা বলা শক্ত, কারণ হাতগুলো অনবরত ওঠানামা করছিল। আবার যারা হাত তুলছে তাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ছিল না কোন্ পক্ষে তারা ভোট দিচ্ছে। চারদিকে শুধু চিৎকার, গালাগালি, উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলা!

একটা লরির ওপর দাঁড়িয়ে মিশো চিৎকার করে বলল, 'কমরেড্‌স্, একটু থামুন!'

বাধা দিয়ে সিলভ্যাঁ বলল, 'থাক, আর কিছু বলার দরকার নেই। ভোট নেওয়া হয়ে গেছে।'

একটুও না দমে মিশো বলে চলল, 'এখানে আর সবার বলা এবং ভোট দেওয়া হয়তো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু একজন এখনো কিছু বলেননি। আমি জেনোর কথা বলছি। আপনারা কি তাকে ভুলে গেছেন? জেনো এখানেই আছে। এইখানে—আমাদের সঙ্গে। জেনোর হয়ে জেনোর মা আজ কথা বলবেন।'

সভায় গভীর স্তব্ধতা নেমে এল। জেনোর মৃত্যু এখনো কেউ ভুলে যায় নি এবং তার মায়ের শোক তাদের ঘিরে ছিল। বৃদ্ধা একটা লরির ওপর উঠে দাঁড়ালেন। কেঁদে কেঁদে লাল চোখ, গোছা গোছা শাদা চুল, একটিও কথা না বলে বজ্রমুষ্টি তুললেন তিনি —কমরেডদের সঙ্গে সভায় যাবার সময় জেনোও ঠিক এই রকম করত। কি যেন বলবার

চেষ্টা করলেন ক্রেমাঁস, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। কিন্তু জনতার সামনে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠল, উত্তরে বজ্রমুষ্টি তুলল প্রত্যেকে। মিশো যখন বলল, 'যাঁরা আপোসের পক্ষে হাত নামান', একটি হাতও নামল না। এমন কি সিলভ্যাঁও ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দিল—ক্রেমাঁস স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সিলভ্যাঁর দিকে।

তারপর ক্রেমাঁস বললেন, 'এখন থেকে জেনোর জায়গায় আমি এখানে থাকব।' স্নেহভরা দৃষ্টিতে মিশোর দিকে তাকালেন তিনি, 'গেটের কাছে যেও না তুমি। ওরা তোমাকে খুন করবে।'

ধর্মঘটের আজ পনেরো দিন। রাত্রিবেলা পিয়ের শিশুর মতো মিশোর চারদিকে নাচতে নাচতে বলল, 'আমরা জিতেছি! আমরা জিতেছি!'

তিন দিন পরে ভাঁইয়ারকে টেলিফোনে ডেকে দেসের বলল, 'আমি ঠিক করেছি ধর্মঘটীদের দাবি মেনে নেব। কতগুলো জরুরী অর্ডার হাতে এসে পড়েছে। আর একটা কথা কি জানেন, যুদ্ধে জিততে হলে পিছু হটতে জানা দরকার। অবশ্য এসব কথা আপনাকে বলা অনাবশ্যক। পিছু হটবার কৌশলটা নেপোলিয়'র মত ভালো করেই জানেন আপনি।'

এই স্থূল বিদ্রূপটা আসলে দেসেরের নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার একটা চেষ্টা মাত্র। আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে বলে সে বিরক্ত, তার আত্মসম্মানবোধ আহত। পিয়ের হয়তো এখন দাঁত বার করে হাসছে। কিন্তু দিনে পাঁচ লক্ষ টাকার খেসারত কে গুণতে চায়? শেয়ারের বাজারের মতো রাজনীতিও একটা খেলা। আজ হয়তো শ্রমিকরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে যেতে পারছে, আবার কাল ওরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক হতে পারে। সেই বিখ্যাত পেন্ডুলাম ভেলকি খেলতে শুরু করেছে। বড়ো বেশি এলোমেলোভাবে দুলছে ওটা। দেসেরের হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও তাই। তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না; মদ, তামাক আর কফি খেতে বারণ করেছে ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারের কথা মেনে চলছে না সে। মনের এই অবস্থায় একটা কিছু উত্তেজনা দরকার—প্রেমের উত্তেজনা যদি না হয় তবে এমন একটা কিছুর যা প্রেমেরই মতো।

ধর্মঘট শুরু হবার পর উনিশ দিনের দিন সন্ধ্যে সাতটায় আপোসের শর্তের ওপর সই করে দু পক্ষ। ধর্মঘটীদের মূল দাবিগুলোর সামান্য অদল বদল করা হয় মাত্র। শ্রমিকপক্ষই যে জেতে তা বুঝতে কারও বাকি থাকে না।

'সিয়েন' কারখানায় যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। 'সিয়েন' কারখানার জয়লাভের অর্থ সর্বত্র জয়লাভ। একদিনের মধ্যেই অন্যান্য মালিকদের আত্ম-সমর্পণের সংবাদ আসতে শুরু করে। জোলিও কাব্য করে লেখে, 'সন্ধি ঘোষিত হয়েছে। হে ফ্রান্সবাসীগণ, এবার কাজে ফিরে চল! ধর্মঘটের ক্ষতকে নিরাময় করতে হবে!'

সন্ধ্যে আটটার সময় 'সিয়েন' কারখানার শ্রমিকরা লাইন বেঁধে দাঁড়াল এবং তিন সপ্তাহের স্বেচ্ছাবন্দীত্বের পর ব্যান্ড বাজিয়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে বেরিয়ে এল কারখানা ছেড়ে। সবার আগে আসে ক্রেমাঁস ও মিশো। ধর্মঘটীদের পরিবার-পরিজন, কারখানা এলাকার অধিবাসী, বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধি—হাজার হাজার লোক অভিনন্দন জানাল বিজয়ী-দের। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা নামছে, আকাশ থেকে এখনো আলো মুছে যায়নি, একটা দুটো তারা দেখা দিয়েছে সবেমাত্র—সূর্যাস্তের সোনালী বিস্তৃতির ওপর তারাগুলোর নীলাভ ঝিলিক রহস্যময় মনে হচ্ছে। উৎসবমত্ত জনতা ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায় আর কাফে-

গ্ুলোতে। ফ্ুল উপহার দিয়ে, বিয়ারের আমন্ত্রণ জানিয়ে জনসাধারণ স্বাগত জানাচ্ছে শ্রমিকদের।

মিশো ক্লেমাঁসকে ধরে আছে। গত কয়েক দিনের ঘটনায় এত ক্লান্ত হয়েছেন ক্লেমাঁস যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও যেন তাঁর নেই। মিশোর ওপর নির্ভর করাটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে এবং তিনি নিজেও মা-র মতো মিশোকে চোখে চোখে রাখছেন। কিন্তু এবার তাদের ছাড়াছাড়ি হবার সময় হয়ে এল। মিশো ব্যস্ত থাকবে ওর কাজ নিয়ে, জেনোর মতো সভায় ছ্ুটোছ্ুটি আর চিৎকার করবে যতদিন পর্যন্ত না ওকে ওরা খ্ুন করে। আর তাঁকে ফিরে যেতে হবে তাঁর শ্ূন্য ঘরে, পাথরের মেঝের ওপর প্রকাণ্ড তক্তপোষ পাতা তাঁর সেই ঘরে।

হঠাৎ ক্লেমাঁস বললেন, 'তুমি বিয়ে করছ না কেন? একা থাকার চেয়ে বিয়ে করাটা ভাল। নইলে দেখো জীবনটা কী ভীষণ ফাঁকা ঠেকবে। তোমাকে ওরা খ্ুন করলে তোমার জন্যে চোখের জল ফেলার কেউ থাকবে না। সেটা ভারি বিশ্রী হবে।'

মিশো সলজ্জ হাসে। আকাশের পটভূমিকায় আঁকা কালো কালো গাছ, 'সিয়েন' কারখানার ওপর থমকে-থাকা আবছা নীল অস্পষ্টতা। একটা পরিচিত ম্ুখের আভাস চমকে চমকে উঠছে তার মনে। দেনিস এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে, হাসছে দেনিস, আর চ্ুপিসাড়ে তার হাতটা চেপে ধরেছে।

একুশ

স্ট্ুডিও ঘরটা অসহ্য রকমের গ্ুমোট—মনে মনে নিজেকে এই কথা ব্ুঝিয়ে, ছবি আঁকবার ইজ়েল্‌টা দেওয়ালের দিকে ঘ্ুরিয়ে, বেরিয়ে পড়ল আঁদ্রে। কিছ্ুদিন হল সে কাজে মন বসাতে পারছে না। আগে, এই তিন মাস আগেও, স্কুলের প্ুরনো বন্ধ্ু-বান্ধবের কাছে যখন সে বলত যে রাজনীতি সে বোঝে না, সেটা যে সে চালবাজি করার জন্যে বলত তা নয়। তারপর অনেক বড়ো বড়ো পরিবর্তন এসেছে। স্ট্ুডিওর আব-হাওয়ায় কখন যে রাজনীতি ঢ্ুকেছে তা সে জানতেও পারেনি। এখন রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়াটা তার প্রথম কাজ। রাস্তায় বার হলে লোকজনের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে সে। সকলের ম্ুখেই এক কথা—ধর্মঘট, রাজনৈতিক দলাদলি, য্ুদ্ধ। যে আন্দোলনের ধাক্কা সারা শহরকে কাঁপিয়ে তুলেছে তা এক নতুন ধরনের অন্ুভূতি জাগিয়ে তুলেছে আঁদ্রের মনে। জনসাধারণের সঙ্গে তার এত নিবিড় যোগ, চারিত্রিক গঠনে সে এত স্ুসংহত যে সাধারণ মান্ুষের জোট বাঁধার ক্ষমতা ও আশার উত্তাপ তাকে নাড়া না দিয়ে পারে না। হ্যাঁ, তার পক্ষে এটাই আসল কথা! কিন্তু চিত্রজগতের স্টিল-লাইফের ওপর কি সে আর মন বসাতে পারবে না?

সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গমের চাষ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ কোনো এক সময়ে পড়েছিল আঁদ্রে। চাষীর ঘরে তার জন্ম, মাটির সঙ্গে তার নাড়ীর টান, প্রবন্ধটি বিশেষভাবে কৌত্ূহলী করে তুলেছিল তাকে। রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে এই প্রবন্ধটির কথা ভাবতে ভাবতে সে সিদ্ধান্ত করল যে শিল্পের দ্ুর্দিন উপস্থিত। এমন গাছও

বহু আছে যাতে জন্মের আট বা নয় যুগ পরে প্রথম ফল ধরে। যে লোকটি বিচি পোঁতে সে ভালো করেই জানে যে গাছের প্রথম ফল তার ছেলে বা নাতির আগে কেউ ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু ওদেশে একটি এক বছরের শিশু-চারার জীবনে কয়েকটি দিনের পরিবর্তন সমগ্র দেশের রূপ বদলে দিয়েছে। সুতরাং যুগধর্মটাই মূল প্রশ্ন। শিল্পীদের জীবনে শান্ত পরিবেশ চাই, তাদের জীবনটাই যেন স্থিতিশীল, কতকগুলি পূর্বস্বীকৃত রূপধর্ম ও নির্দিষ্ট রঙের সমারোহ থেকে একটা পরিণত পৃথিবীর ছবি আঁকে তারা, পতনের বা অভ্যুত্থানের যুগে কিছুই করবার নেই তাদের। মেজোঁ দ্য কুল্‌তুর-এ লুসিয়ঁ বলেছিল, রুচিজ্ঞান না থাকলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। বাজে কথা। এমন সময়ও ছিল যখন এই 'রুচিজ্ঞান' জিনিসটা 'নীল-রক্তের' মতোই হয়ে উঠেছিল একটা দুঃসহ অভিশাপ—যার জন্যে ১৭৯৩ সালে মাথা কাটা গিয়েছিল অনেকের। ইতিহাস স্বপ্রতিষ্ঠ যুগ-সমষ্টিতে, ব্যক্তিত্বে নয়। একটি যুগে যেমন রোবস্‌পিয়েরের মতো নেতার আবির্ভাব, তেমনি আর একটি যুগে দ্যলাক্রোয়ার মতো শিল্পীর। লুই-ফিলিপের কৃপণতার জন্যে যেমন দ্যলাক্রোয়া দায়ী নন, ঠিক তেমনি রোব্‌স্‌পিয়ের দায়ী নন ডেভিডের জীবনী অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলোর জন্যে। নাটকের দৃশ্য সাজানোর মতোই ঐতিহাসিক ঘটনাকেও শুধরে ও ঘষেমেজে নিতে চায় লুসিয়ঁ। কিন্তু ইতিহাস-নাট্যে সে তো আর মঞ্চ-পরিচালক নয়, মূক অভিনেতা মাত্র। যাই হোক, সময় থাকতে স্টিল-লাইফটা এঁকে ফেল্‌তেই হবে। এর পর স্টুডিও বা রঙ টিকে থাকতে নাও পারে! ফিরে এসে আঁদ্রে জোর করে কাজে বসে। কিন্তু কোন ফল হয় না, ঘণ্টাখানেক পরে হাতের তুলিটা আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আর একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। এই সন্ধ্যের অপেক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। রেডিও খুলে বসার সময় হবে তখন। জেনেৎ এখনো 'পোস্ট প্যারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। জেনেতের গভীর ও টলোমলো গলার স্বরের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বিশ্রী কথাগুলো এত বেমানান যে আঁদ্রের কাছে তা নিজের চিন্তার মতোই অসহ্য। লাফোর্গ-এর কবিতা আর পাস্যাঁর জল-রঙে আঁকা ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে আঁদ্রের। অর্থহীন বিকারগ্রস্ত বিদ্রূপ!

নিজেকে প্রায়ই সে প্রশ্ন করেছে, 'জেনেৎ আমার কে?' 'প্রেম' শব্দটা একবারও তার মাথায় ঢোকেনি। মনে মনে ভেবেছে, জেনেৎকে কতটুকুই বা সে জানে, হয়তো তাদের মধ্যে কোথাও এতটুকু মিল নেই, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়তো সামান্য একটু চিত্ত-চাঞ্চল্য ছাড়া আর কিছু নয়। আঁদ্রের মনের গড়নটাই এমন যে সেখানে আবেগ খুব বড়ো হয়ে ধরা দেয় এবং সহজে তা মুছে যায় না। অর্থাৎ কারও ওপরে চট করে তার টান আসে না, সেজন্যে দরকার হয় অনেকখানি ধৈর্য ও সতর্ক মনোযোগ। কিন্তু একবার টান এলে তা দৃঢ়মূল হয়ে বসে।

লুসিয়ঁর সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তার মনের ভাবটা হয়েছে অনেকটা জলে-হাবুডুবু মানুষের মতো। অবিবেচকের মতো কথাটা মেনে নেওয়া হয়েছে, এমনি একটা অপরাধ-বোধে সে পীড়িত। প্রকারান্তরে লুসিয়ঁ সেদিন তাকে বলেছে—'জেনেতের ব্যাপারে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?' ঠিকই বলেছে লুসিয়ঁ। এই চিত্তচাঞ্চল্য দূর করতেই হবে। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে আসতেই সে রেডিওটার কাছে ছুটে গেল।

এ অবস্থায় কাজ করা যায়? আশেপাশের রাস্তায় বাঁশের ভারায় ধর্মঘটী রাজ-মিস্ত্রীরা লাল ঝাণ্ডা উড়িয়েছে। বেতারে জেনেতের গলায় একবার প্রেমালাপ, একবার

পেটেণ্ট ওষ্ধের বিজ্ঞাপন। সময়টা জ্লাই মাস, আবহাওয়া গ্মোট। রাত্রিবেলা ঝড়-বৃষ্টির পরেও বাতাস পরিষ্কার হয় না। আঁদ্রের মনে হতে থাকে, তার সমস্ত উদ্যম ফ্রিয়ে গেছে।

জ্লাইয়ের গোড়াতেই পারীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত অঞ্চল থেকে মান্ষজন চলে গেছে। এ-সময়ে ট্রেনে ও রাস্তায় বেশ ভিড় হয় বলে আগে অনেকে ছ্টি কাটাবার জন্যে সম্দ্র-তীর বা স্বাস্থ্যকর জায়গাগ্লোর উদ্দেশ্যে যাত্রার দিনটা মাসের শেষ পর্যন্ত ম্লতুবী রাখত। কিন্তু এবারে গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পারীর ধনীরা সময়ের আগেই রওনা হয়ে গেছে। চলেছে দক্ষিণের অনেক দ্রের দেশের দিকে। বলে বেড়াচ্ছে —মজ্রদের এবার থেকে প্রো মাইনেতে ছ্টি, মধ্য-ফ্রান্স মজ্রদের দখলে গেল বলে। সম্দ্রের ধারে কয়লা-যোগানদার বা রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে পাশাপাশি বসতে হবে কল্পনা করে সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরা শিউরে উঠেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভ-গালিপকরা নাকী স্র তুলেছে যে স্বাস্থ্যকর জলের জায়গাগ্লো 'দ্ষিত' হয়ে উঠেছে। ভাগ্যবানরা গেছেন স্ইজার-ল্যাণ্ডে বা ইতালীতে। হোমরাচোমরাদের মধ্যে একজনও পারীতে থাকতে রাজি নয়। ১৪ই জ্লাই যে বিরাট মিছিল বার হবে তা কল্পনা করেই তারা আতঙ্কিত। এমন সময়ও ছিল যখন এই দিনটি সকলেই পালন করত। কিন্তু এখন এই জাতীয় দিনটি পপ্লার ফ্রণ্টের বিজয়োৎসবের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রতেইর বন্ধ্বান্ধবরা, যারা শহরেই থেকে গেছে, নিজেদের বাড়ির ওপর থেকে পতাকাগ্লো তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলে, যাতে কেউ ভেবে না বসে যে তারাও জাতীয় উৎসবে যোগ দিয়েছে।

আর শ্রমিক-মহলে খ্শির হল্লা। যদিও প্রো মাইনেতে ছ্টির দাবিটা মানবার আগে অনেকবার ভাবতে হয়েছিল দেসেরকে, কিন্তু তাকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শ্রমিকদের একট্ও সময় লাগেনি। দীর্ঘ আলোচনা শ্র্ হয়ে গেছে কে কোথায় যাবে তাই নিয়ে, কোথাকার দৃশ্য সবচেয়ে চমৎকার, কোন্ নদীতে সবচাইতে বেশি মাছ। শ্রমিক-অঞ্চলের কাফেতে বসে গল্প করবার সময় দেসের প্রায়ই বলে 'কি স্ন্দর দেশ! ওরা বিপ্লব চেয়েছিল আর যা ওরা পেতে চলেছে তা হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড মাছ-ধরার প্রতিযোগিতা!' জ্ন মাসের বিক্ষ্ব্ধ দিনগ্লোর পর গ্রাম্য প্রশান্তি নিয়ে জ্লাই এসেছে। অবশ্য একথা সত্যি যে কমিউনিস্টদের ম্খে এখনো মালিকের প্রতি-আক্রমণ ও ব্রতেইর ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু কেউ বিশেষ কান দিচ্ছে না তাদের কথায়। মানচিত্র, রেল-গাইড, নতুন নতুন সাইকেল আর স্নানের পোশাক, এসবের ভেতর ডুবে গেছে সবাই। প্রো মাইনেতে ছ্টির দিনগ্লো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্র্ হবে আগস্ট মাসে, তাই পারীর শ্রমিকরা ঠিক করে, শহরে থেকেই ১৪ই জ্লাই পালন করবে। কেউ মনে করে, এদিন পল্টনী কায়দায় কুচকাওয়াজ হোক, কারও কারও মতে রাজনৈতিক মিছিল বার করাই এদিনের সার্থকতা, আর অধিকাংশের কাছেই এদিনের অর্থ রাস্তায় রাস্তায় নেচে-গেয়ে ঘ্রে বেড়ানো।

১৩ই জ্লাইয়ের সন্ধ্যে থেকেই প্রোদমে নাচ শ্র্ হয়ে গেল। সেদিন সারা পারীতে বোধ হয় এমন একজনও বাজিয়ে ছিল না যার কাজ জোটেনি। চারদিকে লোকে চিৎকার করছে, ঢাক বাজাচ্ছে, শিস দিচ্ছে, গা ঢেলে দিয়েছে ফ্র্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরি হয়েছে অর্কেস্ট্রা-বাজিয়েদের জন্যে। শানাই-বাজিয়েদের তামাটে ম্খ আর কপালের ওপর ফ্লে ফ্লে ওঠা শিরা; তেষ্টায় ঢকঢক করে বিয়ার গিলছে। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর দ্লছে বিচিত্র রঙের চীনা লণ্ঠন। কাফেগ্লো সমস্ত

রকমের টেবিল সাজিয়ে বসেছে; খাবার টেবিল, রান্নার টেবিল, তাসের টেবিল, বাদ রাখেনি কিছুই। গরমে কোট খুলে ফেলে শুধু শার্ট গায়ে গাঁয়ের লোকের মতো নাচছে পুরুষরা। তাদের গ্যালিসের ধাতুগুলোয় আলো লেগে চকচক করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা তিল চিৎকার জুড়েছে। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল যাদুকর : আগুন গিলে খাচ্ছে, তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে মুরগির ছানা বার করে আনছে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রি করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিষীরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণ্যমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

ছোট ছোট শহর নিয়ে গড়া প্যারীর এই মফস্বল রূপ বোধ হয় আজকেই সবচাইতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সব শহরের আছে নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নায়ক ও নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভিড়, কিন্তু এখন সেখানটা একেবারে ফাঁকা। শ্রমিক-অঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যে আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের এইসব উৎসবের দিনগুলোকে সে ভালোবাসে; কারণ একটা উচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এইসব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভালো লাগে তার, ভালো লাগে যখন দোকানদার এই খাবার-গুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভালো লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশির চিরাচরিত সুরের তীক্ষ্ন আওয়াজ। কিন্তু এখন অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে আর এই বোধটা তীব্রতর হল বিশেষ করে প্লাস দ্য লা বাস্তিল্-এ এসে। প্রাচীন সংগ্রাম-ক্ষেত্র প্লাস দ্য লা বাস্তিল—জুলাই মাসের সেই গুমোট সন্ধ্যায় বহু লোকের ভিড় সেখানে। হালকা মনে নাচ শুরু করেছে সবাই, হাজার হাজার যুগলমূর্তি ঘুরে ঘুরে নাচছে। দূর থেকে সেই নাচের শব্দ ফুঁসে-ওঠা সমুদ্রগর্জনের মতো মনে হল। সেখান থেকে আঁদ্রে ফিরে চলল সিয়েন নদীর ধারে এবং তার প্রিয় জায়গা কঁত্রু-এসকার্প স্কোয়ারের দিকে। এই স্কোয়ারটিতে আশেপাশের গরীব লোকেরা জড়ো হয়েছে আমোদ করবার জন্যে। নানারকম অদ্ভুত চিহ্ন চারপাশে, বাদাম গাছগুলো গাঢ় সবুজ। তখন মধ্যরাত্রি পার হয়েছে, বসে বসে আঁদ্রে গরম বিয়ারে চুমুক দিচ্ছিল, হঠাৎ সে জেনেৎকে দেখতে পেল। একদল অভিনেতার সঙ্গে জেনেৎ এসেছে। এত খুশি হল আঁদ্রে যে চিৎকার করে উঠল। তারপর কিছুক্ষণ চঞ্চলভাবে চেয়ারে বসে থেকে এবং নিজেই নিজেকে বোকা বলে গালাগালি দিতে দিতে জেনেতের কাছে গেল।

'নাচবে?'

অবাক চোখ তুলে তাকাল জেনেৎ। তারপর ওরা নিঃশব্দে নাচতে শুরু করল।

এই আশ্চর্য যোগাযোগ এত অবাক করেছে ওদের যে দুজনেই কেমন আড়ষ্টভাবে চোখ কুঁচকে থাকে। এই আবেগে কোনো কলুষ নেই। আঁদ্রের অজান্তেই কখন যে তার হাতটা জেনেতের শরীর ছুঁয়েছে, কখন যে তার গায়ে জেনেতের নিশ্বাস লাগতে

শ্বরু করেছে তা তার খেয়ালই হয়নি। স্কোয়ারটায় বেশ ভিড়, অনবরত অপরের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও ওদের মনে হচ্ছে যেন কোন্ দূরে প্রান্তরে বা মরুভূমিতে ওরা পালিয়ে এসেছে।

আঁদ্রে প্রস্তাব করল, একসঙ্গে খানিকটা ঘুরে আসা যাক।

জেনেৎ বলে, 'আমার সঙ্গে অন্য লোক রয়েছে...আচ্ছা দাঁড়াও, ওদের আমি অপেক্ষা করতে বলে আসছি।'

একটা সরু আধা-অন্ধকার রাস্তায় ওরা ঢোকে। অন্ধকারে শিশুরা যেমন করে, তেমনিভাবে হাত ধরাধরি করে হাঁটে দুজনে। 'সিয়েন' কারখানায় সেই সন্ধ্যাটির কথা আঁদ্রেকে বলে জেনেৎ।

'এ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বুঝি না। খবরের কাগজ আমি পড়ি না বললেই চলে। কিন্তু আমি যা বলছি সব সত্যি। কিভাবে যে ওরা আমার কথা শুনল! আমি এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে বাড়ি ফিরে চিৎকার করে কেঁদেছি। কেন কেঁদেছি বলতে পারব না। হয়তো জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছিল বলে।'

আঁদ্রে বলে, 'গত কয়েক সপ্তাহে আমি শুধু ঘুরে ঘুরে শুনেছি আর দেখেছি। এর পরিণতি কি আমি জানি না, কিন্তু অসাধারণ একটা কিছু হচ্ছে। ওদের কাছে সব কিছু সহজ এবং গভীর। জমির সঙ্গে নাড়ীর টান ওদের। কিন্তু তুমি আর আমি সাধারণ, যে সব লোককে দেখি, তারা একেবারেই অন্য ধরনের। তারা রুচিবান হতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠাবান নয়। খুব সহজেই তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায়। এক রকম গাছ আছে যা ঠিক এই ধরনের। সেগুলো মাটি থেকে উপড়ে আসে, তারপর ভাসতে ভাসতে কোথায় যে চলে যায় কে জানে। সমস্ত ব্যাপারটাই অহেতুক, আকস্মিক...'

বাধা দিয়ে জেনেৎ বিষণ্নভাবে বলে, 'আঁদ্রে, এই হচ্ছি আমরা।'

আলো-ঝলমলে প্লাস দ্য ইতালীতে আসে ওরা। হাসি, গান আর বাজীর শব্দ চারদিকে।

জেনেৎ বলে, 'জান আঁদ্রে, এই ঠুনকো অবস্থা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই..'

'কিসের ঠুনকো অবস্থা?'

'সব কিছুর। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ না থাকাই ভালো। কাচ খুকিটি সেজে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। এমন কোন কথা নেই...'

কথাগুলো আঁদ্রেকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সেও ঠিক এই কথাই ভেবেছে।

'বলতে পার কেন আমরা ঠিক একই রকম ভাবি?'

'এক হিসেবে এটা যে আমাদের শিল্পবোধের ফল তা আমি জোর গলায় বলতে পারি। সেদিন কারখানায় গিয়ে এই বোধ আমার হয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম— ওরা মনে করতেও পারে যে আমরা ওদেরই দিকে, হয়তো আমাদের ভালো লাগবে ওদের আর ফলে ওরা হয়তো আমাদের আদর দিয়ে নষ্ট করতে পারে। কিন্তু এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমরা সবকিছুর বাইরে পড়ে যাব। কেন? আমি বলতে পারব না। তুমি কি খেয়াল করেছ 'শিল্প' শব্দটা লোকে কি ভাবে উচ্চারণ করে? কোনো কোনো সময় প্রার্থনার বাণীর মতো, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই কলেরা, প্লেগ বা কোনো একটা রোগের নামের মতো। এই রোগের প্রতিষেধক হিসেবে একটা টিকের ব্যবস্থাও যে কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা একটু নাগরদোলায় চড়লে কেমন হয়, আঁদ্রে?'

কিম্ভূতকিমাকার জন্তুগুলো—কোনোটা সবুজ, কোনোটা কমলা, কোনোটা দেখতে ড্রাগনের মত, কোনোটা পক্ষিরাজ বা আধা-মানুষ আধা-ঘোড়া—অনবরত ওঠানামা করছে আর ঘুরছে। প্রকাণ্ড অর্গানটা গর্জন করছে—আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি তা তুমি কোনোদিন জানতে পারবে না।...একটা নীল চকচকে হাতীর ওপর উঠে বসে জেনেৎ ও আঁদ্রে। হঠাৎ হাওয়া বইতে শুরু করেছে। গুমোট আবহাওয়াটা কেটে যায়।

আলিঙ্গনে পরস্পরকে বেঁধে নেমে আসে দুজনে। মুখে কথা নেই। এইসব মুহূর্তে ভয় হয় কথা বলতে, ভয় হয় এমন কি পাশ ফিরে তাকাতে বা হাতখানা নাড়তে—পাছে মুহূর্তের এই সুখটুকু হাতছাড়া হয়।

প্রথমে জেনেৎই চেতনা ফিরে পেল। এবার তার ভয় হল যে আর একটুও দেরি করলে তাকে বেজায় মুশকিলে পড়তে হবে। তার মনের এই ভয় সাময়িক চিত্তবিক্ষেপ নয়; এমন একটা কিছু যা জোরালো, যা তাকে গ্রাস করেছে। ওদের দুজনের মিলন কখনো সম্ভব নয়। একই ধরনের অশান্তিতে ওরা ভুগছে; একই জাতের মানুষ ওরা,... একই পরিবারের...কি বলেছিল আঁদ্রে? হ্যাঁ, এক ধরনের গাছ আছে যা মাঠ থেকে মাঠে ভেসে ভেসে বেড়ায়। আঁদ্রের সঙ্গে সে ঘুরবে? না, না, তা হবে ভাই আর বোনের অবৈধ সম্পর্কের মতো!

জেনেৎ বলল, 'আঁদ্রে, এবার আমাকে যেতে হবে। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

স্কোয়ারের যে দিকটা অন্ধকার সেখানে একটা বাদামগাছ, গাছের ডালে দলছাড়া একটা লণ্ঠন, পাতার ফাঁকে ফাঁকে সেই আলোর রেখা—তারই তলায় দাঁড়িয়ে জেনেৎ সস্নেহে চুমু খেল আঁদ্রেকে। জেনেতের মুখচোখে কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব। আঁদ্রেকে সে পুরুষ হিসেবে দেখছে না—দেখছে একটা দান হিসেবে। দুই ভীরু হাতে জেনেৎকে ধরতে চেষ্টা করল আঁদ্রে। কিন্তু জেনেৎ সরে গেল, 'না, না,...তুমি নাই বা দিলে...'

কেন নয়, সে কথা আঁদ্রে জিজ্ঞেস করল না। নিঃশব্দে দুজনে প্লাস ক'ত্রু এস্কার্প-এ ফিরে এল, নিঃশব্দে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

অন্য অভিনেতারা জেনেতের এই গোপন অনুরাগীর প্রসঙ্গ তুলে তাকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টাতামাসা শুরু করে। জেনেৎ জবাব দেয় না। তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। খানিকটা টক মদ খেয়ে ফেলল জলের মতো। মদটা খেয়ে তার আরও গরম লাগতে লাগল। কপালের দু পাশের রগে শুরু হল দপদপানি। অর্গানটা সমানে সেই ব্যর্থ প্রেমের কাঁদুনি গেয়ে চলেছে। জেনেতের মনে অস্পষ্টভাবে একটা চিন্তা এল, 'এইভাবে প্রেম নিবেদন এক হাতীরাই করতে পারে বোধ হয়।' সেই নীল হাতী..কি করেছিল সে? চিৎকার করে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা এখন বলতে পারলে যেন ভালো হয়।

সে বলল, 'কি মজার ব্যাপার! মেয়েটিকে ওরা সারা জীবন মাটির নিচে লুকিয়ে রাখল। মাটির নিচের রেলপথ—মেট্রোতে। না, তার চেয়েও গভীর—খনির ভেতরে। আরো গভীর—নরকে। তারপর ওরা ওকে বাইরের পৃথিবীতে বার করে এনে বলল—ছুটে বেড়াও, হাসো, নিশ্বাস নাও! কিন্তু ও বলল—না। কেন? কারণ, ও ছুটতে পারবে না, হাসতে পারবে না, নিশ্বাস নিতে পারবে না। না, না!'

'কি ছাইভস্ম বকছ? কে বলেছে এসব কথা?'

'পাঠ্যপুস্তকের দেবী। আমার পরিচিত একজন লোক দেবীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস

করেছিল। তোমার ভয় নেই, মারেশাল। সেই লোকটি তুমি নও। অভিনেতাদের মধ্যে কেউ নয়। লোকটি একজন শুঁড়ি। কিংবা, হয়তো আমি নিজেই। যেই বলে থাকুক না কেন তাতে কিছু আসে যায়?'

'তোমার মাথার ঠিক নেই জেনেৎ!'

'কে জানে! আমি এখন কথা বলতে চাইছি কিন্তু বলতে পারছি না। আচ্ছা মারেশাল, বলতো তুমি কোনদিন সুখ কল্পনা করেছ?'

'না, একবারও না। কেউ তা করে না।'

'ভুল। তুমি ভুল বলছ, মারেশাল। আমার তো সব সময়ে এই ভাবনা। অন্য সবার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, দেখ, সুখ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কত যত্ন করে ওরা—কাঁচের ঢাকনা দেয়, মাখনের মতো কলাপাতায় মুড়ে রাখে। আর নাচে, অবিরাম নাচে। আজও নাচছে। সেই লাইনটা মনে আছে তো—'লিসবন মুছে গেছে, কিন্তু পারীর নাচ শেষ হয়নি।' সে সময়ে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল। হ্যাঁ, এখন আর একটা ভূমিকম্প হওয়াও আশ্চর্য নয়। কিংবা হয়তো নতুন একটা আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়বে। মড়কও দেখা দিতে পারে, বোমা পড়তে পারে আকাশ থেকে। কি হবে জানি না...কিন্তু এই সুখ কী ঠুনকো! সাবধান মারেশাল, নিশ্বাস ফেলো না!'

কথা বলতে বলতে তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল নেমে এসেছে। ভোর হতে আর বিশেষ দেরি নেই। বাড়ি ফিরে চলেছে সবাই। জেনেতের ঠিক পাশেই কে যেন বারবার বলছেঃ

'ভয় কি, সোনামণি, কাল আবার আমরা নাচব।'

দিনের আলোয় ভূতের মতো দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। স্কোয়ার জনশূন্য। এখানে ওখানে আবর্জনার মতো ছড়িয়ে আছে মাড়িয়ে-যাওয়া ফুল, গোলাপফুলের পাপড়ি, সিগারেটের টুকরো, বোতলের ছিপি আর পটকা।

আঁদ্রে যখন স্টুডিওতে ফিরে এল, লাল সূর্য তখন সমুদ্রের মতো ছড়ানো ছাদ-গুলোর ওপরে উঠে এসেছে। ঝলসে উঠছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে চারদিক। জানলার পাশে আঁদ্রে বসল। একটা বিষণ্ণতা আস্তে আস্তে নেমে আসছে তার মনের ওপর। কোন কিছু ভুলতে পারছে না। অনেক দূরে একটা অন্ধকার মাতাল রাতের পটভূমিকায় কৃত্রিম পাতায় ঘেরা চীনা লণ্ঠনের ঝাড় সামনের ওই সূর্যের মতো এখনো জ্বলছে। অসম্ভব জোরে পাক খাচ্ছে বহুরূপী। হ্যাঁ, সব কিছুই তো এই রকমই ঘোরে—একে দেখা বা বোঝা অসম্ভব। ঝড় ও অরণ্যের সময়ের হিসেব এক নয় নিশ্চয়ই।

সেজানের যে কথাগুলো আঁদ্রে অনেক বার মনে মনে ভেবেছে, তা আবার মনে পড়ল। 'প্রকৃতিকে দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করতে পারলে তবেই সত্যিকার দেখা হয়, আকস্মিকতার প্রভাব বা ভুল-দেখার সম্ভাবনা থাকে না। তারপর সেই চিন্তা থেকে আসে চেতনা।' নিভৃত আই-তে কত সুন্দর তাঁর জীবন! সেই সময়টাই ছিল অন্য রকম! কিন্তু জেনেৎ বলেছে, 'না, না, তুমি নাই বা দিলে—' কী না? কামনা? আশা? পরিচিতি?

এদিকে সূর্য আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে। চোখ ধাঁধানো আলোর নিচে শহরটা নিঝুম, ঘুমন্ত; আর সেই আলো চারদিকের সমস্ত রং শুষে নিচ্ছে। অন্ধের মত আঁদ্রে তাকিয়ে রইল পৃথিবীর দিকে; এই পৃথিবীকে আজও সে বুঝতে পারে না। জুলাই মাসের সোনালী রোদে স্নাত হয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময়ে সে ঘুমে ঢলে পড়ল।

বাইশ

জেনারেল পিকার্ যখন তার হালকা যুদ্ধ-ঘোড়াটার ওপর বসে থাকেন, তারি চমৎকার লাগে। মরক্কো জঙ্গী-বাহিনীর পুরোভাগে তাকে দেখে মনে হয় যেন কোনো প্রাচীন সামরিক চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতি বছর ১৪ই জুলাই তারিখে সামরিক কুচকাওয়াজ হয়। যারা ভিড় করে দেখতে আসে, তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত। তাছাড়া আসে সেইসব শৌখিন্ পোশাকের কারিগর যারা পল্টনী উর্দীর বাহার দেখতে ভালোবাসে। আর আসে একপাল ছেলে। কিন্তু এ বছর কুচকাওয়াজ দেখবার জন্যে অন্য ধরনের দর্শকও এসেছে। সাঁজ-এলিজেতে যাদের নিত্যি যাওয়া-আসা তারা চলে গেছে সমুদ্রের ধারে বা জলহাওয়া বদলাতে কোনো ভালো জায়গায়। পারীর সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে এখন শহরতলীর মানুষের ভিড়। পথে ঘাটে কেবল মজুর। শুধু দু-একটা রাস্তার কোণে ব্রতেইর সমর্থক কয়েকজন উদ্ধত যুবক দাঁড়িয়ে। তাদের পরনে ফিটফাট পোশাক, মাথায় 'বেরে' টুপি। মাঝে মাঝে তারা চিৎকার করে বলছে, 'সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক!' শ্রমিকরা জবাব দিচ্ছে, 'রিপাব্লিক-বাহিনী দীর্ঘজীবী হোক!' যদিও রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় ছ-যুগ কেটেছে, তবুও এই চিৎকারের ভেতর কোথায় যেন আজও একটা রেশারেশির ভাব থেকে গেছে। ফলে প্রায়ই হাতাহাতি লেগে যায়।

কিছুদিন হল কাগজে যুদ্ধের আশঙ্কার কথা ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। সেই সঙ্গে রাইন ও আল্পস্-এর অপর দিকের নানা গোলমেলে কাণ্ডকারখানার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ অনেক আশা নিয়ে যাদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা হচ্ছে শিরস্ত্রাণ আঁটা সৈনিক, গোলন্দাজ বাহিনী ও হাসিখুশি বৈমানিক। অনবরত শোনা যাচ্ছে লোরেন্ আর শাব্র্-এর জঙ্গী সুর। বড়ো রাস্তার ধারে ধারে জোর কদমে টান হয়ে মার্চ করে চলেছে দলে দলে সৈন্য। কিন্তু যে দৃশ্যটি জনতার হৃদয় জয় করল তা হচ্ছে সৈন্যদলের গঠন—অনেক রকম মাপের মানুষ একসঙ্গে জড়ো হয়েছে, বেঁটে বামনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে তেঢেঙে দৈত্য। কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই, যেন কোনো দূর অভিযানের পথে পা বাড়িয়েছে সকলে। দর্শকরা অনুভব করল, ওরা তাদেরই আপনার লোক।

'বেরে' মাথায় যে যুবকের দল দাঁড়িয়েছিল তারা মহা উৎসাহে অভিনন্দন জানাল পিকার্কে, দেখাদেখি জনতাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। সেনাপতি হিসেবে পিকারের অতীত জীবন খুবই গৌরবময়। দু-বার সে যুদ্ধে আহত হয়েছে এবং একজন বীর যোদ্ধার সমস্ত গুণ তার ভেতর পুরো মাত্রাতেই আছে। কিন্তু আজ পিকারের মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি এবং এই হাসির ভেতর তার মনের ভাবটা পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। কুচকাওয়াজ দেখবার জন্যে এবার যে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছে, তা দেখে সে বিরক্ত। এই ছোটলোকগুলোর ওপর তার মরক্কো বাহিনীকে লেলিয়ে দিতে পারলে কি

খ্দুশিই না হয় সে! ঘাড় টান করে সোজা সামনের দিকে সে তাকিয়ে রইল, যেন তাকে দ্দু পাশের এই অপ্রীতিকর দৃশ্য না দেখতে হয়। চোখের সামনে ফ্দুটে উঠল আর্ক দ্য ত্রিওঁফ, অতীতের অনেক গৌরবময় স্মৃতি নিয়ে আজও যা মাথা উঁচ্দু করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আজকের এই পরিবেশের সঙ্গে স্মৃতিস্তম্ভটার কোনো সামঞ্জস্য নেই—কতগ্দুলো ওঁছালোক আজ কর্তৃত্ব করছে শহরের ওপর, লাল ঝান্ডা উড়ছে চারপাশে আর তার মতো যোদ্ধা ও সেনাপতিকে কিনা একদল ভুঁইফোড় আর রাজমিস্ত্রীর হ্দুকুম শ্দুনতে হচ্ছে!

একদল শ্রমিক দাঁড়িয়েছিল আর্ক দ্য ত্রিওঁফের সামনে। কাছাকাছি পিকার্ পেঁছিতেই মিশো চিৎকার করে ওঠে, 'রিপাব্লিক বাহিনী—' সঙ্গে সঙ্গে ব্রতৈইর সমর্থক ছোকরাগ্দুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। প্দুলিশের তীক্ষ্ণ হ্দুইস্ল্ বেজে ওঠে। কান খাড়া করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পিকারের ঘোড়াটা। কিন্তু সেদিকে একবার ফিরেও তাকায় না পিকার্। শ্দুধ্দু তার নাকটা আর একট্দু ক্দুঁচকে যায় আর মনে মনে আর একবার সে বলে—ছোটলোক!

গত দ্দু বছর ধরে সাঁজ-এলিজেতে ফ্যাশিস্টদের পবিত্র অধিকার রক্ষিত হয়েছে। বামপন্থী কাগজের হকার, পপ্দুলার ফ্রন্টের সমর্থক শ্রমিক, ইহ্দুদি ইত্যাদি লোকদের ওপর রোজ মারধোর করবার জায়গা এটা। কাফের বারান্দায় যে সব শৌখিন লোক দাঁড়িয়ে থাকে, তারা রোজই এই 'তক্মা-আঁটা ছোকরাদের' কীর্তি দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজকের কথা আলাদা। নানা অঞ্চল থেকে আজ অনেক নতুন লোক এসেছে এখানে। আর্ক দ্য ত্রিওঁফের সামনে রীতিমতো খন্ডয্দুদ্ধ বেধে গেল। ফ্যাশিস্টরা তৈরি হয়ে এসেছিল—রবারের ডান্ডা, ভারী মাথাওলা চাব্দুক আর ছ্দুরি ছিল তাদের কাছে। রক্তমাখা শরীরে একজন শ্রমিক ধরাশায়ী হল। মিশোর চারপাশে একটা ব্যূহ তৈরি হয়েছিল, মিশো চেষ্টা করছিল সেই ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে। হঠাৎ তীব্র একটা ব্যথা অন্দুভব করল—যেন কেউ তার পিঠের ওপর চাব্দুক বসিয়েছে। এক হাতে একটা দরজার হাতল চেপে ধরে হামলাকারীদের ওপর সমানে ঘ্দুষি চালাতে লাগল সে। মহা উৎসাহে প্দুলিশের দল ফ্যাশিস্টদের আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। ব্ল্দুম বা ভীইয়ারের কথা একবারও তারা ভাবে না। নিতান্ত অভ্যেসবশেই তারা বেছে বেছে এমন সব লোকদের ওপর লাঠি চালাচ্ছে যাদের সাজপোশাক সাদাসিধে। আর সাঁজ-এলিজের লোকজনকে প্দুরোপ্দুরি বাঁচিয়ে চলেছে। মিশোর বন্ধ্দুবান্ধবরা ছ্দুটে এল তাকে উদ্ধার করতে। ফ্যাশিস্ট দলের একজন চেষ্টা করছে মিশোকে ঘ্দুষি মেরে ফেলে দিতে। কিন্তু মিশো তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। মার্চ করে যাবার সময় সৈনিকরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল এই হ্দুটোপাটি।

গায়ের কোটটার দিকে তাকিয়ে মিশো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ছ্দুরির ফলা লেগে চিরে গেছে কোটটা। সেই ব্যথাটা এখন আর-নেই কিন্তু তার পিঠের খানিকটা জায়গা প্দুড়ে যাওয়ার মতো লাল টকটকে হয়ে রয়েছে। কমরেডরা তাকে একটা ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। 'হারামজাদারা আমার সব চেয়ে ভালো কোটটাই নষ্ট করেছে।' কথাটা বারবার বলে হাসিয়ে তুলল সবাইকে।

কুচকাওয়াজ শেষ হবার পর তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নেয় পিকার্। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই অসামরিক বেশে রওনা হয় শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলের দিকে। প্রত্যেকটি

গ্রামে গাড়ি থামাতে হয় তাকে কারণ রাস্তা বন্ধ করে নাচগান জুড়েছে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা। চারদিকের এই হৈ-হল্লায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম। চোখ বুজে থাকে সে। এই হারমোনিয়ম আর বাঁশি থামাবার জন্যে যে কোনো দাম দিতে সে রাজি।

ফের্তের কাছে ছোট্ট একটা ঘরে ব্রতৈই তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। জায়গাটা এত সুন্দর আর নির্জন যে প্রেমের কুঞ্জের কথা মনে পড়ে যায়। এটা যে ষড়যন্ত্রকারী-দের মেলবার জায়গা তা ভাবাও যায় না। মার্ন নদীর খাড়াই পাড়ের ওপর তৈরি বাড়িটা, বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় একদিকে নদী আর বুনো ঘাস-ঢাকা দ্বীপ, অন্য-দিকে প্রান্তরের পটভূমিকায় উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের ভেতর মুখ গুঁজে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ানো গরুগুলো বিচিত্র বর্ণের ফুটকির মতো। বারান্দার গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে লতানো গাছের ঝাড় উঠেছে, বাতাসে লতা-ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

ব্রতৈইকে সব সময়েই যেমন দেখা যায়—কাঠখোট্টা আর গোমড়া। ক্যানকেনে গলায় সে গত কয়েক দিনের ঘটনাগুলো বলতে শুরু করে।

সে বলে, 'তেসা বেশ কিছুটা দলবল জুটিয়েছে। কিন্তু এ-ব্যাপারের হেস্তনেস্ত পার্লামেণ্টে হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি না। স্প্যানিয়ার্ডরা শিগ্গিরই একটা কিছু করবে। যদি তারা পপুলার ফ্রণ্টকে ভেঙে ফেলতে পারে, তবে আমরাও ওই পথে চলব —আসচে শরতের মধ্যেই।'

ভিড়ে ঠাসা সাঁজ-এলিজের দৃশ্যটা মনে পড়ে পিকারের। বলে, 'এ বিষ সহজে ছাড়বার নয়। লাখ লাখ মানুষকে খতম করতে হবে। সৈন্যদের দিয়ে কতটুকু কি করানো যাবে তা আগে থেকে বলা শক্ত। আর সৈন্যরা না থাকলে অফিসারদের আর ক্ষমতা কী! অবাস্তব কল্পনা। কি হবে জানি না। তুমি কিসের ওপর ভরসা করে আছ?'

ব্রতৈই বলে, 'একথা আলোচনা করবার সময় এখনো আসেনি। ড্যুসেলডর্ফের কাছ থেকে যা অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, ধরতে গেলে তা অবিশ্যি কিছুই নয়। কিন্তু তোমার ওই কর্নেল যা দিয়েছে তার তুলনায় যথেষ্টই বলতে হবে। আর একটা কাজ যদি করতে পার তো ভালো হয়। সাধারণ সৈন্য সমাবেশের কি পরিকল্পনা আছে জানতে হবে। এই মাথামোটা লোকগুলো কখন কি করে বসে ঠিক কি! আমি চাই না যে আমরা তৈরি হবার আগেই আচমকা যুদ্ধ শুরু হোক...'

পিকার মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমনিতে সে ব্রতৈইর একান্ত ভক্ত, তবুও আজ এই প্রথম ব্রতৈইর কথায় তার মনে সন্দেহ জেগেছে। এই অনুরোধ কি মেনে চলা উচিত? পিকাররা হচ্ছে পল্টনী বংশ। পল্টনের সঙ্গে যা-কিছুর সম্পর্ক আছে সবই তার কাছে অত্যন্ত পবিত্র। অনেক যুদ্ধের স্মৃতি, অনেক পরিবেশের ঐতিহ্য, জেনা থেকে শুরু করে ভের্দ্যঁ পর্যন্ত অনেক প্রখ্যাত নাম জড়িয়ে আছে এই মনোভাবের সঙ্গে। এমনিতে মাথা তার ঠাণ্ডা, কিন্তু আজ সে অল্পবয়সী ছোকরার মতো উত্তেজিতভাবে কথা বলতে থাকে।

'আমি ভেবেছিলাম, যুদ্ধ শুরু হলে আমরা সমস্ত মতভেদ ভুলে এক হয়ে দাঁড়াব।'

কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করে ব্রতৈই, তারপর এসে দাঁড়ায় পিকারের একেবারে সামনাসামনি।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। আমার দেশপ্রেমকে তুমি সন্দেহ করছ না আশা

করি। আমরা দুজনে একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে দিন কাটিয়েছি, দুজনের প্রিয় বন্ধুদের হারিয়েছি সেখানে। কিন্তু আসল কথাটা কি জান, আজ আর জাতির প্রশ্ন নেই—ক্ষমতার আসনে বিশেষ একটা দল জুটেছে। এর বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াব, এমন কি সেজন্যে যদি আমাকে জার্মানদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়—তবুও। ভগবান করুন তা যেন না হয়! কথাগুলো মুখে আনাটাই শক্ত, কাজে করা তো আরো শক্ত। সেজন্যে দরকার চরিত্রের দৃঢ়তা ও অতিমানবিক ইচ্ছা-শক্তি। কিন্তু যাই হোক, আসল কথাটা হচ্ছে এই—এরা যদি জেতে তবে ফ্রান্স জিতবে না, জিতবে বিপ্লব।'

পিকার্ বলে, 'কিন্তু সেনাবাহিনী? সেনাবাহিনীর কি হবে?'

'সেনাবাহিনীর সাহায্যেই ফ্রান্সের পুনর্জন্ম সম্ভব। তা যদি না হয়? তা না হলে এবারের মত ফ্রান্সের পালা ফুরলো। আগামী একশো বছর...'

দূরের বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে তাকিয়ে পিকার্ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কি যেন সে ভাবতে চেষ্টা করছে। কিন্তু একটা অসহ্যরকমের উজ্জ্বল আলো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কেমন একটা হতভম্ব অবস্থা। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার করে ওঠে, কাঁচের পাত্রগুলো টুকরো টুকরো করে ভেঙে চলে যায় এখান থেকে। কিন্তু লতাফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়েছে চারদিকে, বাতাসে মৌমাছির গুনগুন। পিকারের আবার মনে পড়ে, সাঁজ-এলিজের সেই ভিড়। ছোটলোক! না, এটা ফ্রান্সের আসল চেহারা নয়! ব্রতেই ঠিক কথাই বলেছে। এর চেয়ে হিটলার ভালো। অবশেষে পিকারের গলা দিয়ে স্বর বেরোয়, কেমন চাপা ও নিষ্প্রাণ, নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা ঠেকছে।

'তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে একথা মানতেই হবে যে মহৎ একটা দুঃখকে তুমি মাথা পেতে নিয়েছ। আর যদি ভুল হয়ে থাকে...না, একথা আমি ভাবতে চাই না। হুকুম মেনে চলা আমার অভ্যেস। এখন আমি সর্বস্ব ত্যাগ করছি—শুধু জীবন নয়, সম্মান...'

শহরে ফেরার সময়ে ব্রতেই সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু পিকার একসঙ্গে ফিরতে রাজি নয়। কিছুক্ষণ একা থাকতে চায় সে। গাড়িতে বসে আবার সে চোখ বোজে, তারপর একটা বিহ্বল উৎকণ্ঠায় তলিয়ে যায়। বহুরূপীদের বাঁশি তেমনি বিশ্রীভাবে আর্তনাদ করে চলেছে। পারীর উপকণ্ঠে এসে গাড়ি আটকে গেল। সামনের পথ বন্ধ—প্লাস দ্য লা বাস্তিল থেকে মিছিল ফিরে আসছে। একটা কাফের বারান্দায় একদল সৈনিককে দেখে শ্রমিকরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'রিপাব্লিক্-বাহিনী দীর্ঘ-জীবী হোক!' ভুরু কুঁচকে চোখের ওপরে দু হাত চেপে ধরে চালককে পিকার বলে, 'অন্য কোনো পথে যাবার চেষ্টা কর। অন্য যে কোন পথ, যেদিকে তোমার খুশি। কিন্তু যতো তাড়াতাড়ি পারো আমাকে নিয়ে চল। সময় নেই আমার...'

তেইশ

মিছিল এগিয়ে চলেছে সারাদিন ধরে। দশ লক্ষেরও ওপর লোক যোগ দিয়েছে মিছিলে। এর যেন শেষ নেই, চলেছে তো চলেছেই—দ্য লা বাস্তিল, দ্য লা রিপাব্লিক, দ্য লা নাসিয়ঁর ভেতর দিয়ে, সরু সরু রাস্তা ঘুরে, চওড়া বুলভারের ওপর দিয়ে। এক

একবার মনে হচ্ছে, মিছিল বুঝি এবার শেষ হল, কিন্তু পর মুহূর্তেই নতুন নতুন দল উপস্থিত হচ্ছে চোখের সামনে।

এ বছরের মিছিল কিছুটা অন্য ধরনের। এমনটি আশা করা যায়নি। বিজয়ী শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ ভাবে একটা নম্রতা রয়েছে। গত বছরেও এই একই দিনে আর এই একই রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছিল, কিন্তু তার রূপটা ছিল সংগ্রামের—। আর আজকের মিছিল দেখে মনে হয় যেন একটা মেলা বসেছে। আগামী দিনের সংগ্রামের কথা ভাবছে খুব কম লোকই। সবাইকে আচ্ছন্ন করেছে একটা ক্ষমতাবোধ। সবাই ভাবছে : 'আট লক্ষ লোক মিছিলের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গেছে! দশ লক্ষ! পনের লক্ষ!...'

শহরের অর্ধেক জায়গায় পুলিস নেই। সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে পুলিসদলকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখছে শ্রমিকরা নিজেরাই। মারামারি নেই, ঝগড়া নেই, গালাগালি নেই—ছুটির দিনের মত প্যারী মেতে উঠেছে গানে আর নির্দোষ ঠাট্টা-তামাসায়।

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাথা পোশাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরি আঙুরফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুরক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোশাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। জবরজঙ ধরনের ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেত'রা। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নেচে নেচে চলেছে।

অবসর পাওয়া ফৌজী লোকেরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়িতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইড্‌রা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন বাঁকা-পিঠ বুড়ো। এই ছোট্ট দলটির মধ্যে রয়েছে সেইসব পুরনো লড়াকু লোক যারা পারী-কমিউনে যোগ দিয়েছিল। অনেক কাল আগে যখন ওরা ছিল তরুণ যুবক তখন ওরা ম'মার্ৎর্‌ ও বেলভিল-এর এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় শেষ ব্যারিকেড খাড়া করেছিল। আজ ওদের নাতিপুতিদের এই বিজয়-অভিযানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওদের শুকিয়ে যাওয়া কোঁচকানো ঠোঁট হেসে উঠছে।

মাথা উঁচু করে গর্বভরে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে —হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে লড়াইয়ের নিশানার মতো। কিছুকাল আগে ম্যাকসিম গোর্কি মারা গিয়েছেন; তাঁর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। রুশীয় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে রয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আরও ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

পারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা ভেলার মতো যেন জাহাজ ডুবির পর নানা দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে-সব শরণার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ ফরাসীদের পাশাপাশি হাঁটছে। খানিক পরে পরেই বিদেশীদের গলা শোনা যাচ্ছে; ঝাণ্ডা আর পতাকাগুলোতেও বিদেশী শব্দ লেখা। নেপ্‌ল্‌স্‌ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অস্‌তুরিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা, পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার

'ঘেটো' এলাকার ইহুদী, পালিশওলা, মুচি, সাইনবোর্ড-লেখক, সাংহাইয়ের ছাত্র, আনাম-দেশীয়, আরব, নিগ্রো—সবাই যোগ দিয়েছে মিছিলে আর একসঙ্গে সুর মিলিয়ে 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে।

টুপি-কারখানার মজুররা প্রকাণ্ড একটা ক্যাপ এনেছে, ফরাসী শ্রমিকরা যে-ধরনের ক্যাপ আবহমান কাল পরে। ক্যাপটার তলায় লেখা—'হে সর্বহারা, এ তোমার রাজমুকুট!'

লোহা-মজুরদের হাতে থোকা থোকা ফুল—পিংক্, প্যান্সি, নানা জাতের। তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে হাসিখুশি তরুণী ফুলওয়ালীরা, তাদের হাতে রুপোর তৈরি প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ি।

প্লাস দ্য লা বাস্তিল থেকে পোর্ং দ্য ভ্যাঁসেন্ পর্যন্ত আগাগোড়া রাস্তাটার দু ধারে ধোঁয়াটে নোংরা বাড়িগুলো লাল হয়ে উঠেছে। জানলায় জানলায় লাল পর্দা, লাল কার্পেট, লাল কাপড়, বারান্দায় লাল ব্লাউজ পরা মেয়ে। পপি, পিংক্, তিউলিপ—ফ্রান্সের যেখানে যতো লাল ফুল আছে সমস্ত বোধ হয় সেদিন উজাড় করে আনা হয়েছে।

চড়ুইপাখির ঝাঁকের মতো গাছের ডালে উঠেছে ছোট ছোট ডানপিটে ছেলেরা। আজ ওদের বেজায় ফুর্তির দিন। কিছুক্ষণ আগে ওরা বিশ্বাসঘাতক এরিওর কুশ-পুত্তলিকা পুড়িয়েছে। মুসোলিনির ফাঁপাফুলো মূর্তিটা ঝুলছে ফাঁসিকাঠে, তার পাশেই ন্যাকড়ার তৈরি হিটলার। রণ-পার ওপর দাঁড়ানো কিম্ভূতকিমাকার লম্বাটে মূর্তিটা লা'দ্যার।

'সিয়েন' কারখানার শ্রমিকরা চারদিক থেকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হচ্ছে। বাস্তিল কারাগারের একটা মডেল রয়েছে ওদের সঙ্গে, মডেলটার ওপর লেখা—'মনে রাখবেন যে একদিন আমরা বাস্তিল জয় করেছিলাম! মনে রাখবেন যে আজ আবার নতুনভাবে বাস্তিল জয় করতে হবে!' দলটির আগে আগে চলেছে মিশো, লেগ্রে আর পিয়ের।

মঞ্চের ওপর অনেক লোক দাঁড়িয়ে; মন্ত্রীরা আছে, আছে ট্রেডইউনিয়ন প্রতিনিধি, লেখক, শ্রমিক, কমিউনিস্ট ও র‍্যাডিকাল। ব্লুমের মুখে বিষণ্ণ হাসি। দালাদিএ গম্ভীর—কতগুলো একগুঁয়ে রেখা ফুটে উঠেছে মুখের চারপাশে, মুঠি-করা হাতটা ওপরের দিকে তোলা। ভীইয়ার আপন মনে বলে চলেছে—'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ...'

'সিয়েন' কারখানার দলটি যখন মঞ্চের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, কে যেন পিয়েরকে ডেকে বলল, 'দ্যুবোয়া, ভীইয়ার তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে।'

সমাজতন্ত্রী দলের সভ্য, সাম্প্রতিক ধর্মঘটে সক্রিয় অংশীদার, এই প্রতিভাশালী তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের কথা ভীইয়ার শুনেছে এবং সরকারী কাজকর্মের ভেতরেও পার্টির প্রতি দায়িত্ব সে ভুলে যায়নি। বন্ধুত্বপূর্ণভাবে পিয়েরের হাতটা ঝাঁকিয়ে সে বলল :

'সাবাস! কমিউনিস্টরা বলে আমরা বিপ্লবী চেতনা হারিয়ে ফেলেছি। এই অভি-যোগের বিরুদ্ধে সব চেয়ে ভালো জবাব তুমি।'

'ধন্যবাদ।' পিয়ের এত বেশি লজ্জা পেয়েছিল যে এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না।

ভীইয়ার বলল, 'তোমার বাবাকে আমি চিনতাম মনে হচ্ছে। তোমার দেশ পেরপিঞাঁ—নয় কি?'

যৌবনের কোনো ঘটনা ভীইয়ার ভোলেনি। গতকাল যে ডেপুটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে আজ হয়তো তার কথা আর মনে থাকে না কিন্তু এখনো সে স্পষ্ট মনে করতে

পারে তার বাল্যবন্ধুদের কথা, শহরে শহরে বক্তৃতা দেওয়া, অনেকদিন আগেকার নানা সম্মেলন।

'তোমার বাবা এবং আমি একবার একটা মিছিল বার করে ফেরেরো নামে একজন স্প্যানিয়ার্ডের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। তোমার কাছে এখন এই ফেরেরো নামটার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কিন্তু সে সময় সমস্ত দেশ ফুঁশে উঠেছিল। আশ্চর্য এই দেশের মানুষ! এমন আন্তর্জাতিক সংহতিবোধ! এমন ভাবে সাড়া দেওয়া!... আচ্ছা, তোমার সাফল্য কামনা করি।'

পুরনো দিনের কথা মনে পড়তে ভীইয়ার কেমন বিচলিত হয়ে উঠেছে। তার মনে হচ্ছে যেন এই ইঞ্জিনিয়ারের মতোই সেও এখনো তরুণ, সেও কোনো কিছুর সঙ্গে আপোস করে চলে না। মিছিলটাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছে সে এখন। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে সেও যেন পা ফেলে এগিয়ে চলেছে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে। স্কাউটদের দিকে তাকিয়ে উৎসাহের সঙ্গে সে টুপি নাড়তে লাগল।

ভীইয়ারকে যে আবার বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনল সে হচ্ছে র‍্যাডিকাল ডেপুটি পিরু। পিরু যেন কেন এই মিছিলে এসেছে কেউ বলতে পারবে না। সকলে বেশ ভালোভাবেই জানে যে পপুলার ফ্রন্টকে সে ঘৃণা করে। হয়তো সে এসেছে হিসেব নেবার জন্যে কোন্ মন্ত্রী কতটা জনপ্রিয়। নির্বাক মূর্তির মত সে দাঁড়িয়ে, গলা মিলিয়ে গান গাইছে না বা অভিনন্দনের জবাবে কোনো সাড়া দিচ্ছে না। পিরেনেজ-ওরিআঁতাল অঞ্চল থেকে নির্বাচিত, সেখান থেকে এইমাত্র সে পারী পৌঁচেছে। ভীইয়ারকে পাশে দেখতে পেয়ে সে কাজের কথা পাড়ল।

'প্রিফেক্টের কাছে আমি শুনেছি, কোন কোন অঞ্চলে ওদের এত বাড় বেড়েছে যে জোর করে জমি দখল করতেও বাধেনি। স্প্যানিয়ার্ডদের দেখাদেখি ওরা এই সব করছে। আর সব জায়গাতেই পালের গোদা হচ্ছে এই বিদেশীগুলো। আমাদের ওখানে অনেক ক্যাটালোনিয়ান মজুর আছে। আগে ওদের শেখানো হত যে দেশের রাজনৈতিক জীবনে মাথা গলাবার কোনো অধিকার বিদেশীদের নেই। কিন্তু কমিউনিস্টরা যেদিন থেকে এই লোকগুলোকে নিয়ে সংগঠন গড়তে শুরু করেছে সেদিন থেকে সব পাল্‌টে গেছে। সাংঘাতিক অবস্থা...', ভীইয়ার জানে যে পিরু তেসার বন্ধু আর এজন্যেই সে পিরুকে রীতিমতো খাতির করে চলে।

সে বলল, 'আমি আজই দরময়ের সঙ্গে কথা বলব। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিদেশীদের মাথা গলানো চলবে না, এ তো অতি খাঁটি কথা। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি চলতি রেওয়াজের নড়চড় হবে না। আমাদের ওপর একটু বিশ্বাস রাখুন, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে...'

ধন্যবাদ জানিয়ে পিরু চলে গেল। একজন কমিউনিস্টকে চুপি চুপি ভীইয়ার বলল, 'এই তেসার দলকে যদি না থামাতে পার তো আমরা সাবাড় হয়ে যাব।'

ভীইয়ার মনে করে যে এইভাবে কথা বলতে পারাটাই খাঁটি রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় আর এইভাবে চাল দিতে পারলেই তার জয়ের পথ সুনিশ্চিত।

ছোট শহর লাঁ-র প্রতিনিধিরা এই সময় প্ল্যাটফর্মের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, পরনে ভেলভেটের জ্যাকেট, নিচের ঠোঁটে একটা সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। ছুটির পোশাকে চারজন তরুণ শ্রমিক আছে এই দলে। তাদের সঙ্গে যে ঝাণ্ডা রয়েছে তার গায়ে লেখা—'লাঁ-র অধিবাসীরা ফ্যাসিস্টদের রুখবেই!

ভীইয়ার ভাবে, হয়ত লাঁ-তে সবশুদ্ধ তিনশো শ্রমিক আছে, তার বেশি নয়...... তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বলে। 'ছেলেমানুষ!'

উত্তেজিত ও উৎফুল্ল পিয়ের ছুটে এসে নিজের লাইনে দাঁড়াল। ভীইয়ারের সঙ্গে তার কথাবার্তার কথা কাউকে বলে না। তার ভয় ছিল, কথাটা শুনলে মিশো এমন ঠাট্টা-তামাসা শুরু করবে যে সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

সকালবেলার হাতাহাতি, নিজের কোটের দফারফা—এসব কথা মিশো বহুক্ষণ আগেই ভুলে গেছে। তার পিঠটা জ্বালা করছিল কিন্তু তবুও তার আনন্দ কমেনি। মিছিল আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। শহরতলীর তোরণের কাছাকাছি আসবার পরেই হঠাৎ সে চুপ করে গেল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। রাস্তার সংকেত, পেট্রলের মাপ, দোকানের সাইনবোর্ড, সবুজ, হলদে, লাল—নানান আলোয় শহরের বাইরে প্রকাণ্ড একটা ফুলের বাগান যেন।

'ব্যাপার কি, মিশো? খারাপ লাগছে?'

'না। গরম লাগছে!'

জামার আস্তিন দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে হঠাৎ সে বলে, 'আমি এখন ব্লাঁকি-র জীবনী পড়ছি। জান, বইটা পড়ে আমার কি রকম একটু হিংসে হচ্ছে। একটা চমৎকার জীবন, আর সব চেয়ে বড়ো কথা, সে জীবনে কোনো জটিলতা নেই। কয়েকটি দিনের ব্যারিকেড, তারপর সারা জীবন কারাবাস। এমন কি তারাভরা আকাশের কথাও সে লিখে গেছে। সেকালে মরতে পারাটাই একমাত্র কাজ ছিল। কিন্তু এখন তোমাকে বাঁচতে হবে—যাই ঘটুক না কেন। কাজটা অনেক বেশি শক্ত, কিন্তু না করে উপায় নেই।'

অবাক হয়ে মিশোর কথা শোনে পিয়ের। হঠাৎ পিয়ের বুঝতে পারে, মিশোর চিন্তাধারা জটিল হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনের মূল নীতিগুলো একটা আবেগপ্রবণ প্রকৃতি ও গভীর দুঃখবোধকে লুকিয়ে রেখেছে। যেমন রাখে পশুর গায়ে লোম বা মাটির ওপরকার ঘাস। আর পশুর লোমের মতো বা ঝড়ের ঝাপ্টা লাগা ঘাসের মতো তার জীবনের এদিকটাও মুগ্ধ ও সংবেদনশীল।

পিয়ের বলে, 'তুমি অনেক ওপরে উঠে গেছ মিশো। তোমাকে আমি একজন কমরেড ছাড়া কিছু ভাবতাম না। কিন্তু এখন...এখন দেখছি তুমি নেতৃত্ব করতে পার।'

ছেলেমানুষের মতো মুখভঙ্গি করে মিশো, তারপর সুরেলা পাখির মতো শিস দিয়ে ওঠে। চমৎকার শিস দিতে পারে সে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মিছিল। আর একটানা শোনা যেতে থাকে: 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ...'

চব্বিশ

পরদিন সকালে এক মাসের ছুটি নিয়ে পিয়ের বাইরে চলে গেল। ছুটির কথা ভাবলেই পিয়েরের চোখের সামনে সব সময়ে নীল আর সোনালী একটা ছোপ ফুটে ওঠে—ভ্রমণ-কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের মতো।

এক সপ্তাহ আগে চলে গেছে আনে। ক'সারনোর কাছে পাহাড়ের ওপর একটা

জেলেকুটির ভাড়া নিয়েছে। বাড়িটা দেখতে ছোট সাদা বাক্সের মতো। সেখান থেকে নিচের দিকে তাকালে দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা বসে বসে নীল জাল সারাচ্ছে আর লাল রঙের পালগুলো বাতাসে ফুলে ফুলে উঠেছে। একদিকে ফাঁকা সমুদ্র। সব সময়ে জোরে বাতাস বইছে, উঁচু উঁচু ঢেউ উঠছে আর আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র অবিশ্রান্ত গর্জন করছে।

ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল পিয়ের। চুনকাম করা ঝকঝকে ঘর, দেওয়ালে অনেকগুলো তৈল-চিত্র। আর সবকিছুতে মাছের গন্ধ—বিছানার চাদরে, পরদায়, এমন কি দেওয়ালে পর্যন্ত।

পারীর খবরে চনমন করতে করতে পিয়ের এসেছে। ভীইয়ারের সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছিল তা গর্বের সঙ্গে বলে আনেকে, খুঁটিয়ে মিছিলের বর্ণনা দেয়, আর ফ্যাশিস্টদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু আনেকে কোনো সাড়াশব্দ করতে না দেখে চটে ওঠে। সে যে-আদর্শে বিশ্বাস করে সে-আদর্শের যাথার্থ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সে কি কোনোদিন ওকে সচেতন করে তুলতে পারবে না? এই কথাই ভাবে মনে মনে।

সে বলল, 'জীবনের আদর্শ আছে বলেই বেঁচে থাকার সার্থকতা। একথা কি তুমি বোঝো না?'

'না। আর বুঝতেও চাই না। এটা একটা খেলা আর খুবই খারাপ খেলা। সমস্ত ব্যাপারটার ভণ্ডামি আমি বেশ বুঝতে পারি। কেউ কোনো স্বার্থ ছাড়তে রাজি নয়। ভীইয়ার?......অন্য সবার মতোই ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এটা কি তুমি দেখতে পাও না যে সব মানুষই শেষ পর্যন্ত সেই এক রকমই থেকে যাচ্ছে?'

'আমরা ওদের নতুনভাবে গড়ে তুলব।'

'না, তা পারবে না। তোমরা উলটো জিনিসটা করছ। খুশিমতো রঙ চড়াচ্ছ ওদের গায়ে। ও কাজটা সহজ, কিন্তু বলো তো কী বিশ্রী! শুধু তাই নয়, অসাধুও বটে!'

পিয়ের এসে পৌঁছবার প্রথম দিনেই ওরা এইভাবে তর্ক করে। তারপর পিয়ের নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দেয় ছুটির উপভোগের মধ্যে। তিন দিন সে কিছু করে না বা কিছু ভাবে না। প্রাণভরে স্নান করে। আর শুয়ে থাকে বালির ওপর। পাহাড় বেয়ে বেয়ে চুড়োয় ওঠে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে তীরের ওপর আছড়ে পড়া জোয়ারের বাড়ন্ত ঢেউয়ের দিকে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে অনেকবার সে গিয়েছে, সেখানকার মৃদু অলস সৌন্দর্যের সঙ্গে সে পরিচিত। কিন্তু আটলাণ্টিক তাকে মুগ্ধ করে। গোড়ায় মনে হয়েছিল, চারদিকে অসহ্য রকমের চাঞ্চল্য, যেন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় প্রকৃতি প্রহর গুণছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে শুরু করে যে এই অবিরাম গর্জনের সঙ্গে তার মানসিক অবস্থার মিল আছে। এখানে বাতাসের এত জোর যে দরজা খোলা অসম্ভব, মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়, নিচু নিচু শক্ত গাছগুলোকে দুমড়ে ফেলে। এই বাতাস তার ভাল লাগছে।

তিন দিন কাটল এইভাবে। পিয়েরের মুখ রোদে পুড়ল। তার সমস্ত ভেতরটা যেন বিশুদ্ধ হাওয়ায় পরিষ্কার হয়ে গেল। পারীতে থাকবার সময় যে-সব জিনিস জরুরি মনে হত—এখন সেগুলোর কথা মনে হলে ঠোঁটে একটু হাসি খেলে যাচ্ছে মাত্র। অন্যদিকে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে নতুন এক জগৎ: সার্ডিন মাছের অদ্ভুত জীবন এবং সমুদ্রে চলাফেরা করার ব্যাপারে তাদের ভীষণ রকমের কড়াকড়ি, সামুদ্রিক লতার

গন্ধ, রাত্রির আকাশে গোছা গোছা তারা।

খবরের কাগজ এত দেরিতে পেঁাছয় যে ততোক্ষণে সব খবরই প্রায় পচে যায়। একটা পোর্টেব্‌ল্‌ রেডিও সঙ্গে এনেছিল পিয়ের। একদিন সে খবর শোনার জন্যে রেডিওটা খুলে বসল। স্টক এক্‌স্‌চেঞ্জের দর, চীন-জাপানের খটাখটি, ব্যবসাদারদের ভোজসভায় তেসার বক্তৃতা—এই পর্যন্ত শুনে বিরক্ত হয়ে পিয়ের বাইরে চলে গেল কাঁকড়া ধরতে।

আনের খুশি আর ধরে না। এবার সে পুরোপুরি সুখী হবে। পারীতে থাকবার সময় পিয়ের সম্পর্কে তার মনে একটা অস্বস্তি ছিল এবং দৈনন্দিন খবরাখবর সম্পর্কে পিয়েরের আগ্রহ দেখে অর মনে হিংসে হত। যে পরিবারে তার জন্ম আর যে কষ্টের জীবনে সে অভ্যস্ত, তা এত গভীরভাবে বেলভিলের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে রোজকার ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহশীল হওয়ার দিকে ঝোঁক থাকা তার পক্ষেও অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ভাসাভাসা তত্ত্বমূলক কথাবার্তা, রাজনৈতিক দলাদলি আর খবরের কাগজের ভাষা ও সভাসমিতির বক্তৃতা তার একেবারে বরদাস্ত হয় না। এই সমস্ত কিছুকে সে 'রাজনীতি' নাম দিয়ে এককথায় বাতিল করে দেয়। একটিমাত্র বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে আর তা হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষের ভাগ্য। এজন্যেই যদিও গত ধর্মঘট সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না কিন্তু পিয়েরের কাছে যখন ক্ল্যামাসের কথা শোনে তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল পাছে পিয়ের তার চোখের জল দেখতে পায়। পপুলার ফ্রন্ট সম্পর্কে পিয়েরের উদ্দীপনা তার কাছে মনে হয় যেন একই বিন্দুর চারপাশে ঘূর্ণি-ঝড়ের মতো ঘোরা। মনে মনে সে বলে, এর জন্যে মানুষ প্রাণ দেয় না! অবশ্য এই মনোভাবের পেছনে তার অবচেতন মনের আত্মাভিমানও কিছুটা আছে। জীবনে এই প্রথম সে শান্তি ও স্বস্তির আস্বাদ পাচ্ছে আর তার মনে সব সময়েই এই ভয় যে হঠাৎ এর শেষ হতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা হবার পর যখন দুটি জীবনের দায়িত্ব এসেছে তার ওপর তখন এই মনোভাব আরো বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। আর আজ পিয়ের রেডিও না শুনে উঠে গেল—এই ঘটনার মধ্যে মুক্তির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে সে।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় ঝড় উঠল। পিয়ের ও আনে বসে ছিল সমুদ্রের ধারে বালির ওপর, হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় একরাশ বালি ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে গেল। চোখ কুঁচকে রইল আনে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল চারিদিকে তাণ্ডব নৃত্য। প্রচণ্ড ঢেউয়ে নৌকোগুলো আছড়ে পড়ছে তীরের ওপর। গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে বাতাস ছুটছে ঘরবাড়ি পেরিয়ে। পিয়ের ও আনে পড়িমরি করে বাড়ি ফিরে এল।

জানলার পাশে আনে বসল সেলাই নিয়ে। অন্ধকার হয়ে আসছে, তবুও আলো জ্বালে না। প্রচণ্ড আক্রোশে ফুলে ফুলে ওঠা গাঢ় বেগুনী সমুদ্র অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। এই রুদ্রতাণ্ডবের মাঝখানে ওরা যেন একটা আশ্রয়ের আড়াল পেয়েছে। অত্যন্ত তীব্র-ভাবে ওরা অনুভব করছে প্রেমের উত্তাপ ও সজীবতা।

অলস ভঙ্গীতে বেতার যন্ত্রটার সুইচ ঘুরিয়ে দিল পিয়ের। সবুজ আলোটা জ্বলে ওঠে আর মর্সের তীক্ষ্ন কর্কশ পরিচিত শব্দটা মিশে যায় সমুদ্রগর্জনের সঙ্গে।

একটি ইংরেজি ঘোষণা : 'সাধারণভাবে বলা চলে স্টক এক্‌স্‌চেঞ্জের দর ওপরের দিকে উঠছে। আজ 'রয়েল ডাচ' আরো দু পয়েন্ট বেশি...'

নাচের বাজনা।

একটি জার্মান গান : 'প্রিয়তমা হে সুন্দরী...'

'পারী ইল্‌ দ্য ফ্রাঁস বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। এবার মোরিস শেভালিএ গান

গাইবেন—পারী আজো সেই পারী...'

'ল্যক্‌স্‌ ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার কিনুন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 'ল্যক্‌স্‌' কোম্পানী আজ বেতার-শ্রোতাদের কাছে একটি নাটক উপস্থিত করছেন—একটি অদৃশ্য ধূলিকণা।'

ইতালী। ফ্যাশিস্ট পার্টির সেক্রেটারির বক্তৃতা : 'তরুণ সৈনিকদের আমরা এমন-ভাবে তালিম দিচ্ছি যেন তারা সত্যিকারের সাহসী হয়'...আবার নাচের বাজনা।

সাইকেল প্রতিযোগিতা : 'পো কারকাসন্‌ মাঠে বেলজিয়ান গ্রেনেট যে দুরন্ত অতিক্রম...'

'সময়-সংকেত শুনুন! ঠিক চতুর্থ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে গ্রিন্‌উইচ সময়ের সন্ধ্যা সাতটা হবে। আজকের খবর...'

'দুই হাজার নিহত...'

সেলাই করতে করতে আনে থেমে গেল। বেতার যন্ত্রটাকে এমনভাবে চেপে ধরল পিয়ের যেন তার টুঁটি টিপে ধরেছে।

কিন্তু ঘোষণাকারী শান্তভাবে বলে চলেছে : 'বার্সেলোনায় কলম্বাস হোটেলের ওপর কামানের গোলা ছোঁড়া হয়েছে। মাদ্রিদে সরকারপক্ষীয় বাহিনী শ্রমিকদের সহ-যোগিতায় বিদ্রোহীদের লা মন্‌তানা ব্যারাক থেকে বিতাড়িত করেছে। সেভিল-এর শ্রমিক অঞ্চল ত্রিয়ানা অধিকার করবার জন্যে তুমুল যুদ্ধ চলেছে। জেনারেল আরান্দা অভিএদো অধিকার করেছেন। বার্জেস-এ ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে...'

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল পিয়ের। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি। সারবাঁধা সৈন্যের মতো ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে আর সেই মস্ত মস্ত ঢেউয়ের মাথায় লাইট হাউসের আলো কাঁপছে। লাল লাল আলো, জোরালো সাইরেনের মতো গর্জন করছে সমুদ্র। ঘরে ফিরে এল পিয়ের, জলের ছাঁট লেগে মুখটা ভিজে গেছে। আনে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে, শান্ত স্বরে বলল :

'আমি ট্রেনের সময় দেখে রেখেছি। সকাল ছটায় একটা ট্রেন আছে, সন্ধ্যের সময় পারী পৌঁছবে।'

অন্ধকারে আনে পিয়েরকে চুমু খেল আর তারপর দুজনে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল ভোর পর্যন্ত। বাইরে সারা রাত ধরে ঝড়ের মাতামাতি চলে, থামবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

পঁচিশ

হলের ভেতরে ঢুকতে না পেরে হাজার হাজার লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পিরেনিজ-এর অপর দিকে যে গোলাগুলি চলেছে তা জাগিয়ে তুলেছে পারীকে। উত্তেজিত জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আনাচে কানাচে, গ্যালারি ধরে ঝুলছে, মঞ্চের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বাদ্যাইয়োজ-এ গুলি চালাবার কথা বলতে গিয়ে কাশ্যাঁ-র গলা কাঁপে। 'ইণ্টারন্যাশনাল' গান ভেসে আসে বাইরে রাস্তা থেকে। সে-গান কখনো শপথ উচ্চারণের মতো গম্ভীর, কখনো দ্রুত ও উদ্দীপ্ত।

একজন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল মঞ্চের ওপর। শুকনো মুখ, পরিষ্কার দাড়িগোঁফ

কামানো, কপালে গভীর খাঁজ যা স্প্যানিশ মুখগুলোতে সাধারণত একটা বিষণ্ণতার ছাপ এনে দেয়। লোকটির নাম মুনে, কর্মজীবনে শিক্ষক, মাদ্রিদ ইউনিয়নগুলোর নেতা। শ্রোতারা নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তৃতা এবার শুরু হবে। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মুনে, ব্যথায় আধখোলা ঠোঁটে কথা ফুটল না। মঞ্চের ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল :

'ওর ছেলেকে ওরা খুন করেছে......'

তখন স্প্যানিয়ার্ডটি চিৎকার করে ওঠে, 'অস্ত্র চাই।'

সমস্ত হল প্রতিধ্বনি তোলে, 'অস্ত্র চাই!' রাস্তা থেকে জবাব ভেসে আসে, 'অস্ত্র চাই! অস্ত্র চাই!'

তারপর বক্তৃতা দিলেন একজন অধ্যাপক। একজন র্যাডিকাল হিসেবে তিনি পরিচিত, খামখেয়ালী প্রকৃতি, সারা জীবন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছেন ওড্-এর মদ্য-উৎপাদকদের তৈরি মদের নাম 'শ্যাম্পেন' রাখার সংগ্রামকে, দ্রেফুসকে, ইংরেজ ভোটাধিকার আন্দোলনকারীদের আর আবিসিনিয়ার রাজাকে। বক্তৃতায় তিনি 'নির্ভীক নিশঙ্ক যোদ্ধা'র কথা বলে স্প্যানিয়ার্ডদের নৈতিক সমর্থন জানালেন।

সবশেষে উঠল মিশো, বলল, 'ফ্রাঙ্কোকে মুসোলিনি যে সব ইতালীয় বোমারু পাঠাচ্ছে, তার একটা ফ্রান্সের জমিতে নেমেছে। আমরা জানতে পেরেছি যে ইতালীয় সাতান্ন আটান্ন নম্বরের সেনাদল আর হিটলারের 'জাংকার' বিমান-বাহিনী বিদ্রোহীদের সাহায্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের কমরেডদের টোটা-বন্দুক ছাড়া কিছু নেই। পপুলার ফ্রণ্ট সরকারের কাছে আমরা দাবি তুলব—স্পেনের জন্যে বিমান!'

হলের ভেতর আবার মিলিত ধ্বনি ওঠে, 'স্পেনের জন্যে বিমান!' 'স্পেনের জন্যে বিমান!' কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ে ভাগ্রাম বুলভারে, প্লাস দ্য লে-তোয়াল-এ, পথে-ঘাটে-মাঠে। সেই বিরাট জনসমুদ্র এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হতেই কে যেন সরু কর্কশ গলায় আবার শুরু করে, 'স্পেনের জন্যে...' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাগরিক কোলাহলকে ডুবিয়ে দিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে আর একবার ফেটে পড়ে কথাগুলো। লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত সেই শব্দ আছড়ে পড়ে মেট্রোর সুড়ঙ্গ ও বাড়ির দেওয়ালে, জাগিয়ে তোলে ঘুমন্ত শহরতলীকে।

সভার শেষে মিশো পিয়েরকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল :

'বিশেষ করে বিমান সংগ্রহের চেষ্টায় মুনে এখানে এসেছে। একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে এবিষয়ে তোমার যথেষ্ট সাহায্য করতে পারা উচিত।'

মুনে প্যারীতে এসেছে কুড়িটা বোমারু কিনবার জন্যে। তিনটে দিন সে কাটিয়েছে সরকারী আপিসে আপিসে ঘুরে। সব জায়গাতেই তার সঙ্গে ব্যবহার সদয় কিন্তু সবার মুখেই এক কথা—'বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।' শিল্পপতি মিয়েজারের সঙ্গেও দেখা করেছে। মিয়েজার তার বক্তব্য শুনেছে মন দিয়ে, তারপর তার সামনে সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে মৃদু হেসে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছে, 'যতো তাড়াতাড়ি ফ্রাঙ্কো জিতবে ততোই মঙ্গল।'

মিশো বলল, 'দেসেরের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখ। ব্যবসায়ের দিক থেকে প্রস্তাবটা লাভজনক, হয়ত সে রাজি হতে পারে।'

পিয়েরের সঙ্গে বাইরে আসবার সময় মুনে তার কাছে স্পেনের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

'শুধু রিভলবার, টোটা-বন্দুক আর ছুরি নিয়ে আমরা যুদ্ধ করছি। ব্যাপারটা রীতিমতো আহাম্মুকি। আর ভয়ংকরও বটে। চাষীদের হাতে অস্ত্র বলতে আছে মান্ধাতা আমলের ছোট ছোট কামান। দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে—ওরা চারদিক থেকে বেগে এগিয়ে আসছে। ওদের হাতে অনেক 'সাভোয়া' আর 'জাংকার'। আর আমাদের সম্বল মাত্র দশটা যাতায়াতী বিমান। বোমা ফেলবার জন্যে বিমানগুলোর তলায় ফুটো করে নিতে হয়েছে। ফেলে-দেওয়া ছেঁড়া জুতো দিয়েও ওর চেয়ে বেশি কাজ হয়! ওগুলোকে মাটিতে ফেলতে হলে গুলির দরকার নেই, ইঁট ছোঁড়াই যথেষ্ট। এখানে এসে আমি সবাইকে বলেছি—যদি আমরা হারি তাহলে তোমা-দেরও রক্ষে নেই, কিন্তু কেউ আমার কথা বোঝেনি।'

চারদিকে তখনো চিৎকার উঠছে—'স্পেনের জন্যে বিমান!'

মুনে হাসল, 'ব্যাপারটা যদি এদের হাতে থাকত তবে বিমান পেতে কোন অসুবিধে হত না।'

পরদিন সকালে পিয়ের গেল দেসেরের সঙ্গে দেখা করতে। দেসের তার সঙ্গে দেখা করতে দেরি করল না। সোজাসুজি কথা আরম্ভ করল পিয়ের।

'যখন ধর্মঘট চলছিল, আমরা দুজনে ব্যারিকেডের দু-দিকে ছিলাম। কিন্তু আজ আমি যে-জন্যে এসেছি সেটা কারখানা সংক্রান্ত কিছু নয়। স্পেনের সরকারী কর্তৃত্ব তো আর কমিউনিস্টরা করছে না, করছে জিরল বা আজানার মতো লোকেরা, মতামতের দিক থেকে যারা আপনারই দলের লোক। বোমারু বিমান ওদের দরকার। আপনার কাছে ওরা কুড়িটা 'এ ৬৮' বিমান নগদ দামে কিনতে চায়।'

দেসের হাসল, "নগদ দাম' ব্যাপারটা খুবই ভালো। তোমার ধারণা বোধ হয় এই যে, দেসেরকে টাকার লোভ দেখিয়ে হাত করা যায়। হ্যাঁ ভালো কথা, মিয়েজারের কাছে শুনলাম, স্প্যানিয়ার্ডরা কাল ওর কাছে গিয়েছিল। ও বেশ গর্বের সঙ্গে আমাকে বলল —'আমি ওদের সোজা পথ দেখিয়ে দিলাম। নিজের শ্রেণীর প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না।' এ-কথা শুনে তুমি প্রতিবাদ করবে না নিশ্চয়ই—কারণ ওর যুক্তিটা তোমাদের মতোই মার্কস্‌বাদী।'

'আমি মিয়েজার-এর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। মিয়েজার তো ফ্যাশিস্ট। কিন্তু আপনি...'

'আমি সবার আগে ফরাসী, তারপর অন্য কিছু। স্পেনের চেয়েও শান্তি রক্ষার কাজটা আমার কাছে বেশি মূল্যবান।'

'প্রতিবেশী সরকারের কাছে আপনি যদি বিমান বিক্রি করেন তো কে বাধা দিতে পারে?'

'ইচ্ছে করে অবুঝের মতো কথা বোলো না! যদি আমি ওদের কাছে কুড়িটা 'এ ৬৮' বিক্রি করি, ইতালীয়রা এক সপ্তাহের মধ্যে আরো চল্লিশটা 'সাভোয়া' পাঠাবে। এইভাবে ব্যাপারটা বহুদূর পর্যন্ত গড়াবে...অবশ্য জেনারেল ফ্রাঙ্কোর চেয়ে আজানাকে আমি বেশি পছন্দ করি। স্প্যানিয়ার্ডদের সাহায্যের জন্যে আমি তোমাকে একলক্ষ ফ্রাঁ দেব; শুধু আমার অনুরোধ, এই টাকা যে আমার কাছে থেকে তুমি পেয়েছ তা কাউকে বোলো না। কিন্তু কোনো বিমান আমি বিক্রি করব না। ফ্রান্সের শান্তিভঙ্গ হতে পারে এমন কোন ঝুঁকি আমি নিতে রাজি নই। কথায় বলে, অপরের গায়ের কামিজের চেয়ে নিজের গায়ের চামড়ার কদর বেশি।'

'তাহলে, ওরা তলিয়ে যাবে আর তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে আমাদের? এ হচ্ছে চরম নীচতা। মিয়েজারকে আমি বুঝতে পারি, কিন্তু আপনি! ...সেদিন সন্ধ্যেবেলা যে-সব কথা বলেছিলেন মনে আছে?' মুনেকে আমি কি করে বলি যে আপনি বিমান বিক্রি করতে রাজি হননি?'

চেঁচিয়ে মেচিয়ে টেবিলে ঘুসি মেরে পিয়ের ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগল। ক্লান্ত আর সংশয়ী চোখ তুলে দেসের তাকিয়ে থাকে। পিয়েরকে ভালো লাগে তার। পিয়ের প্রায় চলে যাচ্ছে এমন সময় দেসের তাকে আবার থামিয়ে বলল :

'শোন, এগারটা 'এ ৬৮' আর্জেন্টাইনের অর্ডার আছে। মানু নামে একজন লোকের সেগুলো নেবার কথা। ওর কাছ থেকে বিমানগুলো কিনে নাও, ও নিশ্চয়ই রাজি হবে। দেখতেই পাচ্ছ, এই কেনাবেচার ফলে আমি নিজে এক পয়সাও পাচ্ছি না। যদি তুমি মনে কর যে স্প্যানিয়ার্ডরা এতে রক্ষে পাবে, ভালো কথা। আমি কথা দিচ্ছি যে মানু রাজি হবে। আর এই রকম যোগাযোগের ফলে মাল নেবার সময় বিশেষ কিছু গোলমালও হবে না। একথা কেন বলছি জান, আমার নিশ্চিত ধারণা ব্লুম যদি জানতে পারে একটি বিমানও বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না।'

'অসম্ভব! তাই যদি হয় তো আমি ভীইয়ারের সঙ্গে দেখা করবো।'

'ঠিক এই মুহূর্তে ভীইয়ারের জায়গায় নিজেকে দেখলে আমি খুশি হব না। তোমাদের মত কল্পনাবিলাসীদের নিয়ে যে কি হবে! এই নাও মানুর লাইসেন্স। এখন তুমি খুশি তো?'

দেসেরের কাছ থেকে কোনো রকমে বিদায় নিয়ে পিয়ের তক্ষুনি ছুটল মানুর সঙ্গে দেখা করতে।

পাশপোর্ট অনুসারে মানু হনডুরাসবাসী রুমানিয়ান। বহুকাল থেকে সে পারীতে বসবাস করছে এবং নিজেকে সে ফরাসী বলেই মনে করে। নানা ধরনের সন্দেহজনক লেনদেনে সে লিপ্ত এবং এখন সে তো আশার ফানুসে চড়ে বেড়াচ্ছে। যেখানে যতো দালাল, এজেন্ট আর জুয়াড়ী আছে, তাদের সকলের কাছেই স্পেনের ব্যাপারটা একটা মস্ত বড় দাঁও মারবার সুযোগ। মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা থেকে রোজ দলের পর দল প্রতিনিধি আসছে নগদ দামে যুদ্ধোপকরণ কিনবার উদ্দেশ্যে। এই সব দলে আছে বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তর ও ট্রেড ইউনিয়নের মুখপাত্র, ফৌজী লোক, সাংবাদিক-রিপাব্লিকান, কমিউনিস্ট, অ্যানার্কিস্ট। এই সব প্রতিনিধিদলের মধ্যে প্রায়ই কোনো যোগাযোগ বা পরিচয় থাকে না, এবং মাঝে মাঝে এমন হয় যে বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে একই লোকের কাছে দরবার করতে ছোটে। তার ফল হয় এই যে প্রত্যেকেই এদের কাছ থেকে শেষ কপর্দক পর্যন্ত নিঃশেষ করে নেয়। বার্জোসের মুখপাত্ররাও চুপ করে নেই—তারাও ঘুরছে অস্ত্রের সন্ধানে। দালালরা দিনের পর দিন দর বাড়িয়ে চলেছে।

'এ ৬৮'-এর ব্যাপারটা শুনে তিনগুণ দর হাঁকল মানু। বলল, 'এর ফলে বুয়েনেস এয়ারেস-এ একটা কিছু অপ্রিয় ব্যাপারও ঘটে যেতে পারে। তা ছাড়া আমার সঙ্গে কেনাবেচা করবার সুবিধে এই যে মাল নেবার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হবে না, কারণ আমার কাছে লাইসেন্স আছে।'

'আরে না, না। লাইসেন্স আমি নিজেই নিয়ে এসেছি।'

মানু ভেবে দেখল, যার সঙ্গে সে কথা বলছে সে স্প্যানিয়ার্ড নয় যে বড়ো বড়ো চাল মারা চলবে। লোকটি একজন বিশেষজ্ঞ, 'সিয়েন' কারখানার ইঞ্জিনিয়ার, আর কেনা-

বেচার ব্যাপারে দেসের ওকে বন্ধুর মতো সাহায্য করছে। এর মতো লোক তার সাহায্য না নিয়েই বিমান সংগ্রহ করতে পারে। হ্যাঁ, হয়তো পারে, কিন্তু তবুও তো তার কাছেই আসতে হয়েছে! এই সব ভেবে মানু বলল যে আগামীকাল সে পিয়েরকে ঠিক দর বলবে।

'আগামীকাল' শুনে মুনে মুষড়ে পড়ে। প্রায় এক সপ্তাহ পার হতে চলেছে!... তার ধারণা যে মাদ্রিদ এবং রিপাব্লিকের ভাগ্য নির্ভর করছে এই বিমান পাওয়া না-পাওয়ার ওপর। রোজ একই কাগজ বারবার কিনে পড়ে, রেডিওর খবর শোনে, আর পিয়েরের সঙ্গে দেখা হলেই উত্তেজিতভাবে বলে :

'আল্টো দ্য লিয়'...দুটো সাঁজোয়া গাড়ি—ইরানে ওরা মার খেয়ে পালিয়ে গেছে .. ...সব চেয়ে বড়ো বিপদ এসত্রামাদুরা...মেদিনার দিকে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে...মেদিনা...... মেদ্দিনা......'

সে বুঝতে পারে না, এই অবস্থার মধ্যেও আশেপাশের লোকেরা কি করে ঠাট্টা-তামাসা ও খাওয়া-দাওয়া করে, ফুরফুর করে ঘুরে বেড়ায়, সিনেমা-থিয়েটারে যায়। এই নির্লিপ্ততা দেখে পারীর ওপর চটে উঠেছে সে। আর পিয়ের না থাকলে ফরাসীদের সে ঘৃণা না করে পারত না। কিন্তু পিয়েরের অবস্থাও তার মতোই। তার মতোই সান্ধ্য কাগজের এক সংস্করণ থেকে সংস্করণের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। তৃতীয় দিনের দিন মানুর সুর নরম হল এবং মুল দরের ওপর শতকরা কুড়ি ভাগ বাড়িয়ে বিমান-গুলো বিক্রি করতে রাজি হল। বোমারুগুলো ছিল তুলুজের কাছাকাছি একটা বিমান-ঘাঁটিতে। বিমান কেনার খবর মুনে মাদ্রিদে পাঠাল সাংকেতিক ভাষায়। সেদিন সন্ধ্যায় সে পিয়েরের সঙ্গে তুলুজ রওনা হবার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিদেশী দূতের মারফৎ একটা তার এসে উপস্থিত : বোমারু বিমানের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। অন্তত আরো কুড়িটা বোমারু বিমান এবং ত্রিশটা 'দওয়াতিন' ধরনের ফাইটার চাই। ফরাসী সরকারের সাহায্য না নিয়ে এত প্রচুর সংখ্যক বিমান সংগ্রহ অসম্ভব—বিমান কারখানা-গুলোর মালিক হয় দেসের কিংবা ফ্যাশিস্টরা। পিয়েরের ইচ্ছে ছিল, ভাঁইয়ারের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে পারীতে থেকে যায় কিন্তু মুনের দুর্ভাবনা ও ভয় হয়েছিল যে এই এগারটা 'এ ৬৮'ও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, পিয়ের তুলুজ রওনা হবে আর মুনে একাই দেখা করবে ভাঁইয়ারের সঙ্গে।

মুনে বলল, 'আমি ওকে চিনি। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।'

স্টেশনে এসে পিয়ের আনেকে একটা পোস্টকার্ড লেখে : 'এক সপ্তাহের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।' তারপর যাত্রীতে ঠাসা একটা ট্রেনে উঠে বসে। আগস্ট মাসের গুমোট আবহাওয়া, যারা এতদিন পারীতে ছিল তারাও এবার চলেছে সমুদ্র বা পাহাড়ের দিকে। আশেপাশে যা কিছু কথাবার্তা সবই স্নান ভ্রমণ আর নৌকাবিহার সম্পর্কে। তার মধ্যে নিজেকে বিদেশী বলে মনে হতে থাকে পিয়েরের। খবরের কাগজটা খুলে পড়বার আগে মুনের মত সেও বারবার নিজের মনে বলে, 'মেদিনা! মেদিনা!' একবার যদি সে তুলুজে পৌঁছতে পারে! খুব তাড়াতাড়ি তুলুজে পৌঁছে যাক, এ ছাড়া এখন আর কিছু চায় না সে। তার ইচ্ছে হচ্ছে, ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পেছন থেকে জোরে ধাক্কা দেয় ট্রেন-টাকে; আর এই স্টেশনে স্টেশনে থামা অসহ্য। হঠাৎ ভাঁইয়ারের সদয় ও আন্তরিক মুখের ছবিটা ভেসে ওঠে পিয়েরের মনে। মনে পড়ে, আন্তর্জাতিক সংহতিবোধ সম্পর্কে ভাঁইয়ার কি বলেছিল। ট্রেনের কামরায় ধোঁয়া আর ভিড়, পিরেনে পাহাড়ের চুড়োয়

বিলাসভ্রমণ ও স্নানের গল্প—তারই মধ্যে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে পিয়েরের মনে একটা অস্পষ্ট চিন্তা আসে; 'ভীইয়ারের কাছে সব পাওয়া যাবে। ভীইয়ার কখনো স্প্যানিয়ার্ডদের ত্যাগ করবে না।' ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ছাব্বিশ

ভীইয়ারের সঙ্গে দেখা করতে এসে দূর অতীতের অনেক কথা মনে পড়েছে মুনের। বাল্‌ কংগ্রেস, গির্জায় বৃদ্ধ বেবেলের বক্তৃতা, মেয়ে-ভর্তি গাড়ি, অনেক রূপক, অনেক প্রতিজ্ঞা, অনেক অশ্রু। তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে—ব্যার্ন-এ তার সঙ্গে ভীইয়ারের দেখা হয়েছিল। তারা দুজনে চেষ্টা করেছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে জোড়াতালি লাগাতে, যেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক একটা চীনেমাটির বাসন। যুদ্ধের দায়িত্ব, ক্ষতিপূরণ এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির ওপর তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়েছিল সেখানে। তারপর ষোল বছর পার হয়েছে...ষোল বছর আগে ভীইয়ারের চুল ছিল কালো, গলার স্বর ছিল উদাত্ত। বুড়ো হয়ে গেছে ভীইয়ার। মুনেও হয়েছে—

ভীইয়ারেরও অনেক কথা মনে পড়ছে। একটা অর্ধ-বিস্মৃতির ভেতর থেকে যৌবনের অনেক রূপরেখা ফুটে উঠেছে দুই পুরনো বন্ধুর মনে। প্লেখানভ, জোরে, ইগ্‌লেজিয়া। ভীইয়ার বলল, 'একটা বিশেষ বয়স পার হবার পর গোরস্থান ছাড়া অন্য কোনোদিকে যাবার পথ আর থাকে না। যেদিকেই তাকাও না কেন গোরস্থান থাকবেই।'

'গোরস্থান'—কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসতেই মনে পড়ে যায় মুনে কেন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এজন্যে সকাল থেকেই তৈরি হয়ে রয়েছে সে। সরকারী বা পার্টি মুখপাত্র হিসেবে তার পক্ষে মুনের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মুনে যে তার পুরনো বন্ধু—একথাও ভোলা অসম্ভব। আর একথাও বা সে ভোলে কি করে যে অনেক বিপদে পড়েই মুনে তার কাছে এসেছে?

ভীইয়ার বলে, 'তোমার দুঃখের কথা আমি শুনেছি।'

মুনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিজের দুঃখের কথা সে কারও কাছে বলেনি। কিন্তু তার ছেলে পেপের হাসি-হাসি মুখখানির কথা ভেবে সারারাত ঘুমোতে পারে না। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক দুপুরবেলা। সাদা দেওয়াল, সাদা ধুলো। গরমে আর ক্লান্তিতে সবাই ধুঁকছে। চিলকোঠার ঘরে পেপেকে খুঁজে পেল ওরা, সেখান থেকে ওকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে গুলি করে মারল।

মুনের মনে হল, ভীইয়ার তার শরীরের চামড়া ছিঁড়ে ফেলে ভেতরটা দেখে ফেলেছে। আর তাইতে ব্যথাটা যেন আরো টনটনিয়ে ওঠে। চুপ করে থাকে সে।

ভীইয়ারই আবার কথা বলে : 'তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারি বন্ধু। তিন বছর আগে আমি আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি। প্রিয়জনকে হারিয়ে বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই। সে-দুঃখ সহ্য করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, বেঁচে থেকে লাভ কি?—'

মুনে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, ভীইয়ারের কথায় এমন কি আছে যে তার মনটা

খিঁচড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়, ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করে, তারপর হঠাৎ এমনভাবে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করে যেন সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে।

'আমি এসেছি উড়োজাহাজের খোঁজে। আমাদের অবস্থা তুমি জান। যদি তোমরা সাহায্য না কর তবে আর আমরা টিকে থাকতে পারব না। পপুলার ফ্রন্ট হচ্ছে সমাজতন্ত্রের শেষ ধাপ। এও কি সম্ভব যে তোমরা আমাদের সঙ্গে সব দিক থেকেই বেইমানি করবে? একজন সমাজতন্ত্রী হিসেবে আর একজন সমাজতন্ত্রীকে আমি এই প্রশ্ন করছি। অতীতের সবটুকুই তো এখনো একেবারে মুছে যায়নি! হ্যাঁ, সত্যি কথা আমার ছেলেকে ওরা খুন করেছে। সে কথা তুলে লাভ নেই। ওদের হাতে খুন হওয়া তো এখন নিত্যকার ব্যাপার! আজ আমি শুনলাম যে কর্দোভায় গুলি চলেছে। ওরা মানুষ নয়—পিশাচ, উন্মাদ! অসভ্য বর্বর মুরদের ওরা এ হত্যার কাজে ব্যবহার করছে। রাহাজানি আর নারীধর্ষণে ওদের হাত পাকা। এখন এসব দৈনন্দিন ঘটনা। কমরেড ভীইয়ার—'

ভীইয়ার বলে, 'কিন্তু আমরা তো সর্বান্তকরণে তোমাদের সঙ্গেই আছি। নিজের কথা বলতে পারি, এই বিদ্রোহ শুরু হবার পর একটি রাতের জন্যেও আমি ঘুমোতে পারিনি। তোমাদের দুঃখকে আমি নিজের দুঃখ বলেই মনে করি। কিন্তু একথাও তোমাকে বুঝতে হবে যে এই দেশের জীবন রক্ষার দায়িত্ব আমাদের ওপর। ফ্রান্স চায় শান্তি। এর চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে! আর সত্যিই তো, অন্য একটা দেশের রাজনীতিতে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তা নিয়ে ফ্রান্সের একজন সাধারণ লোক মাথা ঘামাতে যাবে কেন?'

মুনে বলে, 'আমরা তো লোকজন চাইছি না, আমরা চাইছি উড়োজাহাজ। আগেকার চুক্তি অনুসারে তোমরা অনায়াসে আমাদের কাছে যুদ্ধোপকরণ বিক্রি করতে পার...'

'এই যুদ্ধটা যদি তৃতীয় কোন শক্তির বিরুদ্ধে হত তবে তো কোন প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু এটা যে গৃহযুদ্ধ।'

'একটা আইনসম্মত সরকারকে বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচাবার অধিকারও কি তোমাদের নেই?'

'ঠিক তা নয়! কথা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক অবস্থাটাই জটিল। ফ্রাঙ্কোর পেছনে হিটলার আর মুসোলিনি রয়েছে। যদি আমরা তোমাকে উড়োজাহাজ দিই, তবে একটা মহাযুদ্ধ লেগে যেতে পারে।'

'তাহলে আমাদের সঙ্গে বেইমানি করার রাস্তাটাই তোমরা বেছে নেবে?'

'এভাবে ঘুরিয়ে বলে লাভ কি? তুমি নিজেই বুঝতে পারছ, আমরা চাই যে রিপাব্লিক জিতুক। কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা। তোমার কাছে আমরা জাহাজ বিক্রি করতে পারব না। আচ্ছা সোজাসুজি মালিকদের কাছে গেলেই তো পারো? আমার দিক থেকে কোন বাধা আসবে না। শুধু একটু সাবধানে কাজ করলেই চলবে। আমরা ঘোষণা করবো যে আমরা তোমাদের কোনো কিছু সাহায্য দেব না আর ওদিকে মাল কিনবে আর চালান দেবে। আমরা দেখেও না দেখবার ভান করবো।'

'হয় তুমি আসল অবস্থাটা জান না কিংবা জানতে চাও না। এক সপ্তাহ হল, আমি এসেছি। ফল কি হয়েছে? এগারটা 'এ ৬৮' পেয়েছি। তাও কি কম হাঙ্গামা করে! ভাগ্যিস দ্যুবোয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমাদের এই কমরেডটি...'

'কে? ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি? তাহলেই দেখ! তবুও তুমি আমাদের গালাগালি

দাও। ওকে আমি চিনি, একজন চমৎকার কমরেড। বোমারু হিসেবে 'এ ৬৮' দারুণ ভাল। আরো পেতে বাধা কি?'

'না, ওরা আমাদের কাছে একটিও উড়োজাহাজ বেচবে না। আমরা যা-ই দাম দিই না কেন।'

'কিন্তু আমরা কি করতে পারি? উড়োজাহাজ বিক্রি করা বা না-করা সম্পূর্ণ ওদের হাতে। এটা ওদের অধিকার।'

'কিন্তু তোমরা আমাদের জঙ্গী বিমান তো দিতে পার।'

'আমাদের নিজেদের বিমানবাহিনী দুর্বল করে? না, কমরেড, না, অসম্ভব! র‍্যাডিকাল্‌রা কি বলবে কে জানে? ডজনখানেক উড়োজাহাজের জন্যেই হয়তো মন্ত্রী-সভার পতন হবে। তা যদি হয় তো তোমাদের পক্ষে সেটা আরো খারাপ। আমি আবার বলছি—তোমরা যতো খুশি মাল চালান দিতে পারো, আমরা চোখ বুজে থাকব। শরণার্থীদের জন্যে সাহায্য, এ্যাম্বুলেন্‌স্‌ কোর গঠন বা এধরনের অন্য কিছু করতে পারি আর শিশুদের জন্যে রুটি ও টিনের ঘন দুধ পাঠাতে পারি। কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া? তা হয় না। না!'

'না'—কথাটা চিৎকার করে কয়েকবার বলার পর শান্ত হল ভীইয়ার, তারপর রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে ঘণ্টা টেপে।

'কি খাবে বল। চা? লেমনেড?'

মুনে উঠে দাঁড়ায়।

'মেদিনা দখল হবার অর্থ কি তুমি বোঝ? এখন ওরা জোলা-র সেনাদলের সঙ্গে মিলতে পেরেছে। আমি কূটনীতিজ্ঞ নই। তাছাড়া, আমার বয়সটাও চৌষট্টি হয়েছে—আচ্ছা, কমরেড ভীইয়ার, আমার পক্ষে এখন যাওয়াই ভালো। আমার একটা ভয় ছিল যে তোমার কাছে হয়তো আমি সব কথা বলে ফেলব কিন্তু সে ক্ষমতা নিয়ে আমি আসিনি, শুধু উড়োজাহাজ যোগাড় করার জন্যেই ওরা আমাকে পাঠিয়েছে।'

মুনে চলে গেল। চাপা অসন্তোষে ভীইয়ারের নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে। এই কথাবার্তা অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়েছে তার কাছে। যতোটা সে আশঙ্কা করেছিল তার চেয়েও বেশি। কিন্তু স্পেনের যে কোনো আশা নেই তা এখন একটা শিশুও বুঝতে পারে। খান কুড়ি বিমানের সাহায্য পেলেও কিছু পরিবর্তন হত না। ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্টকে বাঁচাতে হবে। এখন একটু অসতর্ক হলেই সব ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা। তাহলে ফ্রান্সেও ফ্রাঙ্কোর অনুগামী জুটবে। তা যদি হয় তো কে থাকবে ত্রাণ করবার জন্যে? লাঁ-র তিনশো শ্রমিক? পাগলামি! ওরা আমাদের গভীর খাদের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কমিউ-নিস্টরা নয়, আমাদের নিজেদেরই দলের লোক! অবশ্য মুনেকে বোঝা যায়—নিজের ছেলেকে হারানো সহজ কথা নয়। কিন্তু এমনি অবস্থা তো আরো অনেকের।

'বিমান!' তাহলে সে, ভীইয়ার, আর পার পাবে না। কিন্তু তার দোষ কি? সত্যি, দেশ শাসন করতে হলে নিজের সমস্ত নীতি বজায় রাখা অসম্ভব। পিঠের ওপর এত বড়ো বোঝা থাকলে কাদায় পড়তেই হবে। কিন্তু এ বোঝা না নিলেই পারত সে। একজন সাধারণ নাগরিকের জীবন এর চেয়ে অনেক ভালো—শুধু ভোট দেওয়া আর মিছিলে পা মিলিয়ে চলা, তারপর 'কুঞ্জবনে পাখির গান' শুনলেও ক্ষতি নেই। তবে কাউকে না কাউকে দেশ শাসন করতে হবে তো! এমন বহু জীবিকা আছে যা বড়ো বিশ্রী। যেমন, মেথরের কাজ, কসাইয়ের কাজ, জেলখানার পাহারাদারের কাজ। নিজের ওপরেই

নিজের করুণা হল ভীইয়ারের। আর এই করুণায় টাটিয়ে উঠে কুঁজো হয়ে বসে আছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল তার সেক্রেটারি।

'তেসা টেলিফোন ধরে রয়েছেন। তিনি বলছেন যে আপনার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত জরুরি দরকার আছে।'

তেসা বলল যে সে এক্ষুনি ভীইয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ভীইয়ারকে অগত্যা রাজি হতে হল। এই কদর্য দিনটা যেন আর কাটতে চায় না।

ঘরে ঢুকে স্বভাবসুলভ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে ভীইয়ারকে আলিঙ্গন করে তেসা সঙ্গে সঙ্গে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগল :

'সাবধান! স্পেন হচ্ছে ভীমরুলের চাক! এই স্পেনেই নেপোলিয়ঁর কি হাল হয়েছিল ভোলেননি নিশ্চয়ই। আর সেই সত্তর দশকের কথা মনে আছে তো?...'

'আপনার কথার কোনো অর্থ আমি বুঝতে পারছি না...'

'বুঝতে পারছেন না? তাহলে শুনুন, আপনি ভুল করছেন। যদি আপনি কমিউনিস্টদের উড়োজাহাজ দিতে রাজি হন তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য। হিটলার এক পাও সরে দাঁড়াবে না, মুসোলিনির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।'

'প্রথমত, আজানা বা জিরলকে কমিউনিস্ট বলছেন কেন? কি হিসেবে ওরা আপনার চেয়ে বেশি কমিউনিস্ট?'

তেসা বলল, 'আজানার প্রশ্নটা এখানে বড়ো নয়। বন্দুক কাদের হাতে? মজুরদের হাতে। আমি ওদের যা-ই বলি না কেন কি আসে যায়? সমস্ত ইউরোপের কাছে ওরা 'কমিউনিস্ট'। আমার কথাটা আবার বলছি—স্পেনের ব্যাপারটায় যুদ্ধের বীজ রয়েছে।'

'তাহলে সিদ্ধান্তটা কি এই দাঁড়ায় না যে একটি আইনসম্মত সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়-সম্পর্ক বজায় রাখার অধিকারও আমাদের নেই?' ভীইয়ারের খেয়াল নেই যে তার মুখ থেকে মনের কথাগুলোই বেরিয়ে এসেছে।

তেসা বলল, 'ওসব সুক্ষ্ম বিচার না তোলাই ভালো! আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার বিশেষ একটা রাজনৈতিক সহানুভূতির জন্যে দেশের লোককে প্রাণ দিতে হবে। চমৎকার দেশ-শাসক আপনি! রোম আর বার্লিনকে আলাদা করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আপনি ওদের আরো জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছেন।'

'যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে স্পেনের ব্যাপারে ওরা হাত মিলিয়ে কাজ করছে তখন ওদের আলাদা করা কি করে সম্ভব?'

'এই সব ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করতে হবে। আগু বাড়িয়ে আমাদেরই যেতে হবে মুসোলিনির কাছে। তাহলে ইতালীর ভাবপ্রবণ লাতিন প্রকৃতিটা আবার জেগে উঠবে। আজকের দিনে ফ্রান্সের পক্ষে প্রয়োজন কূটনীতি, দলীয় একগুঁয়েমি নয়। স্পেনের ব্যাপার সম্পর্কে আমাদের দু-দিক থেকেই সাবধান হওয়া দরকার। আলবার ডিউক লণ্ডনে চুপ করে বসে নেই। আলফানসো না ফ্রাঙ্কো—ওসব খুঁটিনাটির কথা। মোটা কথাটা এই যে বার্সেলোনার এ্যানার্কিস্টদের চেয়ে জেনারেলকেই ওরা বেশি পছন্দ করে। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের আর কোন সঙ্গী থাকবে না। পপুলার ফ্রণ্টকে সমর্থন করি বলেই আমি এসব কথা বলছি...'

'তাই নাকি! তা তো আমি জানতাম না! ধর্মঘটের সময়ে আপনার বক্তৃতা...'

'তখন আমি মন্ত্রীসভাকে বাঁচিয়েছি! অবশ্য আপনার কর্মনীতির যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলাম, কিন্তু তা না করে উপায় ছিল না। কি রকম ক্ষেপে উঠেছিল সবাই

মনে আছে? আমি তো মন্ত্রীসভার পক্ষে আস্থা-প্রস্তাব এনেছিলাম। র‍্যাডিকাল উপদলে তার ফল কি হয়েছিল ভোলেননি নিশ্চয়ই। মালভী, মারসাঁদো, মেইয়ের— প্রত্যেকে একবাক্যে বলেছিল, পদত্যাগ চাই। ধর্মঘটের প্রশ্ন এখন আর নেই। কিন্তু এখন অবস্থা আরো অনেক ঘোরালো। মালভী তাল ঠুকছে; জানেন তো ও স্পেনের ধনীদের মস্ত বন্ধু। আপনাকে বলে রাখছি শুনুন, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর চেয়ে আজানাকে আমিও বেশি পছন্দ করি। আমি একজন খাঁটি রিপাব্লিকান, গণতন্ত্রের ভক্ত। কিন্তু আমার কথা কে শুনছে? আর সত্যি কথা বলতে কি, এ নিয়ে আপনাকেও কেউ মাথা ঘামাতে বলেনি। যেটুকু আমরা করব বলে সবাই আশা করে তা হচ্ছে চুপ করে বসে থাকা, এ ব্যাপারে মাথা না গলানো।'

'কিন্তু সবাই তো মাথা গলাচ্ছে।'

'সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য—একটা ষাঁড়ের পক্ষে যে কাজ শোভা পায়, দেবরাজের পক্ষে তা অশোভন। ইতালীয়ানরা তো তাল ঠুকছে, জার্মানদেরও সেই অবস্থা। যুদ্ধ যদি আমরা না চাই তবে একটিমাত্র কাজই আমরা করতে পারি, তা হচ্ছে চুপ করে থাকা। মাদ্রিদে যদি আপনি একশোটা উড়োজাহাজও পাঠান, কিছুই এসে যাবে না। ফ্রাঙ্কোকে ওরা পাঁচশোটা উড়োজাহাজ পাঠাবে। আগুন নিয়ে খেলা করাটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়।'

'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ীরা যদি উড়োজাহাজ বিক্রি করে তবে আমরা বাধা দেব কেন?'

'আবার সেই সূক্ষ্ম বিচার? শুনুন, এটা একটা পার্লামেন্টারি দলাদলির ব্যাপার মোটেও নয়। খুব সাবধান, রক্তারক্তি শুরু হতে পারে! আমি এতটুকু বাড়িয়ে বা বানিয়ে কথা বলছি না। এতটুকুও নয়। কিছুই ওদের আটকাতে পারবে না। মিথ্যে চালাকি করে কি লাভ? আপনি যদি একটিমাত্র উড়োজাহাজ পাঠান, তাহলেই যুদ্ধ লেগে যাবে। আমি জানি যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপনার ঘৃণাটা খাঁটি। তা জানি বলেই আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি। আপনাকে যা বললাম, সব আমার মনের কথা। শুধু আমার নয়, সমস্ত ফরাসী মায়ের কথা, ফ্রান্সের কথা!'

ভীইয়ার বলল, 'শান্তি অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে আমি অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

'তা আমি জানি। কিন্তু আপনার শত্রুরা উঠে-পড়ে লেগেছে। র‍্যাডিকালদের দলে তো ভীষণ সোরগোল—মালভী সমানে চিৎকার করে চলেছে যে আপনি নাকি জাতীয় স্বার্থ মেনে চলেন না। সবাই শুনছে ওর কথা। আর দক্ষিণপন্থীদের কথা না বলাটাই ভালো। ব্রতেইটা তো একটা আস্ত পাগল আর হাবা। আমরা স্প্যানিয়ার্ড নই। আমরা একটি অত্যন্ত সভ্য জাতি। স্পেনে যে ধরনের রাজত্ব চলেছে তা আমাদের দেশে অসম্ভব। কিন্তু ব্রতেই লোকটার রীতিমতো প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। কাল ও বলছিল, আপনাকে নাকি ও যুদ্ধ-প্রচার অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। ওদের এই সব চাল যে আপনি ব্যর্থ করবেন, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমি বলি—'ভীইয়ার হচ্ছেন নিরপেক্ষতার প্রতীক।' এ বিষয়ে আমি একবারে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আপনি শুধু মুখে একবার স্পষ্টভাবে 'হ্যাঁ' বলুন।'

হাতের একটা ভঙ্গি করে তেসা গিয়ে দাঁড়াল ঘরের অন্য দিকের কোণটিতে এবং কাঠগড়ার আসামীকে হুমকি দেবার মতো ঝাঁজালো বক্তৃতা দিতে লাগল। তারপর আবার ভীইয়ারের কাছে সরে এসে থুথু ছিটিয়ে বকলো খানিক। ভীইয়ার তার ধৈর্য বজায়

রেখেছে, এমন কি হাসেও একবার। হঠাৎ কোথা থেকে তার মনের দৃঢ়তা ফিরে এসেছে। মনে হল, মুনের আত্মা ঘরের ভেতর উপস্থিত। ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে তেসা এখন ভাঁড়ামি করছে, এক ঘণ্টা আগে মুনে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। ভাগ্যবিপর্যয়ে হতভম্ব হয়েও মাথা নোয়ায়নি। আর ভীইয়ার—যে তার পুরনো কমরেডের সঙ্গে কথা বলেছে হৃদয়হীন কূটনীতিকের মতো—সে-ই কিনা এখন চেষ্টা করছে তেসার জুজু দেখানোর সামনে নিজের আত্মসম্মানকে বজায় রাখতে। এমন কি আটঘাট বেঁধে চলতেও ভুলে গেছে। তেসা যখন স্পষ্ট একটা জবাব চেয়ে বসে, সে শুধু বলে, 'আমি আমার কর্তব্য পালন করব।' এর বেশি একটি কথাও তেসা তার মুখ থেকে বার করতে পারে না।

তেসা চলে যাবার পর ভীইয়ার ক্লান্ত হয়ে সোফার ওপরে শুয়ে পড়ল। মনের মধ্যে উদ্বেগ : 'এখন কি করা উচিত?' ভীষণ মাথা ধরেছে আর গা গুলোচ্ছে। পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে পারছে না। তেসা লোকটা সত্যিই অসহ্য। কি ভীষণ চিৎকার করে আর কি বিশ্রী থুথু ছেটায়। ওকে মেয়েরা ভালবাসে কি করে...হ্যাঁ ঠিক, ওকে নিশ্চয়ই কেউ পাঠিয়েছে। দক্ষিণপন্থী র‍্যাডিকালরা। কিংবা হয়ত ব্রতেই। বৈদেশিক দূতাবাসের ইতালিয়ানরাও হতে পারে। বড়ো জটিল খেলা!...সত্যিই ওরা তাল ঠুকছে। তার মানেই কি যুদ্ধ? লোকে বলবে কি? গত চল্লিশ বছর ধরে সে যুদ্ধকে বরবাদ করেছে আর এখন কিনা সে-ই লাখ লাখ লোককে মরতে পাঠাবে! স্পেনে তো লোক-মারার কাজটা এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।...

চোখ বুজতেই দেখতে পেল মাছিতে ছেঁকে-ধরা মড়া, বিকলাঙ্গ শরীর আর ভাঙা বাড়ির একটা দৃশ্য। এখন কি করা উচিত? তেসা বলেছে, 'একটি উড়োজাহাজও নয়!' হ্যাঁ, র‍্যাডিকালরা হয়তো মন্ত্রীসভা থেকে সরে দাঁড়াবে। কথাটা মনে হতে স্বাভাবিকভাবেই ভীইয়ার ডুবে গেল রাজনৈতিক অঙ্কের যোগবিয়োগে—স্পেনের ব্যাপারে সরকার পক্ষে কত ভোট হতে পারে তাই হিসেব করতে লাগল মনে মনে। ভোটে নির্ঘাৎ হেরে যেতে হবে! তখন র‍্যাডিকালরা আপোস করবে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে—তেসা থেকে শুরু করে ব্রতেই পর্যন্ত বিরাট একটা দল। সেখানেই শেষের শুরু। যে ব্রতেই একনায়কত্বের স্বপ্ন দেখে, তার কাছে এ-ধরনের মন্ত্রীসভাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এটা ৬ই ফেব্রুয়ারির চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। দোকানদার আর জোতদাররা তো ধর্মঘটের নামে আঁতকে ওঠে; তারা সকলেই ব্রতেইর পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। সমাজতন্ত্রী দলের অস্তিত্ব আর থাকবে না। সর্বোচ্চ আদালত। ভীইয়ারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলা হবে, 'লোকটা যুদ্ধ উস্কে তুলতে চেয়েছিল।' একটা এরোপ্লেনকে গুলি করে মাটিতে ফেলতে পারলেই সমস্ত ফাঁস হয়ে যাবে। সরকারী কৌঁসুলি বলবে, 'ভীইয়ারের যোগ-সাজশে 'এ ৬৮'...না, না, এ নিয়ে ছেলেখেলা করা চলে না! রাত দশটা পর্যন্ত ভীইয়ার নিজের চিন্তায় ডুবে রইল। কি করবে ঠিক করতে পারছে না। শেষকালে অসহ্য মাথাধরা ও ক্লান্তি নিয়ে উঠে বসে গোয়েন্দা-পুলিশের বড়োকর্তাকে ডেকে পাঠায়।

'শুনলাম পিয়ের দুবোয়া নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার এগারোটা 'এ ৬৮' বোমারু বার্সেলোনায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক জটিলতা হতে পারে। বোমারুগুলোকে আটকাতেই হবে। এ কাজ সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?'

'খুবই সহজ। বোমারুগুলো আছে হয় এখানকার 'সিয়েন' বিমানঘাঁটিতে, নয়তো তুলুজে। আচ্ছা এ ব্যাপারটা আমি এক্ষুনি দেখছি।'

পুলিশের বড়োকর্তা চলে যাবার পর ভীইয়ার আবার সোফাটার ওপরে শুয়ে পড়ে। মাথাধরা সারাবার জন্যে দুটো পাউডার খায়। ওষুধের ক্রিয়ায় নিঝুম হয়ে যায় শরীরটা। একটা হাত নাড়বার ক্ষমতাও আর নেই, পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হচ্ছে, পা দুটো ঠান্ডা। এখন আর সে কোনো কিছু ভাববে না। এখনকার মতো যতদূর করা সম্ভব সে করেছে। এবার অপেক্ষা করতে হবে। তবুও একটা কথা অনবরত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়—'বেইমানি!' কথাটাকে কিছুতেই বাতিল করা যায় না। মনে মনে বলে, 'বাজে কথা! কারও সঙ্গে আমি বেইমানি করছি না। স্পেনের আশাভরসা তো এমনিতেই চুকে গেছে। দুশো উড়োজাহাজকে ঠেকাবে এগারোটা!...ছেলেমানুষি! লাঁ-র মজুরদের মতো। এই পথে আমি বাঁচিয়ে রাখব পপুলার ফ্রন্টকে। আমাদের পার্টিকে। আর দেশের শান্তিকে। আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। আর কিছু নয়।' বাচ্চা ভয় পেলে মা যেমনিভাবে সাহস জোগায় তেমনিভাবে সে নিজেকে সাহস জোগাচ্ছে। তবুও সেই ভয়ংকর কথাটা বারবার ভেসে আসে; ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়েছিল, চারদিকে আবছায়া—সেই আবছায়ার ভেতর থেকে পিচ্ছিল মাছের মতো।

হঠাৎ তার মনে পড়ে সীমান্তের ছোট শহর সারবেবের কথা। আগে অনেকবার গেছে সেখানে—পিয়েরের বাবাও একবার সঙ্গে ছিল। মনে পড়ে সেই পিরেনিজ পাহাড়ের তলায় পাটলরঙা বাড়ি, জেলেদের ডিঙি, আঙুরক্ষেত, মস্ত গমগমে রেলস্টেশন। আঙুরের মতো মিষ্টি মদ। সারবেবের লোকেরা এবার তাকে আশীর্বাদ করবে। যুদ্ধ ওদের গা ঘেঁষে অপেক্ষা করছে—একটা নিচু পাহাড় বা ছোট সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আসতে বাকি শুধু। সীমান্ত পার হলেই চুরমার হয়ে যাওয়া বাড়ি আর স্ত্রীলোকের কান্না ও বিলাপ। কিন্তু সারবেবের মায়েরা বলবে, 'ভীইয়ার শান্তিরক্ষা করেছে। ভীইয়ার আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়েছে। ভীইয়ার...' নিজের নামটা বারবার উচ্চারণ করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সাতাশ

অবাক হয়ে পিয়ের বলল, 'এ হতেই পারে না! আমি ভীইয়ারকে টেলিফোন করব।'

অঝোর বৃষ্টির মধ্যে একটা আলোর পাশে দুজনে দাঁড়িয়ে। বর্ষণের আর বিরাম নেই, মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবীটাকে ডুবিয়ে দেবার রোখ চেপেছে। পায়ের নিচে কাঠের পাটাতন ভাসছে। স্রোতের মতো জল গড়িয়ে পড়ছে পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্টের জামার কলার থেকে।

'পারী থেকে হুকুম এসেছে। নিশ্চয়ই মন্ত্রীমশাইয়েরও সায় আছে...'

আর মাদ্রিদে অপেক্ষা করছে সবাই! আজ রেডিওর খবরে শোনা গেছে, ফ্যাশিস্টরা এগিয়ে চলেছে। পারীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে পিয়ের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে টেলিফোনের কাছে। ডেস্কের ওপরে একটা ঘুমন্ত কেঁদো বেড়াল। বৃষ্টির ঝর ঝর শব্দ। শেষকালে ভীইয়ারের সেক্রেটারিকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। শান্ত ও ঠান্ডা গলায়

সেক্রেটারির জবাব : 'মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে এই সংবাদ আমি জানাব...মাননীয় মন্ত্রী-মহাশয় এখন ব্যস্ত আছেন...আমার মনে হয় না মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় পুলিশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন...' এভাবে কথা বলে কোনো লাভ নেই বুঝতে পেরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে পিয়ের। আবছা ভাবে মনে পড়ে, 'সেক্রেটারিও একজন সমাজতন্ত্রী!' তারপর গলা চড়িয়ে ঘোষণা করে, 'পরের ট্রেনেই আমি প্যারী রওনা হব।'

সুপারিনটেনডেন্ট জবাব দেয় না। স্টেশনের কাছে একটা ছোট কাফেতে ঢোকে পিয়ের। বাইরে থেকে যারা আসছে তারা প্রথমেই পরনের জামাকাপড় ঝেড়ে নিচ্ছে। কাফের ভেতরে সেই বিশেষ ধরনের আরামজনক স্বাচ্ছন্দ্য যা বৃষ্টিবাদলার দিনে যে কোনো আশ্রয়ের ভেতর খুঁজে পাওয়া যায়।

নিজের চিন্তায় এত ডুবে ছিল পিয়ের যে হোটেলের মালিক যখন তার কাছ থেকে খাবারের অর্ডার নিতে আসে, সে কিছুই বুঝতে পারে না। তার সমস্ত চিন্তা জুড়ে আছে মাদ্রিদ। চোখের সামনে একটা ছবি : মানচিত্রের ওপর আঁকা একটা বৃত্তের দিকে চারটে তীর ছুটে আসছে। মুনে আগেই খবর পাঠিয়েছে যে এগারটা 'এ ৬৮' পরের দিন বার্সেলোনায় পৌঁছবে। খবর পেয়ে সেখানকার লোকেরা আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করছে। আর এদিকে সবই ভেস্তে যাবার জোগাড়! এই কাণ্ডটা করল কে? ভীইয়ার? সন্দেহটা একবার উঁকি দিতেই সে আঁতকে ওঠে। নিজের ছোট মনের পরিচয় পেয়ে নিজের ওপরেই চটে যায়। ভীইয়ারের ওপর সন্দেহ! এক গ্লাস কোনিয়াক মদ খেয়ে সিগারেটের পর সিগারেট টানতে থাকে। পাশের টেবিলের কথা-বার্তার দিকে কান দেয়। কে একজন মারি পাশের বাড়ির খরগোশগুলোকে বিষ খাইয়েছে, তারই গল্প। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে আনের চোখদুটোর কথা ভাবে। ঝর ঝর বৃষ্টির মধ্যে সেই টিমটিমে আলোটা। কোনো ফল হয় না, ভীইয়ারের চিন্তাটাই বার বার ফিরে আসছে। ভীইয়ার সম্পর্কে সন্দেহ। কোনো একটা শক্ত অসুখ হবার আগে শরীরে যেমন যন্ত্রণা হয় আর শরীরটা যেমন বিশ্রী লাগে, এখনো তাই মনে হচ্ছে। অনেক কথা মনে পড়ছে—ভীইয়ার সম্পর্কে মিশোর কাটা কাটা কথা, সমাজতন্ত্রীরা মুনের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছে সে-সম্পর্কে মুনের মুখে শোনা গল্প। কিংবা হয়তো এসবের পেছনে কোনো সত্যি নেই। হয়তো সত্যিই তার কোনো অসুখ হবে। কাফের ভেতরে স্যাঁতসেঁতে গুমোট গরম, তবুও তার গা শিরশির করছে। ট্রেনের এখনও দু ঘণ্টা দেরি। খানিকক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করে, খানিকক্ষণ চেষ্টা করে স্থানীয় খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে খচ্চর আর গরুর দামগুলো পড়তে। এলোমেলো ভাবে কতকগুলো কবিতার ছাড়া ছাড়া লাইন মনে পড়ে যায়। তারপরেই আবার ভীইয়ারের মুখটা স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে—লাল ঝাণ্ডার তলায় প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে ভীইয়ার হাসছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? এমনও হতে পারে ভীইয়ারের সেক্রেটারির কথায় কিছুই যায় আসে না, সুযোগ পেয়ে একটু ফালতু মুরুব্বিয়ানা দেখিয়েছে লোকটা। কিন্তু পুলিশ বাধা দিচ্ছে। এই পুলিশগুলোকে সাফ করছে না কেন ভীইয়ার? ওগুলো তো ফ্যাশিস্ট, যেন পুলিশ হওয়ার পক্ষে ফ্যাশিস্ট হওয়াটাই বড় গুণ। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট স্পেন সরকারকে বলেছে 'কমিউনিস্ট', আর মুখ বেঁকিয়ে হেসেছে। ও লোকটা বোধ হয় ক্রতেইর গুণ্ডাদলের একজন। ওর দিন যে ফুরিয়ে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিথ্যে একটা দিন নষ্ট হল। ওদিকে স্পেনের লোকেরা আশায় আশায় বসে আছে......অসহ্য!

কাফের ভেতরটা এখন একেবারে শান্ত। কিছু কিছু লোক চলে গেছে, বাকি যারা এখনো বসে বসে ঝিমোচ্ছে তারা সবাই রাতের ট্রেনের যাত্রী। দোকানের মালিক গোলগাল ফুলোফুলো স্ত্রীলোকটিও ঢুলছে, পেটের কাছে চেপ্টে রয়েছে এক বাণ্ডিল সবুজ উল। এক কোণে, লাল মদের ভেতর রুটি ডুবোতে ডুবোতে একটি মজুর কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে তার সঙ্গীকে। কান পেতে শোনে পিয়ের—

'তামাম ব্যাপারটাই এখন স্পেনে। আমি তো যাচ্ছি। দেখে নিও যাই কি না যাই। ওদের মদত দেওয়াটাই এখন আমাদের কাজ। নইলে আমরাও খতম হয়ে যাব।'

পিয়ের নিজেকে সামলে রাখে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে লোকটার হাত ধরে চিৎকার করে বলে, 'ঠিক কথা!' কিন্তু সে শুধু হাসে। বুঝতে পেরে মজুরটি চোখ টেপে অর্থপূর্ণভাবে।

পারীতে পৌঁছেই পিয়ের ছুটল মন্ত্রীদপ্তরের দিকে। গিয়ে শুনল মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত আছেন। দু-ঘণ্টা পিয়ের বসে রইল। আরো অনেকে দেখা করতে এসেছে, প্রায় সকলেই সমাজতন্ত্রী, উদ্দেশ্যও এক—ভীইয়ারকে ধরাধরি করে 'লিজিয়ন অব অনার' বা এই ধরনের কোনো একটা সম্মান-পদক বাগিয়ে নেওয়া। ছটফটে প্রকৃতির ছোট্টখাট্ট এক মহিলা কিচিরমিচির লাগিয়েছে, 'আমি ওকে অনেকদিন থেকে চিনি। ও যখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত সেই সময় থেকে। ও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করবে।' স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ভীইয়ার দেখা করল, অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীদেরও ডেকে পাঠাল একে একে। কিন্তু পিয়ের বসেই রইল সেই থেকে। শেষকালে পিয়ের শুনল, 'মন্ত্রীমশাই লাঞ্চ খেতে গেছেন। তিনটের সময় ফিরবেন।'

তিনটে পর্যন্ত পিয়ের বসে রইল বুলভারের একটা বেঞ্চে। চারপাশের স্বাভাবিক জীবনস্রোত তেমনিভাবেই প্রবহমান। এক-একটা গোল রুটি আর এক-এক টুকরো চকোলেট নিয়ে খেতে বসেছে দরজীরা। একটা দোকানের বাইরে কতগুলো সিল্কের থান নিয়ে কয়েকজন মহিলা ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ট্যাকসি ড্রাইভাররা একজন আর একজনকে গালাগালি দিচ্ছে। বুড়োরা বসে বসে চড়ুইপাখিদের খাওয়াচ্ছে। বোকা বোকা চেহারার একদল ইংরেজ দর্শককে নিয়ে গাইড্‌রা শহর দেখতে বেরিয়েছে। দালালদের মুখে মুখে শেয়ার-বাজারের সর্বশেষ দর। মাদ্রিদ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু পিয়েরের মনে সেই এক উৎকণ্ঠা : তালাভেরা কি ওরা দখল করতে পারবে?...ঘড়ির কাঁটাটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। পিয়েরের মনে হল সে যেন সারাটা দিন এখানে বসে আছে। অথচ তিনটে বাজেনি এখনো।

খাবার পর ভীইয়ার মন্ত্রীদপ্তরে ফিরে এল। আগের মতোই অপেক্ষা করতে লাগল পিয়ের। এবেলা সে একা; দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ হয়ে গেছে। অবশেষে একজন সেক্রেটারি এল তার কাছে।

'মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে ব্যস্ত। সুতরাং তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না বলে ক্ষমা চাইছেন। আমাকে তিনি আপনার সঙ্গে এ-বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পাঠিয়েছেন।'

পুলিশ-সুপারের যথেচ্ছাচারের কথা পিয়ের বলতে শুরু করেছে এমন সময় সেক্রেটারি তার কথায় বাধা দিয়ে বলল :

'মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সমস্ত ব্যাপারটাই পুরোপুরি জানেন। আমরা দুজনেই সমাজতন্ত্রী সুতরাং খোলাখুলি কথা বলতে কোনো বাধা নেই...অবস্থা খুবই ঘোরালো।

যাহোক একটা পথ আমাদের বেছে নিতে হবে। যদি আমরা স্প্যানিয়ার্ডদের সাহায্য করতে চাই তবে হয়তো সব কিছুই খোয়াতে হবে, যুদ্ধকে কিছুতেই ঠেকানো যাবে না আর দেশের ভেতর ফ্যাশিজ্‌ম্‌ মাথা চাড়া দেবে।'

'কিন্তু ফ্রাংকো তো মাদ্রিদে। এখানে তো ব্রতেই!'

'এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক বলে আমার মনে হয় না। স্পেন হচ্ছে একটা পিছিয়ে-পড়া আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, ইউরোপের সীমান্ত। কোনটার গুরুত্ব বেশি? স্পেনীয় রিপাব্‌লিককে বাঁচানো—যে দেশ কৃত্রিমভাবে তৈরি, যে দেশের কোনো বনিয়াদ নেই? না, একটা অগ্রগামী দেশের সমাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা—তার ওপর বিশেষ করে সেই দেশটি যদি আমাদের নিজেদেরই দেশ হয়? মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ঠিক করেছেন যে এই বিষয়ে কঠোর নিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলবেন।'

একথা শুনে পিয়ের আর নিজেকে সামলাতে পারল না। গত কয়েক সপ্তাহের উৎকণ্ঠা—ব্রেত' গ্রামের ঝড় থেকে শুরু করে বুলভারের ভিড় পর্যন্ত, সাধারণ মানুষের হাল্‌কা-হাসি, ভীইয়ারের ওপর অবিচল বিশ্বাস নিয়ে সারা রাত জেগে থাকা, মাদ্রিদ সম্পর্কে উদ্বেগ—সমস্ত কিছু একটা চিৎকারের ভেতর ফুটে উঠল :

'মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়? মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় না বিশ্বাসঘাতক জুডাস!'

কথাটা এত আচমকা যে সেক্রেটারি বলল, 'মাফ করবেন। আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

ততোক্ষণে পিয়ের বেগুনী কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে। চারপাশ থেকে মোসাহেবের দল বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে, তারা যেন বলতে চাইছে, 'ও, কাজ হাঁসিল হল না বুঝি!'

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে পিয়ের রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করল, কিন্তু কোনো ফল হল না। মানসিক যন্ত্রণাটা এত বেশি তীব্র যে কোনো কিছুতেই তার উপশম হবার নয়। যাঁকে সে আদর্শস্থানীয় মনে করত, তাঁর এই অধঃপতন কেন—একথা আর সে ভাবতে চেষ্টা করল না। মনে হচ্ছে, সে সবকিছু খুইয়ে বসেছে, একটা শূন্যতা—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। ঠিক কথাই বলে আনে। আর যা কিছু এতকাল তার জীবনের আদর্শ ছিল, তা কি শুধু ভ্রান্তি, সাদাসিধে মানুষদের জন্যে পাতা কৌশলী জাল মাত্র, প্রতারণার পারস্পরিক সুবিধা-লাভ-সংঘ? তাকে সবাই হাবা ঠাউরেছে। এক ঘণ্টা আগেও মানুষের শুভবুদ্ধি ও বন্ধুত্ব-প্রেরণার ওপরে বিশ্বাস অটুট ছিল তার। বিশ্বাস ছিল আদর্শের ওপরে, যে আদর্শকে সে জীবন দিয়ে মেনে নিয়েছিল। এখন সে মুনের সামনে দাঁড়াবে কি করে?

তালাভেরা...

স্পেনের কথা মনে পড়তেই সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। না, এখনো অনেক কিছু করবার আছে। এই জঘন্য একটা ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর সবকিছু নিশ্চয়ই বদলে যায়নি। মাদ্রিদের লোকেরা এখনো যুদ্ধ করছে। 'এ ৬৮' না থাকুক, টোটা-বন্দুক আছে তাদের। পিয়েরও যাবে সেখানে, সেখানেই প্রাণ দেবে সে। মৃত্যুর চিন্তাটা তার কাছে মুক্তির পথ বলে মনে হয়। একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ে। এক্ষুনি সে মিশোর কাছে যাবে! মিশোই তাকে বলতে পারবে কি ভাবে মাদ্রিদ যাওয়া যায়।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে মিশোর একটুও দেরি হল না।

'যেতে দিল না বুঝি?'

'না। একটিও না। এ কাজ কে করলে জান? ভীইয়ার। ভীইয়ার, বুঝেছ, ভীইয়ার! আমি পাগল হয়ে যাব বোধ হয়? হ্যাঁ, শোন। আমি মাদ্রিদে যেতে চাই। তোমাকে সাহায্য করতে হবে। ওর নামও আমি আর মুখে আনতে চাই না। কি লাভ?'

মিশো বুঝতে পারল পিয়েরের বেদনা কত গভীর। নিঃশব্দে পিয়েরের হাতটা চেপে ধরল সে। একটা খোলা জানলার পাশে দুজনে দাঁড়িয়ে, বাইরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ব্যাঙ-ব্যাঙ খেলা করছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিশো বলল, 'মুনেকে একজন কথা দিয়েছে তিনটে 'পতেজ' উড়োজাহাজ বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে মুনে কিছুই বোঝে না। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই জানো-শোনো। তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পারি। আমরা চেষ্টা করছি একটা স্বেচ্ছাবাহিনী তৈরি করতে। হয়তো আমি নিজেও যেতে পারি। কিন্তু তোমার যাওয়া চলতেই পারে না। এখানে তুমি না থাকলে সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে যাবে...'

পিয়ের প্রতিবাদ করল না। বেশ। কালই সে বিমান-ঘাঁটিতে যাবে। বেশ, এখানেই থাকবে সে। মুক্তি পাবার শেষ ছিদ্রটুকুও এবার বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে এসে পিয়ের হতভম্বের মতো চারদিকে তাকাতে লাগল। কোথায় যাবে সে? শেষকালে সে নিজেও বুঝতে পারল না গোটা পারী পেরিয়ে কেনই বা সে আঁদ্রের কাছে হাজির হল আর কেনই বা রু শের্‌স্‌-মিদির এই অপরিচ্ছন্ন অস্বস্তিকর স্টুডিও-টার কথা এই সময়ে তার মনে পড়ল।

গতবার দেখা হবার পর ছ-মাস পার হয়েছে। পিয়েরের কাছে এই ছ-মাস একটা যুগ। ছ-মাস আগেও সে ছিল কত বালখিল্য...

'কেমন আছ, আঁদ্রে?'

কি বলতে পারে আঁদ্রে? সে কি বলবে এই ভয়ংকর গ্রীষ্মের ঘটনাগুলো তাকে কি ভাবে বিচলিত করেছে আর কি ভাবে জেনেৎকে পেয়েও সে হারিয়েছে?

'একটা স্টিল-লাইফ আঁকতে শুরু করেছি, কিন্তু কিছুতেই শেষ করতে পারছি না।'

অবাক হয়ে পিয়ের তার দিকে তাকিয়ে রইল ঃ

'তুমি এখনো ঠিক সেই রকমটিই আছ আঁদ্রে। মনে আছে তোমাকে সেবার কি ভাবে টানতে টানতে মেজোঁ দ্য কুলতুরে নিয়ে গিয়েছিলাম?'

আঁদ্রে শিস দিয়ে উঠল। 'তুমি কি জান যে লুসিয়ঁ স্পেনে গেছে?'

'হ্যাঁ, খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। বৈদেশিক বিভাগে একটা চাকরি নিয়ে ও গেছে।'

'সত্যি? আমি ভেবেছিলাম ও গেছে লড়তে...'

পিয়ের হাসল। ও এখনো সেই শিশুই আছে। এক সময় পিয়েরও ঠিক এই রকমই ছিল! আঁদ্রের কাছে ভীইয়ারের কথা বলতে শুরু করে পিয়ের। স্বভাবতই পিয়েরের ভাবনা-চিন্তা একটা গমকের ওপরে থাকে। মনে হয় সে যেন চাইছে যে দেওয়া-লের ক্যানভ্যাসগুলো পর্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতকের কাহিনী ফুটিয়ে তুলুক। কিন্তু আঁদ্রে চুপ করে রইল।

'কি মনে হয়? বুঝতে পারছ কিছু?' আবেগে ফেটে পড়ে পিয়ের জিজ্ঞেস করে।

'বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা অসম্ভব নয়।'

'কি? এই প্রতারণা তাহলে তোমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে? আমি শুনেছি

কোন একজন স্প্যানিয়ার্ডকে বাঁচাবার জন্যে এই লোকটি এক সময়ে আমার বাবার সঙ্গে কাজ করেছিল! আর এখন কিনা ও-ই আবার স্প্যানিয়ার্ডদের শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে। এর ভেতর অস্বাভাবিক কিছু নেই? এই বিশ্বাসঘাতকতা স্বাভাবিক?'

'গয়ার পোর্ট্রেটগুলো মনে করে দেখ...'

জ্ঞানশূন্য হয়ে পিয়ের চিৎকার করে ওঠে, 'চুলোয় যাক তোমার আর্ট। তোমরা কি মানুষ? দৈন্য, রক্তপাত, তাজা মাংস—সব কিছুতেই দেখছি তোমাদের আনন্দ। ঠিক গোবরে পোকার মত!' কথাটা বলে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। যেতে যেতে সিঁড়ির কাছ থেকে চিৎকার করে শুধু বলে, 'কিছু মনে করো না। অন্য এক সময়ে আবার আসব।'

আর পিয়ের চলে না যাওয়া পর্যন্ত একবারও আঁদ্রের মনে হল না যে পিয়ের তাকে অন্যায়ভাবে আঘাত করছে। বাইরে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে পিয়েরকে দেখতে পেল না কোথাও। ক্ষুণ্ণ মনে চুপ করে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে লাগল। কেন তাকে অপমান করল পিয়ের? সে তো শুধু বলেছিল যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নয়। ভীইয়ারের মতো লোকের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখবার ক্ষমতা আছে তার। কিন্তু লুসিয়? একটা নাটুলা বিশেষ। ওর চেয়ে কুকুরের সঙ্গে থাকা ভাল! হ্যাঁ, কুকুর-গুলোও নিজেদের মধ্যে মারামারি কামড়া-কামড়ি করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা করবার সময় মুখে বড়ো বড়ো কথা বলে না। আর তার জন্যে তাদের সে ধন্যবাদ জানাতে প্রস্তুত। কিন্তু পিয়ের তাকে অন্যায় ভাবে আঘাত করেছে—সে তো বিশ্বাসঘাতকতা পছন্দ করে না।

পিয়েরের দিন চলাই ভার হয়ে ওঠে। কারখানার কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারে না। কি লাভ মন বসিয়ে যখন সে ভালো করেই জানে যে ইঞ্জিনগুলো হয় ফ্রাঙ্কো নয়তো ব্রতেইর কাছে যাবে?' সেই 'পতেজ' বিমান তিনটে পাঠাবার ব্যাপারে কোনো গণ্ডগোল হয়নি। মাসখানেক পরে দুটো ফাইটার বিমানও পাঠিয়েছে—কিন্তু এ আর কতটুকু? সমুদ্রে এক ফোঁটা জল মাত্র। মাদ্রিদ থেকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসছে। ফরাসী পুলিশ একদিনের জন্যেও বিমানগুলোর ওপর থেকে সতর্ক দৃষ্টি তুলে নেয়নি। আর খবরের কাগজের স্টলে স্টলে ভীইয়ারের সৌম্য ছবি টাঙানো থাকতে দেখা যাচ্ছে। 'নিরপেক্ষতা'র ওপর এমনভাবে বক্তৃতা দিচ্ছে ভীইয়ার যেন ওটা একটা মস্ত কাজ। 'আমরা শান্তি রক্ষা করেছি!' স্পেনের শিশুদের মধ্যে দুধ বিলি করবার জন্যে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ সে দান করেছে—এই শর্তে যে 'সকল শিশুর কাছেই' এই দুধের ভাণ্ডার খোলা থাকবে।

সেদিন পিয়ের আনেকে বলে, 'ছোট ছেলেমেয়েদের আমি যতোই ভালবাসি না কেন, ভীইয়ারের যদি কোনো ছেলেমেয়ে থাকত তো তার গলা টিপে আমি মেরে ফেলতাম...'

দিনের পর দিন জার্মান বোমায় মাদ্রিদের ঘরবাড়ি গুড়ো গুড়ো হতে থাকে। বোমাবিধ্বস্ত মাদ্রিদের বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের ফটো প্রাচীরপত্রের আকারে আঁটা হয় পারীর দেওয়ালে দেওয়ালে। আনে বলে যে ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখাও একটা শাস্তি। পিয়ের কোনো কথা বলে না। সে তো অনেক দিন থেকেই এই শাস্তি ভোগ করছে। তলেদো দখল করে ফ্রাঙ্কো এগিয়ে চলেছে মাদ্রিদের দিকে। কতকগুলো কাগজে আল্‌কাজার-রক্ষাকারী ফ্যাশিস্টদের প্রশস্তি গাওয়া হয়। অন্য কাগজগুলোতে খবর বেরোয় যে মুর দস্যুরা তলেদোর আহতদের পর্যন্ত খুন করেছে। জলিও লেখে,

'ফরাসীদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচাবে।' ব্রতেইর মহিলা-বন্ধুরা মাদ্রিদ-পতনের জন্যে উৎসবের আয়োজন করে রাখে। কিন্তু স্পেনের মানুষ তবুও হার স্বীকার করে না।

পিয়েরের কাছে ভীইয়ারের এই বিশ্বাসঘাতকতার ভেতর কোনো ফাঁক নেই। এই বিশ্বাসঘাতকতা তার নিজের, আনের, গোটা ফ্রান্সের। একটা দুর্গন্ধের মতো এবং একটা বিশ্রী আস্বাদের মতো এই বিশ্বাসঘাতকতা লেগে রয়েছে তার মুখে যা সে কিছুতেই দূর করতে পারছে না। পারীকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে সে, কারণ পারী তার স্বাভাবিক জীবনের কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি ঘটতে দেয়নি। কাফেগুলোতে অবসর সময় তেমনি লোকের ভিড়, তেমনি রাজনৈতিক বিতণ্ডা, তেমনি তাস খেলায় ব্রিজ বা পোকার, তেমনি উলঙ্গ অভিনেত্রীদের নাচগান। সাইরেনের ককিয়ে ওঠা নেই, বোমাবর্ষণ নেই, এক ফোঁটা কৃপণ অশ্রুপাতও নেই। কিছুই নেই।

স্কুল খোলার সময় হল। পারীর রাস্তায় রাস্তায় বইয়ের ব্যাগ আর পেনসিলের বাক্স হাতে ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি ও হৈচৈ। পিয়ের জানে ওদের এই নিশ্চিন্ত উল্লাসের কি দাম দিতে হচ্ছে। মাদ্রিদের উপকণ্ঠে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওদের। বাদাম গাছগুলো শেষবারের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। তারই লাল আভা পারীর বুলভারে। এই সময়টায় সকলে পাখি শিকারে বার হয়। তেসা গেছে মারকিস্ দ্য শারুর পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে; সেখানে গিয়ে একটা ছোট পাখি শিকার করার পর একটি তরুণী ঝি-কে নিয়ে সে পালিয়েছে। চেম্বারের লবিতে এই গল্প সকলের মুখে মুখে। কিন্তু ভীইয়ার এই সব রক্তারক্তি খেলা ভালবাসে না; রক্ত সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। সে শান্তির পক্ষে। রেগে উঠে পিয়ের বলে, 'মাংস খায় কেন, শাকপাতা খেলেই পারে!'

ভেঙে পড়েনি শুধু মিশো। প্রথম স্বেচ্ছাবাহিনীর সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যেই সে স্পেনে যাচ্ছে। প্রশংসা আর হিংসা মেশানো দৃষ্টিতে পিয়ের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এই হচ্ছে একটা মানুষের মতো মানুষ! কি বলেছিল ও?...জয়ের পথ আরও দুর্গম... হ্যাঁ, কথাটার অর্থ পিয়েরও এবার বুঝতে পারছে যেন। এক সময়ে বলা হত, জয়ের দেবী পক্ষ-সমন্বিতা। কিন্তু দেবীর পা দুটো ভারী ও ক্ষতবিক্ষত, ধুলো ও রক্তে কলঙ্কিত।

আঠাশ

কূটনীতিকের চাকরি ভালো লাগছিল না লুসিয়ঁর। আপিসের কাজকর্ম করতে অবশ্য বেশি সময় লাগে না কিন্তু বাকি সময়টুকু কিভাবে কাটাবে তাই নিয়েই ছিল তার দুর্ভাবনা। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকত রেনেসাঁস অট্টালিকার জাঁকজমকের দিকে, ছাত্র ও খচ্চরের পালের দিকে। পারীর কাফেগুলোর সেই উদ্দেশ্যহীন আলাপ-আলোচনা, সেই গল্পগুজব ও নাটকীয়তা—এছাড়া সে থাকতে পারে না। নিজের বিছানা বা সিগারেট-পাইপের মতো এই পরিবেশের সঙ্গেও সে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই লুসিয়ঁ এই ভাল মাইনের চাকরিও প্রায় ছাড়তে বসেছিল, এমন সময় স্পেনের ঘটনা

তাকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছে। রাস্তার ধারে সাইনবোর্ডের লেখাগুলো যেমন হেড লাইটের আলোয় জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে তেমনি এই লোকটিরও মনে হয় যে সত্যকে এবার সে খুঁজে পেয়েছে।

স্পেনের বিদ্রোহ সেখানে যে পরিবর্তন এনেছে, বিশেষ করে বাইরের দিকে যে পরিবর্তন এনেছে, তাই নিয়েই লুসিয়ঁর উদ্দীপনা। মাঝে মাঝে তার মনে হয় যেন সে কোনো একটা প্রাচীন রহস্য-নাটককে মঞ্চস্থ করতে সহায়তা করছে। সাধুবাবাদের মতো লম্বাটে মুখওলা একদল লোক পুড়িয়ে মারছে নাস্তিকদের। কেউ কেউ ক্রুশ ঘোরাতে ঘোরাতে নব-পরিণীতার জন্যে মরছে। স্পেনের অগুণতি বিকলাঙ্গ, আর কুঁজো, অন্ধ ও জানোয়ারের দল গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। ওড়না পরা মেয়েরা গোলন্দাজ সৈন্যদের জড়িয়ে ধরছে। হাতবোমায় আর লেসের পাখায় একাকার। এমনটি লুসিয়ঁ আর দেখেনি। এর নাটকীয় বৈচিত্র্য, রুচিহীনতা আর প্রচণ্ড চড়া সুর তার মন জুড়ে বসে।

একজন ফ্যালাঞ্জিস্ট নেতার সঙ্গে লুসিয়ঁর পরিচয় হয়েছিল। লোকটি সেনা-বাহিনীর মেজর, নাম জোসে গুয়ারনেজ। কাঠখোট্টা চেহারা, ভয়ংকর একগুঁয়ে প্রকৃতি। দিনের বেলা মানুষ মারে আর রাত্রিবেলা ধর্মপ্রচার করে। লুসিয়ঁ দেখে আশ্চর্য হল যে এই স্পেনীয় অফিসারটির কথাবার্তা তার নিজের মনের গোপন চিন্তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। জোসের কথা বলার বিষয়বস্তু হচ্ছে সামাজিক পদের পবিত্রতা; অসমতার সৌন্দর্যময়তা, মেধা, ইচ্ছাশক্তি আর যুক্তির কাছে জনতার আত্মসমর্পণ। অনেক কথা লুসিয়ঁর মনে পড়ে—পারীতে তার অসমাদর, লুমানিতের সেই মাথামোটা লোকটা, পিয়েরের এবং জগতে যতো পিয়ের আছে সকলের মাঝারিত্ব, নির্বাচনের যোগবিয়োগ, এবং তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যা অন্য কারও কাছে স্বীকৃতি পায়নি। আগুন দিয়ে ফ্যালাঞ্জিস্টরা স্বীকৃতি আদায় করেছে। জোসে যে সব পুস্তিকা লেখে তার জন্যে কোন দরজী বা খনি-মজুরের মতামতের অপেক্ষা রাখে না। লুসিয়ঁ চিরকাল বলে এসেছে যে পুরনো পৃথিবীকে বদলাতে হলে দরকার কয়েকজন দুঃসাহসিক লোক আর একটা ষড়যন্ত্র। কমিউনিস্টরা হেসেছে একথা শুনে। ওদের মতে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করে গণ-আন্দোলনের ভেতর জাগিয়ে তুলতে হবে। এখনো ওরা সেই অতীত যুগেই বাস করছে। মার্কস্, কমিউন, গণতন্ত্র, প্রগতি—যতো সব বাজে কথা! কেন যে ওরা বুঝতে চায় না যে 'অধিকার ঘোষণা', এনসাইক্লোপিডিস্ট, বিজ্ঞানে বিশ্বাস, মানুষের নীতিবোধের সুস্পষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে উৎকট ধারণা—এসব থেকে মার্কসবাদকে আলাদা করা যায় না? সমাজ তো আর এই বাড়িটার মত একটা চারকোণা দালান নয়, সমাজ একটা পিরামিড! ফ্যাশিজম নতুন জাগতিক মান তৈরি করবে। বই নয়—শরীরচর্চা ও খেলাধুলা সম্পর্কে উৎসাহ। পার্লামেণ্টারি রিপোর্ট আর আলোচনা নয়—সরকারী আপিস আদালতের সশস্ত্র অধিকার। নির্বাচন নয়—টমিগান।

এই স্পেনীয়টির কথাবার্তায় আরো একটা কিছু আছে যা লুসিয়ঁর মনে দাগ কাটে। মৃত্যু-পূজা। আঁরির মৃত্যুর পর থেকে লুসিয়ঁ খুব ভালো করেই জানে অস্তিত্বহীনতার গুরুত্ব কতখানি এবং তরুণ ও তাজা মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কত গভীর। এ নিয়ে সে একটা উপন্যাস লিখেছে। কমিউনিজম্ সম্পর্কে তার উদ্দীপনা একটা অসতর্ক মুহূর্তের ভুল। অপরের উল্লাস, ছেলেমানুষি হট্টগোল ও তরুণদের সম্পর্কে সমতা তার ভেতরেও সাময়িক একটা সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু জোসের কাছে, এবং লুসিয়ঁর কাছেও, মৃত্যু শুধু চিন্তাজগতেরই বিষয় নয়, তার একটা পরম মূল্য আছে। আকস্মিকতা-

মুখী—সুতরাং সন্দিগ্ধ জীবনকে তা ঠিক পথে নিয়ে আসে।

এই নতুন উদ্দীপনায় লুসিয় মেতে ওঠে। মেজর যখন বলে যে ব্রতেইর সঙ্গে ফ্যালাঞ্জিস্টদের যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে লুসিয়র পারী যাওয়া উচিত, তখন এক কথায় রাজি হয়ে যায়।

পারীতে বা দূতাবাসে কিছু না জানিয়েই সে রওনা হয়ে পড়ে। নিজের চাকরি সম্পর্কে সে কোনো কথা ভাবতে চায় না, ভাবলে নিজেকে ছোট লাগে। জাকা হয়ে সে পারীর দিকে রওনা হল। আঁকাবাঁকা রাস্তায় রোদেপোড়ো লালচে-বাদামী পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলে। কোথাও মানুষজন নেই, ধু ধু করছে চারদিক। পরিবেশটা তার মনের অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। মৃত্যুকে মনে হচ্ছে আপন বোনের মতো। লালচে-বাদামী আর আগুনের মতো গন্‌গনে।

স্পেনের যাদুমাখানো পরিবেশ পার হয়ে ফ্রান্সের ক্ষেতখামার, তার শান্ত জীবনযাত্রা, বেতনসহ ছুটি ও মজুরি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনাকে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হতে লাগল। সবকিছুতে সমৃদ্ধির ছাপ আর প্রথম দিনেই তার কানে এল অনেকবার শোনা সেই কথাগুলো : 'থিতিয়ে বসেছে সবকিছু।'

বুকে জড়িয়ে ধরে লুসিয়কে তার বাবা অভ্যর্থনা করল। লুসিয় এখন আর সেই অবুঝ খরচে ছেলে নয়, একজন কূটনীতিক (লুসিয় বুদ্ধিমানের মতো তার আসার আসল কারণটা বাবার কাছে চেপে গেল)। ছেলের কাছে তেসা স্পেনের অবস্থা একবারও জানতে চাইল না। অনেক আগে থেকেই সে সিদ্ধান্ত করে রেখেছে যে ফ্রাঙ্কোর জয় হবেই। বাদবাকি কোনো কিছু সম্পর্কে তার কৌতূহল নেই। তাই সে লুসিয়র কাছে নিজের পরিকল্পনার কথা বলতে শুরু করল। তাকে বৈদেশিক কার্য-পরিচালনা কমিশনের সভাপতি করা হয়েছে। আর সেও বৈদেশিক বিভাগের গোপন কাগজপত্র মন দিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ঠিক সময়টিতে সে একটা বজ্রবির্ঘোষী বক্তৃতা ছেড়ে মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবে। লুসিয় হাই তোলে। আবার সেই পার্লামেণ্টারী ঘোঁট পাকানো!

কি রকম লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় তা ব্রতেই খুব ভালো করেই জানে। গ্রি-নে-ধরণের 'মন্ত্রশিষ্য'দের সঙ্গে তার ব্যবহার খুবই কড়া। কিন্তু ডেপুটিদের মুগ্ধ করতে, এমন কি তোষামোদ করতে সে রীতিমতো ওস্তাদ। লুসিয়র সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করে যেন তারা দুজনে একই দরের লোক। লুসিয়র মনের আগল খুলে যায়; এতদিন পরে তার কদর হয়েছে। দুজনের মধ্যে প্রথমে কথা ওঠে প্রচারকার্য চালানো সম্পর্কে। ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে হবে। আর ব্রতেই কিছু টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করছে; আল্‌কাজারের রক্ষাকর্তা কর্নেল মসকার্দোকে একটা সোনার তলোয়ার উপহার দেবার ইচ্ছে। তারপর ব্রতেই কথা তোলে, কাজের মতো কাজ কি কি করা যেতে পারে। যেমন, জাহাজভর্তি অস্ত্র চালান দেওয়া, বুর্গসের জন্যে বৈমানিক পাঠানো, যোগাযোগের কাজ—যেমন, বার্সেলোনার গুপ্তচরবিভাগের রসদ পারীর ভেতর দিয়ে চালান দেওয়া।

'আপনি কবে ফিরে যাবেন?' ব্রতেই জিজ্ঞেস করে।

'জানি না।'

ব্রতেই তার শুকনো দড়িপাকানো হাতটা লুসিয়র হাতের ওপর রেখে বলে, 'আপনার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো। কিন্তু ক্যালেন্ডারের মাপটাই জীবনের মাপ নয়। খাঁটি ঘৃণা যে কি জিনিস তা আপনি জানেন। স্পেনে ফিরে যাবেন কেন? যা কিছু

আসল ব্যাপার, তা এখানেই ঘটবে।'

'কোনো ষড়যন্ত্র?'

'হ্যাঁ।'

'মন্ত্রশিষ্য' বাহিনীর কথা ব্রতেই খুলে বলে লুসিয়'র কাছে।

'এ-ব্যাপারে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আপনার বাবা—'

'আমার বাবার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মিল নেই!'

'বুঝেছি। কিন্তু আপনার বাবা পার্লামেন্টারি কমিশনের সভাপতি। ওরা আমার কাছে অনেক কিছুই গোপন রাখছে। কিন্তু আপনার থাকায় সুবিধে এই যে অপর পক্ষের হাত দেখে খেলা চালানো যাবে। অবশ্য, ব্যাপারটা মাদ্রিদের যুদ্ধের মতো অতটা রোমাঞ্চকর নয়। কিন্তু যে সময়ে যা...'

লুসিয়' মাথা নেড়ে সায় দেয়। বিদায় নেবার আগে সে ব্রতেইকে বলে :

'জানেন কেন আমি সমস্ত কাজের জন্যে তৈরি—এমন কি এ-কাজের জন্যেও? প্রত্যেক যুগের একটা নির্দিষ্ট পরিণতি আছে। আপনি একে ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদও বলতে পারেন। মৃত্যুকে আমরা গ্রহণ করেছি জীব-কোষের ধ্বংস হিসেবে নয়, বস্তুর অনির্দিষ্ট আবর্তন হিসেবে নয়, লোকান্তরের পথ হিসেবে নয়—ব্যক্তিজীবনের উচ্চতর সৃজনীশক্তি হিসেবে।'

এই সুন্দর যুবকটির মুখের দিকে আর তার বাদামী চুলের দিকে তাকিয়ে দেখে ব্রতেই।

'হয়তো আপনার কথা ঠিক', শোকার্ত গলায় সে বলে, 'কিন্তু ব্যক্তির অবিনশ্বরতার ওপর আমি বিশ্বাস হারাতে পারি না। আমার ছেলের মৃত্যু...'

বাবার সঙ্গে প্রায় একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসেছিল লুসিয়'। তেসা যখন জানতে পারে যে তার ছেলে বৈদেশিক বিভাগের চাকরি অবহেলা করেছে, তখন সে লাফালাফি দাপাদাপি আর নাকিকান্না শুরু করে দিল। বাবার কাছে লুসিয়'র নিজের পক্ষে কোনো যুক্তি খুলে বলবার ক্ষমতা ছিল না। তার ওপর আবার কয়েক হাজার ফ্রাঁ চাইতে হল বাধ্য হয়ে।

আস্তে আস্তে লুসিয়'র মনে স্পেনের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। এই ষড়যন্ত্র তার কাছে একটা খেলা ছাড়া কিছু মনে হয় না। কোনো প্ল্যান নেই, কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই, জিজ্ঞেস করলে ব্রতেই শুধু বলে, 'আরও অপেক্ষা করতে হবে।' জোসের সাঙ্গপাঙ্গরা ইতিমধ্যেই মাদ্রিদের দিকে এগিয়ে এসেছে। আর বাবার আপিসের বিভিন্ন দলিলপত্র মন দিয়ে পড়ছে লুসিয়' ও রিপোর্ট দিচ্ছে ব্রতেইর কাছে। কিন্তু এ-কাজে খুব বেশি সময় লাগে না—অবসর সময়টা বাবার আপিসের বারান্দায়, ব্রতেইর ওয়েটিং-রুমে আর সন্ধ্যেবেলাকার রাস্তায় ক্লান্তিতে ভরে উঠেছে।

সময় কাটাবার জন্যে লুসিয়' প্রত্যেকটি আমন্ত্রণ রক্ষা করে, যেখানে সেখানে নেচে বেড়ায়, যখন তখন আজগুবি গল্প জমিয়ে বসে, উঁচু-সমাজের চালু মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে। মঁতিনী নামে একজন বিরাট শিল্পপতির মেয়ে লুসিয়'র প্রেমে পড়ে গেল। গোলগাল মেয়েটি, কথায় কথায় খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। যোসেফিনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে লুসিয়'র রোমান্টিক চেহারা, তার মুখে স্পেনদেশের নানা গোঁড়ামির গল্প, আর তার একটা স্বভাব—কারও সঙ্গে বিনীত আলাপ আলোচনার ভেতর হঠাৎ সে চুপ

করে যায়, কোনো একটা বিশেষ দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর অস্পষ্টভাবে হাসে। লুসিয়ঁর এই প্রেমকাহিনী শুনে তেসা খুশিতে ডগমগ। বৈদেশিক পদের বদলে পয়সাওলা কনে পাওয়াটাই যদি লুসিয়ঁ ভালো মনে করে থাকে, তবে ওকে বোকা বলা চলে না নিশ্চয়ই!

যোসেফিন আশা করছে, এবার লুসিয়ঁ তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুলবে। এই আশায় সে মাঝে মাঝে নিভৃত চা-ঘরে বা বোয়া দ্য বুলোঞ-এ মিলিত হচ্ছে লুসিয়ঁর সঙ্গে। কিন্তু লুসিয়ঁ সে-বিষয়ে গা-ই করে না। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে সে লুসিয়ঁর হাত ধরল। শরতের উজ্জ্বল দিন। বোয়ার লাল ও তামাটে অ্যাভিনুতে বেড়াতে বেরিয়েছে ওরা। দূরে একজন মহিলা ঘোড়ার পিঠে বসে শপ্ শপ্ করে চাবুকের শব্দ করছে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠে যোসেফিন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সতর্কভাবে লুসিয়ঁ নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল ঃ

'খোলাখুলি কথা বলা যাক। তোমাকে আমার ভালো লাগে। তাছাড়া তুমি বড়োলোক। এই তো কালই টাকার জন্যে আমার ঘড়ি বাঁধা দিতে হয়েছে...তবুও তোমাকে আমি ছুঁতে পারিনি। তোমার বয়স তেইশ। সব সময়েই তুমি হাসছ। আর আমি? আমি আমার বন্ধু জোসের মতো, মৃত্যুকে আমি বঁধুরূপে বরণ করেছি।'

উনত্রিশ

লুসিয়ঁ যোসেফিনের সঙ্গে আর দেখা করতে যায় না শুনে তেসার প্রায় বিকার দেখা দেবার অবস্থা। না, ওই হতভাগাটাকে দিয়ে কোনো ভালো কাজই হবে না! কিন্তু আরো বড়ো একটা আঘাত অপেক্ষা করছিল তেসার জন্যে। রোমের বৈদেশিক দূতাবাসের একটা রিপোর্ট হাতে নিয়ে বসে বসে সে ঢুলছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকল দেনিস। তেসা খুশি হল; গত কয়েক মাস নিজের মেয়ের বিশেষ কোনো খোঁজখবর সে পায়নি, আমালির কাছে শুনেছে দেনিসের শরীরটা ভাল নয়, কেমন মনমরা হয়ে থাকে সব সময়ে। তেসা বুঝেছিল যে সেই দিন সন্ধ্যে থেকেই—যেদিন তেসা দেনিসের কাছে পার্লামেণ্টে নিজের সাফল্য সম্পর্কে বলেছিল—দেনিস তার ওপরে চটে রয়েছে। দূর ছাই, রাজনীতির! এর জন্যে তার সমস্ত গ্রীষ্মটা নষ্ট হয়েছে। আমালি এবার সমুদ্র-স্নানে যায়নি কারণ 'ছোটলোকদের' সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে সে রাজি নয়। লুসিয়ঁ ফিরে এসেছে স্পেন থেকে। আর দেনিস—হয়তো সত্যিই ওর শরীর খারাপ, কি রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ওকে, কালো কালো দাগ পড়েছে চোখের কোলে। তেসার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে দেনিস কেমন আছে, কিন্তু সে সুযোগ সে পেল না।

দেনিস বলল, 'আমি চললাম। এবার থেকে আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করব।'

এত অসন্তুষ্ট হল তেসা যে কান্নার মতো একটা চিৎকার করে উঠল।

'চুলোয় যা। ছোকরা বন্ধু জুটেছে বুঝি?'

'না, একা।'

অবাক হয়ে তেসা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। না, ওর যে সত্যিই অসুখ হয়েছে,

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কথাটা মনে হতেই তার স্বরটা নরম হল এবং মনের ভাবটা দু-একটা খোঁচার ভেতর যথাসাধ্য গোপন করতে চেষ্টা করল।

'আমাকে দয়া করে বলবে কি, কেন তুমি যাচ্ছ?'

'আমি ভেবেছিলাম যে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে—বিশেষ করে সেই দিনের কথাবার্তার পর। এ ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই। তোমার খরচে আমি আর থাকতে চাই না।'

তেসা আর সহ্য করতে পারল না। 'তোর জাহান্নামে যাওয়া দাদার মতো কোনো পরগাছা তোকে পুষবে বুঝি?'

'আমি জানতাম যে তোমাকে বোঝানো যাবে না। হয়তো এইটেই তোমার যুক্তি। লুসিয় সব দিক থেকেই দোষী, কারণ সে ইচ্ছে করলেই অন্য ভাবে জীবন কাটাতে পারত। কিন্তু তুমি যা করছ, সেটা একেবারেই স্বাভাবিক। এ ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। ঘুষ নিতেও যেমন তোমার বাধে না, তেমনি বাধে না নীচ প্রকৃতির লোককে আড়াল করতে, স্পেনীয়দের বিপদে ফেলতে। এখন যে তুমি আমাকে অপমান করলে তাও তোমার পক্ষে পুরোপুরি স্বাভাবিক। আমার মনে হয় এর পর আর কোনো কথা না বলাই আমাদের দুজনের পক্ষে ভালো।'

'দাঁড়া! যাচ্ছিস কোথায়।'

'আমার নিজের জায়গা আছে। আমি একটা ঘর ভাড়া করেছি।'

'টাকা দিয়েছে কে? নিশ্চয়ই তোর মা—অর্থাৎ সেই আমারই টাকা?'

'না। আমি একটা আপিসে চাকরি নিয়েছি।'

'ওই মহামূল্য চাকরিটির মাইনে কত জানতে পারি কি?'

'মাসে আটশো ফ্রাঁ।'

জোর করে তেসা মুখের ওপর হাসি ফুটিয়ে তুলল ঃ

'বাঃ চমৎকার মাইনে! তোকে লেখাপড়া শেখানো সার্থক হয়েছে দেখছি! দাঁড়া!'

তেসা কি-রকম এলোমেলো ভাবে মেয়ের হাতখানা ধরল। এবার রাগের বদলে করুণা জেগেছে তার মনে। বেচারা! এটা স্নায়ুর অসুখ ছাড়া কিছু নয়। অনেক আগেই মেয়েটার বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। অনেক দিন থেকেই তো আমালিকে সে বলছে...

'পাগলামি করিস না দেনিস। এখন তোর বিশ্রাম আর চিকিৎসা দরকার। এটা তোর স্নায়ুর অসুখ। সাধারণও হতে পারে, শক্তও হতে পারে। ছোট বেলায় আমারও একবার এই অসুখ হয়েছিল। দাঁড়া!'

কিন্তু দেনিস চলে গেল। হলঘরের ভেতর তেসা দেনিসকে ধরে ফেলে এক তাড়া নোট গুঁজে দিল মেয়ের হাতে ঃ

'তোর গোঁয়ার্তুমিই যদি বজায় থাকবে তো এগুলো নিয়ে যা!...আমার ওপর দয়া করে নিয়ে যা! আমার কথাটা রাখ!...

নোটগুলো না নিয়েই দেনিস চলে গেল। ফিরে এসে তেসা শুয়ে পড়ল একটা সোফার ওপর, তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। নিজের কান্না দেখে নিজেই সে অবাক হল আর মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল এর আগে আর কোনোদিন কোনো কারণে সে কেঁদেছে কিনা। কি বোকা মেয়ে! নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনছে। মাসে আটশো ফ্রাঁ দিয়ে কি করে চলবে! এ অবস্থা একটা মাসও ও সহ্য করতে পারবে কিনা

সন্দেহ। এক জোড়া মোজার জন্যেই হয়তো কারও কাছে ওকে যেতে হবে! তখন আর সর্বনাশের বাকি থাকবে কি!. এ সবই হতচ্ছাড়া রাজনীতির জন্যে! এই জঘন্য কাজে না নামলেই পারত সে।

বাড়ির ভেতরকার অপ্রীতিকর আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এসেই দেনিস স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। অসামাজিক, 'ইঁদুরমুখী' বলে তার একটা দুর্নাম আছে, কিন্তু কোনো-দিন সে মুখ ভার করে থাকেনি। আর এখন যে সম্মানজনক দারিদ্র্যকে সে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিল, সেজন্যেও তার মনে এতটুকু দুর্ভাবনা নেই। খুঁতখুঁতে হিসাবনবিসটি ঠাট্টা করে তার নাম দিয়েছে 'ক্ষুদে পাখি'। অন্ধকার আপিস ঘরটায় সারাদিন আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়, লণ্ডন থেকে চালানী পাথুরে কয়লার বিষয়ে সারাদিন হাসিমুখে চিঠিপত্র লেখে দেনিস। শুধু আপিসে নয়, বাড়ি ফিরেও সে হাসে। একটা হোটেলের ছাদের ওপর চিলকোঠার ঘরটা সে ভাড়া নিয়েছে। অন্ধকার ঘুরনো স্যাঁতসেঁতে সিঁড়িটায় উঠতে সস্তা পাউডারের গন্ধ। ছোট্ট ঘরটায় বিছানা পাতবারও জায়গা নেই, দেওয়ালে কাগজগুলো নোংরা। তবুও এই ছোট ঘরটাই ভাল লাগছে দেনিসের। দেওয়ালের আবছা আয়নাটায় বোধ হয় এই প্রথম একটা উৎফুল্ল মুখের ছবি ফুটে উঠল।

অনেক দিন লেগেছে তার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। বসন্তের প্রথম দিককার যে সন্ধ্যেগুলোতে তার সঙ্গে মিশোর প্রথম সাক্ষাৎ, তখন থেকেই তার এই মুক্তির আকাঙ্খার শুরু। আর এখন শরতের বৃষ্টি সারারাত ধরে ছোট্ট জানলাটার গায়ে সশব্দে ফেটে পড়ছে। অনেক ঘটনা সমেত সারাটা গ্রীষ্ম কেটেছে চোখের ওপর দিয়ে, মিশোর সঙ্গে অনেক বার নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, একা থাকার সময়টুকু পার হয়েছে একটানা চিন্তার জাল বুনে—তারপর দেনিস আবিষ্কার করতে পেরেছে নিজেকে। তার এই সিদ্ধান্ত যে বদলাবার নয় তা বোঝা যায় তার খুশিতে কোঁচকানো কপাল আর মুখের হাসি দেখে। অনেক দিন পর মিশোর সঙ্গে আবার দেখা হতে সে শুধু বলে :

'এবার কাজ...স্পেনের জন্যে আমি কিছু করতে চাই। রোজ সন্ধ্যেবেলা আমি সময় দিতে পারি।'

বুলভার সেবাস্তোপোল-এর ওপর দিয়ে ওরা হাঁটছে। রাস্তায় ঘন কুয়াশা—পারীর প্রথম শরতের কুয়াশা। হলদে ফুলকো মেঘের ওপর রাস্তার আলোগুলো যেন ভাসছে। স্পষ্টভাবে কিছু চেনা যাচ্ছে না, পথচারীদের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগছে। বাদামভাজা, আতর আর তামাকের ধোঁয়ার গন্ধ জড়িয়ে আছে ভিজে আবহাওয়ার সঙ্গে। 'ফ্রেগাৎ' 'লিপ্‌প' 'ফ্লাওয়ার্স'—সাইনবোর্ডের লাল অক্ষরগুলো কুয়াশার মালার ভেতর এক একবার ভেসে উঠছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

'তোমাকে টেলিফোন করব ভাবছিলাম,' মিশো বলে।

'টেলিফোনে আমাকে আর পাওয়া যাবে না। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি।'

মিশো সবই বুঝতে পারে। দেনিসের হাতের ওপর মৃদু চাপ দেয়। দেনিস হাসছে। ওর খুশিভরা চোখদুটো সাইনবোর্ডের অক্ষরের মতো কুয়াশার মধ্যে ঝলমল করছে।

কমিটি আপিসে ওরা পৌঁছল। প্রত্যেকের মুখে একটিমাত্র শব্দ—'মাদ্রিদ'। তরুণ যুবক যারা লড়াই করবার জন্যে পা ঠুকছে, বুকে শিশু স্ত্রীলোক যারা তাদের যৎসামান্য সঞ্চয় নিয়ে এসেছে মাদ্রিদের মা-দের জন্যে, শ্রমিক, শিল্পী, পরিচালক, ছাত্র বিদেশী—প্রত্যেকে বার বার বলছে এই একটি শব্দ। পারীর লাঞ্ছিত জীবন্ত চেতনাকে খুঁজে

পাওয়া যাবে এখানে। ভীষণ ভিড় ঘর দুটোতে। দেওয়ালে মাদ্রিদের মানচিত্র আর কাগজের তৈরি স্পেন রিপাব্‌লিকের পতাকা। ওরা মাদ্রিদের দিকে এগিয়ে আসছে—কথাগুলো বলতে গিয়ে সবার গলায় উৎকণ্ঠা। ওরা ওদের হটিয়ে দেবে—সান্ত্বনা দেবার মতো করে কথাগুলো সবাই বলছে। টাকা, সময়, জীবন—স্পেনের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে সবাই রাজি।

ঠিক হল, রোজ সন্ধ্যেয় দেনিস এখানে আসবে। ভারি সহজভাবে দেনিস সবাইকে 'কমরেড' বলে ডাকছে, যেন এভাবে কথা বলতেই সে সারাজীবন অভ্যস্ত—মিশো হাসে।

কুয়াশার মধ্যে মিশো দেনিসকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। রাস্তায় বাদাম-ভাজা কেনে মিশো। দেনিস তার জমে-যাওয়া আঙুলগুলো গরম করে নেয় সেই বাদাম-ভাজায়, তারপর মিশোকে তার নতুন জীবনের কথা বলতে শুরু করে। 'হিসাবনবিস লোকটা ভীষণ খিটখিটে। আর লোকটার মুখের একটুও কামাই নেই। আমাকে অনবরত বলে—'এই দেখ! তোমার জন্যে আবার এই জায়গাটা নতুন করে লিখতে হবে! আর ম্যানেজারটা তো একটা ফ্যাশিস্ট। বড়ো ভয়ানক লোক। ও বলে মাদ্রিদ এতদিনে দখল হয়ে গেছে। আমাকে ও সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে যে আমার মাইনে বাড়ানো বা চাকরি নেওয়া ওর মর্জি'। আমি ওকে বলেছি, 'আমার প্রণয়ী আছে। সে লোকটা হিংসুটে আর তার বন্দুকের নিশানা কখনো ফস্‌কায় না।' শুনে ও আর আমাকে ঘাটাতে সাহস করেনি।

দুজনে হাসে। দুজনেই হঠাৎ খুশি হয়ে উঠেছে। ঘন কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলছে লোকে, আর ওরা পায় সুখের সন্ধান।

কিছুক্ষণ পরে মিশো বলে, 'পরশুদিন আমি চলে যাচ্ছি।'

'তুমি কি স্পেনে যাচ্ছ?'

মিশো ঘাড় নাড়ে।

'মিশো, তুমি ফিরে আসবে তো?'

মিশো চুপ করে থাকে।

'আমি জানি তুমি ফিরে আসবে।'

মিশো জবাব দেয় না। হঠাৎ মনটা ভার লাগছে। এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটল কি করে? দুজনের দেখা হবার পর অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু আরো কিছু আছে যা এখনো বলা হয়নি। আর তাকে কিনা চলে যেতে হচ্ছে...

'মিশো, আমি চাই যে তুমি ফিরে এসো।'

মিশো আবার খুশি হয়ে ওঠে।

'নিশ্চয়ই আসব,' সে বলে, 'আমরা জিতব আর তারপর আমি ফিরে আসব। আর তারপর...'

কথা বলতে বলতে ওরা হোটেলে পৌঁছে গিয়েছে। হোটেলের আবছা আলো প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। আর একটু হলেই ওরা হোটেল ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল আর কি। অন্য দিনের মতোই সাধারণভাবে বিদায় নেবার পালা চুকে যায়। কিন্তু দেনিস হঠাৎ পেছন ফিরে তাকায় তারপর ছুটে এসে মিশোর গালে খাপছাড়া একটা চুমু খেয়ে বসে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে মিশো দেখে দেনিস চলে গেছে। অনেকক্ষণ সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকে আর আপন মনে হাসে। জ্বলজ্বলে কুয়াশার মালা ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যায়।

ত্রিশ

যে দিন সন্ধ্যায় 'সিয়েন' কারখানার শ্রমিকরা তাদের কমরেডদের স্পেনযাত্রা উপলক্ষে উৎসবে ব্যস্ত, সেদিন লন্ডনের নিরপেক্ষতা কমিটির উদ্দেশে সোবিয়েত প্রতিনিধির একটা বিবৃতি বেরোয় খবরের কাগজগুলোতে। সেই সংক্ষিপ্ত তারের ভাষা পারীর শ্রমিকদের জাগিয়ে তোলে। রাস্তায়, মেট্রোতে, কাফের ভেতরে সবাই বলাবলি করে, 'এখন আর স্পেনের লোকরা একা নয়!'

মিশোর মনে হল যেন তার নিজের জন্মদিনের উৎসব করছে। স্পেনযাত্রার আনন্দের সঙ্গে আর একটি আনন্দ এসে মেশে—যে আদর্শের কাছে সে তার জীবন সঁপে দিয়েছে সেই আদর্শের জয়লাভ। বক্তৃতা দিতে উঠে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে :

'এতদিনের স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে! বাব্যোফ-এর স্বপ্ন কি ছিল? স্যাঁ আঁতোয়ান-এর 'নাঙ্গাদের' প্রেরণা দিয়েছিল কে? মৃত্যুদণ্ড হবার আগে বিচারপতিদের সে বলেছিল, 'আমাদের এই বিপ্লব একটা জানানি মাত্র—এর পরেই আসছে একটি মহত্তর ও সুন্দরতর বিপ্লব!' ১৮৪৮ সালে নীল কোর্তা গায়ে শ্রমিকরা সেপাইদের বন্দুকের গুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল—কাজ অথবা মৃত্যু! তাদের কাছে সাম্যবাদ ছিল একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন, তাক-লাগানো খাবার, রূপকথার কারখানা। মৃত্যুর সময় বাপ ছেলেকে বলছে—সমাজ-বিপ্লবের যুগ আসছে! কুসংস্কারের বশে তারা এর নাম মুখ ফুটে বলেনি। কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে কমিউন পত্তন করেছিল সেদিন। ঠিক আজকের মাদ্রিদের মতোই পারীর দুর্গকে রক্ষা করতে হয়েছিল সেদিন। দেশের হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে গুলি করে মেরেছিল ভার্সাইয়ের শাসনকর্তারা। আর ভার্সাই-জেলখানার বন্দীরা বুলেটের সামনে বুক পেতে চিৎকার করে বলেছিল—'সে দিন আসবেই!' চিরকালের স্বপ্ন এটা। এজন্যে প্রাণ দিয়েছে ফুরমি-এর ধর্মঘটীরা। জোরে এজন্যেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। এই স্বপ্নই দেখেছে সৈনিকেরা ভের্দ্যাঁর কামানের সারির পেছনে, শাঁপাইন-এর ট্রেঞ্চে। আজ এটা আর স্বপ্ন নয়—একটা জীবন্ত বাস্তব, একটা দেশ, একটা বৃহৎ রাষ্ট্র। কোনো কিছু একে আড়াল করতে পারবে না বা মুছে দিতে পারবে না। আমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি এমন কিছুর জন্যে নয় যা ভবিষ্যতে হবে, এমন কিছুর জন্যে যা এখনই আছে।'

ব্লুম আর ভাইয়ারের হুকুমে সীমান্ত বন্ধ। তবুও শ'য়ে শ'য়ে স্বেচ্ছাসৈনিক রোজ পিরেনিজ পেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ যাচ্ছে ট্রেনে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বা সাংবাদিক হিসেবে, কেউ পায়ে হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে।

মিশো আর তার আটজন সঙ্গীর জন্যে ঠিকমতো কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। 'লা ভোয়া নুভেল্'-এর বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে মিশো যাচ্ছে; এ-সম্পর্কে দরকারী কাগজপত্র পিয়ের নিয়ে এসেছে তার জন্যে। চুরানব্বইজন স্বেচ্ছাসৈনিকের একটা দল যাচ্ছে পেরপিঞ্যাঁর দিকে, সেখান থেকে তাদের কাতালোনিয়ায় পাঠানো হবে।

সন্ধ্যে আটটার সময় ট্রেন। স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায় জানাবার জন্যে বেশ বড়ো একটা ভিড় হয়েছে কোয়াই দর্‌সে স্টেশনে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার কাছে কিছু কিছু লোক দাঁড়িয়ে। বিবাহিত তরুণ-তরুণীরা হাসছে। একজন বৃদ্ধ প্রচ্ছদপটে উলঙ্গ স্ত্রীলোকের ছবি আঁকা একটা পত্রিকা কিনেছে। জানলায় মুখ বাড়িয়ে একজন মহিলা একগোছা ফুল নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করছেন। বিভিন্ন হোটেলের বিচিত্র লেবেল সাঁটা সুটকেশ সাজিয়ে রাখছে কুলিরা। যাত্রীদের মধ্যে আছে ব্যবসায়ী; আছে পারীর মহিলা—যারা শরতের কুয়াশার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দক্ষিণাঞ্চলে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে; আর আছে আলজিয়ার্সগামী সরকারী কর্মচারী। দু-একজন স্পেনের ঘটনার উল্লেখ করে বলে, 'আজ কিংবা কালকের মধ্যেই মাদ্রিদ দখল হবে। আর তার পরেই সব ঠান্ডা...'

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো ঘিরে যে জনতা দাঁড়িয়েছে তা একেবারে অন্য ধরনের। ধোঁয়া আর ভিড়ের মধ্যে লালরঙের গোলাপফুলকে মনে হচ্ছে ছোট ছোট পতাকা। স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায় জানাতে এসেছে তাদের বন্ধু, কমরেড, মা ও স্ত্রী। তাদের ভালোবাসা ও আনুগত্যের ফিসফিসানির সঙ্গে মিশেছে একটা আনন্দের গুনগুন—'এবার মাদ্রিদ কিছুতেই হাতছাড়া হবে না!' আর মিশেছে নানাদিকের চিৎকার ও গান। দেনিস ভিড়ের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গার্ড যখন চিৎকার করে বলে, 'আপনারা নিজেদের আসনে গিয়ে বসুন', তখন সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে মিশোর জামার হাতটা ধরে শান্তভাবে বলে, 'আমি অপেক্ষা করব।'

হুইস্‌ল্ বেজে ওঠে। বজ্রমুষ্টি ওঠে প্ল্যাটফর্মের ওপর, বজ্রমুষ্টি বেরিয়ে আসে চারখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার জানলা থেকে। প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে একজন মহিলা মন্তব্য করলেন, 'কী লজ্জার কথা!' দেনিস রুমাল নাড়ছে আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে জানলার বাইরে ঝুঁকে-পড়া মিশোর দিকে তাকিয়ে আছে। 'ঠিক তাই!' চিৎকার করে বলে মিশো। একজন স্বেচ্ছাসৈনিকের বৃদ্ধা মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। লাল আলো জ্বলে উঠেছে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে। নতুন যুদ্ধের গান ফিরে আসছে কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে।

গত কয়েকদিনের উত্তেজনায় এত ক্লান্ত হয়েছিল মিশো যে ট্রেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ভেতরেও সে শুনতে পায় চাকার আওয়াজ, সঙ্গীদের কথাবার্তা, স্টেশনের নাম। নারবোন্-এর কাছাকাছি এসে ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে যায়। ধোঁয়াটে হ্রদের পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। কোথাও মানুষজনের চিহ্ন নেই। ধারে ধারে নলখাগড়ার বন, শান্ত জলের ওপর নিচু হয়ে পাখি উড়ছে। দূরে, সূর্যের গোলাপী আলোয় আগুন ধরে গেছে জলে। এই মুহূর্তগুলোতে মিশোর মন জুড়ে বসে দেনিস, মনে পড়ে দেনিসের উষ্ণ হাত আর তার শেষ কথাগুলো। মনে ভার বোধ করে না, গভীর প্রশান্তিতে মনটা ভরে যায়।

তারপর সমুদ্র। কী শান্ত চারদিক! আঙুরের ক্ষেত, দক্ষিণ-অঞ্চলের সূর্য, জেলেদের হালকা জাল—যেন আনন্দের জন্যেই চারপাশের সবকিছু তৈরি। কিন্তু একটু পরেই, সামনের ওই পাহাড়গুলো পার হলেই, যুদ্ধ চলছে। কামরার সকলে জেগে ওঠে, উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের রং বদলাচ্ছে—কখনো বেগুনি, কখনো ইটের মতো লাল। পাহাড়ের ওপারে ভবিতব্য।

স্পেনের সীমান্তরক্ষীরা ট্রেনের যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বজ্রমুষ্টি তোলে—স্বেচ্ছা-

সৈনিকরা ছাড়া ট্রেনে এখন আর বিশেষ যাত্রী নেই বললেই চলে। তারপরেই ভাঙা ঘর-বাড়ি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শিস দিচ্ছে—'রিয়েজো মার্চ'-এর বিষণ্ণ উদাস সুর।

ছ-মাস পরে দেখা গেল, পারী কমিউন ব্যাটালিয়নের লেফ্‌টেনান্ট মিশো একশোজন ফরাসীর সাহায্যে মাদ্রিদের কাছে একটি ছোট আধ-ভাঙা গ্রাম রক্ষা করছে। ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে ওরা এই গ্রামে পৌঁচেছিল। চারপাশে ক্যাস্টোলিয়ান পর্বতমালার উঁচু-নিচু চূড়োগুলো থম্‌কে-থাকা সমুদ্রের মতো। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কত-টুকুই বা ওদের মিল। ওরা একেবারেই অন্য ধরনের। উৎফুল্ল জীবন্ত মুখ, ঠাট্টা-তামাসা লেগেই আছে, স্রোতের মতো কথা বলা স্বভাব। এই নিষ্ঠুর ও সুন্দর দেশের সঙ্গে বা এখানকার সম্ভ্রান্ত, কঠোর ও আবেগপ্রবণ অধিবাসীদের সঙ্গে ওরা মিশে যেতে পারেনি। ছলচাতুরি ও ছেলেমানুষিতে ভরা পারীর ছেলেমেয়েরা নিজেদের বিদেশী মনে করছে এই দেশে। কিন্তু একই উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাস আর স্পেনের লোকদের অন্তরঙ্গতা—এ দুয়ের জন্যে প্রবাসের দুঃখটা ওদের সহ্য হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ গোলাগুলি ছুঁড়বার পর সকাল সাতটার সময় ফ্যাশিস্টরা এগিয়ে আসতে শুরু করে। ফ্যাশিস্টদের গোলায় চারজন মেশিনগানধারী সৈনিক নিহত হয়। মিশো এবং তার সঙ্গীরা ছিল একটা পাহাড়ের ওপর তাড়াহুড়ো করে খুঁড়ে-নেওয়া ট্রেঞ্চে। সেখান থেকে দেখা যায়, একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ফ্যাশিস্টরা গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয় শত্রুদের কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আর একটি দল মাথা তোলে সেই জায়গায়। মিশো হুকুম দেয়, 'হাত বোমা ছোঁড়ো!'

ব্যাপারটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না কিন্তু মিশোর কাছে মনে হল যেন একটা দিন কেটে গেছে। ফ্যাশিস্টদের আক্রমণ ঠেকানো গেল। মিশোর কমরেড তালা-কারিগর জুতোই মারা গেল দুপুরবেলা। মরবার আগে অধীর উৎকণ্ঠায় বারবার সে বলেছিল, 'বোলো—', কিন্তু মিশো তার কোনো কথা বুঝতে পারেনি।

সন্ধ্যের সময় একটা স্পেনীয় ব্যাটালিয়ন এসে ছেড়ে দিল ওদের। একশোজনের মধ্যে এখন মাত্র বিয়াল্লিশজন বেঁচে আছে, সতেরজনকে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে।

তারপর ওরা আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা গরম করতে করতে ঝোল রান্না করল। ঝোলের ভেতর দেবার মতো কিছুই ছিল না! কার যেন দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সাধারণত এই রকম বিশ্রামের সময় ওরা হাসিঠাট্টা করে, গান গায়। কিন্তু আজ, একটা সামরিক সাফল্য সত্ত্বেও, সবাই কেমন বিষণ্ণ। পাহাড়ের ওপর পাথর ও কাঁটা-ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে অনেকজন বন্ধুকে আজ রেখে আসতে হয়েছে ওদের। আর আজকের সন্ধ্যেটাও ঠাণ্ডা—কনকনে হাওয়া বইছে। পোষাক বলতে কারও বিশেষ কিছু নেই—শীতে কুঁজো হয়ে গেছে সবাই। কে একজন একটানা গালি-গালাজ দিয়ে চলেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় এতে ও খানিকটা আরাম পাচ্ছে। কাউকেও বাদ দিচ্ছে না; ঝোল, বাতাস, ফ্যাশিস্ট, যুদ্ধ—সব কিছুর শাপান্ত করে ছাড়ছে।

গ্রামটা জনশূন্য, গ্রামের লোকরা পালিয়েছে। শুধু দুটো কি তিনটে ছোট ছোট ঘরের ভেতরে আবছা আলোর রেখা দেখা যায়। অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা বুড়ী ভূতের মত এগিয়ে এল আগুনের দিকে। সাধারণ চাষীদের মেয়ে, পরনে কালো পোষাক, মাথায় কালো রুমাল। স্ত্রীলোকটি মিশোকে কি যেন বলে, কিন্তু মিশো তা বুঝতে পারে না—অনেক কষ্টে সে গোটা কয়েক স্পেনীয় শব্দ শিখেছে। স্ত্রীলোকটি চলে গেল;

একটু পরেই রান্না করা শুয়োরের মাংস নিয়ে ফিরে এল আবার। মাংসটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বারবার বলতে লাগল : 'খাও! জিনোর মা-র কথা মনে পড়ে মিশোর, এই স্ত্রীলোকটিও ক্ল্যামাঁসের মতো। ওর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছে মিশো। মনে মনে ও নিশ্চয়ই এখন বলছে, 'ওরা তোমাকেও খুন করবে!' এই পৃথিবীটা কত ছোট আর আর কত কম সময়ে একে বোঝা যায়!

পাশের কমরেডটিকে মিশো বলে, 'ওরা আমাদের বলে, তোমরা আমাদের জন্যে যুদ্ধ করছ। না, তা নয়, আমরা যুদ্ধ করছি পারীর জন্যে, ফ্রান্সের জন্যে। পারীর জন্যেই জ'তোই আজ প্রাণ দিল। ওর বাড়িতে আমি একবার গিয়েছিলাম। মঁত্রুজ-এ ও থাকত। ছোট্ট একটা স্কোয়ার আর নিচে একটা কাফে...'

কমরেডটি শান্ত গলায় গান গাইতে শুরু করে, 'পারী, ও আমার পারী!'

একত্রিশ

পারীর স্বাভাবিক জীবনে কোন পরিবর্তন নেই। তেমনি প্রথম অভিনয়-রজনী, চেম্বারের শরৎকালীন অধিবেশন, তেমনি নতুন নতুন ফ্যাশন, অবশ্যম্ভাবী ব্যাঙ্ক ফেল-পড়া ধনী মার্কিনী মহিলার চাঞ্চল্যকর নিখোঁজ হওয়া, তেমনি গোটাকয়েক প্রেম ও গোটাকয়েক আত্মহত্যা। তেসা এখনো আশা করছে যে ব্লুমকে হটিয়ে দেবে, কিন্তু লবীমহলের ধারণা—সরকারপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, নিরপেক্ষতার নীতিতে র‍্যাডিকালরা সন্তুষ্ট। লাল ঝাণ্ডা বা তেরঙ্গা ঝাণ্ডা—দুটোর কোনটাকেই আর দেখা যায় না। দেসেরেরই জয় হল। জনসাধারণের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে ঠিক কাজই করেছে সে। অন্য অন্য দেশে যখন মারামারি, কাটাকাটি, কম খেয়ে থাকা, যুদ্ধাস্ত্রের পাহাড় বানানো, দুর্গ ও বন্দীশালা তৈরি করা, নেতা ও সেনাপতিদের সম্বর্ধনা—তখন পারী আগের মতোই মরিস শেভালিএ-র গানের প্রশংসায় মুখর। হাজার বার গাইবার পরেও মরিস শেভালিএ তেমনি অকুণ্ঠ গলায় আবার গাইছে 'পারী আজো সেই পারী...'

তবুও, এই শান্ত জীবনের নিচে লড়াই চলছে, চাপা আবেগ ঘূর্ণির মতো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। পারিবারিক জীবনে ভাঙন এসেছে, তেসার মত আরো অনেকেরই দিন কাটে পারিবারিক অশান্তির ভেতর। মাঝে মাঝে কাফে রেস্তোরাঁয় তর্ক-বিতর্কের শেষে বন্দুকের গুলি ছোটে। বন্ধুবিচ্ছেদ তো প্রায় রোজই ঘটছে। কতগুলো বিদেশী ভৌগোলিক শব্দ আর অনেক দূরের কোনো প্রতিবেশী দেশের যুদ্ধ নির্ধারিত করছে সব কিছু। দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে পারী। একদল—ধর্মঘটের ওপর যাদের প্রচণ্ড আক্রোশ আর সম্পত্তি হারাবার ভয়ে মিছিল দেখলেই যারা জানলা বন্ধ করে বসে থাকে —তারা উৎসাহিত হয়ে ছোট ছোট লাল আর হলদে পতাকা আঁটতে শুরু করেছে মানচিত্রের ওপর। আর শ্রমিকাঞ্চলের অধিবাসীরা সেই একই মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'মাদ্রিদ প্রতিরোধ করছে!'

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ব্রতৈইর খবরের কাগজগুলোকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল যে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বাহিনী মাদ্রিদের দোরগোড়ায় এসে আটকে গেছে। পারীর

শহরতলীর শ্রমিক-অঞ্চলে বারবার শোনা যেতে লাগল, মান্‌থানারেথ-তীরের সেই আশ্চর্য শব্দগুলো—'ওদের পেরুতে দেওয়া হবে না!'

মাদ্রিদের শ্রমিকদের নানা বীরত্বের কাহিনী মুখে মুখে ফিরছে। আন্তর্জাতিক বাহিনীর কার্যকলাপের বিবরণ লোকে এমনভাবে দিচ্ছে যেন তা রলাঁর বীর-কাহিনী। ধাতু-শ্রমিকরা বা সুতো-শ্রমিকরা এই বিবরণের শেষে একাধিকবার সগর্বে যোগ করেছে, 'আমাদের লোকেরাও ওখানে আছে! দুভাল...জ্যাক্...আঁরি...'

সকালবেলার কাগজ পড়ে ভীইয়ার হাসল। মাদ্রিদ এখনো প্রতিরোধ করছে। টক আঙুর! মন্ত্রী হবার পর থেকে সে আর আদর্শের জন্যে যুদ্ধ বা শ্রেণী-সংগ্রাম বা বিশ্ব-জীবনের কথা ভাবে না। এখন তার কাছে রাজনীতির অর্থই অন্য রকম। তা হচ্ছে এই দল বা ওই দলকে সুবিধা ছেড়ে দেওয়া, সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নিয়োগ, বদলী, পুরস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতি দিনের—সময়ে সময়ে প্রতি ঘণ্টার হিসেব। পৃথিবীটা একটা দামী আর পল্‌কা পুরনো জিনিসে ঠাসা ঘরের মতো সংকীর্ণ হয়ে গেছে। চলবার-ফেরবার বা হাত-পা নাড়বার জায়গা নেই। আর সে যখন নিজের কাছে নিজে বলল যে মাদ্রিদ এখনো প্রতিরোধ করছে, তখন তার মনে হল যেন এই ঘরের বাঁধা থেকে বেরিয়ে এসে সে এক মুহূর্তের জন্যে প্রাণভরে আনন্দের নিশ্বাস নিতে পারছে। আর যাই হোক, সত্যিই চমৎকার লোক ওরা। এমন কি মনে মনে একবার বলে, 'আমাদের লোকও তো আছে ওখানে! সমাজতন্ত্রী শ্রমিক আছে ওদের মধ্যে।'

নিজের সেক্রেটারিকে বলে, 'খবর দেখেছ? বিজয়োৎসবটা ব্রতেই বড়ো তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। শ্রমিকরা তো আর ওর 'মন্ত্রশিষ্য' দলের মতো নয় যে একটা কিছু হলেই খরগোসের মতো পালাবে।'

একটু পরেই ভীইয়ার তার প্রাত্যহিক বিরক্তিকর কাজকর্মের ভেতর ডুবে গেল। প্রথমে দর্শনপ্রার্থীদের দেখাসাক্ষাৎ। এই সময়ে বাধ্য হয়ে তাকে ঘুরিয়ে কথা বলতে হয়, মিষ্টি হেসে ফিরিয়ে দিতে হয়, আর অসম্ভব রকমের প্রতিজ্ঞা করতে হয়। আজকের দর্শনপ্রার্থীদের একজন হচ্ছে সেই পিরু যে জুলাই-মিছিলের দিন তাকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে ছেড়েছিল। এবারেও একই ব্যাপার, নানা নালিশ-অনুযোগে বোঝাই হয়ে পিরু এসেছে:

'রোজ দলে দলে লোক গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা ফ্রাঙ্কোকে আমাদের বিরুদ্ধে উস্‌কিয়ে তুলছি। আজ হোক, কাল হোক—একদিন গোটা স্পেন শাসন করবে ফ্রাঙ্কো। আমার ভোটাররা স্পেনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার বিশেষ পক্ষপাতী—তা যে-দলই সে দেশ শাসন করুক না কেন।'

শান্ত হাসি হেসে ভীইয়ার বলে, 'বন্ধু, কে যে জিতবে তা এখনো বলা যায় না। আজকের শেষ-সংবাদ আপনি পড়েছেন নিশ্চয়ই? যাই হোক, আমি কোনো আপত্তি করছি না...আমরা কথা দিয়েছি একজন স্বেচ্ছাসেবককেও স্পেনে যেতে দেব না। আর এই কথা আমরা নিশ্চয়ই মেনে চলব।'

পিরু চলে যাবার পর ভীইয়ার তার সেক্রেটারীকে বলে, 'পিরেনিজোরিআঁতাল-এর প্রিফেক্টকে সীমান্ত-রক্ষীর সংখ্যা বাড়াবার নির্দেশ দেওয়া দরকার।'

ভাগ্য ভালো যে আজ কোনো সরকারী আমন্ত্রণ ছিল না। দিনের পর দিন জাঁক-জমকের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার ফলে ভীইয়ারের পেটটা ভার হয়ে থাকছিল। আজ শুধু একটা আধ-সেদ্ধ ডিম আর কিছু সব্‌জি ছাড়া আর কিছু খেতে হল না বলে সে খুশি। আজকের বিকেলটাও আনন্দে কাটবে—পার্লামেন্টের অধিবেশনে নয়, খাঁটি সৌন্দর্যরসে

ডুবে গিয়ে। অনেকদিন থেকে তার ইচ্ছে, তরুণ শিল্পী আঁদ্রে কর্নোর ছবিগুলি এক-বার দেখবে। গতবার সালোঁর প্রদর্শনীতে এই শিল্পীর আঁকা আশ্চর্য একটা ল্যান্ড-স্কেপ ছিল ঃ একটা ঝাঁকড়া বাদাম গাছ, বাঁ দিকে একটা নাগরদোলা, ডানদিকে দেওয়ালের গায়ে ছোট্ট একটি মূর্তি। ওর অন্য ছবিগুলো যে ভালো হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কর্নো এর মধ্যেই রীতিমতো আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে...ওই ল্যান্ডস্কেপটা ভীইয়ার কিনবে। সে তো আর কৃপণ নয়। তা বলে দু হাতে পয়সা ওড়াতেও সে ভালোবাসে না। খুশি হয়ে ভাবে, 'সালোঁতে ছবিটার দাম ছিল তিন হাজার। তার মানে দু হাজারে পাওয়া যাবে।'

ভীইয়ার আসবে খবর পেয়ে আঁদ্রের মনে পড়ে যায় ভীইয়ার সম্পর্কে পিয়ের কি বলেছিল। মনে পড়তেই ভুরু কোঁচকায়। চুলোয় যাক! কিন্তু স্টুডিও ঘরটা একটু গোছগাছ করলে কেমন হয়? না, দরকার নেই, এমন কিছু ব্যাপার নয়।

উৎসুক দৃষ্টিতে ক্যানভাসগুলোর দিকে তাকিয়ে ভীইয়ার মন্তব্য করল, 'কী সূক্ষ্ম রঙের কাজ! চেয়ারের তলাকার বাতাসটাও যেন টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই ফুলের রঙটা একটু যেন চড়া হয়ে গেছে। ল্যান্ডস্কেপটা দেখে উৎরিল্লোর সেরা ছবি-গুলোর কথা মনে পড়ে।' আঁদ্রে একটি কথাও শুনছিল না। প্রথমে সে খুঁটিয়ে দেখছিল ভীইয়ারকে আর ভাবছিল, 'না, ছবি আঁকার মতো কিছু নেই চেহারায়। মুখটা আবছা, মুখ তো নয়—একতাল থলথলে মাংস।' তারপর পাইপ ধরিয়ে ভীইয়ারের কথামতো একটির পর একটি ছবি তুলে ধরছে, আর পরনের পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়ছে। ভীইয়ার যে ছবি কিনবে সন্দেহ নেই কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা ভেবেও আঁদ্রের কোনো ভাবান্তর হল না। টাকাকড়ি সম্পর্কে সে নির্বিকার। টাকা থাকলে খরচ করে, না থাকলে বাইরে না খেয়ে ঘরে বসে শুধু শুকনো রুটি-মাংস খায়। এক সময়ে নিজের ছবি সম্পর্কে তার ব্যগ্র ঔৎসুক্য ছিল এবং কার হাতে ছবিগুলো পড়বে তা নিয়ে ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরাই ছবিগুলো কিনে নেয়। সুতরাং আঁদ্রের একটা ধারণা হয়েছে যে স্টুডিওর বাইরে গেলেই ছবিগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। ভীইয়ার বলল, 'সালোঁর প্রদর্শনীতে আপনি যে ল্যান্ডস্কেপটা পাঠিয়েছিলেন সেটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। সেই যে একটা গাছ...'

নিঃশব্দে আঁদ্রে আর একটা ছবি রাখল ইজ্‌ল্‌-এর ওপর। এই ছবিটা তার সব চাইতে প্রিয়। জেনেতের সঙ্গে যে রাত্রিতে দেখা হয়েছিল, তার পরে প্লাস দ্য ইতালী-তে গিয়ে এই ছবিটা সে এঁকেছে। দিনটা বিষণ্ণ। কোণের মেয়েটি কার জন্যে যেন প্রতীক্ষা করছে। নাগরদোলার ঘোড়াগুলো থেমে আছে।

'এই ল্যান্ডস্কেপটা আমি কিনতে চাই।' ভীইয়ার বলে।

আঁদ্রের মুখ কালো হয়ে গেল। টেবিলের পায়ায় পাইপটা ঠুকে তামাক ফেলে দিয়ে ছবির ক্যানভাসটা দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখে।

ভীইয়ার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ছবিটা কি বিক্রী হয়ে গেছে?'

একবারও না ভেবে, শব্দ ব্যবহারে এতটুকু বাছবিচার না করে ছেলেমানুষের মতো রূঢ় ভাবে আঁদ্রে জবাব দেয়, 'আমি চাই না যে এই ছবিটা আপনার বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো হোক। আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন না? সব কিছুর একটা সীমা আছে। ছবিটার দিকে আপনার তাকিয়ে থাকাটাও আমি সহ্য করতে রাজি নই!'

চটে গেলে ভীইয়ারের সমস্ত মুখটা কাঁপতে থাকে। চোখের প্যাশনে, গোঁফের

ভগা, নিচের ঠোঁট, চিবুক—সবশুদ্ধ। বিনীতভাবে সে বলে, 'যেমন আপনার খুশি।' তারপর ছবি দেখাবার জন্যে আঁদ্রেকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহা সমারোহে স্টুডিও ছেড়ে চলে যায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আঁদ্রে শুধু মন্তব্য করে, 'ধাপ্পাবাজ!' তবুও এই সাক্ষিগোপালের ওপর পিয়েরের কী বিশ্বাসই না ছিল! মানুষের বাড়াবাড়ির সীমা-পরিসীমা নেই। আর পিয়েরের মতো ভালো মানুষরাও তা করে থাকে। হাতের একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গি করে আঁদ্রে আবার কাজ নিয়ে বসে—ভাইয়ার আসবে শুনে হাতের যে কাজ ফেলে উঠে এসেছিল। কিন্তু চেষ্টা করেও কাজে মন বসাতে পারে না, তবুও কাজ ছেড়ে কিছুতেই ওঠে না। তার ভয় ছিল যে একবার উঠলেই নিজের মনের খ্যাপা আর ক্লান্ত চিন্তাগুলোর হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না।

অন্ধকার হয়ে এল তবুও সে আলো জ্বালে না। চুপ করে শুয়ে থাকে সোফার ওপর, আর অপেক্ষা করতে থাকে কখন জেনেতের গলার স্বর স্টুডিওর মৃত্যু-স্তব্ধতায় সাড়া জাগাবে। এই অভ্যেসটা তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে। এই সময়টায় যেখানেই সে থাকুক না কেন, একটা বেতারযন্ত্রের সন্ধান করবেই। আর আজ এই বাদামগাছ আর নাগরদোলা নতুন তীব্রতায় তার মনে জেনেতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে। আস্তে আস্তে ঘণ্টাগুলো পার হয়, শেষকালে আসে সেই সময়। সুইচ টিপতে জ্বলে ওঠে সবুজ আলোটা। একটা গান। ভায়োলিনের ছড়-টানা। তারপরেই জেনেতের গলা। জেনেৎ আজ অতল সমুদ্রের বর্ণনা শুরু করেছে, বলছে সমুদ্র-প্রবাল আর তার অশ্রান্ত গুঞ্জনের কথা—এটা কৃত্রিম-মুক্তার বিজ্ঞাপন। তারপর সে একটা কবিতা আবৃত্তি করে; কার কবিতা আঁদ্রে বুঝতে পারে না ঃ

প্রতারিত আমি তাই মৃত্যুপথগামী।
ধু ধু মরু-বালিয়াড়ি, মধ্যরাত্রে যুদ্ধের ঝন্‌ঝনা......

আবার ভায়োলিনের ছড়-টানা, অনেকের গলায় গান। রেডিওর মুণ্ডটা ঘুরিয়ে দেয় আঁদ্রে। শোনা যায় একটি মেয়েলী হাল্‌কা গলা ফরাসী ভাষায় কি যেন বলছে ঃ 'মাদ্রিদ বেতার-কেন্দ্র। লা মাণ্ডা যোদ্ধা নিয়ে গঠিত আমাদের ইউনিটগুলো এবং আন্তর্জাতিক বাহিনী একসঙ্গে ইউনিভার্সিটি সিটির আক্রমণ ঠেকিয়েছে। আমাদের বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে মেডিক্যাল স্কুল থেকে ফ্যাশিস্টদের হটিয়ে দিয়েছে। শহরের উত্তর-অঞ্চলে জার্মানরা দু-বার বিমান-আক্রমণ করেছে। হতাহতের সংখ্যা...'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে আঁদ্রে। প্রাচীন রু শেরস্-মিদি ঘুমন্ত। রকমারি দোকানের মালিক, খোশমেজাজ মুচি, ফুলের দোকানের স্ত্রীলোকটি—সবাই ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে 'তামাক-খোর কুকুর'-এর আশ্রিতরা, রাস্তার বেড়ালগুলো। মাঝে মাঝে দু-একজন বিলম্বিত পথচারীর পায়ের শব্দ! একটা লরি চলে যাবার ঘড়ঘড় আওয়াজ ওঠে। তারপরেই আবার সব চুপচাপ। ধোঁয়াটে বাড়িগুলোতে লোকজন নেই বলে মনে হচ্ছে। একটা গভীর বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন করে আঁদ্রেকে। মাদ্রিদের কথা মনে পড়ে যায়। শহরটা কোনোদিন সে দেখেনি, কিন্তু মনে মনে তার একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করছে—সাদা, অন্ধকার কলরবমুখর, শান্ত,—ঠিক জানে না সে। কিন্তু এখন মাদ্রিদ শহরের ওপর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রাত্রির আকাশ, সেই আকাশের নিচে চেঁচিয়ে কাঁদছে একটি মেয়ে। আর প্রতিটি রাত্রি ঠিক এই রকম। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। পাগল হয়ে যাবার পক্ষে এই তো যথেষ্ট। বোমা বা নিঃসঙ্গ কান্নাটা বড়ো কারণ নয়। বড়ো কারণ, কিছু করতে পার তুমি?...আর এখানে ওরা খড়খড়ি বন্ধ করে

দিয়েছে, গায়ে ঢাকা দিয়েছে হাঁসের নরম পালকের তৈরি লেপ, আর ঘুমোচ্ছে। ওদের শয্যা উষ্ণ ও নিবিড় কারণ বাইরেটা ঠাণ্ডা ও ভিজে আর অনেক দূরে মাদ্রিদের ঘরবাড়ি পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে। উষ্ণ ও নিবিড়! আর তারপর হয়তো এই পারীর আকাশেও গুঞ্জন শোনা যাবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে কালো আর প্রতিকূল আকাশ। তারপর সার্চ-লাইটের অসহায় উঁকিঝুঁকি—না, দেখা যাচ্ছে না! তারপর—প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এক, দুই, তিন...রেডিওর সংবাদ—'বহুলোক হতাহত।' আর একটি মেয়ের কান্না শোনা যাবে রাত্রিবেলা। হয়ত জেনেৎ। কেন ও সবার কাছে প্রতারিত হচ্ছে, কেন ওরা ওকে ডেকে তুলে বলছে না—'পালিয়ে যাও, গ্রামে, সমুদ্রে, যেদিকে খুশি—কিছু আসে যায় কি?' ওরা সকলে প্রতারিত—এই মুচি আর বেড়াল, প্রত্যেকে। জেনেৎ বলেছে, 'প্রতারিত আমি তাই মৃত্যুপথগামী।' কথাটা কি সহজ আর ভয়ংকর।

দ্বিতীয় খন্ড

এক

প্রতি মংগলবার মাঁর্তিনদের বাড়িতে বন্ধবান্ধবদের আসর বসে। বিরাট লাইব্রেরি ঘরে বসে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে কফির কাপে আর মার্তিনিকের টাট্কা মদের গেলাশে চুমুক দিতে দিতে ব্রতেইর বন্ধুরা সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে, আর ওদিকে ড্রয়িংরুমে বসে মহিলারা চা খেতে খেতে গল্পগুজব জমান। মাঁতিনির মেয়ে যোসেফিন্ পুরুষদের ড্রয়িংরুমে আসার অপেক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে; লুসিয়্যাঁর ওপর টানটা এখনো আছে, লুসিয়্যাঁও ওদের বাড়িতে প্রতি মংগলবারে নিয়মিত আসে।

পপুলার ফ্রন্ট জললাভ করার পর প্রায় দু বছর কেটে গেছে। সব কিছুই যেন বেশ খানিকটা বদলে গেছে—কথাটা দেসের প্রায়ই বলে থাকে। ভীইয়ার দেমাক করে, 'শাসন-করার কায়দাটা জেনেছি, আমি আর কারও নজরে পড়ি না।' ব্যবসা ভালো চলছে। কারখানাগুলো অজস্র অর্ডার পেয়ে দিশেহারা, দোকানগুলো যেন খরিদ্দারের চাহিদা মিটিয়ে উঠতেই পারছে না। 'ভাড়া দেওয়া যাইবে' লেখা বিজ্ঞাপনগুলো আর দেখা যায় না, বাড়ি বা জায়গা আর খালি পড়ে নেই। সংকট শেষ হয়েছে—এই মত প্রকাশ করে অর্থনীতিবিদরা প্রবন্ধ লিখছেন আর ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, দেশের অবস্থা আপাতত অনেক দিনের মত সচ্ছল।

কিন্তু এই আপাত-সচ্ছলতার আড়ালে একটা সাধারণ অসন্তোষ চাপা রয়েছে। সেই জুন মাসের হরতালের হিড়িক বুর্জোয়ারা ভোলেনি; তাদের মনে পপুলার ফ্রন্টের আতংকটা থেকেই গেছে। সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা কাজ আর ছুটির দিনে পুরো মাইনে, এই দুটো দাবির ওপরেই ওরা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছিল। এই ধারণাটা যে শুধু মাঁতিনির বন্ধুবান্ধবদেরই তা নয়; মধ্যবিত্তরাও খবরের কাগজে প্রবন্ধ পড়ে এই রকম ভাবে। সাবানের দাম চার পয়সা বেড়ে গেছে—খদ্দেরদের সে কথা বলবার সময় দোকান-দার টিপ্পনি কাটে, 'কি আর উপায় করি, বলুন! মজুর-মহোদয়রা আজকাল সব স্নানা-গারে যেতে শুরু করেছেন।' আয়করের ফর্ম ভর্তি করে দেবার সময় জোতদার বিড় বিড় করে, 'যতো সব পরগাছা!' তার কাছে এই 'পরগাছা' বলতে বোঝায় গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টার, ডাকঘরের দুজন কর্মচারী আর পাশের শহরের মজুররা। মজুরদের মধ্যেও অসন্তোষ। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে রোজ, বছর দুয়েক আগে তাদের যে মজুরি বেড়েছিল ইদানীং আর তাতে চলে না। হরতাল শুরু হয়েছে এখানে ওখানে। মালিকরা দাবি মানতে নারাজ। ভীইয়ার আপোসরফার আবেদন জানিয়েছে। খোলাখুলি সামরিক সংগঠনের ব্যবস্থা করতে ফ্যাশিস্টরা ব্যস্ত। শ্রমিকরা প্রশ্ন তুলেছে, 'আমাদের দেখবে কে? পুলিশ নয় নিশ্চয়ই, তারা তো সুযোগ পেলেই আমাদের পিষে মারবে।' স্পেনের লড়াই এখনো চলছে বটে, কিন্তু ফ্যাশিস্টরা ক্রমশই জিতছে—মাদ্রিদের সংগে কাতালো-নিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ওরা। ক্রুদ্ধভাবে শ্রমিকরা বলাবলি করছে 'স্পেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে।' বিশ্বাসঘাতকতার ঘুণ ধরেছে জনসাধারণের

মনে। সংবাদপত্রে আসন্ন যুদ্ধের বিপদের কথা লেখালেখি চলছে। ভিয়েনার পথে জার্মান-বাহিনী টহল দিয়ে গেছে। হিটলারের পরবর্তী অভিযান সম্বন্ধে সবাই জল্পনা-কল্পনা করছে, কাফেতে বসে গলা ভেঙে ফেলছে তর্ক করে, আর তারপর ঘুমুতে যাচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে। ১৯৩৮-এর অস্বাভাবিক রকমের শীতার্ত এই বসন্তে পারী নিশ্চিন্ত আর বিভ্রান্ত, পরিতৃপ্ত আর অসন্তুষ্ট।

ইতিমধ্যে ব্রতেই নানা কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। মঁতিনির ওখানে যে সব বন্ধুদের সঙ্গে তার দেখা শোনা হয়, তারা তার এই বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের কথা কিছুই জানে না। তার মতে যা কিছু খারাপ তারই মূলে রয়েছে—যাকে সে বলে মজুর শ্রেণীর প্রতি 'তোষণনীতি'। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে পুরো একটি বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ার কাজে লাগিয়েছে নিজেকে। সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর ভার সে দিত গ্রিসনেকে। সামরিক বিভাগের ছ-টি উড়োজাহাজে গ্রিসনেই আগুন লাগিয়েছিল, আর একটা রেলের সুড়ঙ্গ-পথে টাইম-বোমা রেখে এসেছিল। ধনিক সম্প্রদায়কে ভয় দেখাবার জন্যে ব্রতেই 'মালিক-সমিতি'র বাড়িটা উড়িয়ে দেবার ভার দিয়েছিল গ্রিসনের ওপর। বোমা-বিস্ফোরণে বাড়িটার সামনেটা ধ্বসে পড়ে, আর একটা দারোয়ান মারা যায়।

এই সব গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার জন্যে দক্ষিণপন্থীদের কাগজগুলো কমিউনিস্টদের দোষ দিল। কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে ভীইয়ার সাংবাদিকদের বলল, 'এই সব গোলমাল সৃষ্টির ধরনটা এখনো ঠিকমতো নির্দিষ্ট করা যায়নি।' পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে যারা, তারা কড়া ব্যবস্থার দাবী জানাল। তাদের শান্ত করবার জন্যে ভীইয়ারকে এক 'ষড়যন্ত্র আবিষ্কার' করতে হল। অবশ্য, এ ব্যাপারে ব্রতেই আর 'মন্ত্রশিষ্য'দের অস্ত্রশস্ত্রের গোপনীয় গুদামটা যাতে খুব বেশি জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সে দৃষ্টি রাখল; কিন্তু পুলিশ এখান-ওখান থেকে গোটাকতক মেশিনগান খুঁজে বের করায় জন পঞ্চাশেক 'মন্ত্রশিষ্য'ও গ্রেপ্তার হল। ভীইয়ার শেষ পর্যন্ত বলল যে ওই ষড়যন্ত্রটা একটা নিতান্ত ছেলেমানুষি ব্যাপার। ভীইয়ারের ইঙ্গিতে খবরের কাগজগুলো চক্রান্তকারীদের নাম দিল 'কাগুলার'—অসামাজিক হা-ঘরেদের দল, যারা মধ্যযুগীয় মুখোস আর ঠুলী পরে। চেম্বারের অধিবেশনে ব্রতেই অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে ঘোষণা করল যে গভর্নমেণ্ট খাঁটি দেশভক্তদের ওপর নিষ্ঠুর দমননীতি চালাচ্ছে; ফলে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা সবাই মুক্তি পেয়ে গেল।

এবারে ব্রতেই তার কলাকৌশল বদলে ফেলতে মনস্থ করল। বোমা-টোমা ছেড়ে সে এবার ঢুকল পার্লামেণ্টের কূটচক্রান্তে—আন্তর্জাতিক জটিলতা তাকে সাহায্য করবে সরকার পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভাঙন ধরাতে, এই আশায়। পারীর দেওয়ালগুলো আবেদনে ছেয়ে গেল: 'পপুলার ফ্রন্ট ফ্রান্সকে যুদ্ধের পথে টেনে নিয়ে চলেছে!' ব্রতেইর বন্ধুরা চলে গেল গ্রামে গ্রামে 'শান্তির আদর্শ রক্ষায়' চাষীদের প্ররোচিত করবার জন্যে। সাধারণ নিয়ম-মাফিক মন্ত্রীত্ব-সংকট তো লেগেই ছিল। র‍্যাডিকালরা সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে: ব্লুমটা ভারী হুঁশিয়ার—মুনাফার ওপর কর বসিয়ে লোকটা বেশ কিছু কামিয়ে নিতে চায়! সে রকম হলে, তেসাই হয়ত অগ্রণী হবে সবচেয়ে। সুতরাং ব্রতেই গিয়ে দেখা করল সেই বৃদ্ধ আইনজীবীর সঙ্গে, তার বক্তৃতার প্রশংসা করল, আপ্যায়িত করল কাঁচা হাঁসের কাবাব আর পাখির ঝোল খাইয়ে। তেসা খাবারগুলোর প্রশংসা করল, কিন্তু মনে মনে হুঁশিয়ার ছিল সে, এমন কি, ভীইয়ারের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলল যে, সমাজতন্ত্রীরা এবার সাচ্চা ফরাসী হয়ে

উঠেছে। বোধহয় সে বুঝেছে যে, নিজের জয়লাভটা আসন্ন, তাই সমাজতন্ত্রীদের ভোট পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চায়; কিংবা হয়ত সে বামপন্থী র‍্যাডিকালদের খুশি করতে চায়—বিশেষ করে ওই অতি-উগ্র ডেপুটি ফুজে-কে—যে ব্রতেইকে খোলাখুলিই হিটলার-পন্থী বলে থাকে।

বোমা ফাটিয়ে বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে মন্ত্রীত্বের অবসান ঘটানো অবশ্য অনেক শক্ত কাজ। কোন্ কোন্ নতুন শক্তির সাহায্য সে পেতে পারে তার একটা তালিকা ব্রতেই করে ফেলল। গ্রিসনে আর তার 'বর্মধারী'র দল ইদানীং বেকার হয়ে পড়েছে। ব্রতেই বন্ধুত্ব পাতালো দুকান আর গ্রঁদেল্-এর সঙ্গে—এই ডেপুটি-যুগলের খানিকটা নাম-ডাক আছে, মঁতিনিদের বাড়িতে যাতায়াতও আছে। দুজন কিন্তু উলটো স্বভাবের লোক। দুকান্ হল মফস্বল অঞ্চলের কোনো প্রাক্তন সৈনিকের ছেলে। শৈশব কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু সমাজতন্ত্রী আন্দোলন থেকে সে নিজেকে দূরে রেখেছে। বীর-প্রসবিনী, সৌন্দর্যপ্রিয় ফ্রান্সই তার আদর্শ; জোয়ান-অফ-আর্কের বীরত্ব-গাথা, রঁীম্স্ আর শার্ৎর ধর্মমন্দিরের স্রষ্টা যারা সেই সব অজ্ঞাত ভাস্করদের শিল্প-কীর্তি, আর সমগ্রভাবে জাতি-সম্বন্ধে গৌরববোধ তার কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করে। গত যুদ্ধে বৈমানিক হিসেবে কাজ করে সে ভীষণভাবে আহত হয় আর দু বার পদক পায়। তারপরে সে রাজনীতিতে ঢুকেছে, আর প্রচার করেছে—যাকে সে বলে—'সামগ্রিক জাতীয়তাবাদ।'। আল্প্স্ অঞ্চলের কোনো একটি নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে সে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি হয়ে এসেছে। চেম্বারে একেবারে ডান দিককার চেয়ারে সে বসে আর মাঝে মাঝে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রকমের বিবৃতি দিয়ে দক্ষিণপন্থীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে। যেমন একটা বক্তৃতায় সে বলে বসল, 'যদি আমাদের আর একটা নতুন কমিউন-এর বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তিএর-এর দুমুখো নীতি গ্রহণ করার চেয়ে প্রতিরোধকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াই আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।' প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স দুকানের—রাশভারী স্বভাব, কুৎসিত চেহারা, আর তোতলা কথা। উত্তেজিত হয়ে উঠলে এত দ্রুত কথা বলে যে তার আত্মীয়দের পক্ষেও বক্তব্যটা বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশ্য চেম্বারে বক্তৃতা দেয় সে ক্বচিৎ কখনো, তবু তার প্রতিপত্তি আছে খুব। ব্যক্তিগত সম্ভ্রমবোধ আর বিদ্যাবত্তার জন্যে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে সে—ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বিমান-বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুকান অন্যতম এবং বিমান-বাহিনী কমিশনের কাজকর্ম সেই পরিচালনা করে। পপুলার ফ্রন্ট ফ্রান্সকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে—এই বিশ্বাস থেকে সে ব্রতেইর সঙ্গে যোগ দিল। তার সঙ্গে মানিয়ে চলাটা হল ব্রতেইর চেষ্টা, জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতার একটা কথাও সে তার সামনে উচ্চারণ করল না।

দুকান পার্লামেণ্ট আর সামরিক মহলে সুপরিচিত, কিন্তু গ্রঁদেলকে জানে গোটা দেশের লোক। তরুণ, সুদর্শন গ্রঁদেল, রোমান নাক আর স্বপ্নাতুর নীল চোখ, স্যাঁ-জুস্ত্-এর প্রতিকৃতির মত দেখতে। খুব ভাল বক্তা সে—প্রতিপক্ষের লোকরাও মুগ্ধ হয়ে তার বক্তৃতা শোনে, যেন বুলবুল পাখির গান শুনছে। গ্রঁদেল ছিল—যাকে বলে, 'শিশু-বিস্ময়'—অল্প বয়সেই চমৎকার বেহালা বাজাতে পারত। যুদ্ধ বিরতির পরে তার বাবা ফাট্কা বাজারের দালালী করে প্রচুর টাকা আয় করেন, কিন্তু অল্প কিছু-কাল পরেই ভদ্রলোক ফতুর হয়ে যান; ফলে গ্রঁদেলকে বেরুতে হয় জীবিকার সন্ধানে। 'দারিদ্র্যের অধ্যাত্মতত্ত্ব', 'মহাব্যোম বাত্যা' ইত্যাদির ওপর কয়েকটি প্রবন্ধ আর গোটাকতক সমাজতাত্ত্বিক রূপক-নাট্য লিখেছিল সে। কয়েক বছর বাদে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ

দিয়ে কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করে সে খুব সাফল্য অর্জন করে। তারপরে চেম্বারে নির্বাচিত হয়ে হঠাৎ ঘোষণা করল যে, ব্লুম আর ভীইয়ারের আন্তর্জাতিকতায় সে বীতশ্রদ্ধ এবং একজন খাঁটি ফরাসী হিসেবে আর ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে মার্কসের চেয়ে প্রুধোঁর ওপরই তার ভরসা; অন্য লোকের নির্দেশে চলতে সে রাজি নয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রঁদেলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। র‍্যাডিকাল, রিপাব্লিকান, সমাজতন্ত্রী, আর গণতন্ত্রী দলের লোকরা তাকে পাবার চেষ্টায় ঘুরতে থাকল। গ্রঁদেল নিজেকে 'নির্দলীয় সমাজতন্ত্রী' বলে ঘোষণা করল, কিন্তু চেম্বারে ভোট গ্রহণের সময় সে সর্বদা দক্ষিণপন্থী বিরোধী-দলের পক্ষ নিত—সুতরাং ব্রতেইর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল তার। গ্রঁদেলের শত্রুও ছিল কিছু কিছু। উদীয়মান তরুণ ডেপুটি হিসেবে তার খ্যাতি ক্ষুন্ন হতে পারে—এমন কিছু আলোচনা পার্লামেন্টের লবী মহলে উঠলেই উৎসুক শ্রোতার দল জুটে যেত। জার্মান দূতাবাসের জনৈক পদস্থ ব্যক্তির কাছে সে আজকাল একটু বেশি যাতায়াত করছে—এরকম একটা কথা বলাবলি হচ্ছে। এমন কি, শোনা যাচ্ছে যে র‍্যাডিকাল ফুজে নাকি গ্রঁদেলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে কতকগুলো দলিলপত্রও জোগাড় করেছে। এই সমস্ত কানাঘুষোর উত্তরে গ্রঁদেল কেবল তার সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল উচ্চকিত করে। 'ওটা অত্যন্ত পুরনো কৌশল,' সে বলে, 'প্রতিদ্বন্দ্বীর গায়ে কালি ছিটাও, আর গণ্ডগোল পাকিয়ে তোল! সময় এলে আমিই প্রমাণ করে ছাড়ব—ওই ফুজে লোকটা মস্কোর দালাল।'

বছর তিনেক আগে গ্রঁদেল একটি সুন্দরী দো-আঁসলা মেয়েকে বিয়ে করেছে। নাম মারি, কিন্তু সবাই তাকে ডাকে 'মুশ' বলে। গ্রঁদেল সর্বত্র তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়—লোকে ওদের উল্লেখ করে 'মানিকজোড়' বলে।

গ্রঁদেলের সঙ্গে মঁতিনিদের বাড়িতেও মুশ যায়—কিন্তু সাধারণ আলাপ আলোচনায় সে যোগ না দিয়ে পুরনো ছবির অ্যালবামে চোখ বুলোয়। যোসেফিন ওকে মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে; মুশ্ মাঝে মাঝে লাইব্রেরীর দরজাটার দিকে তাকায় আর লুসিয়ঁর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই তার মুখের ভাবটা বদলে যায়।

ব্রতেইর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মঁতিনি অর্থসাহায্য করছে। ডালকুত্তার মতো মুখ, ভয়ানক রাশভারী কড়া মেজাজ তার। কবে যে সে তার বাবার বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে সেই আশায় যোসেফিন দিন গুনছে; পল মরাঁ-র কোনো বই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কিংবা তার মেয়ে বড়ো বেশি লিপ্স্টিক্ ব্যবহার করে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মঁতিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা ঝেড়ে যোসেফিনকে উত্যক্ত করে। মোটা বুদ্ধি, গোঁয়ার স্বভাব এই মঁতিনির। মজুরদের ব্রতেই শায়েস্তা করে দিতে পারবে বলে তার বিশ্বাস। গত বছরের লাভের অঙ্কে তার অভিযোগের কোনো কারণ ঘটেনি, কিন্তু তার আত্মাভিমানে ঘা লেগেছে: 'চল্লিশ ঘণ্টা হপ্তা, বটে! ছোটলোক আর বলে কাকে! আমি কত ঘণ্টা কাজ করি তার হিসেব আছে? তারপর তো আমাকে কতরকম ঝুঁকি নিতে হয়, লোকসান হলে সে তো আমাকেই সইতে হয়। ওদের তো মজুরি পেলেই চুকে গেল। যতো সব পরগাছা!' দেসেরের মতো মঁতিনি মজুরশ্রেণীকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখে না, তার কাছে মজুরেরা হচ্ছে ভয়ংকর সর্বভুক পশুপাল। ওদের লোভ আর নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে তার অভিযোগের বিরাম নেই।

আজকের এই বিশেষ সান্ধ্যসম্মেলনে মঁতিনি আর কাউকে মুখ খোলবার অবকাশ দেয়নি, অনর্গল বকে চলেছে। মজুরদের মারমুখী হয়ে ওঠার কথা। মজুরেরা যে

আলাদা হাত-মুখ ধোবার বন্দোবস্ত দাবি করেছে, সে-কথাটা এই নিয়ে একশোবার বলল।

'এর পরে ওরা স্নানঘরের দাবি তুলবে, দেখে নিও। ভাবো একবার—জার্মানরা যেখানে দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা খাটছে, আমাদের মজুররা কিনা তখন বেড়াতে যেতে চায় সমুদ্রের ধারে!'

ভীষণ রাগে এক ঝলক কেশে নিল সে। বাক্যস্রোতে এই বিরামের সুযোগটুকু নিল ব্রতেই। সে এসেছে পার্লামেন্টের আসন্ন সংগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করতে, হাত-মুখ ধোবার বন্দোবস্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে নয়। পার্লামেন্টে দুকানের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে, মর্তিনির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্রতেই নাৎসী-বিভীষিকার ওপরে তার যুক্তিটা দাঁড় করাল, 'মে মাসে জার্মানরা চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর চাপ দিতে থাকবে বলে মনে হয়। তার আগেই আমাদের একটা সত্যিকারের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা চাই-ই। ব্যক্তিগতভাবে, তেসা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই, অবশ্য যদি সে কমিউনিস্টদের ভোট অস্বীকার করে তবেই।'

লুসিয় ভুরু কুঁচকে তাকাল। অনেকদিন থেকেই তার সন্দেহ হয়েছে, ব্রতেই আজকাল ষড়যন্ত্র ছেড়ে পার্লামেন্টের কূটনীতিতে নেমেছে; সে যাই হোক, দেশের ত্রাণ-কর্তা হিসেবে তার বাবাকে দাঁড় করানো হবে বলে সে আশা করেনি। শুকিয়ে আসা বাগানে ঘটা করে বেড়া দিয়ে লাভ কি! হাই চেপে ভাবল লুসিয়। মুশের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছে হয়েছে তার।

গ্রঁদেল ব্রতেইকে সমর্থন করল, 'তেসা অবশ্য অনেক কম শয়তান। তবে ঐ ফুজের দল থেকে ওকে সরিয়ে নিতে হবে। কাল শুনলাম, ফুজে ওই জাল দলিলগুলো তেসার হাতে তুলে দিয়েছে। আমি তখুনি তেসার সঙ্গে দেখা করে ওকে শুধোলাম, 'আমার বিরুদ্ধে ওদের অভিযোগটা কি দয়া করে বলো।' ভারি মিষ্টি ব্যবহার করল তেসা, কিন্তু কোনো কৈফিয়ৎ দিতে রাজি হল না। ওদের ফন্দিটা স্পষ্ট, বৈদেশিক-বিভাগে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলা। দেশের মনোযোগ অন্য বিষয়ে নিয়ে যাবার এ একটা চিরন্তন উপায়। ব্লুমকে বাঁচাবার জন্যে ওরা সবচেয়ে টাটকা সোরগোলটাকে পাকিয়ে তুলতে চায়।'

বিরক্ত হল দুকান, 'ফুজেটা এত ছোটলোক হবে বলে ভাবিনি, ভালো লোক বলেই ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছিল। ভের্দাঁ-তে লড়াই করেছিল সে। আর এখন কিনা লোকটা একজন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছন থেকে ছোরা মারতে চায়! ওদের আসল চেহারাটা তোমায় কিন্তু ফাঁস করে দিতেই হবে, গ্রঁদেল। বক্তা হিসেবে তোমার প্রতিভা...'

'কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, এই যা আফ্‌সোস্‌। মুশ্‌কিল হল গিয়ে, ওই জালিয়াতির বিষয়টা জানতে না পারলে ঠিকমত তৈরি হয়ে নিতে পারছি না।'

ব্রতেই ব্যাখ্যা করল, 'তেসার কাছে আমিও ব্যাপারটা জানবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু ও কেটে পড়ল; দু নৌকোয় পা রাখছে ও। কিন্তু তেসা আমার পুরনো বন্ধু। আর নির্বাচনে জয়লাভের ব্যাপারে আমার কাছে ও ঋণী। তা ছাড়া এই সব গুজবে ওর নিজেরও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। কিন্তু ওর কাছে আর কি আশা করা যায়? দলের বিধি-নিয়মে বাঁধা পড়েছে লোকটা,—তান্ত্রিকদের আর এরিও-র ক্রোধ জাগাতে ভয় খাচ্ছে।'

অস্পষ্টভাবে হাসল লুসিয়, তারপর হঠাৎ বলল, 'আমার বাবা খাঁটি মানুষ, কিন্তু ওঁর বুদ্ধিটা মোটা।'

ভোটের হিসেব-নিকেশে লেগে গেল ডেপুটিরা। র‍্যাডিকালদের মধ্যে প্রায় সত্তর-জন ব্লুমের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। সরকার পক্ষের সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় ভাঙন ধরেছে—কিন্তু

এই ভাঙনটা চলেছে খুব ধীরে। এদিকে আর অপেক্ষা করার সময় নেই, এক মাসের মধ্যেই জার্মানরা কাজ শুরু করে দেবে।

'সেনেটররাই বাঁচিয়ে দেবে শেষ পর্যন্ত। ব্লুমকে এক হাত নেবে বলে কাইও কথা দিয়েছে।'

দুকান বিড়বিড় করল, 'কাইওটা একটা খেঁকশেয়াল, আগে থেকেই হার স্বীকার করে বসে আছে ও।'

ভবিষ্যৎ সরকারের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। প্রথম শর্ত : তেসাকে কমিউনিস্টদের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। সুদেতেন-সমস্যার ব্যাপারে একটা সুদৃঢ় নীতি অনুসরণ করা চাই, কিন্তু একেবারে অনমনীয় হলেও আবার চলবে না, এমন সব সালিশী মানতে হবে যাতে দু পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সরকারকে অবিলম্বে স্বীকার করে নিতে হবে। লাভালকে রোমে পাঠাতে হবে, মুসোলিনির সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া খুব জরুরি দরকার। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, বিমান-যন্ত্র শিল্পে আমানত-খাটানো চালু করা—এই দুটোর ওপর দুকান জোর দিল; আর চাই সত্তর-ঘণ্টা সপ্তাহ।

মাঁর্তিনকে খুশি করবার জন্যে ব্রতেই যোগ করে দিল, 'মজুররা যদি কারখানা দখল করে, তাহলে সশস্ত্র ফৌজ বহাল করতে হবে।'

কিন্তু এই বিষয়টার ওপর মাঁর্তিন ভিন্নমত হল, 'না। গ্যাস ছাড়তে হবে। স্রেফ্ গ্যাস, আর কিছু না! ধোঁয়া ছেড়ে তাড়াও ওদের ইঁদুরের মতো! হ্যাঁ, জাহাজ-তৈরির কারবারটাও বাড়ানো চাই—ওটা ধরো হিসেবের মধ্যে। আর চাই সন্ত্রাসবাদী কাজের জন্যে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা। 'সমিতি'র বাড়িতে বোমা ফেলেছিল যে শয়তানটা, সে এখনো ধরা পড়েনি। গিলোটিনের ব্যবস্থাই ওর পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত!'

মাঁর্তিনের ভারী মুখখানার দিকে ব্রতেই তাকাল : বোকাটা যে কি বলে ফেলবে কে জানে! জরুরি কাজ আছে বলে ব্রতেই উঠে চলে গেল।

অন্যেরা গিয়ে বসল ড্রয়িংরুমে। লুসিয়ঁর দিকে তাকাল যোসেফিন, লুসিয়ঁ কিন্তু যোসেফিনকে দেখতেই পেল না। মুসের পাশে বসে সে জিরোদু-র নতুন নাটক 'ট্রয়ের লড়াই হবে না' সম্বন্ধে গালগল্প জুড়ে দিল, 'নামটা খুব ভাল, ভয় ঘুচোবার জন্যে লোকে দেখতে যাচ্ছে।'

মুশ ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'বৃহস্পতিবারে। ও থাকবে না। আমি নিজেই তোমাকে ঢুকিয়ে নেব।'

দুকান সোৎসাহে গ্রাঁদেলের কাছে প্রমাণ করছিল যে সক্রিয় একটা নীতি গ্রহণের এই সময় : 'ইতালীর সপক্ষেই হোক বা বিপক্ষেই হোক, ও একই কথা। সুদেতেনদের সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু চেক্ ম্যাজিনো লাইন.........'

'বটেই তো। কিন্তু ভুললে চলবে না যে সুদেতেনরা জার্মান। আর, হিটলার ঘোষণা করেছে—পশ্চিমে তার আর কোন দাবি নেই.........'

উত্তেজিত হয়ে উঠল দুকান। চিৎকার করে কি একটা বলল, কিন্তু কি যে বলল বুঝে ওঠা অসম্ভব; মুখের মধ্যে রবার চিবুচ্ছে বলে মনে হল।

গ্রাঁদেল হেসে বলল, 'ঠিক কথা।'

হলঘরটায় এসে যোসেফিন লুসিয়ঁকে ধরল। ওর দিকে না তাকিয়েই সে তাড়াতাড়ি বলে গেল, 'লুসিয়ঁ, তোমার যদি কিছু হয়, তাহলে আমাকে ভুলো না—

তোমার জন্যে আমি করতে পারি না এমন কাজ নেই।'

কথাটা লুসিয়র মনকে নাড়া দিল, কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিয়েছে : 'ধন্যবাদ। এখানে বাইরে বড়ো শীত, তোমার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।'

চোখে জল এসে গেছে যোসেফিনের : 'তুমি কি মানুষ!'

বাইরে ঠান্ডা পুব-বাতাস বইছে। কোটের কলার তুলে দিল লুসিয়। ব্রতেই, যোসেফিনের নির্বোধ কোমলতা, আর মুশ—এ সব তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর!

'পাড়া-সমিতি'গুলির কোন একটাতে এসে ব্রতেই অব্রি-কে খুঁজে বের করল। ভূগর্ভ-রেলপথের টিকিট-বাবু এই অব্রি, চেহারাতেই বিতৃষ্ণা জাগায়, অন্যের ক্ষতি সাধনে অতি-তৎপর, কোনো সাংসারিক বন্ধন নেই তার। 'শোন, অব্রি' ব্রতেই বলল, 'একজন বেইমানকে সরিয়ে দিতে হবে আমাদের।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অব্রি। বহুদিন ধরে সে তার কৃতিত্ব দেখাবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। একবার কেবল তাকে একটা কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল— অতি নোংরা একটা কাজ—এভিনু ভাগ্রাম-এ একটি মেয়ে 'লুমানিতে' বিক্রি করছিল, তাকে গিয়ে মেরে এসেছিল অব্রি।

'আপনার হুকমের অপেক্ষায় আছি, কর্তা।'

'ওই 'বর্মধারী' গ্রি-নেকে খতম করে দিয়ে আসতে হবে তোমায়। একটুও যেন জানাজানি না হয়। তারপরে এই জিনিসটা ওর কাছাকাছি রেখে আসবে.........' পকেট-বইটা খুলে ব্রতেই একটা কমিউনিস্ট পার্টি-সঙ্ঘের কার্ড বের করে দিল।

'তাই হবে, কর্তা'—গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলল অব্রি।

বাড়ি ফিরে ব্রতেই তার চিঠিপত্র খুলল না, স্ত্রীর প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না। পাতলা ঠোঁটদুটো নড়ছে কি নড়ছে না এমনি ভাবে প্রার্থনা উচ্চারণ করল। গ্রি-নের জন্যে তার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু আর কিই বা করা যেত? সাদা পাতায় নতুন অধ্যায় লেখা শুরু হবে— গ্রি-নের মতো লোক দু-একবার মদ টেনেই সব ঘুলিয়ে দিতে পারে......অবশ্য খাঁটি মানুষ এই গ্রি-নে, কিন্তু মুর্খ। 'বর্মধারী আমি' বলে বড়াই করে। এহেন লোকের জন্যে স্বর্গের দুয়ার খোলা আছে। কিন্তু তার—ব্রতেইর—ভবিষ্যত কি? বড়ো বেশি ঝুঁকি নিয়েছে সে নিজের হাতে; অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে। পরলোকগামী আত্মার শান্তির জন্যে আর একবার প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ করে সে স্ত্রীকে ডাকল :

'গ্রি-নে বলে কাউকে কোনদিন আমি চিনি না, বুঝেছ?'

কোমরে জড়ানো তোয়ালেটায় হাত মুছল মাদাম ব্রতেই, স্বামীর প্রিয় একটা খাবার তৈরি করতে করতে সে উঠে এসেছিল। ব্রতেইর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল 'পিশাচ!'

চুপ করে রইল ব্রতেই।

দুই

ভেরনুই স্টেশন থেকে কাদা-ভরা রাস্তাটা বেয়ে গ্রি-নে চলেছে পুরনো বাগান বাড়িটার দিকে। অনেকদিন ধরে একটানা বিশ্রী আবহাওয়ার পর এই প্রথম উজ্জ্বল

একটা দিন এসেছে। 'শিগ্‌গিরই ইস্টার আসছে', গ্রি-নে ভাবে। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে গরম লাগায় ওভারকোটের বোতামগুলো খুলে ফেলে। বড়ো বড়ো গাছগুলোর নীচে 'লিলি-অফ-দি-ভ্যালী'র সরু সরু পাতাগুলো যেন সবুজ আলোয় জ্বলছে। আর মাসখানেকের মধ্যেই পারীর লোকেরা এখানে আসবে বনভোজন করতে। দৈনন্দিন শান্তিপূর্ণ মুহূর্তগুলি গ্রি-নেকে বিরক্ত করে। ব্যাপারটা না বুঝলেও, সে মনে মনে অন্যের ভাবনামুক্ত জীবনকে হিংসা করে। কিন্তু আজকের এই উজ্জ্বল রোদ আর বনে বনে বসন্তের স্পর্শ তার মনটাকে প্রসন্ন করে তুলছে। আর কয়েকদিন বাদে যে প্রণয়ী-যুগল এখানে আসবে 'লিলি-অফ্-দি-ভ্যালী' তুলতে, তাদের কথা ভাবে গ্রি-নে।

ব্রতেই এবার তাকে কোথায় পাঠাবে—স্পেনের ফ্রন্টে? ব্রিতানিতে? ছেলেবেলা থেকেই গ্রি-নে ফ্রান্সময় ঘুরে বেড়িয়েছে—ধোঁয়াটে রেলগাড়ির গুমোট গরমে, জংশন স্টেশনের কনকনে ঠাণ্ডায়, তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে। সাধারণ টেবিলে বসে টহলদার ব্যবসায়ীদের বহুবার-বলা গালগল্প শুনতে শুনতে খাওয়া, ওলিওগ্রাফ-ছবি টাঙানো নোংরা দেয়ালওলা ঠাণ্ডা ঘরে তেলচিটে বিছানায় শোয়া—এ-সবে গ্রি-নে অভ্যস্ত। ঘুরে বেড়ানোটা তার খুব ভালো লাগে না, কিন্তু সংসার-প্রতিষ্ঠ জীবনে নিজেকে কল্পনা করতেও বাধে। ব্রতেইর দেওয়া বিপজ্জনক কাজগুলো পালন করার ব্যাপারে তার আগে-কার পেশা তাকে সাহায্য করেছে। সপ্তাহখানেকের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেও তার বাড়িওয়ালী মোটেই অবাক হয় না। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত গোটা ফ্রান্স গ্রি-নের জানা। আড্ডা দেবার মতো জায়গা, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল, আর স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে সর্বত্র। গত চারমাস ধরে সে বসে আছে। অব্রির চিঠিখানা পেয়ে সে অতি উল্লসিতও হয়নি, মন-ভারও করেনি। যেমন তেমন করে কয়েকটি জিনিস সুটকেশে ভরে নিয়েছে, ওপরে রেখেছে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি, পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছে রিভলভারটা; হোটেলওয়ালীকে বলেছে, 'একবার আনেসি-তে যাচ্ছি যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে!' তারপর মনে মনে ভাবছে 'যন্ত্রপাতিই হোক আর বোমাই হোক, কিই বা এসে যায়?' দু বছর আগে যেটা তার কাছে উত্তেজনা আর রঙীন কল্পনায় ভরা জুয়ো-খেলা বলে মনে হত, এখন সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঁধাধরা কাজ; যোগ্যতার সঙ্গে সে তার কর্তব্য পালন করে, কিন্তু সে উৎসাহ আর নেই।

এপ্রিলের জ্বলন্ত রোদে ভরা দুপুর আর পাখিদের উল্লাসভরা ডাকডাকি কোমল করে তুলছে গ্রি-নের মন—'মন্ত্রশিষ্য'দের কথা ভুলে সে ভাবছে আনেসি-র হোটেলওয়ালার মেয়ে কোঁকড়া-চুল লুলুর কথা। যা-হোক একটা নাম করে দেবার জন্যেই যে সে তার বাড়িওয়ালীকে আনেসিতে যাবার কথা বলেছে, তা নয়; দিবাস্বপ্নের ঘোরে ওই নামটা বেরিয়ে গেছে তার মুখ থেকে। সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে, লুলুকে বিয়ে করে, একটা কাফে কিংবা ছোট্ট হোটেল খুলে বসতে পারলে কী সুন্দর হত! কিন্তু এ সবই স্বপ্ন! পয়সা জমানো গ্রি-নের ধাতে নেই, ব্রতেইর কাছ থেকে যা পায় তা নতুন পোশাক বানাতে আর লুলুকে উপহার কিনে দিতেই খরচ হয়ে যায়।

অব্রি গ্রি-নের অপেক্ষায় ছিল। আধ-ভাঙা বাগানবাড়িটা অ্যালডার গাছে ঘেরা, সাদা দেওয়ালগুলোর গায়ে প্রণয়ীরা নাম আর তারিখ লিখে রেখে গেছে। ছোট পাথরের আসনটার ওপর বসল অব্রি, তারপর পাশ ফিরল রোদের দিকে। বসন্তের মিষ্টি ছোঁয়াচ তার মনেও লেগেছে। সাবান আর এসিডের একঘেয়ে গন্ধে ভরা সুড়ঙ্গ-পথে মাসের পর মাস কাটাবার পর এখানে এই গাছের সবুজ ছায়ার নীচে ছোট্ট নদীটির ধারে বসে

নন্দনকাননের আস্বাদ পাচ্ছে অব্রি, ভুলে গেছে অপেক্ষা করার কারণটা। ফিট্‌ফাট্‌ পোশাক পরা সদ্য দাড়ি-কামানো গ্রি-নেকে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে—রূপকথাটি ফুরলো।

করমর্দন করে অব্রি বলল, 'বোস। 'বর্মধারী' দেলমাস্‌ আসছে। ওর কাছেই সব নির্দেশ পাওয়া যাবে।'

একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে নিল গ্রি-নে : নতুন পোশাকটা সে ময়লা করতে চায় না।

'স্যাঁতসেঁতে ভাবটা নেই, জোর রোদ্দুর উঠেছে,' বলল অব্রি, 'তবু সাবধান থাকা ভালো, ঠান্ডা লাগিয়ে লাভ নেই।'

ছোট্ট নদীটির রূপোলি ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে রইল ওরা নীরবে, আর ধীরে ধীরে মধুর একটা তন্দ্রার ভাব আচ্ছন্ন করল ওদের।

'কর্তা আসছেন না?' গ্রি-নে জিজ্ঞেস করল।

'না। শরীরটা ভাল নেই ওঁর। তবু চালিয়ে দিচ্ছেন কোন রকমে, এই আর কি।'

'ওঁর বয়স কত বলে মনে হয়?'

'ষাটের বেশি।'

'ছেলেটা মারা যাবার পর বড্ড বুড়িয়ে গেছেন উনি। দু বছর আগেকার কথা—বেশ মনে আছে আমার—হরতাল চলছিল একটা; ওঁর স্ত্রী কাঁদছিলেন। তারপর আমি যখন পৌঁছলাম তখন প্রার্থনা করছিলেন উনি...'

'হুঁ, সে এক দুর্দিন গেছে!...তারপর, তোমার খবর কি? বিয়ে করেছ তুমি?'

'না। তুমি?'

মুহূর্তের জন্যে অব্রির কুৎসিত মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সলজ্জ হাসিতে, 'এখনো করিনি,' বলল সে।

'তাহলে বিয়ে করার কথাটা ভাবছ, বলো? তা বেশ। আমি শিগ্‌গিরই বিয়ে করছি। আর্নেসিতে একটা খাসা মেয়ে পেয়েছি—চমৎকার মেয়ে। বাপ উকীল, কিছু সম্পত্তিও আছে। ওখানেই গিয়ে মনের মতো সংসার পাততে চাই। হোটেল কিনব একটা। ইংরেজরা এসে থাকবে, পয়সা আছে ওদের। কিছু নগদ টাকাও জমিয়েছি। মন মাতানো মেয়ে, চমৎকার গান গায়, চমৎকার গলা।'

লুলু জীবনেও গান গায়নি; কিন্তু একবার মিথ্যে কথা বলতে শুরু করলে গ্রি-নের পক্ষে থামা শক্ত। বোধহয় সে কেবল চাল দেবার জন্যেই বলছে না, নিজের স্বপ্ন-কাহিনীই বলে চলেছে সে। চারপাশের বন জুড়ে পাখিদের ডাকাডাকি উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীর শৌখিন হালকা বাদামী রঙের জুতো-জোড়ার দিকে তাকিয়ে অব্রি একটু যেন দুঃখের সঙ্গে ভাবল, 'এহেন লোকের পক্ষে বিয়ে করা সহজ। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবে কে? কোন বুড়ী পেত্নী হয়তো...'

গ্রি-নে বলল, 'কই দেলমাস্‌ না কি যেন নাম বললে, কি হল তার? পথ হারিয়ে ফেলল নিশ্চয়।'

'এসে যাবে' বলল অব্রি।

অব্রি যে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে, তা নয়। সব ভেবে রেখেছে সে আগে থেকে, কিন্তু যে জন্যেই হোক, ধীরে সুস্থে এগুচ্ছে সে। মদের বোতলটা বের করল গ্রি-নে

আর অব্রি বের করল খানিকটা রুটি আর মাংস—সারাদিনের খাটুনির কথা ভেবে এটা অব্রি আগে থেকেই সঙ্গে এনেছিল। রবারের মতো নরম মাংসটা গ্রিনে বেশ আরাম করে খেল, এতখানি হেঁটে এসে বেশ খিদে পেয়ে গেছে তার। গ্রিনের বোতলটা থেকে এক ঢোঁক খেয়ে অব্রি তার শুভকামনা করল।

ব্র্যাণ্ডির প্রভাবে আরও মোলায়েম হয়ে পড়ল গ্রিনে। ঘুম পাওয়ায় হাই তুলল সে। নদীর জলের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নাতুরের মত বলল, 'মাছ ধরতে খুব ভালো লাগে আমার। আনেসির ট্রাউট্ মাছগুলো ঠিক এতো বড়—এই দেখো?—' তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

টুপি খুলে পড়ল এক পাশে, ঠোঁট দুটো আধ-বোজা। তার মুখখানা এমনিতে ফ্যাকাশে, মাংসপেশীর খিঁচুনিতে কুঁচকে-থাকা; সেই মুখখানাকেই এখন দেখাল শান্ত, রোদ লেগে গোলাপী। এমন কি একটা ছেলেমানুষি ভাব ফুটে উঠেছে গ্রিনের মুখে। অব্রি তবু দেরি করছে। আর সে নিজের একাকীত্বের কথা ভাবছে না, দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেছে, নিজেই নিজেকে বলে চলেছে, 'এইবার!' তীব্র একটা বিরক্তি পেয়ে বসল, আর আগেকার আরামের ভাবটা চলে গিয়ে কেমন একটা ঝিমুনি এল। চোখমুখ পাকিয়ে কটমট করে তাকায় সে। এই শালা ব্র্যাণ্ডিটা! আর ওই পড়ে ঘুমুচ্ছে শুয়োরের বাচ্চাটা! হোটেল খুলতে চায়! বড়ো সুখ! 'ভিক্টোরিয়া' কিংবা 'শান্তি-কুটীর' কেমন? কিংবা হয়তো লোকটা সত্যিই বেইমানি করেনি। হয়তো সংসার পাততে চেয়েছিল। এসব কাজের চেয়ে মাছ-ধরাটা নিশ্চয়ই ঢের সুখের। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু অব্রির জীবনে কোনো সুখ শান্তি নেই কেন? এই লোকটার চেয়ে সে কম কিসে? কেন এই মারধোর আর খুন-জখম?—বেজন্মাগুলো! এই প্রচণ্ড গালটা যার উদ্দেশেই দেওয়া হয়ে থাক, অব্রির মন এতেই শক্ত হয়ে উঠল। নিদারুণ বিদ্বেষে যেন জ্বালা করে উঠল গলাটা। তারপরে সে বের করল তার ছোরাখানা।

দু মিনিট বাদে—বর্মধারী গ্রিনে মারা গেছে বলে নিশ্চিত হবার পর—ব্রতেইর দেওয়া কার্ডখানা অব্রি পাথরটার পাশে সেঁধিয়ে দিল। কার্ডটা জাক দেলমাস্-এর নামে। ওভারকোট, প্যাণ্ট আর হাত দুটো ভালো করে পরীক্ষা করার পর তাড়াতাড়ি হেঁটে চলল অব্রি। বসন্ত দিনের সমস্ত উৎসাহ তার উবে গেছে। রয়েছে খালি বিরক্তির ভাবটা। মাংসের কথা মনে পড়তে গা ঘুলিয়ে ওঠে। 'রবারের মত!' থুতু ফেলতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। বড়ো রাস্তায় বাসে চড়বার জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো মেয়ে—অব্রিকে দেখে ওরা হেসে ওঠে। একজন বলে, 'বড় আরামেই হেঁটে এসেছে বলে মনে হচ্ছে!'

জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে অব্রি বিড়বিড় করে, 'হারামজাদী!'

সন্ধ্যের পর 'আহত সৈনিকদের সংঘে' এসে ব্রতেইর কাছে রিপোর্ট করল সে।

'হয়ে গেছে'—বলল অব্রি।

ধন্যবাদ জানিয়ে ব্রতেই তাকে নিজের পাশে সোফাটায় বসাল। তারপর বলল, 'এই কাজের ভেতর দিয়ে তুমি সংগ্রামে দীক্ষিত হলে।'

'লোকটা কি সত্যিই বেইমানি করেছিল?'

দাঁড়িয়ে উঠল ব্রতেই।

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'তুমি যেতে পারো এবার।'

বেরিয়ে যাওয়ার সময় অব্রির দিকে তাকিয়ে ব্রতেই অস্পষ্টভাবে ভাবল, 'এ লোকটাকেও সরাতে হবে।'

পরদিন সকালে সমস্ত কাগজে গ্রি-নের ছবি বেরুল। খবরে বলা হল : দক্ষিণপন্থী হিসেবে লোকটা পরিচিত ছিল এবং ৬ই ফেব্রুয়ারির বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল। এক পয়সাও সে রেখে যায়নি, গরীব লোক সে; আর্থিক লাভের উদ্দেশে তাকে খুন করা হয়নি নিশ্চয়ই; কমিউনিস্টরা অবশ্য ঘোষণা করেছে যে জাক দেলমাস্ বলে কাউকে তারা জানে না, তবে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, 'ক্যাথলিক টহলদার-ব্যবসায়ী সমিতি'র একজন প্রভাবশালী সভ্য ও রাজনৈতিক বিরোধীকে ওরাই সাবাড় করেছে।

অব্রি খবরের কাগজ পড়ে না। ভেরনুই-বনের রহস্যময় ঘটনার কথা জনপ্রাণীর কাছেও সে উল্লেখ করেনি। রোজকার মতো টিকেট পাঞ্চ্ করার কাজটা করে যায় আর অসুস্থ লোকের মতো বারে বারে হাই তোলে। কাজের শেষে একটা অচেনা কাফেতে গিয়ে কড়া মদের হুকুম দিয়ে বসল। নেশাটা মাথায় চড়ে যায়। আরেক গেলাশ; আরো এক গেলাশ...

টুপি-মাথায় কয়েকটা লোক খাচ্ছিল পাশের টেবিলে। ওদের কথাবার্তা শুনতে চায়নি অব্রি, কিন্তু গ্রি-নের নামটা বারবার কানে আসতে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। গ্রি-নের অস্তিত্ব আর নেই, অব্রি শুনতে চায় না তার কথা। হাঁদাগুলো থামবে না মনে হচ্ছে।

'হুঁ, একটা কুত্তা কমলো, আর কি!...'

'কিন্তু ওরকম লোক যখন ফ্যাশিস্টদের দিকে যায়, তখন বুঝতে হবে ওরা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল ওকে...'

অব্রি উঠে গেল ওদের কাছে, চড়া গলায় বলল, 'মিথ্যে কথা! গ্রি-নেই হোটেল কিনতে চেয়েছিল, ওকে খুন করেছে কমিউনিস্টরা, তোদের মতো খুনে মেকী-গণতান্ত্রিকরা। বুঝেছিস, বেজন্মারা?'

একজন দাঁড়িয়ে উঠে মারল অব্রির মুখে। কাঁচের ঝন্ঝনানির মধ্যে অব্রি গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। কাফেটা চট্ করে ফাঁকা হয়ে গেল। বুড়ো ওয়েটারটা অনেকক্ষণ ধরে ভারী ভারী থালা, চামচে আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া তাসগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলল।

তিন

আগের দিন তেসার ষষ্টিতম জন্মদিনের উৎসব হয়ে গেছে। অজস্র চিঠি আর টেলিগ্রাম এসেছে—সবগুলোয় '৬০' অংকটা লেখা। ছোকরা উকীলরা ষাটটা মোমবাতিওয়ালা বিরাট একটা কেক উপহার দিয়েছে তাকে। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলন্ত মোমবাতিগুলোর অস্থির নীল শিখার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল তেসা। মনটাকে বেজার করে তোলবার চেষ্টা কচ্ছে সে; জোর করে ভাবতে চেষ্টা করছে, কতটা পথ সে পেরিয়ে এসেছে আর কত সামনে সেই পথের শেষ। কিন্তু এসব চিন্তা তার কাছে অবাস্তব। এত তারুণ্য আর সে কখনো অনুভব করেনি। ষাটের অংকটাকে সে দেখছে সুন্দর একটি লিপিচিহ্ন হিসেবে। এই তো সবে জীবন শুরু হল তার। এখন সে অবশ্য

বিখ্যাত আইনজীবী, কিন্তু এর পর সে হয়ে উঠবে দেশের অন্যতম নেতা। 'লতা' কাগজের পঞ্চম কলমের আদালত-সংবাদ থেকে একেবারে প্রথম কলমে তার নাম উঠে আসবে। চরম-পন্থার দিন কেটে গেছে, দেশ চায় শান্তি। পপুলার ফ্রন্টের বজ্রমুষ্টি কিংবা ব্রতৈইর রোমান সেলাম ক্লান্ত করে তুলেছে সবাইকে। লোকে চায় বন্ধুত্বমূলক করমর্দন। বড়ো আশায় চেয়ে রয়েছে তারা এই হাসিখুশি, ভোজনপ্রিয়, বাকপটু কিন্তু অতি সাবধানী সাংসারিক মানুষ তেসার দিকে।

হ্যাঁ, বড়ো সুন্দর এই দিনটা, যদিও পারিবারিক দুশ্চিন্তাও আছে নানারকম। বড়ো বড়ো সব ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়েও কোনো ফল হয়নি; ভিতেল-এ গিয়ে মাদাম তেসা কিছুদিন চিকিৎসা করিয়ে এসেছে, কোনো ফল হয়নি; ব্যারাম তার বেড়েই চলেছে, আজকাল আরও ঘন ঘন তার যন্ত্রণা দেখা দেয়। গতকাল উত্তেজনার ফলে যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল আমালির, আর আজকের এই সন্ধ্যায় জ্বলন্ত মোমবাতির দিকে তাকিয়ে তেসা যখন নিজেকে ফ্রান্সের বরপুত্র কল্পনা করছে, তখন ওষুধের গন্ধে ভরা নিজের অন্ধকার ঘরে শুয়ে আমালি অতিকষ্টে যন্ত্রণার কাতরানি চাপবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু স্ত্রীর অসুখ ছাড়াও অন্যান্য দুর্ভাবনা আছে তেসার : লুসিয়ঁটাকে শোধরানো গেল না। আমালি এখনো তাকে খোকা বলে ডাকে, যদিও এই 'খোকা'টির বয়স হল ঠিক চৌত্রিশ। রাজনীতিক জীবনে ঢোকার কোনো আশা আর ওর নেই। অকর্মা হতভাগাটা আজকাল এক অদ্ভুত রোজগারের উপায় ধরেছে : লুসিয়ঁ ইদানীং জোলিওর কাগজে ঘোড়দৌড়ের সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করে। শোনা যাচ্ছে, ও নাকি জকিদের কাছ থেকে যে সব খবর যোগাড় করে সেগুলো গোঁজামিল দিয়ে ছাপিয়ে লোক ঠকায় আর আসল খবরগুলোর ওপর বাজী জিতে জোলিওর সঙ্গে টাকাটা ভাগাভাগি করে নেয়। মন্ত্রীর ছেলের পক্ষে এই পেশাটা বাঞ্ছনীয় বলা চলে না। ছেলের সঙ্গে বকাবকি করে স্বাস্থ্য খারাপ করার ভয়ে তেসা ওর সঙ্গে কথা বলে না; খাবার টেবিলে দুজনে চুপচাপ বসে থাকে। লুসিয়ঁ মুখ খুললেই তেসা কোনো একটা কেলেঙ্কারীর আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে।

তেসার আরও বড়ো দুঃখের কারণ দেনিস। এখন তেসা বুঝেছে, স্নেহের ব্যাপারে যুক্তির কোনো দাম নেই। লুসিয়ঁর কথা ভেবে তেসা নিজের জন্যেই ভয় পায় : ও হয়তো তার মুখে চুনকালি দেবে।

লুসিয়ঁ মরে গেলে সে কাঁদবে, কিন্তু স্বস্তিও পাবে। দেনিসের বেলা তা নয়। দেনিস যে তার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, 'নোম' কারখানায় বাক্স-প্যাকিং-এর কাজ নিয়ে বাপের অপমান করেছে, আর গোয়েন্দা-পুলিশের বড়কর্তার কাছ থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী কি একটা কমিউনিস্ট সমিতির সভ্য হয়েছে,—এগুলো তেসার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। দেনিসের শরীরের জন্যে সে উদ্বিগ্ন : বড়ো কষ্টের মধ্যে দিন কাটছে ওর, বেশি খাটতে পারে না মেয়েটা; নিরর্থক ওই মিছিলগুলোতে যোগ দিয়ে হয়তো মারাই পড়বে কোনোদিন। তেসা দেনিসের যেটুকু খবর পায় তা পুলিশ কিংবা কোনো পেশাদার গোয়েন্দা মারফত। ওকে চিঠি লিখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনো উত্তর পায়নি; তেসার সঙ্গে ও কোনো সম্বন্ধ রাখতে চায় না। ভাবতে ভাবতে প্রায় জল এসে গেল তার চোখে। ষাটটা মোমবাতির দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল, ছোট্ট দেনিস গোলাপী কাগজে ছন্দোবন্ধ অভিনন্দন পাঠাত তার জন্মদিনে। গভীর দুঃখে সে প্রায় ভেঙে পড়বে—এমন সময় এক টেলিগ্রাম এল সেনেটের সভাপতির কাছ থেকে। হাসল তেসা :

খাঁটি এবং বিচক্ষণ যে ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা সে। ধারালো নাকটায় ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে উঠল—উত্তেজনার মুহূর্তে তেসার এরকম হয়। দেনিসের কথা ভুলে সে ক্যাবিনেটের ঘোষণার কথা ভাবল।

পরদিন সকালে এক অতি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। প্রাগ থেকে পাঠানো ফরাসী রাজদূতের রিপোর্টটা পড়তে বসে সে আবিষ্কার করল যে ফুজের দেওয়া সেই প্রমাণ-পত্রখানা অদৃশ্য হয়েছে। 'গ্রঁদেল-সংক্রান্ত' সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে বিরক্তিকর। কারও স্বরূপ-উদ্ঘাটন করাটা তেসা পছন্দ করে না। রাজনীতি হচ্ছে এক অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার; উচ্চকিত বক্তৃতা করা এর একটা অংশ মাত্র। আর আছে লবির কোণে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিসানি, দ্বিপ্রাহরিক আহারে মাখন আর নাসপাতি খেতে খেতে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা, কথার ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম অর্থ-সন্ধান আর ইঙ্গিত; 'স্বরূপ-উদ্ঘাটনের' কোন স্থান এই খেলায় নেই, স্তাভিস্কি-ঘটনাটা নিয়ে ব্রতৈইর দল কী বিশ্রী কেলেংকারিটাই বাধিয়ে তুলেছিল! এমন কি, তেসাকে ওরা জড়াতে চেয়েছিল! কমিউনিস্টদের ভোট না পেলে ফুজে নির্বাচিত হতে পারত না; অবশ্য সে পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক। ফুজে না বললেও তেসার জানতে বাকি নেই যে গ্রঁদেলটা একটা ফোতো নেতা, ওর সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার ছিল। কী বক্তৃতাই দেয় লোকটা। এমন মন-মজানো বক্তৃতা দিতে পারতেন শুধু আরিস্তিদ্ ব্রিয়াঁ। কিন্তু এর সংগে এই চাঞ্চল্যকর স্বরূপ-উদ্ঘাটনের সম্বন্ধটা কি? গত হেমন্তের সময়েই গ্রঁদেলের সংগে জার্মান গুপ্তচর-বিভাগের যোগাযোগের কথাটা তাকে ফুজে বলেছিল। তেসা থামিয়ে দিয়েছিল ফুজেকে : ছোকরা ডেপুটিটা কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। আসলে এই 'ষড়যন্ত্র' কথাটাই তার কাছে যেন কোনো ভিন জগতের ভাষার মতো শোনায়। বুড়ো মেজর কিংবা লুসিয়র মত অকর্মা জুয়োখেলায় সর্বস্বান্ত বেপরোয়া লোকরাই কেবল বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগের সংগে লিপ্ত হতে পারে। ফড়ে-দালালদের সংগে বে-আইনী লেন-দেন, জোচ্চোরদের বাঁচাবার চেষ্টা—এসব এক-আধটা এমন কিছু নয়, তেসা বোঝে; কোন লিমিটেড কোম্পানীতে সম্পূর্ণ আইনসম্মত ভাবে যোগ দেওয়া আর স্তাভিস্কি বা উস্‌ত্রিক সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি। কিন্তু ষড়যন্ত্র... তেসার মনে পড়ল ভিক্‌তর হুগোর কবিতা, শয়তানের দ্বীপ, বিবর্ণ ছোকরা-ডেপুটির মাথার ওপর ঝুলন্ত খাঁড়া। না, গ্রঁদেল এরকম কোনো কাজ করতে পারে না!

মাত্র তিন দিন আগে তেসাকে ওই অভিশপ্ত কাগজখানা দিয়েছিল করিৎকর্মা ফুজে, চিঠিখানা পড়ার পর বৈদেশিক বিভাগের দলিলগুলোর সংগে সেটাকে রেখে দিয়েছিল একটা ফাইলে। কিসিংগেন্ আর বাডেন-বাডেনের রাসায়নিক পণ্যগুলোর ওপর খাটানোর জন্যে দু হাজার ফ্রাঁর উল্লেখ ছিল তাতে। তেসা বিরক্ত হয়েছিল পড়ে। বেশ তো, জার্মান রাসায়নিক জিনিসের ব্যবসায়ে গ্রঁদেল কিছু পয়সা কামাতে চায়—এটা তো আর ষড়যন্ত্র নয়? ফুজে অবশ্য বলেছে যে আত্মপক্ষ-সমর্থনে কোনো প্রমাণ গ্রঁদেল দাখিল করতে পারবে না; কিন্তু তেসা ডেপুটিদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, এই কথাই সে বলেছিল ফুজেকে। কিন্তু 'বৈদেশিক বিভাগের সভ্যদের চিঠিটার কথা জানানো চাই' বলে ফুজে পীড়াপীড়ি করছে। এসব এত বাজে ব্যাপার—বিশেষত এখন, যখন দক্ষিণ-পন্থীদের সাহায্যে ব্লুমকেও সরাতে-হবে, আবার সেই সংগেই বামপন্থীদের সমর্থনও পাওয়া চাই। তেসা ফুজের দাবি অস্বীকার করতে পারে না, কারণ তাহলে বামপন্থী র‍্যাডিক্যাল-দের গোটা দলটাই নতুন গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যাবে। আবার ওদিকে ওই চিঠিটার কথা

বৈদেশিক বিভাগকে জানিয়ে দিলে ব্রতেই যাবে ক্ষেপে; দক্ষিণপন্থীরা যাবে র‍্যাডিক্যালদের দিকে, র‍্যাডিক্যালরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্লুমকে বাঁচাতে চাইবে। এই সমস্ত ভেবে দেখার পর তেসা ব্যাপারটা দু-এক সপ্তাহের জন্যে মুলতুবী রাখবে বলে ঠিক করল; দু-এক দিনের মধ্যেই মন্ত্রীত্ব-সংকটের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু চিঠিটা চুরি করতে পারে কে? এরকম কোনো ঘটনা তার জীবনে এই প্রথম ঘটল। তার টেবিলের ওপরেই ছিল ফাইলটা। বেশ মনে আছে, গতকাল উঠে যাবার আগে সে ড্রয়ারটায় তালা লাগিয়ে গেছে—কাগজগুলো সব যথাস্থানেই ছিল। আমালিকে জিজ্ঞেস করলে সে হয়ত বলবে, চুরি করেছেন স্বয়ং বীলজেবাব।

চেম্বারে এসে তেসা চুরির কথাটা একদম ভুলে গেল। আলোচ্য বিলটা—দুটো নতুন পশুচিকিৎসা-বিদ্যালয় খোলা নিয়ে। স্থানীয় নির্বাচনকন্দ্রের ডেপুটিরাই শুধু উপস্থিত ছিল। অন্যেরা লবিতে কিংবা ধূমপানের ঘরে ভিড় জমিয়েছে। সবাই বলছে আসন্ন সংকট নিয়ে; তেসার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তারা যে রকম উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করছে, তার থেকেই বোঝা যায়—ব্লুমের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

ভীইয়ার এসে ষষ্টিতম জন্মদিনের অভিনন্দন জানাল তেসাকে; তারপর সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ষাট বছর বয়সে মন্ত্রী হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। আপনি বেশ কম বয়সেই শুরু করলেন। এই নিয়ম।'

'ষাট বছরের আইবুড়ো মেয়ে!' খিক্ খিক্ করে হাসল তেসা, 'তা মন্দ নয়, কি বলেন? হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনি কি ওই ইয়ের সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন...?'

ভীইয়ার লজ্জা পেয়ে সরে গেল ওখান থেকে। হঠাৎ তামাকের ধোঁয়ার আড়াল থেকে ফুজে এসে হাজির হল। তেসা তাকাল ওর চশমা আর ছোট দাড়ির দিকে—সব বিষয়ে লোকটার প্রাচীন র‍্যাডিক্যালদের মত হবার চেষ্টা—আর সঙ্গে সঙ্গে তেসার মনে পড়ল হারিয়ে যাওয়া সেই প্রমাণ-পত্রটার কথা।

'গ্রঁদেলের ব্যাপারটা বৈদেশিক বিভাগকে কখন জানাবে বলে ঠিক করেছ?' সোজা-সুজি জিজ্ঞেস করল সে।

হাত দুটো নাড়ল তেসা, 'ব্যাপারটা বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করা চাই, তাই না? এরিওর সঙ্গে একবার আমি আলোচনা করব। এখন তো দ্বিগুণ সাবধান হওয়া দরকার, নইলে মধ্যবর্তী দলগুলো সব বিরুদ্ধে যাবে আমাদের।'

ফুজেকে থামানো অসম্ভব, 'দক্ষিণপন্থীরা তো আমাদের ওপরে চটে আছেই কিন্তু বামপন্থীদের মধ্যে আমাদের শত্রু নেই কেউ। তাছাড়া, এটা কোন দলের ব্যাপার নয়। দেশের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত। বুঝলে? দেশ! ব্রতেই যদি খাঁটি লোক হয়, তাহলে সেই সবার আগে গ্রঁদেলকে তাড়িয়ে ছাড়বে। গ্রঁদেল একদম জার্মানির গুপ্তচর। আজকের 'পারী-মিদি' পড়েছ? বার্লিন থেকে তো বলা হচ্ছে, স্ট্রাসবুর্গের ওপর আগে চাপ দিলে তবেই হয়ত 'বেচারা সুদেতেন জার্মানদের ওপর এই অত্যাচার' বন্ধ হতে পারে। এ সময়ে পঞ্চমবাহিনীর কোন প্রতিনিধিকে আমি সইতে রাজি নই...'

তেসা বলল, 'এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? এটা তো আর স্পেন নয়? তর্কটা এখানে খুনোখুনিতে দাঁড়ায় না। মাথা ঠাণ্ডা করো। আমার বয়স বেশি, অভিজ্ঞতাও বেশি। সময় হলে আমিই দলিলটা হাজির করব। আচ্ছা, তাহলে আসি এখন। দালাদিএর সঙ্গে একটু কথা আছে...'

জ্বালিয়ে মারলে এই ফুজেটা,—তেসা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া

দলিলের চিন্তাটা তার মনে থেকে গেল না। অবশ্য ব্যাপারটা সামলানো যাবে; ফ্রজেকে বলে দেওয়া যাবে যে দলিলগুলো সে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছে বিশেষজ্ঞদের কাছে, তারপর সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া যাবে ওই বিশেষজ্ঞদের আর দ্যজিয়েম্ ব্যুরোর ওপর; ওখানে তেসার বন্ধুবান্ধব আছে, তারা তেসাকে বাঁচাবে। ফ্রজেকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে সে সরাসরি অস্বীকার করতে পারে কিংবা চিঠিটা জাল বলে ঘোষণা করতে পারে; পরে পার্টি সভায় আস্থা প্রস্তাব পেশের প্রশ্নও তুলতে পারে। ব্যাপারটা সামান্য। গ্রঁদেল যদি জার্মানদের পক্ষে একটু আধটু ব্যবসা করে তো কি যায় আসে? ওসব গোঁড়ামি যথেষ্ট হয়েছে এবার গুরুতর রাজনীতির দিকে মন দেবার সময় এসেছে।

কিন্তু যতো নষ্টের মূল ওই কাগজখানার কথা কিছুতেই তেসা ভুলতে পারছে না। ওটার রহস্যময় অন্তর্ধানের কোনো কারণ সে আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। ভীইয়ারের কোনো লোক কি তার ওপর নজর রাখছে? কিংবা দেনিসের কোনো বন্ধু? এটা হলে আরও খারাপ। ভাবতেই সে শিউরে উঠল। কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তেসার ধারণা—অতি বজ্জাত গুন্ডা ওরা, কোনো কিছুতেই ওদের বাধে না। হয়তো কোনো ফাঁদে ফেলে ওরা তাকে মস্কো নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। ... কমিউনিস্টদের কাজ নয়তো এটা?

বাড়ি ফিরে স্থির মস্তিষ্কে সে কাজে বসবার চেষ্টা করল। আবার সে ফাইলখানার ভেতরে ভালো করে খুঁজল ঃ আর একবার যদি ভোজবাজীটা ঘটে যায়, হঠাৎ মিলে যায় কাগজটা। কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই সেটার। প্রাগের রাজদূতের সেই রিপোর্টটা পড়া আরম্ভ করলে সে। সুদেতেন জার্মানদের সম্বন্ধে হিটলারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসা সম্ভব—একথা সে বহুদিন আগে ভেবে রেখেছে। বন্ধুদের সে বলেছে, 'হ্যাঁ, খনিজ জলের জায়গা হিসেবে কার্লস্বাদ সুন্দর, তবে আমাকে ভাবায় ভিসির ভবিষ্যৎ।'

শোবার ঘর থেকে একটা গোঙানি শোনা গেল। কাজ থেকে উঠে পড়ে তেসা গেল তার স্ত্রীর কাছে।

মৃদুস্বরে বলল আমালি, 'মাপ কোরো, কী সংঘাতিক হয়ে উঠেছে আমার পক্ষে! শিগ্‌গিরই মরে যাব আমি। লুসিয়ঁর কি হবে?'

স্ত্রীর ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখখানার দিকে তাকাল তেসা; সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, 'ভাল হয়ে যাবে তুমি, নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। ডাক্তাররা সবাই বলেছে। শিগ্‌গিরই আমরা দুজনে একবার ভিতেলে যাব। নিশ্চয় যাব।'

আমালি নিজের কথা ভাবছে না, ভাবছে তার একমাত্র স্নেহের ধন বাদামী-চুল, ঘর-ভোলা ছেলেটার কথা। ফিস্‌ফিসিয়ে আবার বলল সে, 'লুসিয়ঁর কি হবে, বলো?'

'ঠিক ব্যবস্থা করে নেবে ও। কচি খোকা তো নয়; কোনো চিন্তা নেই তোমার।'

কাজের ঘরে যখন সে ঢুকছে, ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে লুসিয়ঁ। দরজার ওপর ঠোকাঠুকি হল তাদের। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠল তেসার কাছে ঃ প্রমাণ-পত্রটা লুসিয়ঁ চুরি করেছে! তার লেখাপড়ার ঘরে লুসিয়ঁকে সে যে এই প্রথম ঢুকতে দেখল তা নয়, লুসিয়ঁ প্রত্যেকবারই আমতা আমতা করে কৈফিয়ৎ দিয়েছে যে দেশলাইটা কিংবা সন্ধ্যের কাগজটা নিতে এসেছিল সে। এখন সব স্পষ্ট বোঝা গেল। হ্যাঁ, লুসিয়ঁর মতো ছেলে সব পারে।

তাড়াতাড়ি বারান্দাটা পার হয়ে লুসিয়ঁর ঘরে এল তেসা। টেবিলের ওপর কয়েকটি ঘোড়ার ছবি, মহিলার হাতের লম্বা দস্তানা একটি, আর একটা পিস্তল। সোফাটার ওপরে

বসে তেসা কপালের ঘাম মুছল হাতের তেলো দিয়ে; তারপর মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল :

'লুসিয়ঁ, গ্রঁদেল-সংক্রান্ত চিঠিটা তুমিই নিয়েছ?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল লুসিয়ঁ।

তারপর তেসা নিজেকে সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'জার্মানদের হয়ে কাজ করছিস তুই?'

হাত তুলে ছুটে গেল লুসিয়ঁ তেসার দিকে। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ইতর!'

'বেরিয়ে যা!' চিৎকার করে উঠল তেসা।

তারপর তেসা ফিরে গেল নিজের পড়ার ঘরে, লুসিয়ঁকে তার মায়ের কাছে বিদায় নিতে শুনল। কাঁদছে আমালি। এই তো চুকে গেল সব! সরকারী মন্ত্রীর পদের আর কি মূল্য এখন তেসার কাছে? মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেছে, ছেলেকে সে নিজেই তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে। তার ছেলে—গুপ্তচর! নিজের ওপর করুণা জাগল তেসার, নাক ঝাড়তে লাগল বহুক্ষণ ধরে। আমালির কান্নার শব্দ ভেসে আসছে শোবার ঘর থেকে। স্ত্রীর কাছে গিয়ে বিছানার ওপর বসল সে।

'গিন্নী'—তেসা যখন অত্যন্ত বিচলিত হয়, তখন স্ত্রীকে সে এইভাবে সম্বোধন করে— 'সবাই একে একে ছেড়ে গেল আমাদের, পড়ে রইলাম শুধু আমরা দুজন।'

'কেন ওকে তাড়িয়ে দিলে? বড্ড অভিমানী ও। আর ওকে কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

'ফিরে আসতেও দেব না। ও কি করে জানো? গুপ্তচর হয়েছে ও। জার্মানদের সাহায্য করছে।'

'আমি তো বরাবরই বলেছি, রাজনীতি অতি নোংরা জিনিস। তোমার কাছ থেকেই তো শিখেছে লুসিয়ঁ। তুমিই তো গলা ফাটিয়ে বলেছ, জার্মানির সঙ্গে চুক্তিতে আসা সম্ভব, আর হিটলার তোরেের চেয়ে ভাল লোক।'

বোকা অজ্ঞ মেয়েমানুষ বলেই স্ত্রীকে চিরদিন ভেবে এসেছে তেসা, আমালিকে একথা বলতে শুনে রীতিমত আশ্চর্য হল সে।

'আহা, তুমি থামো দেখি', বলল তেসা, 'ওসব কথা শুনতে চাইনে। লুসিয়ঁ রাজনীতিক নয়, গুপ্তচর। তফাতটা বোঝো না তুমি?'

লুসিয়ঁর ব্যাপারটা ঘটার আগে থেকেই তেসার অনেকখানি স্থৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল; জোরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে ফিরে এল পড়ার ঘরে আর অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করতে করতে বিড়বিড় করল, 'গুপ্তচর! ভাড়াটে গুণ্ডা! অকর্মা! ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসল শেষে। ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখতে হবে; প্রমাণপত্র ইত্যাদি চুরি করাটা যদি লুসিয়ঁর স্বভাব হয়ে থাকে, তবে ঘটনাটা গুরুতর; গ্রঁদেল তাহলে সত্যিই এ ব্যাপারে জড়িত; কিন্তু কাগজটা অদৃশ্য হওয়ায় এখন আর কোনো প্রমাণ নেই। চুরির ব্যাপারটা পুলিশে জানাবে নাকি? কিন্তু তার মানে লুসিয়ঁকে জেলে পাঠানো। এ আঘাত আমালি সইতে পারবে না। আর, তেসারই বা তাতে লাভ হবে কি? ফ্রান্সের ত্রাণকর্তার ছেলে কিনা গুপ্তচর? না, চুরির কথা কাউকে বলা চলবে না। ফুজেকে বলতে হবে, চিঠিটা জাল। কিন্তু গ্রঁদেলকে নিয়ে কি করা যায়? ডেপুটিদের পরিষদে গুপ্তচর—এমন ব্যাপার কোনো কালেই শোনা যায়নি! কিন্তু প্রমাণ নেই কোনো। ফুজের বিবরণ যদি সে দাখিল করে, তাহলে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে শত্রুবৃদ্ধিই হবে তার, তাছাড়া ভালো করে ভেবে

দেখলে, গ্রঁদেল যদি জার্মানির চর হয়ই, ফ্রান্সের কি ক্ষতি সে করতে পারে? সমর-পরিষদের সভ্য ও নয়। জার্মানদের হয়তো হাজার হাজার গুপ্তচর আছে, আর একটাতে কি আসে যায়?...মোটের ওপর এটা হল গিয়ে দ্যজিয়েম ব্যুরোর লোকদের ব্যাপার, তার মাথা ঘামাবার দরকার কি? সব দিক ভালো করে বিবেচনার পর তেসা ব্যাপারটা চেপে যাবে বলে ঠিক করল : লুসিয়ঁটা চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে, হাড়-বজ্জাতটাকে আর শোধরাবার কোনো উপায় নেই।

আর একবার সে আমালির কাছে গেল, 'লুসিয়ঁর ওই গুপ্তচরবৃত্তির কথাটা কাউকে বোলো না। কথাটা একেবারে বাজে, রাগের ঝোঁকেই বলেছি ওটা। আবার একটা সাংঘাতিক বিলের পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্যে ও আমাকে বলতে এসেছিল। তা ছাড়া ও আমাকে অপমানও করেছে। তুমি ওকে টাকা পাঠাতে পারো, কিন্তু এখানে যেন আর কখনো না আসে। আচ্ছা, তুমি এখন ঘুমোও, কেমন?'

পড়ার ঘরে ফিরে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সোফার ওপর খোলা চোখে শুয়ে রইল তেসা। নিজের অকৃতার্থ জীবনটার কথা ভাবছে সে। প্রতিবারের মতো এবারও দেনিসের কথা মনে পড়ল তার। এই প্রথম সে ভাবল, 'বোধ হয় দেনিসই ঠিক।' অভিশপ্ত, মৃত এই গৃহ থেকে ও বিদায় নিয়েছে। বাপকে ও কি চোখে দেখত? ছেলেমানুষ দেনিস, অপরিণত ওর বিচারবুদ্ধি, আইনের রীতিনীতি বোঝে না। খুনেদের হয়ে মামলা লড়ে তেসা, নকল নথিপত্র সাজায়, কুখ্যাত সব বদমায়েসদের কাজকর্মের নির্দেশ দেয়—তার পেশাই তাই। দেনিসের চোখে সে নোংরা-মন মিথ্যাবাদী। দেনিসের রাজনীতি জ্ঞান ওই পর্যন্ত। অত্যন্ত জটিল খেলায় নেমেছে তেসা : ব্রতেইর সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব, আবার ভীইয়ারকে দেখেও হেসে কথা বলে; ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্যে সেটা করতেই হয়! কিন্তু ব্যাপারটা তো নোংরা বটেই। সুতরাং দেনিসের মনও ঘৃণায় ভরে উঠেছে। বাপের অপরিচ্ছন্ন জীবন থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাকে আর গুপ্তচর ভাইকে ছেড়ে চলে গেছে। খাঁটি মানুষ দেনিস, কোনো কিছুর সঙ্গে আপোষ করে চলে না। মেয়ের দৃঢ় মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ল তেসার। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে চারপাশের ছবি আর মূর্তিগুলোর সঙ্গে ক্রমশ মিশে গেল দেনিসের পরিচিত মুখাবয়ব। কখনো যেন দেনিস তলোয়ার তুলছে জোয়ান-অফ-আর্কের ভঙ্গিতে, কখনো বা রক্তাক্ত ছোরা ধরছে উঁচিয়ে, লুই মাইকেলের বিষণ্ন নিস্পলক চোখ দুটো যেন তাকিয়ে রয়েছে তেসার দিকে আর সে বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'শয়তান!' সে জানে কমিউনিস্টরা খুনে, তার মেয়ে পারলে তাকে খুন করবে। কিন্তু এখন সেই মেয়েকেই সে আশীর্বাদ জানাল। এই তো সে দেখছে দেনিসকে তার মুখখানা পলেস্তারার মতো, চোখের জায়গায় দুটো গর্ত। তেসার টুঁটি টিপে ধরেছে দেনিস ...

ঘুমের ঘোরে চিৎকার করতে লাগল তেসা। আমালি জাগিয়ে তুলল তাকে। তেসার চেঁচানো শুনে সে ওঠবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু পারেনি, পড়ে গেছে মেঝেয়। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এসেছে এই ঘরে। দু হাতে তেসার মাথাটা ধরে আমালি বলল, 'কি হয়েছে, পল?'

কিছুক্ষণ লাগল তেসার হুঁশ ফিরে আসতে।

'দেনিসকে স্বপ্ন দেখছিলাম...সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গেল, গিন্নী...'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। চমকে উঠল তেসা : এত রাত্রে তাকে টেলিফোনে ডাকছে কে? লুসিয়ঁর কিছু হল নাকি? ভয়ানক কিছু?

রিসিভারটা তুলে নিল সে। কথা বলছে মাশাঁদো। দশ মিনিট আগে সেনেটে ভোট নেওয়া শেষ হয়েছে সেই খবর দিচ্ছে মাশাঁদা। ব্লুম জরুরীকালীন ক্ষমতা দাবি করেছিল। ভোটের ফলাফল—ব্লুমের পক্ষে সাতচল্লিশ, বিপক্ষে দুশোর বেশি।

উত্তেজনায় কথা আটকে গেল তেসার; জড়ানো স্বরে স্ত্রীকে বলল, 'কাল থেকে আমি মন্ত্রী। আমরা জিতেছি।'

আমালির মনে সান্ত্বনা আর আশা ফিরিয়ে আনবার জন্যে দুটো একটা উৎসাহের কথা বলতে চাইল সে। কিন্তু সারা দিনে বড় বেশি চাপ পড়েছে তার স্নায়ুর ওপর। নীল-পায়জামা পরে টেবিলটার কাছে বসে জামার হাতায় নাক মুছতে মুছতে অঝোরে কাঁদতে লাগল তেসা।

চার

সেনেটের সভ্যরা যখন ব্লুমের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্রুদ্ধভাবে কাশছেন আর বার্ধক্যগ্রস্ত কাঁপুনি-ধরা ঘাড়ের লাল শিরা ফুলিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছেন, শহরের আরেক প্রান্তে তখন 'সিয়েন' কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকরা সভা বসিয়েছে মালিক-পক্ষের জবাব বিবেচনা করবার জন্যে। দু সপ্তাহেরও ওপর হরতাল চলছে তাদের। এবারে দেদের সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে, কারখানাবাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে না গেলে শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো আলোচনার মধ্যে সে যাবে না। আর সে দার্শনিক সাজতে কিংবা উদারপন্থী রসিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি নয়; সময় বদ্‌লেছে। তাছাড়া দু বছর আগে যে অদম্য উৎসাহ শ্রমিকদের জয়লাভে শক্তি জুগিয়েছিল, এখন আর সেটা নেই। অন্যদের দেখাদেখি 'সিয়েন' কারখানায় হরতাল শুরু হয়েছে; যুদ্ধ-পণ্যোৎপাদনের সবগুলি কারখানা জুড়ে এই ধর্মঘট। এবারে আর ঝাণ্ডা উড়ছে না, ঐকতান সংগীতের আয়োজন নেই, নেই পুলিশের সঙ্গে আড়ালে হাসির কথা বলাবলি। জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে উঠেছে বলেই তারা ধর্মঘট করেছে; কিন্তু জয়লাভ করবে বলে বিশ্বাস আছে খুব কম লোকেরই।

মিশো নেই, এখনো সে স্পেনে যুদ্ধ করছে; বেঁচে আছে না মরে গেছে তা তার কমরেডরা কেউ জানে না। ফেব্রুয়ারির লড়াইয়ে 'পারী কমিউন' বাহিনীর সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে। পিয়ের আছে ধর্মঘটীদের পক্ষে, কিন্তু গত দু বছরে অনেক বদলে গেছে সে; এখনকার এই প্রবীণ, স্বল্পভাষী পিয়েরের সঙ্গে আগেকার সেই দিল-খোলা, সর্ববিষয়ে উৎসাহী পিয়েরের অনেক তফাৎ; ভীইয়ারের বিশ্বাসঘাতকতায় ভেঙে গেছে তার মন। লড়াই করে চলেছে সে এখনো; নিজের স্বার্থ, আনের বিষণ্ণ ক্ষীণদৃষ্টি চোখ, কিংবা একবছরের ছেলে দুদুর আকর্ষণ—কোনো কিছুই তাকে রুখতে পারেনি বিপদ মাথায় করে বার্সেলোনা কিংবা কার্তাজেনায় যাতায়াত করা থেকে। শুধু তফাত এইটুকু যে এখন সে লড়াই করে জয়ের আশা নিয়ে নয়, হতাশার তিক্ততা নিয়ে। ধর্মঘট পরিচালনা করছে লেগ্রে। যদি বলা হয় যে জুন-ধর্মঘটের প্রাণকেন্দ্র ছিল মিশোর অদম্য উদ্যম, তাহলে এবারকার এই দেরি-করে আসা শীতজড়ানো বসন্তে লড়াই-এর প্রতীক হচ্ছে লেগ্রের উত্তেজনাহীন দৃঢ়সংকল্প।

মালিক পক্ষের সাফ জবাব লেগ্রে পড়ে শোনাবার পর চুপ করে রইল সবাই। লেগ্রের ধর্মঘট চালিয়ে যাবার প্রস্তাবে হাততালিও পড়ল না, প্রতিবাদও উঠল না। দমে গেছে যেন সবাই।

'কারও কিছু বলবার আছে?'

কারও মুখে কথা নেই। চুপ করে থাকাটা অসহ্য মনে হচ্ছে; এই চুপ করে থাকার আড়ালে পরাজয় উঁকি মারছে যেন। হঠাৎ একটা ক্ষীণ গলা শোনা গেল উড়োজাহাজ রাখার লম্বা অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে :

'আমি বলতে চাই।'

মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল এক বুড়ো। নাম দুশেন। এক সময়ে সে ছিল কারখানার ঢালাই ঘরের মজুর, কিন্তু ইদানীং অনেক দিন থেকে সে রাত পাহারাদারের কাজ করছে। পিঠ বাঁকাতে কষ্ট হয়, কারখানার উঠোনটায় কোনরকমে পা টেনে টেনে হাঁটে, কিন্তু তবু সে চাকরি থেকে অবসর নিতে চায় না; বলে 'বাড়িতে ভারি একঘেয়ে লাগে।' দুশেনকে সবাই চেনে। সে যেন জগতের শুরুর দিনটি থেকে এখানে কাজ করছে। ইঞ্জিনীয়াররা তার মতামত মন দিয়ে শোনে, দেখা হলে দেসের তার সঙ্গে করমর্দন করে বলে, 'আমাদের গৌরব তুমি।' কান খাড়া করল সবাই, কি বলতে চায় দুশেন? কারও পরোয়া না করে আগুন-ছোটানো বক্তৃতা দেনেওয়ালা ছোকরা নয় দুশেন। কমতি মজুরি আর বাড়তি সাংসারিক খরচের কথা বলে লাভ কি? ও কথা তো সবাই জানে। আর এটা ১৯৩৬ নয়। দেসের বিন্দুমাত্র টলেনি। পরিবারে উপোস শুরু হয়েছে তাদের; ধর্মঘট চালিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না—জেতার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কি বলতে চায় দুশেন? সময়কালে অনেক কিছুই তো দেখেছে সে।

মঞ্চের ওপর উঠে কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দুশেন—মনে হল যেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে মুখ খুলল সে, বুড়োটে ভাঙা গলায় গান ধরল, 'ইন্টার-ন্যাশনাল'-এর প্রথম কয়েকটা লাইন :

> 'জাগো, জাগো, জাগো সর্বহারা
> অনশন-বন্দী ক্রীতদাস......'

দাঁড়িয়ে উঠল সবাই, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলল নীরবে।

ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অন্যান্য কারখানায় আবেদন জানাবার কথা যখন আলোচনা হচ্ছে, তখন লেগ্রেকে উঠে যেতে হল। কমিটি থেকে খবর এসেছে—গভর্ণমেণ্টের পতন আসন্ন।

গালের ওপর কাটা দাগটা দেখে দেনিস সঙ্গে সঙ্গে চিনল লেগ্রেকে—মিশোর সঙ্গে যেদিন তার দেখা হয় সেদিন সন্ধ্যের ওই তো কথা বলেছিল দেনিসের সঙ্গে। লেগ্রে মিশোর খবর জানতে পারে হয়তো। মাঝে মাঝে মিশোর চিঠি পায় দেনিস। লড়াই-এর খবর দেয় মিশো, স্পেনীয় ভাষার অসুবিধার কথা লেখে, লেখে বাহিনীর কমরেডদের সম্বন্ধে, চাষীদের বীরত্ব, আর আরাগ'-জেলার শীত আর গরমের কথা। চিঠিগুলো কখনো কাগজের টুকরোর ওপর হিজিবিজি করে লেখা, কখনো বা লম্বা কাগজে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা। প্যারীর কথাও লেখে কখনো কখনো—দেনিসের সঙ্গে একত্রে কাটানো সন্ধ্যেগুলো সে ভোলেনি। আবার কখনো লেখে লড়াইএর হালচালের খবর, তিরুয়েল-এ কামান সাজাবার ঘুলঘুলি কিংবা জঙ্গী বিমানগুলোর কথা—ওরা যার নামকরণ করেছে 'ভোঁতা নাক'। শেষ চিঠিখানায় তিরুয়েল-সীমান্তের যুদ্ধের সোৎসাহে বর্ণনা দিয়ে শেষে

পেন্সিলে লিখেছে, 'ভালবাসি তোমায়, ঠিক তাই!' দেনিস সর্বদা সঙ্গে রাখে চিঠিখানা, সারাদিনে বারবার দেখে ঠিক আছে কিনা, চিঠিটার প্রত্যেকটি কথা তার মুখস্থ, তবুও ঘুরে ফিরে দেখে সে চিঠিখানা।

বাইরে থেকে দেনিসের জীবনটা একঘেয়ে। কাজ, তারপর কোনো সভা কিংবা কোনো বক্তৃতার রিপোর্ট-নেওয়া। কিন্তু দেনিস বোঝে যে এটাও লড়াই, আর সে রয়েছে মিশোর পাশাপাশি। মিশোর চিঠিগুলো যেন সামরিক ইস্তাহারের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া ছেলেমানুষি ভালবাসার কথায় ভরা— মানসিক ক্লান্তির মুহূর্তে এই চিঠিগুলো তাকে উৎসাহ দেয়। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মিশোর কোনো চিঠি সে পায়নি। উদ্বেগ জমে উঠছে মনে, নিজের দুশ্চিন্তাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যে বারবার নিজেকে বোঝাচ্ছে, 'বেঁচে আছে ও, ভাল আছে'—আর মিশোর অভ্যস্ত উক্তিটা আওড়াচ্ছে মনে মনে, 'ঠিক তাই!' কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই উদ্বেগ বাড়ছে তার। লেগ্রেকে দেখে দুরু দুরু করে উঠল বুক। হয়তো লেগ্রে শুনেছে কিছু...

কমিটির সভায় আলোচনা হল মন্ত্রীত্ব-সংকট নিয়ে। ব্লুমের পদত্যাগ দাবি করেছে সেনেট। পপুলার ফ্রন্ট হয়তো ভেঙে যাবে। র‍্যাডিক্যালরা দু দলে ভাগ হয়ে গেছে। সমাজ-তন্ত্রীরা নিজেদের অবস্থাটা অসহায় করে তোলবার চেষ্টা করছে—ওদের ভয়, তেসো দল ছেড়ে গেলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে পড়ে থাকতে হবে। পারীতে ধর্মঘটের হিড়িক বেড়েই চলেছে, কিন্তু মজুরদের উৎসাহ নেই তেমন। মজুরদের বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা সফল হয়েছে। গত বছরের তুলনায়, পরিস্থিতি অনেক খারাপ।

কে একজন বলল, 'ঠিক সুযোগটি হারিয়েছি আমরা।'

সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ উঠল : আপাতত হাতের কাজটায় লেগে থাকো! পপুলার ফ্রন্ট রক্ষার জন্যে পারীতে অভ্যুত্থান ঘটানো অসম্ভব। ব্লুম যদি পদত্যাগ না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে শুধু ব্রতেইর দল, কাগুলার আর হয়তো পুলিশ। সামরিক বাহিনী ফ্যাশিস্টদের পক্ষ নেবে না। ব্লুম আর ভীইয়ারকে শুধু রুখে দাঁড়াতে হবে......

সভায় একটা ঘোষণা-পত্র তৈরি করা হল। গভর্ণমেণ্ট যেমন আছে তেমনি থাকবে; কাগুলার আর তাদের দলপতি জেনারেল পিকারকে গ্রেপ্তার করবে ভীইয়ার; স্পেনকে সাহায্য পাঠানো দরকার : সীমান্ত খুলে দিতে আর দেরি নয়!

লেখবার কোনো দরকার ছিল না, সবাই জানে এসব; কথাগুলো শোনাল অত্যন্ত সাধারণ, 'কি খবর!' কিংবা 'আচ্ছা, আমি তাহলে' কথাগুলো যেমন প্রায় অর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হয় সেই রকম দাঁড়িয়ে গেছে এসব কথাও। ঠিক হল, দুক্লো ব্লুমের সঙ্গে কথাবার্তা কইবে, আর লেগ্রে যাবে ভীইয়ারের কাছে, কারণ নির্বাচনের সময় সে ভীইয়ারের পক্ষে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া, ডেপুটিদের মধ্যে কেউ যাওয়ার চেয়ে, শ্রমিকদের কারও যাওয়াই ভালো—ভীইয়ার জানুক জনসাধারণ কি চায়।

ধর্মঘটের ওপর আলোচনা উঠল। চালিয়ে যেতেই হবে ধর্মঘট! সংকটের কি সমাধান হয়—তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। নোম-কারখানার অবস্থা সম্বন্ধে ওরা দেনিসকে জিজ্ঞেস করল।

দেনিস বলল, 'ওরা তো সবাই বলছে ধর্মঘট তুলে নেওয়া উচিত; অথচ, ধর্মঘট করা যে দরকার তাও ওরা জানে। লেগে তো আছে সবাই, কিন্তু আমাদের কমিউনিস্টরা নেতৃত্বের ভার নিচ্ছে না।'

লেগ্রে হাসল, 'ঠিক আমাদের কারখানার মতোই অবস্থা!'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেনিস তার সঙ্গ নিল। ‘স্পেনের খবর কিছু পেয়েছ?...... মিশো কেমন আছে?’

মনের উদ্বেগ চাপা রইল না দেনিসের গলায়। ভুরু কুঁচকে তাকাল লেগ্রে; প্রায় তিন মাস সে স্পেনের কোনো খবর পায়নি, কিন্তু শান্তভাবে জবাব দিল, ‘খবর সব ভালোই। একজন কমরেড কয়েকদিন হল এসেছে। অল্প কিছুদিন আগে তার সঙ্গে মিশোর দেখা হয়েছে...’

খুশি চাপতে পারল না দেনিস। ক্ষীণ হাসি দেখা দিল লেগ্রের বিষণ্ণ মুখে—ভেঙে-পড়া ঘরদোর, আর পোড়া গন্ধে ভরা বিলাঁকুর-এর কোনো এক জায়গায় বসন্তের আবির্ভাবের মতোই এই হাসি।

. . সে বলল, ‘কাল কারখানায় এসে দেখা করব তোমার সঙ্গে। ওদের উৎসাহ জিইয়ে রাখা দরকার। আমাদের কারখানায় ধর্মঘটের অবস্থাও খুব খারাপ। আজ তো বাঁচিয়ে দিল এক বুড়ো। ‘ইন্টারন্যাশনাল’ গান ধরে দিল লোকটা। ধর্মঘট যে চালু আছে তা নেহাৎ অপরের অবজ্ঞাকে সবাই মনে মনে ভয় করে বলেই।

দেনিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাঁধের রাস্তা ধরে চলল লেগ্রে। এদিকটায় পারীর অন্য এক চেহারা। বাড়িগুলো নতুন আর অস্বাভাবিক রকম সাদা, চারদিকে কারখানা, সাইরেনে ভোঁ বাজছে জাহাজঘাটায় যেরকম বাজে। অদ্ভুত এবারের এই বসন্ত। এপ্রিল মাস এসে গেল, অথচ শীত রয়েছে এখনো। ঘাড় গুঁজে পথ চলতে চলতে লোকে হাঁচে আর কাশে। বাদাম গাছগুলোয় এরই মধ্যে ফুল ফুটতে শুরু করেছে, শীতের উত্তুরে হাওয়ায় সবুজ কুঁড়িগুলোকে কেমন যেন বেমানান লাগে। দেনিসের খুশিভরা মুখখানা মনে পড়ল লেগ্রের। মিশোর যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে? কী সাংঘাতিক হবে তাহলে! মেয়েটা ভালবাসে মিশোকে, দেখলে বোঝা যায়। চমৎকার মেয়ে। ও নাকি ছাত্রী, মিশো বলেছিল। যাই হোক, ভালবাসার মতো একজন লোক পৃথিবীতে থাকাটা বেশ। মেয়েটাকে শান্ত শিষ্ট বলে সবাই, কিন্তু তা নয় ও; সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তা ভালোই, প্রাণোচ্ছলতার লক্ষণ ওটা।

লেগ্রে বড় একলা মানুষ—নিজের জীবনের কথা যতোদূর তার মনে পড়ে। বাবাকে সে দেখেনি কোনোদিন; অল্প বয়সেই মা মারা যায়; মানুষ হয়েছে কাকার কাছে। শুয়োরের মাংস-বেচা কসাই ছিল তার কাকা, অতি কঞ্জুস আর নিচু মন। লেগ্রেকে রক্ত ভরা বালতিগুলো টেনে টেনে নিয়ে যেতে হত, উনুন ধরানো আর মেঝে ধোওয়ার কাজও করতে হত তাকেই। তারপর সে ঢোকে এক কারখানায়।

লেগ্রের পক্ষে বড় অসময়ে যুদ্ধ শুরু হল—সবেমাত্র জীবনে যখন সে খুশির স্বাদ পেতে শুরু করেছে, আন-মারীর সঙ্গে আলাপ জমে উঠেছে তার, ঠিক সেই সময়ে। যুদ্ধের উগ্রতাটা যখন মিইয়ে এসেছে আর দু পক্ষই দু পক্ষের শক্তি সামর্থ্য কমিয়ে আন্দাজ করছে, সেই সময় আরগঁ-বনের গড়খাইয়ে বসে আন-মারির কথা মনে পড়ত তার। শেলের টুকরো মুখে লেগে আহত হয় সে; ক্ষতচিহ্নটা থেকে গেল। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখে আন-মারীর চিহ্ন নেই কোনো; শুনল সে নাকি একজন মার্কিন বৈমানিকের সঙ্গে চলে গেছে।

সেই থেকে মেয়েমানুষ মাত্রই সে সন্দেহের চোখে দেখে। তখন তার জীবনটা ছিল বৈচিত্র্যহীন। সিনেমায় যেতো হরদম, আর মদ খেয়ে বেহুঁশ হত। তারপরে রাজনীতিতে উৎসাহ জাগল তার। আর একবার প্রেমে পড়ল, কিন্তু এবারেও সুযোগ হারাল। কি

করে মার্গ-এর কাছে কথাটা পাড়বে বুঝে উঠতে পারেনি; মার্গ তাকে অপছন্দ করে বলে ধারণা হয়েছিল লেগ্রের। সেবারে গরম কালটায় ভয়ানক গোলমাল গেছে—সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি...। প্রত্যেকদিনই কোনো না কোনো সভায় বক্তৃতা দিতে হত তাকে। হেমন্তে মার্গ বিয়ে করল দুবি-কে। লেগ্রে ভাবল, ওকেই মার্গ-এর বেশি ভাল লাগবে। নববর্ষের দিন কেল্লার কাছে তার ছোট বাড়িটায় দুবি নেমন্তন্ন করেছিল বন্ধুদের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছিল সবাই, প্রচুর মদ খেয়ে চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে তুলেছিল বাড়িটা; বাইরে বাগানে এসেছিল মার্গ বাতাস পাবার জন্যে; লেগ্রেকে চলে যেতে দেখে কাছে ডাকল; সিনেমার কথা বলতে বলতে জিজ্ঞেস করল; 'দুঃখের দ্বীপ' ছবিটা লেগ্রে দেখেছে কি না। চুপ করে রইল লেগ্রে। হঠাৎ মার্গ তাড়াতাড়ি বলল, 'তখন তোমায় ভালবাসতাম আমি...' বলেই ফিরে গেল অতিথিদের ঘরে। নিজের ওপর ভয়ানক চটে উঠেছিল লেগ্রে। সুখের মুখ দেখা তার ভাগ্যে নেই বলেই ঠিক করেছিল আর আরও বেশি বিমর্ষ হয়ে উঠেছিল ক্রমশ।

এসব কথা এখন কেন ভাবছে সে? এখন অবশ্য জোসেৎ আছে। একজন কমরেডের মেয়ে সে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে লেগ্রের, জোসেৎ যেন তার দিকে প্রীতির দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু ওর বয়েস চবিবশ আর লেগ্রের বিয়াল্লিশ। জোসেৎকে সে বলছে, 'তোমার তুলনায় আমার বয়স বড্ড বেশি।' শুনে চটে উঠেছিল কেন জোসেৎ? একবার কথা বলা দরকার ওর সঙ্গে; লেগ্রে তবু পিছিয়ে দিচ্ছে দিনটা—এখনও ঠিক সময়টি আসেনি। দেনিসের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে তার মনে পড়ে গেছে কি সে হারিয়েছে।

গলাবন্ধটা ভালো করে জড়িয়ে নিল লেগ্রে। বৃষ্টিও হচ্ছে না, বরফও পড়ছে না... কী অদ্ভুত এবারকার বসন্ত। ভীইয়ারকে একবার টেলিফোন করা দরকার। ব্লুম পদত্যাগ করলে দেসেরকে নোয়ানো অসম্ভব হবে। কারখানা থেকে লোকদের হয়তো জোর করে বের করে দেবে ওরা। অল্প কিছুদিন আগেও কিন্তু শ্রমিকদের হাতে সব ক্ষমতাই আছে বলে ভাবা গিয়েছিল। আগামীকাল হয়তো ব্রতেই ক্ষমতা পাবে। নিজেদের শক্তির ওপর বেশি বিশ্বাস করেছে তারা—সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নির্বাচন, পপুলার ফ্রন্ট, মিছিল। কিন্তু ওরা হিসেব করেছে কমিয়ে কমিয়ে। আর এখন সুযোগ চলে গেছে! ঠিক যেমনটি হয়েছিল মার্গ আর তার নিজের বেলায়...ইস্, কী বিশ্রী আজকের আবহাওয়াটা!

ধর্মঘট কমিটির সভা চলছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল লেগ্রে। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খবর কি?'

তিনটে বিষয় ভেবে দেখা চাই। প্রথম নম্বর হচ্ছে, ধর্মঘট। চালিয়ে যেতেই হবে। অন্যান্য কারখানার মজুররা শক্ত রয়েছে। প্রতিনিধিরাও এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। 'নোম' কারখানার মজুররা কিছুতেই দমবে না। দেশের অবস্থা খুব খারাপ। এখন ওদের উড়োজাহাজটাই দরকার সবচেয়ে বেশি। হিটলার আবার কিছু একটা করতে চায়। তার মানে দেসেরের ওপর চাপ দেবে ওরা; মাল যোগান দিতে হবে ওকে। দু নম্বর : মন্ত্রীত্ব-সংকট। গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন জানাব বলে ঠিক করেছি আমরা। কিছুতেই পদত্যাগ করা চলবে না। চেম্বার আস্থা জ্ঞাপন করেছে। সেনেট তো একটা দুঃস্থালয় বলতে গেলে! নির্বোধ বুড়োগুলোর অনেক আগেই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। ভীইয়ারের কাছে যাচ্ছি আমি; আমাদের সমর্থন আছে ওর পক্ষে; দরকার হলে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করব আমরা।'

কে যেন বলল, 'ভীইয়ারটা অতি হারামজাদা।'

লেগ্রে বলল, 'অস্বীকার করছি না, তবে সব হারামজাদাই একরকম নয়। একজনকে

তো বেছে নিতেই হবে আমাদের—আর ব্যাপারটা ঠিক দুটো গোলাপ ফুলের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন নয়। তেসা হলে আরও খারাপ।'

'ঠিক। কিন্তু তিন নম্বরটা কি?'

'কিসের তিন নম্বর?'

'তিনটে বিষয় বললে যে তুমি?' লেগ্রে হাসল।

'ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম...তিন নম্বর হচ্ছে এই আবহাওয়াটা। কমরেড্স, একেই কি তোমরা বসন্ত বলো? না, এ বসন্ত নয়; এটা একটা কলঙ্ক!'

পাঁচ

রুস্যাঁ-তোনোর-এর শৌখিন অঞ্চলে ফরাসী-রিপাব্লিকের সভাপতির প্রাসাদ। ভোরবেলা থেকে বাড়িটার সামনে ভিড় জমেছে। দলে দলে লোক এসে ঊর্ধ্বমুখে তাকাচ্ছে বাড়িটার দিকে। নোটবুক আর ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। আশে পাশের রেস্তোরাঁগুলোয় অনুসন্ধিৎসুরা জমায়েত হয়ে কফি কিংবা জল-মেশানো মদের গেলাশে চুমুক দিতে দিতে বাজি ধরছে, সভাপতির কাছে কার ডাক পড়ে তাই নিয়ে। নটার সময় মস্ত একটা মোটর এসে থামল গেটের কাছে। সদ্য-দাড়ি-কামানো তেসা সুগন্ধ ছড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সামনে। নিজের ছবি তুলতে দিল সে; রিপোর্টারদের দিকে আঙুল আস্ফালন করে কৌতুক করল :

'সভাপতি মশাই আমাকে ডেকেছেন আলোচনার জন্যে—শুধু এইটুকুই বলতে পারি। সবেমাত্র কুঁড়ি ফুটেছে, তাড়াতাড়ি করে ফুলটা ছিঁড়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, ধৈর্য ধরো!'

দলিল হারানোর দুশ্চিন্তা, দেনিসের জন্যে উদ্বেগ, স্ত্রীর অসুখ—সমস্ত ভুলে গেছে তেসা। খুশিতে উজ্জ্বল তার মুখ চোখ। ঈর্ষার সঙ্গে বলল একজন সাংবাদিক, 'সত্তর বছর বয়স হতে চলেছে লোকটার, ভেবে দেখো একবার!'

ফটোগ্রাফাররা এরিও, দালাদিএ আর বনে-র ছবি নিল। ডেপুটি আর সেনেটররা ব্যতিব্যস্ত আছেন সকাল থেকে, কারুরই ঠিক সময়ে প্রাতর্ভোজন হয়নি। চেম্বারের লবিতে দলে দলে ভিড় জমিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা—সভাপতি মশাই সেনেটের স্পীকারকে ধন্যবাদ জানানোর সময় নাকি আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। হজমের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছে দালাদিএ; তেসা সকলের সামনেই ব্রতেইকে আলিঙ্গন করেছে। 'কমিদি ফ্রাঁসেস'-এর অভিনেত্রীরা, নর্তকী আর থিয়েটারের মেয়েরা এবং অন্যান্য রূপসীরা বৃথাই নির্দিষ্ট সময়ে থেকেছে তাদের প্রভাবশালী প্রেমিকদের অপেক্ষায়; জাতির প্রতিনিধি যারা, তাদের প্রেম করার সময় নেই।

কেবল ভীইয়ার শান্ত আছে আশ্চর্য রকম। সাংবাদিকরা এসে বিরক্ত করেনি তাকে; চেম্বারেও যায়নি সে; এসবের মধ্যে সে নেই। গত শীতেই সে বুঝতে পেরেছিল—র‍্যাডি-ক্যালরা আবার তৈরি হয়েছে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে;

সুতরাং এখন আর তার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। নিজের পারিবারিক ব্যাপারে মন দিয়েছে সে। লোকজন লাগিয়ে ছবিগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে নিল—অবিলম্বে সে উঠে যেতে চায় তার নিজস্ব বেসরকারী ফ্ল্যাটে। আভিঞ্ঞ'তে গোমস্তার কাছে চিঠি লিখে দিয়েছে যেন জুলাইয়ের মধ্যেই বাসাটার মেরামত সেরে রাখে। এতদিন পরে ছুটি উপভোগ করবার দিন আসছে তার।

মন্ত্রীত্ব-সংকটের কিছুদিন আগে ন্যান্সি থেকে তার মেয়ে ভায়োলেৎ এসেছিল দেখা করতে; তার স্বামীর মাল খালাস করার ছোট একটা ব্যবসা আছে সেখানে। সেবারে বাবাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে গিয়েছিল সে—বারবার ভোটের হিসেব করছে, সেনেটরদের নামে গজগজ করছে, আর নালিশ জানাচ্ছে যে কেউ তাকে বোঝে না। এখন কিন্তু বাবাকে দেখে খুশি আর চেপে রাখতে পারছে না ভায়োলেৎ—ফুর্তির সীমা নেই ভীইয়ারের; মস্ত কাপে কফি খেল, কাপের ওপরে ভেসে ওঠা পাতলা সরটা সরিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে, চোখ কুঁচকে দুষ্টু হাসি হাসল। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো যে না-জানে, ভীইয়ারকে দেখে তার মনে হবে যেন সে কোনো বিজয়োৎসব পালন করছে।

ভীইয়ার বলল, 'আজ থেকে আমি পাখির মতই স্বাধীন। রু-দ্য-লা-বিশি থেকে ছবি দেখিয়ে আনি তোকে, চল্। দেরাঁ-র আঁকা ছবির একটা চমৎকার প্রদর্শনী হচ্ছে ওখানে।'

নিজের পড়ার ঘরে গেল ভীইয়ার; তার সেক্রেটারী অপেক্ষা করছিল: কয়েকটা জরুরি ব্যাপারে নির্দেশ নেওয়া দরকার। শার'ৎ এ্যাঁফেরিঅর-এর জেলা-কর্তা বন্যা হয়েছে বলে খবর পাঠিয়েছে; বন্যার্তদের সাহায্য পাঠানো দরকার। খবরটা পেয়ে গতকালও ভীইয়ার বিচলিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোনো ঘটনাকে কি ভাবে রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টির কাজে লাগানো যায় তা সে জানে। কিন্তু এখন সে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

'আমার পরে যিনি আসছেন তিনিই এ-ব্যাপারটা দেখবেন। ভদ্রলোককে আমি হিংসে করছি মনে কোরো না যেন। শার'ৎ এ্যাঁফেরিঅর-এর জেলা-কর্তা ব্রতৈইর বন্ধু। সে যাই হোক, সমস্ত দপ্তরটাই হয়ে রয়েছে একটা বোলতার চাক। শার'ৎ-নদীর জল খুব বেশি রকম বেড়ে উঠেছে বলছ?'

সেক্রেটারীর উত্তর না শুনেই ভীইয়ার কল্পনার চোখে দেখতে লাগল: বিরাট ঘোলাটে নদীটা ফুলে উঠছে নিঃশব্দে, আধডোবা গাছের মাথাগুলো জেগে আছে জলের ওপর, ভেসে চলেছে কাকের বাসাগুলো। সরকারী দায়িত্ব-মুক্ত ভীইয়ারের কাছে বন্যাটা শুধুই একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার, একটা কবিত্বময় ছবি। অনিমন্ত্রিত জনৈক অভ্যাগত এসে পড়ায় বাস্তব জগতে ফিরে এল ভীইয়ার। লেগ্রে এসে হাজির হয়েছে।

সে বলল, 'কমিউনিস্টরা আপনাকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। নির্বাচনে জিতেছে পপুলার ফ্রন্ট, আর দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে একমাত্র চেম্বার।'

'কিন্তু সরকারী নিয়মতন্ত্রে...'

'নিয়মতন্ত্র-মাফিক আপনি তো সেনেটের ভোট মেনে নিতে বাধ্য নন। আইনের সমর্থন চান? বেশ তো! র‍্যাডিক্যাল-মন্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে যখন সেনেট অনাস্থা জ্ঞাপন করেছিল, তখনও তো লিয়' বুর্জোয়া পদত্যাগ করেনি। এই তো একটা দৃষ্টান্ত পেলেন আপনি। আপনার পদত্যাগ করা মানেই ফ্যাশিস্টদের পথ খুলে দেওয়া। প্রথমে দালাদিএ,

মনে, তেসা—তারপর ব্রতেই।'

'বিপদের সম্ভাবনা বড্ড বাড়িয়ে দেখছো, বন্ধু। দালাদিএ পপুলার ফ্রন্টের সংগঠক, তেসাও এমন কিছু ভয়ংকর লোক নয়; যতদূর মনে পড়ে, কমিউনিস্টরাও ওর পক্ষে ভোট দিয়েছিল। লোকটা একটু অস্থিরচিত্ত কিন্তু খাঁটি, ঠিক র‍্যাডিক্যালরা যেমনটি হয় আর কি!...'

চালাকির ধার ধারে না লেগ্রে। দাঁড়িয়ে উঠে গলা চড়াল, 'একবার আপনি আমার সামনেই বলেছিলেন যে আপনার ভাগ্য শ্রমিকদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। শ্রমিকরা চায় আপনি থাকুন। .আপনার কাছে চাল দিতে চাই না আমি; আপনি জানেন, অনেক সময়ে আপনার রাজনৈতিক নীতির আমরা নিন্দা করেছি। কিন্তু এটা ঝগড়ার সময় নয়। ফ্যাশিস্টরা শ্রমিক-সংগঠনগুলো ভেঙে দেবার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা রয়েছি আপনার পেছনে; সরে গেলে চলবে না আপনার! সেনেটের সামনে কালকে বিরাট মিছিল বের করব আমরা! ওই বুড়ো ঘাগীগুলোকে দেখিয়ে দেব কাদের জোর বেশি।'

অতি ক্ষীণ হাসি হাসল ভীইয়ার ঃ 'আমার ওপরে এই আস্থা আছে বলে তোমাকে আর তোমার পার্টিকে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন এসব অতীতের কথায় দাঁড়িয়ে গেছে। আজ সকালে ব্লুম মন্ত্রীসভার পক্ষে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে সভাপতির কাছে।'

দু চোখে হাত ঢেকে বসে পড়ল লেগ্রে ঃ 'খুব খারাপ হবে এর পরিণাম। শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরানো হবে ওদের প্রথম কাজ। তারপর? ঠিক অস্ট্রিয়ায় যা হয়েছে তাই হবে। জার্মানরা আসবে। স্পেনের দিন তো ফুরিয়ে এসেছে; চেকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কবা হবে; 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' নামে ব্রতেই—হিটলার কি মুসোলিনী—যে কোন লোকের সঙ্গে হাত মেলাবে।'

সহানুভূতির সঙ্গে ঘাড় নাড়ল ভীইয়ার; সে এখন একজন বামপন্থী ডেপুটি মাত্র, মনের কথা খুলে বলায় আর কোন বাধা তার নেই ঃ 'ঠিক কথা। স্পেন সম্বন্ধে ওরা বড়ো জঘন্য কাজ করেছে। খোলাখুলি বলতে গেলে, বৈদেশিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার নীতিটা একটা লজ্জাকর প্রহসন। ইতালীয়ানরা তো যা ইচ্ছে তাই করছে..............তোমার নৈরাশ্যবাদে আমার সায় আছে।'

লেগ্রের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, 'দোষটা কার?' কিন্তু আলোচনাটা নিরর্থক ভেবে চুপ করে রইল। করুণ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ভীইয়ার। লেগ্রের মনে পড়ল, দু বছর আগে সেই সভায় ভীইয়ার তাকে কি ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। ভীইয়ারের কথার পুনরাবৃত্তি করল সে ঃ

'লজ্জাকর প্রহসন!...আচ্ছা, আসি তাহলে। আপনাকে বিরক্ত করে কোনো লাভ নেই।'

লেগ্রে চলে গেলে ভীইয়ার ভাবল, 'একটু আধটু ভব্যতা সভ্যতা আছে লোকটার; আমি যে কি ভয়ানক ক্লান্ত তা ও বুঝেছে; অন্য লোকে এটুকু বোঝে না, খালি পেছনে লেগে থাকে...হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম সেক্রেটারীকে...'

নোট-বই খুলে দাঁড়িয়ে ছিল সেক্রেটারী।

ভীইয়ার বলল, 'কাল সেনেটের সামনে মিছিল বেরুবে বিক্ষোভ জানাবার জন্যে। পুলিশের কর্তাকে খবর দাও, যেন সে মিছিলটাকে বেআইনী ঘোষণা করে। অন্যায়ভাবে ভয় দেখিয়ে আমাকে শাসাবার সুযোগ ওদের আমি দিতে চাই না। ভোটে হেরে গিয়ে

আমরা পদত্যাগ করেছি—এর মধ্যে কোনো চালাকি নেইঃ পার্লামেন্টের খেলার এই রীতি।'

ঘন্টা বাজিয়ে চাকরটাকে ডাকল ভীইয়ার ঃ 'ভয়ানক ঠান্ডা ভেতরে। আগুনটা জ্বালিয়ে দাও, আর আমার চটি জোড়া আনো।'

আহা, কী শান্তি! আগুনের আঁচে খুশির ফট-ফট আওয়াজ করছে কাঠগুলো; বুট জোড়া খুলে ফেলল ভীইয়ার, লোমের ঝালর দেওয়া গরম চটির মধ্যে পা ঢুকিয়ে ছুটি উপভোগ করতে লাগল সকাল এগারোটার সময়। যেতে হবে না কোথাও; অলস আরামদায়ক চিন্তায় ভরে উঠল মনটা। লেগ্রে বাড়িয়ে বলেছে। বড় আশ্চর্য দেশ এই ফ্রান্স, প্রতি দশ বছরে একবার করে ধ্বংসের পথে যায়, অথচ মোটেই ধ্বংস হয় না; এবারেও হবে না। হয়তো সেনেটররাই ঠিক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বড় জটিল হয়ে উঠেছে। তেসা, দালাদিএ সারো, এমন কি লাভাল...ঘরে তৈরী চটি-জুতোর মতো যেন ওরা সবাই। ফ্রান্স ওদের চেনে, তাই ওদের ক্ষয়ে যাওয়াটুকুও চোখে পড়ে না। কিন্তু পপুলার ফ্রন্টকে আপাতত কিছু দিনের মত শিকেয় তুলে রাখা যেতে পারে......

ভায়োলেৎকে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হয়ে উঠল ভীইয়ার, কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। ভায়োলেতের স্বামীর কথা, তার ব্যবসা আর নতুন বাসার কথা জিজ্ঞেস করল সে।

'তোর একটা খোকা হবে বলে আশা করছিলাম। নাতিকে আদর করতে ইচ্ছে হয় আমার।' (ভীইয়ারের বড়ো মেয়ের দুটো মেয়ে আছে।)

'মোরিস তো বলে, এখন ছেলেপুলে না হওয়াই ভালো। ন্যান্সির সবাই বলছে, শিগ্গিরই নাকি যুদ্ধ বাধবে।'

রাজনীতির কথা তোলবার ইচ্ছে ছিল ভায়োলেতের। মোরিস তাকে পরে কেবলই খোঁচাবে, 'কি বললেন উনি, তাই বলো।'

'শোনো বাবা, এই দু বছর আমার বড় দুঃখ গেছে। এরা কেউ তোমাকে তোমার মতো করে বুঝতে চায় না, অবশ্য আমার সামনে কেউ কিছু বলে না কিন্তু মোরিস আর জানের মারফৎ সবই শুনতে পাই আমি। কেন জানি না, তোমার ওপরে ওরা সবাই খড়্গহস্ত—তুমি নাকি মজুরদের ডুবিয়ে দিয়েছ! তাই তো বলাবলি করছে কেউ কেউ। এমন কি এই নিয়ে গানও বেঁধেছে ওরা। আবার অনেকে খেপে আছে তুমি কাগুলারদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছ বলে। আমি অবশ্য কান দিই না... কিন্তু তবু চারদিকে বলাবলি হতে শুনছি এসব। কতবার যে কেঁদেছি এসব শুনে।'

বিরক্তিতে কেঁপে উঠল ভীইয়ারের থুতনি। মেয়ের কথার উত্তরে কি বলবে সে? বলবে কি, যে, মহাপুরুষরা সবাই তাঁদের জীবিতকালে নিন্দিত হন? বলবে কি, যে, দু বছর ধরে সে ফ্রান্সকে রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছে? কিন্তু সে নিজেই বুঝল এ সব বড়ো বড়ো কথা অত্যন্ত বেমানান শোনাবে। আগুনের কাছে ঘেঁষে সে বসে বলল ঃ

'জানি, সবাই আমাকে ঘৃণা করে। মা মারা যাবার পর আমার আর কেউ নেই।'

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে একটা গেলাশে কুড়ি ফোঁটা ওষুধ মেপে নিল সাবধানে।

'ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। খাবার এক ঘন্টা আগে হজমের জন্যে এটা আমাকে খেতে হয়।'

ছয়

লুসিয়ঁর প্রতি মুশ্ এত আকৃষ্ট হল কি করে? লুসিয়ঁ ওকে মোটেই ভালবাসে না, কোনদিন বলেওনি ভালবাসার কথা। এ পর্যন্ত লুসিয়ঁ যত মেয়ের হৃদয় জয় করেছে তার তালিকা লেখা আছে ওর ঘোড়দৌড়ের হিসেবের খাতায়—মুশ্ সেই তালিকায় একটা নামের সংখ্যা বাড়িয়েছে মাত্র : সুন্দরী মুশ্, যার মন পাওয়া নাকি বড়ো কঠিন! এতদিনে লুসিয়ঁ বুঝেছে জেনেতের প্রতি তার আবেগ ছিল কত গভীর; জেনেতের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবার জন্যে কী আগ্রহে সে অধীর হয়ে উঠত, জেনেৎ হয়তো তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবে না, জেনেৎ হয়তো তার সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া ব্যবহার করবে এসব কথা ভেবে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরত। মুশের কাছে লুসিয়ঁ শুধু একটু আধটু মজা পায়, তার বেশি কিছু না। ইদানীং যেন মুশের আলিঙ্গনে কিছুটা শিথিলতা এসেছে, তাই তার প্রেমকে উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্যে লুসিয়ঁ ঠাট্টা করা শুরু করেছে মুশ্ এখনো তার স্বামীর সঙ্গে আছে বলে। জল ভরা চোখে মুশ্ জিজ্ঞাসা করেছে, 'ওকে ছেড়ে যেতে বল তুমি?' বাপের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে লুসিয়ঁ। মুশ্ ভেবেছে যে ওর সঙ্গে ওই নোংরা ঘরে গিয়ে থাকাটা হবে ভারি সুখের—না খেয়ে থাকবে, জামা-কাপড় ধুয়ে দেবে লুসিয়ঁর আর ওর লেখা প্রবন্ধগুলো পৌঁছে দিয়ে আসবে খবরের কাগজের আপিসে। কিন্তু মুশের স্বামীর প্রতি ঈর্ষার ভাব দেখিয়ে একটু মজা উপভোগ করবার পর লুসিয়ঁ বলেছে, 'না, তোমাকে আমার কোন দরকার নেই। তোমার স্বামী তো তোমায় ভালবাসে খুব।' আরও বেশি কেঁদেছে মুশ্, তারপর অধৈর্য লুসিয়ঁর ভ্রূকুটি দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে উঠে হাওয়াই দ্বীপের গান ধরেছে।

তিন বছর আগে ব্রিতানির কাছে সমুদ্রের ধারে মুশের সঙ্গে গ্রঁদেলের দেখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয় গ্রঁদেল। পাহাড়ের চুড়োয় ওকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে গ্রঁদেল অনেক গল্প করেছে 'মহাব্যোম বাত্যা' সম্বন্ধে—লেখক হিসেবে তখন নাম করতে শুরু করেছে সে। শীতকালে বিয়ে হল ওদের। দুজনেই অল্প বয়সী, দেখতে সুন্দর, আর চালাক-চতুর। তাছাড়া গ্রঁদেলের ভাগ্যটাও ভালো, ডেপুটি হয়ে টাকা করল মোটা রকম। তারপর আঁতইল-এ অনেক ভাড়ায়-বাসা নিয়েছে দুজনে; বন্ধুবান্ধবদের ঘন ঘন নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে। মুশ্ তার পোষাক-আশাক কেনে সবচেয়ে দামী দরজির দোকান থেকে আর বিরাট একটা কাডিলাক গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ায়। মুশের প্রিয় ফুল পার্মা-ভায়োলেট দিয়ে গাড়িটা সাজিয়ে রাখতে কখনো ভোলে না সোফারটা।

মনে হতে পারে, ওদের সংসারটাই এমন যে ওদের পারিবারিক জীবন সুখের হবে। কিন্তু বিয়ের চার বছর পরে মুশের দেখা হল লুসিয়ঁর সঙ্গে আর একদম মাথা ঘুরে গেল ওর। প্রথমেই ও আকৃষ্ট হল লুসিয়ঁর দেহ সৌষ্ঠবে। গ্রঁদেলের সৌন্দর্য যেন খানিকটা নিরুত্তাপ আর আবেগহীন, খোদাই করা ছবির মতো। লুসিয়ঁর সব কিছুই যেন আবেগে উচ্ছল : কোঁকড়া বাদামী রঙের চুল, উজ্জ্বল চোখ, অতি-ক্ষীণ হাসি আর

সরু হাত। অল্প কয়েকদিন তার সঙ্গে মিশেই বুঝল যে এরকরটি আর কাউকে ও জীবনে দেখেনি। সামান্য একটা কথায় সে হয়তো জ্বলে ওঠে আগুনের মতো, তারপর পরমুহূর্তেই হয়তো দুর্বোধ্য ও নির্বাক এক বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রায়ই তাকে জুয়ো খেলতে লক্ষ্য করেছে মুশ্, কিন্তু জুয়ো খেলার সময়ও লুসিয়ঁ লুসিয়ঁ-ই থাকে। নির্মম হয়ে ওঠে কখনো, কঠিনভাবে পীড়ন করে নিজেকে। মহত্তম থেকে জঘন্যতম কোন কাজ করতে পারে যেন। তার ভবিষ্যৎ তার নিজের কাছে যেমন তেমনি অন্যের কাছেও রহস্যময়। লুসিয়ঁর খামখেয়ালী স্বভাব, প্রেমের ব্যাপারে অবিশ্বস্ততা আর চরম নৈরাশ্যবাদ— এগুলোও মুশ্‌কে কম আকর্ষণ করেনি। ঔপনিবেশিক সরকারী-চাকুরের কেতা-দুরস্ত, নিয়মতান্ত্রিক পরিবারে মুশ্ মানুষ হয়েছে, সেখানে সবই বাঁধা ধরা, মাপা-জোকা বিধি-ব্যবহার—বাবার প্রেমের ব্যাপার, মায়ের প্রার্থনা, ঘুষ আর অল্প মাইনের বাঁধা পুরনো চাকর। গ্রঁদেলকে মনে হয়েছিল যেন কোনো উপন্যাসের নায়ক, তাই গ্রঁদেলের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। কিন্তু তিন বছর তার সঙ্গে থেকেই মুশ্ বুঝেছিল যে, গ্রঁদেল আসলে অত্যন্ত হিসেবী সাংসারিক প্রতিষ্ঠা-কামী লোক। সে নিজেই একবার মুশের কাছে স্বীকার করেছে যে, জনৈক প্রভাবশালী ডেপুটির কাছ থেকে কি একটা সুবিধে আদায় করে নেবার জন্যে সে একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেম করে মুশের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল। একমাত্র জুয়োখেলায় গ্রঁদেলের অকৃত্রিম উৎসাহ। আগে আগে সে মন্তোকার্লো আর বিয়ারিৎস্-এর জুয়োর আড্ডায় নিয়মিত যেত, কিন্তু ডেপুটি হবার পর ওসব জায়গা যাওয়া ছেড়েছে; মুশ্‌কে বলেছে, তার কাছে জুয়োর ঘুঁটিও যা রাজনীতিও তাই। গ্রঁদেলকে বিশ্বাস করে না মুশ্, মনে মনে ঘৃণাই করে। লুসিয়ঁর কাছে মুশ্ স্বীকার করেছে, 'আমার মনে হয়, ও যেন কিনে নিয়েছে আমায়।' মুশের কথার উত্তর দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে চটে ওঠে লুসিয়ঁ, এমন কি একবার মেরেও বসেছিল; কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই হেসে উত্তর দেয়, 'গণিকাদের আমি ভালবাসি, ওরা ভারি ভদ্র।'

লুসিয়ঁ যে বাপের থেকে ভিন্ন হয়ে গিয়ে আধ-পেটা খেয়ে থাকে—এতে তার প্রতি আরও বেশী টান অনুভব করে মুশ্। কিন্তু গ্রঁদেলের সুনাম রক্ষায় তার এত আগ্রহ কেন সেটাও বুঝতে পারে না। স্বামীর কোনো ব্যাপারে ওর আগ্রহ নেই, কোনো দিন ও গ্রঁদেলকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না, গ্রঁদেল প্রেমের ব্যাপারটা জানতে পেরেছে বলে মুশের ধারণা হয়েছিল একদিন। গ্রঁদেল যে কতখানি দুর্বৃত্ত, মুশ্ তা ভাল করে জানে বলেই জানে বলেই লুসিয়ঁর জন্যে ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। কিন্তু মাতানিদের বাড়িতে যখন ওদের দুজনে দেখা হল, গ্রঁদেল চিরাচরিত শিষ্ট ব্যবহার করল লুসিয়ঁর সঙ্গে।

নিজের পারিবারিক অশান্তির কথা লুসিয়ঁ কাউকে বলেনি, কারণ তার ভয় ছিল জোলিওর কানে কথাটা উঠলে তার রোজগারের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তেসাও তেমনি ছেলের সঙ্গে ঝগড়ার কথাটা চেপে গেছে। একমাত্র মুশ্‌ই জানত সব। গ্রঁদেল ইদানীং লুসিয়ঁর কথা মুশকে প্রায় রোজই বলে। চুপচাপ থাকে মুশ্। শেষে একদিন গ্রঁদেল বলল, 'আমি জানি ওর সঙ্গে ভারী ভাব তোমার। ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করার কোনো দরকার নেই, আমার কোনো হিংসা নেই ওর ওপর। তুমি শুধু ওকে একবার এখানে আনো। আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে ওর সঙ্গে।'

রীতিমত উদ্বেগ নিয়ে মুশ্ গেল লুসিয়ঁর কাছে। কি করে যে স্বামীর প্রস্তাবটা তার কাছে পাড়বে তা ভেবে পেল না। একটা কোনো বিপদ ঘনিয়েছে বলে ও আঁচ করেছে।' লুসিয়ঁ যেন বিপদটাকে তাচ্ছিল্য করবার জন্যেই খুব হালকা ভাবে কথাবার্তা

বলতে লাগল, ঠাট্টা তামাসা জুড়ে দিল মুশের সঙ্গে। এই প্রথম লুসিয়র আলিঙ্গনে ভয় ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি জাগল না মুশের মনে; ভেতরটা যেন কেঁপে উঠল তার। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুশ্ বলল:

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ও। বড় ভয় হচ্ছে আমার, লুসিয়।'

'যতো বাজে চিন্তা তোমার। গ্রঁদেল ওথেলো নয়।'

'বুঝতে পারছ না তুমি। ঈর্ষার প্রশ্ন নয় এটা। বড়ো ভয়ংকর লোক ও। কোনো বিপদে ফেলতে চায় তোমাকে। ওর এই পাতলা হাসি আমি চিনি। তোমার সঙ্গে ওর দেখা করতে চাওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'ও বোধহয় জানে না যে আমি বাবার সঙ্গে ভিন্ন হয়ে গেছি; আমার বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায় গ্রঁদেল। আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু ও চায় না। থাক, ওসব কথা ঢের হয়েছে,' বলে মুশ্‌কে চুমু খেল লুসিয়। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠল মুশ্:

'চিঠিটা লিখেছে কে?'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে লুসিয় বলল, 'ওটা একটা জালিয়াতি, পেছন থেকে ছুরি মারার সেই চিরাচরিত পন্থা, আর কি! কিলমান নামে একজনের সই আছে চিঠিটায়।'

বালিশে মাথা গুঁজল মুশ্। ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে লুসিয় বলল, 'তুমি জানো কিছু এ সম্বন্ধে? বলো তাহলে!'

'ও খুন করবে তোমায়।'

'বলো কি জানো তুমি চিঠিটার কথা!'

'না, চিঠিটার কথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু কিলমান্‌কে আমি জানি। দোহাই তোমার, এ কথা বোলো না যেন! ও খুন করবে তোমায়! লুসের্নে একটা হোটেলের ঘটনা—কিলমানের সঙ্গে আমাকে কয়েক মিনিটের জন্যে ফেলে রেখে ও চলে গিয়েছিল। আমাদের ঘর দুটো ছিল পাশাপাশি। বীভৎস লোক এই কিলমান, সরু কোমল দেখে মনে হয় যেন কর্সেট্ ব্যবহার করে, মাথার পেছন দিকটা একদম কামানো...... ফরাসী কথা বলত মজার ঢঙে 'দ' গুলো উচ্চারল করত 'ত'-এর মত, খাঁটি জার্মান-আদমী। কিন্তু কাউকে বোলো না! গ্রঁদেল আমায় কিছু বলতে বারণ করেছিল। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও...... তুমি তো জানো সাধারণত ও কি রকম শান্ত। ওর সঙ্গে কোনো কিছুর মধ্যে তুমি যেতে পাবে না।'

মুশের কথায় লুসিয়র আর কান ছিল না। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিল, তারপরে চিৎকার করে উঠল:

'শিগ্‌গির জামাকাপড় পরে নাও।'

কিসের জন্য যে লুসিয়র এত ব্যস্ততা তা বুঝতে পারল না মুশ্; ওর হাতের ওপর নিজের ঠোঁট চেপে ধরতে চেষ্টা করে বলল:

'লুসিয়, লক্ষ্মীটি! রাগ কোরো না! আমার সত্যিই কোন দোষ নেই।'

কেঁদে ফেলল মুশ্। তারপর লুসিয়কে খুশি করবার জন্যে হাতব্যাগটা খুলে প্রসাধন করতে বসল, পাউডারের পাফটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল লুসিয়,

'আঃ এসো, এসো শিগ্‌গির!'

একসঙ্গে বেরিয়ে যাবার সময় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল মুশ্:

'ওগো, এত ভয় হচ্ছে আমার!'

ব্লাউজটা খুলে গেছে লক্ষ্য করে মুশ্ ছুটে গিয়ে ঢুকল প্রথম দরজাটার আড়ালে। বেরিয়ে এসে দেখে—কোথাও নেই লুসিয়ঁ। বাস-থামার জায়গাটায় একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল মুশ্—চার পাশে লোকের ভীড়, কিন্তু কারো দিকে ওর লক্ষ্য নেই। প্রায় ওর কানের কাছে একটা খবরের কাগজওলা চেঁচিয়ে উঠল, 'বিপদ কাটেনি এখনো!' ভয় পেয়ে চমকে উঠে হিস্টিরিয়া-রোগগ্রস্তের মত মুশ্ কেঁদে উঠল—ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল চোখ দিয়ে। একটি মহিলা এগিয়ে এলেন ওর কাছে, শান্ত গলায় বললেন, 'কোনো ভয় নেই! আমার স্বামী বলেছেন, যুদ্ধ হবে না।'

সাত

সন্ধ্যা আটটায় ব্রতেইর বাড়ী পৌঁছল লুসিয়ঁ। বসবার ঘরে তাকে নিয়ে এসে চাকরটা অপেক্ষা করতে বলে গেল; খেতে বসেছে ব্রতেই।

'মন্ত্রশিষ্য'দের নেতার জীবনযাত্রা একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের মতো; ঘরের মধ্যে একটা পিয়ানো—কেউ কোনদিন বাজায় না; লাল-সাটিনের রঙটা যাতে চটে না যায় সেইজন্যে আসবাবগুলোর ওপর ঢাক্‌নি দেওয়া। গোল টেবিলটার ওপরে পরিবারের লোকদের ছবির একটা অ্যালবাম আর বিরাট একটা বই 'লোয়ারের তীরের প্রাসাদগুলির উপাখ্যান।' দেয়ালে টাঙানো সমুদ্রে সূর্যাস্ত, আর ফুলেভরা কুঞ্জবনের কয়েকটা দৃশ্যচিত্র।

খাবার ঘরে যাবার দরজাটা খোলা। পুরনো ধরনের কাঁচের আসবাবে ভর্তি কুলুঙ্গিটা চোখে পড়ে; স্ত্রীর মুখোমুখি বসে ব্রতেই সুরুয়া খাচ্ছে, কোণে রয়েছে একটা উঁচু চেয়ার—ছোট ছেলের বসার জন্যে : ব্রতেইর স্ত্রী এটা সরিয়ে নিতে দেয়নি। সযত্নে তোয়ালেটা ভাঁজ করে রেখে ব্রতেই উঠে এল আগন্তুকের কাছে।

লুসিয়ঁর উত্তেজিত মুখচোখ দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল; না বলে কয়ে কেউ এসে তার সঙ্গে দেখা করলে সে বিরক্ত হয়। কিন্তু কোনো অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমা চাইবার মতো মনের অবস্থা নয় লুসিয়ঁর; মুশের কাছ থেকে আসার পর এক ঘণ্টাও হয়নি এখনো।

সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল লুসিয়ঁ :

'চিঠিটা জাল নয়।'

হেসে বলল ব্রতেই, 'তোমার কৃতী পিতাই বুঝি বললেন একথা?'

'না, বাবা বললে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু কিলমান বলে একজন লোক আছে, আমি জানি; আর গ্রঁদেলের সঙ্গে তার একবার যোগাযোগ হয়েছিল।'

লম্বা, চাপা ঘরটার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করল ব্রতেই; আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করতে করতে লুসিয়ঁ বুঝতে চেষ্টা করল, ও চটে উঠবে, বিস্মিত হবে, না বিহ্বলতার ভাব প্রকাশ করবে। কিন্তু ব্রতেইর বলিষ্ঠ কঠিন মুখে কোন ভাব প্রকাশ পেল না।

'কে বললে তোমাকে এ কথা?' জিজ্ঞেস করল ব্রতেই।

'নাম বলতে পারব না; কিন্তু কি যায় আসে তাতে? আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি......'

আলোটা জ্বালিয়ে দিল ব্রতেই; ঝাড়লণ্ঠনটার উজ্জ্বল আলোয় চোখ কুঁচকাল লুসিয়ঁ। তার পেছনে দাঁড়িয়ে উঁচু চেয়ারটার পিঠে হাত রেখে ব্রতেই বলল:

'আমি পরামর্শ দিই—এখুনি তুমি যা বললে তা তুমি ভুলে যাও। তুমি এখন অন্য লোকের হাতে ঘুঁটিমাত্র। নামটাও করতে চাও না এমন একজন লোক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলছ তুমি! আমি তোমাকে গ্রঁদেল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহেই বলছি।'

বিনাবাক্যে হলঘরটায় বেরিয়ে এল লুসিয়ঁ, অন্ধকারে অনেকক্ষণ হাতড়াল টুপিটার জন্যে, তারপর হঠাৎ আবার ফিরে এল বসবার ঘরে। ব্রতেই তখনো একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

অস্বাভাবিক শান্তস্বরে বলল লুসিয়ঁ, যেন সে আপন মনেই বলছে কথাটা: 'দেড় বছর ধরে আপনার সঙ্গে কারবার করছি আমি, এখন দেখছি ভেতরে কিছু ব্যাপার আছে...... কিন্তু আপনি কি অন্ধ? নাকি, আপনিও এই কিলমানকে চেনেন?'

লুসিয়ঁর মনে হল, ব্রতেই তাকে মেরে বসবে কিংবা 'বদমায়েস' বলে চেঁচিয়ে উঠবে; কিন্তু কোন ভাব-পরিবর্তন দেখা গেল না তার মুখে; শুধু বলল, 'অতি তুচ্ছ লোক তুমি, আমাকে অপমান করা তোমার ক্ষমতার বাইরে। আমার উপদেশ শোনো: রাজনীতির মধ্যে তুমি মাথা গলিও না—ও কাজ তোমার নয়, ইতর জোচ্চুরি আর না হয় বেশ্যার দালালী করাই তোমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে। যাও, বেরিয়ে যাও!'

মুঠো পাকাল লুসিয়ঁ, কিন্তু ব্রতেইর দিকে এগিয়ে না গিয়ে অনুগতের মত বেরিয়ে এল। রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর তার মনে হল, কেন ওকে মেরে বসলাম না! নিজের ওপর বিরক্তিতে সে ভুলে গেল অপমানটা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তারই মধ্যে হেঁটে চলল রাস্তা বেয়ে। মে মাসের শেষ, তবু শীত রয়েছে।

আর একবার লুসিয়ঁ অনুভব করল—তার জীবন-ধারণের সমস্ত কারণগুলো যেন ভেঙে পড়েছে চুরমার হয়ে; এই ভাঙনটা রুখবার যেন কোন উপায়ই ছিল না! কে একজন ঘাড়-কামানো কিলমানের কাজে লেগেছে সে—কী বিরক্তিকর! আর মুশ্ কিনা দিব্যি আছে গ্রঁদেলের সঙ্গে। মুশ্ যে বহুবার গ্রঁদেলকে ছেড়ে চলে আসতে চেয়েছে, সে কথা মনেই পড়ল না লুসিয়ঁর; মুশ্‌কেও পাপের অংশীদার বলে মনে হল তার। কে জানে? হয়ত মুশ্ কিলমানের সঙ্গেও থেকেছে। একই দলের ওরা সবাই! তার বাবা ঠিকই বলেছে, 'জার্মানদের হয়ে কাজ করছিস তুই!' কিন্তু বাবার কাছে আর ফিরে যাবে না সে, মেজোঁ-দ্য-কুলতুরের ওই সব নির্বোধগুলোর কাছেও আর যাবে না—ফিরবার পথ বন্ধ। আর সামনেও খালি শূন্যতা। কালকে হয়ত জোলিও জানতে পারবে, তার বাপ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে; জোলিও কেন ঘোড়দৌড়ের বাজী জেতার টাকার ভাগ দিতে যাবে অন্যকে? ব্রতেই তাকে অপমান করতে চেয়েছিল; ঠিকই তো—কাল থেকেই হয়তো তাকে চুরিই ধরতে হবে, কিংবা গণিকার অন্নে প্রতিপালিত হতে হবে। তবু, এদের এই রাজনীতির চেয়ে সেটা ভালো।

হঠাৎ লুসিয়ঁ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল: ছবির মতো সাজানো একটা আনন্দ-মেলার শোভাযাত্রা চলেছে; অর্ধনগ্ন মেয়েরা শীতের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে পথ-চল্‌তি অল্প কয়েকজন লোকের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করছে, শোভাযাত্রার হালকা, পীতাভ

আলোয় যেন শীতের অনুভূতিটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও। লুসিয়'র মনে পড়ল—তুষার-মেরু আর আঁরির মৃত্যুর কথা। কি ব্যাপার এসব?—শাদা রঙের গাড়ি, পলেস্তারার তৈরী বিরাট হাঁস, পাউডারের পুরু প্রলেপ লাগানো মুখ আর কাগজের ফুলের মুকুট-পরা মেয়েদের এই উৎসব-যাত্রা আজ কিসের জন্যে? অনেক চেষ্টায় মনে পড়ল শেষেঃ ও, হ্যাঁ, আজকের কাগজে ছিল বটে খবরটা—ফ্রান্সের লোকদের একটু আনন্দ দান করতে চায় পল তেসা। বজ্রমুষ্টি, লালঝাণ্ডা আর প্রাণহীন রাজনীতি তো ঢের হয়েছে! চিরজীবী হোক গণ-মনের আনন্দ আর দেশের ব্যবসা বাণিজ্য! পল তেসা সমস্ত পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে বলে মনস্থ করেছে—যুদ্ধ কিংবা বিপ্লবের ভয়ে পারী ভীত নয়। বসন্তের আবির্ভাবের সূচনা এই কার্নিভালের শোভাযাত্রা ঃ থিয়েটারে প্রথম রজনীর অভিনয় হিপোড্রোমে বাজীজেতার পুরস্কার, নাচ আর সৌখিন বেশভূষার প্রদর্শনী শুরু হবে এবার। পারীতে বসন্ত আসছে! —ত্বরা করো, ত্বরা করো ইংরেজ আর মার্কিন আনন্দ-সন্ধানীর দল!—টাকা এনো সংগে করে! নাচের জলসা আর পোশাকের দোকান খোলা রয়েছে তোমাদের জন্যে, সুগন্ধ-বিক্রেতারা আর গণিকারা তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে! ফ্রান্সের রক্ষা-কর্তা পল তেসা রয়েছেন তোমাদের অপেক্ষায়!

আর একটা সুসজ্জিত গাড়ি পাশ কাটিয়ে গেল; কাঁধে তিন-রঙা চাদর জড়ানো একটা মোটা-সোটা মেয়ে একটা বৈদ্যুতিক মশাল তুলে ধরে রয়েছে। যেন ফ্রান্সের প্রতীক ও। শীতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চোখ দুটো বিষণ্ণ, বিবর্ণ রাঙা ঠোঁট। লুসিয় দাঁড়িয়ে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল; তারপরে হঠাৎ চ্যাংড়া ছোঁড়াদের মত জিব ভেংচে উঠল মেয়েটার দিকে।

আট

খুব অল্পদিন আগেও 'যুদ্ধ' কথাটা বলতে লোকের মনে কতকগুলো অতীতের স্মৃতি জাগত। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো, শান্তশিষ্ট শুঁড়ি কিংবা হিসাব-সরকার দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায় বসে যৌবনের সেই উচ্চকিত দিনগুলোর কথা বলতে ভালবাসত; গল্প বলা আরম্ভ করত এই বলে, 'সেই যুদ্ধের সময়ে......' শ্রোতার কথা গ্রাহ্যই করত না কেউ কেউ; বিপদের অভিজ্ঞতাগুলো অনেক বাড়িয়ে, অংগভংগির সাহায্যে আর গলার স্বরে অনুকরণ করে বোঝাতে চাইত গুলি-গোলার বজ্র-বিভীষিকা আর মুমূর্ষুর গোঙানি। যুদ্ধের পর থেকে যারা গতানুগতিক নিরানন্দ জীবন যাপন করে আসছে, তারা যুদ্ধের বছরগুলোকে দেখে একটা নেশা-ধরানো অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে। গড়খাই-এর কাদা, উকুন আর আতংক ভুলে গিয়ে তারা উৎসাহের সংগে বর্ণনা করত—শত্রুর পরিখার পেছনে দুরূহ অভিযান, সামরিক উৎসব আর প্রেমাভিসারের দুঃসাহসিক বৃত্তান্ত। ছোট ছেলেরা বাপেদের যৌবনের দুঃখ-কষ্ট আর সাহসের কথা শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—তাদের কাছে যুদ্ধটা হয়ে উঠেছিল ঘোড়ার গাড়ি কিংবা তেলের লণ্ঠনের মতই অব্যবহার্য অতীতের জিনিস। এখন আবার এই পরিচিত শব্দটা নতুন করে চালু হল, যুদ্ধ বলতে এখন বোঝায় দুর্দিনের পূর্বাভাস

আর উৎপীড়ন, যেন আগামী দিনের পথ আগলিয়ে আছে এই যুদ্ধ। লোকে বলে,'যদি যুদ্ধ না বাধে তাহলে হেমন্তে বিয়ে করব আমরা' কিংবা, 'জুলাই মাসে পরীক্ষা পাস করব—যদি যুদ্ধটা না বাধে তাহলে।'

এবারকার বসন্তে খুব খানিকটা লেখালেখি হল সুদেতেনদের নিয়ে—যাদের কথা এর আগে কেউ শোনেনি। চেকোশ্লোভাকিয়ার ম্যাপের দিকে তাকিয়ে সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল, মনে পড়ল—১৯১৪র কথা, সার্বদের কথা আর সেই গরম দিনটির কথা, যেদিন ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে ছোট ছোট সাদা ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছিল—সাধারণভাবে সবাইকে সৈন্যদলভুক্ত হতে হবে।

মে মাসে যে আতঙ্কটা রটেছিল, দেখা গেল সেটা বাজে গুজব; কিন্তু তবু সেই গুমোট গরমের আবছায়ার দিকে তাকাতে ভয় পেল অনেকেই। আবার সেই সুদেতেনরা! ছুটি সম্বন্ধে বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে কিইবা বলবার আছে? সেই একই উত্তর পাওয়া যায়, 'যদি যুদ্ধ না হয়....।'

কিন্তু তবু ছুটির দিনগুলো ঘনিয়ে এল, আর যুদ্ধের ভয় উপেক্ষা করে পারীর লোকেরা বেরিয়ে পড়ল মৎস্য শিকারে কিংবা পাহাড়ী গ্রামের সন্ধানে। হতভাগা সুদেতেন-দের জন্যে তারা রোদ-জ্বলা এই শহরে পড়ে থাকতে রাজি নয়।

ফ্রান্সের আর তার নিজের শুভ জন্ম-লগ্নে তেসা দৃঢ়বিশ্বাসী। সে ঘোষণা করল, 'শান্তির মরুদ্যান আমাদের এই দেশ!' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংবাদপত্রে আর রেডিয়োতে উচ্চকিত প্রচার চলল ফ্রান্সের শান্তিপ্রিয়তা নিয়ে—যেন জিনিসটা কোন পেটেণ্ট ওষুধ কিংবা শ্রেষ্ঠতর একটা পানীয় বিশেষ! মার্কিনরা যাবে কোথায়? বাইস্‌বাদেনে? ওরে বাস্‌রে! ঝটিকা বাহিনী, সামরিক কুচকাওয়াজ, কয়েদীদের গারদখানা আর ফাঁকি দিয়ে তৈরি নকল-মালে জায়গাটা ঠাসা। কার্ল্‌সবাদে নয় নিশ্চয়ই : খোদ সুদেতেনরা থাকে ওখানে। ইতালীতে তো স্পেন-আগত আহত সৈনিকরা ভরে তুলেছে হাসপাতালগুলো, তা ছাড়া ওখানে এমনিতেই বড়ো গোলমাল চলছে—'কালো-কোর্তা'রা নতুন অভিযান শুরু করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ভিসি, কান, বিয়ারিৎস্‌—এসব জায়গা রয়েছে আগন্তুক-দের অপেক্ষায়। শান্তির মরুদ্যানই বটে, সুতরাং প্রতি সন্ধ্যায় মাইক্রোফোনের সামনে জেনেৎ পুনরাবৃত্তি করে চলেছে : 'শান্তির মরুদ্যান...অগ্রিম স্থান সংগ্রহ করে রাখুন... এমারাল্ড্‌ উপকূলে আসুন!...লামার্তিনের স্মৃতি-উজ্জ্বল মাশ' দেশের রূপসীদের ভুলবেন না...'হে সান্ধ্য-মঙ্গলধ্বনি, স্মিত-গন্ধা ওগো সোমলতা!'...নাদুস-নুদুস মুরগীর কোর্মা আর চমৎকার মদ...।'

পনেরই আগস্ট জেনেতের ছুটি হল; ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চেপে এল গার দ্য লিয়'-তে। আগের বছরগুলোর মতই পারীকে এ সময়ে মৃত শহর বলে মনে হয়। রাস্তা দিয়ে চলেছে দুচারজন মফস্বলের লোক কিংবা ঘোড়া-টানা টাঙ্গায় চেপে কয়েকজন ইংরেজ টহলদার। ফাঁকা, নিশ্চিন্ত শহরটাকে দেখাচ্ছে গ্রামের মতো। কাফের আঙিনায় মোটা-সোটা লোকগুলো দিব্যি বসে আছে জামার বোতাম খুলে বুক বের করে। চটি পায়ে দিয়ে দারোয়ানগুলো দরজায় বসে সুতো বুনছে। চারদিকে একটা স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া। উদারভাবে হাসছে সবাই; জেনেৎকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্‌সি-চালক শুভকামনা জানাল—ছুটিটা যেন তার আনন্দে কাটে।

ট্রেনে আলাপ-আলোচনা চলছে আবার সেই সুদেতেন, হিটলার আর যুদ্ধ নিয়ে।

ওসব কথায় কান দিল না জেনেৎ—তার কাছে ওসব অবাস্তব আর জীবন-বিচ্ছিন্ন অতি দূরের জিনিস। এই যে, ফ্ল্যারি এসে গেছে।

গরমে ভ্যাপ্‌সা আর আঙুরবনে ঘেরা এই সাদা ছোট্ট গ্রামটাকে জেনেতের এত পছন্দ হল কিসে? মদের ব্যবসায়ীরা ছাড়া আর কেউ এটার নামও জানে না। বোধ হয় ছেলেবেলায় শোনা এই মিষ্টি নামটা মনে পড়ে গিয়েছিল তার ঃ ফ্ল্যারি।

অনেকদিন বাদে সে প্যারীর বাইরে এসেছে। মাঠের সবুজে, চারদিকের নিস্তব্ধতায় আর খোলা হাওয়ায় যেন নেশা চড়ে গেল তার মাথায়; বুক ভরে নিশ্বাস নিল, নীল আকাশের নিচে ভোরবেলাকার তাজা আস্বাদ উপভোগ করল, মাঠে মাঠে ছুটে বেড়াল, পাহাড়ে উঠল, এখানকার সব কিছুই যেন শান্ত আর অচঞ্চল। ছেলেবেলায় দেখা এই রকম ছোট ছোট বাড়ি আর দ্রাক্ষাকুঞ্জ মনে পড়ল জেনেতের আর হেসে উঠে মনে মনে বলল, 'শান্তির মরূদ্যানে ...।' অন্তত এই একবার সে আন্তরিকভাবেই বলল তার বিশ্বাসের কথাটা।

আঙুর-গুচ্ছের ওপর গন্ধক ছড়িয়ে দিচ্ছে ভাঁটি-খানার লোকরা; ওদের হাত, জামা, সর্বাঙ্গ নীল রঙে ছেয়ে গেছে। প্রত্যেকটি আঙুরের গোছা সস্নেহে পরীক্ষা করছে আর খুশির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে নির্মেঘ আকাশের দিকে। ওদের একজন জেনেৎকে বলল, 'ভালো মদ হবে এ বছর।' প্রতি বছরের গ্রীষ্মঋতুর সঙ্গে এদের জীবনস্মৃতি জড়ানো—রোদ বেশি পাওয়া গেল কিনা আর আঙুরের ফসল ভাল তুলতে পারল কিনা তারই মাপে এরা সুখ-দুঃখের হিসেব করে। ভালো ফসলের সনটা লিখে রাখে পুরনো মদের বোতলের লেবেলে আর আগস্ট মাসের ঝিম-ধরা গুমোট গ্রীষ্মদিনের সঙ্গে সেই স্মৃতি জড়ানো থাকে। এবছর ইতিমধ্যেই আঙুরের রঙ কালো হতে শুরু করেছে।

নিচের উপত্যকাটা গাছে ছাওয়া। প্রত্যেকটি গাছের যেন নিজস্ব একটি জীবন আছে; ওক্, এম্ আর অ্যাশ্ গাছগুলো মানুষগুলোর চেয়ে বয়োবৃদ্ধ আর মানুষগুলোও এই গাছগুলোকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্রাম করে এদের ছায়ায় বসে, ক্লান্তির মুহূর্তে আর প্রেমের অভিসারে আসে এদেরই তলায়—খায়, ঘুমোয় আর পরস্পরকে চুম্বন করে এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে। এই গাছগুলোর মধ্যে একটা জেনেতের ভারি প্রিয় ঃ ঘোলাটে ছোট্ট নদীটির কূলে যে লম্বা অ্যাশ গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, সেইটা। আঁধার-বরণ পাতাগুলো যেন উজ্জ্বল আকাশের পটে খোদাই করা, খাড়া দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে, বাতাসের ঝাপটায় কিছুতেই নোয় না; জেনেতের মনে হয় গ্রামের প্রবেশ-পথে গাছটা প্রহরীর মতো যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে শান্তি রক্ষার জন্যে।

যুদ্ধের কথাটা ফ্ল্যারিতেও পৌঁছল এসে। গ্রাম্য কাফেটার ঠাণ্ডা আবছায়ায় বসে যেখানে চাষীরা মোটা কাঁচের গেলাশ-ভর্তি কড়া মদে আস্তে আস্তে চুমুক দেয়, সেখানে শহরের রেডিয়োর সংবাদ-ঘোষক ওই অমিশুক ঝগড়াটে লোকটার চড়া গলা শোনা গেল। লোকটা সুদেতেনদের কথা আর কে একজন হায়েন-লায়েনের কথা বলল। ভ্রূকুটি করে তাকাল গাঁয়ের লোকে : যুদ্ধ গুড়ি মেরে আসছে তাদের ঘরের দিকে? এমন সময়ে এসে হাজির হল ওজেন—লোকটা গাঁয়ের গোপালভাঁড়। গাল দুটো লাল, বিরাট গোঁফ—কি এক অজ্ঞাত কারণে লোকে তার ডাকনাম দিয়েছে 'অস্ট্রিয়ান'; যদিও পাশেরই এক গাঁয়ে তার জন্ম। সে এসেই সোৎসাহে ঘোষণা করল 'চল্লিশটা চিংড়ি মাছ খেয়েছি আমি আজ।' হায়েনলায়েনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সবাই এসে ভিড় জমালো 'অস্ট্রিয়ান'কে ঘিরে

কোন্ নদীতে ওই চিংড়ির সন্ধান পাওয়া গেল তারই বৃত্তান্তটা ওর পেট থেকে বের করবার চেষ্টায়; বজ্জাতটা নিঃশব্দে হাসতে লাগল দাঁত বের করে। অন্যান্য কয়েকটা ঘটনাও ঘটে গেল : লিয়ঁ থেকে কয়েকজন লোক এল একজন জোতদারের খামারে ফসল তোলার উৎসব উপলক্ষে মদ কিনে নিয়ে যেতে; বুড়ো বাঁজ লতাপাতা দিয়ে কতকগুলো ঝুড়ি তৈরি করে বেচল কয়েকজন বিদেশী টহলদারের কাছে; কাফেওলার ছাগলটা পালিয়ে গেল। এই এখানকার জীবন কিন্তু খবরের কাগজে আর রেডিয়োতে একঘেয়েভাবে মৃত্যুর কথাই খালি বলা হচ্ছে—ওসব অনির্দিষ্ট কথায় কান না দেওয়াই হল যারা বেঁচে আছে তাদের চেষ্টা।

গ্রামের জীবনের অংশ হয়ে উঠল জেনেৎ; চাষীরা ওকে মদ দেয় আর কৌতুক করে ওর সঙ্গে; নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে 'ভারি রংদার মেয়ে'—যার অর্থ, 'ভারী চমৎকার মন-খুশি-করা মেয়ে।'। এখানে এসেই জেনেৎ ভুলে গেল পারীকে যেখানে সে ফেলে এসেছে তার একঘেয়ে ক্লান্তিকর নির্বান্ধব কর্মজীবন। পারীর ফিটফাট কেতাদুরস্ত মেয়েদের নিয়ে মোটর গাড়িগুলো যখন বড়ো রাস্তা বেয়ে চলে যায়, তখন সেই শত্রুভাবাপন্ন জগতের কথা মনে পড়ে জেনেতের—ভয়-মেশানো চিন্তা জাগে তার মনে, 'শিগ্‌গিরই ফুরিয়ে যাবে এই ছুটির দিনগুলো!'

তারপর, একদিন যখন ভয়ানক গরম পড়েছে, জ্বলন্ত রোদ্দুর থেকে বাঁচবার জন্যে সবাই গিয়ে জুটেছে ঠাণ্ডা কাফেটায়, একজন পারীর লোক এসে আলাপ করল জেনেতের সঙ্গে। ছুটির পোশাক-পরা লোকটার পায়ে রবারের জুতো, জামায় কলার নেই; ভারি ফুর্তিবাজ, ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো পাইপ্, তিল-চিহ্নিত পাতলা মুখ আর উজ্জ্বল চোখ—দেখে মনে হয়, মার্শ বা দিজ-র কোন মদের ব্যবসায়ী হবে হয়তো; সশব্দে ঠোঁট চেটে আর গাল ফুলিয়ে হাওয়া ছেড়ে তারিয়ে তারিয়ে মদ খায় লোকটা। সেদিনটা গরমে তন্দ্রা এসেছে সকলের; কাফেওলার বউটা ঘুমুচ্ছিল নাক ডাকিয়ে; কিন্তু পাইপ মুখে এই লোকটার যেন হাসিখুশির সীমা নেই। 'অস্ট্রিয়ান'-এর সঙ্গে ঠাট্টা করে আর কাফেউলীকে নিয়ে কৌতুক করে জেনেৎকে হাসাল খুব খানিকটা; তারপর শুরু করল মার্সাইএর উপাখ্যান বলতে : 'অলিভিএ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলে কিনা, 'কানবিএর-এর রাস্তা ধরে আমি যখন যাচ্ছিলাম, তখন দেখা পেলাম মারিয়ুসের। চেঁচিয়ে ডাকলাম, ওহে মারিয়ুস! কিন্তু ফিরেও তাকালো না ও। শেষকালে জানা গেল—কী কাণ্ড দেখো দিকি!—ও কিনা ও নয়, আর আমি আমাতে নেই!' হেসে গড়িয়ে পড়ল জেনেৎ, 'কী কেলেঙ্কারী! ও কিনা ও নয়, আর আমি আর আমাতে নেই...!' এত সংক্রামক হয়ে উঠল হাসিটা যে কাফেউলীটা পর্যন্ত জেগে উঠল দিবানিদ্রা থেকে, তারপর একটু হেসেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এই বিদেশীটাকে জেনেতের পছন্দ হল—যদিও লোকটা বয়সেও তরুণ নয়, দেখতেও সুশ্রী নয়। লোকটার সরল আমোদপ্রিয় স্বভাব আর এক ধরনের জীবনীশক্তি জেনেৎকে আকৃষ্ট করেছে। জেনেতের জীবন কাটে অভিনয়ের জগতে—যেখানে প্রত্যেকের হাবভাব আর বাচনভঙ্গী কৃত্রিম। এই লোকটার মধ্যে—একে সে মদের ব্যবসায়ী বলেই ধরে নিয়েছে—এমন কিছু আছে যা তার হৃদয়কে স্পর্শ করল। সহজভাবেই গল্প করল ওরা দুজনে, তারপর গরম কমে গেলে একসঙ্গে বেড়াতে গেল। জেনেৎ ওকে নিয়ে এল তার সেই প্রিয় গাছটির তলায়; ঘাসের ওপর ও বসে পড়ল, মাথার টুপি নামিয়ে রেখে মস্ত বড়ো এক সিল্‌কের রুমাল দিয়ে কপাল মুছে বলল, 'আশ্চর্য সুন্দর এই জায়গাটা।' কেমন বিষণ্ণ দেখাল ওকে, জেনেৎও বিমর্ষ বোধ করছিল।

'কেমন যেন মনমরা ভাব দেখছি তোমার' বলল লোকটা, 'এই একটি ক্ষমতা আমার আছে : মানুষের মনের ফূর্তি একেবারে নষ্ট করে দিতে পারি আমি। রূপকথায় শোনা যায়, মুঠো ভরে ধুলো তুলে নিত আর সেটা হয়ে যেত একমুঠো সোনা; আমার বেলায় ঠিক তার উল্টো : সোনা বদ্‌লে হয় ধুলো।'

'বুঝেছি,' বলল জেনেৎ।

জেনেতের দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ল আর একটা গাছের কথা—ধুলোয় ভরা, তন্দ্রাচ্ছন্ন গাছটা দাঁড়িয়ে আছে পারীর সেই পার্কের নাগরদোলাটার পাশে। জেনেৎও সুখী হতে পারত, কিন্তু কেন সে প্রত্যাখ্যান করল সুখকে? সেও এই লোকটির মতো—সোনা বদলে হয় ধুলো, এই অচেনা লোকটি তার কাছে আরও প্রিয় হয়ে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে বলল সে :

'আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে বড়ো অদ্ভুতভাবে। আমি এখনো জানি না তুমি কে? আমি একজন অভিনেত্রী। তাই বলে ভেবো না আমি খুব নাম করা কেউ। ছোটখাটো অভিনেত্রীদের মধ্যে আমি একজন—রেডিয়োতে কাজ করি। জীন ল্যাবেয়ার। জেনেৎ। তোমার নাম কি?'

'দেসের। ফ্রান্সে বোধহয় লাখখানেক দেসের আছে।'

'দ্যুপোঁ-র সংখ্যা আরও অনেক বেশি। আমি একজন দেসেরের কথা শুনেছি, কোটিপতি লোক সে। সবাই বলে, লোকটা পাগল, কিন্তু আর সব বড়োলোকদের মতই সেও বড়ো সাংঘাতিক জীব...।'

হাসল দেসের। বলল, 'নিশ্চয়। কিন্তু পরিচয় আদানপ্রদান তো হল। এবার এস, জ্ঞানী অলিভিএর মত বলা যাক : তুমি কিনা তুমি নও আর আমি আর আমাতে নেই। কেমন? অভিনেত্রীর জীবন তোমার বেশ লাগে, না? কি ধরনের ভূমিকায় নামো তুমি—সরলা কিশোরী? হতাশ প্রেমিকা? গ্রাম্য কুমারী? না, মার্গারিৎ গতিএ?'

'সিনৎসানো' মদ আর 'জাতীয়' বিছানার বিজ্ঞাপন ঘোষণা করি আমি। ফ্রান্সের সমৃদ্ধির কথাও বলে থাকি। বুঝতেই পারছ, আমি অতি সামান্য লোক। একবার আমার একটা প্রধান ভূমিকায় নামবার কথা ছিল। কিন্তু অন্য একজনকে ওরা দিল ভূমিকাটা; প্রশ্নটা ছিল অভিনেত্রীর খ্যাতি নিয়ে—অর্থাৎ আসলে যেটা টিকিট বিক্রির টাকার প্রশ্ন। আমার এক মঞ্চ-ব্যবস্থাপক বন্ধু আছে—মারেশাল তার নাম; বোধহয় কখনো শোনওনি তার নাম। ভারি বুদ্ধিমান লোক ও—নাটক মঞ্চস্থ করার কথা সর্বদাই ভাবে, কিন্তু কোন নাটক প্রযোজনা করেনি এ পর্যন্ত—টাকা নেই ওর। একটা বিপ্লবী থিয়েটারের দল আছে ওদের। কিন্তু লোকের রুচি বদলে গেছে আজকাল। অভিনব পরিকল্পনায় একটা নাটক প্রযোজনা করবে ভেবেছিল মারেশাল, আর আমার তাতে প্রধান ভূমিকায় নামার কথা ছিল। কিন্তু এ সবই তো স্বপ্ন। আমাকে সেই নকল মুক্তোর আর কোষ্ঠকাঠিন্যের নতুন কোনো ওষুধের বিজ্ঞাপন আউড়ে যেতে হবে। তাতে আমার কোনো দুঃখু নেই। শুধু, এতো শিগ্‌গির আবার পারীতে ফিরে যেতে হবে ভেবে মনটা খারাপ লাগছে...'

হঠাৎ জেনেতের মনে হল, তার সঙ্গীটি কি করে বা কোথা থেকে এসেছে, সে সব কিছুই জানে না সে। লোকটা পাশের মার্শ গ্রাম থেকে এসেছে, না পারী থেকে? মৃদুস্বরে শুধোল সে: 'তুমি কি ছুটিতে এসেছ এখানে?'

'হ্যাঁ। এই কাছেই জুলিয় যাবার পথে এক জায়গায় ছোট একটা বাড়ি নিয়েছি

আমি। অক্টোবর পর্যন্ত থাকব এখানে।'

তোমার পরিবার আছে সঙ্গে?

হেসে উঠল দেসের, 'একলা মানুষ আমি। সঙ্গী আর জুটল না কোনোদিন। কেন জানি না, লোকে আমার কাছ থেকে পালায়, না আমিই লোকের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচি, তবে তোমার কাছ থেকে পালাইনি।'

'আমিও তোমার কাছ থেকে পালাইনি। আমিও একলা মানুষ। মানে, আমারও নিকট আত্মীয়স্বজন ছিল। না, ঠিক বলিনি কথাটা, নিকট আত্মীয় নয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমি শুধু থাকতাম ওদের সঙ্গে—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু এতো হল একেবারে বাইরের দিকের ব্যাপার—একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করার মতো। কিংবা আরও ছোট ব্যাপার—এই ধরো যেমন কোন হোটেলের একটা ঘরে গিয়ে ওঠা। কিন্তু কি যায় আসে বলো?'

স্নিগ্ধ শান্ত সন্ধ্যা নামল; হাওয়ায় কেঁপে উঠল অ্যাশ্ গাছের পাতাগুলো; ব্যাঙের ডাক আর দূরে গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। কেমন স্তব্ধ হয়ে রইল জেনেৎ। হঠাৎ যেন দেসেরের মুখখানা দেখাল বড় শুকনো আর বুড়োটে, একটাও কথা না বলে তারা গ্রামে ফিরে এল। বিদায় নেবার সময় দেসের পরের দিন আসবে কিনা জিজ্ঞেস করল; একটু যেন তিক্ততার সঙ্গেই বলল, 'যেন স্কুলের ছেলের মতই প্রণয় মিলনের কামনা জানাচ্ছি এক জামির গাছের নিচে।'

'জামির গাছ নয় এটা, অ্যাশ্ গাছ। ওসব কথা থাক। মন খারাপ করো না যেন! আচ্ছা, কাল দেখা হবে!'

পরের দিন দেসের এসে অনেকক্ষণ গল্প করল; বলল, জেনেতের চোখ দুটো পেঁচার মত, পুডল্ কুকুরের মত তার চুল আর মিষ্টি স্বভাব, পারীর চ্যাংড়া ছুঁড়ীদের মতো তার কথা; কথায় কথায় জানাল, সংসারের ওপর ঘেন্না জন্মে গেছে তার; আর, শরীর একেবারে ভেঙে না-পড়া পর্যন্ত সে ফ্ল্যারির সমস্ত মেয়ের সঙ্গে একে একে নাচতে রাজি আছে; আরও জানাল—গাড়ির টায়ারটা তার ক্ষয়ে গেছে, গায়ের কোটটাও শতচ্ছিন্ন; লাফোর্গের কবিতা সে ভালবাসে; তবে যে জন্যেই হোক, পরিসংখ্যানে তার ভারি আগ্রহ।

আরও কয়েকদিন পরে ওরা দুজনেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার আগ্রহে নির্দিষ্ট সময়ে অধীর হয়ে উঠতে লাগল। ওদের দুজনের মনেই কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, আবার উচ্ছ্বাসপ্রবণ বাচালতাও নেই ওদের স্বভাবে। জেনেৎ ভাবল, 'ব্যাপারটা ওর কাছে ছুটির দিনের একটা অতি সাধারণ অ্যাড্ভেঞ্চারের মতোই।' দেসের ভাবল, 'আমি বয়সে বুড়ো, দেখতে কুৎসিত—তবে টাকায় সবই কেনা যায়।'

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকেও গরমটা রয়ে গেল; ভারি খুশি হল চাষীরা—ফেঁপে ফুলে উঠছে আঙুরগুলো, ভাঁটিখানার এবার গাঁজানি শুরু হবে শিগ্গিরই, কিন্তু জেনেতের আর সেটা দেখা হয়ে উঠবে না—তার ছুটি ফুরোবে আর এক সপ্তাহ পরেই।

শেষের দিনের আগের দিন যখন ওদের দেখা হল, দেসের অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে ধরল জেনেৎকে; প্রেমের ব্যাপারে সে স্কুলের ছেলেদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ নয়। তার আন্তরিকতা আর আবেগটুকু বুঝল জেনেৎ, তারপর তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বিমর্ষভাবে বলল, 'না, থাক।'

সঙ্গে সঙ্গে ওর নিষেধ মেনে নিল দেসের। তারপর কিছুক্ষণ ওরা একটা বনের

পথ ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চলল। এক সময়ে জেনেৎ বলল, 'অনেক জাম হয়েছিল এখানে —পাতাগুলো দেখ। রাগ কোরো না, তোমাকে দেবার মতো কিছু আমার থাকত যদি... তুমি তো জানো, আমি কুমারী নই। প্রেমের ব্যাপার এমন অনেক ঘটে গেছে আমার জীবনে। কি করে যে কী ঘটে গেছে তা নিজেও জানি না—হয়তো নিজেকে বড়ো একলা মনে হয়েছে বলেই, কিংবা হয়তো পুরুষের প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি বলেই...কিন্তু তোমার বেলায় আলাদা কথা।'

চুপ করে রইল দেসের।

এই কথাবার্তার পর জেনেৎ রাত্রে নিজেই নিজের ওপর চটে উঠল: আবার সে সুখকে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছে! সে নিজেই অবশ্য জানে না যে লোকটাকে সে সত্যিই ভালবেসেছে, না এটা শুধুই মনের একটা সাময়িক চাঞ্চল্য মাত্র। মাঝে মাঝে জেনেতের মনে হয়েছে, দেসেরের কথায় সে তার নিজের মনের চিন্তাগুলোরই যেন উত্তর পায়, আর সেইজন্যেই ওর সঙ্গে কথা কইতে তার ভালো লাগে। ওরা দুজনেই ক্লান্ত আর একলা। দুজনেই তারা দরদের সন্ধানে ঘুরছে সংসারে—এক হিসেবে তারা দুজনেই স্নেহের ভিখিরী। পরস্পরকে কি দিতে পারে তারা? আঙুর চাষ করে যারা তাদের সঙ্গে কথা কয়ে, ভাঁটি-খানার লোকদের সঙ্গে বিশ্রাম করে, আর গাঁয়ের কাফেটায় বসে সহজ কৌতুক করে মাঝে মাঝি খুশি হয় দেসের। এখন কিন্তু জেনেতের মনে হল যে সে ভালবাসে দেসেরকে। বনের মধ্যে এই ঘটনার জন্যে চটে উঠল ও নিজের ওপর: ওই অদ্ভুত ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ভাবটা দেখাতে গেল কেন? তারপর চটে উঠল দেসেরের ওপর: তার কথা শুনল কেন ও? শেষে ঠিক করল, কাল ওকে চুমু খাবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পর দিন দেসের শহুরে পোষাক পরে এসে হাজির। মুখে চোখে উদ্বেগের চিহ্ন, কান দিল না জেনেতের কথায়।

'এক ঘণ্টার মধ্যে আমি পারী রওনা হচ্ছি,' বলল সে।

'না না!' বলে উঠল জেনেৎ।

দেসের শান্তভাবে বলল, 'ধন্যবাদ।'

তারপরে একটা দলা-পাকানো রঙের কাগজ বের করে বলল:

'টেলিগ্রাম। ফিরতে বলছে ওরা আমায়। আচমকা পরিস্থিতিটা জটিল হয়ে উঠেছে...'

কতকগুলো পরিচিত শব্দ হঠাৎ জেনেতের কানে এল—হিটলার, হায়েনলায়েন, চেম্বারলেন—যেন কোন রেডিয়োর খবর শুনছে।

'যুদ্ধ বাধবে না নিশ্চয়ই?'

'তা মনে হয় না। তবে শান্তি রক্ষা করা চাই, যে কোনো উপায়ে... দেখেছ তো, এখানকার লোকেরা কত সুখী। এদের এই শান্তি রক্ষা করতে হবে আমাদের...'

'হ্যাঁ,' নিস্পৃহ গলায় বলল জেনেৎ।

এক মুহূর্ত পরেই সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেসা করল, 'কিন্তু তুমি কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। তোমার পরিচয়টাই এখনো আমার জানা হয়নি। প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি মদের ব্যবসাদার। কিন্তু এখন তুমি কথা বলছ—যেন কোনো ডেপুটি কিংবা মন্ত্রী।'

মুহূর্তের জন্যে খুশি হয়ে উঠল দেসের, 'না, না, মন্ত্রী নই আমি! ভগবান রক্ষে

করুন। আমি ব্যবসাদার বটে, তবে মদের কারবার করি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমিই সেই সাংঘাতিক জীব দেসের। তুমি প্রথম দিন বলেছিলে কথাটা, মনে পড়ে? তারপরে, এখন বোধ হয় তুমি আমায় চুলোয় যেতে বলবে?

বিস্মিত দৃষ্টিতে জেনেৎ তাকাল ওর দিকে—যেন এর আগে কখনো সে দেখেনি ওকে। কোটিপতি লোক। তার মনে পড়ল লিয়'র উদ্ধত, উন্নাসিক বড়োলোকগুলোকে। কিন্তু দেসের চাষীদের সঙ্গে মদ খায়, আলপাকার কোর্তা পরে ঘুরে বেড়ায় আর তৃতীয় শ্রেণীর একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে গল্প করে দিন কাটায়। জেনেৎ যে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সেটাই যেন সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও বেশি ঘোলাটে করে তুলল। লোকটা ফিরে চলেছে পারীতে—যাক গে! অ্যাশ্‌গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। ওকে চুমু খাবার ইচ্ছে হয়েছিল জেনেতের—কিন্তু হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল:

'রাত্রে ভেবেছিলাম, তোমাকে চুমু খাব; কিন্তু এখন আর তা অসম্ভব—এখন তুমি ভাববে, তোমার টাকার ওপর আমার নজর পড়েছে।'

চোখে জল এসে গেল দেসেরের; নিজের আবেগপ্রবণতায় নিজের ওপর চটে উঠে মৃদুস্বরে বলল, 'সেই পুরনো কথা।'

দেসেরকে দ্রুত চুমু খেয়ে, খাড়াই পথটা বেয়ে ছুটে ওপরে উঠে গেল জেনেৎ, তারপর ফিরে ডাকল দেসেরকে, 'আমার টেলিফোন নম্বর, স'ক্রেন '০৮২৬।'

আরও একটু ওপরে উঠে আবার বলল, 'বিদায়! পারীতে আবার দেখা হবে আমাদের, কেমন?'

দেসের ততোক্ষণে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছে, তেমনি সহজ, তেমনি খানিকটা কৌতুকপ্রিয়; বলল, 'নিশ্চয়। অবশ্য, যদি যুদ্ধ না বাধে।'

নয়

ফ্রান্সের নিরাপত্তার কথাটা তেসা এত দীর্ঘকাল ধরে সবাইকে বলে আসছে যে শেষ পর্যন্ত তার নিজেরই সেটায় বিশ্বাস জন্মে গেছে। কাউকে যদি বলতে শোনে, 'যদি যুদ্ধ না হয়,' তাহলে তেসা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'হবে না!' লোকটা যেই হোক না কেন, তেসার মুখে এ কথা শুনে খুশি হয়ে হাসে—হ্যাঁ, তেসা নিশ্চয়ই জানে কিছু! কিন্তু তেসা জানে না কিছুই। অন্য যে কোনো লোকের মতোই সে শুধু বসে বসে ভাবতে পারে, 'যুদ্ধ হবে কি হবে না?' কিন্তু নিশ্চিন্ত ভাবটা বজায় রাখল সে। তেসার এই প্রশান্তিটা সুদৃঢ় এবং ব্যাখ্যাতীত; নিশ্চিন্তভাবে পানীয়তে চুমুক দিচ্ছে যে অগণিত লোক তাদের দেখে, পলেত্তের অনর্গল কথায়, আর পার্লামেন্টের চিরাচরিত গালগল্প শুনতে শুনতে তেসার মনে এই নিশ্চিত ভাবটা ক্রমশ প্রশ্রয় পেয়েছিল; বিশ্বের সব কিছুই বোধগম্য এবং পূর্বনির্দিষ্ট বলে মনে হয়েছিল তার। কোথাকার কোন্ হতভাগা সুদেতেনদের জন্যে এহেন সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে—তাই কখনো সম্ভব নাকি?

তারপর এল সেপ্টেম্বর মাস। বার্লিন থেকে তারে খবর এল—নাটকের শেষ অঙ্কটা একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এসেছে। দু-চারটে আশার কথা বলে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তেসা লোয়ার নদীর ধারে এক বাগানবাড়িতে কয়েকদিন ছুটি কাটিয়ে আসতে যাবে—এমন সময় ঝড় উঠল। ঘটনার গুরুত্বটা বুঝল খুব কম লোকেই। কাগজের খবর বিশ্বাস করল না কেউ; মে মাসেও তো খবরের কাগজ-গুলো এমনি ঘোঁটিয়েছিল। 'থেমে যাবে শিগ্‌গিরই,' বলল সবাই। ছুটি যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল; সমুদ্রতীরে রৌদ্রোপভোগ করল সবাই, বেয়ে উঠল পাহাড়-চূড়োয়, বঁড়শি জুড়ে নিল ছিপের ডগায়। ছুটির দিনের শান্ত উষ্ণতার মধ্যে খবরের কাগজের সংবাদগুলোকে মনে হল নিতান্ত অবাস্তব। বৈদেশিক রাজ-দূতদের পাঠানো রিপোর্ট যে কেমন করে স্নানের আমোদ আর ভ্রমণের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে—সেটা বুঝে ওঠা একটু শক্ত বৈকি।

দায়িত্বটা ভয় পাইয়ে দিল তেসাকে। এ রকম বিশ্রী সময়ে কৌশল খেলিয়ে বিপদের সম্ভাবনা কমিয়ে বলে আর আত্মপ্রশংসায় খুশি হয়ে উঠে ক্ষমতা হাতে পেয়ে কোনো লাভ আছে কি? নিজের অতীত জীবনের কথা ভেবে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কয়েকবার : এর চেয়ে কোনো ডাহা খুনীর পক্ষসমর্থন করা অনেক সহজ—কোনো ধনী শ্যালিকার গলা কাটার আগে ওরা বড় বড় বক্তৃতা ঝাড়তে যায় না! কিন্তু মন্ত্রীত্ব ছাড়তে তেসা রাজি নয় কিছুতেই। ক্ষমতালাভের মধ্যে এক ধরনের মাদকতা আছে, বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে তার; এমন কি, পলেৎও লক্ষ্য করেছে এটা। সর্বদাই সচকিত হয়ে আছে, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, উৎসাহের অন্ত নেই যেন তেসার; নিজেই নিজেকে বোঝাচ্ছে, 'কী সময়ই যে পড়েছে! মন্ত্রী তো অনেকেই হয়েছে—সবাই তারা বিস্মৃত আজ। কিন্তু আমার কথা ইতিহাসের পাতায় পড়বে আমাদের নাতির নাতিরা—যদি শুধু ফ্রান্সের শান্তি রক্ষা করতে পারি!'

দিনে দিনে অবস্থাটা সংকটজনক হয়ে উঠতে লাগল; জার্মানদের রুখবার জন্যে এখনি কিছু একটা করা চাই। ইংরেজরা সবকিছু চুপচাপ হজম করে যাচ্ছে। আর ফ্রান্স শতধা-বিভক্ত। তেসা ফ্লাঁদ্যাঁ-কে একপাশে ডেকে বলল, 'শান্তি ঝুলছে সুতোর ডগায়।' আর বিষণ্ণ গলায় বারবার বলল কথাটা। তেসার ধারণা ওই চেকরাই যতো অনর্থের মূল। তারপর এসে পড়ে দাড়িওলা ফুজে—এসেই হুঙ্কার দিয়ে স্বাধীনতার কথা বলে, ক্লেমাঁসো থেকে উদ্ধৃতি দেয় আর কথার ফাঁকে বারবার বলে 'ফ্রান্স! ফ্রান্স! ঘাবড়ে গিয়ে তেসা বলল, 'চটছ কেন এতো? চেক্‌দের ডোবাবো না আমরা। আমি কথা দিচ্ছি...' তারপর সে এই দাড়িওলা মূর্তিমান ক্রোধের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আপাতত দেখা যাচ্ছে—যুদ্ধে নামতেই হবে আমাদের।'

তখনই প্রাগ থেকে একটা টেলিগ্রাম এল তার হাতে: দু-একদিনের মধ্যেই সুদেতেন-দের অভ্যুত্থান হবে; জার্মান ফৌজ তাদের 'ভাইদের রক্ষা করার জন্যে' সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকবে; চেকোস্লোভাকিয়ার ওপর কোনদিন হস্তক্ষেপ করা হবে না বলে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের জন্যে জোর করছে বেনেস। তেসা ভাবতে বসল—ফ্রান্সই যখন সর্বনাশের দুয়োরে, তখন চেকদের বাঁচানো সম্ভব কিনা? দক্ষিণপন্থীরা বিদ্রোহ করবে বলে শাসাচ্ছে। পাতলা-নেশা-ধরানো পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে দালাদিয়ে বলছে, 'ফ্রান্সের চাষীদের কচু-কাটা হতে দিতে পারি না আমি!' লেব্রাঁ তো

কাঁদছে। আর দেনিসের দল কতকগুলো ঝগড়াটে প্রস্তাব পাশ করছে আর ধর্মঘট পাকিয়ে তুলছে—হ্যাঁ, কোনো সাংঘাতিক খুনীর পক্ষসমর্থন করার চেয়েও এই সমস্যাটা নিশ্চয়ই দুরূহতর।

ব্রতৈইকে তার ঘরে ঢুকতে দেখে তেসা সখেদে নাক ঝাড়ল : আবার সেই অপ্রিয় কথাবার্তা শুরু করতে হবে তাকে; যেন সুদেতেনরাই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, পার্লামেন্টে বিরোধী-পক্ষের তাল সামলাতে হবে তাকেই, আবার ব্রতৈইকেও খুশি রাখতে হবে। হঠাৎ তেসার মনে পড়ল লুসিয়ঁকে আর সেই অপহৃত চিঠিখানার কথা। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, সুতীক্ষ্ম নাকটা তীক্ষ্মতর হয়ে উঠল শিকারী পাখির মতো।

'আপাতত দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধে নামতেই হবে আমাদের,' বলল তেসা।

'মোটেই না,' শান্তভাবে বলল ব্রতৈই, 'যুদ্ধে নামা আমাদের চলবে না, যুদ্ধে নামবোও না আমরা। যুদ্ধ-বিরোধী করে তুলতে হবে দেশটাকে। যুদ্ধের এই আতঙ্কটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকেও ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আজ শেয়ার বাজারে গিয়ে দেখি...'

'কিন্তু সুদেতেনরা এই সপ্তাহেই অভিযান শুরু করে দেবে বলে মনে হয়—কথাটা শুনেছো কি? সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে—জার্মানরা সীমান্ত পেরিয়ে আসবে। আমাদের আর কেটে পড়ার কোনো উপায় থাকবে না।'

'যদি সামরিক ব্যবস্থা জারি করো, তাহলে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। ফ্রান্সের পরাজয় তো নিশ্চিত। অবশ্য জার্মানির সঙ্গে আমাদের শত্রুতা তো বরাবরের। কিন্তু লড়াইয়ে নামার আগে তৈরি হয়ে নেওয়া দরকার, অথচ ফ্রান্সে আজ ঐক্যের অভাব। অনেকের মতে সুদেতেনদের ভাগাভাগি করে দেওয়াই উচিত—ঈশ্বরের প্রাপ্য ভাগ ঈশ্বরকে, হিটলারের প্রাপ্য ভাগ হিটলারকে। আমার দলের ডেপুটিদের তো এই যুক্তি। জার্মানীকে গোটাকতক সুবিধা ছেড়ে দেবার বিরুদ্ধে কারা? কামউনিস্টরা, পপুলার ফ্রন্টের লোকেরা, আর ঐ মস্কো-মোহমুগ্ধ ফুজেটা। চেকদের জন্যে ওদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই, ওরা চায় খালি নিজেদের জোর বাড়াতে। একশোজন ফরাসীর মধ্যে দশজন চায় আপোষ-রফা, পাঁচজন বেনেসের পক্ষে, আর বাদবাকি সবাই স্রেফ তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত ব্যাপারটায়। তুমি নিশ্চয়ই কমিউনিস্টদের পথে পা বাড়াবে না?'

'এ ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংস্রব কি? প্রশ্নটা হচ্ছে চেক্‌দের নিয়ে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওই চেক্‌দের যে মস্কোর সঙ্গে মিতালী।'

'আর আমাদের নিয়ে। প্রাগের সঙ্গে চুক্তিতে সই করেছিল লাভাল, কাশ্যাঁ নয়; পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাপারে দলগত স্বার্থের খাতিরে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়।'

ব্রতৈই বলল, 'মৈনাক-চুড়োয় বসে নেই আমরা। তুমিই তো বলেছিলে, বার্সেলোনার অ্যানার্কিস্টদের জন্যে ফরাসীরা প্রাণ দিতে চায় না। না, থামো! বলেছিলে কিনা? বেশ। তাহলে এখন, এই কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্যে ফরাসীরা প্রাণ দিতে চায় না; তাছাড়া, ক্রেমলিনের পোষ্যরা শাসন করে ঐ দেশ। পল, তুমি তো বোঝো, চেকোশ্লোভাকিয়া মস্কোর একটা ঘাঁটি মাত্র। হিটলারের বেড়া ডিঙোতে চাওয়াটা তো না-বুঝবার মত কিছু নয়।'

ব্রতৈইর সুস্পষ্ট, দৃঢ় মুখখানার দিকে তাকিয়ে তেসা বিস্মিত হয়ে ভাবল, ফুজের সেই প্রমাণপত্রখানা চুরি হয়ে যাবার কথা ও জানে কিনা। শেষ পর্যন্ত বলে উঠল, 'গ্র্যাঁদেল সম্বন্ধে তোমার মনোভাবটা কি?'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রতৈই বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে

এসেছি, আর তুমি কিনা শুধোচ্ছ এক অতি অকিঞ্চিৎকর হতভাগার কথা। তোমার কাজ এখনো শেষ হয়নি, পল জেনে রেখো!'

ব্রতেই চলে গেলে তেসা হিসেব করতে বসল : দক্ষিণপন্থীরা বেরিয়ে গেছে— তার মানে দুশো চল্লিশ ভোট চলে গেল বিপক্ষে। একটা কথা ব্রতেই ঠিক বলেছে—বিভক্ত হয়ে গেছে দেশ। গ্রঁদেল-সংক্রান্ত কথাটা সে তুলবে নাকি? কিন্তু তাহলে তো শুধুই বোকা বনবে সে—প্রমাণ কই তার হাতে? বার্লিনকে শাসানি দিলে কেমন হয়? কিন্তু হিটলার যদি ভ্রূক্ষেপ না করে? বড়ো বিপজ্জনক হবে চালটা। জেনারেল গামল্যাঁ 'চেক-ম্যাজিনো লাইন' সম্বন্ধে ঝাড়া তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিল। কিন্তু দালাদিএ যখন সোজাসুজি প্রশ্নটা তোলে তখন গামল্যাঁ বসে পড়াটাই ভালো মনে করেছিল : 'সামরিক বিভাগ গভর্ণমেন্টের আদেশ পালন করবে।' আদেশ পালন করাটা সোজা, আদেশ দেওয়াটাই কঠিন।

দুপুরে খাবার আগে তেসা ডেকে পাঠাল তার বন্ধু জেনারেল পিকার্‌কে—লোকটার ওপর ভরসা আছে তার। পিকার্‌কে তরুণ এবং শান্ত দেখাচ্ছিল— কি করে যেন মনে হয়, লোকটা ফ্রান্সের অপরাজেয় সমর-শক্তির প্রতীক। ব্রতেই বা ফুজের মতো মারমুখী সমালোচনা করে তেসাকে নাস্তানাবুদ করল না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টাও করল না; ঠাণ্ডা মেজাজে নিজের মতামত ব্যক্ত করল :

'সমস্যার রাজনীতিক দিকটা আমি বাদ দিয়ে বলছি— আমি সৈনিক মাত্র। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুরক্ষিত সীমান্তটা হারালে অবশ্য আমাদের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতি হবে। কিন্তু সত্যি কথাটা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। সামরিক ব্যবস্থা জারি করে আমরা সফল হবো বলে তো মনে হয় না। দেশের মনোভাব তুমি জানো। লোকে বুঝতে চায় না, সুদেতেনদের জন্যে কেন তারা লড়াই করতে যাবে। যুদ্ধ রুখবার জন্যে যুদ্ধ— এরকম কোনো ধারণায় তাদের বিশ্বাস নেই। জার্মানি সম্বন্ধে...'

'কিন্তু চেকরা ওদের রুখবে।'

'বেশ তো! এই ধরো সপ্তাহখানেকের জন্যে। এদিকে চলছে সাঁড়াশী-অভিযান; আসল আক্রমণটা আসবে অস্ট্রিয়ার দিক থেকে। হাঙ্গেরিয়ানরা এগুতে থাকবে, পোল্‌রাও। জার্মানরা সোজাসুজি আমাদের আক্রমণ করতে পারবে। অবশ্য আমাদের ম্যাজিনো লাইন আছে; কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু আমাদের উড়োজাহাজ নিতান্ত কম। আমাদের বৈমানিকদের সামরিক শিক্ষা অতি সামান্য। বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলোও আমাদের মোটেই আশানুরূপ নয়। আর স্পেনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে—'

বাধা দিয়ে বলল তেসা, 'তাহলে, অসম্ভব?'

ভদ্রতার সঙ্গে হাসল পিকার্। 'সৈনিকের কাছে ও কথাটার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সব দিক ঠিকমতো ওজন করে নেওয়া চাই। সামরিক পরাজয়ের চেয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারানো ভাল।'

পিকার্‌কে পেয়ে প্রথমটায় তেসা খানিকটা ভরসা পেয়েছিল, কিন্তু এখন বেশ একটু দমে গেল সে। পারী কি ভাবে ধ্বংস হবে তার একটা ভয়ংকর ছবি এঁকে দেখাল পিকার্। পিকার্ যা জানে জার্মানরাও জানে নিশ্চয়—চাল মারা আর সম্ভব নয়। কি করা উচিত এখন? আত্মসমর্পণ করা? কিন্তু, তাহলে ফ্রান্সের দায়িত্ব? ফ্রান্সের সম্মান?...অত্যন্ত

বিরক্ত হয়ে উঠল তেসা : যেন বেলজিয়াম বা পর্তুগালের মন্ত্রীত্বের সমতুল্য পদে তার অবনতি হয়েছে। তার দেশপ্রেম জেগে উঠল। নিজের ঘরে গোধূলির আলোয় একলা বসে তার মনে পড়ল : ভের্দ্যাঁর দিনগুলো, যুদ্ধে নিহত কমরেডরা, আর ১৯১৮র পেয়েও-না-পাওয়া বিজয়। হ্যাঁ, লুভ্র্-এর সেই প্রতিমূর্তিটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ : জয়ের দেবী পক্ষসমন্বিতা, কিন্তু ছিন্নমস্তা তিনি।

দেসেরের সঙ্গে খেতে বসল তেসা। চমৎকার সব খাবার খাইয়ে কি করে বন্ধু-বান্ধবকে পরিতৃপ্ত করতে হয় দেসের তা ভালোভাবেই জানে, কিন্তু তবু যেন খাওয়াটা জমবে না মনে হচ্ছে। এমন কি, খাবারের তালিকার দিকেও তেসা একবারও তাকায়নি। মার্সাই অঞ্চলের সব রকম খাদ্য মেলে এই রেস্তোরাঁটায়—রসুনের গন্ধ থেকে আর ধনে শাকের ওপর বিছানো ভাজা মাছ থেকেই সেটা ধরা যায়। অন্য সময় হলে, উর্বরা দক্ষিণ দেশের বিচিত্র সুখাদ্যের স্বাদ-গুণ বর্ণনায় তেসার মুখে খই ফুটত। কিন্তু এখন তার মনটা কোনো একটা অধঃপতনের গ্লানিতে ভরে উঠেছে।

হেসে বলল দেসের, 'কই, মদ মেশানো চিংড়ির শুরুয়া পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম না তো? সত্যি, কী ভয়ানক রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠেছি আমরা আজকাল!'

দেসেরও কিন্তু বিমর্ষ বোধ করছিল; একটা অতি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তার আছে: একই দিনে তাকে দেখে কখনো মনে হবে যেন কুড়ি বছর বয়স কমে গেছে তার, আবার কখনো মনে হবে যেন বয়স বেড়ে গেছে কুড়ি বছর। এখানকার এই ঢিলেঢালা লোকটাকে যদি জেনেৎ দেখত, তাহলে একেই সেই প্রেম-কাঙাল, রোমান্টিক, অ্যাশ্ গাছের ছায়ায় অভিসার-যাত্রী বলে চিনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হত।

গত কয়েক বছরে দেসের যেন দমে গেছে বেশ খানিকটা। আগে আগে যখন দিন-কাল ছিল অন্য রকম, তখন কোনো কিছুতেই তার বিশ্বাস না থাকলেও একটা মানসিক একাগ্রতা তার ছিল; বড়ো বড়ো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলত কিংবা ফেল মারিয়ে দিত, শেয়ার বাজারের লেনদেনে গোলমাল বাধিয়ে দিত আর ইচ্ছেমতো মন্ত্রীর অদল বদল ঘটাত—যেন হাতের দস্তানা বদলাচ্ছে। একটা প্রাণহীন সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর ছোটখাটো আনন্দগুলি জিইয়ে রাখার কাজে নিজের সমস্ত শক্তি সে নিয়োগ করেছিল। ধর্মঘটের হিড়িক, ফ্যাশিস্টদের সন্ত্রাসবাদ, স্পেনের নাটকীয় ঘটনা, হিটলারের অস্ট্রিয়া আত্মসাৎ আর দেশের পক্ষে ব্যাপকতর ও বৃহত্তর পরীক্ষার সম্মুখীন হবার সমস্যা—ইত্যাদি যে সব ঘটনা গত কয়েক বছরে ঘটে গেছে, তার ফলে জীবন অর্থহীন হয়ে উঠেছে তার কাছে। সমস্ত পৃথিবীটার আবহাওয়াই গেছে বদলে; সেই পুরনো ধাঁচের ফ্রান্সের উৎসাহী মৎস্যশিকারী, গ্রাম্য নৃত্যোৎসব আর র‍্যাডিক্যাল সমাজতন্ত্রী—এদের কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে বাঁচানো যাবে বলে কল্পনা করাও অসম্ভব। দেসের কাজ করে চলেছে বটে, কিন্তু সে যেন অনেকটা অভ্যাসবশেই। গোঁয়ার জুয়াড়ীর মতই সে একটিমাত্র সংখ্যার ওপরে সমস্ত বাজী ধরছে আর জুয়োর ঘুঁটিগুলো যেন ওকে বোকা বানিয়ে মজা দেখছে। অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি: লোকে তাকে প্রশ্ন করে, তাকেও উত্তর দিতে হয়, আর তার প্রত্যেকটি কথা নির্দেশ হিসেবে গৃহীত হয়।

তেসাও তাকে সেইভাবেই দেখে। চিংড়ি মাছের শুরুয়ার জন্যে তেসা এই রেস্তোরাঁয় আসেনি। ভোজ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্যে দেসের অন্যদিকে তার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চায়: কিন্তু প্যারীর ধ্বংসলীলার চিন্তায় আর দক্ষিণপন্থীদের ভোটের কথা ভেবে তার মন

ভারাক্রান্ত।

'কি হবে?' ক্লান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল সে।

'পথ ছেড়ে দিতে হবে আমাদের। ব্রতেইর সঙ্গে কথা হয়নি তোমার?'

'হ্যাঁ; ভয়ানক গরম গরম কথাবার্তা বলছে ওরা। ওদের কাছে বেনেসও 'বলশেভিক'।'

হেসে ফেটে পড়ল দেসের, 'তা তো বটেই, আজানা হল গিয়ে প্রথম বলশেভিক। তৃতীয় বলশেভিক কে হবে কে জানে! তুমি, না চেম্বারলেন? ভারী মজার কথা। কিন্তু সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট : পথ ছেড়ে দিতে হবে আমাদের। হাতের তাসগুলো সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছে ওরা—তা তো তুমি বোঝো। এখন আর ধর্মযুদ্ধে নামা অসম্ভব; যুদ্ধমাত্রই এখন গৃহযুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। আগে হলে, এই গৃহযুদ্ধের বিপদটা আসত গোপন রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা জনসাধারণের অসন্তোষ কিংবা সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ থেকে। এসব তো রীতিমত লোককাব্যের বিষয়বস্তু! কিন্তু এখনকার কারবার হচ্ছে বিরাট একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে নিয়ে, যে রাষ্ট্রে বড় বড় সব রাজনীতিজ্ঞরা রয়েছেন আর রয়েছে বিমান-বাহিনী—এইটাই আরও খারাপ। পূর্ব ইউরোপের দিকে লোকের সন্দেহের চোখে তাকানোটাই স্বাভাবিক। রুশরা যদি আমাদের সঙ্গে আসে, তাহলে ব্রতেইর দল পরাজয়বাদী হয়ে উঠবে। রুশরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে শ্রমিকরা হয়ে উঠবে পরাজয়বাদী। আর যদি রুশরা নিরপেক্ষ থেকে অপেক্ষা করা আর লক্ষ্য করে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করে, তাহলে সবাই পরাজয়বাদী হয়ে পড়বে, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরাজয়ের কথা ভাবতে ভয় পায় আবার জয়ের কথাতেও ঘাবড়ায়। সবচেয়ে ভয় পায় ওরা মস্কোর শক্তিবৃদ্ধিতে। এমন অবস্থায় যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করে দেখো না একবার! শ্রমিকরা যে 'লা-মার্সাই' গান গায়, সেটা বুঝি। কিন্তু ওসব গ্রাহ্য কোরো না। গান গাইতে চায় গেয়ে বেড়াক; কিন্তু পথ ছেড়ে দিতেই হবে আমাদের।'

এক প্লেট চিংড়ি মাছ নিয়ে চুপ করে বসে রইল তেসা; আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। গরম সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, তারপর বলল, 'বড় ক্লান্ত আমি। কিন্তু একটা কিছু ঠিক করতে হবে। দালাদিএটা কি রকম লোক তা তুমি জানো—ও খালি ঘুষি আস্ফালন করে চেঁচাতে পারে, 'আমি, আমি, আমি...' নেপোলিয়ন...কিন্তু আসলে ও একটা ভাঁড়; বাজে কথা বলে ভুল বোঝাতে চায় ও। কিন্তু জার্মানরা যদি পাঁচশ কি হাজার বোমারু-বিমান পাঠিয়ে জবাব দেয়, তাহলে? পিকারু বলছে, আমাদের বিমান-বাহিনী কোনো কাজের নয়। ভয়ানক একটা দায়িত্ব চেপেছে আমার ঘাড়ে। প্রাগ রয়েছে উত্তরের অপেক্ষায়; আমরা ওদের কথা দিয়েছিলাম...'

'সম্প্রতি চেম্বারলেনের সঙ্গে আমি নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি,' বলল দেসের, 'ভারি হুঁশিয়ার ব্যবসাদার লোকটা—হিংসুটে, কিন্তু কথাবার্তা যেন মধুর মতো! ওর ঠাকুর-দাদার দেওয়া মস্ত একটা গোলগাল ঘড়ি বের করে দেখাল, একটা নীতিবাক্য খোদাই করা আছে ঘড়িটার গায়ে : 'এমন কোনো প্রতিজ্ঞা কোরো না যা পূর্ণ করতে পারবে না'—ব্যবসাদারের পক্ষে ভারি উল্লেখযোগ্য নীতি। কিন্তু মন খারাপ কোনো না; তুমি তো কোন প্রতিজ্ঞা করনি, ও কাজটা করে গেছে তোমার পূর্ববর্তীরা। আর, তুমি করলেও কিছু যেতো আসতো না। রাজনীতি ব্যবসা নয়—রাজনীতিতে সততা বজায় রাখাও অসম্ভব।'

'কিন্তু একটা কিছু ঠিক করতে হবে আমাদের...'

'ঠিক যা করবার তা অন্যরাই করবে আমাদের হয়ে...এক ঘণ্টা আগে লণ্ডন থেকে ডেকেছিল আমার টেলিফোনে। মাননীয় চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—বুড়োটা ভারী ঘাগী। সুতরাং কোনো দুর্ভাবনা নেই তোমার। আপাতত আমরা হলাম একটা বৃটিশ উপনিবেশ, পরে হয়তো জার্মানীর কোন একটি প্রদেশও হয়ে দাঁড়াতে পারি। ব্রতেই হবে গলেতিএ। অত্যন্ত শয়তানী ব্যাপার—কিন্তু করার নেই কিছু। ফরাসীরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমি আবার বলছি—পথ ছেড়ে দিতেই হবে আমাদের।'

আরও বেশি বিষণ্ন হয়ে পড়ল দেসের। কিন্তু তেসা এতক্ষণে হাসতে শুরু করেছে। চেম্বারলেনের সিদ্ধান্তের খবরটা ভারি উৎফুল্ল করে তুলেছে তাকে, এখন তার গভর্নমেণ্ট দায়িত্বমুক্ত। বৃটিশরা যদি সরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে, এমন কি ওই ফ্রজেটাকেও লেজ গুটোতে হবে; তাহলে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দলকেই মন্ত্রীদলের পক্ষে ভোট দিতে হবে, আর এই বলে চমৎকার একটা বক্তৃতা দেবার সুযোগ পাওয়া যাবে যে 'এই দুর্যোগের মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন।'

চিংড়ি মাছটার বেলায় অন্যমনস্ক ছিল তেসা, কিন্তু এবার এই ষাঁড়ের লেজের কোর্মাটা অত্যন্ত উপভোগ করল; লোভীর মত ঠোঁট চেটে, ঢেঁকুর তুলে আরাম করল; তারপর ক্লান্তভাবে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে, ক্ষীণ হাসি হেসে, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'কই, কিছু খাচ্ছো না তো তুমি ?'

'খিদে নেই।'

এতক্ষণে তেসা লক্ষ্য করল কেমন যেন খারাপ দেখাচ্ছে দেসেরের চেহারাটা। মুরুব্বিয়ানা করে সে এই সর্বশক্তিমান কোটিপতির পিঠ চাপড়াল, 'দু-এক বছরের মধ্যেই আমরা সামলে নেব সমস্ত। এখন দেরি করিয়ে দেওয়াটাই আসল কাজ। কিছু না খেয়ে ভালো করছ না তুমি। পবিত্র মশাল তুলে ধরে রাখতেই হবে আমাদের। হ্যাঁ, খাওয়াটি দিব্যি হল। এত খিদে পেয়েছিল, অথচ জানতেও পারিনি এতটুকু। আচ্ছা, আর একটু ছানা নেওয়া যাক।'

খেয়েই চলল তেসা। দেসের হেসে বলল, 'খুড়িমা মারা যাবার পর আমার কাকা দু-দুটো আস্ত হাঁসের কাবাব খেয়ে বলেছিলেন, 'বড় দুঃখ পেয়েছি তাই...' তেসা বাড়ি ফিরল খোশ্ মেজাজে।

আমালি জিজ্ঞাসা করল, 'মদ খেতে বসেছিলে বুঝি?'

'না। তবে খেয়ে এসেছি। খাওয়াটা দিব্যি হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। তাছাড়া, অনেক গুরুতর রাজনৈতিক খবরাখবরও পাওয়া গেল। ওসব তুমি বুঝবে না—সাংঘাতিক জটিল সব ব্যাপার। তবে সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট : পথ ছেড়ে দিতে হবে আমাদের।'

পোশাক ছাড়তে ছাড়তে তেসা হাল্কা মনে গান ধরল গুনগুনিয়ে, 'পথটি ছেড়ে দাও...দাও...দাও...দাও।'

দশ

জোলিও প্যান প্যান করছিল, 'ওই খনিজ-জলের জায়গাটায় থাকার সময়ে আমাকে প্রায় না খাইয়ে রাখা হয়েছিল, তবু একটুও রোগা হইনি। কিন্তু এখন বোধহয় মণখানেক ওজন কমে গেছে আমার।' সম্পাদকের আপিসটা দেখে সামরিক হেড্-কোয়ার্টার বলে মনে হয়। জোলিওর ব্যবহারটা জেনারেলের মতো; রহস্যজনক সব প্যাকেট আসে তার নামে, অধিকতর রহস্যজনক সব হুকুম জারি করে। দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরাট এক মানচিত্র। আসলে সে নিজে কিছুই বুঝতে পারছে না আর তাই দুর্ভাবনায় রোগা হয়ে যাচ্ছে। দেসেরকে চটাতে সে ভয় পায়, কারণ দেসের এখনো 'লা ভোয়া নুভেল্'-এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কিন্তু দেসেরের পেট থেকে কিছু বের করা অসম্ভব; খালি বলে, গভর্নমেন্টকে সমর্থন করে যাও। কিন্তু সমর্থন করবে কাকে? মন্ত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে একমত হতে পারছে না; দালাদিএ মাদেলের বিরুদ্ধে; তেসা রেনোকে পাত্তাই দেয় না। অথচ এরা প্রত্যেকেই জোলিওর কাছ থেকে কাজ পেতে চায়।

দেসেরকে ধন্যবাদ—'লা ভোয়া নুভেল্' সব চেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকাগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। জোলিও বেপরোয়াভাবে তার পৃষ্ঠপোষকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে; পররাষ্ট্র-বিভাগের গোপন তহবিল থেকে টাকা নেয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেও ঘুষ নিতে ইতস্তত করে না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে এই দুর্বলতাটুকুর জন্য সে মাঝে মাঝে নিজের ওপরই চটে ওঠে। যদি দেসের হঠাৎ জানতে পারে তাহলে কি হবে? —কিন্তু তার রোজগারের অনেক উপায় আছে—এই ভেবে নিজেকে সে সান্ত্বনা দেয়। তাছাড়া, তার স্ত্রীর একটা পশমের কোট চাই, তার সহকারী-সম্পাদকরা ভারী লোভী, আর সবছেয়ে বড়ো কথা, যাদের কাছ থেকে সে টাকা নিচ্ছে তারা সবাই খাঁটি ফরাসী, দেসেরের বন্ধু—সুতরাং কাউকেই সে ঠকাচ্ছে না। কিন্তু ইদানীং বেচারী বড়ো গণ্ডগোলের মধ্যে পড়েছে। সরকারী ইস্তাহারগুলো যেন স্কটিশ ধারাস্নানের মতো—কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জল। গভর্ণমেন্টের মতলব বুঝে ওঠা কঠিন; কর্তৃপক্ষ কি যুদ্ধের জন্যে তৈরি হবে, না আত্মসমর্পণ করবে? জোলিও স্ত্রীকে বলে, 'রাজনীতি বলে না একে। একটা গণিকালয় এটা। ওরা শেষ পর্যন্ত না বেআক্কেলের মতো কিছু করে বসে—ভগবানের কাজে এই চাই! কিন্তু সহকারীদের সামনে সে সবজান্তা ভাব দেখায়, যেন কূটনৈতিক গোপন তথ্য-গুলো সবই তার জানা। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে তার সেই একই উত্তর : 'ভারি জটিল খেলায় নেমেছি আমরা, খুবই জটিল...'

দেশের লোক দিশেহারা। কোনো কোনো কাগজে লেখা হল, হিটলার স্ট্রাস্বুর্গ আক্রমণের আয়োজন করছে; অন্যান্য কাগজ ঘোষণা করল, চেকরা সুদেতেনদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে তবে এ ব্যাপারের সঙ্গে ফ্রান্সের কোনো সম্বন্ধ নেই। ডজনখানেক প্রবন্ধ পড়ার পর লোকে উদ্বেগের সঙ্গে শুধোয়, 'দুত্তোর ছাই! কি বলতে চায় এরা? আর, সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, কি করলে মিটবে এসব?' এরই মধ্যে রোজকার জীবন

যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে। আঙ্গুরের ফসল তোলবার জন্যে তৈরি হয় চাষীরা, থিয়েটারগুলোয় নতুন নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, স্কুলের ছেলেরা স্কুল খোলার অপেক্ষায় থাকে। চিনি আর চালের বরাদ্দ নিতে গিয়ে মেয়েরা বলাবলি করে, 'শুধু যদি যুদ্ধটা না বাধে!' আর সব জায়গাতেই এমন লোক কিছু থাকে, যারা জবাব দেয়, 'হবে না যুদ্ধ। চেকদের ব্যাপার আমাদের কি? খালি এই মার্কস্‌বাদীরা আর ইহুদীরা যুদ্ধ চায়। কিন্তু আমরা শিগগিরই ওদের জারিজুরি ভেঙে দেব...।' বুর্জোয়ারা চেম্বারলেনের প্রেমে পড়ে গেছে, নামকরণ করেছে 'শান্তির দেবদূত'; কবিরা তার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখছে; কাগজগুলো টাকা তুলছে চেম্বারলেনকে কোনো একটা দামী উপহার পাঠাবে বলে; ফ্রান্সের নানা শহরের রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে 'রু চেম্বারলেন'। বাহারে স্নানাগারগুলিতে, জুয়োখেলার আড্ডায়, গ্রামের জমিদারীতে আর পারীর ধনী-অঞ্চলে গ্রীষ্মদিনের দিবানিদ্রা থেকে অসময়ে জেগে উঠে লোকে চেকদের অভিশাপ দিয়ে বলছে, ওরাই গণ্ডগোলের মূল আর বুলগেরিয়ানদের চেয়েও ওরা খারাপ, আধা বলশেভিক আর আধা 'ব্যাশ্‌ই-ব্যাজুক্‌' ওই চেকরা। কিন্তু শহরতলীর শ্রমিক-অঞ্চলে লোকে দালাদিএকে গাল দিচ্ছে, স্পেন আর 'নিরপেক্ষতার' নীতি স্মরণ করছে, আর চিৎকার করে বলছে, 'আত্ম-সমর্পণ আর নয়!'

বিকালবেলায় আতঙ্কজনক সংবাদ এল ঃ চেম্বারলেনের দ্বিতীয় বারের সফরও ব্যর্থ হয়েছে। জোলিও শূন্যে হাত ছুঁড়তে লাগল ঃ শান্তির দেবদূত—যিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও আরেকটি বিমানযাত্রার ভয়ে ভীত নন—তাঁর এই বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয়ের কথাটা সে কয়েক কলম লিখবে বলে এইমাত্র ঠিক করেছিল। আর এই সময়ে কিনা আবার গোল-মাল! কি করতে হবে বুঝে উঠতে না পেরে জোলিও আপিস ঘরে এদিক ওদিক পায়চারি করছে, এমন সময় দেসের টেলিফোনে ডাকল তাকে : 'এখুনি এসে একবার দেখা করো আমার সঙ্গে।'

অ্যাভালিদ্‌-অঞ্চলের এই রাস্তাগুলো নির্জন আর অন্ধকার। অজ্ঞাত আশঙ্কায় জোলিওর গা ছম ছম করছে। ছোট ছোট নীল আলোগুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে কবরখানার আলোর মতো। দেসেরের চেহারা দেখেও সান্ত্বনা পেল না সে—সেই স্থূল মুখ, আর স্তিমিত চোখের নিচে ঝুলে পড়া মাংস; এমন কি, দেসেরের টেবিলটা পর্যন্ত দেখে কেমন একটা বিষণ্ণতা মনে জাগে; সাধারণত কাগজপত্র ছড়ানো থাকে টেবিলটার ওপর; কিন্তু এখন শুধু এক গ্লাশ জল আর কয়েকটা মাথাধরার বড়ি ছাড়া টেবিলটা ফাঁকা।

জোলিও ঢোকামাত্র দেসের বলল, 'পরিস্থিতিটা ভয়ানক গুরুতর। অবশ্য, যুদ্ধ কেউই চায় না, কিন্তু ওরা চাল মেরে যতোটা পারে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। জন-সাধারণ যুদ্ধ চায় না; যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে যাদের হাতে রাইফেল তারাই বাধাবে। আমি কিন্তু এখনো আশাবাদী। আচ্ছা আমার কথাটা তাহলে শোন; তোমার কাগজ যারা পড়ে তারা হাবাগোবা নয়, তাদের মতামতের দাম আছে। কিন্তু তারা কেউ মোরিস দেয়াকে বিশ্বাস করে না, লোকটার বদনাম আছে। মোরিস রস্তাঁ-র কবিতা নিয়ে ওরা হাসাহাসি করছে। ওসব লোক দিয়ে চালানো অসম্ভব! নামগুলো দেখ ঃ কেরিলি, দুকান, ফুজে, কাশ্যাঁ। আর এদের বিরুদ্ধে তুমি খাড়া করছো কাদের? কতকগুলো ন্যাকা-বোকা ছিচকাঁদুনেকে।'

উত্তেজনায় দমবন্ধ হয়ে এল জোলিওর। তন্ন তন্ন করে হাতড়াল পকেটগুলো—

চিঠি জমাখরচের হিসাব আর তাগা-তাবিজ ভর্তি তার পকেট; একটা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি খুঁজেছে সে। না, সে শুধুই মাইনে নিচ্ছে না বসে বসে! সগর্বে দেসেরকে দিল একটা পাতলা দুমড়ানো কাগজ ঃ 'এই যে!'

জনৈক বিখ্যাত লেখকের একটা প্রবন্ধ; রচনাটার শিরোনামা ঃ 'মৃত্যুর চেয়ে দাসত্ব শ্রেয়।' আগাগোড়া পড়ে কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখল দেসের। ওরকম ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে কেন তার মুখে? প্রবন্ধে যে সব কথা বলা হয়েছে, ওসব সে আগে একাধিকবার বলেছে—জার্মানদের সুবিধা ছেড়ে দেবার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে, ফ্রান্সের নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া উচিত বলে ঘোষণা করেছে, ব্যঙ্গ করেছে যারা শেষ পর্যন্ত যুঝতে চায় তাদের নিয়ে। দেসের ভয় করে মৃত্যুকে, শবযাত্রায় যোগদান করতে ঘৃণা করে সে। প্রায়ই ভেবেছে, 'বাঁচবার জন্যে যে কোন কাজ করতে রাজি!' আর এই পাতলা কাগজটির ওপর লেখা রয়েছে কিনা, 'মৃত্যুর চেয়ে দাসত্ব শ্রেয়।' কথাটা ভারি রূঢ় আর অপ্রিয়। দেসেরের যা কিছু শৈশব-স্মৃতি—তড়বড়ে ছেলে আর খিটখিটে বুড়ো, নাচঘরের গাইয়ে আর সমুদ্রের হাওয়া—এসবের সঙ্গে কিংবা তার প্রিয় লেখকদের স্মৃতির সঙ্গে খাপ খায় না কথাটা।

নিঃশব্দে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে দেসের আর একটা মাথাধরার বড়ি খেল। তারপর বলল, 'ভীইয়ারের লেখা কোনো প্রবন্ধ যদি ছাপাতে পারো তাহলে ভালো হয়। কিংবা তার সঙ্গে কোনো আলাপ আলোচনার সংবাদ। অবশ্য গভর্ণমেণ্টে ঢোকার পর থেকে লোকটা খানিকটা চাপা পড়ে গেছে, শ্রমিকদের মধ্যে অনেকের কাছেই ও এখনো খাঁটি লোক বলে পরিচিত। ভীইয়ার যদি আপোস-রফার পক্ষে কিছু বলে, তাহলে ও নিজের চাকায় তেল দিচ্ছে বলে কেউ সন্দেহ করবে না। পাঁচজনে ওকে ভাববে, 'আন্তর্জাতিকতাবাদী, যুদ্ধবিরোধী...' এই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে বলতে পারি—এর বক্তব্যগুলো ঠিক, কিন্তু সে যাই হোক, আমি এই 'দাসত্ব' কথাটা বদলে দিতে চাই।

কেন যেন হঠাৎ দেসেরের মনে পড়ল, বনের পথে জেনেতের সেই বিষণ্ণ গলার নিষেধ, 'না, কোরোনা।'

'আমি ও জায়গায় একটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা বসাতে চাই ঃ 'অবমাননা' কিংবা 'কষ্টবরণ।'

পরের দিন ভীইয়ারের সঙ্গে দেখা করল জোলিও। বেঁটে খাটো ভোঁতা লোকটা এসেই খুলে বলে ফেলল তার আসার কারণটা। ক্লান্ত স্বরে ভীইয়ার উত্তর দিল, 'জানি। দেসের ইতিমধ্যে সব বলেছে আমাকে। কিছু মনে কোরো না, এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে। আমি জানতাম না যে হিটলারের আজ বেতার-বক্তৃতা দেবার কথা। এক্ষুনি শোনা যাবে ওর বক্তৃতাটা। হিটলার কি বলে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'জার্মান জানেন আপনি?'

জানি বৈকি। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলোর পুরনো সব সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বক্তৃতা শুনেছি আমি : বেবেল, লীব্‌কনেখ্‌ট্‌, কাউট্‌স্কি, সকলের। যুদ্ধের ঠিক আগে বাল্‌-এ বেবেল একটি বক্তৃতা দিয়েছিল, মনে পড়ছে—দিনকাল ভাল ছিলো তখন, এখনকার মত নয়! হ্যাঁ, আজকের পরিস্থিতিটা ভয়ানক জটিল। আমরা সমাজতন্ত্রীরা তখন বলেছিলাম—জার্মানিতে ভীইমার রিপাব্‌লিককে জিইয়ে রাখা দরকার। স্ট্রেসেমানের সঙ্গে চুক্তিতে আসা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু শোনেনি ওরা আমাদের কথা। আর, এই হচ্ছে তার

ফল! কিন্তু যুদ্ধ হতে দিতে পারি না আমরা, হতে দেবও না কিছুতেই। গণতন্ত্র যুদ্ধ করবার জন্যে নয়—এতো স্বতঃসিদ্ধ। যুদ্ধ গণতন্ত্রকে হয় ধ্বংস করে, না হয় ধ্বংসের পথ এগিয়ে দেয়। ক্লেমসো তো আর একটু হলে পার্লামেণ্টকে পকেটে পুরত। ইতালীতে কি হয়েছে দেখ; আর কেরেনস্কির পরিণামটা? যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে বিপ্লব অনিবার্য। সবাই তা বোঝে। আর, যুদ্ধে জিতলেই বা লাভটা কি? সমর-বিভাগের কোন কর্তা-ব্যক্তি হয়তো ক্ষমতা দখল করে বসবে। অবশ্য দু-একজন সৎলোক যে আমাদের জেনারেল-দের মধ্যে নেই, তা নয়; যেমন ধরো বুড়ো পেত্যাঁ—ওরকম খাঁটি লোক দু-একজনই আছে। কিন্তু তেমনি আবার ভাগ্যান্বেষী, বেপরোয়া ক্ষমতাপ্রিয় লোকও আছে অজস্র। সামরিক কমিশনের একটা সভায় সেদিন ছিলাম—কে একটা কর্নেল দ্য-গল্‌কে দেখলাম, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারী সুনিশ্চিত, আর অতি উঁচু আকাঙ্ক্ষা লোকটার। সে তো ঘোষণা করল: শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমরা, সরকারী ব্যয় বরাদ্দ নতুন করে সংশোধন করা দরকার, সামরিক বাহিনীতে আরও বেশি যান্ত্রিক উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ হেন দুর্দান্ত গোঁয়ার লোক তো সুযোগ পেলে এক মুহূর্তে ডিক্টেটর হয়ে বসবে। সাধারণত আমার মনে হয়—সামরিক লোকজনকে এ ব্যাপার থেকে দূরে রাখতে হবে। ওদের উপদেশ নিতে যাওয়াটা বোকামি। আর, দালাদিএকে...' কথাটা শেষ না করেই ভীইয়ার ছুটে গেল রেডিওটার কাছে। একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল যন্ত্রটা থেকে।

'এইবার বক্তৃতা হবে হিটলারের। ভেবে দেখ, ঠিক এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর লোক নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে রেডিওর সামনে।'

জোলিও কত রকম ভাষা জানে ভীইয়ার জিজ্ঞাসা করায় সে সগর্বে উত্তর দিল, 'ফরাসী আর মার্সাই অঞ্চলের ভাষা।' সত্যি কথা বলতে কি, জোলিও এক বর্ণও জার্মান বোঝে না। কিন্তু তবু সে কাটা-কাটা উচ্চারণে উচ্চকিত সেই বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বসল। হিটলার তার বক্তৃতা আরম্ভ করল সংযতভাবে, কিন্তু খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙা গলায় চিৎকার করে শাসাতে আরম্ভ করল। অবোধ্য সব কথা বেরিয়ে আসতে লাগল লাউড-স্পীকারটার ভেতর থেকে—অবোধ্য বলেই জোলিওর কানে কথাগুলো আরও ভয়ংকর শোনাল। বুড়ো নেকড়ে বাঘের মত খেঁকাতে থাকল হিটলার। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জোলিও; চেয়ারের পেছন দিকটা চেপে ধরল, দৈববাণীতে তার গভীর বিশ্বাস, কাঠ ছুঁয়ে থাকলে অমঙ্গল কেটে যায়—এ বিশ্বাসও তার আছে।

ভীইয়ার মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে থাকল, যেন অদৃশ্য সেই বক্তার কোনো উক্তি সমর্থন করছে; মাঝে মাঝে ঘাড় ঝাঁকুনি দিল বিরক্তভাবে; তার থুতনি, নাক আর প্যাঁশনে চশমা ঈষৎ কাঁপতে থাকল। জোলিও আগাগোড়া সাগ্রহে লক্ষ্য করে গেল ভীইয়ারের মুখের ভাব—যদি তার থেকে অবোধ্য বক্তৃতার খানিকটাও বুঝতে পারে সেই চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যে জনতার সামনে হিটলার বক্তৃতা দিচ্ছে, সেই জনতার 'জার্মানি জিন্দাবাদ' চিৎকার ধ্বনিতে ভরে উঠল ঘরটা—সঙ্গে সঙ্গে জোলিও চেয়ারের পেছনটা প্রাণপণে চেপে ধরল। ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে এরকম চলল; শেষে প্রচণ্ড একটা উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল। রুমাল দিয়ে কপাল মুছল ভীইয়ার। জোলিও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'ও, না বিশেষ কিছু না। এসব আগেই জানতাম। মোটের ওপর আমার এখনো আশা আছে। আল্‌সাসের ওপর হিটলারের আর কোনো দাবিদাওয়া নেই একথাই সে

বার বার বলল। আর এইটাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড়ো কথা।'

'চেকদের সম্বন্ধে?'

'ওদের সম্বন্ধে কোনো কথা শুনতে চায় না ও। কিন্তু যেহেতু পশ্চিম দিকে ওর কোনো দাবি নেই বলে ঘোষণা করেছে, সেহেতু ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা সম্পূর্ণ সম্ভব বলে আমি মনে করি। শেষ পর্যন্ত প্রাগের ভাগ্য আমাদের ওপর নির্ভর করছে। আপোস রফার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা দরকার। আমি এক্ষুণি একটা বিবৃতি দিচ্ছি।'

ঘণ্টা বাজতেই, কোঁকড়া-চুল, পুরু পাউডারের প্রলেপ লাগানো একটি টাইপিস্ট মেয়ে ঢুকল ঘরে। ভীইয়ার বলে যেতে লাগল, মেয়েটা টাইপ করে গেল। ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতে করতে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে, ভীইয়ার যেন বক্তৃতা দিচ্ছে কোনো অদৃশ্য জনতার সামনে; মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলে নিজেকে কল্পনা করে নিয়েছে, আবেগে কেঁপে উঠেছে তার গলাঃ

'যুদ্ধ-রাক্ষসী যাদের রক্ত শুষে খেয়েছে, সেই তরুণদের স্মৃতির ব্যথায় লক্ষ লক্ষ মায়ের বুক এখনো ভারাক্রান্ত। ভের্দ্যুকে আমরা ভুলে যাইনি! বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হিসেবে হিটলার সেই ভয়ংকর সর্বনাশের বিভীষিকা বিস্মৃত হয়নি দেখে আমরা আনন্দিত। তাঁর প্রসারিত হস্ত আমরা—ফরাসী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি...' নিজের হাতটা প্রসারিত করে ভীইয়ার ভাবল কিছুক্ষণ।

'প্রতিনিধির পরে দাঁড়ি বসাব?' জিজ্ঞাসা করল টাইপিস্ট মেয়েটা।

'না, কমা বসাও। আমরা, ফরাসী গণতন্ত্রের প্রতিনিধিরা, শান্তিপ্রিয় জাতির এই সন্তানরা, জোরের শিষ্যরা...'

তারপরে প্রবন্ধটা আগাগোড়া পড়ে দেখে সই করে দিল সে। জোলিও যখন বিদায় নিচ্ছে, তখন ভীইয়ার তাকে বলল, 'আটলাণ্টিক এজেন্সি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত—এই কথাটা শেষে বসিয়ে দিও—ওটা ওই মার্কিনদের জন্যে। পেটের দায়টাও তো দেখতে হয়, বুঝলে কিনা, ও ভাবনাটা থেকে রেহাই নেই কিছুতেই। আমি সাংবাদিকদের পেশায় আবার ফিরে এসেছি, জানো? আমরা এখন সহযোগী।'

জোলিও চলে যাবার পরে একলা বসে ভীইয়ার বক্তৃতার কথাগুলি স্মরণ করে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলল। না, কথাগুলো নিশ্চয়ই বেবেলের নয়! মন্ত্রীত্ব-সংকটটা বসন্তকালে হয়ে ভালোই হয়েছিল। নোংরা ব্যাপার যতোসব! স্পেনের বেলায় যা হয়েছিল, তার চেয়েও খারাপ। অপরের অর্থে ফ্রান্সকে আত্মমোচনের মূল্য দিতে হবে। তাছাড়া, চেকদের পক্ষে আত্মসমর্পণ করাই ভালো, নইলে ওরা অবিলম্বেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরকম সময়ে সাংবাদিক হওয়া ঢের ভালো, ওকাজে দায়িত্ব কম। তাহলে, র‍্যাডিকালরা সমাজতন্ত্রীদের মন্ত্রীদল থেকে বের করে দিতে চায়।—তা দিতে চায় দিক, জঞ্জাল সাফ হয়ে যাক!

চেয়ারটায় বসে বসে ঢুলতে লাগল ভীইয়ার। হঠাৎ মেয়েলি গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেল ঃ তার বড়ো মেয়ে লুই কোনো খবর না দিয়ে এসে পড়েছে পেরিগো থেকে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল লুই ঃ

'কাল সন্ধ্যায় গাস্ত-র ডাক পড়েছে। বিমান-বিধ্বংসী বাহিনীতে ও আছে। কি হবে, বাবা?'

ভীইয়ার তার মুখখানার ভারিক্কি ও বদান্য ভাব ফুটিয়ে তুলল। মেয়েদের কোনো

কিছু উপহার দেবার সময় যে ভাবে কথা বলত, সেইভাবে বলল :

'পরে বলব ওসব কথা। থাম, থাম, কাঁদিসনি। সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। যুদ্ধ বাধতে দেব না আমরা, বুঝলি, কিছুতেই দেব না।'

অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে জোলিও বাড়ি ফিরল। দেসের যা করেছে তা নিশ্চয়ই জেনে-শুনে করছে, কিন্তু সেই নীল আলো, আর হিটলারের বক্তৃতা...বাপ রে! ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করল সে। জোলিওর স্ত্রী হৈ চৈ বাধিয়ে দিল, তাড়াতাড়ি চটিজোড়া এনে দিয়ে ভেরভ্যাঁ-লতার রস তৈরি করতে বসল—সর্দির ওষুধ হিসেবে এই জিনিসটা জোলিওর ভারি প্রিয়।

'একটা প্রবন্ধ বাগিয়েছি ভীইয়ারের কাছ থেকে,' বলল সে, 'ঝাড়া তিনশো লাইন! একেবারে সামনের পাতায় ওর ছবিশুদ্ধ ছাপানো হচ্ছে। খুশি হবে দেসের। কিন্তু ওদের যদি একবার দেখতে তুমি! সবাই বলছে আশার কথা, কিন্তু মুখগুলো দেখাচ্ছে জলে-ডোবা কুকুরের মতো। দেসেরের বোধহয় কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছে। চেহারা দেখে রুগী ছাড়া কিছু মনে হয় না। ক্যান্সার হল না কি? তাহলে তো হয়েছে—কাগজটা উঠে যায় আর কি!'

রসটা তৈরি করে ঢেলে দিল তার স্ত্রী। তারপর মৃদুস্বরে শুধোল, 'যুদ্ধ বাধবে না কি?'

হেসে উঠল জোলিও, 'কিসের যুদ্ধ? ওরা প্রাগ ছেড়ে দেবে দেখে নিও! হিটলারটা হরদম চেঁচাচ্ছে, আমি ওর সমস্ত বক্তৃতাটা শুনেছি—লোকটা একেবারে বদ্ধ পাগল। উন্মাদ। কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল ভীইয়ারের মুখ ওর বক্তৃতা শুনতে শুনতে। আমার কি ভয় হচ্ছে জানো?—ওরা হয়তো মার্সাইও ছেড়ে দেবে! তা যদি হয়, তাহলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবার মত কোনো জায়গা থাকবে না। মরুক গে যাক!'

এগারো

আঁদ্রে সারাদিন ধরে পারীর উত্তেজিত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে আর উৎকণ্ঠ কথাবার্তার টুকরো তার কানে ঢুকেছে : 'হবে নাকি?...হবে না তাহলে?...' সন্ধ্যার দিকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল রু শেরস্-মিদিতে। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। মুচিটা চেঁচাচ্ছে, 'এখুনি না সামলালে ওরা এখানে পর্যন্ত এসে যাবে, পেটের জ্বালায় পাগল ওই ইঁদুরগুলো!' পুরনো মালের দোকানদার বুড়ো বোয়ালোর পাকা-চুল, কাঁচুলি-আঁটা বউটা অভিযোগ করছে, 'না ফ্রান্সের এতে কি করবার আছে তাই বলো? কোনো জ্যান্ত চেক্‌কে কোনোদিন চোখেও দেখেছ কি?' 'তামাক-খোর কুকুর' কাফেটায় বসে একজন খদ্দের প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে জার্মানদের আরও জায়গার দরকার : 'যেমন ধরো, রবিবারের দিনে এই কাফেগুলো। প্রায়ই ওরা অনেক বেশি জায়গা জুড়ে টেবিল পাতে। তাই করাটাই তো স্বাভাবিক।' ভুরু কোঁচকাল কাফেওলা : 'কিন্তু সে জন্যে ওদের

জরিমানা হয়।' একজন মিস্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল, 'জার্মানদের আরও জায়গায় দরকার? তাহলে আমার বেলায় কি? কেমন ধারা ফরাসী তুমি? শয়তান, ফ্যাশিস্ট!' ঘুষোঘুষি হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

বুড়ো বোয়ালোর দোকানের জানলায় সাজানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাল আঁদ্রে। জিনিসগুলো দেখতে দেখতে খুশি হয়ে উঠল তার মন। বিচিত্র সব জিনিসের অদ্ভুত এক সমাবেশ! একটি উলঙ্গ নিগ্রো দেবতার মূর্তি—অত্যন্ত মহিমাময় এবং নির্লজ্জ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বের দিকে, মৃদু আলোয় জ্বলছে ডেল্‌ফট্‌-এ তৈরি মাটির বাসনগুলো; জমে যাওয়া নদীর জলের মতো নীল আর শাদা—ওগুলো রুয়োর জিনিস; ক্যাপার থেকে আনা পাখি আর সৈনিকদের ছোট ছোট মূর্তিগুলোর গোলাপী উষ্ণ রঙ; হাতীর দাঁতের চীনে বোতাম; ছুঁচলো ছিপি বসানো নস্যদানগুলোর গায়ে খোদাই করা চিরন্তন নীতিবাক্য 'সাম্য অথবা মৃত্যু।' গালা-পাথরের ভারী কণ্ঠহার, গোমেদ বসানো কঙ্কন, পারসীক নীলমণি। জরিদার কাপড়ের পাড়, চুমকী বসানো ওড়না, ভেনিসের রেশমী ফিতে, নীল কাঁচ। ইংলণ্ডে ছাপা ঘোড়-দৌড়ের ছবি—সবুজ রঙের কোর্তা-পরা সওয়ার আর ঘাবড়ে-পিছিয়ে আসা ভঙ্গিতে হাল্‌কা-রঙে-আঁকা ঘোড়া। একটা হুঁকো—অ্যালকেমিস্টের পাত্রের মতোই রহস্যময় আর জটিল, পরী, পুরনো মুদ্রা, চুলের গোছা, মোমের তৈরি গোলাপ ফুল। সব মিলিয়ে কত পরিশ্রম রয়েছে এই জিনিসগুলোর পেছনে।

এই পুরনো জিনিসের দোকানটার পাশেই একটা দুধের দোকান। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আঁদ্রে তাকিয়ে রইল ছানা-মাখন-পনীরের দিকে—যেন মহাশিল্পীদের আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাল রঙের তাল পাকানো ডাচ মাখন; একটা সুইস্‌ ছানার স্তূপ থেকে জল চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে; শুকনো মোমের মতো জমাট দুধ; ক্ষীরের রঙটা যেন শ্বেত-পাথরের লাল নীল রঙের ছিটেফোঁটা সোনালী ঘি গলে গলে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়; সবুজ পাতায় মোড়া ছাগলের দুধের মাখন, বিচিত্র রঙে আর আকারে সাজানো নানা জিনিস।

তার ওপাশে একটা মদের গুদোম। বোর্দোর মদ-ভরা লম্বা-গলা সুষ্ঠু আকারের বোতলগুলো পারিবারিক আবহাওয়ায় মানায় ভাল—সেনেটরদের আর জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকদের ভারী প্রিয়; বারগ্যাণ্ডি মদের পেট-মোটা খাটো বোতলগুলো দেখে খুড়ীমার আকৃতির কথা মনে পড়ে—প্রবীণদের জন্যে ওই পানীয়; কিন্তু প্রণয়ী-যুগলের প্রিয় ওই 'ভ্যাঁ-দালসাস্‌' মদের বোতলগুলোর নীল রঙ আর ঋজু গড়নের চেহারাটা ভারি রোমাণ্টিক। বোতলগুলোর লেবেলের গায়ে বিভিন্ন গ্রামের নাম লেখা: শাঁবের্‌ত্যাঁ শাব্‌লি, বারসাক, বোন্‌, ভুভ্‌রে, শ্যাতোনফ্‌-দ্য-পাপ—গোটা পৃথিবী জুড়ে এইসব গ্রামের খ্যাতি। কনিয়াক মদের একটা বোতলের গায়ে এত পুরু হয়ে ধুলো জমেছে যে ওটা অনায়াসে ওই পুরনো জিনিসের দোকানে স্থান নিতে পারত। আঁদ্রে ভাবল, 'আমার চেয়ে ওই মদের বয়স ঢের বেশি।'

তার পরের দোকানের জানলাটা আঁদ্রের ভারী প্রিয়, তামাক-খাওয়ার পাইপগুলো সে প্রায়ই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে: পর পর সাজানো আছে লম্বা পাইপ আর নাক-গরম করা বেঁটে পাইপ, সিধে পাইপ আর পাহাড়ী ভেড়ার শিঙের মতো বাঁকা-চোরা পাইপ, ফোতো-বাবুদের জন্যে ক্ষুদে পাইপ, নাবিকদের জন্যে মোটাসোটা ভারী পাইপ—কালো, বাদামী, হালকা লাল রঙের পাইপ। দোকানদারটা একদিন আঁদ্রেকে বুঝিয়েছিল কি ভাবে হিদার গাছের শেকড় থেকে এই সব পাইপ তৈরি হয়; মাটির নিচে এই শেকড়গুলোর

অন্তত পঞ্চাশ বছর কাটা চাই—তা নইলে তামাকের স্বাদটা ভাল পাওয়া যায় না; এই মরা শেকড়গুলো সম্বন্ধে আঁদ্রের এখন আর একবার গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তামাক-ওলাটা তাকে দেখবামাত্র আবেগ-উত্তেজিত কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আ—আ—আপনার কি মত? যুদ্ধ হবে বলে আপনি মনে করেন?' ফিরে এল আঁদ্রে নিজের স্টুডিয়োয়। পিয়ের ঢুকল তার পরেই। ঢুকেই গড় গড় করে সবকিছু ব্যাখ্যা করে যেতে লাগল। সন্ধ্যার সময় কারখানায় একটা সভা আছে, মজুররা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ভয়ানক রকম। এই ক-বছরে পিয়ের খানিকটা বুড়িয়ে গেছে বটে, তবু দক্ষিণ অঞ্চলের লোকের মানসিক উদগ্রতাটুকু বজায় আছে তার। ঘটনার গুরুত্ব তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে, কোনো কথাই শেষ করতে পারছে না। কথা বলতে বলতে সমস্তক্ষণ রেডিওটা একবার খুলে দিচ্ছে, পরক্ষণেই বন্ধ করে দিচ্ছে। 'সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে!' চিৎকার করে বলল পিয়ের, 'এখন আর সরে দাঁড়ানো চলে না। খাদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছ—তবু কিনা ভয় ঘুচছে না ওদের!...ভীইয়ারের প্রবন্ধটা পড়েছ? কী লজ্জাকর সব কথা! কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী...'

আঁদ্রে বাধা দিল তার কথায়: 'কল্পনাবিলাসী! কিন্তু মোটের ওপর কিছুই বুঝতে পারছি না আমি—আমার স্বভাবই এই রকম। তোমার কি মনে হয়? যুদ্ধ চাও তুমি? জঘন্য ব্যাপার এই যুদ্ধ। ভার্সাই চিত্রশালার ছবিগুলিতে যুদ্ধ বলতে কেবল জেনারেল, পতাকা আর মেঘই দেখা যায়। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কাদা আর উকুন। সত্যি বলছি, কি করে যে আমার জীবনটা কাটবে আমি নিজেই তা জানি না। তুমি আছ বেশ; প্রথমত, তোমার—'আঁদ্রে তার মস্ত বড় গিঁঠে বুড়ো আঙুলটা বেঁকিয়ে ধরল—'আনে আছে। দ্বিতীয়ত, একটি ছেলে আছে তোমার। তৃতীয়ত, তোমার আছে, যাকে বলে, আদর্শবাদ। কিন্তু আমার কিছুই নেই, স্রেফ কিছুই নেই!'

'কিন্তু তোমার আর্ট আছে।'

'আর্ট? ও সব কথার কথা, পিয়ের। আবহাওয়াটাই আর্টের উপযুক্ত নয়। কাল বাবার কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম, যুদ্ধ হবে কি হবে-না জানতে চেয়েছেন। তাঁর চিন্তা আপেলের জন্যে। হ্যাঁ, আমিও জানতে চাই; আমার চিন্ত আমার ছবির জন্যে। কিন্তু জিজ্ঞেস করবার মতো লোক আমার কেউ নেই। এখন বিপদটা কেটে গেলেও দু-এক বছরের মধ্যেই আবার ঘনিয়ে আসবে। আর, তুমি কিনা বলছ আর্ট নিয়েই জীবন কাটাতে! জীবনের স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে সর্বত্র, আবার গতিশীল হয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় নেবে। একটা আশ্চর্য পাইপ দেখেছি আজ, কাঠের আঁশগুলো সব উঠেছে ওপরের দিকে; কি দিয়ে তৈরি জানো? হিদার গাছের মরা শেকড় থেকে, বুঝেছ? কিন্তু শেকড়টা মাটির নিচে ছিল একশো বছর ধরে। আর এখানে কি দেখছি—ধর্মঘট, মিছিল, হিটলারের খেঁকানি, কোথাকার কতকগুলো সুদেতেন—আর তুমি কিনা চাও আমি বসে বসে মহৎ শিল্প রচনা করি! যতো সব বুজরুকি!'

এবারে পিয়েরের বদলে আঁদ্রেই রেডিওটার কাছে ছুটে গেল। পিয়ের ওকে থামিয়ে বলল, 'এখনো সময় হয়নি, আপাতত আধ ঘণ্টার মতো খবর বলা হবে না।'

চেম্বারলেনের বিমানযাত্রায় রোম বা ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তার যে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই বরং সে অপেক্ষা করছে সম্পূর্ণ অন্য একটা জিনিসের জন্যে—একথা আঁদ্রে স্বীকার করতে পারল না। পুরো দু-বছর ধরে দিনের পর দিন সে এই আকোটুকুকে

জীইয়ে রেখেছে এবং রোজ সন্ধ্যায় জেনেতের কথা শোনে। জেনেতের সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি, তার দুঃখের কথা আঁদ্রে কিছুই জানে না। কিন্তু তবু তার কাছে জেনেৎ যেন সেই একই জেনেৎ আছে।—হ্যাঁ, এই উন্মাদ জগতে একমাত্র জেনেৎই আঁদ্রের চোখে বদলায়নি। আঁদ্রে বলল, 'খবরটা শোনার সুযোগ হারাতে চাই না আমি, প্রথমে বিজ্ঞাপন ঘোষণা করে বটে কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়।'

রেডিওটা কিন্তু নির্বাক। জেনেতের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। আঁদ্রের কাছে ভয়ানক একটা দুর্লক্ষণ বলে মনে হল। 'কোনো বোঝাপড়া ওদের মধ্যে হয়নি এখনো'—বলল সে।

'আমার ভয় হচ্ছে, দালাদিএ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে দাঁড়াবে।'

ওদের দুজনের ভাবনা দু বিষয়ে, দু জনের ভয় দু রকম। জেনেতের গভীর গলার স্বর কিংবা সাধারণ সংবাদ-ঘোষণার বদলে, সময়-সংকেতের ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ আওয়াজটা শোনাল কর্কশ আর নির্মম। হঠাৎ অত্যন্ত নির্লিপ্ত একটা কণ্ঠস্বরে ঘোষণা হল ঃ

'সামরিক কাজের উপযুক্ত যে সব ব্যক্তির নাম 'অ' আর 'আ' দিয়ে আরম্ভ...'

খুশি হয়ে উঠল আঁদ্রে; একটা বোঝা নেমে গেল তার ঘাড় থেকে। এখন থেকে তার ভাবনা ভাববে অন্য লোকে।

বলল, 'তা বেশ হল এটা। তার মানে, যুদ্ধে নামছি আমরা।'

পিয়েরের কোনো যুক্তি, সিদ্ধান্ত বা স্বীকৃতিতে কান দিল না সে। পুরনো পরিচিত রাস্তাটা রয়েছে ঠিক আগেরই মতো—উলটো দিকের বাড়ির বারান্দায় একটা ফুলে ভরা সাজি, ঝকঝকে আকাশে ফ্যাকাশে মরা চাঁদ। আঁদ্রের মনে হল, এই কয়েকটা বছর তার কেটেছে যেন যন্ত্রণাদায়ক বিরতির মতো—লাল ঝাণ্ডা-শোভিত সেই জুন মাসের দিন, পাক খাওয়া নাগরদোলার সেই রাত্রি, তখন থেকে শুরু করে আজকের এই সময়-সংকেতের টিক্‌ টিক্‌ আওয়াজ, জানলার নিচে পথ-চলতি লোকের পায়ের শব্দ, আর এক্ষুণি এই সামরিক কাজে যোগদানের ঘোষণা পর্যন্ত। কোনো কিছু জানতে, ভাবতে অথবা স্মরণ করতে ইচ্ছে হল না তার। মুহূর্তের জন্যে একটা বেদনা অনুভব করল সে ঃ জেনেতের কি হল?...কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাটাও নিরর্থক; সব কিছুই যেন পাক খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পিয়েরের সঙ্গে বাইরে এল আঁদ্রে। সদর দরজাটার কাছে বসে কাঁদছে একটা মেয়ে। রিজার্ভ-ফৌজের কয়েকজন লোক হাতে পেঁটরা ঝুলিয়ে 'লা-মার্সাই' আর 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে গাইতে চলে গেল। উষ্ণ গ্রীষ্ম-রাত্রি। 'প্রেমিকদের স্বর্গোদ্যান' ভাবল আঁদ্রে আর জুলাই-রাত্রির অমলোকোজ্জ্বল এই প্লাস ক'ত্‌র্‌-এসকার্প্‌টা চেয়ে চেয়ে দেখল আর একবার...

পিয়ের বলল, 'আমাকে সুড়ঙ্গ-ট্রেনটা ধরতে হবে। দেরি হয়ে গেল বোধ হয়। আচ্ছা, আঁদ্রে আসি তাহলে। আবার দেখা হবে।'

পিয়ের কিন্তু একথা বলেই চলে গেল না। এই 'আবার দেখা হবে' কথাটায় দুজনের মনই পীড়িত হয়ে উঠল। সন্তানের পিতা এই পিয়েরকে যেন ভুলে গেল আঁদ্রে; ভুলে গেল ইঞ্জিনীয়ার পিয়েরকে—যেসের, সমাজতন্ত্রী-দল, কিংবা যুদ্ধ সম্বন্ধে অনর্গল কথা বলে যে পিয়ের। আঁদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ইস্কুলের সহপাঠী; দুষ্টু, কল্পনাপ্রবণ বারো বছরের পিয়ের, যে একদিন গ্রীনল্যান্ডে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করেছিল তার কাছে।

আঁদ্রে বলল, 'তোমার সেই গ্রীনল্যান্ডে বেড়াতে যেতে চাওয়ার কথা মনে পড়ে?

শিকার! কী মজার ছিল দিনগুলো! তোমারও বোধহয় ডাক পড়বে ফৌজে যোগ দেবার জন্যে। পোকা-মাকড়ের মতো মারা পড়ব আমরা—কোনো সন্দেহ নেই এতে। ঠিক ভের্দ্যর মত দাঁড়াবে ব্যাপারটা, তবে এবারকার যুদ্ধে আকাশ থেকেও মৃত্যু নামবে। কিন্তু কিছু যায় আসে না তাতে। তবে একটা ভালো কথা এই যে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা সচেতন—জীবনে একটা বড়ো রকমের বদল আমার দরকার ছিল। যা হোক হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাক। একটা কবিতা আছে, কার লেখা ভুলে যাচ্ছিঃ প্রতারিত আমি তাই মৃত্যু-পথগামী...। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপারটা কি জানো? অনেকদিন আগেকার কথা; আমাদের ওই কাফেটায় আমার পাশে বসেছিল এক জার্মান। নীল-চোখ আর ঘাড়-ছাঁটা দেখেই বোঝা যায় লোকটা দস্তুরমত জার্মান; আমি ভেবেছিলাম আশ্রয়প্রার্থী বুঝি, কিন্তু শেষে বোঝা গেল মনে-প্রাণে খাঁটি জার্মান ও। মাছ সম্বন্ধে ওর আগ্রহ আছে; আমার আঁকা দৃশ্যচিত্রগুলো ভাল লেগেছিল ওর। লোকটা মাতলামির ঝোঁকে বলেছিল যে যুদ্ধ একটা হবেই আর পারীকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে জার্মানরা। ভারি মজার লোক! আমার মজা লাগছে এই ভেবে যে, ওরও বোধহয় ফৌজে যোগ দেবার ডাক পড়েছে। তার মানে, ও লড়াই করবে আমার সঙ্গে? কি জঘন্য ব্যাপার বলো তো? কিন্তু তবু আমি খুশি হয়েছি, পিয়ের; অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকতে হবে না। যুদ্ধ যদি হয় তো যুদ্ধই হোক।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

বারো

ব্রতেই যেন দাঁড়াতেও পারছে না আর। পর পর রাত্রি জাগার ফলে লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো; খাড়া আছে কেবল তার ইস্পাতের মত শক্ত শরীর আর ইচ্ছাশক্তির জোরে। যে কোনো উপায়ে হোক একটা আপোস-রফা করা চাই; জার্মানির সঙ্গে চুক্তিতে আসা সম্ভব। মস্কোর সঙ্গে ফ্রান্সের চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে ফেলাই আসল কাজ। কিন্তু অতি দ্রুত ক্রমপর্যায়ে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে; হিটলার অপেক্ষা করবে না; দিশেহারা ইউরোপের ওপর দিয়ে 'শান্তির স্বর্গদূত' বৃথাই আকাশ-যাত্রা করে গেছেন; ফ্রান্সে যারা এখনো পপুলার ফ্রন্টকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে তারা প্রতিরোধের জন্যে জোর করছে। ব্রতেই প্রবন্ধ লিখছে, পুস্তিকা প্রচার করছে, আলোচনা করছে কূটনীতিকদের সঙ্গে, নির্দেশ দিচ্ছে 'মন্ত্রশিষ্য'দের; আর জেনারেল পিকারের মারফৎ সমর-বিভাগের অফি-সারদের পরিচালনা করছে।

নিষ্প্রদীপ হয়ে গেছে পারী। অন্ধকারের আড়ালে ব্রতেইর লোকরা প্ররোচিত আর উত্তেজিত করে বেড়াচ্ছে জনসাধারণকেঃ 'চেকরা নিজেরাই এর জন্যে দায়ী। শুধু ধনী ইহুদীরাই যুদ্ধ চায়।'

'মাদেল যুদ্ধের পক্ষে। ওকে মাদেল না বলে রথ্‌স্‌চাইল্ড বললেই ঠিক নামে ডাকা হয়। বেনেস টাকা খাইয়েছে ওকে আর আমাদের সন্তানদেরই কেবল পাঠানো হচ্ছে কসাইখানায়!'

'এক লাখ উড়োজাহাজ আছে জার্মানদের। একদিনেই পারীকে ওরা গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে...'

কর্মমুখর হয়ে উঠেছে গার দ্য লেস্ত্; রিজার্ভ-ফৌজ ভর্তি ট্রেনগুলো কয়েক মিনিট অন্তর ছাড়ছে; ওদের মধ্যে কেউ কেউ বজ্রমুষ্টি তুলছে, গান গাইছে আর বলছে, 'জার্মানদের দেখিয়ে দিতে হবে হামাগুড়ি-দেওয়া শিশু নই আমরা।' অন্য কেউ অপ্রসন্নভাবে বলছে, 'কেনই বা হামাগুড়ি দিতে যাব আমরা?' মেয়েরা কাঁদছে। অবাধ সুযোগ পেয়েছে ফ্যাশিস্টরা; ওরা বলে বেড়াচ্ছে, সামরিক ব্যবস্থা জারী করাটা বে-আইনী হয়েছে, চেকরা নিজেরাই চুক্তিভঙ্গ করেছে, এবং ফরাসীদের উচিত ছিল ওদের চুলোয় যেতে দেওয়া।

স্পেন-যুদ্ধের গোড়ায় যে রকম হয়েছিল, ঠিক তেমনি এবারও ফ্রান্স দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। সাঁজ-এলিজে অঞ্চলে 'যুদ্ধ-বিরোধী আদর্শটাই' জয়লাভ করেছে; যুদ্ধের বিভীষিকার নামে অভিশাপ দিচ্ছে সবাই আর আবেদন জানাচ্ছে মানবিকতার মনোভাবের কাছে—এমন কি, 'ভ্রাতৃত্ব-বোধ'-এর কাছেও। নিজেদের সাম্প্রতিক উক্তিগুলো সহজেই ভুলে গেছে তারা, এমন কি নিজেদের জীবনযাত্রার ধরন শ্রেণী-ঐতিহ্য আর জাতি-তত্ত্বের রূপকথাও ভুলে বসেছে। ফ্যাশিস্টরা যাদের বলে 'কুঁড়ের দল', সেই শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের অন্ধ বিদ্বেষটাই সব চেয়ে তীব্র। ঔপনিবেশিক সামরিক বিভাগের ক্ষমতামত্ত যথেচ্ছাচারী কর্তারা—যাঁরা রিফ্-অভিযানে অংশ নিয়েছেন কিংবা সামান্যতম অপরাধের জন্যে সৈন্যদের গুলি করে মেরেছেন, তাঁরা এখন বলছেন, রক্তপাতটা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই সেদিনও যে সব পণ্ডিত অধ্যাপকরা 'ফ্রান্সের দুর্ভেদ্যতা'র কথা সগৌরবে ঘোষণা করেছেন আর মার্শাল ফশ্-এর উদ্ধৃতি আওড়েছেন, আজ তাঁদের মুখে শোনা যাচ্ছে, যুদ্ধে যোগদান করা অসম্ভব: জার্মানদের একটি আঘাতেই ম্যাজিনো লাইন তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়বে। আর, লোরেন্-নিবাসী ব্রতেই— যে একদিন ফরাসী সৈন্যের মেৎস্-প্রবেশের মুহূর্তটিকে তার জীবনের চরমতম সুখের ক্ষণ বলে ঘোষণা করেছিল—সে এখন বলছে, 'বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে রক্ষা করার দায়িত্বের তুলনায় সীমান্তের প্রশ্নটা নিতান্ত গৌণ।'

ধনী-অঞ্চলগুলো দেখতে দেখতে খালি হয়ে যাচ্ছে; স্নানাগারগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা; কাগজের খবরে সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটির আরাম উপভোগ মুলতুবী রেখেই সবাই ফিরে এসেছে রাজধানীতে। কিন্তু যেই সামরিক ব্যবস্থা জারী আর নিষ্প্রদীপ চালু হল অমনি বুর্জোয়ারা সব পারী ছাড়তে আরম্ভ করল আর পরিবারের লোককে পাঠিয়ে দিল সুদূর গ্রামাঞ্চলে। ফলে, বছরের এই সময়টায় বেড়াতে আসার সময় না হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র ও পর্বতের ধারে ধারে গ্রামগুলো আবার সচকিত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই গাছের পাতা-ঝরা শুরু হয়ে গেছে; হৈমন্তিক ঝড় বইতে শুরু করেছে ইংলিশ-চ্যানেলের বুকের ওপর দিয়ে। ছুটি উপভোগকারীর দল শীতে জড়োসড়ো হয়ে বসে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে গজ্‌গজ্ করে বলল, 'যাই বলো, এই হতভাগা চেক্‌দের ঢিট্ করার সময় এসেছে!'—সুদেতেনদের কথা আজকাল আর কেউ ভাবে না।

শহরতলীর শ্রমিক-অঞ্চলে কিন্তু কথাবার্তা অন্য ধরনের। সেখানকার কেউই যুদ্ধের সম্ভাবনায় খুশি হয়ে ওঠেনি; তবু তারা নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে দেশকে রক্ষা করার জন্যে। তারা বুঝেছে যে ফ্রান্স কোণঠাসা হয়ে গেছে, আর নিজেদের বুঝিয়েছে, এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। 'আক্রমণকারী' কথাটা সবাই বোঝে, দৈনন্দিন কথাবার্তার

অংশ হয়ে উঠেছে ওই শব্দটা; রিজার্ভ-ফৌজের লোকেরা প্রায়ই 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে গাইতে যায়। ভবিষ্যতের দিকে ওরা আশা নিয়ে তাকায়ঃ ফ্যাশিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আর তাদের ফরাসী বন্ধু ব্রতেই-দোরিওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলেছে তারা। মাঝে মাঝে মনে হয়, ১৯৩৬-এর জুন মাস যেন ফিরে আসছে। বিলাকুর্-এ চেম্বারলেনের প্রশংসা করতে গিয়ে অঁরি মার খেয়ে এসেছে। পুলিশ যখন তাকে তুলে নিয়ে যায়, তখন রাস্তায় ছোঁড়ারা চিৎকার করে উঠে, 'লড়াই শুরু হয়ে গেছে!'

'জাতীয় মনোভাবাপন্ন ডেপুটিদের' এক সভায় ব্রতেই বলল, 'যুদ্ধ হবে না। কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না। চেকরা চুক্তি করেছে মস্কোর সঙ্গে—অর্থাৎ, আমাদের কমিউনিজ্‌মের পক্ষে লড়াই করবার জন্যে বলা হচ্ছে। একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। সব দিক ঠিকমত বিবেচনা করে দেখা যাক। বলশেভিকবাদ সিঁদ কেটে ঢুকেছে আমাদের দেশে; স্পেনে এখনো জাতীয়-যুদ্ধ চলেছে; ইংলণ্ড তো তার নিজের দ্বীপে এই সব বিষাক্ত প্রভাবের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত; ইংরেজরা ভণ্ডামী করতে পারে, চাল দিতে পারে, উদারনৈতিক আদর্শ নিয়ে গদগদ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আসলে ইউরোপকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে পারে কে? একমাত্র হিটলার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের মিত্রপক্ষই আমাদের আসল শত্রু আর শত্রুপক্ষই আমাদের আসল বন্ধু।'

এই প্রথম ব্রতেই দুকানের সামনে তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে সাহস করল। খুব একটা বাদ-প্রতিবাদ আর দেশভক্তিমূলক বক্তৃতা শুরু হবে বলে সে আশা করেছিল। দুকানের সাম্প্রতিক মনোভাবটা তার জানা নেই, সেপ্টেম্বর মাসের সেই আতঙ্ক-ঘটনার পরে আর দুকানের সঙ্গে তার দেখা হয়নি, আর সেও এড়িয়ে গেছে দুকানকে। ব্রতেইর বক্তৃতা শুনে প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল দুকান—গোঁয়ার আর মন্থর স্বভাবের লোক হলেও সে মোটেই নির্বোধ নয়, এখন যেন সচেতন হয়ে উঠল সে। দক্ষিণপন্থীরা 'মহান ফ্রান্স'-এর পক্ষে—এই বিশ্বাস নিয়েই দুকান তাদের দলে আসে; আর এখন কিনা তারাই—ব্রতেইর আর তার নিজের ভূতপূর্ব বন্ধুরাই—সামরিক উদ্যোগ-আয়োজন বানচাল করে দিচ্ছে, দলত্যাগ আর বিশ্বাসঘাতকতার কাজে উৎসাহ দিচ্ছে। আর ফ্রান্সকে সত্যিই রক্ষা করতে চায় কারা? শ্রমিকরা! কমিউনিস্টরা!—বড়ো ভয়ানক কথা। দুকানের পক্ষে এটা মস্ত একটা আঘাত; সত্যি 'কথাটা উপলব্ধি করতে তার বহুদিন লেগেছে। হাজার হাজার লোক যে শ্রেণীগত আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্ধ, ব্রতেই সেই দলে নয়—এই ভেবে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে এতদিন। কিছুদিন থেকেই সে ব্রতেইর সঙ্গে একবার আলোচনা করবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ব্রতেইকে ধরতে পারছে না কিছুতেই। ইদানীং তার মন অবিশ্বাসে ভরে উঠেছে। দুকানের যদি বয়স কম হত তাহলে কোনো সামরিক কাজে ঢুকে হয়ত স্বস্তি পেত সে; কিন্তু ছাপ্পান্ন বছর বয়সে আকাশ-যুদ্ধের কথা ভাবা কঠিন। পরাজয়বাদীদের প্রচারের বিরুদ্ধে সে যথাসাধ্য করেছে। ওরা এড়িয়ে চলে দুকানকে; কখনো বা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে অনুকম্পার সঙ্গে বলে, 'স্বপ্ন-বিলাসী'; কিংবা চটে উঠে এক ধমকে থামিয়ে দেয়, 'মস্কোর নির্দেশ ওসব।' যে সব কথায় তার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে, ঠিক সেই কথাগুলোই সে আজ শুনল ব্রতেইর এই বক্তৃতায়। দুকানের ইচ্ছে হল, তার এই ভূতপূর্ব শিক্ষক আর ফ্রান্সের শত্রুদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয়, কিন্তু ভীষণ উত্তেজনায় কথা আটকে গেল তার; উচ্চারণের ত্রুটি এতোই বেড়ে গেল যে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে একটা যন্ত্রণার গোঙানি বেরুতে থাকল তার গলা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত

একটা অস্বাভাবিক স্বরে চিৎকার করে উঠল দ্যকোন :

'তাহলে এইটাই তোমার আসল মূর্তি! হিটলারের গুণগান করে বেড়াও! তুমি যুদ্ধে আহত হয়েছিলে—কিন্তু ওই সম্মানের চিহ্নটার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তুমি!' চোখে জল এসে গেল দ্যকোনের; ছোঁ মেরে তুলে নিল টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজপত্রগুলো; দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ডেপুটিরা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'লোকটা পাগল!' কেউ কেউ বলল, দ্যকোন সম্বন্ধে অত কড়াকড়ি বিচার করলে চলবে না : গত যুদ্ধে আহত হবার ফলে ওর খুলি ফুটো করে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল; এই ব্যাপারটা বোধ হয় ওর মনকেও খানিকটা প্রভাবান্বিত করেছে।। গ্রাঁদেল শুধু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'পাগলামির ভান করলেও হালচালে ও দিব্যি সেয়ানা। কাল ফুজের সঙ্গে ওকে দেখলাম। দেশপ্রেমের জন্যে ততোখানি নয় যতোখানি মস্কোর মাখন-রুটির জন্যে...'

ব্রতেইর অভিমত—ও নিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়, দ্যকোনের ব্যাপারটা আরও শান্ত সময়ের অপেক্ষায় মুলতুবী রেখে আপাতত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে মন দেওয়া দরকার—যে কোনো মুহূর্তে অবস্থা চরমে উঠতে পারে।

'মুসোলিনীর ওপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে। হিটলারের সঙ্গে আমাদের মিটমাট ঘটিয়ে দেবে সে। চেম্বারলেনেরও যথেষ্ট আগ্রহ আছে এ ব্যাপারে। আমরা যে চতুঃশক্তি-চুক্তির স্বপ্ন এতকাল দেখে এসেছি, তার প্রয়োজনীয়তা র‍্যাডিকালদের উপলব্ধি করানো চাই-ই।'

সভায় একটা প্রস্তাব গৃহীত হল : 'জাতীয় মনোভাবাপন্ন ডেপুটিদের এই সভা আশা করে যে শান্তিরক্ষার জন্যে গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য করবেন এবং বিচার-বিবেচনা না করে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকবেন।'

ডেপুটিরা সবাই চলে যাবার পর গ্রাঁদেল ব্রতেইর কাছে গিয়ে বন্ধুত্ব দেখিয়ে বলল, 'আশ্চর্য রকম সংযত ছিলেন আপনি! আমি হলে তো রীতিমত চটে উঠতাম। আপনার ওই ক্ষতচিহ্নটার কথা...কী হীন বদমায়েশী!'

ব্রতেই একবার চারদিকে দেখে নিল, ঘরে আর কেউ নেই। তারপর নিচু স্বরে বলল, 'আমায় লোকে বোকা বলে ভাবুক এ আমি চাই না। দ্যকোনটা একটা নির্বোধ, মানসিক ব্যাধিতে ও ভুগছে। কিন্তু আপনার আমার মধ্যে বলেই বলছি কথাটা : আপনার দেশ-প্রেমের আসল প্রেরণাটা জানতে পেরেছি আমি। আশা করি, আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন ?'

ঘাবড়ে গিয়ে চোখ পিট্পিট্ করতে লাগল গ্রাঁদেল। 'কই না, পারছি না তো।'

'তাহলে আরও খুলে বলি কথাটা। আমি জানি, জনৈক কিলমান—'

'আবার সেই জালিয়াতি!'

'মাফ করবেন; আপনি যে ওর সঙ্গে সত্যিই দেখা করেছিলেন, তার প্রমাণ পেয়েছি আমি।'

কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল গ্রাঁদেলের মুখ : ব্রতেই যদি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার আর কোনো ভরসা নেই। চুপ করে রইলে সে।

'তবু ভাল যে আপনি প্রতিবাদ করলেন না,' বলল ব্রতেই, 'কাউকে আমি বলিনি কথাটা, আর বলতেও চাই না। তবে আপনি যে আমাকে হাবাগোবা লোক বলে ধরে নেবেন—তা হবেনা। আপনার বার্লিনের প্রভুদের ধারণা যে ওরা আমাকে নিজেদের কাজে

ব্যবহার করে নিচ্ছে। ওরা যা ভাবে ভাবুক। ব্যক্তিগতভাবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমিই ওদের নিজের কাজে ব্যবহার করছি। বুঝলেন মশিয় গ্র্যাঁদেল, আমি জাতীয় ফ্রান্সের সেবক, কিলমানের নই।' নিজেকে সামলে নিল গ্র্যাঁদেল, এমন কি উৎফুল্ল হয়েই বলল, 'আরে মশাই, শেষ পর্যন্ত তো প্রশ্নটা দাঁড়ায় কথার মানে নিয়ে। ও নিয়ে তর্ক তুলে লাভ কি?'

বাইরে রাস্তার মুখরতা সেই একই রকম উৎকণ্ঠ; লোকে আসছে যাচ্ছে, ছোট ছোট দলে জড়ো হয়ে গুজব নিয়ে আলোচনা করছে, রাস্তার ধারের দোকানগুলো থেকে সাগ্রহে কিনছে কাগজের সর্বশেষ সংস্করণ, পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, তর্ক করছে, গান গাইছে। একটু তাড়া ছিল ব্রতেইর; রোমের একটা কাগজের একজন সংবাদ-দাতার সঙ্গে তার দেখা করার কথা, কিন্তু যাবার পথে সে ঢুকল স্যাঁ জেরম্যাঁ দে প্রের গির্জাটায়। স্ফটিকপাত্রে রাখা পবিত্র জলে ফ্যাকাশে আঙুলটা ডুবিয়ে নিয়ে ক্রশ-চিহ্ন আঁকল নিজের বুকে, তারপরে ডান দিকে যেখানে বেদীর ওপরে মেরী-মাতার মূর্তির চারদিকে মেয়েরা প্রার্থনা করছে তাদের স্বামী-পুত্রদের জন্যে।

গির্জার ছায়া থেকে বাইরে এসে রোদটা অসহ্য লাগে। ব্রতেই চোখ কুঁচকে তাকাল— মুহূর্তের জন্যে মনে হল সব কিছু যেন ভেসে উঠে পাক খেয়ে যাচ্ছে: বিনিদ্র রাত্রিগুলো শোধ তুলতে চায়। খবরের কাগজওলারা সমানে ছুটোছুটি করছে। আলখাল্লা-পরা এক-জন পাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। কেউ একজন মারা যাচ্ছে, লোকটির আত্ম-শুদ্ধির জন্যে ধর্মপুস্তক ইত্যাদি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলেছেন তিনি; গির্জার ধর্ম-সংগীত গাইয়েদের মধ্যে সাদা লুঙ্গি আর ফ্রক-পরা একটি ছেলে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। আঙিনায় ডাকাডাকি করছে একদল পাখি। আর, উলটো দিকে কাফেটার বারন্দায় বসে মৌরী, এরারুট, ইউক্যালিপ্টাস, কমলালেবু আর লিলি-অফ-দি-ভ্যালীর রস মেশানো সুগন্ধি সরবত খেতে খেতে পারীর লোকেরা এমন একটা ভাব দেখাবার চেষ্টা করছে, যেন বিশ্বসংসারে কিছুই ঘটেনি।

তেরো

'সিয়েন' কারখানার ধর্মঘটীদের সভা অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল; বাক্যব্যয় করার ইচ্ছে নেই কারও। সবাই জানে দেশের দায়িত্ব এসে গেছে কতকগুলো অকিঞ্চিৎকর হীন-চরিত্রের লোকের হাতে—যে কোনো বিশ্বাসঘাতকতার কাজ ওদের দ্বারা সম্ভব। শ্রমিকরা লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু এই প্রস্তুতির পেছনে কোন স্ফূর্তির ভাব কিংবা আবেগ নেই। তাদের দৃঢ় সমর্থন জানাবার জন্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি দল প্রেরিত হবে বলে স্থির হল।

পরের দিন সকালে চেক-দূতাবাসে যাবার পথে শাঁ-দ্য-মার পার হবার সময় লেগ্রে আর পিয়ের সারি সারি ট্যাঙ্ক যেতে দেখল। দড়ি ঘুরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে মেয়ে-গুলো। অবস্থাপন্ন চেহারার একজন মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল,

'চেকোশ্লোভাকিয়ার বিয়ার খুব ভাল শুনেছি, কিন্তু আমি বিয়ার ভালবাসি না। তা তোমাদের জিজ্ঞাসা করি—ওদের ব্যাপারে আমাদের কি করার আছে?'

লেগ্রে পিয়েরকে বলল, 'তুমি কাল বলছিলে—শিগগিরই এমন অবস্থা হবে যে ফ্রান্সের বন্ধু বলতে কেউ থাকবে না। কথাটা ঠিক। কিন্তু ফ্রান্সের মধ্যেও আমাদের বন্ধু নেই। পপুলার ফ্রন্টের কথা আমরা এখনো বলি, কিন্তু পপুলার ফ্রন্ট লোপ পেয়েছে। সমাজতন্ত্রীদের চেয়ে দুকানকে ঢের পছন্দ করি আমি—লোকটা খাঁটি। শ্রমিকরা চমৎকার তৎপরতা দেখাচ্ছে—অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে ওদের আন্দোলন। কিন্তু চাষীরা? দালাদিএ যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে ওরা খুশি হয়।'

পিয়ের হেসে বলল, 'শুধু চাষীরাই নয়, আমার আনেও খুশি হবে—যদিও ও মজুরের মেয়ে। ওর বোঝা উচিত—কিন্তু সব কিছুই ও একেবারে গুলিয়ে ফেলেছে। আমাকে প্রায়ই বলেঃ কিন্তু তুমি তখন কি লিখেছিলে দেখ। ব্যক্তিগতভাবে নিজের আবেগ-অনুভূতির ওপরে আমার বিশ্বাস আছে। স্পেনের ব্যাপারেও ঠিক এই রকমটিই হচ্ছিল... বার্সেলোনায় আজানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। একদম খাঁটি র‍্যাডিকাল—আমাদের সারোর মতই। তোমার কি মনে হয়, শ্রমিকদের ও ডুবিয়ে দেয়নি? নিশ্চয়ই ডুবিয়েছে; তবু প্রশ্নটা ওকে নিয়ে নয়। চেকদের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু আনে বুঝতে চায় না—সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলে ও।'

'আনে বোঝে হয়তো, কিন্তু ওরা তোমাকে সীমান্তে পাঠাতে পারে ভেবে ভয় পেয়েছে। একটা ছেলে আছে তার। এতো বোঝাই যায়......' নিশ্বাস ফেলল লেগ্রেঃ সংসারে সে একলা মানুষ, তার জন্যে কারও ভাবনা নেই।

মেঘলা দিন, কিন্তু সাদা মেঘের আড়ালে সূর্যকে টের পাওয়া যায়। পিয়ের বিড়বিড় করে বলল, 'পথ ছেড়ে দেবে ওরা। মোহগ্রস্থরা যেমন একই ভাবে পাক খায়, এ-ব্যাপারটাও তেমনি।'

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পিয়ের যেন একটা কিছুর জন্যে আশায় আশায় দিন কাটাচ্ছে। এমন কি স্পেনের চিন্তাটাও তলিয়ে গেছে। হিটলারের কাছে চেম্বারলেনের প্রথম ও দ্বিতীয় বিমানযাত্রার মধ্যবর্তী সময়ে যেন কয়েক বছর কেটে গেছে। কাজ, চিন্তা কিংবা ঘুমোনো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পপুলার ফ্রন্টের দিনগুলোর সেই উৎসাহ আর পিয়েরের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু আশাভঙ্গের তিক্ততা; এমন কি, একটা নিষ্ক্রিয়তার মনোভাবও যেন পেয়ে বসেছে তাকে। তার স্বভাবের সঙ্গে এ জিনিসটা মোটেই খাপ খায় না; পিয়ের ভাবছে, 'এগুবার পথও আমার আর নেই, পিছুবারও উপায় নেই।' অস্ত্রশস্ত্র-বিক্রেতাদের সঙ্গে কয়েকটা কূটনৈতিক কথাবার্তা চালাতে হয়েছিল তাকে। বারকয়েক স্পেনে যাতায়াত করতে হয়েছিল। দিনগুলোকে এখন আশ্চর্য স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। সে আশা করছে শিগগিরই একটা কিছু ঘোষণা করা হবে, যুদ্ধ বাধবে, আর তাকে যেতে হবে সীমান্তে। কিন্তু তার মনের মধ্যে যে শিশুটি বাস করছে, পের্পিঞার সেই অলস স্বপ্নবিলাসীটি সুখী-জীবনের দাবী জানাচ্ছে। পাশের বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে পিয়ানোর সুর তার কানে ঢুকতেই থেমে গেল পিয়ের, খুশি হয়ে নিমীলিত করল চোখ দুটো ঃ

'পুরনো সেই সুর...কী সুন্দর!'

চেকোশ্লোভাকিয়ার দূতাবাসের প্রধান সেক্রেটারী তাদের অভ্যর্থনা করল। মোটা-

মোটা ঢিলেঢালা প্রকৃতির লোক এই ভানেক, চাষীদের মতো চওড়া হাত, মোটা ঘাড়ের ওপর গলাটা মাড় দেওয়া শক্ত কলারে জড়ানো।

গত কয়েকদিন ধরে অনবরত শ্রমিকদের প্রতিনিধি-দল দূতাবাসে আসছে, আর প্রত্যেকবার ভ্রূকুটি করছে ভানেক। 'সর্বহারা-শ্রেণীর দৃঢ় ঐক্য' শুনে সে ভেবেছে, কি কি ঘটেছে ব্যাপারটা? কে এই লোকগুলো যারা তার সঙ্গে দেখা করতে এসে করমর্দন করছে, ক্রুদ্ধভাবে কথা বলছে আর ভরসা দিয়ে যাচ্ছে? কমিউনিস্ট ওরা! চেক্-প্রতিনিধির কাছে গিয়ে সে স্বীকারোক্তি করল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!'

ন-বছর আগে ভানেক মোরাভিয়ার ওস্ট্রাভ্-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বে অধ্যাপনা করত; মতামতের দিক দিয়ে সে ছিল উদারপন্থী। সেখানে কমিউনিস্টরা নতুন সামরিক আইন-জারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় গোলমাল শুরু হল; গ্রেপ্তার হল কমিউনিস্টরা। বিচারের সময়ে ভানেক অন্যতম সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিল; রায় শুনে খুশি হয়েছিল সে ঃ দলের নেতাদের জন্যে চার বছর কারাদণ্ড। আর এখন প্যারীর সেই কমিউনিস্টরাই ভরসা দিচ্ছে তাকে! কিন্তু যাদের সঙ্গে এতদিন ধরে ভানেকের মেলামেশা, যে সব বন্ধুদের সে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে আর যাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছে ম্যাজিনো-লাইন, টিটুলেস্কুর বক্তৃতা কিংবা স্মেটানার নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল সেই সব সংস্কৃতিবান দরদী লোকগুলো? গত বসন্তে তেসা যখন মন্ত্রী হল, তখন কী খুশিই না হয়েছিল ভানেক! মাসারিক-এর জয়ন্তী উপলক্ষে তেসাই তো লিখেছিল, 'ইউরোপের কেন্দ্রে চেকোশ্লোভাকিয়া আমাদের পাশ্চাত্য-সভ্যতার দুর্ভেদ্য প্রাকার। মানবতার দেশ এই চেকোশ্লোভাকিয়া...' আর এখন তেসার কাছে ঘেঁষাও অসম্ভব। তার দেশের ভাগ্যে কি ঘটবে সে কথা ভেবে ভানেক উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ফরাসী সংবাদপত্রে প্রবন্ধগুলো পড়ে চটে আগুন হয়েছে সে; ব্রতেই যে প্রবন্ধে চেকদের 'বর্বর' বলেছে, সেই প্রবন্ধটা পড়ে রাগের ঝোঁকে কফির কাপ ভেঙে চুরমার করেছে। এর ওপরে তার ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্ভাবনাও আছে; মোরাভিয়ার ছোট একটা সীমান্তবর্তী শহরে ভানেকের জন্ম; সেখানে থাকেন তার বুড়ো বাপ-মা আর বোন। গোঁয়ারের মতো সে দিনে একশো-বার পুনরুক্তি করে, 'ফরাসীরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।' বৈদেশিক বিভাগের দপ্তরে গিয়ে ভানেক তার জানাশোনা ডেপুটিদের চেপে ধরেছে, কিন্তু তারা হয় কিছু বলতে পারেনি আর না হয় মড়াকান্নার ভাব দেখিয়েছে। দূতাবাসে প্রতিনিধি দল আসতেই থাকছে; কিন্তু ভানেক যাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে—যেমন, ফরাসী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি দল, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ, র‍্যাডিকাল কিংবা এমন কি সমাজতন্ত্রীরা—তারা কেউ আসে না। যারা এসেছে তারা সবাই শ্রমিক আর সবাই এসে একই কথা বলে গেছে। ভানেক ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন করেছে আর মনে মনে ভেবেছে 'আবার সেই কমিউনিস্টরা?'

দূতাবাসে এসে লেগ্রে সমস্তক্ষণ চুপ করে রইল; কথাবার্তা সবই বলল পিয়ের। পিয়েরের জোরালো ভঙ্গি আর অসাধারণ বাক্যপ্রয়োগের ক্ষমতায় ভানেক আকৃষ্ট হল; সে বুঝল, এ মজুরও নয় কমিউনিস্টও নয়—স্বাধীনভাবে চিন্তা করে; লোকটার মতামত আর মনের গড়নটা তার নিজের মতোই।

'অত্যন্ত খুশি হলাম আপনার কথা শুনে,' বলল ভানেক, 'সব রকম মতের লোকই যে আমাদের কাছে আসছেন, এটা আনন্দের কথা। নইলে, খালি কমিউনিস্টরাই আসছে

বলে ধারণা হতে পারত।'

পিয়ের আড়ষ্টভাবে বলল, 'আমি কমিউনিস্ট।'

ভদ্রভাবে হাসল ভানেক। দোতলার খোলা জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। কানে আসছে কাগজওলাদের আতঙ্কজনক চিৎকার। আলোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ভানেক ভাবল, তেসা আজ তার সঙ্গে দেখা করবে কিনা কে জানে।

বাইরে এসে লেগ্রে পিয়েরকে বলল, 'শোন, পিয়ের। অবশ্য জানি, এখন এই নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই; তবু আমি কিছুদিন ধরে তোমাকে কথাটা শুধোব ভাবছিলাম। তুমি পার্টিতে যোগ দিচ্ছ না কেন?'

পিয়ের কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর বলল, 'কেন তা জানি না। বোধহয়, এইটাই সমীচীন।'

শেষ পর্যন্ত তেসা ভানেকের সঙ্গে দেখা করল। পাছে কোন অভিযোগ শুনতে হয়, এইজন্যে মন্ত্রী-মশাই আগে থেকেই চেঁচাতে লাগলেন :

'বোঝেন না কেন আপনারা? শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির ওপরেই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর ভাগ্য নির্ভর করছে। আমরা আপাতত যুদ্ধে নামতে অপারগ। কিন্তু আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজন সম্পূর্ণ হলেই, ওসব প্রদেশগুলো আবার ফিরে পাইয়ে দেব আপনাদের। সবুর করতে জানা চাই। প্রাশিয়ানরা যখন শ্লেস্‌ভিগ অধিকার করে নেয়, তখন আমরা বাধা দিইনি বটে, কিন্তু অর্ধ-শতাব্দী পরেই আমরা ডেনদের ফিরিয়ে এনে দিয়েছি তাদের সম্পত্তি। এটা তো হল গিয়ে রাষ্ট্রনীতির অ-আ-ক-খ।'

ভানেক সাধারণত অল্পভাষী; কিন্তু এখন সে একটা হঠকারিতা করে বসল, 'শ্লেস্‌ভিগ দখল করে নিতে দিয়ে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটতে দিয়ে ফ্রান্স সিড্যানের পথ তৈরি করে দিয়েছিল......'

তেসা মুখিয়ে উঠল, 'ও উপমাটা এক্ষেত্রে খাটে না। দ্বিতীয় রিপাব্লিকের তখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা; কিন্তু আজ এই ১৯৩৮ সালে ফ্রান্স দুর্নিবার শক্তিতে বিকশিত হচ্ছে। কিছু ভাববেন না : সিড্যান-এর পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু সবুর করা চাই। সুদেতেন প্রশ্নের ওপর ফ্রান্স দু দলে ভাগ হয়ে গেছে।'

চুপ করে রইল ভানেক। তার রোদ-বৃষ্টি-ঝড় সওয়া লাল মুখখানা আরও লাল হয়ে উঠেছে, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। কিন্তু তেসা মাথা ঠাণ্ডা করে ফেলল; তার ক্রোধ পরিবর্তিত হল অমায়িকতায়। ভানেকের কাছে সরে এসে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল :

'বিশ্বাস করুন আপনাদের দুঃখে আমরাও দুঃখী। প্লাস্ দ্য লা কঁকর্দ-এ স্ট্রাস্‌বুর্গের প্রতিমূর্তি যখন শোক-বস্ত্রে ঢেকে গিয়েছিল তখনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। আপনারা হাড়িকাঠে চাপছেন বলিদানের অর্ঘ্য হিসেবে। শান্তিরক্ষার জন্যে আপনারা যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। একথা ফ্রান্সের নারীজাতি কখনো ভুলবে না......'

ভানেকের মনে পড়ল কালো ঘোমটার নিচে তার বৃদ্ধা মায়ের মুখখানা—চাষী-বৌদের মতই তাঁর বেশভূষা। একটা অসম্ভব, ছেলেমানুষি আশা জাগল তার মনে : হয়তো শেষ পর্যন্ত এরা চেকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নাও করতে পারে।

ভানেক বলল, 'আপনি বলছেন, সুদেতেন-প্রশ্নের ওপর ফ্রান্স দু দলে ভাগ হয়ে গেছে; কিন্তু যে অঞ্চলটা নিয়ে বিরোধ বেধেছে, সেখানে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানকার বাসিন্দারা সবাই চেক, একটাও জার্মান নেই সে সব জায়গায়। এ আমি খুব ভাল করে জানি। আমি ওই জায়গারই লোক। অন্তত ওই অঞ্চলগুলো বাঁচানো একান্ত প্রয়োজন।'

হাই তুলল তেসা, এ ধরণের কথাবার্তায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে : 'এক ঘণ্টা আগে দালাদিএ জানিয়েছে যে সে মিউনিকে বিমানযাত্রা করছে। ওখানে একটা বোঝাপড়া করে নেবে ওরা। আপনার গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিকে সবই জানানো হবে নিশ্চয়ই। সুতরাং বর্তমানে ভূগোল নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

ভানেকের নীল চোখ ঝাপসা হয়ে এল, কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে তেসাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। তারপর তেসা আপন মনে ভাবল, 'কী কাজই না চেপেছে ঘাড়ে! খুনীদের সঙ্গে গিলোটিনে যাওয়াও ঢের ভাল ছিল। এই চেকটা লোক ভালো, কিন্তু বড্ড বেশি সরল! আমরা যে সব কিছুরই ঝুঁকি নিতে পারি না, তা ওরা বোঝে না কেন? যথেষ্ট বদান্যতা দেখানো গেছে! ফ্রান্সের এখন নিজের কথাটা নতুন করে একবার ভেবে দেখা দরকার।'

পলেৎকে টেলিফোনে ডাকল সে :

'আসব নাকি একবার? একটু সান্ত্বনা চাই আমি। না, না, খবর সব ভালো, এমন কি—ভয়ানক ভালো। কোনো যুদ্ধ হবে না। কিন্তু অতি বিশ্রী মানসিক অবস্থা আমার। কি যেন বলেছেন ভেরলেন?—'মন যে কেমন করে অকারণে।' বেশ! আমি আসছি তাহলে। এক্ষুনি পৌঁছে যাব।'

চৌদ্দ

গায়ের কোটটা খুলে ফেলে জোলিও তার ছাপাখানার ঘরে ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ-সংস্করণ কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদগুলো কি ভাবে সাজানো হবে সেটা ঠিক করা হচ্ছে; চেম্বারলেনের ছেলেবেলার গল্পটার জন্যে জোলিও বিশেষভাবে গর্ব অনুভব করছে : অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হলে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মহোদয় মিটমাট করিয়ে দিতেন এবং তাঁর মা ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্য-জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন।

একজন সহকারী সম্পাদক এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি শিরোনামা দেব?—'মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত'?'

জোলিও ভ্রূকুটি করে বলল, 'খেলো শোনাচ্ছে। মোটেই জোরালো হয় না কথাটা। ঠিক লাগসই হবে না।'

'তাহলে, 'শান্তির বিজয়-অভিযান' কথাটা কেমন হবে?'

এটাও জোলিওর পছন্দ হল না; মাথাটা পেছনে হেলিয়ে চোখ দুটো নিমীলিত করে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ফ্রান্সের বিজয়-অভিযান—গোটা প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপাও শিরোনামাটা...'

পারীতে ফিরে এসে দালাদিএ মৃত সৈনিকদের স্মৃতি-স্তম্ভের নিচে ফুলের তোড়া রাখল; সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আপিস, দোকান, ইত্যাদি বন্ধ আছে; সাঁজ-এলিজের চওড়া ফুটপাথে ভিড় জমেছে, জনসাধারণ আনন্দ-মুখর, যুদ্ধক্ষেত্রের গড়খাইয়ে গিয়ে আর বসতে হবে না তাদের। বিশেষ করে নারীর সংখ্যাধিক্যটা লক্ষ্যণীয়; পতাকা উড়ছে সর্বত্র,

ফুলের দোকানে গোলাপ আর জেরানিয়মের তোড়া বিক্রি হচ্ছে! গতকাল অন্ধকার রাস্তায় রাস্তায় শোনা গিয়েছিল নিচু গলায় বিষণ্ণ বাক্যালাপ, কান্নার ফোঁপানি আর ভাঙ্গা গলার গান। আর আজ সর্বত্রই ছুটির দিনের মুখরতা।

সাঁজ-এলিজের কাছে একটা মাঝারি গাছের রেস্তোরাঁর এক অন্ধকার কোণের টেবিলে বসে আছে দেসের। দুপুরের খাওয়া এইমাত্র শেষ করে সে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। এই রেস্তোরাঁয় লোকজন বড়ো একটা আসে না, জানাশোনা লোক এড়াবার জন্যেই দেসের এখানে এসেছে। কাগজওলার কাছ থেকে একখানা 'লা ভোয়া নুভেল' কিনে নিয়ে সামনের পাতাগুলো চোখ বুলিয়ে উল্টে গেছে, এখন পড়ছে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা ডাকাতির আর আগুন-লাগার খবরগুলো। অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে আছে তার মন, আর চোখ তুলেই ফুজেকে দেখতে পেয়ে বিষণ্ণতাটা আরও বেড়ে গেল।

'তুমি এখানে?'

'দেখতেই পাচ্ছো...'

অন্য যে কোনো সময় হলে ফুজেকে দেখে দেসের খুশি হত। অনেকদিনের বন্ধু তারা; দুজনে একসঙ্গে 'পলিটেক্‌নিক্‌'-এ পড়েছে আর ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখেছে। পরে দেসেরকে মন দিতে হয়েছে ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা কাজে, আর ফুজে নামল ইতিহাস আর রাজনৈতিক গবেষণায়। ক্বচিৎ দেখাশোনা হয় তাদের, কিন্তু দেখা হলে তারা বন্ধু-ভাবেই কথাবার্তা বলে, আড়ম্বতা বা কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেয় না। দেসেরকে যদি কেউ বলে যে তার প্রিয়পাত্র ওই র‍্যাডিকালরা হীনচরিত্রের লোক, ওরা রিপাব্‌লিকের রক্ত শোষণ করছে, আর আড়ালে-আড়ালে স্তাভিস্‌কির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে, তাহলে দেসের জিজ্ঞাসা করে, 'ফুজে সম্বন্ধে কি বলতে চাও?' তার কাছে এই শ্মশ্রু-মণ্ডিত কর্মী ব্যক্তিটি প্রাচীন ফ্রান্সের সমস্ত সদগুণের মূর্তিমান প্রতীক।

ঐতিহাসিক হিসাবে ফুজে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। পিকার্ডির জ্যাকোবিন সম্প্রদায় আর শুআঁদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম সম্বন্ধে তার লেখা বইগুলো মূল্যবান রচনা বলে সর্বস্বীকৃত। বিদ্যার সাধনাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে সম্পূর্ণ করাও তার লক্ষ্য। তার কাছে দেশভক্তির অর্থ আর সাদাসিধে ব্যবহারের অর্থ একই। সহজ আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বলে, 'পিতৃভূমির সংকট।' তাকে যারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, এমন কোন লোকের সদ্যজাত সন্তানকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে ফুজে লোকটিকে বলে, 'একজন খাঁটি নাগরিক আপনি!' ফুজে নিজেকে জ্যাকোবিনদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করে।

অতীতের প্রতি তার অন্ধ অনুরাগ। কেউ না কেউ সর্বদাই রিপাব্‌লিকের শত্রুতা করছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। নেপোলিয়নের বংশধরদের যে কোন সমর্থককে সে সন্দেহের চোখে দেখে, আর রাস্তায় দেখলেই বিরক্তির সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পৃথিবী ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্য দেশে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। প্রত্যেকটি বিদেশী কথা সে ফরাসী ঢঙে উচ্চারণ করে—সোবিয়েতকে বলে 'সোহিব্এ', চেম্বারলেন কে 'শংবেরলাং', দ্যচেকে 'দিউস্'; শুধু তাই নয়, ক্রোট্‌দের সে বলে, 'সন্ত্রাসবাদী, কালাপাহাড়ী, বল্কানদের দল' আর গান্ধীকে বলে 'হিন্দু দাত'।

ফুজের বাবা ছিলেন পাথর খোদাইয়ের কারিগর, গভীর একনিষ্ঠতা ছিল তাঁর নিজের কাজে, তাই ছেলেবেলা থেকেই ফুজে কাজ ভালবাসতে শিখেছে। বরাবরই সে

নিজের মতো কাজ পেয়েছে, এটা তার একটা সৌভাগ্য। যারা ন্যায্য বেতন পায় না বলে কাজকে ঘৃণা করে—চার পাশের সেই লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী তার চোখেই পড়ে না। তার মতো, সমাজতন্ত্রী আন্দোলনটা কতকগুলো সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কিন্তু বস্তুসম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন লোকের উদ্ভট পরিকল্পনা মাত্র। ফরাসী ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের ফুজে উপদেশ দেয়, 'তা যাই বলো, এর পেছনে ভাটিক্যানের চক্রান্তটা অগ্রাহ্য কোরো না!'

যাদের ওপর অবিচার করা হয়েছে এমন সব লোকের অভিযোগ সম্পর্কিত কাগজপত্রে তার পকেট সর্বদাই ঠাসা থাকে। বাসাবাড়ি থেকে বিতাড়িত বিধবার জন্যে ফুজে তদ্বির করে, সেনিগলের অধিবাসীদের সমর্থনে কিংবা এ্যানার্কিস্টদের পক্ষে দাঁড়ায়। সুতরাং 'নাগরিক সর্ব-সাধারণের অধিকার রক্ষার জন্যে সংঘ'-এর সে একজন শ্রেষ্ঠ উৎসাহী কর্মী। তার স্ত্রী তাকে কৌতুক করে বলে, 'ব্যস্তবাগীশ!' মোটাসোটা, শান্ত স্বভাবের মেয়ে তার স্ত্রী— সর্বদাই বাড়ির কাজকর্ম করছে, বাতি-দানের ঠুলী তৈরি করছে, ছবি টাঙাচ্ছে কিংবা চেয়ারের ওড়নায় নক্শা সেলাই করছে। ফুজে ঠাট্টা করে অভিযোগ করে, 'পিঠের ওপর বাড়ি-বয়ে-বেড়ানো এক শামুককে বিয়ে করে এনেছি।' ছেলেগুলো বড়ো হয়ে উঠেছে, কিন্তু একটাও কোনো কর্মের নয়, কিছু করবার ইচ্ছেও নেই; ফুজের কাছ থেকে টাকা বাগায় আর তাকে মনে করিয়ে দেয় যে 'অপরের সম্বন্ধে সহিষ্ণু' হওয়াই তার নীতি।

চেম্বারের সবাই ফুজেকে র‍্যাডিকাল বলে মনে করে; কিন্তু তেসার মতে, সে বলশেভিক। তেসা চেঁচামেচি করে, 'কী কাণ্ড! লোকটা বলে কিনা, বামপন্থীদের মধ্যে র‍্যাডিকালদের কোনো শত্রু নেই! তাহলে কমিউনিস্টরা কি?' ফুজে একবার কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে বলেছিল, 'ওদের কথাবার্তা সব অত্যন্ত অবাস্তব, কিন্তু সাচ্চা দেশভক্ত ওরা।' মাত্র বাহান্ন বছর বয়স তার, কিন্তু আচারে ব্যবহারে সে পুরোদস্তুর প্রাচীনপন্থী; চেম্বারে সবাই ওকে নাম দিয়েছে 'পাল্কীর-গাড়ীওলাদের শেষ বংশধর'।

দেসেরের মনটা কি রকম ভারাক্রান্ত হয়ে আছে; কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু জানত যে ফুজের বাক্যালাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; আর সত্যিই ফুজে নানা প্রশ্ন তুলল—দেসেরের অন্তরালবর্তী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সে রীতিমতো খোঁজ খবর রাখে:

'তুমি সাঁজ-এলিজে যাওনি কেন? শ্যাম্পেন খাচ্ছো না কেন? তোমার তো খুশি হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত এটা তোমাদেরই জয়।'

'কি বলব বলো? এত সহজে আর এমন ঢাকঢোল পিটিয়ে জয়লাভ করাটা খুব সুখের কিছু নয়।'

কথাটা বুঝতে না পেরে ফুজে বিরক্ত হয়ে উঠল। দাড়িটা কাঁপতে থাকল তার। 'কথা, খালি কথা! এই তো চেয়েছিলে তোমরা—অস্বীকার করবার চেষ্টা কোরো না। এমন কি ওই যাদুঘরের মড়া ভীইয়ারটাকে পর্যন্ত দলে টেনেছো। সবই জানি আমি। বিজয় উৎসবের অনুষ্ঠান করতে পারো বৈকি তোমরা!'

'না, আমি এ চাইনি। যুদ্ধের জন্যে আমরা যে প্রস্তুত নই আর যুদ্ধ করতেও পারতাম না, তা আমি জানতাম। আমি ছিলাম আপোস-রফার পক্ষে। কিন্তু প্রথমত, আপোসের শর্তগুলো আমরা যা আশা করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি গুরুভার হয়েছে; দ্বিতীয়ত—এইটেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—আমার কথাটা বড্ড বেশি রকম সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বুঝেছো? বড্ড বেশি রকম সঠিক! আজ দেখা গেছে, ম্যাজিনো

লাইন কিংবা অস্ত্রশস্ত্র কোনোটাই আমাদের কোনো কাজে লাগবে না; কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। সাঁজ-এলিজের ভিড় দেখে এখানে পালিয়ে এসেছি। কূটনীতিক ক্ষেত্রে এটা ঠিক সিড্যানের মতই একটা ব্যাপার—অথচ এটাকে ওরা কিনা একটা বিজয়োৎসবে দাঁড় করিয়েছে! বিমানঘাঁটিতে নেমে দালাদিএ নিজের মুখ দেখাতে ভয় পাচ্ছিল, ভেবেছিল ওরা তাকে পচা ডিম ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু ওরা এসে তাকে অভিনন্দন জানাল ফুলের তোড়া নিয়ে—নর্তকীকে যেমন করে লোকে। যে দেশের লোক এরকম করে, তারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ।'

'দেশের লোকের ওপর দোষ চাপাচ্ছে কেন? এর জন্যে তোমরাই দায়ী, আর বিশেষ করে এই তুমি। আমি একথা তোমায় স্পেন-ঘটনার শুরুতেই বলেছিলাম। তোমরাই ভীরুতাটাকে একটা নাগরিক ধর্ম হিসেবে প্রচার করেছ, আর এখন কিনা জনসাধারণকে আত্মসমর্পণ করে খুশি হতে দেখে অবাক হচ্ছ! যে সব কাগজে পালিয়ে বাঁচাকেই গৌরবের সঙ্গে প্রচার করা হচ্ছে, সেই সব কাগজের পৃষ্ঠপোষকতা করছ তুমি। ফ্রান্সের শত্রুদের সাহায্য করছ। তুমি চাও—'

তাকে বাধা দিয়ে দেসের বলল, 'কি যে চাই তা আমি নিজেই জানি না। আমার তাস তুরুপ হয়ে গেছে। আমাদের দেশের তাসও তাই, বোধ হয়। আমি কি ভেবেছিলাম জানো? কুঁদুলে আর বুভুক্ষু সব উঠ্তি জাতিগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের শান্ত সুখী জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে যাব বলেই ভেবেছিলাম, কিন্তু তা হল না। এখন যেটা করবার রয়েছে সেটা মন টানবার মতো কিছু নয়। সম্ভব হলে টাহিটি চলে যেতাম। কিন্তু ব্যবসার জালে বাঁধা পড়ে গেছি। ব্যবসার জন্যে মোটেই গ্রাহ্যই করি না, তবু একেবারে সব ছেড়েছুড়ে দিতেও পারি না। সব সময়ে স্নায়বিক ব্যাধিতে ভোগাটা কবির পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, কাব্য দেবীরা সেটা পছন্দ করেন বলেই মনে হয়। শেয়ার-বাজারে ওসব চলে না।'

খাবারের বিল শোধ করে দিল দেসের। তারপর যেন তারা দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলে এল সাঁজ-এলিজের দিকে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল।

একটা খোলা মোটরে চেপে যাচ্ছে দালাদিএ। জনতা সোৎসাহে অভিনন্দন জানাল তাকে। তার পেছনে আর একটা মোটরে চলেছে তেসা। সে সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখছে তার নিজের উৎসব-দিবস হিসাবে, সমস্ত তারিফটা এক দালাদিএকে নিতে দিতে চায় না সে। জনতার হর্ষধ্বনির উত্তরে মাথা নোয়াবার সময় কেঁপে উঠল তার টিকোল নাকটা; সলজ্জভাবে এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হাসল তেসা—বিয়োগান্ত নাটকের কোন অভিনেতা করুণ স্বগতোক্তির শেষে যেমন হাসে। একজন মহিলা একটা গোলাপ ছুঁড়ে দিল তার দিকে, বুকের ওপর ফুলটাকে সে চেপে ধরল।

'ভারি ফুর্তির শবযাত্রা,' বলল ফুজে, 'ফ্রান্সকে গোর দিতে চলেছে ওরা।'

দেসের আচমকা হেসে উঠল, 'তেসাকেই বড়ো ভাল মানিয়েছে। গোলাপ কেন? লরেল-পাতার মুকুট পরা উচিত ওর।'

ফুজে খেঁকিয়ে উঠল, 'এটা ইয়ারকি দেবার সময় নয়, দেসের। পিতৃভূমির সংকট! হয়তো আর বছরখানেকের মধ্যেই জার্মানরা সাঁজ-এলিজের ওপর মার্চ করে যাবে। মাগীগুলো তখন তাদের দিকেও অমনি করেই গোলাপ ছুঁড়ে দেবে।'

'পিতৃভূমির সংকট, এ্যাঁ? তুমি খাঁটি লোক, কিন্তু তোমার ওই বক্তৃতা ঝাড়ার

স্বভাব আর কিছুতেই শোধরাল না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে পিতৃভূমির আর কোন অস্তিত্বই নেই। আচ্ছা, তাহলে চলি, ফুজে, আবার দেখা হবে!'

পনের

পাতলা দেওয়ালের আড়াল ভেদ করে বাড়ির সমস্ত বাসিন্দাদের কানে এসে পোঁছচ্ছে রেডিওর খবর; সংবাদ-ঘোষকের গলাটা যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে।

ছেলের জন্মের অল্পদিন আগে পিয়ের এই বাড়িটায় এসে বাসা নিয়েছে। দশটা মহলওলা এই বিরাট বাড়ি মিউনিসিপালিটির তৈরি করেছে একটা পোড়ো জমির ওপর। অল্পদিন আগেও জমিটা বুনো ঘাস আর আগাছার জঙ্গলে ভরাট ছিল, আর শত্রুর আক্রমণ রুখবার জন্যে বড় বড় গড়খাই কেটে রাখা হয়েছিল এখানে। পিয়ের একদা এইখানেই প্রণয় অভিসারে এসেছে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কবিতা আউড়েছে আর শাশ্বত প্রেমের প্রতিজ্ঞা করেছে। এখন এই জায়গাটায় চারদিকে বিরাট বিরাট দালান, রাত্রে হাজার জানলায় আলো জ্বলে। ভাড়াটেরা সবাই চাকুরে, কারিগর আর মজুর। দুটো ছোট ঘরওলা এক-একটা খোপ নিয়ে এক-একটা বাসা; প্রত্যেকটি বাসার জীবনযাত্রা একই ধরনের : সকালে উঠেই লোকে ছোটে সুড়ঙ্গ-ট্রেন ধরবার জন্যে; সকাল নটায় মেয়েরা বিছানা-তোষক রোদ-বাতাস লাগাবার জন্যে জানলার বাইরে টাঙিয়ে দিয়ে ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করে; বেলা বারোটায় কাটা-কোর্তা পরা ইস্কুলের পোশাকে কালি-মাখা হাতে ফেরে ছোট ছেলে-মেয়েরা। মাখন, পেঁয়াজ আর কফির গন্ধে বাতাস মন্থর হয়ে থাকে। বিকেলের দিকে রেডিওটা মুখর হয়ে ওঠে, সাড়ে সাতটায় সবাই সান্ধ্য-ভোজন শেষ করে এগারটায় আলো নিভিয়ে শুতে যায়।

গত কয়েকদিন ধরে রেডিওটা মাঝরাত্রি পর্যন্ত অনবরত চেঁচিয়েছে : সাংঘাতিক সব খবর আশা করছে লোকে। কিন্তু আজ সংবাদদাতাটি সকলের ভয় ঘুচিয়েছে : যুদ্ধ হবে না।

পিয়ের আর আনে খেতে বসেছিল। খবরটা শুনে পিয়ের শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাঁটা-চামচটা হাতে নিয়ে; তারপর দাঁড়িয়ে উঠে টেবিলের ওপর বিছানো চাদরটা টান দিয়ে ফেলে গাল দিয়ে উঠল। আনের মনে নানা বিরোধী আবেগের একটা মিশ্রিত অনুভূতি জেগেছে। সে খুশি হল পিয়েরকে যুদ্ধে যেতে হবে না বলে; যুদ্ধ না হলে ভেঙেপড়া বাড়িঘর আর অঙ্গহীন শিশুর মৃতদেহের দৃশ্যও দেখতে হবে না, এ ভেবেও খুশি হল আনে; কিন্তু তবু একটা অজানা দুঃখে ভরে উঠল তার মন—স্বামীর মতামত বা ধারণার অংশীদার সে নয়, কিন্তু স্বামীর দুঃখটা সঞ্চারিত হওয়ায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

ওদের দুজনের মধ্যে কত অমিল। চঞ্চল আর মুখর স্বভাব পিয়েরের, প্রত্যেকটি ভাব ফুটে ওঠে তার মুখে, উল্লাস থেকে হতাশা পর্যন্ত প্রত্যেকটি অনুভূতির মধ্যে তার মন ক্রমাগত দোল খায়। আনে চাপা স্বভাবের মেয়ে, এমন কি খানিকটা গোপনীয়তা আছে তার মধ্যে; একরোখা, সর্বদাই মূল সত্যটাতে যেতে চায়, স্বাস্থ্যবতী, মাতৃত্বের আনন্দে

ভরপুর; তার দৈহিক কামনাগুলো সহজ আর সরল। প্রীতির সঙ্গে ওরা দুজনে জীবন-যাপন করে; মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে প্রচণ্ড কিন্তু ক্ষণস্থায়ী মতবিরোধ দেখা দেয়; পরস্পরের প্রতি ওরা সর্বদাই চেতনা-বহির্ভূত আর স্বেচ্ছাতীত একটা একাত্মতা-বোধ অনুভব করে। ওদের দুজনেরই নিজস্ব জীবন, কর্মক্ষেত্র আর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা আছে। আনে তার কাজ করে যায় সত্যিকার একটা প্রেরণা নিয়ে; তার চোখে প্রতিটি শিশুই রহস্যময় ক্ষীণজীবী চারাগাছের মতো—যেন শুকিয়ে যাবে, আর না হয় সতেজে বেড়ে উঠবে। আনে মনে মনে বলে, 'ওরা সবাই আমার ছেলে, দুদুর মতোই।' কিন্তু কথাটা সত্যি নয়; ছেলের প্রতি তার অন্ধ, একাগ্র স্নেহ; দুদুর সোনালী চুল আর আধো-আধো কথায় বুক ভরে ওঠে তার। আনের আর কোনো অনুভূতি এর চেয়ে গভীরতর নয়,একমাত্র পিয়েরের প্রতি ভালবাসা ছাড়া। স্বামীর প্রতি এই ভালবাসাটুকু সে পিয়েরের কাছে গোপন রাখে, এমন কি নিজের কাছেও। কিশোরীর মতো একটা প্রতিরোধ রয়ে গেছে আনের মধ্যে; পিয়েরকে আত্মদান করার সময় প্রত্যেকবারই তার মনে প্রথমবারকার সেই বিস্ময় আর সুখের শিহরণ জাগে।

আনের ছোট্ট বাসাটা পরিচ্ছন্ন আর নিরাভরণ; জিনিসপত্রের বাহুল্য ও পছন্দ করে না। কিন্তু পিয়েরের টেবিল হরেক ভূতাত্ত্বিক নমুনায় স্তূপীকৃত—একটু উল্টে পাল্টে দেখলেই বোঝা যাবে, কত বিচিত্র সব শখ আর সংগ্রহের বাতিক এক সময়ে পিয়েরের ছিল।

বুলভার ব্রুনের এই ছোট গুমোট বাসাটায়, ইস্কুলের বই, ছবি আর মোটাসোটা গোলাপীরঙ দুদুকে নিয়ে ওরা সুখী হতে পারত। কিন্তু সুখী নয় ওরা: বাইরের কোনো একটা বাধা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ওদের জীবনে। আনে এটা অনেকদিন আগেই বুঝেছে—গ্রাঁদ্ বুলভারের সেই কাফেটায় বসে সৈন্যদের যখন সে আগামী যুদ্ধ নিয়ে তামাসা করতে শুনেছে, তখন থেকেই। যুদ্ধের অপেক্ষায় গত দু বছর ধরে একটানা মানসিক পীড়ন সইতে হয়েছে। এই জীবনটাকে ওরা নিতান্ত সাময়িক বলে ধরে নিয়েছে—ভ্রমণকারীরা যেমন একদিনের জন্যে কোন হোটেলের ঘর ভাড়া নেয়। আনে একবার পিয়েরকে বলেছিল, 'তবু যা হোক, আর একটা দিন ওরা দিয়েছে আমাদের।' পিয়েরের কাছে এই জীবনটা তার সংগ্রামের অংশ এবং নিজেদের ধ্যানধারণা আর আশা-নিরাশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ওর উত্তেজিত কথাবার্তা হৃদয় দিয়ে বুঝতে গিয়ে আনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষত গত কয়েকদিন কেটেছে একেবারে দিশেহারা অবস্থায়। স্পেনের যুদ্ধে এমন একটা কিছু ছিল যার আবেদনটা মানবিক। মাদ্রিদ-ধ্বংসের ফটো দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল আনে, নিজের অজান্তেই প্রশংসা করেছে 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'র বীরত্বের। ও তখন পিয়েরকে বলেছিল, 'আমার সংগ্রাম এটা নয় বটে, তবে এর মধ্যে কোথাও কোনো গলতি নেই।' আনের পক্ষে এই 'কোনো গলতি নেই' উক্তিটা একটা স্বীকৃতি নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন, যখন সব কিছুই ঘুলিয়ে গেছে—রাজনীতি আর ব্যক্তিগত আবেগ, শান্তি-প্রিয়তা আর ভীরুতা, 'ইণ্টারন্যাশনাল' আর জেনারেলদের মহড়া, সবই যখন মিশে গেছে পরস্পরের সঙ্গে, তখন আনে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নির্বাক থেকেছে। কাঁদতে কাঁদতে মায়েরা ইস্কুলে আসত: অশুভ দিনটা এগিয়ে আসছিল ক্রমশ। আর শেষ পর্যন্ত এই এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হল মিউনিক চুক্তির কথা। যুদ্ধ আর বাধবে না তাহলে!

'পিয়ের, ঠিক এই মুহূর্তে কত লোক আনন্দ করছে? জার্মানদের মধ্যেও। তোমার কি মনে হয় ওদের মন অন্য রকম? তোমার ওই রাজনীতি ভুলে যাও, অন্তত মিনিট খানেকের জন্যে!'

'তোমার যুক্তিটা আঁদ্রের মতো,' বলল পিয়ের।

'আঁদ্রের মতো কেন? লক্ষ লক্ষ লোকের মতো! তোমরা যাদের বল 'জনসাধারণ'। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তোমাদের সময় এসেছে...'

'কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আমি।'

'আগেকার দিনে মানুষ বাসা বাঁধত, কাজকর্ম করে যেত, আর ছেলেপুলে মানুষ করত। কিন্তু তোমরা, অর্থাৎ তোমার মত লোকরা, সেটা শুধুই সয়ে গেছ; কোনো রকমে সয়ে গেছ। তখনকার দিনে বড়ো বড়ো বই লেখা হয়েছে, নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, ওসুধের আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এখন সবাইকে তোমাদের মতো লোকের মুখ চেয়ে চলতে হয়। আমি মতামতের কথা বলছি না, বলছি চরিত্রের কথা। ইদানীং যেন সবই বিশেষ একটা কিছুর মুখ চেয়ে রয়েছে...আর সেটা কী সাংঘাতিক......'

তর্ক তুলবার চেষ্টা করল না পিয়ের। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে লাগল— আজ সকালের জীবনটা অতীতের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। আনের মনে কিন্তু দুশ্চিন্তা জেগেছে, সে বুঝেছে যে সমস্যার কোনই সমাধান হয়নি। যুদ্ধটা আপাতত মুলতুবী থাকল বটে, কিন্তু কতদিন টিঁকবে এই শান্তি? এক সপ্তাহ? এক বছর? জীবনকে বিন্দু বিন্দু করে দান করে কি ভাবে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়?

দুদুর কাছে উঠে গেল আনে। আরামে ঘুমোচ্ছে ও। আনে ভাবল, দুদু যেন অনেক দিন বাঁচে, অনেক অনেক দিন। ওর দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে আবার নতুন করে গজাবে। কেমন ধারা হবে ওর জীবনযাপন? একটা সামরিক সমাবেশ থেকে আর একটায়? ওকে চুমু খেতে ইচ্ছে হল আনের, কিন্তু সংযত করল নিজেকে। ইস্কুলের খাতাগুলো দেখতে বসল সে। নিঃশব্দতাটা পীড়াদায়ক; এর চেয়ে রেডিওর চিৎকার অনেক ভালো; রেডিওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক সপ্তাহের জন্যে? এক বছরের জন্যে? মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে খাতার পাতায় ছেলেমানুষি লেখাগুলোয় মন বসাতে বৃথাই চেষ্টা করল সে। দশ-বারোবার পড়ল: 'ফন্তেনেতে আমার কাকার কতকগুলো খরগোস আর একটা গরু আছে।' একটা কামনা জাগল তার মনে—গাছপালায় ছাওয়া গোয়ালঘর আর শান্ত অচঞ্চল জীবনের জন্যে—যে জীবনে তাড়াহুড়ো নেই, অপেক্ষা করা নেই, কোনো ভাবনা নেই।

গত কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনা, রাত্রি জেগে কাজ আর সভা করার ফলে পিয়ের অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। খবরের কাগজের পাশুটে পাতাটার ওপর এলিয়ে পড়েছে তার অকালে-পেকে-যাওয়া চুলে ভরা কালো মাথাটা। ওর নিয়মিত নিশ্বাস-পতনের শব্দ একটা শান্ত প্রভাব বিস্তার করল আনের মনে: এখন তবু জীবনটা খানিকটা মনের মতো হয়ে উঠছে। তারপর পেন্সিলটা ভেঙে যাওয়ায় উঠে পড়ল আনে, আর পিয়েরের মুখের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—কেমন যেন মড়ার মুখের মতো রক্তহীন, কঠিন দেখাচ্ছে পিয়েরের মুখ, যেন জমে শক্ত হয়ে গেছে। আনের চিৎকারে জেগে উঠে ঘুমভরা গলায় 'অ্যাঁ?' বলেই পিয়ের আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ষোল

সৈন্য-সমাবেশের হুকুম জারি হওয়ায় লুসিয়ঁ ভারি স্বস্তি পেয়েছিল; গ্রীষ্মকাল থেকেই ভয়ানক বিশ্রী রকম কাটছে তার দিন। যা ভয় করেছিল ঠিক তাই ঘটে গেছে। বাবার সঙ্গে তার ভিন্ন হয়ে যাবার গুজবটা জোলিওর কানে পৌঁচেছে; ভোঁতা-বুদ্ধি বেঁটেখাটো এই সম্পাদকটি লুসিয়ঁর উদ্ধত ব্যবহারের জন্যে তাকে অনেকদিন থেকেই অপছন্দ করত, ঘোড়দৌড়ের স্তম্ভটা জোলিও এখন তার ভাগ্নেকে নিয়ে দিল। লুসিয়ঁর অন্য কোনো রোজগারের উপায় জানা নেই। খিদে সয়ে থাকা, ময়লা জামা পরা আর বিনা-সিগারেটে সন্ধ্যা কাটানোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠল সে। নিয়মিত বিল শুধে উঠতে পারে না বলে হোটেলের কর্তা লুসিয়ঁর দিকে আড়চোখে তাকায়; নিজের টাকার অভাবটা তাকে জানতে না দেবার জন্যে লুসিয়ঁ খাওয়ার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। রাস্তার গরমে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। বারান্দায় বসে লোকে খাওয়া-দাওয়া করছে—দেখে দেখে ভারি বিরক্ত হয় লুসিয়ঁ। ওরা খাবারের তালিকাটা খুঁটিয়ে বিচার করছে কি খাবে তাই পছন্দ করার জন্যে, এটা-ওটা গন্ধ শুঁকছে, সোরগোল করছে, আর হাসছে। খাবারের গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে তার। তারপর হঠাৎ দেখা পেয়ে যায় কোনো বন্ধুবান্ধবের—কোনো সাহিত্যিক কিংবা মেজোঁ-দ্য-কুলতুরের কোন সভ্য, ব্রতেইর দলের কেউ কিংবা জুয়োর আড্ডায় পরিচিত কোনো লোক। লুসিয়ঁ চট্ করে একটা গল্প বানিয়ে ফেলে : বাড়িতে টাকার থলিটা ফেলে এসেছে, কিংবা ইজিপ্শিয়ান পাউন্ড বদ্‌লে নিতে বড়ো অসুবিধা ছিল আজ—বলেই জোর করে হাসতে হাসতে চেয়ে নেয় পাঁচশো ফ্রাঁ, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই উড়িয়ে দেয় টাকাটা।

একদিন মার কাছ থেকে এক চিঠি পেল সে : শরীর তাঁর আরো খারাপ হয়ে গেছে, অনুনয় করেছেন লুসিয়ঁ যেন তার বাবার সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলে। মুহূর্তের জন্যে মায়ের প্রতি গভীর করুণায় ভরে উঠল তার মন : মনে পড়ল ছেলেবেলায় হামজ্বরে ভোগার কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপরেও করুণা জাগল। হয়তো মায়ের কথা মত চললে শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে। না খেয়ে থাকা আর টাকা ধার করা তো যথেষ্ট হল! এমন কি, চিঠিখানার উত্তর দেবার জন্যে সে একটা কাগজ নিয়েও বসল, কিন্তু দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল কাগজটা। না, না! ওখানে অবশ্য পরিষ্কার বিছানা আর তিন পর্বের আহার পাওয়া যাবে কিন্তু সেটুকুর জন্যে নিজেকে ছোট করতে যাবে না সে। ব্রতেইকে বিশ্বাস করে ভুল করেছে সে, কিন্তু এই ভুলের মধ্যে কোনো অসাধুতা নেই। আর তার বাবার মন ভারি প্যাঁচালো আর বিবেকহীন। তাছাড়া ভারি একঘেঁয়ে ওখানকার জীবন—আবার গিয়ে সেই বক্তৃতা শোনা : 'কাজ করো, তাহলেই সব পাবে। এই আমি তো আর অমনিই মন্ত্রী হয়ে উঠিনি।'

লুসিয়ঁর মাঝে মাঝে মনে পড়ে মুশের কথা আর তাদের মিলনের সেই শেষ সন্ধ্যায় তার আবেগের কথা। স্বীকার না করলেও মুশ সম্বন্ধে একটা অনুশোচনার ভাব আছে তার

মনে, যদিও এসব মনোভাবকে সে 'আবেগের উচ্ছ্বাস' বলে উড়িয়ে দেয়। মুশ তাকে কয়েকবার চিঠি লিখেছে। তার ক্ষমা চেয়ে অনুনয় করেছে আর জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বলে জানিয়েছে। বেদনার সঙ্গে ভ্রূকুটি করে লুসিয়ঁ বেগুনী রঙের কাগজে লেখা সেই চিঠিগুলো ছোটো ছোট টুকরোয় ছিঁড়ে ফেলেছে। ইদানীং সে আর মুশের চিঠি খোলে না; কি লাভ পড়ে? মুশকে সাহায্য করবার নেই কিছু। নিজেই সে যথেষ্ট দুঃখী। সংসারে এতটুকু দরদ নেই: আরি মরে গেছে, জেনেৎ তাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর ব্রতেইকে একটা হীন ষড়যন্ত্রকারী বলে জানা গেছে।

ব্রতেইর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর লুসিয়ঁ রাজনীতির প্রতি একেবারে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে; এমন কি, খবরের কাগজের দিকেও সে আর তাকায় না। জগৎজোড়া ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো তার কাছে ক্লান্তিকর আর নোংরা বলে মনে হয়—তার বাবার কাগজের ফাইলগুলো, ব্রতেইর বাড়ি কিংবা জনৈক কিলমানের ঘাড়ের মতোই। রাস্তায় কিংবা কাফেতে হিটলার বা যুদ্ধের কথা শুনে হাই তোলে লুসিয়ঁ: স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তার বাবা ফুজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় লেগেছেন। তারপরে হঠাৎ একদিন ফৌজে যোগ দেবার জন্যে তার ডাক পড়ল। মনে পড়ল সালমাঙ্কার কথা, উদ্ব্যস্ত সৈন্যসমাবেশ আর যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে ফিরে ফ্যালাঞ্জিস্ট্‌দের মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতার কথা ভেবে খুশি হয়ে উঠল সে।

দিন দুয়েক বাদে অবশ্য মিউনিক চুক্তি ঘোষিত হল। নিজেকে বিদ্রূপ করল লুসিয়ঁ: আবার ওরা তাকে বোকা বানিয়েছে। পারীর ট্যাঙ্ক-চলা রাস্তায় রাস্তায় নিষ্প্রদীপ আর সৈন্যসমাবেশের মধ্যে সেও লক্ষ লক্ষ হাঁদারামের ভিড়ে জুটে গিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা এদিকে ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়েছেন চেম্বারে ভোট সংগ্রহের উপলক্ষ হিসেবে। অসুস্থ লোকের মতো ঘন ঘন হাই তুলল লুসিয়ঁ। এখন আবার তাকে বেরুতে হবে টাকা যোগাড়ের চেষ্টায়, বিল না শোধার জন্যে হোটেলওলাটা আবার গজ্ গজ্ করতে থাকবে, আর তার নিজের দাড়ি-গজিয়ে-ওঠা থমথমে মুখখানার ছায়া ফুটে উঠবে দোকানের জানলাগুলোয়।

কিন্তু ভাগ্য দয়া করল তার ওপর। মাদলেনের কাছে দেখা পেয়ে গেল তার ভূতপূর্ব প্রকাশক গতিএ-র। অন্য যে কোনো দিন গতিএ তাকে দ্রুত এড়িয়ে যেত, কিন্তু আজ গতিএ ভারি খোশমেজাজে আছে। সেদিন সকালেই সে মরতে চলেছে ভেবে তিন বছরের মেয়ের দোলনার কাছে গিয়ে কাঁদছিল; তারপর অতি অকস্মাৎ 'লা ভোয়া নুভেল্'এর বিশেষ সংস্করণটা যেন তাকে তার হৃত জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। গতিএ যে কেবল লুসিয়ঁকেই চুমু খেতে প্রস্তুত আছে তাই নয়—পারলে সে যেন খবরের কাগজওলাকে আর পুলিশটাকেও চুমু খায়। লুসিয়ঁর শুকনো দাড়ি-গজানো মুখ আর ময়লা পোশাক দেখে সে ধরেই নিল যে এই ক-দিনের অস্বাভাবিক অবস্থায় জের ওটা।

'আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না', চেঁচিয়ে উঠল গতিএ, 'বুঝতে পারছ, ভাগ্যটা কত ভাল? গতকাল আমার কোলমার-এ যাবার কথা ছিল, গোলন্দাজ বাহিনীর সার্জেন্ট হয়েছিলাম কিনা! আর এখন...' দম নেবার জন্যে থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খবর কি?'

'আমার? পদাতিক বাহিনী। দ্বিতীয় দফার হাবিলদার।'

'বলো কি হে! খুশি হওনি তুমি? হাঁদা কোথাকার!

'সত্যি বলতে কি, আমার কাছে ও সবই সমান।'

'উচ্‌কপালে! না, দাঁড়াও বলছি, স্নায়বিক ব্যাধিতে ভুগছ তুমি।'

ল্যুসিয়ঁর মনে পড়ল, টাকা চাই! রহস্যজনকভাবে সে হেসে বলল ঃ

'তাছাড়া ভারি বিশ্রী একটা অবস্থায় পড়েছি আমি। একজন অভিনেত্রীকে নিয়ে ক্লভিল্‌-এ গিয়েছিলাম, এমন সময়ে এই সব হৈ চৈ শুরু হল। আমি যেভাবেই হোক জানতাম, যুদ্ধ টুদ্ধ হবে না। কিন্তু আচমকা এই সামরিক ব্যবস্থা জারি হল, আর আমিও মেয়েটিকে ওখানেই রেখে আসতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এখন আবার ক্লভিল্‌ গিয়ে ওকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা আমায় ছুটি দিয়েছে, কিন্তু ভারি গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে গেছি। ব্যাঙ্কগুলো সব বন্ধ। কাল পর্যন্ত ফেলে রাখতে চাই না কাজটা। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব, যদি তুমি আমায় সাহায্য করো, কিন্তু তোমার অসুবিধা হলে...'

'না, না, মোটেই না!...'

থলিটা খুলে হাজার ফ্রাঁর একটা নোট বের করে দিল গতিএ। হাসল ল্যুসিয়ঁ ঃ গতিএ কী ভয়ানক কৃপণ তা সে জানে। বই বিক্রির টাকা থেকে তার প্রাপ্য অতি কষ্টে আদায় করতে হত তাকে। আর এখন কিনা হাজার ফ্রাঁ দিচ্ছে সে—ল্যুসিয়ঁ বড় জোর দুশো আশা করেছিল। গতিএ চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়াও! তোমাকে অমনি ছেড়ে দিচ্ছি না আমি। তোমার ট্রেন কখন? অনেক সময় আছে।'

একটা মদের দোকানে গিয়ে তারা দুজনে গেলাশ দুয়েক মদ খেল। খুশিভরা একটা তৃপ্তির ভাব জাগল ল্যুসিয়ঁর মনে। গতিএ-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সি চেপে এল মঁপারনাস্‌-এ। বিরাট একটা রেস্তোরাঁর তেতলায় উঠে এল। একটা আরশিয় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবল : আজকালকার দিনে দাড়ি-না-কামানো চেহারা আর নোংরা পোশাক তো হতেই পারে যে কোনো লোকের, কিন্তু রূপ কখনো ম্লান হয় না; কোট-টুপি জিম্মা রাখার ঘরের এই পরিচারিকাটি নিশ্চয়ই তাকে মনে মনে তারিফ করছে।

ফলাও আহারের হুকুম দিল—নিজের গল্প বানাবার কুশলতায় আর খামখেয়ালি স্বভাবে ভারি আনন্দ পায় ল্যুসিয়ঁ। আসলে তার ভয়ানক খিদে পেয়েছে, টেবিলের ওপর রাখা রুটিটা এক গ্রাসে শেষ করে দেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা না করে অত্যন্ত আয়েসী ঢঙে হোটেলের ওয়েটারটাকে বলল, 'এটার পরে, মুরগির কোর্মা এনো দয়া করে, অবশ্য যদি ধানী মুরগী হয়...'। চারদিকেই লোকে উৎসব করছে। সামরিক বয়সের লোক যারা, তাদের কেন্দ্র করেই আসর জমেছে; ক্লান্ত বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওদের, যেন এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছে। কেউ কেউ সামরিক উর্দি পরা, প্রায় সকলের দাড়ি-না-কামানো মুখ; ওরা ইচ্ছে করে স্থূল ভাষায় কথা কইছে আর কথায় কথায় দিব্যি দিচ্ছে। মেয়েরা ওদের ঘিরে অনর্গল কথা বলছে—কেউ বা ধর্ম-মা কেউ বা ধর্ম-বোন, আর না হয় বীরের আশায় বহু-প্রতীক্ষিতা বিশ্বস্ত প্রণয়িনী। মোটা কাগজের ঠুলি পরানো বাতিদানের মৃদু আলোর রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে সব কিছুতে। ট্যাঙ্গো-নাচের চটুল সুরে গাওয়া হচ্ছে স্বর্গ, পুনরধিকারের কাহিনী। শ্যাম্পেন-বোতলের ছিপি খোলার শব্দ উঠছে, মদের গেলাশে গেলাশ ঠেকানোর টুং টাং আওয়াজ করে উৎসব-মুখর নরনারীর দল পরস্পরের শুভকামনা করছে 'শান্তির উদ্দেশে!' কে একজন কয়েক বোতল মদ শেষ করার পর জোলিওর উদ্দীপ্ত বাণী স্মরণ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'বিজয়ের উদ্দেশে!'

এক বোতল শাবেরতাঁ-মদ খাওয়ার পর ল্যুসিয়ঁর-মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল।

আর সে কিলমান বা হোটেলওলা বা নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বের কথা ভাবছে না। আবার সে যেন হয়ে উঠেছে বিখ্যাত লেখক, স্যুর্‌রিয়ালিস্টদের বন্ধু, শৌখিন ব্যবহারজীবীর ছেলে, সুন্দরী এক অভিনেত্রীর প্রণয়ী; আবার সে যেন বেঁচে উঠেছে।

আরও অনেকের মতোই লুসিয়ঁ দিনের ঘটনা আর রাতের পানোন্মত্ততার ফলে সময়ের অভিজ্ঞান থেকে মুক্তি পেল। আশেপাশের লোকজন সবাই আজকের এই সন্ধ্যাটির অসাধারণত্ব আর গতানুগতিক কর্মমুখর দিনগুলির থেকে এর বিভিন্নতাটুকু বুঝে নিয়েছে। গ্যিইও যখন তার কাছে এসে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকাল আর আমার ছবির দোকানে আসো না কেন? একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি হে ছোকরা, খাঁটি মুক্তো!' তখন লুসিয়ঁ মোটেই বিস্মিত হল না। একটা ছবির দোকানের মালিক এই গ্যিইও, লুসিয়ঁর সঙ্গে তার তিন বছর দেখা হয়নি।

গ্যিইওর অবস্থা টলটলায়মান; গোল, লাল মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; বুকে গোঁজা একটা শাদা মোমের পাঁপড়ি-ভাঙা ক্যামেলিয়া; লুসিয়ঁকে সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজের টেবিলে। লুসিয়ঁরও ওর সঙ্গে গিয়ে বসার আগ্রহ হয়েছে—ওর টেবিলে একটা মেয়েকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তন্বী মেয়েটির গাঢ় গায়ের রঙ, নিটোল মাথা, অল্প ভোঁতা নাক, অর্ধস্ফুট পুষ্ট ঠোঁট আর চীনেমাটির মত সবুজ চোখ। হেঁচকি টেনে টেনে গ্যিইও বলল, 'জুটে পড় আমাদের সঙ্গে। এই যে সেই মুক্তোটি স্বয়ং—জেনী, একজন শিল্পী। আর এ হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিক—লুসিয়ঁ তেসা। ওর বাবার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

হেসে ফেটে পড়ল লুসিয়ঁ, 'কি বক্‌বক্ করছ? মোটেই সাহিত্যিক নই আমি। আমি হচ্ছি ঘোড়ার বংশাবলী ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।'

জেনী তাকাল লুসিয়ঁর দিকে, চোখের দৃষ্টি তার আবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনার বই পড়েছি আমি, ওই যেটা মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায় ছিলাম আমি, বোগদাদের সেই পারসীক মালীটি যেমন ছিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।'

মেয়েটির কথায় ইংরেজী উচ্চারণের ঢঙে কেমন একটা ছেলেমানুষী ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। লুসিয়ঁ মনে মনে ভাবল, 'দু-এক গেলাশ টেনেছে, কিন্তু কী রূপসী!' ওদের সঙ্গে বসে এক গেলাশ শ্যাম্পেন খেল লুসিয়ঁ, তারপর বলল:

'আমিও আপনার অপেক্ষায় ছিলাম, তবে আরও গদ্যের ভাষায় বলি, আমার আগ্রহটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যেই। আচ্ছা, পরিচয় তো হল, এবার একটু পান করা যাক।'

'আচ্ছা, তবে আমি শুধু হুইস্কি খাই।'

আমেরিকার কেন্‌টাকি প্রদেশের এক সব চেয়ে প্রাণহীন শহরে জেনী জন্মেছে আর বড়ো হয়ে উঠেছে। তার মেথডিস্ট্ বাবা ছিলেন কেরাসিন কাঠের ব্যবসাদার। ছেলেবেলা থেকেই জেনী ভয়ানক কল্পনাপ্রবণ: শেলী আর কীট্‌সের কবিতা উৎসাহের সঙ্গে পড়েছে, আর রোমান ক্যাথলিক হতে চেয়েছে; নিগ্রোদের দুঃখকষ্ট নিয়ে কতকগুলো গল্প লিখেছিল; আর একবার ইউরোপ-প্রত্যাগত প্রেসিডেন্ট উইলসনকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে পালিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে। তখন তার বয়স ষোল বছর। আঠারো বছর বয়সে এক ভবঘুরে আলোক-চিত্রশিল্পীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়—সে জেনীকে হলিউডে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়, কিন্তু

তাই বলে জেনীর হলিউডে আসা আটকায়নি; সিনেমা-তারকা হতে চেয়েছিল সে। ওখানে এসে তার দারিদ্র্য আর অপমানের সংগে পরিচয় হল। স্টুডিও কর্তৃপক্ষ আর সহকারী পরিচালকরা অত্যন্ত ব্যবসাদারী ভংগিতে বলত, 'একদিন একসংগে নৈশ-ভোজন করা যাক, তারপর না হয়...' জেনী অত্যন্ত ঘৃণার সংগে এই সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপর সে ছবি আঁকা ধরল। খালি পেটে থেকে দৃশ্যচিত্র আঁকত—লালচে পিংগল মাটির বুকে ফণিমনসার ঝাড় আর বহুবর্ণের বাড়িঘর। ছবি আঁকার ব্যাপারে জেনীর কৃতিত্ব আছে কিন্তু রুচির বালাই নেই; আসলে প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু স্থূল আর উচ্চকিত, তাই তার ভাল লাগে। হঠাৎ তার ভাগ্য খুলে গেল : লস্ এঞ্জেলস্-এর এক বিমান-কারখানার ইঞ্জিনীয়ার তার প্রেমে পড়ল, জেনীরও তাকে পছন্দ হল, ফলে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। দারিদ্র্য থেকে ঐশ্বর্যের মধ্যে এসে পড়ল জেনী। পারিবারিক জীবনে এই ইঞ্জিনীয়ারটি একটু ভোঁতা স্বভাবের হলেও তার ব্যবহার ছিল দরদ-মেশানো আর ভদ্র। জেনী মনে মনে ভাবত, 'খাঁটি প্রেম যে এই রকম, তা তো জানলাম না।' দু বছর বাদে একটা বিমান-দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা গেল। দু শিশি সেঁকো-বিষ খেয়ে ফেলল জেনী; ডাক্তাররা বাঁচিয়ে তুলল তাকে। একটা বিলে ঝাঁপ দিল; পাঁচজনে ধরে জল থেকে তুলে ফেলল তাকে। কয়েক মাস একটা অন্ধকার ঘরে প্রায় সমস্তক্ষণ বসে রইল। তারপর আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠল—জানতে পারল স্বামী তার জন্যে প্রচুর টাকা রেখে গেছে। ইউরোপ-যাত্রার জাহাজে চাপল আর দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াল যাদুঘরে আর নৈশ-ক্লাবে। অনেক বেপরোয়া রোমাঞ্চ-সন্ধানীর সংগে জেনীর প্রণয়ব্যাপার ঘটেছে—'খাঁটি প্রেম' কি রকম তা জানবার ভারি আগ্রহ তার। বিভিন্ন শিল্প-বিদ্যালয়ে সে স্কুলের মেয়ের মতোই নিয়মিত যাতায়াত করেছে। তারপর স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে পারীর এই মঁপারনাস্ অঞ্চলে, যেখানে বদমেজাজী মার্কিনরা এসে হুইস্কি খায় আর ইউরোপ-আমেরিকার প্রাচীন আর নয়া জগৎ নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। জেনীও মদ খেতে খেতে এই সব হাসিঠাট্টায় যোগ দেয়।

লুসিয়ঁর চেয়ে সে এক বছরের বড়, কিন্তু লুসিয়ঁকে ধরে নিল নেহাৎ ছোট ছেলে বলে। আর একবার জিতল লুসিয়ঁ : তার উজ্জ্বল চোখ, বাদামী চুল আর কথাবার্তার মধ্যে বিষণ্ণ দুঃখবাদ জেনীকে এত আকৃষ্ট করল যে সে গ্যিইওর বকবকানিতে কান না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল লুসিয়ঁর দিকে। এমন কি জেনী নাচতেও চাইল না। বড় প্রগাঢ় অনুভূতি এটা; লুসিয়ঁও সাড়া দিল—ভাবল প্রেমে পড়ে গেছে সে।

ছুরি দিয়ে গেলাশটা ঠুকতে ঠুকতে গ্যিইও বলল, 'আমি একটা 'স্বাস্থ্যপানের' প্রস্তাব করছি। লুসিয়ঁ পদাতিক বাহিনীতে, আমি বিমান বিধ্বংসী বাহিনীতে, শার্ল বৈমানিক, দুমঁ ওই পদাতিক বাহিনীতেই একজন ক্যাপ্‌টেন। আমরা এই কজনেই হয়ত আজ থেকে একমাস বাদে আলসাস্-এর মাঠে সার বনে যেতাম। কিন্তু বেঁচে আছি আমরা, বেঁচেই থাকব। এটা আমাদের একটা সত্যিকারের জয়লাভ—আমাদের রাষ্ট্রনীতিক আর লেখকদের জয়, পল ভালেরী আর দের্যার জয়, আঙুর ক্ষেতের চাষীদের, দর্জিদের আর দারোয়ান-চাপরাসীদের জয়। আমি অনুরোধ করছি, দারোয়ান-চাপরাসীদের অবজ্ঞা কোরো না—ওরাও প্রত্যেকে শান্তির স্বর্গদূত। আমি প্রস্তাব করছি, ফ্রান্সের এই যে সুন্দরতম বিজয়, এরই উদ্দেশে আমরা পান করি এসো।'

জেনী হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর লুসিয়ঁকে বলল, 'আমার ভালেরীর কবিতা

ভাল লাগে না। এলুয়ারকে বেশি পছন্দ করি আমি। আপনি? গ্যিইওর কথাগুলো শোনাল ঠিক উইলসনের মত, কিন্তু তখন ফরাসীরা ছিল উইলসনের বিরুদ্ধে। 'রাগ করবেন না। আমি রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু এত আনন্দ হচ্ছে আমার। ভাবতেও ভয়ানক মনে হয়, ওরা আপনাকে মেরে ফেলতে পারত!......'

হেসে উঠল লুসিয়ঁ।

'তার চেয়েও সহজ মনে হয়, আমাদের দেখা না হতেও পারত।' গ্যিইও চেঁচিয়ে ডাকল, 'বিল আনো!' টাকাটা লুসিয়ঁই দেবে বলে পীড়াপীড়ি করল; বুড়ো ওয়েটারকে একশো ফ্রাঁ বকশিশ ছুঁড়ে দিল। বুড়োটা হেসে বলল, 'ধন্যবাদ, মেজর মশাই।'

'ভুল হল। দ্বিতীয় দফার হাবিলদার মশাই।'

জেনীকে সে নিচু গলায় বলল, 'শেষবারের মত একবার পান করা যাক আপনার উদ্দেশে। সেই পারসীক মালীটি ভয়ে পালিয়ে আসে বোগদাদে। সেখানে এক পরমা সুন্দরীর সঙ্গে তার দেখা হয়। ওরকম কাউকে সে এর আগে দেখেনি......তারপর মৃত্যুকে সে হাঁকিয়ে দেয়।'

জেনী লুসিয়ঁর হাতটা চেপে ধরল।

বেরিয়ে এসে পাসি পর্যন্ত গাড়ি চেপে এল ওরা দুজনে। নিস্তব্ধ এক রাস্তার ওপর জেনীর বাড়ি। বাড়ির পাশে মস্ত এক গাছের পাতাগুলো রাস্তার আলোয় অস্পষ্ট-ভাবে কাঁপছে। জেনী বিদায় নিতে চেয়েছিল, কিন্তু লুসিয়ঁ চলে এল হলঘরটার ভেতর। অস্বস্তি বোধ করল জেনী, ছেলেমানুষের মত অনুনয় জানাল, 'না, না,......'

জেনীর মনে হল, এই হচ্ছে খাঁটি প্রেম। এক মুহূর্তেই সমস্ত সুযোগ হারিয়ে বসবে ভয় হল। ওভারকোটটা না খুলেই লুসিয়ঁ একটা নিচু আরামকেদারায় বসে পড়ে চোখ বুজল। তার মুখে শ্রান্তি আর ক্লান্তির ভাব ফুটে উঠেছে। হঠাৎ শান্ত হয়ে উঠল জেনী:

'একটু কফি তৈরি করি, কেমন?'

কফি তৈরি করার যন্ত্রটা নিয়ে এসে কাঁচের গোল ঠুলির নিচে নীল আগুনের শিখা জ্বালিয়ে নিল। চোখ দুটো অল্প খুলে লুসিয়ঁ বলল:

'অ্যালকেমী···...'

আর কোনো চাঞ্চল্য নেই তার মনে। কিছুই যেন চাইবার নেই; কড়া, মিষ্টি কফির আস্বাদটা তার কাছে চরম সুখ বলে মনে হল। অনর্গল কথা বলে চলেছে জেনী। চুপ করে থাকা সম্পর্কে তার একটা প্রবৃত্তিগত ভয় আছে। যদিও তার জীবনে প্রেমের ব্যাপার বড়ো কম ঘটেনি, তবু তার ব্যবহারটা হয়ে উঠল অনভিজ্ঞ বালিকার মত।

'হলদে গোলাপ ভীষণ ভালবাসি আমি, সোনালী নয়, হলদে গোলাপ। মঁপারনাসে বর্মার দোকানে এক গাদা হলদে গোলাপ আছে। আশ্চর্য গন্ধ। যদি সত্যিই তুমি আমাকে খুশি করতে চাও তাহলে কিছু ওই গোলাপ এনে দিও...··' 'পারব কিনা সন্দেহ।' আরাম-কেদারা থেকে বলে উঠল লুসিয়ঁ, 'সুড়ঙ্গ ট্রেনে ফিরবার ভাড়াটা পর্যন্ত আমার নেই......'

নিজের দারিদ্র্যের জন্যে লুসিয়ঁ লজ্জিত। আর এখন নিজের এই স্বীকারোক্তিতে নিজেই অবাক হয়ে গেল। এখানে আসার উদ্দেশ্যটা ভালো করে জেনে শুনেই সে এসেছে। তারপর যেন সব কিছু গুলিয়ে গেছে—কফি, জেনীর বসার সম্মত ভঙ্গি,

শিল্প-প্রসঙ্গে আলোচনা, গ্রীস আর ফুল। তা ছাড়া, অত্যধিক মদ খাওয়ার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। তার গলার স্বর বহু দূরে থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হয়। জেনী ভাবল, ঠাট্টা করছে লুসিয়ঁ : তাদের রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সমস্ত খরচ তো সে-ই দিয়েছে। হেসে জেনী বলল, 'এই রে! বেশি ফুর্তি লোটার এই ফল।'

চোখ মেলে তাকাল লুসিয়ঁ; জেনীর এই কৌতুকের বকুনিতে বিরক্ত হল সে। 'গতিএ নামে একজন লোকের টাকায় ওই ফুর্তিটুকু লুটেছি। এমন সুযোগ কদাচিৎ মেলে। সাধারণত অল্প স্বল্প টাকা ধার করে চালাই আমি—গোলাপ ফুল কেনার জন্যে নয়, শাক-রুটির জন্যে। ও তুমি বুঝবে না। ধনী মার্কিন তুমি। আমি একজন অতি সাধারণ বেকার। আমাদের শ্রেণী আলাদা।'

জেনীর প্রতি এমন কি একটা ঘৃণাও বোধ করল লুসিয়ঁ—ধনী ব্যক্তিকে দুস্থ লোকে যেমন ঘৃণা করে। জেনীর দিকে তাকাল না; বুঝতে পারল না যে ও কাঁদছে।

দারিদ্র্য কি তা জেনী ভালো করেই জানে, হলিউডের সেই দু বছর সে ভোলেনি—যখন খিদেয় মূর্ছা যাবার মত অবস্থাতেও সে বন্ধুবান্ধবদের বলত যে-মোটা হবার ভয়ে সে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে এক তাড়া নোট নিয়ে ফিরে এসে টাকাটা লুসিয়ঁর পকেটে গুঁজে দেবার চেষ্টা করতে লাগল :

'দয়া করে নাও এগুলো। আমি অনুনয় করছি।'

একটা কুৎসিত ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে গেল লুসিয়ঁর মুখ; দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল নোটগুলো টেবিলের ওপর।

'এই জন্যে আসিনি আমি,' বলল সে।

ব্যথা লাগতে পারে এমনভাবে সে আঁকড়ে ধরল জেনীর কাঁধ। কোনো বাসনা বা কামনা অনুভব করল না লুসিয়ঁ; নিজের উদ্দেশ্যের সাধুতাটুকু সে প্রমাণ করতে চায়। জেনী ভাবল, ধনবতী হবার জন্যে লুসিয়ঁ ক্ষমা করেছে তাকে, ভালবেসেছে ও; আর ও দেরি সইতে চাচ্ছে না, পারছেও না...তারপর সে লুসিয়ঁকে আত্মদান করল বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুশোচনায়; অতল সাগরের প্রবাল-পাথারে ঝাঁপ দিল জেনী।

জেনী পরিশ্রান্ত একটা সুখানুভূতির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। লুসিয়ঁর চোখে ঘুম এল না। তার গত ক-মাসের জীবন সে মনে মনে পর্যালোচনা করে চলল : কি করবার আছে তার? জোচ্চুরি করাই যাদের কাজ এই রকম কোনো তুচ্ছ সংবাদপত্রে কাজ করবে? বাবার কাছে ফিরে গিয়ে নতি স্বীকার করবে? কারও যথাসর্বস্ব লুট করবে? জেনীর দিকে চোখ পড়তেই বেশ একটু বিস্মিত হল; ওর কথা প্রায় ভুলে বসেছিল সে। লুসিয়ঁ খুঁতখুঁতের মত মুখ বিকৃত করল। পাশবিক পরিতৃপ্তির একটা উষ্ণ ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে ওর গা থেকে। প্রথমটায় ভালেরী, শিল্পকলা আর হলদে গোলাপ সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবীসুলভ কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কাছে ঘেঁষতে না দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু এই ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনা কত ঘটে গেছে ওর জীবনে? ওকে জাগিয়ে তুলে গালাগাল দিতে আর মারতে ইচ্ছে হল লুসিয়ঁর। কিন্তু একটুও না নড়ে শুয়ে রইল নিজের জায়গায়। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল, লুইস্যাজের সময়কার অনুকরণে আসবাব, ওয়াত্তো-র আঁকা একটা ছবির পুনর্মুদ্রণ, লিলি ফুলে ভরা একটা পাত্র। আসবাব-পত্রে-সাজানো বাড়ি ভাড়া নিয়েছে জেনী; সমস্ত জিনিসই অন্যের; লুসিয়ঁর কাছে এগুলো ওর মধ্যবিত্ত পরিবেশের প্রতীক। আর একবার সে তাকাল জেনীর দিকে। সকালবেলার তীক্ষ্ণ আলোয় বয়সের চিহ্ন ধরা

পড়ল জেনীর মুখে; ওর গায়ের চামড়াটা অত্যধিক কোমল, জীর্ণ হয়ে আসা ফুলের মত ভাঁজ বসে যায় তাতে। একটা হাই তুলে লুসিয়্‌ এ পর্যন্ত যত মেয়েকে ভালবেসেছে তার একটা সংখ্যা গুনতে লাগল। কুড়িটা পর্যন্ত গুনে সব ঘুলিয়ে ফেলল—দুটো মার্গো ছিল। দ্বিতীয়টাকে ধরেনি, না কি ধরেছে? রুপোলী চুল ছিল তার—চুলের রঙটা ওইভাবে কলপ করে নিয়েছিল বললেই ঠিক হয়—জনৈক সংগীত-শিক্ষকের মেয়ে। নিজের চিন্তায় ছেদ টানল সে : কী অসহ্য নীচতা এসব! অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে নিঃশব্দে পোশাক পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় জেনী জেগে উঠল; তখনো হাসছে জেনী, স্বপ্নময় হয়ে আছে তার মুখ চোখ। তারপর লুসিয়্‌কে দেখতে পেল সে।

'পোশাক পরেছো কেন?' কাঁপা গলায় শুধোল জেনী।

'যাবার সময় হয়েছে।'

'লুসিয়্‌.........'

কৃত্রিম ভঙ্গিতে হেসে উঠল লুসিয়্‌ :

'গ্যিইও মদ খেয়েছে বিজয়ের উদ্দেশ্যে। আসলে জিত হয়েছে জার্মানদের। একথা শিশুরাও বোঝে। কিন্তু মদ খেতে গেলে মিথ্যে বলতেই হয়। এখন তো আর আমরা মদ খাচ্ছি না। কাল তুমি ছিলে বড়ো সুন্দরী, তাই না? কিন্তু এখন দেখছি মার্কিন দেশের খুড়ীমা তুমি, মোটেই খুকিটি নও, আমিও পারসীক মালী নই, আমি হচ্ছি 'হুলো বেড়াল'। 'হুলো বেড়াল' কাকে বলে জানো না বোধ হয়? পল ভালেরীর ভাষায় ও কথাটার মানে—'গণিকার অন্নদাস'।'

কিছুই বুঝল না জেনী; কান্নায় ভেঙে পড়ে লুসিয়্‌র পা দুটো চেপে ধরল।

'আজ বিকেলে আবার আসতেই হবে তোমায়! কথা দাও!'

লুসিয়্‌র মধ্যে কিছু যেন একটা লোপ পেল—ভেঙে পড়ল তার শেষ অভিমান, নিঃশেষ হয়ে গেল তার আত্মিক পবিত্রতার অবশিষ্টাংশটুকু। টেবিলের ওপর দুমড়ানো নোটের তাড়াটার দিকে তাকালো একবার : হালকা গোলাপী রঙের হাজার ফ্রাঁর নোট। অন্তত দশ হাজার ফ্রাঁ আছে ওতে। টাকাটা পকেটে পুরে নির্বিকারভাবে বলল :

'আচ্ছা, আসব। আজ আসতে পারব না হয়তো; কাল কিংবা পরশু।'

সকালটা আশ্চর্য সুন্দর, পরিষ্কার আর উজ্জ্বল। লুক্সেমবুর্গ বীথি পর্যন্ত হেঁটে এল লুসিয়্‌। তাকিয়ে দেখল গাছের পাতাগুলোর রঙ—তামাটে, সোনালী আর লাল, কোন ধ্বংসপুরীর যেন ইতস্তত ছড়ানো ঐশ্বর্য। বাগানের ভেতরটা সেই চিরাচরিত জীবনের চিহ্ন। এত সকালেও মায়েরা আর ধাত্রীরা ঠেলে নিয়ে এসেছে তাদের দোলনা-গাড়িগুলো; বিবর্ণ বাদামী বালুকাস্তুপের ওপর শিশুরা খেলে বেড়াচ্ছে; ছেলেরা নৌকা ভাসাচ্ছে পুকুরে। বুড়ো আমানত-মালিক আর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা রোদ পোয়াতে পোয়াতে খবরের কাগজ পড়ছে। চড়ুই পাখি লাফালাফি করছে ঘাসে ঘাসে। ওপরের দিকে তাকিয়ে ভেরলেন-এর মাথাটা দেখতে পেল লুসিয়্‌ : কবিকে দেখে মনে হয় যেন কোন বুড়ো রাখাল; কালো কালো ছাপ পড়েছে পাথরের গায়—ভেরলেন কাঁদছিলেন। আপনার থেকেই কবিতার এক পংক্তি আবৃত্তি করল লুসিয়্‌ : 'শান্ত সহজ জীবনখানি...।' এ হেন জীবন কেন সম্ভব হল না তার পক্ষে? শান্ত আর সহজ জীবন —কাজকর্ম করো, সাদাসিধে খাও, ছেলেপুলে আদর কর আর এই বাগানে বেড়াও।

আশেপাশের লোকজন বলাবলি করছে, 'চেম্বারলেন বিশ বছরের মত শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

'আরে বাপু, আমি বিশ বছরের স্বপ্ন দেখতে চাই না। যদি মোটে দশ বছরও হয়......'

যে বলছিল তার দিকে চেয়ে দেখল লুসিয়ঃ অন্তত সত্তর বছর বয়স লোকটার। দশ বছরের মত শান্তি চায় ও কিসের জন্যে? বিড় বিড় করে বলল সে ঃ 'কক্ষনো না!' বুড়োটা বিরক্ত হয়ে চোখ পিটপিট করে তাকাতেই লুসিয় দাঁড়িয়ে উঠে হাই তুলল। কি করবার আছে তার? তারপর হঠাৎ মনে পড়ল টাকার কথাটা। রাত্রিটাকে কি রকম অবাস্তব বলে মনে হল। সন্দেহ জাগায় একবার হাতড়ে নিল পকেটটাঃ মচ্‌মচ্‌ শব্দ করে উঠল নোটগুলো...। তারপর এক মোটরে চেপে এল রু পিরামিদ্‌-এ এক ইংরেজ দর্জির দোকানে; স্কট্‌ল্যান্ডে তৈরি সবুজ রঙের টুইড কাপড়ের একপ্রস্থ পোশাক বানিয়ে নিতে চায় সে।

সতেরো

অনেকদিন বাদে দেনিস মিশোর কাছ থেকে চিঠি পেল।

'প্রিয় দেনিস!'

এখান থেকে দুবার চিঠি দিয়েছি তোমায়, কিন্তু চিঠিগুলো তোমার হাতে পৌঁছয়নি বলে মনে হচ্ছে—একবার ওরা ডাকের গাড়িটা পুড়িয়ে দেয়, অন্য চিঠিখানা এক ঘর-ফেরতা সার্ব কমরেডের মারফৎ পাঠিয়েছিলাম। শোনা গেল, কমরেডটি সেরবের-এ ধরা পড়েছে। আমরা এদিকে বেশ একটু ব্যতিব্যস্ত আছি। চিঠি লেখার একটুও ফুরসৎ নেই! আপাতত ফ্রন্ট থেকে দশ মাইল দূরে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি। আজ সকালে খানিকটা জল এনে দিল এরা। দিব্যি স্নান করে নেওয়া গেল, আর খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে নেওয়া যাচ্ছে আর কি। শুধু তামাকের অভাবে ভারি অসুবিধে হয়, মাঝে মাঝে রাত্রিতে ধূমপানের তৃষ্ণায় মাথা খারাপ হয়ে যায় আমাদের। যা পারো পাঠিও। সবই আমাদের লোকদের জন্যেই।

কাল আমরা আর একবার ফ্যাশিস্টদের আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়েছি—এই নিয়ে আমরা আটবার রুখলাম ওদের। আমাদের এব্রো-নদী পেরিয়ে আসবার পর থেকে ওরা আর থামেনি। নিজেদের ফৌজের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্যে ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কি করে আমরা নদীটা পার হলাম, সে গল্প একদিন শোনাব তোমায়। অত্যন্ত খরস্রোতা এই নদীটা, জলের বুকে ঘূর্ণি লেগেই আছে। দেশে এমন নদী দেখিনি আমি। সারারাত্রি মার্চ করে এসেছি। এই স্পেনীয়রা ভারি সাহসী. এখানে পৌঁছে এদের মধ্যে সব কিছুরই অভাব দেখেছিলাম। খেতে যাবার সময় সবাই নিজের নিজের মহড়া ছেড়ে চলে যেত। বিশৃংখলা হয়ে উঠেছিল অবর্ণনীয়। চারদিকেই বিশ্বাসঘাতকের দল। এখন এটা সত্যিকারের ফৌজ হয়ে উঠেছে। আর, মনের জোর কমেনি এতটুকু। ফ্লিস্‌ অধিকার করে নিয়ে আমরা 'ইণ্টারন্যাশনাল' গান জুড়ে দিলাম। স্প্যানিশ ছেলেরাও তাদের

নিজেদের ভাষায় গাইতে গাইতে বাঁ দিকে চালাল আক্রমণটা। এরা সবাই অল্পবয়সী চাষীর ছেলে।

আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে ফ্যাশিস্টরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। ওদের বৈমানিকরা সব জার্মান। এব্রোর সমস্ত মাছ মেরে ফেলেছে ওরা। চারদিকে বোমা পড়েছে, তারই মধ্যে নৌকোর সাঁকোটা তৈরি করে নেওয়া হল। আমরা ৫৪৪ নম্বর মোহড়াটা রুখেছি সাত সপ্তাহ ধরে। ওদের বোমারু হাওয়াই-জাহাজগুলো মাথার ওপর সারাদিন ধরে উড়ছে। আমরা ওগুলোকে বলি, 'রামপাখি'। টন-টন বোমা ফেলেছে ওরা। তাছাড়া আছে গোলন্দাজ ফৌজ। কাল ওরা সিদ্ধান্ত করেছিল—আমাদের আর কেউ বেঁচে নেই, আসলে কিন্তু আমাদের মোটে চারজন মারা গেছে। কারপিনোর জন্যে বড় দুঃখ হয়। তুলুজ থেকে এসেছিল ও, চমৎকার ছেলে, ভারি হাসিখুশি। একদিন আমরা স্পেনীয়দের জন্যে একটু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেছিলাম, কারপিনোকে প্রধানা-নর্তকী সেজে 'লাকমে'র সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকতে দেখে সবাই তো হেসে গড়াগড়ি। ভারি সাহসী ছিল ছেলেটি। শত্রু-পরিখার পেছনে এক অভিযানে গিয়ে তিনটে ইতালীয়ানকে ধরে এনেছিল।

বিকেলের দিকে আক্রমণ চালাল ফ্যাশিস্টরা। সূর্য ডুবছে ততোক্ষণে! অদ্ভুত এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য—চাঁদের মরা পাহাড়ের ছবির মত দেখতে। গাছপালা চোখে পড়ে না একটুও, পৃথিবীটাকে যেন ভেতর দিক থেকে বাইরে টেনে উলটে নেওয়া হয়েছে। হামলা শুরু করবার আগে ওরা দু ঘন্টা ধরে গোলা ছোঁড়ে। ওদের কতগুলো কামান-বাহিনী আছে জানতে পারলে বেশ হত! আমরা ওদের প্রায় একশো গজ এগিয়ে আসতে দিলাম, তারপর মেশিন-গান ছুটিয়ে দিলাম ওদের ওপর। উলটো মুখে পাক খেয়ে গড়িয়ে গেল ওরা, ঠিক তাই! ওরা পেলেতিএকে জখম করেছে, ও একজন বেলজিয়ান। আমি ওর জখম বেঁধে দিলাম, আর ও চেঁচিয়ে উঠল : 'ওদের ভাগিয়ে দিয়েছি তো? সাবাস!'

দেখতে পাচ্ছ, আমাদের মনের জোর মোটেই কমেনি, অবশ্য সবাই খুব ক্লান্ত। আর ওই তো বললাম, তামাক খেতে পাই না একবারও। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আসল কথা, আমরা প্রতিরোধ করেছি।

ওরা যে ভ্যালেন্সিয়ার দিকে এগোয়নি, তার একটা কারণ হল এই। ওদের ফৌজ ঢের শক্তিশালী, ওদের বিমান-বাহিনী আমাদের দশগুণ। অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি 'নিষ্ক্রিয় নীতি'র ফলাফল। ব্লুম আর ভীইয়ারকে চিনে নিয়েছে আমাদের সবাই, ওদের উদ্দেশ্যে গাল পেড়ে বলে, 'আর এই ভীইয়ারটা...'। ফ্যাশিস্টদের পদাতিক ফৌজ অনেক আছে, বেশ ভাল যোদ্ধাও বটে—গুয়াদালাজারার ইতালীয়ান ভাড়াটে সৈনিকদের মতো নয়, মুর কিংবা নাভারীজ সৈনিকদের মতো! কিন্তু আমরা ওদের রুখতে পারব বলে মনে হয়। শুধু অল্প কিছুদিন থেকে আমাদের লোকেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে। এটা হচ্ছে আমাদের দেশের লোকের জন্যে। খবরের কাগজ খুলে আরও একটা আত্মসমর্পণের কথা পড়ে ভয়ানক দমে যেতে হয়। স্প্যানিয়ার্ডরা আমাদের ছোট চোখে দেখে, আর অবাক হয়ে ভাবে, কি ধরনের লোক আমরা! আর আমাদের মতে ওরা ঠিকই ভাবে। কিন্তু আমার তো মনে হয়, এবার বদলে যাবে সব কিছু। আরো পিছু হটা অসম্ভব। আমাদের রেডিওয় আংশিক সাময়িক ব্যবস্থা জারীর কথা ঘোষিত

হয়েছে। আমরা সবাই ভারি উৎসাহ পেয়েছি খবরটা শুনে। এমন কি, র‍্যাডিকালদেরও স্বীকার করতে হবে যে আমরা এখানে ফ্রান্সের জন্যেই লড়ছি।

আমাদের খুব ভালো একজন কমরেডের মারফৎ এই চিঠিখানা তোমার হাতে পৌঁছবে। ওকে উৎসাহ দিও, ওর কোনো দেশ নেই, আত্মীয়-পরিজন নেই। আমাদের এখানকার জীবন আর সামরিক অভিযান ইত্যাদি সম্বন্ধে সবই ও তোমাকে বলবে। আর যেটুকু বলবে না, সেটুকু তুমি বুঝে নিও। কি বলতে চাচ্ছি, বুঝতে পারছ তো? আমার কেবলই মনে পড়ে, সেই কুয়াশা-ঢাকা রাতে তুমি কি ভাবে হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলে—প্রায়ই মনে মনে দেখি সেই ছবিটা। কি বলতে চাই—বুঝছো নিশ্চয়। অনুভূতিটা এত তীব্র হয়ে উঠতে পারে—ভাবিনি কখনো। বলতে চাই, কিন্তু বলতে পারাটা বড়ো শক্ত, বিশেষ করে চিঠিতে। এইটাই শুধু বলতে পারি, শিগগিরই আবার মিলিত হব আমরা। আমার নিবিড় আলিঙ্গন নিও।

তোমারই

মিশো

সেইদিন সন্ধ্যাতেই দেনিস উত্তর দিলঃ

পারী, ৪ঠা অক্টোবর

প্রিয় মিশো!

কী খুশি হলাম তোমার চিঠি পেয়ে! আমি ইদানীং তোমার জন্যে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম—কথাটা লুকোতে চাই না। তোমার আর আমার শুভ জন্ম-লগ্নে আমার একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস আছে, সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা। যে কমরেডটি তোমার চিঠিখানা পৌঁছে দিল, তার কাছ থেকে তোমার অনেক খবর জানতে পারলাম। প্রত্যেক খুঁটিনাটির ওপর আমার আগ্রহটুকু সে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছে। দরদী আর সাহসী এই কমরেডটি।

মনের কথাটা খুলে বলছি তোমায়, তোমার ওপর হিংসে হয় আমার। সোজাসুজি, সামনাসামনি লড়াই করা কত সুখের! প্রতি মুহূর্তে জীবন বিপন্ন করে তোলা, খাঁটি আর সাহসী সঙ্গীদের মধ্যে থাকা আর তাদের গভীর বন্ধুত্ব অনুভব করার মধ্যে সত্যিই আনন্দ আছে। এখানে লোকে প্রায়ই বলে, স্পেনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, আর লড়াই চালানোর কোনো মানে হয় না। কথাটা সত্যি নয়। একজন লোকের হাতেও যতোক্ষণ বন্দুক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝাপড়া চুকবে না।

এখানে যে সব ব্যাপার ঘটছে, আমার পক্ষে সে সব তোমাকে লেখা বড় কঠিন। নীচতা, ভীরুতা আর মিথ্যাচারের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছে আমাদের। মিউনিক চুক্তির আগে আমাদের সবাই প্রতিরোধে বিশ্বাস করত। পারীর রাজমিস্ত্রীদের এক ধর্মঘট চলছিল, দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে মিউনিকের চারদিন আগে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওটা দালাদিএ, আমার বাবা আর তাঁদের দলবলের একটা খেলার চাল মাত্র। ওরা জনসাধারণকে কি রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছে আর কি রকম সংগঠিতভাবে আতঙ্ক প্রচার করছে, যদি তুমি দেখতে!

গত দু দিনে বদলে গেছে সব। এখন ওরা লড়তে চাইলেও কোনোই ফল হবে না তাতে। পপুলার ফ্রন্ট ভেঙে যাওয়াতে ভারি খুশি হয়েছে ওরা, কিন্তু আসলে ফ্রান্সেরই মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। ওরা মেতেছে, বিজয়োৎসব পালন করছে, যৌথ-নৃত্যের আয়োজন করছে, এমন কি বিজয় শোভাযাত্রা বের করেছে, কাল গ্রাঁদ বুলভারে জার্মান পতাকা

উড়তে দেখলাম। কী সাংঘাতিক! দালাদিয়ে হিটলারকে অভিনন্দন জানিয়ে তার করেছে। তোমার চিঠিখানা পড়ে আমার ভারি মজার একটা ছোটখাটো ঘটনার কথা মনে পড়ল। তুমি একজন কমরেডের কথা লিখেছ, সে নাকি 'লাকমে'র অনুকরণ করেছিল। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শুনলাম, সে 'অপেরা কমিক'-এ 'লাকমে' দেখতে গিয়েছিল; গায়িকাটি তার গানের মধ্যে নিজের এক লাইন জুড়ে দেয়, 'চেম্বারলেনে চুম্বন করি, বড় সাধ জাগে মনে!' আর, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালি পড়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা কী নির্বোধ আর কুৎসিত, দেখো দিকি!

শ্রমিকরা ক্ষেপে আছে। গত এক সপ্তাহে পার্টির প্রভাব বেড়ে গেছে। আমাদের কারখানায় আজ একটা সভা ছিল, সেখানে ঠিক করা হল, অতিরিক্ত সময়ের কাজ আর করা হবে না। আমাদের দল থেকেই প্রস্তাবটা পেশ করা হয়। বেকার লোক তো দেশে যথেষ্টই আছে। আমাদের কারখানায় যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হচ্ছে, সে কথা ভেবেই আমরা ইতিপূর্বে কোনো প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু এখন তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ফ্রান্সকে রক্ষা করার প্রশ্ন আর ওঠে না। ইউক্রেন-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, এমন কি মানচিত্রও ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে। ওরা জার্মানদের সহযোগিতায় সোবিয়েত-বিরোধী আন্দোলনে নামছে শুনলে মোটেই আশ্চর্য হব না আমি। এখানকার সব শান্তিবাদীরা হঠাৎ ভয়ানক রকম জঙ্গী হয়ে উঠেছে!

সেই সঙ্গে পার্টির ওপর নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে, আমার বাবা নাকি পার্টিকে বেআইনী করে দেবার পক্ষে। আমরা সেজন্য প্রস্তুত আছি। গোপনে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে—এমন একটা ছোট সংগঠন গড়ে নিয়েছি আমরা।

এবার বলি, চরম শয়তানির কথাটা। কাল লেগ্রে বলল, সামরিক ব্যবস্থা জারি হওয়ার সময় তোমরা সৈন্যদলভুক্ত হওনি—এই অজুহাতে ওরা 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'র লোকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আদেশ অমান্য করার অভিযোগ আনবে। ভেবে দেখ একবার—যারা নিজেরাই দলত্যাগী, তারাই কিনা অভিযোগ আনছে সেই সব লোকের বিরুদ্ধে, যারা বিশ্বাসঘাতকতার মোহড়া রুখছে দুটি বছর ধরে!

আমার নিজের কথা কি আর বলবো বলো? 'নোম' কারখানায় এখনো কাজ করছি। মনের কথাই বলছি, পার্টির কাজের জন্যেই বেঁচে আছি আমি। আর কোনো কিছুতে আমার একটুও আগ্রহ নেই। সেদিন এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল; ভদ্রলোক দিব্যি সংস্কৃতিবান, বামপন্থী, মতামতের দিক থেকে অ্যানার্কিস্ট আর রুদ্ধ-পন্থীদের মাঝামাঝি। তিনি বললেন, 'আপনারা অন্ধ। মধ্যযুগীয় অবিশ্বাসীদের যে সময়ে দমন করা হয়েছিল, সেই সময়ে জন্মানো উচিত ছিল আপনাদের। উগ্র ধর্মান্ধতা ছিল তখনকার হাল।' একদম বাজে কথা! কিন্তু প্রাচীন স্থাপত্য সম্বন্ধে পড়াশোনা করেই এতগুলো বছর কাটিয়েছি, ভেবে সত্যিই আমার দুঃখ হয়; বিষয়টার কোনো দরকার নেই বলে নয়; নিশ্চয় আছে। আমি জানি, সাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চেয়ে সৌন্দর্য ঢের বেশি উত্তরজীবী। দেখতে পাচ্ছ, আমি অন্ধ নই। কিন্তু ওই বিষয়টার ওপরে আমার কোনো কিছু নির্ভর করছে না। ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দ্বারাই আগামী একশো বছরের মত সব কিছুরই ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যাবে, শুধু আমাদের ব্যক্তিগত ভাগ্যই নয়, আমাদের সভ্যতার ভবিষ্যৎও। এর তুলনায় অন্য সমস্ত জিনিসই নিতান্ত গৌণ আর অপ্রত্যক্ষ বলে মনে হয়।

চিঠিখানা একটু সাদাসিধে হয়ে পড়ল, কিন্তু আমি অন্য ধরনের ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছি আজকাল। তুমি যে যুদ্ধ করছ, সেটা একটা আসল কাজ। আর আমরা গর্ত খুঁড়েই চলেছি উইপোকার মত...। এবার আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে একটা কথা বলিঃ মিশো, তোমার কথাটা বুঝিনি ভেবো না। প্রতিদিন তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি এই এসে পড়লে হয়তো, কিংবা এসে গেছ, আর ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলছ 'ঠিক তাই'! সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গেই আছি আমি, যখন অন্য কিছু ভাবি তখনো। আমি এই রকমই। ও কথা লিখে আর নিজের মনটাকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাই না। না বললেও তুমি বুঝতে পারবে।

তোমার দেনিস'

আঠারো

জনতার অভিনন্দনের উত্তরে যেদিন তেসা গোলাপ ফুল বুকে চেপে ধরে মাথা নুইয়ে প্রত্যভিবাদন জানিয়েছিল, তার পরে এক মাস কেটে গেছে। কিন্তু সেই সব সুখের মুহূর্তগুলি আজকাল ভুলে গেছে সে; প্রতিদিনই সে নতুন নতুন দুঃসংবাদ পায়।

নেশার ভাবটা কেটে যাবার পর একটা প্রতিক্রিয়ার অবসাদ এসেছে দেশে। আলোয় উজ্জ্বল রাস্তাগুলো দেখে আর লোকের মনে ফুর্তির ভাব জাগে না। সেপ্টেম্বরের সেই ভয়-চকিত ভাবটা অল্প দিনেই কাটিয়ে উঠেছে সবাই। সামরিক সংগঠনের ব্যাপারটা একটা আর্থিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; যে টাকাটা ওই জন্যে খরচ করা হয়েছিল, সেটা তুলতে হবে। প্রতিদিন গভর্নমেণ্ট নতুন নতুন কর বসাচ্ছে। পাঁউরুটির দাম চড়ে গেছে। মোটর-বাসে চড়া তো একটা বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মঘট শুরু হচ্ছে এখানে ওখানে। মালিকরা কড়া ব্যবস্থা দাবি করছে। কাগজে দেশের সচ্ছলতার কথা লেখা হচ্ছে বটে, কিন্তু আজকাল আর কেউ ওসব বিশ্বাস করে না। ব্রতৈইর 'পাড়া-সমিতি'গুলো আসন্ন 'অভ্যুত্থানের' জন্যে অতি দ্রুত আয়োজন করে চলেছে। অব্রি ঘোষণা করেছে, 'নববর্ষের মধ্যেই আমরা শৃঙ্খলা স্থাপন করব।' দালাদিএ তার 'ইস্পাতের মত কঠিন ইচ্ছা-শক্তি'র কথা উল্লেখ করে মৃগী-রোগীর মত আর্তনাদ করেছে, আর তার ফলে, সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছে অনেকের কাছে। গভর্ণমেণ্ট টিঁকে রয়েছে যেন শেষ আশ্রয়টুকুর ওপর নির্ভর করেই, আর তেসা পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে চেম্বারের লবিতে।

ফ্যাশিস্টরা বিদ্রোহ করবে—এ বিশ্বাস তেসার নেই, ধর্মঘটকেও ডরায় না সে। পথেঘাটে যে সব উপদ্রব হয়, সেগুলোর সঙ্গে চেম্বারের তর্ক-বিতর্কের একটা স্বাভাবিক যোগাযোগ আছে বলেই সে মনে করে। তার ভয় অন্য কিছুর জন্যেঃ চেম্বার কি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপন করবে? কতবার সে দালাদিএকে বলেছে, 'খুব সাবধান! আস্থার প্রশ্ন তুলো না যেন। কিসে যে কি করে বসবে ওরা তা বলা যায় না।'

ভাঁইয়ার যখন একদিন বলল, 'দেশের লোকে যে কি ভাবছে, তা কি আমরা জানি?' তখন তেসা হাত নেড়ে উত্তর দিল, 'তার চেয়েও খারাপ—ডেপ্লুটিরা যে কি ভাবছে, তাই জানি না আমি!'

গভর্নমেন্টের টলে-ওঠা অবস্থা উপলব্ধি করে ব্রতেই ইদানীং তেসার সঙ্গে নিম্নতম কর্মচারীর মতো কথা কইতে শুরু করেছে। কমিউনিস্ট প্যার্টিকে দমন করা হোক বলে দাবি জানাল সে। এ ধরনের পরামর্শে ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ল তেসা: কোন রাজনৈতিক দলকে বেআইনী করে দেওয়াটা ইয়ারকির কথা নয়, ভয়ানক হৈ-চৈ হবে। অবশ্য সমাজতন্ত্রীরা ভারি খুশি হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওদের মধ্যে বেশ খানিকটা অসন্তোষ নিশ্চয় দেখা দেবে। বামপন্থী র‍্যাডিকালদের ওরা নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেবে, আর তেসাকে পড়ে থাকতে হবে ব্রতেইর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে। শেষে ব্রতেই হয়ত কোনদিন বলে বসবে, 'তেসাকে দিয়ে ওর কাজ তো করিয়ে নেওয়া গেছে। এবার ওকে সরিয়ে দিয়ে লাভালকে আনো।'—ব্রতেই যে এমন কথা বলে বসবে না, সে সম্বন্ধে ভরসা দিতে পারে কে?

গ্রঁদেল আগাগোড়া সক্রিয় রয়েছে ব্রতেইর পেছনে। তার খ্যাতি বেড়ে গেছে। লোকে বলে, সেপ্টেম্বরের বিপর্যয় থেকে সে ফ্রান্সকে বাঁচিয়েছে। লা-ফ্লেস্ শহরের রিজার্ভ ফৌজের সৈনিকদের স্ত্রীরা তাকে এক সেট টেবিল-শুদ্ধ লেখার জিনিসপত্র উপহার দিয়েছে। কাগজ চাপা দেবার পাথরটার ওপর একটি স্ফটিক-নির্মিত পায়রা, অলিভ-শাখা ধরা রয়েছে তার ঠোঁটে। ক্রমেই বেশি মাত্রায় মারমুখী হয়ে উঠেছে তার বক্তৃতাগুলো। একটা সভায় সে ঘোষণা করল, 'ফ্রান্সকে কমিউনিস্টদের কবল থেকে আর আন্তর্জাতিক ধনিকতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করবার সময় এসেছে। এই তেসাদের সরিয়ে দিতে হবে!' গ্রঁদেল-সংক্রান্ত সেই দলিলখানা দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে ফেলার জন্যে দারুণ ক্ষোভ মিশ্রিত দুঃখ জেগেছে তেসার মনে। শুধু যদি সেই চিঠিখানা থাকত তাহলে গ্রঁদেলকে সে গুঁড়িয়ে দিতে পারত আর ব্রতেইর এই লেজে খেলানোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত! আর কে তাকে ফেলেছে এই বিশ্রী অবস্থায়? লুসিয়ঁ! ওকথা মনে পড়লেই রাগে আত্মহারা হয় তেসা। নিজের ছেলেমেয়েই কিনা বেইমানি করল তার সঙ্গে! দেনিস মজুরদের উস্কানি দিচ্ছে বাপের বিরুদ্ধে আর লুসিয়ঁ হয়েছে গ্রঁদেলের সহকর্মী।

নিজের চারদিকে শত্রু গজিয়ে উঠতে দেখল তেসা। ব্রতেইর বিরুদ্ধতাটা স্বাভাবিক: বিরোধী-দলের একজন প্রতিনিধি সে। এটা তো পার্লামেন্টের খেলায় নিয়মসম্মত। কিন্তু র‍্যাডিকাল পার্টির মধ্যেও তেসার বিরুদ্ধে বলাবলি হতে শোনা যাচ্ছে। এবারেও সেই অতি-উগ্র ফুজেটাই পালের গোদা। ঘৃণায় ভরে উঠেছে তেসার মন। নিজে বাঁচা আর অপরকে বাঁচতে দেওয়ার নীতিটা জানা উচিত লোকের। ফুজের বিরুদ্ধে সে কোনোদিন দল পাকায়নি। তাদের দুজনের নির্বাচন কেন্দ্র আলাদা, পেশা আলাদা, স্বার্থও আলাদা। ফুজে একটা বইয়ের পোকা আর তেসা হচ্ছে প্রাণবন্ত মানুষ। আর ফুজে এখন কিনা সাহস করল তার দেশভক্তি সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে; পার্টি-সভায় ও বলেছে, 'তেসা মিউনিকের সমর্থক। মিউনিক-চুক্তিকে সমর্থন করার অধিকার তার আছে। কিন্তু ওই জার্মানদের ভাড়াটে লোক গ্রঁদেলকে বাঁচাবার জন্যে আমার দেওয়া সেই প্রমাণপত্রখানা সে নষ্ট করে ফেলল কেন?' এর উত্তরে তেসা খুব একটা উদ্দীপনাময় কিন্তু অস্পষ্ট বক্তৃতা দিয়ে ফ্রান্সের উচ্চতর স্বার্থের কথা আর কূটনৈতিক ব্যাপারের গোপনীয়তা উল্লেখ

করেছিল। খুব তারিফ পেয়েছিল সে। কিন্তু যাই হোক কয়েকজন ডেপুটি ফুজেকেই বিশ্বাস করেছে আর গ্রঁদেলের সঙ্গে তেসার গোপন যোগাযোগ আছে—এমন কথাও বলাবলি হচ্ছে। রেগে আগুন হয়ে উঠল তেসা কিন্তু দলিলের ব্যাপারটা একদম চেপে গেল। লুসিয়ঁ যদি এর মধ্যে জড়িত থাকে তাহলে কি করে সে এ সম্বন্ধে সব খুলে বলবে? তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না ফুজে।

দালাদিএ প্রস্তাব করল বর্তমান পার্লামেণ্ট বাতিল করে দিয়ে অবিলম্বে একটা সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হোক। ডেপুটিরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তেসা বুঝল কথাটা নিতান্ত নির্বোধের মতো। এর ফলে কমিউনিস্টদের আর দক্ষিণপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি হবে। অন্তত পঞ্চাশটি আসন হারাবে র‍্যাডিকালরা। এর মানেটা দাঁড়ায় নিজের কবর নিজেই খোঁড়ার মতো। তাছাড়া চেম্বার এতে রাজি হবে নাঃ আত্মহত্যার সম্ভাবনার প্রতি কেউই আকৃষ্ট হয় না। সরকারের বিরুদ্ধে এই একটা বিষয়ে সবাই একমত হবে—দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দলইঃ চেম্বারে নিজের আসনটা বজায় রাখতে চাইবে না—এমন কোনো লোক আছে কি? দালাদিএ বলেছে, উনিশশো চল্লিশের নির্বাচনের ফলাফল হবে সাংঘাতিক। তা তো হবেই। কিন্তু আগামী নির্বাচন হতে ঢের দেরি এখনো। সবচেয়ে যা খারাপ—ডেপুটিরা ইতিমধ্যেই তাদের ভোটদাতাদের খুশি করতে লেগেছে; হয় তারা নতুন করধার্যের বিরুদ্ধে না হয় মজুরদের খুশি রাখতে উদগ্রীব। কি করা যায়? অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ভাবল তেসা, শেষ পর্যন্ত এক উপায় বের করলঃ চেম্বারের জরুরিকালীন ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকারের মেয়াদ আরো দু বছর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই টোপটা গিলবে সবাই। বুরবঁ প্রাসাদে আরো দু বছর বেশি বসতে পাবার সম্ভাবনায় কেই বা আত্মশ্লাঘা অনুভব না করে পারে? এই চালটা দিতে পারলে মন্ত্রীদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে বছর খানেকের মত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তার বেশি ভাবতে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতা হবে। এক বছরের মধ্যে কি হবে কে জানে?

শুধু যদি ফুজের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া যেত! তেসা র‍্যাডিকাল পার্টি সম্মেলনের মুখ চেয়ে আছে, সেখানে বিরোধী পক্ষকে দমন করতে পারা যাবে। উদ্দীপনাময় আর কুশলী একটা বক্তৃতা লিখে নিয়ে প্রস্তুত হল সে সম্মেলনের জন্যে। বক্তৃতার মধ্যে অজস্র উদ্ধৃতি দিল প্লুটার্ক আর গ্যামবেতা থেকে, মার্ন-এর শহীদদের করুণ স্মৃতিকথার সঙ্গে উল্লেখ করল দেশের বিমান-যন্ত্রশিল্পের নানা ত্রুটির কথা। আয়োজনটা যাতে বেশ বিরাট রকমের হয়, সে জন্যে তেসা নিখুঁত ব্যবস্থা করল; নির্দেশ পাঠাল জেলা কমিটিগুলোয়, উপযুক্ত প্রতিনিধিদের যাতায়াতের খরচ যোগাল, মোটা মাইনের বিনা-কাজের চাকরি আর পদক ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দিল।

আমালি যখন বলল, 'কী ভয়ানক চেহারা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। এত খাটলে কি করে চলবে?' তখন তেসা মৃদুভাবে উত্তর দিল, 'গিন্নী, আর কি করবার আছে বলো? ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমার রইল শুধু ফ্রান্স।' গত এক বছরে অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছে আমালি; কিছুই খেতে পারে না, আর ঘুমও ভালো হয় না। শুকিয়ে আসা বিবর্ণ শিশুর মতো দেখতে হয়ে গেছে সে। তেসা উঠে পড়ল; বড় দুঃখ হয় তার স্ত্রীর জন্যে। বক্তৃতাটা তৈরি করবার সময় বাইবেলের জেরেমিয়ার অধ্যায় থেকে একটা উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে তার চোখে পড়ল জব-এর কাহিনী। পাতা দুয়েক পড়ে তেসার মনে হল যেন তার নিজের সম্বন্ধেই ওই গল্পটা লেখা। জবের মতোই সব

কিছুই হারিয়েছে সে; ভেঙে চুরে গেছে তার সংসার। ছেলেমেয়েরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে; স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়; আর, সবাই নিন্দা রটাচ্ছে তার নামে। সে কত একাকী আর কত অসুখী, সে কথাটা কেউ বোঝে না। জবের না হয় ঈশ্বর সহায় ছিলেন, কিন্তু তেসা যুক্তিবাদী মানুষ। আমালির মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ের জগতে বাস করতে চায় না সে। পরলোকে প্রতিদান পাবার আশাও সে রাখে না। তেসার সহায় তাহলে কি? কথাটা ভাবার পর তেসা নিজেকে বোঝাল, আত্মনির্ভরতা আর মানবিক সম্ভ্রমবোধই তার অবলম্বন।

পার্টি সম্মেলনের জন্যে যারা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের মধ্যে ফুজে অন্যতম। চেম্বারে সরকার পক্ষের বিরোধিতা করতে সে অনিচ্ছুক, কারণ সরকারী দলে তার পার্টি সহ-যোগীরা রয়েছে অনেকে। পার্টির একান্ত অনুগত সে, তার বিশ্বাস—র‍্যাডিকালরাই জ্যাকোবিনদের নৈতিক উত্তরাধিকারী, আর, তেসা তাদের দলে দুর্ঘটনাক্রমে ঢুকে পড়েছে বলে সে মনে করে। পার্টির শ্রেষ্ঠ কর্মীরা আসবে এই সম্মেলনে; জেলা-অঞ্চলের কর্মঠ, খাঁটি সব লোক, যারা রিপাব্লিককে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ফুজে স্থির করেছে, সম্মেলনে সে গ্রদেলের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী বলে দেবে, তেসার দু-মুখো নীতি প্রকাশ করে দেবে, আর দাবি জানাবে দালাদিএ যেন প্রিন্স দ্য কঁদের বদলে রোবস্‌পিয়ের-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

ফুজের দৃঢ় বিশ্বাস—'মুক্তি' কথাটা যদি সম্মেলনে বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হয়, তাহলে একটা ঝড় উঠবে আর তার ফলে বর্তমান সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হবে। সে ঘোষণা করল, 'র‍্যাডিকালদের হয় এই আত্মসমর্পণের লজ্জাকর নীতি ত্যাগ করে ফ্রান্সকে জয়ের পথে নিয়ে যেতে হবে, আর না হয় সর্বসাধারণের বিক্ষোভের ফলে তলিয়ে যাবে তারা।' জনসাধারণের এই বিক্ষোভ কি চেহারা নিয়ে ফেটে পড়বে—একথা জিজ্ঞেস করলে সে বিনা দ্বিধায় উত্তর দেয়, 'ব্যারিকেড তৈরি হবে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বুঝেছেন মশাই, ব্যারিকেড!'

মার্সাইএ সম্মেলন হবার কথা। দক্ষিণে রওনা হবার আগের দিন ফুজে 'ফরাসী-বিপ্লব অনুশীলন সমিতির' এক সভায় যোগ দিয়েছিল। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরল সে। দাঁত-পন্থীরা কয়েকটি দলিলপত্রের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করেছে, আর এখনো রোবস্‌পিয়েরের বিরুদ্ধে নকল নথিপত্র সাজাবার অভিযোগ করে চলেছে সমানে। ফুজে চটে উঠে একজন শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিককে বলেছে 'এটা আপনার স্বেচ্ছাচারিতা।' বাড়ি ফিরে হল-ঘরটায় ঢুকেই সে চিৎকার করে উঠল, 'এমন অন্ধ বুদ্ধিবিভ্রাট তো আর কখনো দেখিনি!'

দাঁতর নীতিহীনতার ওপর এক লম্বা বক্তৃতা শোনার পর তার স্ত্রী বিষণ্ণ মৃদু গলায় বলল, 'আমি ভাবছি তার চেয়েও গুরুতর একটা কথা।'

প্রসন্ন হাসি হেসে ফুজে বলল 'বোধহয় বলতে এসেছ যে মশারীটার মধ্যে মাছি ঢুকে গেছে?'

ফুজের ধারণা, তার এই স্থূলকায়া স্ত্রী মারি-লুইয়ের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পারি-বারিক স্বাচ্ছন্দ্য আর গৃহের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। কিন্তু মারি চটে উঠে বলল, 'তুমি না হয় আকাশে চরে বেড়াও কিন্তু সব দিক সামলে চলতে হয় তো আমাকেই। কে একটা মেয়ের সঙ্গে আমাদের লুই জড়িয়ে পড়েছে। একজন সরকারী চাকুরের মেয়ে সে; ক্যাথলিক পরিবার। মেয়েটি গর্ভপাতের ব্যবস্থা করিয়ে নেবে; টাকা দাবি করছে সে।

ওর বাপ-মাকে সমস্ত জানিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে মেয়েটা।'

অত্যন্ত বিরক্তভাবে চেঁচাতে লাগল ফুজে, 'আমি এর বিরুদ্ধে। এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। কী কেলেঙ্কারী! লুই ওকে বিয়ে করুক আর না হয় পাদরির শরণ না নিয়েই সংসার পাতুক দুজনে মিলে। যা হয় করো খালি ওইটি ছাড়া।'

'কিন্তু লুই বিয়ে করতে চায় না যে। ও বলছে, মেয়েটিকে মোটেই ভালবাসে না ও আর সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নিতান্ত সাময়িক ঘটনার ফল।'

পাশের ঘর থেকে ছুটে এল লুই। ছোকরার মুখময় ব্রণ, গায়ে নীল কোর্তা, নাকী সুরে বলে উঠল 'ওকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। ও একটা ভণ্ড আর স্বার্থপর মেয়েমানুষ। আর ওর বাপ একটা ক্যাথলিক, সাংঘাতিক পরচর্চা করে লোকটা দিনরাত। এখন তোমায় সেই 'পরমত-সহিষ্ণুতা' গেল কোথায়?'

গোঁয়ারের মত ফুজে বারবার বলল, 'আমি এর বিরুদ্ধে।' ফাঁকা ঘরে সমানে চিৎকার করে যেতে থাকল, খেয়ালই হল না যে মারি-লুই আর তার ছেলে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে কাজে মন দিল সে। মার্সাইএ যে বক্তৃতাটা দেবে তার নোটগুলো সংশোধন করতে বসল। মারি-লুই সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে, কাজে অভিনিবিষ্ট স্বামীর দিকে তাকিয়ে শেষে ভয়ে ভয়ে বলল, 'দু হাজার। লুইয়ের জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যে। ভারী শস্তা একটা পশমের কোট পেয়েছি!'

'আগে বলোনি কেন?' অন্যমনস্কভাবে বিড় বিড় করে বলল ফুজে, 'এইমাত্র আমি চেক আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে তিন হাজার ফ্রাঁ দিয়ে এসেছি। মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত সবুর করতে হবে তোমায়।'

মারি-লুই মিতব্যয়ী গৃহিনী। পুরনো পোশাকের হাল ফিরিয়ে নিতে সে জানে, নিলামী মাল থেকে মোজা কিনে আনে স্বামীর জন্যে, শস্তায় টেবিলের ঢাকনি কিংবা চেয়ার কেনবার জন্যে দশ বারোটা দোকানে ঘোরাঘুরি করে; আরো বেশি টাকা না দেবার জন্যে কখনো স্বামীকে তাড়না করে না। কিন্তু এখন এই গোঁয়ার্তুমির জন্যে বিরক্ত হয়ে উঠল সে। লুইয়ের জন্যে দু হাজার ফ্রাঁ যোগাড় করার উদ্দেশ্যেই তাকে বাধ্য হয়ে এই পশমের কোটের গল্পটা বানাতে হয়েছে।

'আমি তোমার কাছে এমন কিছু ঘন ঘন টাকা চাইতে যাই না!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওই আশ্রয়প্রার্থীদেরই যদি ভরণপোষণ করতে চাও, তবে ব্যবসায় নামো না কেন? আমাকে সবাই বল, 'ডেপুটির গিন্নী তুমি, তোমার তো অনেক টাকা।' আর এদিকে আমি কিনা ঝিয়ের মত খেটে মরছি। অন্য ডেপুটিরা তো টাকা করে প্রচুর। রোবস্‌পিয়েরের ওপর ওই বইটা লিখে কত টাকা রোজগার করেছ তুমি?'

রাগে পাগল হয়ে উঠল ফুজে। মেঝের ওপর লাথি মেরে বলে উঠল, 'চোপ রও! কী ভেবেছ তুমি আমায়? আমি তেসা নই! বরং দোকানের জানলা সাফ করব গিয়ে, সেও ভালো আমার পক্ষে!'

মারি-লুই আঙুল মটকাতে মটকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছেলেকে বলল, কালই সে তার রুপোর বাসনগুলো বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করে আনবে। এগুলো সে বিয়ের উপহার হিসেবে পেয়েছিল, তার জীবনের এই প্রথম সে এগুলো হাতছাড়া করছে। রান্নাঘরে গিয়ে সে চিনির শিশি, দুধের গামলা, সাঁড়াশী আর চামচগুলো পালিশ করতে

লাগল বসে বসে।

ফ্রজে রাতভোর ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করল, আর প্রত্যেকের উদ্দেশে গাল পাড়ল—লম্পট চরিত্র লুইয়ের উদ্দেশে, তেসার উদ্দেশে, সেই ঐতিহাসিকের উদ্দেশে যিনি 'বিশুদ্ধ-চরিত্র ম্যাক্সিমিলিয়ান'-এর নামে নিন্দা রটনা করেছেন, আর নিজের উদ্দেশেও—আরো সাদাসিধে, আরো কঠোর, আরো পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা উচিত ছিল তার! তারপর অল্প একটু জলে মুখখানা ধুয়ে, আর উস্কোখুস্কো দাড়িটা আঁচড়ে নিয়ে সে রওনা হল রেল-স্টেশনের দিকে।

একই দিন সকালে তেসার রওনা হবার কথা, কিন্তু দালাদিএ মন্ত্রীদলের একটা সভা ডেকেছে: ব্যাঙ্ক-মালিকরা মারশাঁদ-র বিলের বিরোধী। সভা যতোক্ষণ ধরে চলল, তেসা কেবল হাই তুলল আর মনে মনে হিসেব করতে থাকল পার্টি সম্মেলনে ফ্রজের পক্ষে কতগুলো প্রস্তাব উঠতে পারে। সভা ভাঙার পর বাড়ি এল জিনিসপত্রগুলো তুলে নেবার জন্যে। হলঘরে একজন অপরিচিত লোক অপেক্ষা করছিল।

তেসা চেঁচিয়ে উঠল, 'সময় নেই আমার!'

'পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না, মন্ত্রী-মশাই। ব্যাপারটা বিশেষ জরুরি।' তেসা শুনতে চায় না। সে ভাবল, লোকটা হয়ত সরকারী চাকুরে, কোনো অভিযোগ জানাতে এসেছে।

'তাহলে, মন্ত্রী-মশাই, মার্সাইতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?'

তখন তেসা বুঝতে পারল, লোকটা পার্টি-সম্মেলনের প্রতিনিধি, আর সম্মেলন সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে ও এসেছে। সুর বদলে ফেলল তেসা। অমায়িকভাবে এনে বসাল ওকে নিজের লেখা-পড়া করবার ঘরটায়। প্রতিনিধির কাগজপত্র বের করে লোকটা আত্মপরিচয় দিল, 'আমার নাম ভাইস, হট-রাঁন বিভাগের কোলমার-দলের প্রতিনিধি।'

সুন্দর চেহারা ভাইসের, করুণ নীল চোখ, কোঁকড়ানো চুল। জেলা-অঞ্চলের লোক বলে মনে হয় তাকে দেখে, উঁচু কলারের কোট আর ডোরা কাটা পাতলুন, কোর্তার ওপর সোনার চেন ঝোলানো। কথায় উচ্চারণে আলসেশিয়ান টান।

'কোলমারের র‍্যাডিকালরা বরাবরই পপুলার ফ্রন্টের বিরোধী, পার্টির আসল নেতা হিসেবে আমরা আপনার মুখ চেয়েই আছি! ফ্রজে সম্মেলনে গণ্ডগোল বাধাতে চায় শুনে ভয়ানক বিরক্ত হয়েছি আমরা।'

'কিন্তু ফ্রজে পার্টির পুরনো সভ্য। তার বক্তব্যটা যতোই ভুল হোক না কেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে।'

'কোলমারের র‍্যাডিকালরা মনে করে, ফ্রজে বর্ণচোরা কমিউনিস্ট, লোকটা মস্কোর নির্দেশ মতো চলে। গির্জার ওপরে ও যে-রকম বাড়াবাড়ি আক্রমণ করে চলেছে তার ফলে আলসাস্ মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একাধিকবার ও গিয়ে জুটেছে দলত্যাগীদের সঙ্গে। বেসাস'-র অস্ত্র-তৈরির কারখানায় মজুররা যেবার অবস্থানধর্মঘট করে, সেবার ও মজুরদের হটিয়ে দেবার কাজে পুলিশকে বাধা দেয়, অর্থাৎ ফ্রান্সের আত্মরক্ষার প্রস্তুতিকে ও বানচাল করে দিয়েছিল। জার্মানির সঙ্গে যাতে আমাদের একটা হাঙ্গামা বাধে, সেই জন্যে ও জার্মানী-আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সুপারিশ-চিঠি দিয়েছে। আর সব চেয়ে বড়ো কথা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের চরিত্র খারাপ করার অপরাধে অভিযুক্ত লারিশো-র মুক্তির ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছে ও।'

একঘেয়ে ভোঁতা গলায় বলে চলল ভাইস, যেন কোনো লিখিত অভিযোগপত্র পাঠ করছে। পৃথিবীতে যে কত রকমের নীচতা আছে, সে কথা ভেবে একটা শিশুসুলভ বেদনা প্রকাশ পেল তার দুই চোখে। লারিশোর নামটা শুনে তেসা হাসল। ও ব্যাপারের সবই সে জানে। লারিশোর মা ফুজের কাছে আবেদন জানিয়েছিল; উকিলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিল ফুজে কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে অনেক গণ্ডগোল আছে জানতে পেরে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ও রকম লোককে বাঁচাতে চাও কেন? ওকে গিলোটিন করলেও যথেষ্ট হয় না!' যাই হোক, লারিশো শেষ পর্যন্ত টাকার জোরে নিজের মুক্তি কিনে নিতে পেরেছিল। মেয়েটির মা ঘুষ খেয়ে সাক্ষ্য দিয়ে আসে যে একজন নির্দোষ লোকের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার জন্যে সে তার মেয়েকে প্ররোচিত করেছিল। ভাইসের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে তেসা আলোচনা করতে চাইল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'কি করতে চান আপনি?'

'ফুজের মুখ বন্ধ করে দিতে চাই।'

'কিন্তু সেটা তো আমাদের পার্টি-ঐতিহ্যের বিরোধী। মত প্রকাশের স্বাধীনতা...'

'শয়তানদের জন্যে নয়!'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তেসা। তারপর একটু হেসে বলল, 'আপনার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি, আপনার মতো তরুণরাই তো দেশের আশা-ভরসা। কিন্তু এত পরমত অসহিষ্ণু হলে চলবে কেন? যাই হোক, আপনাকে নিবৃত্ত করার কোনো অধিকার আমার নেই। একজন নাগরিক হিসেবেই আপনার কর্তব্য করতে যাচ্ছেন আপনি। মার্সাইএ আবার দেখা হবে আমাদের। ওখানে পৌঁছে আপনি আমার বন্ধু বিলে-র সঙ্গে দেখা করবেন। ওর বয়স প্রায় ষাট, কিন্তু মনের দিক থেকে ও তরুণ, আর সেও আপনার সঙ্গে একমত। ও আপনাকে সাহায্য করবে।'

ভাইস্ চলে যাবার পর তেসা চাকরানীটাকে তার জিনিসপত্র বাইরে পৌঁছে দিতে বলল। তারপর এল আমালির কাছে বিদায় নিতে। বিছানায় শোয়া আমালিকে ভয়ানক ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, ক্রুশ চিহ্নিত মালা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা-মন্ত্র বলে চলেছে। আমালিকে আলতো চুমু খেয়ে তেসা বলল:

'আচ্ছা, তাহলে আসি গিন্নী। ভাল হয়ে যাবে তুমি! আমি সব আঁট-ঘাট বেঁধে ফিরে আসব বলে আশা করছি। লোকটা যদি মুখ খুলতে সাহস করে, তাহলে একবার দেখে নেব ওকে।'

উনিশ

মার্সাইকে লোকে বলে 'ফ্রান্সের শিকাগো'। এই বন্দরের অলিতে গলিতে বোম্বেটে আর ছেলেমেয়ে-বিক্রির গোপন ব্যবসাদারদের ভিড়; এখানে গণিকাদের দালাল, চোরা-কারবারী, আফিম আর কোকেনের ফড়েদের একচ্ছত্র অধিকার। এমন লোকও অজস্র আছে যারা রিভলভার থেকে বোমারু-বিমান পর্যন্ত সব কিছু অস্ত্রশস্ত্র কেনা-বেচা করে—

এদের অনেকেই ব্রতেইর দালাল আর ভাড়াটে গুণ্ডা, স্পেনের দুরবস্থার সুযোগে যারা দু হাতে টাকা লুটে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে শহরের পথে ঘাটে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়ঃ যারা দলের সঙ্গে বেইমানি করেছে, কিংবা মুখ বুজে থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করেছে, তাদের সাবাড় করে দিয়েছে গুণ্ডরা। 'পুরনো বন্দর' অঞ্চলের সরু সরু রাস্তায় অসংখ্য গণিকালয়ের ঘিঞ্জি। পরিব্রাজক, কেরানী, ব্যবসাদার আর নাবিকদের জন্যে প্রতীক্ষায় থাকে অর্ধনগ্ন মেয়েরা; পথ-চলতি লোক যদি তাদের দেখে মুগ্ধ না হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায় তাহলে মেয়েগুলো তার টুপি কেড়ে নেয়, কিংবা নোংরা জল ছিটিয়ে দেয় তার গায়ে। গণিকাদের দালালরা আর তাদের ভাড়াটে লোকরা নির্বাচনী প্রচারে বন্দোবস্ত করে, ধর্মঘট ভেঙে দেয়, আর গুপ্তচরদের দরকার মতো লুকিয়ে রাখে কিংবা ধরিয়ে দেয়।

নির্বাচনের আগের কয়েকটা দিন গুণ্ডাদের ভারি সুদিন, দু হাতে টাকা লোটে ওরা। নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে যারা, তাদের একটু দরাজ হতে হয়, তা নইলে গুণ্ডারা বক্তাকে ধরে মার লাগাবে, দেয়ালে লটকানো ভোটের আবেদন টেনে ছিঁড়ে দেবে, আর ভোটদাতাদের হাঁকিয়ে দেবে। বোম্বেটেরা দুটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত; প্রথম দলের নেতৃত্ব করে লেপেতিত নামে একজন কানা লোক, স্থানীয় পৌর-সভার মাইনে বাঁধা লোক ও। সেখানে সমাজ-তন্ত্রীদের প্রাধান্য। খুব অল্পদিন আগেও তার যা কিছু আগ্রহ ছিল একমাত্র কোকেনে; অত্যন্ত অমায়িকভাবে লেপেতিত ব্যাখ্যা করেঃ 'আমি নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে।' দ্বিতীয় দলটি ব্রতেইর হয়ে কাজকর্ম করে, ওদের নেতা লেব্রক; জনৈক ব্রেজিলীয় ব্যবসায়ীকে খুন করার পর থেকেই তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। বোম্বেটেরা অনায়াসে এদল থেকে ওদলে গোষ্ঠী বদল করে। এদের সহযোগিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পেলে চেম্বারের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়ানো যেমন বিপজ্জনক, কানবিএরে কাফে খুলতে চাওয়াও তেমনি অসম্ভব।

এই র‍্যাডিকাল সম্মেলন উপলক্ষে মার্সাইএর গুণ্ডারা যা পারে বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, সব কিছু বিবেচনার পর তেসার বন্ধু বিলে স্বয়ং লেব্রকের সঙ্গে দেখা করে আরজি পেশ করল। বিলে কফির পাইকারী কারবার করে, সে লেব্রককে বিশ্বস্ত লোক বলে জানে। ছিঁচকে চোররা যাতে কফি চুরি না করতে পারে সেজন্য সে অনেকবার তার সাহায্য নিয়েছে। এবার সে লেব্রককে সম্মেলনের অধিবেশনে শান্তি আর শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার নিতে অনুরোধ জানাল। দুশোজন বেশ্যার দালাল আর চোরা-কারবারীকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হল; কেউ কেউ আমন্ত্রিত হল অতিথি হিসেবে। কাউকে বলা হল সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে আসতে। ফুজে যাতে কোন ব্যবস্থা ভণ্ডুল না করে দিতে পারে, সেজন্যে সমস্ত রকম আয়োজন করা হল।

বিরাট হলঘরটায় ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেল ফুজে। সে এই ধরণের সভায় মধ্য-বয়সী, ঘাড়-মোটা, দাড়িওলা মফস্বল অঞ্চলের লোক দেখতে অভ্যস্ত; দোকানদার, উকিল, জোতদার, অধ্যাপক, টহলদার ব্যবসায়ী, কারুশিল্পী—এক কথায় ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই সব সভায় যোগ দেয়। অবশ্য এবারকার অনুষ্ঠানে অন্যান্য বারের মতই তার অতিপ্রিয় গোটাকতক দাড়ির দেখা-সে পেল, কিন্তু তারা সবাই হারিয়ে গেছে খোলোয়াড়ী চেহারার ছোকরাদের ভিড়ে—যারা তাদের বলিষ্ঠ বাহু আর চকচকে পাট-করা চুল সম্বন্ধে ভারি গর্বিত। এদের মধ্যে অনেকেই লেব্রক কর্তৃক সংগৃহীত 'নিমন্ত্রিত ব্যক্তি'। অন্যেরা

এসেছে 'প্রতিনিধি' হিসেবে, এরা নিজেদের 'তরুণ র‍্যাডিকাল' বলে থাকে। তেসাকে যে সব দল সমর্থন করে তারা, আর না হয় অর্থলোভীরা এদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে।

এই 'তরুণ র‍্যাডিকাল'দের মধ্যে অনেকেই আগে ফ্যাশিস্ট সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল; ফ্যাশিস্টদের আসন্ন ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় ওরা প্রলুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখল—ব্রতেইর অনুগামী হওয়া মানে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্যে অপেক্ষা করা; আর এই দলে এলে আরামের চাকরি, লাল-ফিতে শোভিত সম্মান-পদক কিংবা অন্তত কয়েক হাজার ফ্রাঁ সহজেই বাগানো যায়। এই 'তরুণ র‍্যাডিকাল'রা শ্রমিক আর ইহুদীদের গাল পাড়ে, 'চূড়ান্ত ক্ষমতাপন্ন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের' জন্যে দাবি জানায়, আর মুসোলিনীর 'বাস্তব বোধ' এবং হিটলারের 'বীরত্ব' সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত উৎসাহ দেখায়। হলের এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা, নিজেদের মধ্যে নানারকম টিপ্পনী কাটছে, হাই তুলছে আর সোরগোল করছে—সম্মেলনের অধিবেশন দেখে ফুটবল খেলায় দর্শকের ভিড়ের কথা মনে পড়ে।

দালাদিএকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হল; পুরনো দিনের দাড়িওলা সভ্যরা, 'তরুণ র‍্যাডিকাল'রা, আর বেশ্যার দালালরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, 'শান্তি দীর্ঘজীবী হোক'! কেউই লড়াই করতে চায়নি। সামরিক বয়সের যুবকরা মন খুলেই ধন্যবাদ জানাল এই ঘোলাটে চোখ, ছোটখাটো মানুষটিকে—যে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের গড়খাইয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ফ্রান্সের নায়ক ও প্রাচীন র‍্যাডিকাল-পন্থী নাগরিক এদুয়ার দালাদিএ যে তাদেরই একজন পার্টি-সহযোগী—একথা ভেবে প্রবীণ পার্টি-প্রতিনিধিরা গর্বে স্ফীত হয়ে উঠল। তেসা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল—আবার দালাদিএ সমস্ত তারিফটুকু একাই লুটছে। কিন্তু দালাদিএ যে প্রতীক মাত্র,—একথা উপলব্ধি করে সে মনে মনে ভাবল, 'ওরা আমাকেও বাহবা দিচ্ছে।' এটা ভাববার 'পর সেও এই হর্ষধ্বনিতে যোগ দিল।

উঁচু গলায় বক্তৃতা শুরু করল দালাদিএ। মাঝে মাঝে স্বরটা চিৎকারের পর্দায় চড়ে যাচ্ছে। অনেক দুর্বল স্বভাব ব্যক্তির মতোই সেও একটা অনমনীয় দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। নিজের শক্তিমত্তার ধারণায় সে বারবার চেঁচিয়ে উঠতে লাগল, 'আমি এ কথা বলেছিলাম!...আমি চাই!—আমি এ হতে দেব না!—'

মাঝে মাঝে তার গলার স্বরে একটা করুণ আর্তনাদ ফুটে উঠছে যা শুনে মনে হতে পারে, সে যেন কোনো ক্ষুদ্র ইস্কুল মাস্টার, যাকে নিয়ে সবাই বিদ্রূপ করে আর ভাগ্যের চক্রান্তে যাকে নেপোলিয়নের ভূমিকায় নামতে হয়েছে। দালাদিএ চিৎকার করে বলল, 'আমি বারণ করছি, কেউ যেন আত্মসমর্পণের কথা না বলে! মিউনিক-চুক্তিটা মোটেই আত্মসমর্পণ নয়!' বক্তৃতা দিতে দিতে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল, ওয়েস্ট্-কোটের ফাঁক দিয়ে দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, কায়দা করে মাথা নোয়াল: বোধ হয় সত্যিই সে নেপোলিয়ন, যে বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয় করেছে? মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনিতে হলঘরটা কেঁপে উঠছে। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই আত্মবিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে: প্রতিযোগিতাটা কেবল ফুজের বিরুদ্ধেই নয়, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও।

দালাদিএ মঞ্চ ত্যাগ করার পর প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা মানসিক অবসাদের ভাব জাগল। সবাই হলের এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হৈ চৈ করে পরস্পরের সঙ্গে হাসিঠাট্টা জুড়ে দিল। সভাপতি মহাশয় বৃথাই তাঁর হাতের কাছের ঘণ্টাটি বারবার বাজালেন। পরবর্তী বক্তা ফ্রান্সের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর একটা রিপোর্ট পেশ করছিল—

তার কথায় কেউ কান দিল না। অত্যন্ত বেসামরিক মনোভাবাপন্ন এই নাগরিকদের মনে সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তারা এখানে এসেছে শান্তিরক্ষার নীতিতে সমর্থন জানাতে, পপুলার ফ্রন্টকে গোর দিতে, আর 'ফালতু লোক'দের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থার দাবি জানাতে। ফ্রান্সের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার জন্যে এত বাক্যব্যয় কেন? কিসের জন্যে? মিউনিকের পরে, এক কমিউনিস্টরা ছাড়া আর কে ফ্রান্সের বিপদ ঘটাতে পারে? মাত্র একজোড়া দাড়িওলা মদের ব্যবসায়ী বক্তার প্রতি মনোযোগ দিয়ে অপরিচিত পরিভাষা আর সংখ্যাগুলো বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। পরে ওদের একজন অপরজনকে বলল, 'বক্তব্যটা আগাগোড়াই খুব অস্পষ্ট, কিন্তু আমাদের যখন ম্যাজিনো লাইন আছে, তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি আমরা, অবশ্য ওটা তৈরি করতে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু তেমনি আবার উনি যা বললেন, সমস্ত খরচটাই মোটে একবারের বেশি তো নয়—'

হলের বাইরে এল প্রতিনিধিরা। শহরের সমস্ত কাফে আর মদের দোকানগুলো ভর্তি করে তুলল তারা, সান্ধ্যভোজন শেষ করে হালকা মদ খেল, আর তারপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল 'পুরনো বন্দরের' রাস্তায়। এখানে বহু বিচিত্র ধরণের সব লোক তাদের অপেক্ষায় রয়েছে: গণিকালয়ের বাড়িউলী, মেয়েমানুষ, পিয়ানো-বাজিয়ে, জুয়াড়ী—আর রয়েছে লেব্রকের দলের অল্পবয়সী ছোকরারা, যারা এই সব প্রতিনিধিদের সামরিক কায়দায় এক অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন করেছে। সম্মেলনের খবর পাবার পর থেকেই 'নিষিদ্ধ অঞ্চল'গুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে: দৈনন্দিন খরিদ্দার আর জাহাজ-ভর্তি মার্কিন পরিব্রাজকদের চেয়ে নতুনতর এক আস্বাদ কিছুদিনের মতো পাবে তারা। মফস্বল-অঞ্চলের প্রতিনিধিদের কাছে সম্মেলনটা শুধু নাগরিক কর্তব্য পালনের ব্যাপার নয়—একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারও বটে। পাঁচ দিনের মতো সবাই পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে, সবাই অবিবাহিত বনে গেছে, আর স্বপ্নাচ্ছন্ন মফস্বল শহর থকে এসে পড়েছে উদ্দাম মার্সাইএ। কয়েকজন বাড়িউলী তো তাদের বাড়ির গায়ে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে: 'কেবলমাত্র প্রতিনিধি মহাশয়দিগের জন্যে।'

সে যাই হোক, প্রতিনিধি মহাশয়রা প্রণয়-বিভ্রমটুকু উপভোগ করলেও রাজনীতির কথা বিস্মৃত হল না। আদিরসাত্মক কবিতা আওড়াবার ফাঁকে ফাঁকে রাজনৈতিক তর্কাতর্কি বেধে গেল। সামান্য যে ক-জন সরকার-বিরোধী ছিল, তাদের দুচার কথায় দমিয়ে দেওয়া হল। প্রথমে ফ্যাশিস্টদের আর তারপরে তেসার প্রচারকার্য দেশের জনসাধারণের মনের গভীরে প্রবেশ করেছে। পপুলার ফ্রন্টের ওপর দোকানদারদের ভয়ানক রাগ: 'গণতন্ত্রকে ফ্যাশিস্টদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেই আমরা ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা বোকা বানিয়েছে আমাদের। ওরা মজুরদের বিগড়ে দিয়েছে, ধর্মঘটে উস্কানি দিয়েছে, আর দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়েছে!' জোতদাররা মিউনিক-চুক্তির পক্ষে সমর্থন জানাল: 'ওরা কাদের যুদ্ধের পথে ঠেলে দিচ্ছে? আমাদের। মজুররা তো কারখানাতেই থাকবে। রীতিমত জোচ্চুরি!' দু-চার বোতল শ্যাম্পেন টানার পর প্রতিনিধিরা সবাই অত্যন্ত ঝগড়াটে হয়ে উঠল; চিৎকার করে শাসাল; আর তোরেকে, ধর্মঘটীদের, এমন কি ব্লুমকেও গুলি করতে চাইল। গণিকাদের দালালরা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার জুড়ে দিল, 'সাবাড় করে দাও ওদের সবাইকে!' কিন্তু মেয়েগুলো প্রতিনিধিদের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমার ছোট্ট একটা উপহার কিনে দাও খোকন!' আর, দাড়িওলা 'খোকন' বিরক্তিতে বিড় বিড় করতে করতে বিরাট টাকার থলিটা পকেট থেকে বের করল।

ব্যাপারটা চরমে উঠল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে। ফ্রজে মঞ্চে উঠে দাঁড়াতেই হলের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল—সবাই যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু আশা করেছে। নিজের সামনে কাগজপত্র বিছিয়ে নিল ফ্রজে; সারারাত্রি জেগে সে এই বক্তৃতা তৈরি করেছে। প্রতিনিধিদের মনোভাব লক্ষ্য করে তার বক্তব্যের অনেক জায়গায় সুর নরম করে দিয়েছে, আর দালাদিএর প্রসঙ্গ উল্লেখ কবার সময় সাবধান হবে বলে স্থির করে এসেছে। সংকট সৃষ্টি করার জন্যে যে কোনো সুবিধা ছেড়ে দিতে সে রাজি। মনে মনে ভাবল, 'সম্মেলনকে' এবং সম্মেলনের মারফত গোটা দেশকে, দেখিয়ে দিতে হবে যে বিশ্বাসঘাতকরা ফ্রান্সকে গহ্বরের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মতামতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তেসা গ্রঁদেলের যে চিঠিখানা লুকিয়ে ফেলেছে, সেই চিঠির কথা যখন প্রতিনিধিরা জানতে পারবে তখন কি ভাববে তারা?

ফ্রজে শান্তভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করল:

'অসুস্থ মায়ের শয্যার পাশে সন্তানরা কখনো ঝগড়া করে না, এবং ফ্রান্স আজ সাংঘাতিক পীড়িত...'

একটা চিৎকারে বাধা পেল সে। দ্বিতীয় সারিতে একজন লম্বা লোক উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটা ভাইস।

'কমিউনিস্টদের একজন দালালকে আমরা এখানে বক্তৃতা করতে দিতে রাজি নই...'

হতবুদ্ধি ফ্রজে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?'

'কোলমারের প্রতিনিধি আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন কারো আদেশেই, 'তরুণ র‍্যাডিকাল'রা আর লেব্রকের ছোঁড়ারা খেঁকিয়ে উঠল, 'বসে পড়ো! মস্কোয় যাও'! 'আলসাস্ জিন্দাবাদ!' 'গুলি করে মারো কমিউনিস্টদের!' 'ডাকাত! লারিশোর টাকার কি করেছ?' বেসাস'!' 'লোকটা ধর্ষণ করেছে একটা মেয়েকে! গুলি করে মারো শালাকে!'

ফ্রজে বৃথাই কথা বলার চেষ্টা করতে লাগল, তুমুল গণ্ডগোলে ডুবে গেল তার গলা। সভাপতি-মশাই প্রাণপণে ঘণ্টা বাজিয়ে টেবিলের উপর চড় মারতে লাগলেন। তারপর তিনি মৃদু স্বরে ফ্রজেকে বললেন, 'আমার মনে হয়, আর পীড়াপীড়ি না করাই ভালো।'

প্রতিনিধির মধ্যে কয়েকজন যারা ফ্রজের পক্ষে, তারা সাংঘাতিক চটে উঠল, কিন্তু তারা হলের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে বসে আছে, আর তাদের ঘিরে বসে রয়েছে লেব্রকের বন্ধুরা। এখানে ওখানে হাতাহাতি হয়ে গেল তাদের মধ্যে। সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এরিও খাবার ঘরটায় ঢুকে গেল। শেষ পর্যন্ত ফ্রজে কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল মঞ্চ থেকে। সভাপতি পরবর্তী বক্তাকে আহ্বান করলেন। সবাই দরজার দিকে ভিড় জমিয়ে তুলল। হঠাৎ আর একবার ফ্রজের চড়া গলা শোনা গেল: 'গ্রঁদেল সংক্রান্ত সেই প্রমাণ-পত্রখানা আমি যখন তেসাকে...'

আর কিছু বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল; আবার সেই গণ্ডগোলটা শুরু হয়ে গেছে। এর পর সভাপতি কিছুক্ষণের জন্যে অধিবেশনের কাজে বিরতি ঘোষণা করলেন।

ভাইস হয়ে উঠল এদিনের নায়ক। প্রতিনিধিরা তার কাছে এসে করমর্দন করে অভিনন্দন জানাল। মার্সাইএর র‍্যাডিকাল দলের সভাপতি বিলে—যে তেসার ইঙ্গিতমত সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকে করে রেখেছিল—ভাইসকে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ জানাল

অভিজাত 'ল্কুলাস' রেস্তোরাঁয়। বিলে নিখুঁতভাবে আপ্যায়ন করতে জানে। জাফরান আর লাল মরিচের গুঁড়ো ছিটানো বিখ্যাত 'ব্যুআ' মাছের কালিয়াটা চমৎকার রান্না হয়েছিল—এই খাদ্যটা মার্সাইএর গর্ব। স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে ভাইস বলল, 'ঝাল-নোনতা জিনিস খেতে বড়ো ভালোবাসি।'

শহরের প্রায় মাঝখানে চিড়িয়াখানার কাছাকাছি এক জায়গায় একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে খাবার জন্যে চলল ফুজে। মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে সে পায়ে হেঁটে চলেছে। পরের দিন পার্টি-কমিটির কাছে এক খোলা চিঠি পাঠাবে বলে স্থির করেছে সে। র‍্যাডিকাল সংবাদপত্রগুলো যদি চিঠিখানা ছাপাতে রাজি না হয়, তাহলে সে চিঠিটা 'লুমানিতে'র পাঠাবে। কিলমান-সংক্রান্ত তথ্যগুলো সে বর্ণনা করবে তাতে। তারপর দেশের লোকে বিচার করবে কে খাঁটি দেশভক্ত—সে না তেসা?

গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পথ চলেছে ফুজে, এমন সময় বেঁটে-পাতলুন আর বাদামি রঙের খেলোয়াড়ী-কোর্তা পরা দুজন লোক এসে তার গা ঘেঁষে রাস্তার মাঝখানে সামনে থেকে পথ রুখে দাঁড়াল। পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় ফুজে বলল, 'মাফ করবেন।'

'এই দেখ্ তাহলে, শুয়োরের বাচ্চা!

ঘুষি খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল ফুজে রাস্তার ওপর। অন্ধকার রাস্তাটা প্রায় নির্জন। একটা বেড়াল ডাকছে করুণ সুরে। পচা পাতার গন্ধ নাকে এসে লাগে; দক্ষিণ অঞ্চলের দীর্ঘায়িত হেমন্ত শেষ হয়ে আসছে।

সন্ধ্যার সময় হোটেলের বিশ্রামের ঘরটায় তেসা অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে লেবুর রস মেশানো চা খাচ্ছে, এমন সময় তার অল্প-বয়সী সেক্রেটারি দ্রুত পায়ে এল তার কাছেঃ

'ফুজেকে গুণ্ডারা আক্রমণ করেছিল। হাসপাতালে নিয়ে গেছে তাকে। পুলিশ বলছে, তার টাকার থলিটা চুরি গেছে।'

'কী সাংঘাতিক কাণ্ড!' বলে উঠল তেসা।

অত্যন্ত বিচলিত আর দুঃখিত হয়ে পড়ল সে; গভীর বেদনা অনুভব করল ফুজের জন্যে। যদি শরীরের ভেতরে রক্তপাত হয়ে ও মারা যায়, তাহলে? একলা! হাসপাতালেই মারা পড়বে লোকটা। মারশাঁদর দিকে ফিরে বলল তেসা, 'অবশ্য রাজনীতিক হিসাবে ফুজে একেবারেই অকর্মণ্য, তবে ভারি করিৎকর্মা ছিল লোকটা...'

'অতি জঘন্য এদের নীতিজ্ঞান! বলি, এই সব গুণ্ডাগুলোকে মার্সাই থেকে ওরা সরাবে কবে?'

'সরিয়ে দেবার সময় এসেছে! আশা করি যারা এ কাজ করেছে তারা সবাই ধরা পড়বে।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে তেসা কাপটা ঠেলে দিল একপাশে। ভয়ানক গরম পড়েছে। মারশাঁদ বরাবরই একটু হাঁদা গোছের, সে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'ও কোন্ চিঠির কথা উল্লেখ করছিল? তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক কি?'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিল তেসাঃ 'তোমার ভাব দেখে মনে হয়, যেন ফুজেটাকে তুমি কোনো দিন চেনো না। ও একটা উন্মাদ! ডন কুইক্সোটের মতই পুঁথির জগতে ওর বাস। হয়ত দাত'-সম্পর্কিত কোন নথিপত্রের চিন্তায় ভরে আছে ওর মাথাটা আর সমস্ত ব্যাপারটা গ্র'দেলের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ওর জন্যে আমি ভারি দুঃখিত।'

পরের দিন তেসা স্বয়ং বক্তৃতা দিল; যদিও তার আর কোনো বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা, নেই, তবু সে খুব একটা স্নায়বিক উত্তেজনা অনুভব করতে থাকল। সুন্দর হল তার বক্তৃতাটি। অন্যান্য বাক্য-বাগীশরা সব পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস্ করল, 'আজ ওঁর এলেমদারী ভারি জবর!' তেসা বলল—পিতৃভূমির প্রতি তার বিনম্র ভালবাসার কথা, যে ভালবাসা আত্ম-আকাঙ্ক্ষা বর্জিত; উদ্ধৃত করল লামার্তিনের কবিতা; তারপর বলল যুগান্তরের ঘর্মসিক্ত আর রক্তরঞ্জিত 'মহাদেশের' কথা:

'এশিয়ার বর্বরতার উই-টিপির আক্রমণের বিরুদ্ধে আর মার্কিণ দেশের সদ্য-তৈরি টোট্‌কা দাওয়াইএর হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করতেই হবে আমাদের। সুপ্রাচীন ধর্মমন্দিরের স্রষ্টাদের মতোই, বিভিন্ন দেশের জনগণকে সাধ্যমত শক্তি যোগাতে হবে নতুন আর উন্নততর ইউরোপ গড়ে তোলার কাজে। কী আমাদের ভিন্ন করে রেখেছে জার্মানির থেকে? একটা নদী, আর গোটাকতক কুসংস্কার। ইউরোপের সীমান্ত এখানে নয়, দূর পূর্বপ্রান্তে সেই সীমান্ত—যেখানে খৃীষ্টীয় বীরপ্রসবিনী পোল্যাণ্ড আজ স্থান ছেড়ে দিচ্ছে আধাপ্রাচ্য এক সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীকে।'

পাগলের মত হাততালি দিল 'তরুণ র‍্যাডিকাল'রা। আর তারপর তেসা যখন বলল, 'কমিউনিস্টরা পপুলার ফ্রন্টের চুক্তি ভঙ্গ করেছে। ওরা জাতি-বহির্ভূত', তখন তারা আর একবার তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল। প্রতিনিধিরা সব মাঝামাঝি রফা-ব্যবস্থায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল, এখন তারা তেসার নেতৃত্ব অনুসরণ করল। তেসাকে সম্মান দেখাবার জন্য মার্ন-এর প্রতিনিধিরা এক ভোজসভার ব্যবস্থা করল; সেখানে সে সগর্বে ঘোষণা করল:

'ইউরোপের আবহাওয়া বদলে গেছে। মনে প্রাণে আমি তরুণদের সহযোগী। অতীত দিনের বুলি আওড়ে কোন লাভ নেই। র‍্যাডিকাল পার্টি বরাবরই অত্যন্ত সজীব। ব্লুমেরই সরকারী ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনতে পারবে বলে আশা করছে, ও আমাদের ওপর একটা আমদানী করা রাষ্ট্রতন্ত্র চাপিয়ে দিতে চায়। সেটি হবে না, আমরা নিজেরাই পার্লামেন্টিয় নিয়মতান্ত্রিকতার নানা ব্যাধি থেকে মুক্ত করব নিজেদের। আমাদের জাতীয় প্রতিভাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং আমাদের পার্টির স্বাধীনতা-প্রেমের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, আমরা সর্বক্ষমতাসম্পন্ন গণতন্ত্র সৃষ্টি করব।'

তেসা যখন ভোজন-পর্বের অতি উপাদেয় আহার্য দ্রব্যগুলো হজম করছে, তখন সে খবর পেল—শহরের মাঝখানে আগুন লেগেছে। তেসা কোনদিনই সাংঘাতিক কোনো দুর্ঘটনা পছন্দ করে না। ছেলেবেলায় যখন কোথাও অগ্নিকাণ্ড বা বন্যা দেখতে অন্য ছেলেরা ছুটে যেত, তখন সে চটে উঠত! ভয়ংকর কোনো কিছুর দৃশ্যে আশঙ্কায় ভরে ওঠে তার মন। কিন্তু এখন সে ভাবল দুর্ঘটনা-স্থলে গিয়ে হতভাগ্য শহরবাসীদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আসা দরকার।

মনিহারীর দোকান 'বিশ্বভাণ্ডার' দেশলাইয়ের বাক্সের মতো জ্বলছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলে এই সময়টায় উত্তর-পশ্চিমগামী একটা ঝড় বইতে থাকে; ফলে রাস্তাটার অন্য দিকে যেদিকে শ্রেষ্ঠ সব হোটেলগুলো রয়েছে সেদিকেও আগুনটা ছড়াল। কানবিএরের পথ আগলে রাখা হয়েছে। পুলিশরা তেসাকে দেখেই সেলাম দিতে থাকল, আর কর্মব্যস্ত ভাব ফুটিয়ে তুলতে লাগল, ধোঁয়ায় কাশি এসে গেল তেসার। মোটা এরিও তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কী নারকীয় কাণ্ড, দেখো দিকি! আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার কোনো বন্দোবস্ত শহরে নেই! লিয়'র দমকলকে খবর দিয়েছি। কিন্তু তারা যে কখন পৌঁছবে

ভগবান জানেন!' রাস্তায় লোকে বলাবলি করছে, আগুন লাগলে অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় গোটাকতক দোকানী-মেয়ে আগুনে মারা পড়েছে। লেখকের দলের ছোঁড়ারা সম্মেলনের কথা ভুলে হোটেলগুলোর ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে, আর হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই পকেটস্থ করছে। ভিড়ের লোকরা চটে উঠে বলাবলি করছে: 'একটাও সিঁড়ি নেই! জলের নল নেই!' ফ্যাশিস্টরা একটু প্রচার করে নেবার সুযোগ নিয়েছে: 'গোটা সরকারী ব্যবস্থাটায় ঘুণ ধরে গেছে। এরকম কোনো ঘটনা ইতালীতে ঘটতে পারত কি?'

এক মুহূর্তের জন্যে তেসা দৃশ্যটার তারিফ করল। আগুনের শিখাগুলো লম্বা ধাড়িটার মাথার ওপর দিয়ে লাফ মারছে ধোঁয়ায় আঁধার আকাশের দিকে। আকস্মিক বিপৎপাতের ভয়ংকরতা সত্ত্বেও তার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটা একটা আতশবাজির মতই—খুব সাংঘাতিক কিছু নয়। তারপরে সে নিজের হুঁশ ফিরিয়ে আনল, ভুরু কুঁচকে ভাবল—এটা একটা জাতীয় দুর্ভাগ্য। ব্রতেই অবশ্য এই অগ্নিকাণ্ডের সুযোগ নেবে। কী যোগাযোগ—ঠিক সম্মেলনের সময়েই কিনা ঘটল। শহরের পৌরসভায় যে সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য, র‍্যাডিকালদের নয়, এটা ভালো কথা। যে শহরে দশ লক্ষ বাসিন্দা, সেখানে একটাও আগুন-বাঁচানো সিঁড়ি নেই—কথাটা শুনে কি বলবে ভীইয়ার? যতো সব ফালতু লোকের কাণ্ড আর কি! ব্যাপারটা থেকে এরিও খানিকটা তারিফ কুড়িয়ে নিল—এই যা আফসোস; লিয়'তে ও সব ব্যবস্থা মজুদ রেখেছে। আর ওই হতভাগী দোকানের মেয়েগুলো...কী ভয়ানক কাণ্ড! কী সাংঘাতিক!

তেসা যে হোটেলটায় আছে, সেটা আধাআধি পুড়ে গেছে। স্থানীয় আদালত-বাড়িতে মন্ত্রীদের ঘর দেওয়া হল আর জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া হল। প্রতিনিধিদের অনেকেরই কাগজপত্র, দলিল, ইত্যাদি চুরি গেছে দেখা গেল। তেসা গর্বের সঙ্গে তার হাত-ব্যাগটা নাড়াচাড়া করল—লুসিয়'র ব্যাপারটার পর থেকে সে খুব সাবধান হয়ে উঠেছে। তার ক্ষতিটা অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। আর প্রসাধনের বাক্সটা ছাড়া আর কিছু হাতাতে পারেনি ওরা—কিন্তু ভারি সুন্দর কচ্ছপের খোলা দিয়ে ফিট করা ছিল এই বাক্সটা। আদালত বাড়ির অভ্যর্থনা গৃহের উনুনটায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল; আগুনের প্রসন্ন শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে তেসা কানেবিএর-এর অগ্নিকাণ্ডের কথাটা স্মরণ করল: যাই হোক, ভারি সুন্দর দেখতে লাগছিল দৃশ্যটা। হেসে দালাদিএকে বলল:

'খুব সামান্যই ক্ষতি হয়েছে। মাত্র একটা প্রসাধনের বাক্স...'

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে দালাদিএ। এই অগ্নিকাণ্ডটায় সে একটা 'অশুভ লক্ষণ' দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তেসা দিব্যি খোশ মেজাজে আছে, আর একবার সে সম্মেলনে নিজের জয়লাভের কথাটা ভাবছে। একটা অগ্নিকাণ্ডের মত ছোট খাটো ঘটনায় কি যায় আসে। এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাপারটা ভুলে যাবে সবাই। কিন্তু ফ্রান্সের নীতি নির্ধারিত হয়ে গেল আগামী কয়েক বছরের মতো। একটা নবযুগের আরম্ভ হতে চলেছে। আর একটা সংকট দেখা দিলেই পল তেসা দেশের পুরোভাগে চলে আসতে পারবে।

চোখ বন্ধ করে একটা আরাম-কেদারার গহ্বরে সে বসে আছে, এমন সময়ে এক টেলি-গ্রাম এল তার হাতে: পারিবারিক চিকিৎসক জানাচ্ছেন, আমালির অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে।

চোখের জলের নোনতা স্বাদ মুখের মধ্যে অনুভব করল তেসা; কিন্তু সংযম বজায়

রাখল সে। নীল কাগজখানা এগিয়ে দিল দালাদিএর দিকে।

'এক্ষুনি পারী ফিরে যেতে হবে আমায়, কিন্তু কিছু যাবে আসবে না তাতে— কালকের অধিবেশনটা নিতান্ত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে। তুমি কিন্তু ঠিকই বলেছিলে— অগ্নিকাণ্ডটা সত্যই দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। না, না, ভেঙে পড়িনি আমি। আমি আত্মসংবরণ করেছি।'

কুড়ি

আধা-অন্ধকার ঘরটায় দুটো মোমবাতি জ্বলছে। লিলি ফুলের গন্ধটা কেমন যেন অস্বস্তিকর। আমালির মুখখানা শান্ত দেখাচ্ছে, এমন কি, শারীরিক যন্ত্রণা আর উদ্বেগ থেকে মুক্তির অনুভূতিতে যেন একটা সুখের ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে। তেসা বসে আছে বিছানার পাশে: ঘটনাটা এখনো যেন সে সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেনি, ছত্রিশ বছর কাটিয়েছে সে স্ত্রীর সঙ্গে; আমালিকে সে সর্বদা নিজের পার্শ্ববর্তিনী হিসাবেই জানত— দুর্ভাবনাগ্রস্ত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট আমালি। মৃত্যুর পরেও সে যেন বেঁচে আছে। তেসা যখন মনে মনে বলল, 'ও আর নেই,' তখন কথাটা শোনাল নেহাৎ মামুলি বুলির মতই। বেঁচে আছে আমালি : গোধূলির আলো এসে পড়েছে তার মুখে, চারদিকে ফুল আর কেঁপে কেঁপে ওঠা মোমবাতির শিখার দিকে তাকিয়ে তেসা অতীতে ফিরে গেল। যে কোন কারণেই হোক, নিজের ছাত্রজীবনের চ্যাংড়ামিগুলো মনে পড়ল তার। সব কিছু যেন ভেসে উঠল এক উজ্জ্বল আবছায়ার ভেতরে। মনে মনে সে ভাবল, 'এটা ঠিক না।' দুঃখটা কমে আসছে বলে মনে হওয়ায়, একমাত্র আমালির দুঃখেই মনটাকে একাগ্র করে রাখতে চাইল। ইদানীং অনেকদিন সে আর আমালির জন্যে ফুল কিনে আনেনি। এক সময়ে সে স্ত্রীকে নিয়মিত ফুল এনে দিত। প্যান্সি আর আনিমোন আমালির বড় প্রিয় ছিল। কি ভাবে তাদের প্রথম দেখা হল সে কথা মনে পড়ল তেসার।

তখন বসন্তকাল,—তার আগের বছর তেসা কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। তেসা তখন 'লাতিন কোয়ার্টারে' থাকে, চওড়া কানাওলা টুপি পরে, গলাবন্ধনী ফিতেটা ঢিলে করে বাঁধে, জোরের বক্তৃতা আর রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের তারিফ করে, একক এবং অদ্বিতীয় প্রেমে বিশ্বাস কর—কিন্তু কোনো চাকরানী বা মজুরনীকে দেখলেই তার পেছন ধরে আর চেঁচায়: 'আমাদের রক্তে শ্রমিকের রক্ত সঞ্চারিত হোক!' আর, গেলাশ দুয়েক হাল্কা-নেশা-ধরানো পানীয় খাবার পর হয়তো কোন বিমুগ্ধা শ্রমজীবিনীর কানে কানে রেমী দ্য গুর্ম'র কবিতা আবৃত্তি করে:

'ক্ষমতার স্পর্শ লভুক তোমার কলঙ্কী ওই বুকের চূড়া দুটি
'মুক্ত-বসন ওরা যে আজ ফাগুন-ফুলের প্রায় উঠেছে ফুটি'

আমালির কাছেও সে এই কবিতা আবৃত্তি করত। আমালি তখন উরসুলিন-এ পাদরিদের

ইস্কুল থেকে লেখাপড়া শেষ করে পারীতে ফিরে এসেছে। কবিতাটা শুনে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে কেঁদে ফেলেছিল আমালি, থতমত খেয়ে বলেছিল, 'শোন, পল...' তারপর থেমে গিয়ে ছোট্ট ফিতের রুমালখানা বলের মতো করে দলা পাকিয়ে ফেলেছিল। একদিন তেসা তাকে থিয়েটারে নিয়ে গেল; সেদিন ছিল 'ঈডীপে' নাটকের অভিনয়। বিখ্যাত বিয়োগান্ত-অভিনেতা মুনেসুলি বলে উঠলেন—'কী সাংঘাতিক এই জীবন!' তখনকার দিনে ঘোড়া-গাড়ির চল ছিল, গাড়িগুলোর ছোট ছোট জানলায় ঘন নীল রঙের পর্দা ঝোলানো থাকত. লম্বা টুপি মাথায় দিয়ে গাড়োয়ান বসত সামনের দিকে। বোয়া দ্য বুলোঞ্রে'র এক অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যখন তাদের গাড়িটা চলেছে, তখন তেসা চুমু খেল আমালিকে: লম্বা ফিতে ঝোলানো ঘোমটার মত করে পরা এক টুপি পরে ছিল আমালি। তেসাকে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল, 'কী মধুর!' তারপরে বলেছিল, 'কিন্তু এ যে অন্যায়!' আর আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। আমালির ঠোঁট দুটো ছিল ফুলো-ফুলো, পলেতের মতো......

নিজের ওপর চটে উঠল তেসা। এসব চিন্তা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। সে জানে, এই সব অসংলগ্ন স্মৃতির চেয়ে তার দুঃখ অনেক বেশি গভীর। বারবার সে পুনরাবৃত্তি করল, 'মরে গেছে, আমালি মরে গেছে।' বোধহয় এই উক্তিটা তার দুঃখের প্রকাশ, কিন্তু কথাটা শোনালো সরকারী বিবৃতির মতোই নেহাৎ ফাঁকা। অন্যের সম্পর্কে এই কথাটা কতবার সে উচ্চারণ করেছে? আর এখন তো আমালিকে ডাকলেও শুনতে পাবে না সে। তাই কখনো সম্ভব? খুব পাতলা ঘুম ছিল ওর—হ্যাঁ, এখন থেকে বলতে হবে 'ছিল'। মার্সাইএর সমস্ত বিবরণ, ফুজের ব্যাপার আর ওই অগ্নিকাণ্ডের কথা আমালিকে কিছুই বলা হয়ে উঠল না। কোনো দিন আর কোন কিছু তাকে বলা যাবে না। ওর সেলাইয়ের জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে ওখানে। তেসার জন্যে যে গলাবন্ধটা সে বুনছিল, সেটা শেষ করা হয়ে ওঠেনি। ছুঁচ আর পশমগুলো পড়ে রয়েছে —সেলাইয়ের ঘরগুলো তেসা গুণতে লাগল—তারপর ঘুমে ঢলে পড়ল। ট্রেনে সে দুর্ভাবনায় ঘুমোতে পারেনি।

দেনিসের ঘরে ঢোকার শব্দ সে শুনতে পায়নি। মায়ের মৃত্যুসংবাদ কাগজে পড়ে দেনিস তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল দেনিস—আমালিকে এরকমটি আর কখনো দেখেনি সে। এমন একটি বিচক্ষণতার ভাব ফুটে উঠেছে আমালির মুখে যে দেনিস মনে মনে ভাবল, 'মাকে আমি কোনদিন ঠিকমত চিনে উঠতে পারিনি!' এখন তো সময় চলে গেছে। বাবার দিকে তাকাল দেনিস; ঘুমন্ত তেসার হাঁটুর ওপর একটা সবুজ পশমের তাল। আর ঘর ভর্তি লিলি ফুলে—গির্জায় যেমন থাকে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অসহ্য ঠেকে—দুঃস্বপ্নের মতো। সব কিছুই অত্যন্ত অনাত্মীয় বলে মনে হয়। শুধু মায়ের চোখ দুটো পরিচিত। এই প্রথম দেনিস অনেক দূর থেকে নিজের শৈশবকে প্রত্যক্ষ করল। মায়ের সরু ঠাণ্ডা হাতখানার ওপর নিজের উষ্ণ ঠোঁট চেপে ধরল, তারপর বুঝল—সে কাঁদছে। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে সহজ হয়ে উঠল সব কিছু, কিন্তু তাতে দুঃখটা কমল না, মনের অস্থিরতাটুকুও ঘুচল না। কান্নার শেষে দেনিস নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে; পরিচিত লম্বা বারান্দাটা পার হয়ে বেরিয়ে এল বাহিরে। উকিলের পোশাকপরা তেসার ফটোগ্রাফটা তার দিকে চেয়ে রইল ঠিক আগের মতোই। পথে পথে একটা উৎসবের আবহাওয়া দেখা দিয়েছে; কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পিচ-ঢালা পথের বুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আলোর

প্রতিবিম্ব—কালো, ঘন-বেগুনী, আর রুপলী রঙে জ্বলছে গোটা দৃশ্যটা।

মৃত্যুর আগেই আমালি তার শেষ ধর্মকৃত্য সম্পন্ন করে গেছে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে যাতে কোনো সম্পর্ক না থাকে এমন ভাবে তার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করল তেসা। বামপন্থীদের চটিয়ে লাভ কি—বিশেষত মার্সাই-সম্মেলনের ঠিক পরেই? সমাধি-স্থান-সংলগ্ন গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠল; ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল শবযাত্রা, তেসা হেঁটে চলেছে পুরোভাগে, পেছনে পুরুষরা, তারপর মেয়েরা। মন্ত্রীপত্নীর শবযাত্রা একটা ঘটনা-বিশেষ, 'পারীর সর্বসাধারণ' এসে হাজির হয়েছে এই উপলক্ষে। শতাধিক মোটর-গাড়ি থেমে রয়েছে আশেপাশের রাস্তাগুলোয়—বুরব'-প্রসাদে বিরাট বিতর্কের দিনে, কিংবা থিয়েটারে প্রথম রজনীর অভিনয়ে এই সব গাড়িকেই বাইরে থেমে থাকতে দেখা যায়। বিভিন্ন দলের ডেপুটিরা তেসাকে সমবেদনা জানাতে উদ্‌গ্রীব। এদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়—ভীইয়ার, মারশাঁদ, ব্রতেই আর ওই বুড়ো ঘাগী মারাঁ। আইনজীবীরাও আছে, আর আছে তেসা যে-সব ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রতিনিধিরা, এটর্ণী আর ব্যবসায়ী—ব্যারন রথ্‌স্‌চাইল্ড্‌, দেসের, মিয়েজার, জোলিওর নেতৃত্বে সাংবাদিকের দল, পল মরাঁ, নাট্য-প্রযোজক আর কূটনীতিকরা। এরা বলাবলি করল, জার্মান বৈদেশিক বিভাগের স্থানীয় উপদেষ্টা যে উপস্থিত আছেন সেটা 'ভাল লক্ষণ'। আলাদা একটা লরিতে ফুলের মালাগুলো বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। বিরাট একটা গিঁঠওলা মালাক্কা-বেতের ছড়ি আস্ফালন করে জোলিও সাংবাদিকদের বোঝাচ্ছেঃ 'ফুজে? ও, ওই লোকটা! আরে বাপু, মার্সাই শহরকে তো আমি চিনি...' তেসা এগিয়ে চলেছে ধীর পায়ে, কিন্তু ঘন ঘন রুমালটা বের করে নাক ঝাড়ছে বিষণ্ণভাবে।

পের-লাশেস-এ আমালিকে সমাধিস্থ করা হল। এইটাই পারীর সৌখিনতম সমাধিস্থান। তেসা খরচ করতে কার্পণ্য করল না; সুন্দর দেখে একটা জায়গা বেছে নিয়ে নিজের জন্যেও তৎক্ষণাৎ খানিকটা জমি কিনে ফেলল। এই রকম করাটাই নিয়ম, জীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের এটাও একটা অংশ মাত্র; প্রত্যেকেই তাই করে। জমি-সংক্রান্ত কথা-বার্তা চলল খানিকক্ষণ, প্রতি বর্গগজের অমুক দাম, কিন্তু তেসা আলোচনাটাকে মৃত্যুর চিন্তার সঙ্গে জড়িত হতে দিল না, চুক্তিপত্রে সই করে দিল, 'চিরতরে আমার ব্যবহারের জন্যে রহিল' মান্যগণ্য লোকের কবরের পাশে সমাধিস্থ হওয়াটাই ঠিক। আমালির বাঁ দিকে একজন নৌ-সেনাপতির কবর, ডান দিকে শায়িত আছেন জনৈক সেনেটরের স্ত্রী।

তেসা বহুবার গোরস্থানে এসেছে; মন্ত্রীদের আর ডেপুটিদের সমাধি-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা তার অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু এবার এই সমাধিস্থানটা ভালো করে তাকিয়ে দেখে সে অবাক হল। এ যে রীতিমত শহর! রাস্তাগুলোর নাম আছে, বাড়িগুলোয় নম্বর আছে—না ঠিক বাড়ি নয়, সমাধিগৃহ। আর এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক। ঝোপের শুকনো ডালগুলো ছেঁটে দিচ্ছে মালীটা। অবশ্য কবরগুলো বড় ঘেঁসাঘেঁষি, মৃত্যুর পরে লোকে কেমন যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তবু যা হোক, পাড়াটা ভারি চমৎকার। গোরস্থানটা যে একটা শহর, আর জীবনেরই অন্যতম অংশ, এই কথাটা ভেবে তেসা খানিকটা স্বস্তি পেল।

খোলা কবরের ধারে তেসা দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দূরে লুসিয়ঁর বাদামী মাথাটা চোখে পড়তেই ঘুরে দাঁড়াল সে। লুসিয়ঁটা একেবারে ওর কাকা রবের-এর মতো দেখতে! রবেরটা তো একটা জোচ্চোর...একটা স্মৃতিস্তম্ভের আড়ালে লুসিয়ঁ অদৃশ্য হয়ে গেল। ও আর কিছু ভাবেনি, শুধু মাকে একবার শেষবারের মতো দেখে নিতে এসেছিল—বাড়িতে

যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখানে এসে রুপোলী পাতায় অলঙ্কৃত শবাধার, গোরস্থানের কর্তার লোকজনের মাথায় বাহারে টুপি, ব্রতৈইর চাঁচা-ছোলে মুখ আর জোলিওর ধানশিষের মতো নীল রঙের গলাবন্ধনীর দিকে তাকিয়ে লুসিয় বুঝল, তার মায়ের আত্মা এখানে অনুপস্থিত। ধরা-পড়ে-যাওয়া চোরের মতো নিজের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

শবানুগামীরা সবাই সার বেঁধে দাঁড়াল; যে লোকটা কবর খুঁড়েছে তার পাশ দিয়ে একে একে ঘুরে গেল সবাই, আর যাবার সময় প্রত্যেকে লোকটার হাতেধরা একটা থালা থেকে অল্প একটু ধুলো তুলে নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল। তারপর তারা তেসার কর-মর্দন করল।

তেসা কতবার এইরকম এক টিপ ধুলো তুলে নিয়ে করমর্দন করেছে বিধবা আর বিপত্নীকদের সঙ্গে! কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হল। কনকনে ঠাণ্ডা হওয়া বইছে—চোখে জ্বালা ধরে যায়। তেসা চোখ দুটো কোঁচ-কালো। হঠাৎ তার মনে হল, 'হয়ত আমায় গোর দিচ্ছে এরা? সমাধির জায়গা তো দুটো।' তেসার শরীরটা টলে উঠল। কে একজন হাত বাড়িয়ে ধরল তাকে। চারদিকে তাকিয়ে দরময়-এর দাড়িটা তার চোখে পড়ল; মনে মনে ভাবল, 'আর ওরা কিনা বলে, দরময় আমাকে ঘেন্না করে।'

এতক্ষণে তেসা মুখগুলো লক্ষ্য করতে লাগল—ডেপুটিদের মধ্যে কে কে এসেছে। এর থেকে মনে পড়ে গেল চেম্বারে ভোটগ্রহণের কথাটা, আর সে বেঁচে আছে ভেবে খুশি হল। শুধু একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে।

সন্ধ্যার দিকে তেসা এল পোলেতের কাছে। মনস্থির করবার আগে অনেকক্ষণ ইতস্তত করেছে সে—ওর কাছে গেলে আমালির স্মৃতির প্রতি অসম্মান দেখানো হবে হয়তো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল; তেসা একটু সহানুভূতি আর স্নেহ পেতে চায়। বাড়িটা বড্ড খাঁ-খাঁ করছে, এটা-ওটা প্রত্যেকটা জিনিসই মনে করিয়ে দিচ্ছে আমালির কথা।

পোলেৎ স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী মেয়ে; গলাটা মোটের ওপর বেশ মিষ্টি। পেশাদারী সংগীত-বাসরগুলিতে সে গান গায়, এই সব গানের বিষয়বস্তু কখনো বা অত্যন্ত উচ্ছ্বাস ভরা—নাবিকের বউয়ের বিরহব্যথা কিংবা মরুভূমিতে সৈনিকের মৃত্যুবেদনা নিয়ে রচিত আর কখনো বা অত্যন্ত অশ্লীল। আসলে সে জীবনের যৌন-দিকটাকে অপছন্দ করে। ভালো-মানুষ স্বভাবের মেয়ে সে, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের জন্যেই জন্মেছে; ছোট ছেলেমেয়ে, বাগান আর ছোটখাটো সাংসারিক কাজ ভালবাসে। কৈশোরের এক অত্যন্ত ছেলেমানুষি প্রণয়ব্যাপারের ফলে পোলেৎ ঘটনাচক্রে রঙ্গমঞ্চে এসে পড়ে। তিন বছর আগে তেসার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। তেসার সঙ্গে এই যোগাযোগের ফলে পোলেৎ বেশ একটু গর্ব অনুভব করেছিলঃ তার মত একজন ছোটখাটো অভিনেত্রীর কাছে তেসার মতো এক-জন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী, চেম্বারের ডেপুটি এবং সম্প্রতি যে মন্ত্রী হয়েছে—এমন একজন লোক যে যাতায়াত করে—এটা ভেবে পোলেৎ খুশি হয়। মফস্বলের জনৈক দোকান-দারের অল্পশিক্ষিত মেয়ে সে, ভালো বানান জানে না, ডিটেকটিভ-গল্প ছাড়া আর কিছু পড়েনি কোনদিন। তেসার প্রতি ওর শ্রদ্ধাঃ তেসা সবজান্তা, কথা কইবার সময় অজস্র কবিতা আর লাতিন প্রবচন উদ্ধৃত করে, আর আমেরিকার কথা বলে এমন ভাবে যেন গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালেই দেশটা দেখতে পাওয়া যায়। তেসার জন্যে দুঃখও হয়

পোলেতের; লোকটা কঠিন পরিশ্রম করে, বউটা চিররুগ্ন আর ছেলেমেয়েদের কোনো দরদ নেই বাপের ওপর। তেসাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে পোলেৎ—তার পছন্দ-মাফিক চুল বাঁধে, গলাবন্ধ বুনে দেয়, নানারকম খাবার তৈরি করে খাওয়ায়। অতি-রিক্ত আদর দিয়ে তেসা পোলেতের মাথাটি খেয়েছে; পোলেতের দৃঢ়বিশ্বাস, সে তেসার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আসলে কিন্তু পোলেতের আর একজন প্রণয়ী আছে—আলবের নামে একজন ঘোড়দৌড়ের সওয়ার, এর অস্তিত্ব তেসা কোনোদিন সন্দেহ করেনি। এটাকে পোলেৎ অবিশ্বস্ততা বলে মনে করে না। সপ্তাহে একবার পোলেৎ এই অশ্বধুরন্ধর ছোকরাটির সঙ্গে ফুর্তি করে—লোকটা দৌড়বাজ-ঘোড়ার নাম ছাড়া আর কিছু জানে না; এমন কি ডিটেকটিভ-গল্পও তার কাছে ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। পোলেৎ তার সঙ্গে গল্প সল্প করে না; গলাবন্ধও বুনে দেয় না, খাবার রেঁধে খাওয়ায় না, শুধু তার প্রেম উপভোগ করে নিঃশব্দে আর লোভাতুরের মতো—ক্ষুধার্ত লোকে যেভাবে খেয়ে চলে, ঠিক সেই-ভাবে। আলবের-এর কাছ থেকে চলে আসার পর পোলেৎ দুঃখিতও হয় না, আত্মগ্লানিও অনুভব করে না।

সারস পাখি আঁকা নীল রঙের একটা জাপানী মেয়েদের পোশাক পরে পোলেৎ ঘরে বসে আছে, এমন সময় দরজার ঘন্টিটা বেজে উঠল। তেসাকে দেখে ও অবাক হয়ে গেল, তেসা আজ আসবে বলে পোলেৎ মোটেই আশা করেনি। নিঃশব্দে সে তেসাকে অভ্যর্থনা জানাল, ঘরে গিয়ে পাশে বসল, আর তার জামার কলারটা খুলে দিল। তেসার বড় অদ্ভুত লাগছে নিজেকে, সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতেও পারছে না। গভীর সহানু-ভূতিতে ভরে উঠল পোলেতের মন। কি বললে বুঝে উঠতে পারল না, নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠল। তেসাই প্রথম কথা কইল :

'মার্সাই-এ যখন অগ্নিকাণ্ড ঘটল, সবাই বলল, ওটা দুর্লক্ষণ। আমি ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। সে যাই হোক, মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হতে হয়...'

পোলেতের অনেক কুসংস্কার আছে—মইয়ের তলা দিয়ে যেতে ভয় পায়, আয়না ভেঙে গেলে কান্নাকাটি করে। তেসার কথায় অস্বস্তি বোধ করল সে। হয়তো সত্যিই কোনো অজ্ঞাত শক্তি আছে? কিন্তু তেসা ততোক্ষণে কথা বলতে শুরু করেছে :

'এ সময়ে এরকম ব্যাপার ঘটা বড় সাংঘাতিক! একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছি আমি, অথচ কাজ করে যেতেই হবে আমায়, ওরা সাধারণ-ধর্মঘটের জন্যে তৈরি হচ্ছে। একটা দুর্দৈব ঘটে যাবে, দেখছি। মাত্র একচুলের জন্যে আমরা যুদ্ধটা কোনোক্রমে এড়াতে পেরেছি...'

পোলেৎ পুরনো আর্মাঞাক্ মদের একটা বোতল বের করল। হাত দিয়ে গেলাশটা গরম করে নিয়ে তেসা খেয়ে ফেলল পানীয়টা। আবার ক্লান্তি পেয়ে বসল তাকে—কবরের পাশে যেমন হয়েছিল। সমস্ত ঘুলিয়ে ফেলল সে, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'দুটো জমি কিনেছি, জান?' পোলেৎ মুখ ফিরিয়ে নিল। হেমন্তে একটা হতাশার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে তেসা মনে মনে ভাবল, 'আমিও ঠিক এই রকমই করেছি—আমালির প্রতি।' শার্টের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের বুকটা চেপে ধরল তেসা; দেহের উত্তাপ অনুভব করে স্বস্তি পেল—বেঁচে আছে সে! নিজের জন্যে আর পোলেতের জন্যে আরও খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে পরস্পরের গেলাশে গেলাশ ঠেকিয়ে আওয়াজ করে তেসা বলে উঠল :

'তোমার শুভকামনা করি। আমার স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত করার জন্যে ডাক্তার

কি একটা ওষুধ দিয়েছে। সে তো বলে, আমালি কোনো কষ্ট পায়নি। সে যাই হোক, ঘটনাটা বড় সাংঘাতিক! কি যে ঘটে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমালির পক্ষে ব্যাপারটা সহজ; তার মনে বিশ্বাস ছিল। নরকে যাবার বড়ো ভয় ছিল ওর। কিন্তু আমার ভয়টা কিসের কি জানি। নৌ-সেনাপতি লেপেরিএ-র পাশেই...'

আরেকবার মদ খেল তারা। পোলেত্তের পোশাকের দিকে তাকিয়ে তেসা বলল, 'কী ছেলেমানুষি পোশাক! পাখি আঁকা কেন?'

ঘরটার চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে—যেন এর আগে কখনো আসেনি এখানে। একটা কাঁধ-উঁচু পিয়ানো, দেয়ালে ঝুলছে খুব জাঁকালোভাবে সই করা অভিনেতাদের ছবি, একটা আরাম-কেদারা আর ডজন খানেক উজ্জ্বল রঙের কুশান। আর্মাঞ্ঞাক্ মদটা চমৎকার, ভারি চমৎকার। 'এই মদটা পেলে কোথায়?...ওর সাধ ছিল, পাদরিরা যেন ওকে কবর দেয়। আমার তাতে আপত্তি ছিল না! কিন্তু আমার রাজনৈতিক পদবীটাও তো দেখতে হবে। অবশ্য, ব্রতেই ভারি খুশি হত, কিন্তু বামপন্থী দলটার সঙ্গেও মানিয়ে চলতে হবে আমায়; ওরা ইদানীং বিশ্রী মেজাজে আছে। আর আমালির কাছে এখন সবই সমান—ও তো আর শুনতে আসছে না কিছু। ওকে ডাকলেও আর সাড়া দেবে না...ও সবই আমি ভেবে দেখেছি। পোলেৎ লক্ষ্মীটি, একটা দুঃখের গান শোনাও আমায়।'

'মাগো! তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই...!'

একুশ

হলদে, তামাটে, ধূসর কুয়াশায় ঢাকা নভেম্বরের সকাল। শহরতলীর ঘিঞ্জিতে বিষণ্ণ বাড়িগুলোর ভিজে দেওয়াল থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। এবারের হেমন্তে একটা হতাশার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে জনসাধারণের মন। ১৯৩৬-এর গ্রীষ্মকালে শ্রমিকদের যতোগুলো জয়লাভ হয়েছিল, একে একে তা সবই তারা হারিয়েছে। প্রত্যেকটি সরকারী ঘোষণায় নতুন নতুন বিধিনিষেধ আর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়েছে তাদের ওপর। সপ্তাহে খাটুনির ঘণ্টা বেড়ে গেছে, অতিরিক্ত সময়ের খাটুনির মজুরি কমে গেছে, শ্রমিকদের প্রাণধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত মাইনের ওপরেও আবার কর চাপানো হয়েছে। এলোমেলোভাবে ধর্মঘট বেধে যাচ্ছে। পুলিশ ধর্মঘটীদের হাঁকিয়ে দিচ্ছে কারখানা থেকে, যারা কারখানার দরজায় পিকেটিং করছে, তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে কাঠগড়ায়; আর বিচারপতিরা 'দলের পাণ্ডা'দের ওপর কঠিন দণ্ডদান করেছেন। দেশ শাসন করছে যারা, তাদের মধ্যে আছে—দালাদিএ, যে অল্প কিছুকাল আগেও প্লাস্ দ্য লা বাস্তিল-এ মুঠি-আস্ফালন করে বলেছিল, 'আমি রুটিওলার ছেলে, জনগণের বন্ধু'; আর আছে তেসা, যার পক্ষে পোয়াতিএরের কমিউনিস্টরা ভোট দিয়েছিল। দেশ জোড়া গভীর হতাশা। খবরের কাগজের কাটতি কমে গেছে। সভা-সমিতিতে হলঘরের অর্ধেকটাও ভর্তি হয় না। মজুররা জড়ো হয় যে সব কাফেতে, সেখানে একটা ক্লান্ত নিস্তব্ধতা নেমেছে। স্পেনের

মৃত্যুযন্ত্রণা লক্ষ্য করে সবাই বলাবলি করছে, 'এবার আমাদের পালা।' মজুরদের ওপর জুলুম চালালে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে তা ভেবে দালাদিএ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সকে যে কী গভীর ক্লান্তিতে পেয়ে বসেছে, সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই; আর তার প্রতিপক্ষের লোকেরা তো স্বপ্ন দেখছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলো একদিনের জন্যে সাধারণ ধর্মঘট করবে বলে স্থির করল। অনেকদিন আগে থেকেই তারা ধর্মঘটের তারিখ ঘোষণা করে দিল। তেসা আমালির সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে চাঙ্গা হয়ে উঠল; সে হল প্রধান নির্দেশদাতা। আর একবার দেওয়ালগুলো ছেয়ে গেল সাদা ইস্তাহারে—সামরিক আদেশজারি হয়ে গেল; রেলকর্মীদের, যুদ্ধোপকরণ তৈরির কারখানার শ্রমিকদের আর অন্যান্য সর্বজনীন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সাধারণভাবে সৈনিকদের সমপর্যায়ভুক্ত করে নেওয়া হল। গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করল, যে ধর্মঘট করবে তাকেই সৈন্যদলত্যাগী হিসাবে গণ্য করা হবে। আত্মসন্তুষ্টির হাসি হেসে তেসা জাহির করল, 'ফন্দিটা আমারই। একবার খালি চালু করতেই যা একটু মুশকিল। কিন্তু এখন তো সামরিক আদেশজারিটা বলতে গেলে একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই বুঝে নিয়েছে সবাই।'

তেসার সঙ্গে আলোচনার পর জোলিও তার কাগজে লিখল, হরতাল করা মানেই জার্মানদের খপ্পরে গিয়ে পড়া—'ফরাসীগণ! মস্কো-মোহমুগ্ধ গ্রীকদের উপহার লইতে বিরত হউন!'

দেসেরের পরাজয়টাই সাম্প্রতিক আলোচনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছে। কারখানা মালিকদের এক সভায় সে আপোসরফার কথা তুলেছিল : শ্রমিকরা প্রস্তাবিত ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেবে আর সরকার পক্ষও নতুন যে সব আদেশ জারি করা হয়েছে সেগুলো পুনর্বিবেচনা করে দেখবে। মালিকরা রাগে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল : তারা কি কমিউনিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে নাকি? দেসের বৃথাই বোঝাতে চাইল, 'যুদ্ধের হুমকি আমাদের সামনে। এ সময়ে শ্রমিকদের চটানো ঠিক নয়।' সক্রোধে গর্জন করে উঠল মঁতিনি, 'ওসব বন্ধ করে দেবার সময় এসেছে। হিটলার আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। হরতাল করতে দাও একবার তারপর ওই কমিউনিস্টদের সাফ করে দেব কারখানা থেকে।'

বগল থেকে থার্মোমিটারটা বের করে নিয়ে ভাইয়ার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'সাড়ে নিরানব্বুই।' ইনফ্লুয়েঞ্জা তাকে দায়িত্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। র‍্যাডিকালদের নীতিতে ভারি বিরক্ত হয়ে সে বলেছে, 'ওরাই মজুরদের ঠেলে দিচ্ছে কমিউনিস্টদের কোলে। এর পরিণামে বিপ্লব বাধবে আর ফ্যাশিজম জয়ী হবে।' ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হবার আগে অস্পষ্ট ভাষায় লেখা এক প্রবন্ধে সে বলেছিল, 'প্ররোচনার বিপদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সরকারের নতুন আদেশ-জারির বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে যদি শ্রমজীবীরা অসহযোগ করে বসে, তাহলে সেটা একটা জাতীয় দুর্বিপাকে পর্যবসিত হতে পারে।' সে হরতালকে সমর্থন করেনি, নিন্দাও করেনি। কিন্তু তার বন্ধুদের মধ্যে দু-চারজন শ্রমিকদের আবেদন জানিয়েছে ধর্মঘট না করবার জন্যে।

পারীর বাসিন্দারা সকালে তাদের ঘরের জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে ভাবল, আজ কি ঘটে যায় কে জানে! কাফের আড্ডাগুলো জমজমাট করে তুলেছে তারা। বিষম কুয়াশাচ্ছন্ন আজকের এই সকালটা। কিন্তু কারখানাগুলোর কাছাকাছি শিরস্ত্রাণগুলো ঝলসে উঠেছে। রেল স্টেশনে, সরকারী আপিসে আর

ডাকঘরগুলোয় স্পেশ্যাল পুলিশ-বাহিনীর ছোট ছোট দল মোতায়েন আছে। বাসচালকদের পাশে একজন করে পুলিশ বসে রয়েছে। ঘোড়ার লেজের ঝালরওলা পিতলের শিরস্ত্রাণ শোভিত শান্ত্রীরা রাস্তায় পায়চারি করছে এদিক ওদিক। সবাই বলাবলি করছে—কঠিন সাজার কথা, সারবন্দী অপরাধীর দল, আর লম্বা হাজতবাস...

প্রবীণ মজুরদের মধ্যে একটা থমথমে নিরুৎসাহ ভাব; ধর্মঘট ভেঙে যাবে বলে ওদের সন্দেহ। আজকের দিনটা দেনিসের পক্ষে সংগ্রামে দীক্ষিত হবার দিন। গভর্ণমেণ্ট যে এ আঘাতের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। তারপর হবে এ কলঙ্কের অবসান। পারীর মজুররা বাঁচাবে স্পেনকে, যে স্পেন হৃতশক্তি হয়েও আজও বেঁচে আছে।

আজকের এই দিনটির জন্যে দেনিস অনেকদিন ধরে তৈরি হচ্ছে। এক-একবার মনে হয়েছে, হয়তো ততখানি শক্তি, সব দিক সামলাবার ক্ষমতা আর সাহস তার নেই। সে অনুভব করেছে—মিশোর চিঠি থেকে এব্রোর যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা যদি সে পড়ে শোনায়, তাহলে দুর্বলচিত্তদের মনে লজ্জা জাগবে। যদি কোনো মিলিটারী এসে তাকে বাধা দেয়, তাহলে সে তাকে বলবেঃ তোমরা আমাদের ভাই! দেনিসের শুকনো, জ্বল-জ্বলে দুই চোখে তার মানসিক অতিপ্রয়াসটা প্রকাশ পাচ্ছে।

শ্রমিকদের এক সভা চলছিল। কেউই কাজে যায়নি। এমন সময় একজন এসে খবর দিল, ঢালাই-ঘরের মজুরদের একটা অংশ কাজে যোগ দিয়েছে। শ্রমিকরা 'তরুণ যোদ্ধা'র গানটি গাইবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বিষণ্ণ এক নিস্তব্ধতার মধ্যে তাদের গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। বড়ো ইঞ্জিনীয়ার কারখানা-ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে ঘিরে রয়েছে কতকগুলো সাধারণ পোশাক-পরা পুলিশের লোক; ওদের একজনকে একটা রিভলবার আস্ফালন করতে দেখা গেল। ইঞ্জিনীয়ার বললেন, 'তোমরা যদি কাজ করতে না চাও, তাহলে আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, এ জায়গা ছেড়ে চলে যাও।' তীব্র প্রতিবাদের চিৎকারে তাঁর কথার উত্তর এল! ইঞ্জিনীয়ার হাত নেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু পুলিশগুলো থেকে গেল। তারপর মজুররা নিচু গলায় আলোচনা শুরু করল—তাদের কি করা উচিত।

'ঢালাই-ঘরে ওরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

'কিচ্ছু হবে না এই ধর্মঘটে।'

দেনিস চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেড্‌স!'

সাধারণ পোশাক-পরা পুলিশের লোকরা তাকে ধরে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। একজন মুচড়ে ধরল তার হাতটা।

মজুরদের মধ্যে জনকতক কাজে যোগ দিল; বাদবাকি সরে পড়ল। যারা ততোটা নিরীহ নয়, তাদের মধ্যে জন বারোকে বাইরে কারখানার আঙিনায় ধরে আনা হল। পাশের একটা রাস্তায় পুলিশের একটা কয়েদী চালান দেবার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গ্রেপ্তার-করা লোকদের ওরা পাঁজাকোলা করে ছুঁড়ে দিল গাড়িটার মধ্যে; এই ছুঁড়ে দেবার প্রক্রিয়াটার ফলে একজনের দাঁত ভেঙে গেল। দেনিসের পোশাক ছিঁড়ে দিল ওরা। কমরেডদের সে বলল, 'আমাদের লোকরা কেউ নড়বে না!' নিজের গ্রেপ্তার হওয়া আর শারীরিক বেদনাটাকে সে দেখছে কাজের পুরস্কার হিসেবে। সঙ্গী কমরেডদের দমে যাওয়া ভাব কিম্বা হাজতের নোংরা অন্ধকার ঘর—কিছুতেই তার উৎসাহ কমবে না।

পুলিশ তাকে খানাতল্লাসী করল। গোঁফওলা শান্ত্রীটার মুখে মদের গন্ধ; মোটা চওড়া হাতটা দেনিসের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতে দিতে লোকটা কতকগুলো অশ্লীল টিপ্পনী কাটল। ফাঁকা চোখে দেনিস তাকিয়ে রইল, যেন সে সেখানে নেই। তার একমাত্র চিন্তা, ধর্মঘট কি করে চলবে।

পারীর অন্য প্রান্তে, বিলাঁকুর-এ 'সীন' কারখানার ওপর হামলা চালাবার আয়োজন চলছে। দেসের তার টেবিলের কাছে ঘোলাটে চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছে। পাইপটা জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নিভন্ত অবস্থাতেই রেখে দিয়েছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার; বাঁ হাতে আর কাঁধে বেদনা হয়েছে; অস্পষ্টভাবে ভাবছে, হৃৎপিণ্ডে বাত ধরল কিনা। জীবনে এই প্রথম দেসের একটা অসহায় ভাব অনুভব করছে। মালিকদের মূর্খতা আর দূরদর্শিতার অভাব দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। ওরা সবাই অন্ধ। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে? ধর্মঘট বন্ধ করার জন্যে সে যথাসাধ্য করেছে। দালাদিএ, তেসা, ফ্রুসার—এদের সঙ্গে আলোচনা করেছে, নিজের যুক্তি বিস্তারিত করেছে, ওদের নিজের মতে আনবার চেষ্টা করেছে। ওরা তার কথা ভদ্রভাবে শুনে গেছে, তারপর বলেছে, 'কমিউনিস্টদের সাবাড় করে দিতেই হবে আমাদের।' শিল্পপতিরা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের দাবি জানিয়েছে। তারা দেসেরকে বলেছে, 'তুমি আমাদের সমিতির একজন সভ্য।' দেসের ভেবেছিল নিজের কারখানাগুলো দু-একদিনের জন্যে বন্ধ রাখবে। অবস্থাটা এইভাবে সামলানো যেত, জোর-জবরদস্তি প্রয়োগেরও কোনো দরকার হত না। কিন্তু তেসা চেঁচাতে লাগল, 'বিশ্বাসঘাতকতা! একথা শুনে চেম্বার কি বলবে?' ইঞ্জিনীয়াররা গজ্‌রাতে লাগল, "গভর্ণমেন্ট যদি কমিউনিস্টদের শায়েস্তা না করে তাহলে আমরাই প্রতিরোধ-সংগঠন গড়ে তুলব।' মঁতিনি ভীষণ গণ্ডগোল বাধাবে বলে শাসাল। সুতরাং দেসেরকে পথ ছেড়ে দিতে হল। সে রইল শুধুমাত্র একজন দর্শক হিসেবে। আর, এখন সে বসে রয়েছে তার টেবিলের সামনে, ক্লান্ত ভাবে অপেক্ষা করছে ঘটনার সংবাদের জন্যে।

লেগ্রের আশঙ্কা হচ্ছে, ধর্মঘট ভেঙে যাবে। মজুররা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বিশ্বাসের জোরও হারিয়েছে। কিন্তু মালিকরা হুমকি দেখানোয় তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; চেঁচিয়ে বলল, 'ডরাই না তোমাদের এমন কি, হরতাল করবার বিরুদ্ধে ছিল যে সব মজুর, তাদেরও আর কিছু বলার রইল না। ধূসর কুয়াশার মধ্যে লাল ঝাণ্ডা উড়তে লাগল। কারখানা-ঘরে আর মিলের আঙিনায় লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হল শ্রমিকরা।

কারখানা আপিস কুঠিতে ইঞ্জিনীয়াররা সবাই পিয়েরকে ঘিরে ধরল; বলল, 'বক্তৃতাবাগীশ!', 'মস্কোর দালাল'! রাগে পাগল হয়ে পিয়েরও চিৎকার করে জবাব দিল, 'ফ্যাশিস্ট! ন্যাৎসী!'

প্রায় ঘুষোঘুষি বাধে, এমন সময় দেসের ডেকে পাঠাল পিয়েরকে, বলল, 'বাড়ি যাও তুমি। ভারি বিশ্রী ব্যাপার। এটা ১৯৩৬ নয়। ওরা চেয়েছিল যাতে ধর্মঘটটা বাধে। আর তুমি শুধু শুধুই মাথা খুঁড়ছ। ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে ওরা তোমাকে পাকড়াও করবে। তখন আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না।'

'আপাতত আমি নিজের কথা ভাবছি না।'

'ভুল করছ। তোমার স্ত্রী-পুত্র আছে। আদর্শবাদের কথা যদি বল, ওসব ছাড়! তোমরা তো ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছ যে ভীইয়ারটা একটা বুড়ো সঙ। অন্যেরাও তাই। তোমার এখন গায়ের চামড়া বাঁচাতে হবে।'

'আপনি তাই করছেন বটে। হ্যাঁ, চামড়া বাঁচাবার চেষ্টাই করছেন আপনারা। মিউনিকে তাই করেছিলেন, এখানেও করছেন। কিন্তু এবারে আপনারা আর পারবেন না।' পিয়ের যখন বাইরে এল, শ্রমিকদের মধ্যে হাজার হাজার বজ্রমুষ্টি উত্তোলিত হলঃ 'ইঞ্জিনীয়ার দ্যুবোয়া আমাদের সঙ্গে আছেন!' এই কর্কশ-স্বভাব, ক্রুদ্ধ লোকগুলোর আন্তরিক প্রীতি এসে পৌঁছল তার কাছে।

পুলিশের বড়কর্তা ভিড় দেখে আতঙ্কিত হয়ে দেখা করতে এলেন দেসেরের সঙ্গে।

বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে দেসের বলল, 'আমার কিছুই করার নেই। তোমাকেও পরামর্শ দিই, পীড়াপীড়ি একদম কোরো না।'

'দুর্ভাগ্যবশত, আমার ওপর হুকুম আছে।'

পুলিশ দেখে মজুররা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের মধ্যে কারও কারও হাতে ইঁট কিম্বা লোহার ডাণ্ডা। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছাড়বার পাইপ বাগিয়ে ধরল।

ফটকটার কাছে দাঁড়িয়েছিল লেগ্রে।

অদৃষ্ট আর একবার তার হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। মনের কথাটা এখনো সে জেনেৎ-এর কাছে ব্যক্ত করেনি। কিন্তু মাস খানেক আগে থেকে তার জীবনে একটা পরিবর্তন এসেছে। জোসেতের বাবার সঙ্গে পার্টি তহবিলের জন্যে সে দেখা করতে গিয়েছিল। চলে আসার সময় জোসেৎ জিজ্ঞাসা করল, সে কোনদিকে যাবে। লেগ্রে বলল, সে যাবে সুবেনে-র দিকে। 'আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি', বলল জোসেৎ। সময়টা ছিল হেমন্তের এক বৃষ্টি-ভেজা বিকেল। ওরা দুজনে—যে জন্যেই হোক, নদীর কোল-ঘেঁষে ফাঁকা পথটা ধরে সাঁকো পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল। শেষে জোসেৎ বলল, 'তুমি না এলে আমার মন বড়ো খারাপ করে।' লেগ্রে বলল, 'সত্যি?' তারপর বলল, 'আমার বয়স বড্ড বেশি তোমার পক্ষে। আমি—' জোসেৎ কথাটা শেষ করতে না দিয়ে চুমু খেয়েছিল তাকে। আর এখন বেধে গেল এই হরতাল। মনের আবেগকে প্রশ্রয় দেবার সময় নেই লেগ্রের। শুধু মাঝে মাঝে একটা চিন্তা তার মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, 'জোসেৎ-এর কি হল কি জানি!'

ওপরের রসায়নাগার থেকে পিয়ের পুলিশকে ফটক ভেঙে ঢুকতে দেখল। ওরা ছুটে গিয়ে পড়ল লেগ্রের ওপর। লেগ্রে জোয়ান লোক, বাধাও দিল, কিন্তু ওরা ওকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। জানলাগুলো থেকে এক ঝাঁক ইঁট উড়ে এসে পড়ল। পিয়ের ছুটে নেমে এল নিচে। হঠাৎ চোখে একটা ভয়ানক জ্বালা অনুভব করল সে। দরজাটা চেপে ধরল নিজেকে সামলাবার জন্যে।

আঙিনায় লোকজন ছোটাছুটি করছে। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'গ্যাস!'

জানালায় দাঁড়িয়ে আছে দেসের। সমস্তই দেখল সে; বিষণ্ণভাবে নিজেকে শুধোল, 'এই কি ফ্রান্স?' এই কি তার দেশ, যে দেশকে সে ভালবাসে? সে দেশ আর নেই। সেই অমায়িক, খুশি-ভরা ফ্রান্সের দিন গেছে—যে-ফ্রান্সের শ্রমিকরা মালিকদের সহৃদয়ভাবে গাল পাড়ে আর সেই মালিকের গেলাশের সঙ্গে গেলাশ ঠেকিয়ে মদ খায়, যেখানে লোকে অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেবার পরেই ডিনার খেতে বসে, মাংসের তরকারির চমৎকার আস্বাদ পেয়ে 'সমাজ-বিপ্লবের' সব কথা ভুলে যায়, যে দেশের সবাই ভালবাসে ফুল আর রসিকতা। এই কাল্পনিক অলীক ফ্রান্সকে সে বাঁচাতে চেয়েছিল। সে দেশ আজ স্মৃতি-মন্থনে পর্যবসিত; পুঁথির কাহিনীতে, রূপকথার রাজ্যে আজ সে দেশ আশ্রয় নিয়েছে। সেই ফ্রান্সকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় সে—গ্যাস ছেড়ে! যা হয় ওরা করুক গে যাক! এখন আর সামলাবার কোনো

উপায় নেই। নিজেকে বাঁচাবার কথাটা তাকে ভাবতেই হবে, তামাক খাওয়াটা কমাতে হবে, শরীরের যত্ন নিতে হবে। জেনেৎকে ফোনে ডাকবে সে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে, চলে যাবে জাভায় কিম্বা চিলি-তে।

পুলিশ প্রায় একশো জন মজুরকে ধরে নিয়ে গেল। যাদের গ্রেপ্তার করে আনা হল, তাদের নিয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে হাজতের কর্তৃপক্ষ মুস্কিলে পড়ল; আধ ঘণ্টা অন্তর দফায় দফায় লরিতে নতুন লোক এনে হাজির করা হচ্ছে।

পুলিশদের কথাবার্তা দেনিস আগ্রহের সঙ্গে শুনল। ওরা ভয়ানক রেগে আছে। তার মানে, ধর্মঘট সফল হয়েছে। মাঝে মাঝে ঘরে নতুন বন্দীদের এনে ঢোকানো হচ্ছে। একজন টেলিফোন-কর্মী বলল, সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে, হামলা দেখে ভয় পেয়ে গেছে সবাই। সুড়ঙ্গ-রেলপথের একজন শ্রমিককে নিয়ে আসা হল; লোকটার মুখময় রক্ত: একটু জিরিয়ে নিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'কাপুরুষের দল!' সুড়ঙ্গ ট্রেণ চলাচল করছে। সন্ধ্যার দিকে দেনিস জানতে পারল,শুধু বড়ো বড়ো কারখানাগুলোতেই হরতাল চলেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে, এমন সময় পুলিশ আরও তিনজন মজুরকে ঠেলে দিল ঘরের ভেতর।

তারা বলল, 'সিয়েন-এ সবাই হরতাল করেছে। ওখানেই ছিল সবাই শেষ পর্যন্ত। পুলিশ গ্যাস ছেড়েছে।'

'গ্যাস' কথাটা শুনে সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। টেলিফোনের মেয়েটি কাঁদতে শুরু করল! কিন্তু দেনিস দাঁড়িয়ে উঠে গান জুড়ে দিল। অন্যেরাও গলা মিলাল। পুলিশ মার লাগাবে বলে শাসানো সত্ত্বেও গেয়ে চলল ওরা। আশে পাশের জেল-কুঠরীতে যারা রয়েছে তাদের কানেও পৌঁছল সেই গান। জেলের স্যাঁতসেঁতে চামড়ার গন্ধে আর ইঁদুরদের গর্তে ভরা ভাঙাচোরা বারান্দা দিয়ে ভেসে চলল সেই গানের সুর। সেই গানে প্রকাশ পেল সাহস, ক্রোধ আর ভ্রাতৃত্বের আবেগ। 'সিয়েন', 'নোম' আর বেনো কারখানার শ্রমিকরা গলা মিলিয়ে গাইল সাইবেরিয়ার পার্টিসানদের গান।

সন্ধ্যেবেলায় দালাদিএ বেতারে এক বিবৃতি দিল। নিজের পাঠগৃহে একা মাইক্রো-ফোনের সামনে বসে বক্তৃতা দেবার সময় সে ফাঁকা ঘরে শূন্যচোখে তাকিয়ে রইল, তার কপালের শিরা ফুলে উঠল।

'গভর্ণমেন্ট জয়লাভ করেছে।'

মিউনিক থেকে এবং আরো অনেকবার পশ্চাদপসারণের পর সে এতদিনে 'জয়লাভ' এই মিষ্টি কথাটা ব্যবহার করতে সমর্থ হল।

বন্দীদের জেরা শুরু হল। 'দেনিস তেসা'—এই নামটা শুনে জেল-দারোগা হাসল:

'তুমি ও'র কোন আত্মীয় নও, আশা করি?'

তার ওপর যে কোন অত্যাচারই হোক না কেন, দেনিস ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়। কিন্তু যে ব্যাপারটাকে সে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে মনে করে, এই লোকটা ঠিক সেইখানেই তাকে ধরে ফেলেছে। প্রথমটায় চুপ করে রইল সে, তারপর ভাবল ব্যাপারটা গোপন করা আরো অপমানজনক।

'আমি আপনাদের মন্ত্রীর মেয়ে। কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে ও ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ নেই। আমি কমিউনিস্ট। আপনারা জেরা চালিয়ে যেতে পারেন।'

চোখ কুঁচকে মুখখানা বিকৃত করে জেল-দারোগা এল জেলের ছোটকর্তার কাছে।

সে বড়োকর্তাকে খবরটা দিল।

তেসা ঘুমোচ্ছিল। 'অত্যন্ত জরুরি' কাজের ঘণ্টাটা বেজে ওঠার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। ভারি গরম গেছে সারা দিনটা। যখন যা রিপোর্ট এসেছে, তেসা সেক্রেটারীর কাছ থেকে সমস্ত জেনে নিয়েছে আর সর্বক্ষণ হাজতের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রেখেছে। অনেক রাত না হওয়া পর্যন্ত সে দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। তারপর রাত তিনটেয় স্নান করেছে। স্নানঘরের টালিগুলো ঝকঝকে সাদা, জলটা যেন নীল রঙের। নিজের সরু পায়ের দিকে তাকিয়ে সে 'রিগোলেত্তো' থেকে গুনগুনিয়ে একটা গানের তান ভাঁজতে শুরু করে দিল। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে ওদের, আর কখনো হরতাল করবে না! এখন শুধু দক্ষিণপন্থীরা যাতে ব্যাপারটাকে খুব বেশি ভাঙিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা না করে, সেটা দেখতে হবে!

আধ-জাগা অবস্থায় সে টেলিফোনের কথাগুলো শুনে গেল: 'আপনার মেয়ে এর সঙ্গে জড়িত।' সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিল। সে এখন পুলিশ-কর্তৃপক্ষের হাতের মুঠোয়! ব্রতেই যে ব্যাপারটা জানতে পারবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? খবরের কাগজগুলোর পক্ষে তো মরশুম লেগে যাবে! কী সাংঘাতিক ডাইনী এই ক্ষুদে মেয়েটা!

জেলের বড়োকর্তার পড়ার ঘরে প্লাস্টারের তৈরি বিজয়লক্ষ্মীর এক আবক্ষ প্রতিমূর্তির পাশে তেসা দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দেনিসকে নিয়ে আসা হল। তার পোশাক ছেঁড়া খোঁড়া, চুল এলোমেলো, মুখখানা বিনিদ্র রাত্রি-যাপনের ফলে বিবর্ণ। এই কিনা তার মেয়ে—যার শরীরের কথা ভেবে সে এত উদ্বিগ্ন, স্বাস্থ্য ভাল করবার জন্যে যাকে সে কতবার পাহাড়ের দেশে নিয়ে গেছে, আর সবচেয়ে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা করিয়েছে। তেসা ক্ষোভটা সামলাবার চেষ্টা করে সংযত স্বরে কথা বলল, কিন্তু গলাটা তার কেঁপে উঠল:

'দেনিস, আমি তোমায় খালাস করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

সে নিজের একটা কার্যক্রম ঠিক করে রেখেছিল: পুলিশের বড়োকর্তাকে সে বলবে—দেনিস জনগণের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছে, সেই জন্যেই সে সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে জেনে নেবার জন্যে একটা কারখানায় ঢুকেছিল। দেনিসকে সে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তার শূন্য গৃহ আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। কী আদরেই সে রাখবে ওকে!

দেনিস বলল, 'তাহলে, আমাদের সবাইকেই খালাস করে দিতে হবে তোমাদের।'

দেনিসের এই কথাগুলো, তার গলার স্বর আর এই অপ্রত্যাশিত 'তোমাদের' বহু-বচন-সম্বোধনে তেসা হতবাক হয়ে গেল।

'দেনিস!'

চুপ করে রইল দেনিস। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভিন্ন জগতের একজন লোক। গতকাল সে তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

তেসা আত্মহারা হয়ে পড়ল। 'খালাস করে দিতে হবে ওই গুণ্ডাগুলোকে? 'কী বলছিস খেয়াল আছে?'

'গুণ্ডা কারা? জার্মানদের বেলায় তোমরা কাপুরুষের মতো ব্যবহার করেছ। দেশ নাকি তৈরি নেই! এভাবে কাজে লাগাবার জন্যেই বুঝি তোমরা গ্যাস মজুদ রেখেছিলে!'

'তোদের ওই কমিউনিস্টরা জার্মানদের দালালী করছে। কাল যখন তোরা

হরতাল করছিলি, তখন ইতালিয়ানরা নীস আর করসিকার জন্যে দাবি পেশ করেছে। এই হচ্ছে ধর্মঘটের প্রথম ফল।'

'তোমরাই জার্মানদের দালালী করছ। বিমান-কারখানার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল কারা? তোমরা যা করেছ, তা আর তোমাদের বলতে হবে না। ফ্রজের মুখ বন্ধ করে দেবার জন্যে তোমরা বোম্বেটেদের লেলিয়ে দিয়েছিলে......'

'মিথ্যে কথা! একেবারে মিথ্যে! তুই এমন বোকা যে যা বলে তাই বিশ্বাস করিস। তোরা ভেড়ার পাল!'

অনেকক্ষণ ধরে সে চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে চলল। তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল, কি লাভ বলে? একটা বিদ্ঘুটে ধারণায় পেয়ে বসেছে ওকে। ওর চোখ খুলে দেওয়া অসম্ভব। ব্যাপারটা চাপা দিতে হবে।

তেসা বলল, 'তর্ক থাক। আমাদের দুজনেরই যার যার নীতিতে বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখতেই হবে। ব্যাপারটা যদি কাগজে বেরোয়, তাহলে আমাদের দু-পক্ষেরই সাধারণ শত্রু ওই ব্রতেই আর তার ফ্যাশিস্ট দল ভারি খুশি হবে।'

'ব্রতেইর চেয়ে তোমরা ভালো কিসে?'

'সব কিছুই তোমরা রাজনীতিতে এনে দাঁড় করাও। হৃদয় বলেও একটা জিনিস আছে। আর যাই হোক, তুমি আমার মেয়ে। তোমার পরলোকগত মাকে স্মরণ কর। কী সহৃদয়া ছিলেন তিনি! দেনিস, আমি তোকে মিনতি করছি, ঘরে ফিরে আয়! তোর মায়ের নামে অনুরোধ করছি!'

দেনিসের আর সহ্য হল না। চেঁচিয়ে উঠল সে ঃ

'চুপ কর! অতি জঘন্য লোক তুমি!'

একথা বলার জন্যে পরে সে নিজেকে দোষ দিয়েছেঃ নিজের যন্ত্রণাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিল সে।

কিছু না করতে পেরে তেসাকে ফিরে যেতে হল। জেল-কর্তার ওপর চাপ দিতে বাধ্য হল সে। দেনিসের গ্রেপ্তারের খবরটা কাগজে অপ্রকাশিত রইল, দণ্ডাজ্ঞার কথাটাও উল্লেখ করা হল না। 'নোম' কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে তারও বিচার হল: সকলের ওপরেই আদেশ হল একমাস হাজতবাসের। খুশি হল দেনিস। আদালতের সভাপতি তার নামটা দ্রুত উচ্চারণে পড়ে গেলেন, এবং তার সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেন না। দেনিস সন্দেহও করল না,—এইটুকুর জন্যে তার বাবাকে কতখানি হাঙ্গামা পোয়াতে হয়েছে।

এর পর থেকে তেসার মনে কমিউনিস্টদের ওপর এক নিদারুণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মে গেল। আগে তার কোনো শত্রু ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্রতেই বা ভীইয়ারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধেছে, কিন্তু তারা হচ্ছে রাজনীতির খেলায় অংশীদার। এমন কি ফ্রজের জন্যেও সে দুঃখিত, যদিও ওই দাড়িওলা গোঁয়ারটা তার গায়ে কালি ছিটোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা দেনিসকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। শান্ত স্নেহ-ময়ী একটি মেয়েকে ওরা করে তুলেছে নারীত্ব-বর্জিত রণরঙ্গিনী। ওই রকম স্ত্রীলোকেরাই ১৭৯৩-তে গিলোটিনের আশেপাশে নেচে বেড়িয়েছে। ওটা আবার একটা রাজনৈতিক দল হল কিসে? ওটা তো একটা আধ্যাত্মিক জাহান্নাম। ওদের ধ্বংস না করতে পারলে ওরা চরম অত্যাচার চালাবে, ছোরা মারবে, গলা টিপে ধরবে। তেসাকে ওরা ছার-

পোকা বলে মনে করে। কিন্তু ফ্রান্স এখনো খাড়া আছে! হরতাল তো ভেঙে গেছে। তার মানে, আমরা বাঁচবই। এবার একটু বিশ্রামের জন্যে একবার পোলেতের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

বাইশ

পিয়েরকে ছাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা দেসেরের ছিল না। নিজের অসহায় অবস্থাটাই তাকে বিরক্ত করে তুলেছে; মন্ত্রীরা এসে যার তোষামোদ করে গেছে সেই দেসেরকে আজ একদল ক্ষুদে-মালিকের কাছে মাথা নোয়াতে হবে ভাবতেও পারা যায় না, কিন্তু সে যাই হোক, পিয়েরকে কারখানায় বাহাল রাখা সম্বন্ধেও সে মনস্থির করে উঠতে পারেনি—দক্ষিণপন্থী কাগজগুলো 'লাল ইঞ্জিনীয়ার'টির সব খবর ছাপিয়ে দিয়েছে। পিয়েরকে সে বলল, 'আমি তোমায় আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব, একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে তোমায়।' পিয়ের রাজি হল না; এটা একটা মন-রাখা গোছের ব্যাপার বলে তার মনে হল।

বড়ো একটা কাফের বারান্দায় বসে তারা কথা বলছিল। অস্বাভাবিক রকমের শীতার্ত এই সন্ধ্যাটা, হিমাঙ্কের নিচে চার ডিগ্রি। খদ্দেররা গাল ফুলিয়ে হওয়া ছেড়ে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ছে এক গেলাশ মদ খেয়ে শরীরটা গরম করে নেবার জন্যে। খালি বারান্দাগুলোয় শুধু নিচু চিমনিওলা উনুনগুলোর লাল্‌চে আভাটুকু দেখতে পাওয়া যায়।

'অবশ্য আমার ওপরে তোমার অবিশ্বাসটুকু সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত', দেসের বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা হল গিয়ে—আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সংস্কার আর পাঁচজনের মতামতের বাঁধনে বাঁধা। যেমন ধর, মজুরদের মধ্যে হয়তো এমন অনেক ভালো লোক আছে যারা হরতালের বিরুদ্ধে, কিন্তু কিছু করবার সাধ্য নেই তাদের। মঁতিনি মহোদয়ের মতামত বিবেচনা করে দেখতে আমি বাধ্য। তোমাদের ভাষায় ও ফ্যাশিস্ট; আমার ভাষায়, ও একটা গেঁয়ো বোকা। বিমান বাহিনীর অভাবে ওরা কং-কে দায়ী করে গালাগালি দিচ্ছে। কিন্তু তুমিই তো ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে একজন, সুতরাং তোমাকে বরখাস্ত করতে আমি বাধ্য। ওরা বোমারুর কি ধার ধারে? ফ্রান্সের জন্যেই বা কি ধার ধারে?'

এক সময়ে অন্যের ওপর পিয়েরের অগাধ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ইদানীং সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ আর স্পষ্টবাদী হয়ে উঠেছে। তার মনে হল, দেসেরের অভিযোগগুলোর মধ্যে কপটতা আছে।

সে বলল, 'ওদের দোষ দিচ্ছেন কেন? আপনিও তো মিউনিক চুক্তির পক্ষে ছিলেন।'

'আমি চেয়েছিলাম সশস্ত্র শান্তি, পরস্পরের মধ্যে আলোচনা আর আপোস-রফা। কিন্তু ওরা শুধু সাত তাড়াতাড়ি হিটলারের দয়ার ওপর নিজেদের ছেড়ে দিতে চায়। কি যে হচ্ছে আর কি যে হবে তা শুধু ওই বদ্‌মাইসগুলোই জানে, যা পায় তাই হাতিয়ে নেবার

জন্যে ওরা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু খাঁটি লোক যারা তারাও চোখ বন্ধ করে আছে অন্ধের মতো।'

পিয়ের বলল, 'কিন্তু আর পাঁচজনও তো আছে। লেগ্রের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল কি? পুলিশের হাতে মার খেয়ে ও এখন হাসপাতালে। ওর মতো আরো অনেক আছে। মানুষের মনের ভাব আর চিন্তা হাজারো রকম—এগুলো একটা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নেয়। এরই তাগিদে লোকে শিল্প সৃষ্টি করে, আরাম খোঁজে, পরিবার গড়ে তোলে। কমিউনিস্টদের কথা বলছি কেন? কারণ তারা একটা জিনিসের 'ওপর মনটাকে একাগ্র করে আনে। এটা অন্ধতা নয়, একটি লক্ষ্যে তাকাবার ক্ষমতা।'

দেসের বলল, 'ওই নিচু-চিম্‌নিওলা উনুনগুলো দেখছ? ওগুলো বেশ একটা উষ্ণতার মোহ সৃষ্টি করে—যেন গোটা রাস্তাটাই গরম করে তোলা যায়! হ্যাঁ, এর থেকে মনে পড়ে গেল, একেবারে জমে যাচ্ছি আমি। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করি—তুমি এখনো গররাজি?'

পিয়ের আশা করেছিল, আনে তার ওপর চটবে। এখন তো বেকার অবস্থায় দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, তার ওপর আছে দুদুর ভাবনা। কিন্তু আনে তৎক্ষণাৎ বলল, 'ঠিক করেছ তুমি।' রাজনীতির আলোচনায় পিয়েরের মতামতকে সে সমর্থন করে না, কিন্তু যখন আত্মসম্মান আর স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে, তখন সে পিয়েরকে দেখে শ্রদ্ধার চোখে—বালিকা-বয়সে সে তার বাবাকে যে ভাবে দেখত।

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। যে দারিদ্র্যেকে অল্প-কিছুদিন আগেও একটা অপচ্ছায়ার মতো মনে হয়েছিল—আজ সেটা একেবারে বাস্তব হয়ে উঠেছে। বাসা-ভাড়া আর ডাক্তারের দক্ষিণা দিতেই আনের মাইনে ফুরিয়ে গেল—দুদুর জ্বর হয়েছিল। মাসের শেষে আর ওদের হাতে পয়সা রইল না। আগে আগে ওদের দুজনেই দারিদ্র্যকে জেনেছে—সে দারিদ্র্য সম্মান ক্ষুণ্ণ হবার মতো কিছু নয়, কিন্তু এখন অত্যন্ত অসম্মানজনক দৈন্যের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হল।

পিয়েরকে অন্য কোনো কারখানায় নেবে বলে মনে হল না। 'মালিক সমিতি' থেকে তার নাম অপরাধীদের তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। মিস্ত্রি হিসেবে, এমন কি গতর-খাটিয়ে মজুর হিসেবেও কোনো কাজ পাবার জন্যে সে বৃথাই চেষ্টা করল। আর সব জায়গা থেকেই ফিরে আসতে হয় তাকে।

গয়লার দাম চুকিয়ে দেবার জন্যে ঘড়িটা বেচে দিতে হল। আনে নিজের শীতের কোটটা পুরনো কাপড়ের দোকানের লোকটার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এটা বড্ড বড়ো হয় আমার গায়ে'—আর, এক সপ্তাহ ধরে তারা একবেলা খেয়ে রইল। পিয়েরকে খানিকটা উৎসাহিত করার চেষ্টায় আনে বলল, ছুটির দিনকটার জন্যে ও কিছু উপরি মাইনে পেতে পারে। ভোরবেলা পিয়ের বেরিয়ে যায়, সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ছোটখাটো কারখানা-গুলোয় ঢুঁ মারে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিজ্ঞাপন পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে আনেকে বলে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তাকে খাইয়েছে। পিয়ের ফিটফাট পোশাক পরে, প্রত্যেক দিন দাড়ি কামায়। এই ছিমছাম কটা চুল স্বপ্নদর্শীটিকে দেখে কেউ, ভিখিরী বলে ভাবতে পারবে না। কিন্তু কোনো খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় পিয়ের চোখ ফিরিয়ে নেয়।

একদিন একটা বিজ্ঞাপন দেখল : যদি বরফ পড়ে, তাহলে রাস্তা পরিস্কার করবার

জন্যে লোক দরকার হতে পারে; ভোর পাঁচটায় এসে হাজিরা পেশ করতে হবে। সন্ধ্যা থেকে ঘন তুষারবৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে; প্রথম দিকটায় বরফগুলো পথের ওপর গলে গেল, তারপর পুরু হয়ে জমে উঠে ঢেকে দিল রাস্তাটা। আনেকে জাগাবার ভয়ে রাত্রি চারটের সময় পিয়ের নিঃশব্দে কুঠরীর বাইরে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরল তার, কিন্তু তবু যে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আনের হাতে কুড়ি ফ্রাঁ—চাই কি তিরিশ ফ্রাঁও হতে পারে—তুলে দিতে পারবে, একথা ভেবে খুশির হাসি হাসল। জায়গাটায় পৌঁছল পোনে পাঁচটায়। শাদা তুষার অরণ্যের মধ্যে একটা বড় গ্যাসের বাতি জ্বলছে আর একটা লাল ইঁটের বাড়ির সামনে লোকের ভিড় জমে উঠেছে। হরেক রকমের লোকঃ হাঘরে, ফালতু লোক, হরতালে যোগ দেবার অপরাধে বরখাস্ত ডাক-পেয়াদা, অনশন-ক্লিষ্ট জনৈক ছবি-আঁকিয়ে, জনকতক জার্মান আশ্রয়প্রার্থী, বুড়ো আর ছেলে ছোকরার দল। চল্লিশজন লোকের দরকার, কিন্তু এসে জুটেছে তিনশোর কম নয়। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল পিয়ের। শেষ পর্যন্ত ওরা হেঁকে বলল, 'আর না!' পিয়ের বাড়িমুখো চলল ভারি পায়ে; শীত করছে, আর কেমন যেন দুর্বল মনে হচ্ছে ওর নিজেকে; পায়ে ফোস্কা পড়েছে, মাথাটা ঘুরছে।

হেঁটে চলল লে হালে-র পাশ দিয়ে। দৃশ্যটা জমজমাট : রেস্তোরাঁ-মালিক, কসাই, শবজিওলা আর খাবারের দোকানের মালিকরা নিজেদের পছন্দসই জিনিস বাছাইয়ের আগ্রহে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে। এমিল্ জোলার ভাষায় বলতে গেলে—পারীর আর সবই যেন বদলে গেছে, কেবল তার 'পেট'টি ছাড়া। ভিজে আর জল-চোয়ানো এইসব আহার্য-স্তূপের দিকে তাকিয়ে পিয়ের অস্পষ্টভাবে স্মরণ করল সেই প্রায়-বিস্মৃত উপন্যাসটির কথা—ভোজনপুষ্ট অনুভূতিহীন ব্যবসাদারদের দলে এক ক্ষুধার্ত আর আইনের চোখে অপরাধী, আত্মগোপনকারী সেই স্বপ্নদ্রষ্টার কাহিনী যাতে আছে।

আঁকশিতে ঝুলছে বিরাট মাংসপিণ্ডগুলো—গোলাপী বেগুনে আর অসহ্য লাল। ভোজনপ্রিয় এই শহরের ক্ষুধাতৃপ্তির জন্যে কতগুলো করে গরু আর ভেড়া লাগে? কৃত্রিম উপায়ে পিলে ফোলানো কতগুলো রাজহাঁস? কতগুলো করে বহুবর্ণ ধানীমুরগী আর বুক-উঁচু বেলে-হাঁস?

মাছের বাজারে সাজানো রয়েছে ভূমধ্যসাগরের বিরাট শোল মাছ, দেখে মনে হয় ওরা যেন মোম দিয়ে তৈরি; উত্তর সমুদ্রের কোমল শরীর চাঁদা মাছ; পিঠে নীল-সবুজ ডোরা কাটা রুপলী-বুক মাকেরেল মাছ; শাদাটে, পিছল-শরীর কুচো-মাছ; চেপ্টা ইতালীয় শামুক-মাছ, পর্তুগীজ গল্‌দা চিংড়ী, সামুদ্রিক কাঁকড়া, আর হরেক রকমের সামুদ্রিক উদ্ভিদ। গন্ধটা অসহ্য। মেছুনীদের হাতগুলো নোনাজল লেগে লেগে লাল আর কর্কশ। পাথরের বেদীগুলোর ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আরো এগিয়ে সবজিওলাদের দোকান। হাল্‌কা সবুজ ধনে-শাক, গাজর, মুলো আর ঝুঁটিশাক। রুসিল'-অঞ্চল থেকে আনা লেটুসগুলোর পাশেই সুদৃশ্য ছোট ছোট ঝুড়িতে সাজানো ব্যাঙের ছাতা। আরো ওদিকে সাজানো আছে শারৎ-এর মাখনের তাল, ডিম, টিনের কৌটো ভর্তি ক্ষীর, মেসিনা আর জাফার কমলালেবু, আপেল, গ্রীষ্ম দেশের লোভ-জাগানো মিষ্টি গন্ধওলা কলার কাঁদি, খেজুর আর আনারস।

দোকানউলীরা পেঁয়াজের ঝোল খাচ্ছে আর আড়ষ্ট আঙুলগুলো বাটির গায়ে গরম করে নিচ্ছে। ফালতু লোকগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক, আর পড়ে পাওয়া আলুগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। ভোজন-রসিকরা ছানার তালগুলো টিপে দেখে শুধোচ্ছে—মালটার দাম

কত। কাঁচা কালির গন্ধওলা ধূসর রঙের খবরের কাগজ নিয়ে কাগজওলা ছেলেরা বাজারের রাস্তায় ঘুরছে। তারপরে মধ্যযুগীয় স্যাঁ য়ুসটাশ্ গির্জার ঘণ্টাটা বাজতে শুরু করল। রাঙা উর্দি-পরা কসাইরা মাংসগুলো কাটতে লাগল। মফস্বলের ব্যাপারীরা শাক-সবজি আর বাঁধাকপিতে বোঝাই তাদের পুরনো ঝরঝরে লরিগুলো খালি করে দিয়ে কফি-খানায় গিয়ে কনিয়াক্-মেশানো কফি খেতে লাগল। রাস্তার শানের ওপর রক্তের মতো গড়িয়ে গেল লাল মদের স্রোত। বিরাট তোড়ায় বাঁধা লাল, পিংক্ ফুল, বেগুনী লতাবাহার আর গোলাপের স্তূপ জমে উঠল। নীস্ আর গ্রাস্ থেকে ট্রেন-বোঝাই হয়ে এসেছে শ্বেতকরবী, হলদে দোপাটি, স্থলপদ্ম, লিলি অফ দি ভ্যালী, আর আজেলিয়া। পঞ্জিকার ঋতুর হিসাব পারী মানে না ঃ সারা বছর ধরেই পারীর রাস্তায় ফেরীওলার ঠেলাগাড়িতে হরেক ফুলের শোভা। তুষার-কণা নেমে আসছে আকাশ থেকে। যারা ভাগ্যবান, তারা রাস্তায় বরফ সাফ করে চলেছে। কিন্তু ওদের দলে পিয়ের নেই। সে যেন দম-দেওয়া পুতুলের মতো হেঁটে চলেছে; এমন কি, খিদেও অনুভব করছে না। গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠছে ওর। খাবারের পাহাড় যেন পিষে মারবে ওকে। খাবার জিনিসটা আর খুশির চিন্তা জাগায় না—ওরা যেন সংগ্রামের ঘোষণায় মুখর, একটা সমগ্র জীবনদর্শনের প্রতীক—ব্যাপারী, দালাল, দাঁড়িপাল্লা আর নোংরা হিসেবের খাতায় ভীড়াক্রান্ত এক শত্রুভাবাপন্ন জগৎ। আর ওই হাজার ফুলের তোড়া। ভানেকের চোখের জল, ক্যাটালোনিয়ার দুঃখ, লেগ্রের কষ্ট, পিয়েরের খিদে—পারী এসবের কি ধার ধারে? পারী বেঁচে থাকতেই ব্যতিব্যস্ত। মাংসওলাটা আধমণ কিমা বিক্রি করে গুনগুনিয়ে গান ধরেছে 'পারী আজো সেই পারী'। জীবনের প্রতি এই বিশ্বাস-টুকুর মধ্যে এমন একটা কাতরতা আছে যে, কথাটা ভাবতেই পিয়েরের মনটা শান্ত হয়ে উঠল। কাজের তাড়া আছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে সে হেঁটে চলল, যদিও মনে মনে জানে কোথাও যাবার নেই। শীত করতে লাগল তার, তারপর হঠাৎ চলার গতিটা কমিয়ে ফেলল। ফিরে গিয়ে বুসি-অঞ্চলে ঢুকে সরু আঁকাবাঁকা পথগুলোয় ঘুরতে ঘুরতে বার-বার মোড়ের মুখে এসে পড়ল—যেখানটায় ঠেলাগাড়ির বুকে পিছল-শরীর চেপটা মাছ-গুলো ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে।

তারপরে খানিক বাদে একটা কুড়িয়ে-নেওয়া খবরের কাগজ পড়বার জন্যে পিয়ের একটা ভিজে বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল, ইউরোপের সংকট খানিকটা কেটে গেছে......তেসার বক্তৃতা......শান্তির প্রতিশ্রুতি......' হঠাৎ পিয়ের সচেতন হয়ে উঠল ঃ আলু ভাজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বড়ো বড়ো কড়াইয়ে আলুগুলো সেদ্ধ করে নিয়ে কাগজের ঠোঙায় পুরে বিক্রি করছে আর দোকানউলীটা চেঁচাচ্ছে ঃ 'গরমাগরম!......চার্-চার পয়সা......!' হ্যাঁ, চার পয়সায় একটা আশ্চর্য স্বপ্ন কিনে নিতে পারা যায়। পিয়ের হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দুমড়ানো কাগজখানা এগিয়ে ধরল একজন পথ-চলতি লোকের দিকে—লোকটা সরকারী চাকুরে গোছের, কাজে চলেছে। পিয়েরের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে লোকটা দ্রুত হেঁটে চলে গেল। ফিরে এসে আবার সেই বেঞ্চিটায় বসে পড়ে পিয়ের নিজেকে প্রশ্ন করল, কেন এমন করতে গেল? আর একবার সে ঝিম্ মেরে গেল! দূর থেকে ভেসে আসছে ছুটন্ত মোটর গাড়ির আওয়াজ আর বাজারউলীদের চেঁচামেচি। একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একজন পুরুষ চলে গেল সামনে দিয়ে; মেয়েটি পিয়েরকে তাকিয়ে দেখে তার সঙ্গীটিকে কি যেন ফিসফিস করে বলল। একটা বুড়ো-গোছের কুকুর পায়ে পায়ে এসে পিয়েরের বুট জোড়া শুঁক দেখে পেছনের দু পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল,

পিয়ের যে নিতান্ত সঙ্গতিহীন—একটা কুকুরও যেন তা বুঝতে পারে।

বাড়ি ফিরে দেখে—আরো বিপদ তার অপেক্ষায় রয়েছে। ঘরে ঢুকতেই আনে ফিস-ফিসিয়ে বলল : 'বাবা এসেছেন।'

অন্য যে কোনো সময়ে হলে তারা খুশি হয়ে উঠত। আনের বাবা থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের এক ছোট্ট শহরে, অনেকদিন ধরে বুড়ো একবার মেয়ের কাছে এসে কচি নাতিটাকে দেখে যাবার কথা ভাবছিল। মাঝে মাঝে সে তার মেয়েকে বড়ো বড়ো ছেলে-মানুষি অক্ষরে ছোট ছোট চিঠি লেখে।

আনে প্রায়ই পিয়েরকে তার বাবার কথা বলত। লেজাঁদর একজন পুরনো কালের মিস্ত্রি। যুদ্ধের আগে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার করার জন্যে সে দশ মাস জেল খেটেছে। বছর পাঁচেক আগে সে ভুগছিল। তখন কারখানা ছেড়ে চলে যায় দাস্‌স্‌-এ—সেখানে তার ছোট ভাই একটা ছোটখাটো মোটর কারখানা চালায়। সে তার ভাইকে মেরামতির কাজে সাহায্য করে, আর রান্নাঘরের আঙিনাটায় এটা সেটা করে বেড়ায়। চৌষট্টি বছর বয়স তার। পিয়ের ভেবেছিল শাদা চুলওলা বিরাট একটা মানুষ, কিন্তু এখন দেখল ছোটখাটো শুকনো একটা বুড়ো, মাথায় সদ্যজাত শিশুর মতো কয়েক গোছা চুল।

পিয়ের তৎক্ষণাৎ বুঝল, আনে কেন তার বাবার আসার কথাটা এভাবে উদ্বিগ্ন স্বরে ফিস্‌ফিসিয়ে বলেছে। বৃদ্ধ ভেবেছে তার মেয়ে একজন ইঞ্জিনীয়ারকে বিয়ে করে বেশ সুখেই আছে, আর দুদু দরকার মতো সব জিনিসই ঠিক পেয়ে যাচ্ছে। আর মেয়েকে দেখতে আসার বহুদিনের প্রতিশ্রুতি রাখতে সে এত সময় থাকতে ঠিক এই সময়েই এসে পড়েছে। যদি সত্যি কথাটা বলা যায়, বৃদ্ধ দুশ্চিন্তায় পড়বে। কিন্তু ওরা তাকে খাওয়াবে কি?

পিয়েরকে কৌতুহলের চোখে আগাগোড়া দেখে নিয়ে লেজাঁদর বলল, 'তোমার বুট-জোড়াটা তো বেশ মজবুত।' পিয়েরের মনে পড়ল সেই কুকুরটা, খবরের কাগজ আর ভাজা আলুর কথা। লেজাঁদর ওদের কুঠরীর সব কিছু দেখে বেড়াল, রান্নাঘরে গেল, তারপরে তার অনুমোদন জানাল, সবই বেশ পরিচ্ছন্ন। পিয়েরকে শুধোল, 'তোমার কাজকর্ম চলছে কেমন?' পিয়েরের মুখে নতুন ইঞ্জিনের বর্ণনাটা সে সাগ্রহ মনোযোগের সঙ্গে শুনল। তারপর তাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল রাজনীতি নিয়ে। লেজাঁদর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'একদম পিছিয়ে পড়েছি আমি। দাকস শহরটাতো ঘুমে ঝিমোচ্ছে। আমার ভাই ওসব রাজনীতি-টীতির ধার ধারে না। ও 'লে মাত্যাঁ' কাগজের গ্রাহক।' লেজাঁদর মিউনিক-চুক্তির মানেটা বুঝে উঠতে পারল না, আর পিয়ের যখন স্পেনের কথা তুলল শুধু তখনই সে উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারপর সে চেঁচাতে লাগল, 'জিতবে। ওরা! ওরা জিততে বাধ্য!' আলোচনাটা অতীতের ঘটনার দিকে মোড় ফিরল। হরতাল আর মিছিলের কথা স্মরণ করে লেজাঁদর-এর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'উনিশ শো ছ-য়ে আমরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল করে গেছি রাস্তা দিয়ে।' জোরে-এর সঙ্গে পরিচয় ছিল বলে ভারি গর্ব তার। বলল, 'সভায় বক্তৃতা দিতে উঠই জোরে গলাবন্ধনীটা খুলে ফেলতেন। তখনকার দিনে শক্ত কাপড়ে তৈরি হত গলায় বন্ধনী। ভয়ানক খাটতে হত কিনা ওঁকে। আর কী গলা ছিল ওঁর!'

পিয়ের চুপ মেরে গেল। এই প্রাণবন্ত বৃদ্ধের সংস্পর্শে সে নিজের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে। লেজাঁদর নিজের মতো করে তার জামাইয়ের নিঃশব্দতার অর্থ করে নিল। বোধ হয় সে ঠিক কথাটা বলেনি? ওকি তার নিজের শ্রেণীর

মানুষ? পিয়েরের হাবভাব একটু যেন ঘাবড়ে দিয়েছে তাকে; আর যাই হোক, লোকটা ইঞ্জিনীয়ার তো! আনের এখন ভিন্ন জগতে বাস, মজুর শ্রেণীর লোককে ও বেছে নেয়নি। অস্বস্তির সঙ্গে লেজাঁদর বলল, 'আমি বোধ হয় তোমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। আমি একবার দুয়াই-এর সঙ্গে দেখা করে আসি ততোক্ষণ।'

আনে আর পিয়ের মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের দিকে তাকাল। লেজাঁদরকে আটকাতেই হবে; ইতিমধ্যে খাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু খাওয়াবার মতো কি আছে? দুদুর সুরুয়াটুকু? বলবে কি যে ওদের এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল? বৃদ্ধ হয়ত তাই শুনে ক্ষুব্ধ হবে। আনে বলল, 'এখনই যেও না। দাকসের কথা সব বল শুনি।' লেজাঁদার বলতে শুরু করল। গরমকালে অনেক লোক বেড়াতে গিয়েছিল ওখানে; ওর ভাই বেশ কিছু টাকা করে নিয়েছে। কিন্তু এখন জায়গাটা খুব চুপচাপ। যুদ্ধ হবে শুনে লোকে ভয় খাচ্ছে। ইদানীং কেউ আর নতুন ঘরবাড়ি তুলছে না, আর মোটর গাড়িও বিশেষ কিনছে না, কারণ সামরিক বিভাগ থেকে ওগুলো দখল নিয়ে নেওয়া হবে বলে লোকে ঘাবড়াচ্ছে। লরির ব্যবসাটাই ঘিশেষভাবে খারাপ। ক্রমশই বেকারের দল বাড়ছে।

'পারীতে বেকার লোক কি খুব বেশি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'অনেক। চাকরির সমস্ত বিভাগেই। আজ দেখলাম—একদল লোক রাস্তা পরিষ্কার করতে এসেছে। একজন ছাপাখানার মুদ্রাকর, একজন খাবারের দোকানী, এমন কি একজন ছবি-আঁকিয়েও ছিল ওই দলে। দু ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা।'

পিয়ের তৎক্ষণাৎ তার বাক্যপ্রমাদটুকু বুঝতে পারল। বৃদ্ধ কথাটা ধরতে পারবে না, কিন্তু আনে......আর সে কিনা আনেকে বলেছে, একটা কারখানা তাকে ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে নেবে। আর সত্যিই, আনে তার দিকে এমন ভীতিবিহ্বল চোখে তাকাল যে সে নিজেদের সাংঘাতিক দুঃস্থতার কথাটা এই প্রথম উপলব্ধি করেছে বলে মনে হল। কিন্তু লেজাঁদুর্-এর কান খাড়া ছিল। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা সমঝে নিল : আনের বিব্রত অবস্থা, পিয়েরের নিঃশব্দতা আর ফাঁকা রান্নাঘরের মানেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে।

লেজাঁদর বলল, 'আমি এই একটু মোড়টা থেকে ঘুরে আসছি। দুয়াইকে একবার টেলিফোন করব ভাবছি।'

আধঘন্টা বাদে সে জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে ফিরল—এক বোতল মদ, সার্দিন মাছ, পাঁউরুটি, মাখন আর কফি, চিনি আনতে ভোলেনি। আনেকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোর একটা ছোট্ট খুকী হলে কেমন হয়?' কোনো প্রশ্ন তুলল না সে। খেতে খেতে পিয়ের হরতালের সমস্ত কথা বলল—গ্যাস ছাড়ার বৃত্তান্ত, দেসেরের সঙ্গে তার আলোচনা, আর অপরাধীদের তালিকায় তার নাম ওঠার কথা। পিয়ের যে তার আপন শ্রেণীর লোক—এ কথাটা ভেবে লেজাঁদর-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অভাবের কথাই যদি ওঠে—ওদের বয়স কম, ওরা সব ঠিক করে নিতে পারবে।

তারপর পিয়েরের গেলাশে গেলাশ ঠেকিয়ে সে বলল, 'বিজয়ের উদ্দেশ্যে!'

সব পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে—স্প্যানিয়ার্ডরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেবে ফ্যাশিস্টদের, আর সর্বত্র শ্রমিকের অভ্যুত্থান হবে। হরতাল বাধবে আর ব্যারিকেড তৈরি হবে দিকে দিকে।

খাবার আর মদ পেটে পড়ায় পিয়ের একটু নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। উষ্ণ একটা আরাম অনুভব করছে সে, কিন্তু তার মনমরা ভাবটা যেন কিছুতেই কাটছে না।—এই হল গিয়ে

পুরনো যুগ। পরাজয় আর হতাশার জ্বালা ওরাও জেনেছে। কিন্তু এই বৃদ্ধটির মতো বিশ্বাসের জোর, সরলতা ও প্রসন্নতা পিয়েরের নেই কেন? দুদুকে ঘুম পাড়িয়ে দিল ওরা। দুদুর মেজাজ খারাপ ছিল বলে শুতে যেতে চাচ্ছিল না, কিন্তু শুইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঘুমে ঢলে পড়ল। লেজাঁদর্ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, 'ওর জীবন কাটবে শান্তিতে, দেখিস, আমাদের মতো নয়। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের। শাঁপাঞ'র জেলে থাকতে হয়েছে আমায়। সে কী দুর্ভোগ! কিন্তু আর যুদ্ধ হবে না। শ্রমিকরা এখন একটু বেশি বুদ্ধি ধরে। তাছাড়া জার্মানরা যুদ্ধে নামবে না। ওদের দেশেও তো শ্রমিক আছে। ওরা যুদ্ধ হতে দেবে বলে ভাবিস নাকি?'

সকাল সকাল শুতে যাওয়া আর ভোর পাঁচটায় ওঠা তার অভ্যাস; চোখ দুটো স্থির আর দৃষ্টিহীন হয়ে উঠল; জেগে থাকবার জন্যে লড়াই করতে দুদুর ছোট বিছানার ওপরেই ঢুলে পড়ল লেজাঁদর্। তার মুখখানা দেখাল ছোট ছেলের মুখের মতো।

তেইশ

এবারকার এই শীতকালের মতো সময়ের গতিকে এত মন্থর বলে আর কখনো মনে হয়নি। পারীর অবস্থাটা শান্ত কিন্তু বিভ্রান্তিকর। অতীত গৌরবের স্মৃতিস্তম্ভগুলি ডিসেম্বরের নীল গোধূলি-আলোয় ঢাকা পড়েছে। দোকানের জানলাগুলোয় হরেক রঙের পুতুল আর নানান রকমের খাবার শান্তিপূর্ণ বড়দিনের উৎসবের মোহ এখনো বজায় রেখেছে। দু-একজন উৎসবমত্ত লোক নির্জন রাস্তায় চিৎকার করে গান ধরেছে, কিম্বা কোন প্রমোদসঙ্গিনী শ্রমজীবিনীর পিছু ধাওয়া করছে। কিন্তু একটা অবসাদগ্রস্ত হাল ছেড়ে দেওয়ার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পারী নগরী।

প্রতিদিন সকালে মন্ত্রীরা কোন অবাধ্য টেলিগ্রাফ-কর্মচারী কিংবা কারখানা-শ্রমিকের বরখাস্তের নোটিশে নিয়মিত সই করছেন। মালিকরা সর্বত্রই শ্রমিকের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। হাজার হাজার বেকার পেটের জ্বালায় অস্থির; জাতীয়-আত্মরক্ষা-নীতির ওপর বক্তৃতা দিলে দালাদিএ কিন্তু অস্ত্র-কারখানার যন্ত্রপাতি নিশ্চল রইল—যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

জোলিও তার কাগজের পাঠকদের পয়সায় সোনার প্রসাধন-সেট কিনে চেম্বারলেনের স্ত্রীকে উপহার দিয়েছে। বেঁটে মোটা লোকটা সগর্বে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বাজারের সেরা মাল এটি!' কিন্তু চেম্বারলেন যখন পারী পৌঁছল, রেল-স্টেশনে শ্রমিকরা জমায়েত হয়ে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি তুলল তার উদ্দেশ্যে। এইটাই জনতার শেষ প্রতিরোধ। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল তারপর। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজ চলল অবিরাম। মিস্ত্রী, পালিশওলা, ঢালাই-মজুর আর অন্যান্য শ্রমশিল্পীরা জেলখানায় বসে চকোলেট-বাক্স বার্নিশ করতে লাগল।

হাসপাতাল থেকে আদালতে আনা হল লেগ্রেকে। দুজন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দু দিকে। আত্মপক্ষ সমর্থন শুরু করল, 'আমি দালাদিএকে অভিযুক্ত করি.........' আদালতের সভাপতি শান্তভাবে বললেন, 'নিয়ে যাও একে।' তার পর পাঁচমিনিট বাদেই

তিনি ঘেঙাতে থাকলেন, '১৯শে জুলাই-এর আইন অনুসারে......লেগ্রে জাক্‌-কে......সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল......'

র‍্যাডিকাল দলের এক সভায় ফুজের বন্ধুরা গভর্ণমেন্টের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে। সূক্ষ্ম হাসি হেসে তেসা বলল, 'গভর্নমেন্টের পদত্যাগের পরিণাম হচ্ছে আমাদের শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ।' একটা মানচিত্রের পর্যবেক্ষণে একটা গোটা সন্ধ্যা কাটানোর পর জনৈক ডেপুটির সঙ্গে নৈশভোজনে বসে ছানা ফলাহারের অন্তর্বর্তী গুরুগম্ভীর সময়টিতে সে বলল, 'দেখে নিও, জার্মানরা পুব দিকে যাবে! ওদিকে তেল আছে হে—আর তেল জিনিসটা কি তা জানো তো? এ যুগের রক্ত হচ্ছে ওই তেল।'

রিবেনট্রপ একবার এল পারীতে; সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ রাস্তাগুলোয় লোক চলাচল বন্ধ করে দিল। অত্যন্ত অবাস্তব অসম্ভব এক দৃশ্যের সামনে উপস্থিত করা হল এই অতিথিটিকেঃ ফাঁকা প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এর ওপর লাল শীতের সূর্য। ভদ্রভাবে রিবেনট্রপ বলল, 'এবার পারীতে এসে আমি বিশেষভাবে খুশি হয়েছি......'

ইতালীর ফৌজ এগিয়ে চলেছে বার্সেলোনার দিকে। ডেপুটিরা সভা করে সিনেটের সভ্য বেরার-কে জেনারেল ফ্রাংকোর কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেছে। তেসা এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'ভুল বোঝাবুঝির পালা চুকিয়ে দেবার এই তো সময়!'

ভীইয়ার এক সভায় চেক নারীদের আর কাটালোনিয়ার শিশুদের দুর্ভাগ্যের জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তৃতায় বলল, 'সরকার শ্রমিকশ্রেণীর ওপর অন্যায় আক্রমণ চালিয়েছে,' তারপর গলার স্বরে ফোঁপানির সুর মিশিয়ে ঘোষণা করল, 'দাসত্বের শৃংখলে বন্দী ইউরোপের বুকে আমাদের এই রিপাব্লিকই স্বাধীনতার শেষ দুর্গপ্রাচীর!' আধা-সমর্থনসূচক খানিকটা হাততালির সাড়া পাওয়া গেল। তারপরে 'সিয়েন কারখানার দারোয়ান সেই বুড়ো দ্যুশেন সামনের সারির শ্রোতাদের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এই দুর্গপ্রাচীর রক্ষা করবার জন্য মারা পড়বে কারা?—এক যারা সন্ত-শহীদ আর যারা গোবেচারী উলুখড় শুধু তারাই। সাধু-সন্তরা তো স্বর্গে আর উলুখড়ের মরণ নেই কোনকালে।'

দ্যুশেনের টিপ্পনী শুনে তেসা হেসে বলল, 'যাই বলো না কেন, বড়ো রসিক এই ফরাসীজাত।, দুকানের ঘেঙানিতে ঘাবড়াই না আমি। আমরা তো আর চেক্‌ নই।'

তা যাই হোক, তেসা মাঝে মাঝে হতাশার অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল। নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করল—কেন সে এই বোঝা চাপিয়েছে নিজের কাঁধে? কমিউনিস্টরা চেঁচাচ্ছে, 'পল তেসা মুর্দাবাদ!' গ্রঁদেল-সংক্রান্ত সেই চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে দুকান বেশ গোল বাধিয়েছে; সেও চেঁচাচ্ছে, 'চেম্বারের মধ্যে কিনা জার্মানির গুপ্তচর!' এমন কি, পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিশনগুলোও অসন্তোষ প্রকাশ করে দাবি জানাচ্ছে জুলুম বন্ধ করার জন্যে।

শ্রমিক-সংক্রান্ত কমিশনের পক্ষ থেকে ভীইয়ার দেখা করতে এল তেসার সঙ্গে। বলল, 'কয়েকদিন আগে এক শ্রমিকসভায় আমি তোমাকে সমর্থন জানিয়েছিলাম। ওরা আমার বক্তৃতায় বাধা দিয়েছে, আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে, বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ তুমি। গভর্নমেন্ট দিন দিন জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠছে।'

তেসা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কিন্তু অপ্রিয় নয় কে? তুমি ফ্লাঁদ্যা? ব্রতেই? যতো সব বাজে কথা! এদেশে জনপ্রিয় কে বলি শোন—হিটলার! ব্যক্তিগতভাবে, তোমার পদ অধি-

কার করে নেবার জন্যে আমি দুঃখিত। এখন সরকারবিরোধী দলে থাকাটা অনেক বেশি স্বস্তির। তোমরা তো বলে দিলে, 'জুলুম বন্ধ করো!' করতে পারলে আমিই খুশি হতাম সব চেয়ে। তোমরা কি ভেবেছ আমায়? একটা বুনো জানোয়ার? কিন্তু ওই কমিউনিস্টরা ওদের আন্দোলন থামাক আগে। শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে যথাসাধ্য ব্যবস্থা আমরা করছি, আর ওরা সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। কয়েক কোটি লোককে জবাই হতে পাঠানোর চেয়ে কয়েক হাজার লোককে জেলে পাঠানো ঢের ভাল। ওরা যুদ্ধ-বন্ধ-করবার-জন্যে যুদ্ধ চায়, কিন্তু আমার ফন্দিটা হচ্ছে, হেঁ! হেঁ!—আমার ফন্দিটা হচ্ছে যুদ্ধ-বন্ধ-করবার-জন্যে গ্রেপ্তার!'

প্যাঁশ্‌নেটা চোখ থেকে নামিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে কাচ দুটো পরিষ্কার করতে করতে ভীইয়ার তেসার দিকে নিরীহ ঝাপসা চোখে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে শান্তি বজায় রাখা যাবে?'

'কি বলব বলো? জার্মানদের পুব দিকে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষেত্রে আমরা কুড়ি বছরের মতো নিরাপদ। হিসাবের ভুল হতে পারে। আমি নিজে জুয়ো খেলতে ভালোবাসি, কিন্তু বর্তমানে আমরাই হলাম গিয়ে বাজির তাস; আমরা ফাটা হয়ে গেছি, বিলি হয়ে গেছি খেলুড়েদের হাতে। কী সাংঘাতিক পেশা আমাদের! বেকারগুলোকে হিংসে হয়, ওরা সাঁকোর তলায় শুয়ে থাকে, কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। ওগুস্ত, আমাদের এই অস্তিত্বটাকে বেঁচে থাকা বলে না। কোন কিছুর ওপরে মনটাকে একাগ্র করে তোলবার সময় আমাদের নেই। আমালি যখন মারা গেল...'

গলাটা কেঁপে উঠল তার। দুটো মোমবাতি আর লিলিফুলগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। আর, ভীইয়ার অনুভব করল তেসার প্রতি তার মনোভাব যেন বদ্‌লে গেছে। তেসাকে তার কোনো দিনই ভাল লাগেনি। চিরদিন একটা ব্যবসাদার লোক বলে সে দেখে এসেছে তাকে। এখন সে তেসার মধ্যে এমন একটি মানুষের সন্ধান পেল যে তার অন্তরের কাছাকাছি তারা দুজনে একসঙ্গে লেখাপড়া করেছে, একই বই পড়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। ছবির পছন্দও তাদের একই ধরনের। আর দুজনেই তারা নিরর্থক আত্মবলিদান দিয়েছে—পার্লামেন্টের স্থূল কূটনীতির খেলায়, বিতর্কে আর ভোটাভুটিতে খুইয়ে বসেছে নিজেদের আত্মিক দীপ্তি। তেসার কাছে উঠে গিয়ে আন্তরিকভাবে তার করমর্দন করল ভীইয়ার। বলল:

'আমি বুঝি। আমিও বড় একা মানুষ।'

ভুলে গেল তারা কমিশনের ভোটের প্রসঙ্গ, ফ্রান্সের ভাগ্যের কথা। নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখের আলোচনায় মেতে গেল এই দুই বন্ধু। ভীইয়ার অভিযোগ করল, 'সেকালে ধর্মাশ্রম ছিল—লোকে সেখানে আস্তানা গাড়ত, পড়াশোনা করত, বিশ্বরহস্য অনুধ্যান করত আর ফুলগাছের গোড়ায় জলসেচ করত। এযুগে কিন্তু কোথাও কোনো নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেই।'

কিন্তু তেসা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে নিল। ওই ধরনের বিষণ্ন কথাবার্তায় তার কি লাভ? ফূর্তির সঙ্গে সে বলে উঠল, 'ওকথা বোলো না; পরশু 'ফলি বেরজ্যর'-এ গিয়েছিলাম নাচ দেখতে। স্বীকার করতেই হবে, মেয়েরা বড়ো আশ্চর্য সৃষ্টি। অবশ্য, নৃত্যশিল্পের দিক থেকে ওদের নাচ বিচার করলে চলবে না। ওরা কেউ আন্না পাভ্‌লোভা নয়...কিন্তু ওদের দেহবিক্ষেপ দেখে—মাইরি বলছি—সত্যিই বেঁচে আছি বলে মনে হল।'

চব্বিশ

তেসা ইদানীং দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন পাবার চেষ্টায় আছে। ব্রতৈইকে দলে টানার চেষ্টায় ছিল সে, কিন্তু ব্রতৈই দিন দিন বেশিরকম স্পষ্টভাষী হয়ে উঠছে, মাঁদেল-এর পদত্যাগ দাবি করে চাপ দিচ্ছে তার ওপর। কোনো এক ক্রীড়ামোদীদের ক্লাবে নৈশভোজনের আসরে ব্রতৈই বক্তৃতা দিয়েছে, 'দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওই ইহুদী মাঁদেলটা এখনো মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত! জার্মানির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়াই ওর চেষ্টা।' তেসা ছুটে এল মাঁদেলের কাছে আফসোস্ জানাতেঃ 'ওর কাছে আর কি আশা করা যায় বলো? ব্রতৈইটা একটা অন্ধ গোঁয়ার। ওর মনটাই প্রাচ্যদেশীয়—শুধু তো ও লোরেন্‌এ জন্মায়নি। কিন্তু আমরা হচ্ছি কার্তেসীয়। ও ধরনের ব্যাপার আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ।' ব্রতৈইকে বলল, 'হ্যাঁ, তা মাদেল-সম্বন্ধে যা বলেছ তার মধ্যে অনেকখানিই সত্যি। ইহুদীরা আমাদের বিরুদ্ধেই রয়ে গেল দেখছি।'

গ্র'দেলের জন্যে তেসা ভারি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় আছে। লোকটা সর্বত্র যায়, মন-কেড়ে-নেওয়া হাসি হাসে আর মৃদুস্বরে বলে, 'প্রিয় বন্ধু।' আর তেসা মনে মনে ভাবে, 'লোকটা আমাকেও ফাঁদে ফেলতে চায় বোধ হয় ?' পারীর ড্রয়িংরুম মহলে গ্র'দেল অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। 'জার্মন-লাতিন জগৎ ও বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'—এই বিষয়ের ওপর সে 'লাকাসাদোর'-এর বক্তৃতাগৃহে শৌখীন একদল শ্রোতার কাছে বক্তৃতা দিয়েছে। সিনেমার সংবাদচিত্রের লোকরা তার ছবি তুলেছে।

গ্র'দেল সর্বত্র হাসিমুখে যায় আর প্রসঙ্গক্রমে ইঙ্গিত দিয়ে বলে, 'ইউক্রেন জায়গাটা সম্বন্ধে সত্যিই অনেক কিছু জানবার শোনবার আছে, জানেন? কাল আমি মেজেপ্পার জীবনীটা পড়ছিলাম। জীবনীটা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি শিক্ষণীয়'! তেসা জানে না মেজেপ্পা কে, কিন্তু গ্র'দেলের প্রত্যেকটি কথাতেই তার সন্দেহ। মাঝে মাঝে সে কিলমানের চিঠিটা স্মরণ করে, কিন্তু আরো বেশি করে তার মনে পড়ে, 'মন্ত্রী হবার দিকে গ্র'দেলের লক্ষ্য। ওর সম্বন্ধে আরো সাবধান হবে আমায়!'

ব্রতৈই গ্র'দেলের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। তাদের মধ্যে যে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। এতদিন ফুজে যা বলে আসছিল, ইদানীং দুকানও সেই সব কথা বলতে লেগেছে। গ্র'দেল সম্বন্ধে সে সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে। কোনো প্রমাণ আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'না! কিন্তু এটা আমার একটা অনুভূতি।' ব্রতৈইর সঙ্গে থেকে আর সময় নষ্ট না করে সে পার্টি ছেড়ে দিল। দক্ষিণদলের লোকরা তাকে আক্রমণ করে বলল, 'নীতিভ্রষ্ট', 'প্রতিশোধপরায়ণ', 'জাতীয় বলশেভিক।' কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে দুকানের মধ্যে এমন একটি চারিত্রিক অখণ্ডতা ছিল, যার জন্যে সে একজন খাঁটি দেশভক্ত হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল; এই সুনামটা সহজে নষ্ট হল না। ব্রতৈইর বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই দুকানের সঙ্গে দেখাশোনা করতে লাগল; ফলে, এতদিন যে পার্টিতে শৃঙ্খলা বজায় ছিল সেই পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরল।

দুকানের আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হয়ে জেনারেল পিকার ব্রতেইর সঙ্গে দেখা করতে এল। বলল, 'তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নেই। কিন্তু এই গ্রঁদেল লোকটা আমার কাছে এসে আমাদের সমরোপকরণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তোলে—ওকে আমি বিশ্বাস করি কি করে?'

'গ্রঁদেল আমার সঙ্গে কাজ করছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওর সম্বন্ধে কি বলাবলি হচ্ছে তা তুমি জান। আমাদের অবস্থা এখন আর ১৯৩৬-এর মত নয়—যখন ব্লুম ছিল ফ্রান্সের পুরোভাগে। যুদ্ধ যদি বাধে, তাহলে আমাদেরই সেজন্যে দায়ী হতে হবে।'

ব্রতেই ঘাবড়ে গিয়ে টেবিলের ওপর বিছানো চাদরটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, ভারী জটিল এই খেলাটা। বিপজ্জনকও বটে; অস্বীকার করছি না তা। আমরা নিজেদের শক্তিতে জিততে অসমর্থ। এখন যদি আমরা এতটুকু পিছিয়ে যাই, তাহলেই আবার পপুলার ফ্রন্ট কায়েম হবে। অবশ্য, পারলে পরে আমি অন্যান্য মিত্রশক্তি বেছে নিতাম। যাই বলো, শেষ পর্যন্ত আমি তো লোরেন-বাসী। কিন্তু বাছ-বিচারের কোনো সুযোগ নেই আমাদের। ব্রিটিশরা হচ্ছে মৈনাক পর্বতের দেবতাদের মতো; ওদের খেলায় আমরা বড়ে মাত্র; আমাদেরই টিউনিসিয়া কিংবা ইন্দোচীনের মূল্যে ওরা নিজেদের দেনা শোধ করবে। তাছাড়া, ওদের পার্লামেন্টে তো মোটে একজন কমিউনিস্ট সভ্য, সুতরাং ওদের পক্ষে ত্রিদলীয় চুক্তির কথা বলা সহজ। হ্যাঁ, মোটে একজন! কিন্তু আমাদের অবস্থাটা একবার তাকিয়ে দেখ! আমি দেখছি জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। জার্মানরা আমাদের অবস্থার সুযোগ নিতে চায়—তার মানেটা বুঝে ওঠা কঠিন নয়। কিন্তু ফ্রান্সের একটা অখণ্ড সত্তা আছে, সেটা ভেঙেচুরে দেওয়া যায় না। ব্যাধির সংক্রমণটা এখনো মেরুদণ্ডে সঞ্চারিত হয়নি। সুতরাং ঠিক উল্টো ব্যাপারটাই ঘটবে; আমরাই জার্মানদের অবস্থার সুযোগ নেব, ওরা নয়। বুঝতে পারছ তো? যুদ্ধের আশঙ্কার সুযোগে আমরা কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করার একটা সুবিধে পাব। জনগণকে যারা শান্তির বার্তা শোনাবে, জয়লাভ হবে সেই পক্ষেরই। কিন্তু হিটলার লড়াই করতে সাহস পাবে না, আর যাই হোক আমাদের ফৌজের সঙ্গে খানিকটা তো বুঝতেই হবে। যাই হোক, ও সব ব্যাপার তুমি ভালো বোঝ আমার চেয়ে।'

'আমি আর কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের ফৌজ ঘা সইতে পারবে না। এটা সমরোপকরণের প্রশ্ন নয়—যাদিও সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। আমাদের স্পেনের প্রতিনিধির সঙ্গে আমি এই মাত্র কথা বলছিলাম। জার্মান বিমান-বাহিনী সম্বন্ধে তার খুব উঁচু ধারণা। কিন্তু আমি আবার বলছি, প্রশ্নটা তা নিয়ে নয়। অভাব ঘটেছে নৈতিক সাহসের। অফিসাররা কেউ যুদ্ধে যেতে চায় না। ঘটনা যদি এমন দাঁড়ায় যে যুদ্ধে যেতেই হবে, তবু তারা যেতে চাইবে কিনা সন্দেহ। কোনো একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত পিছু হটার নীতি তুমি স্বীকার করছ। কিন্তু ঠিক সেই পর্যন্ত এসেও আমরা রুখে দাঁড়াতে পারব বলে তো মনে হয় না। সামরিক বাহিনী একটা জীবন্ত, জৈবিক ব্যাপার।'

পিকার্ উত্তেজিত হয়ে উঠল; সামরিক বিভাগটিকে সে আন্তরিকভাবে ভালবাসে। কিন্তু ব্রতেই তার কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করার পর খুব শান্ত হয়ে গেছে। তার যা বলার ছিল সবই সে বলেছে। শুধু উল্লেখ করেনি কিলমানের সঙ্গে গ্রঁদেলের যোগাযোগের প্রশ্নটা। কিন্তু সেটা একটা খুঁটিনাটির ব্যাপার। খেলাটা জটিল অবশ্য। ব্রতেই কতবার ইতস্তত

করেছে; কিন্তু সে ঠিক থেকেছে তার ভগবৎবিশ্বাসের জোরে আর নিয়তির নির্দেশে। ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেরিতা সেই ল্যোরেন-নিবাসিনী মেষ-পালিকার কথা সে সর্বদাই স্মরণে রেখেছে। না, ফ্রান্সের বিনাশ নেই।

পিকারের সঙ্গে কথাবার্তার অল্পক্ষণ বাদেই সে তেসার সঙ্গে দেখা করে পীড়া-পীড়ি করতে লাগল—গ্রঁদেল-সংক্রান্ত গুজব অস্বীকার করে যাতে তেসা একটা বিবৃতি দেয়। বলল, 'গ্রঁদেলের সম্মান-হানিকর এই সমস্ত গুজবেরই জের টানা যায় দুকানকে জড়িয়ে। ও লোকটা নিতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তোমার নামটা সর্বদাই উল্লেখ করা হচ্ছে। আবার সেই চিঠি জালের প্রশ্নটাকে খোলাখুলি টেনে আনা হয়েছে। ব্যাপারটা থামাতেই হবে তোমার।'

তেসা গোঁয়ারের মত বলল, 'আমি তো সমর্থন করছি না কিছুই, কিন্তু কোনো কিছু অস্বীকার করার উদ্দেশ্যও আমার নেই। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্বন্ধ কি? তাছাড়া গ্রঁদেলের ওপর আমার কোনো সহানুভূতি নেই। তোমাকে স্পষ্টই বলছি, ও লোকটা আমার মনে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস জাগাতে পারেনি।'

'আর তুমি কি ভেবেছ আমি গ্রঁদেলকে খুব পছন্দ করি? ও একটা বেপরোয়া লোক, খালি টাকা বোঝে আর লাভের আশায় নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে। আমার মেয়ে থাকলে তাকে নিশ্চয়ই গ্রঁদেলের হাতে দিতাম না। কিন্তু এখানে আমাদের কারবার রাজ-নীতি নিয়ে, কি ভালো লাগে না লাগে তা নিয়ে নয়। গ্রঁদেলের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চালাচ্ছে কারা—দুকান, ফুজে; আর ওদের পেছনে আছে কমিউনিস্টরা। ওরা পপুলার ফ্রন্টকে জীইয়ে তুলতে চায়। তুমি এই নিন্দারটনাকে মিথ্যে প্রমাণ করো, তাহলে আমরা ওদের ফিকিরফন্দি বানচাল করে দেব।'

তেসা বলল, 'সেটা বেশ ভালো কথা; কিন্তু চিঠিটা যে জাল সে সম্বন্ধে আমি মোটেই নিঃসংশয় নই। নিজেদের মধ্যে বলছি, গ্রঁদেল একদা অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে।'

'অসম্ভব। কিন্তু তোমার হাতে কোনো প্রমাণ আছে কি?'

'না।'

'তাহলেই দেখ। ওকে দল থেকে বের করে দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সে রকম ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে ব্যাপারটা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। তুমি যদি চুপ করে থাক, তাহলে ওরা তোমায় সাবাড় করে দেবে। এবার এটা দেখ—এটা হচ্ছে দুকানের অধুনাতন খেল্।'

ব্রতেই একটা চিঠি দেখাল তেসাকে—গ্রঁদেলের রোজগারের উপায় সম্বন্ধে তদন্তের দাবি জানিয়ে দুকান কয়েকজন দক্ষিণপন্থী ডেপুটির কাছে চিঠিখানা পাঠিয়েছে; এই তদন্তের দাবিটা শুধু গ্রঁদেল সম্বন্ধেই নয়—'কিলমান-ঘটনা'র সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের সম্বন্ধেই, এবং এদের মধ্যে তেসাও আছে।

বিরক্তিতে কাশতে লাগল তেসা: 'হায় কী শয়তানী!'

এর পরে একটা সংক্ষিপ্ত এবং জোরালো অস্বীকৃতি-পত্রে তেসার সই পাওয়া ব্রতেইর পক্ষেই সহজ হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় তেসা পলেৎকে বলল, 'ব্রতেই আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। চূড়ান্ত শয়তান আর ঠগ ওই লোকটা। অবশ্য, আর একটা জয়লাভ হবে আমাদের। যার-

বরাদ্দ-কমিশন আমাদের সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। ফজুের বন্ধুরাই তো আছে ওই কমিশনে, সুতরাং সেটা খুব আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমি ওদের অবাক করে দেবার মতো একটা বিস্ময়-উপহার দিয়েছি—ফরাসী-জার্মান ঘোষণার আকারে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কী ভয়ানক রকম সব জয়লাভ হচ্ছে আমাদের একে একে, একবার দেখ: মিউনিক, হরতাল-ভণ্ডুল, ফ্রাঙ্কোর কাছে বেরার্-এর মিশন, আর এখন এই ঘোষণা। সেকেলে লোকরা যেমন বলে—এমনধারা আর একটা জয়লাভ হলেই সব চলে যাবে জাহান্নমে!'

'কি চলে যাবে জাহান্নমে?'

'কি মানে? কেন, ফ্রান্স!'

রাজনীতিতে পলেতের কোনো উৎসাহ নেই; খবরের কাগজে সে পড়ে একমাত্র খুনের খবর আর ধারাবাহিক চিত্র-কাহিনীগুলো। কিন্তু সে জোয়ান দ্য আর্ক্, নেপোলিয়ন, ভিক্টর হুগো আর ভের্দ্যাঁর ঐতিহ্যের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে। তেসার দিকে ভীতি-বিহ্বল চোখে তাকাল সে। তেসা কিন্তু হাসির চোটে কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

'হাসছ কেন?'

'কান্নার চেয়ে ভাল, তাই,' তেসা নিরীহভাবে বলল, 'বড় ক্লান্ত আমি। একটু-আধটু আমোদ করার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। আচ্ছা রাগ কারো না, লক্ষ্মীটি! এই একটু ঠাট্টা করছিলাম আর কি। ফ্রান্সের বিনাশ অসম্ভব। পৃথিবী ধ্বংস হবার আগে ফ্রান্স ধ্বংস হতে পারে না।'

পঁচিশ

দালাদিএ আর তেসার নীতি প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যে স্প্যানিশ গভর্নমেন্ট 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'কে সাহায্য করতে অস্বীকার করল। সীমান্তের কাছে ক্যাটালোনিয়ার ছোট্ট এক গ্রামে 'পারী কমিউন' বাহিনী শ্রান্ত অবস্থায় অপেক্ষা করছে—তার লোকদের ফ্রান্সে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। চাষী বৌরা ছোট্ট নদীটায় কাপড় ধোয়া-কাচা করে নিয়ে যায় আর হালকা-সবুজ রঙের শীতের সব্জি সংগ্রহ করে ফেরে। জীবনকে শান্তিময় বলে মনে হয়। হঠাৎ, ঝড়ের আগে ধুলোর ঘূর্ণির মতো, আশ্রয়প্রার্থীরা এসে জুটতে লাগল।

মুর ফৌজ শহরের দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বার্সেলোনার লোকরা পালাতে লাগল সবাই, খচ্চর আর ছাগলের পাল তাড়িয়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলল চাষীরা। কেউ কেউ তাদের গরু ভেড়াগুলো মেরেও ফেলেছে। ছোট ছোট দেরাজ আর মুরগি-ভর্তি বাঁশের ঝুড়িগুলো ঝুলছে গাড়ির দুদিকে আর মেয়েরা পাশে পাশে হেঁটে চলেছে বোঁচকাগুলো কাঁধে নিয়ে। তারপরে সৈন্যরা পালাতে শুরু করল। বন্দুক-বারুদের বাক্সগুলো পড়ে রইল পথের ধারে। গোলন্দাজরা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল কামানগুলো। আর সমস্তক্ষণ ফ্যাশিস্ট বিমানবাহিনী বোমা ফেলল রাস্তার ওপর; ছোট ছেলে-মেয়েরা বুকের ওপর নিজের নিজের পুতুলগুলো চেপে ধরে পাহাড়ের খোঁদলের আড়ালে রইল—

এই পুতুলগুলো কোনোক্রমে তারা সঙ্গে আনতে পেরেছে।

আতঙ্কিত এই জনতার স্রোত এগিয়ে চলেছে আবছা-নীল ওই দূরে পাহাড়ের দিকে, যার ওপারে ফ্রান্সদেশ। কিন্তু তেসা ফরাসী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছে, 'আশ্রয়-প্রার্থীদের ঢুকতে দিতে পারি না আমরা। ভয় দেখিয়ে সুবিধা আদায় করাটা পছন্দ করি না আমি। আর আমাদের মনে করুণা জাগিয়ে তুলে কমিউনিস্টরা তো তাই করতে চায়।' সুতরাং সীমান্তের প্রবেশ-পথ বন্ধ করে দেওয়া হল।

দু-একজন সেনাপতি তবুও সামরিক-প্রতিরোধ সংগঠিত করার চেষ্টা করলেন। সৈনিকদের ক্ষয়িষ্ণু মনের জোর জীইয়ে তোলবার জন্যে উৎসাহ দিতে লাগলেন তাঁরা, সীমান্ত থেকে পলাতক সৈনিকদের ধরে এনে সামরিক নিয়মে শাস্তি দিলেন। সাহস আর দৃঢ়তার আবেদন জানিয়ে ছোট ছোট খবরের কাগজ প্রকাশিত হল। সরকারী মন্ত্রীদের দপ্তর আর সামরিক বিভাগের কর্মচারীরা যাযাবরের জীবন যাপন করতে লাগল, দৈনিক একটা সীমান্ত-গ্রাম থেকে আর একটা গ্রামে জায়গা বদল করতে হল তাদের। জঙ্গলের আড়ালে, ছাউনীর নীচে, খামার-ঘরে টাইপ-রাইটার কাজ করে চলল খট্‌ খট্‌ শব্দে। গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্টের শেষ ঘাঁটি ফিগ্যেরা শহর বোমা ফেলে উড়িয়ে দিল ইতালীর বোমা-রুরা, গুঁড়িয়ে দিল তার পুরনো ধাঁচের বরান্দাওলা বাড়িগুলো, হত্যা করল সমস্ত আশ্রয়-প্রার্থীদের। কাটাছেঁড়া বিকৃত দেহগুলো পড়ে রইল ধুলো আর ধ্বংসের স্তূপে।

স্পেনীয় পার্লামেন্টের শেষ অধিবেশন হল মাটির নীচে এক ভাঁটি-ঘরে। দাড়ি-না-কামানো ক্লান্ত মুখ প্রতিনিধিদের সারা গায়ে ধুলো ঃ রাতজাগা নিদ্রাহীন চোখ লাল। জনৈক বৃদ্ধ ভাঁটি-ঘরে নামবার সিঁড়িটার ওপর একটা কার্পেট বিছিয়ে দিল, ব্যাখ্যা করে বলল, 'যাই বলো, এটা আমাদের জাতীয় প্রতিনিধি সভার অধিবেশন তো।' নেগ্রিন তার বক্তৃতায় বলল স্পেনের জনতার ধর্ম-যুদ্ধের কথা, হিটলার-মুসোলিনীর বর্বরতা আর ফ্রান্সের হৃদয়হীনতার কথা—যে ফ্রান্স নারী আর আহতদের দেশে ঢুকতে দেয়নি। বলবার সময় কয়েকবার সে হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল। আর সমস্তক্ষণ চতুর্দিকে বোমা লেগে জ্বলে-ওঠা গ্রামগুলো পুড়ে খাক্‌ হতে লাগল।

ফরাসী বাহিনীর আস্তানা যে গ্রামে সেখানে যখন গোলাবর্ষণের আওয়াজ এসে পেঁছল, মিশো বলল, 'ওই ওরা আসছে, ঠিক তাই! ওরা যেন আমাদের প্রাণ থাকতে ধরতে না পারে! দাঁড়িয়ে যাও!'

বেরিয়ে পড়ল তাদের বাহিনী। অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে সাহায্য করল তারা, শত্রুর একটা ট্যাঙ্ক-আক্রমণ প্রতিহত করল। ঘণ্টাখানেক ধরে বেশ জবরদস্ত একটা লড়াই হয়ে গেল—সত্যিকারের যুদ্ধ। মাদ্রিদ, তিরোল আর এব্রোর লড়াইয়ের উৎসাহে টিঁকে গেল তারা এবং শেষ কয়েক ঘন্টার জন্যে আবার জয়ের আভাসটুকু দেখা দিল। কিন্তু রাত্রিবেলায় একটা মোটর গাড়ি এসে পেঁছল ফৌজের ছাউনীতে—গুলির ফুটোয় গাড়ির ঢাকনিটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। গলার সঙ্গে ঝোলানো ব্যাণ্ডেজে বাঁধা হাত নিয়ে একজন ফ্যাকাশে-মুখ এ্যাড্‌জুট্যান্ট্‌ গাড়ি থেকে নেমে সবাইকে ডেকে বলল, 'আগামী কাল শেষ সৈন্যদল-গুলোকে অতি অবশ্য সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে।'

মিশো রাগের চোটে সত্যিই চিৎকার জুড়ে দিল; তার মতে লড়াই সবেমাত্র শুরু হয়েছে। রাগ চেপে রেখে ফরাসীরা সবাই উত্তর-মুখো রওনা হল।

সীমান্ত অঞ্চলটা দেখাচ্ছে বিরাট একটা ছাউনীর মতো। দু সপ্তাহ ধরে আশ্রয়-

প্রার্থীরা প্রবেশপথ খোলা পাবার অপেক্ষায় রয়েছে। শেষ ভেড়াটাকে তারা জবাই করেছে; দেরাজ, আলনা, কম্বল আর বাক্স-ভর্তি কাপড়চোপড় পুড়িয়ে উনুন জ্বেলেছে। কেন তারা এত সব জিনিসপত্র আনতে গিয়েছিল সঙ্গে করে? রাত্রে শীত পড়ে আর মেয়েরা আগুন জ্বেলে চারপাশে বসে শরীর গরম করে। গাধাগুলো ডেকে ওঠে। নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা ফৌজী-শিঙা বেজে ওঠে মাঝে মাঝে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ দালাদিএকে জানাল—স্পেনীয়রা যদি একেবারে সীমান্ত পর্যন্ত সরে এসে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়, তাহলে ফরাসী সীমার মধ্যেও সহজেই যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। সুতরাং দালাদিএ সীমান্তের প্রবেশ-পথ খুলে দেবার হুকুম দিল। শান্ত্রী আর সৈন্যের দল—এদের মধ্যে বেশির ভাগই সেনেগলের লোক—ঢুকে পড়ল আশ্রয়-প্রার্থীদের মধ্যে, খানাতল্লাসী করে কেড়ে নিল তাদের হাতিয়ার, গরু ভেড়া আর কিছু কিছু জিনিসপত্র। পেরপিঞাঁতে পুলিশ 'আটক মাল'-এর ব্যবসায় বেশ দু পয়সা করে নিল—বিশেষত রিভলবার, টাইপ-রাইটার আর ঘড়িগুলো বিক্রি হল খুব।

'পারী কমিউন' বাহিনীকে দেখে মোটেই মনে হবে না যে ওরা একটা পরাজিত সেনাদল। উড়ন্ত ঝাণ্ডা তুলে ধরে, কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে কুচকাওয়াজ করে সৈনিকরা ঢুকল। শুধু ওদের মুখচোখে ফুটে উঠেছে পরাজয়-বোধের তীব্র জ্বালাটুকু। এভাবে দেশে ফিরতে হবে—একথা ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এ যেন দেশ থেকে নির্বাসিত হবার মতো। ওদের অনেকেই বোমা-বিধ্বস্ত স্পেনের পোড়া জমিতে ফেলে আসা কামান-শ্রেণী আর সংসারের জিনিসপত্রের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে চোখের জল অতি কষ্টে সামলেছে।

সেনেগলীরা পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল—ফরাসীদের দিকে কি যেন চেঁচিয়ে বলল, ওরা বুঝে উঠতে পারল না। মিশো ওদের সেনা-নায়ক; রোদে-পোড়া জলে-ভেজা বিবর্ণ পুরনো পতাকাকে সামরিক অভিবাদন জানাল 'পারী কমিউন' বাহিনী। বিব্রত বোধ করল সরকারী ফরাসী বাহিনীর সাধারণ সৈন্যরা, কিন্তু সেনেগলী সৈন্যরা ভালো মনেই অতিরিক্ত শাদা দাঁত বের করে খুশির হাসি হাসল।

একজন পুলিশ মিশোর বন্ধু জুল-এর ব্যাণ্ডেজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে বলল, 'কিছু সোনাদানা ওখানে লুকিয়ে রেখেছে হয়ত।' টাট্কা ক্ষতচিহ্নটা দেখে দিব্যি গালল সে। ফরাসীদের ওরা নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিল এক ছাউনীতে; বলল, 'তোমাদের ব্যবস্থা পরে হবেখন। তোমরা সব সৈন্য-বাহিনী ছেড়ে পালিয়েছিলে।' এদের সঙ্গে আর সবাইকে পুরে দেওয়া হল—স্প্যানিয়ার্ড আর সুইড, বৃটিশ আর সার্ব, সন্তানকে স্তন্যদানরত নারী, বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গ্রাম্য ছেলেমেয়ের দল, কবি আর রাখাল আর সাংঘাতিক রকম আহত লোক। যারা পিছিয়ে পড়েছিল, সেনেগলীরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দিল।

কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে লোকের গাদগাদি—খোঁয়াড়ে ভেড়ার পালের মতো। ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়ায় ধুলো-বালি উড়ে এসে পড়ছে মুখে চোখে। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি শুরু হল। কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। কিছু রুটি তাদের দেওয়া হবে বলা হয়েছিল, কিন্তু কেউ দিয়ে গেল না। ছাউনীটা ঠিক সমুদ্রতীরের ওপরেই, সারারাত ধরে সগর্জনে ঢেউ ভেঙে পড়তে লাগল বালিয়াড়ির বুকে। মাঝে মাঝে দূরে গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

তেসার বন্ধু ডেপুটি পিয়ু এসে পৌঁছল পারী থেকে। শুল্ক বিভাগের আপিসে সে সারাদিন বসে রইল স্প্যানিশ ফ্যাশিস্টদের আসার অপেক্ষায়। দূরবীন চোখে লাগিয়ে লাল আর হলদে রঙের পতাকাটা দেখতে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। মিনিট পনের বাদে স্প্যানিশ জেনারেলের কাছে নিজের নামের কার্ড দিয়ে বলল, 'আপনাদেব এই মহান জয়লাভে আমি অভিনন্দন জানাই।' জেনারেল মশাই উত্তরে অনুগ্রহের হাসি হাসলেন।

দিন কেটে যেতে লাগল। ছাউনীর বন্দীরা খিদের যন্ত্রণায় ভুগল; অগভীর কুয়োটা থেকে প্রস্রাবের গন্ধ উঠল; এসে পৌঁছতে লাগল ভ্রমণকারীর দল; স্পানিয়ার্ডদের দিকে তারা এমন ভাবে তাকাল যেন ওরা কোন চিড়িয়াখানার বন্য জন্তু; রক্ত-আমাশা আর নিউ-মোনিয়ায় যারা মারা পড়ল, তাদের মৃতদেহগুলো প্রতিরাত্রে গাড়ি বোঝাই হয়ে চালান হয়ে গেল।

পেরপিঞা হাসি-খুশি দিল-খোলা গোছের শহর; এখানকার লোকে বাদামের বরফি খায়, কড়া পচাই মদ টানে, ময়দানে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে সামরিক বাজনা শোনে আর পপুলার ফ্রণ্টের পক্ষে ভোট দেয়। এবার লোকের তল্লাশে পেরপিঞায় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। ইস্কুলগুলো গারদখানায় পরিণত হল। পুলিশ ফিরতে লাগল আত্ম-গোপনকারী স্প্যানিয়ার্ডদের সন্ধানে। স্প্যানিশ মেয়েদের খালি মাথায় ঘোরাফেরা অভ্যাস; বৃথাই তারা তাদের শেষ পয়সা পর্যন্ত খরচ করে এবারকার শীতের ফ্যাশন অনুযায়ী ছোট ছোট টুপি কিনলঃ তাদের কান্না-ফোলা চোখেই ধরা পড়ে গেল তারা।

অনেক ফরাসী মেয়ে-পুরুষ স্প্যানিয়ার্ডদের গোপন আশ্রয় দিল তাদের চিলে কোঠায়, ভাঁড়ার ঘরে, পায়খানায় আর রাখালদের কুঠরীতে। হাজার হাজার শুভাকাঙ্ক্ষী পাহাড়ী উৎরাইয়ের অজানা বাঁক ঘুরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল আশ্রয়প্রার্থীদের।

অত্যন্ত বিষন্ন এই সন্ধ্যাটা। ছাউনীর এক শান্ত্রী একজন স্প্যানিয়ার্ড্-এর মুখে ঘুষি মেরেছিল। এ অপমান সইতে না পেরে স্প্যানিয়ার্ডটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বন্দীদের সকলেরই মনমরা ভাব। তার ওপর আবার রুটির দৈনিক বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তারা পাচ্ছে মোট সাড়ে চার তোলা। মিশো তার অংশটা ফার্নাণ্ডেজ্‌কে দিয়ে দিল; ফার্নাণ্ডেজ একজন স্পেনীয় শিল্প-শিক্ষক—যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ঘাঁটির সন্ধান এনে দিত যারা, তাদের একটি দলের নেতৃত্ব করেছে সে।

মিশো বলল, 'নিদারুণ লজ্জার কথা! তুমি হয়তো অতোটা খারাপ ভাবে নিচ্ছ না; এর জন্যে তোমরা দায়ী নও। কিন্তু আমি তো ফরাসী।'

ফার্নাণ্ডেজ্ বোকার মত বলল, 'কি জানি! আমি এর আগে কখনো দেশের বাইরে যাইনি। এই প্রথম...'

'তুমি অন্যদের—আমাদের কমরেডদের—অবস্থা জান না, এই আমার দুঃখ। সত্যি বলছি তোমায়—অন্য ধরনের ফরাসীরাও আছে। কিন্তু কোথায় তারা? কতজনাই বা হবে? ফ্রান্স এক সময় অন্য রকম ছিল। আমাদের বাহিনীর নাম দিয়েছিলাম 'পারী কমিউন'। কী সুন্দর নামটা! ওরা তো কই ওদের বাহিনীর নাম দিতে যায় না 'মিউনীক বাহিনী'। আমাদের সমস্যাটা কি জান? ভারি সহজ আমাদের ফ্রান্সের এই জীবনযাত্রা। ১৯১৪-র যুদ্ধ লোকে ভুলে গেছে। নিজেদের মধ্যে ওরা বলাবলি করে, 'হাঙ্গামা চুকে গেছে; আর কিছু হবে না; আমাদের বুদ্ধিটা বেড়েছে।' যেন যুক্তি দিয়ে

সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচা যায়। বড় বেশি রকম ভালোভাবে আছে ওরা। ওরা ভালো খেতে পায়, মেয়েরা রূপসী, সমুদ্রতীর আছে, পাহাড় আছে, বাগান আর কাফে আছে সর্বত্র, আর আবহাওয়াটাও নাতিশীতোষ্ণ। সুতরাং ওরা যে কেবল বিপদের কথা ভাবতে ভয় পায় তাই নয়, বিপদকে অবজ্ঞা করে। কুড়ি বছর আগে ওরা রুশদের অবজ্ঞা করত—আমি তখন শিশু মাত্র, বেশ মনে আছে আমার—ওরা হাসাহাসি করে বলত, 'রুশরা তো নিজেরাই খাবার রুটি পায় না, পরার পাৎলুন পায় না, ওরা আবার গোটা পৃথিবীটাই বদলে দিতে চায়।' এখন ওরা স্প্যানিয়ার্ডদের বিদ্রূপ করে বলে, 'ওরা তো খুব আত্মসম্ভ্রমের কথা বলত, কিছুতেই নাকি 'নতজানু' হবে না ওরা—এখন তো সেই আমাদের দোরে এসেই আশ্রয় চাইতে হল।' এদের সমস্ত জীবন-দর্শনটাই কী সংকীর্ণ! আর বিপদটা ওরা দেখতেই পাচ্ছে না। বন্ধুতা আর বিশ্বাসের সহজ অনুভূতির ওপর ওদের কোনো ভরসা নেই। আমার মনে হয়, ফ্রান্সের মুক্তি আসবে একমাত্র চরম দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে—নিদারুণ সাংসারিক দুঃখ।'

ওদের মাথার ওপরে লক্ষ তারা জ্বলতে লাগল। ঢেউয়ের চাপা গর্জন ভেসে এল সমুদ্র থেকে। মার্চ মাসের ঝড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ছাব্বিশ

ফোটোগ্রাফখানার দিকে তাকিয়ে জোলিও হাসল। তরুণী অভিনেত্রীটি এক গ্যাস-মুখোস পরে নিজের ছবি তুলিয়েছে। বুক-কাটা পোশাকে তার নারীসুলভ আকর্ষণী-শক্তিটা বেশ একটু দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার মুখোশপরা মুখখানা দেখাচ্ছে শুয়োরছানার থাঁদা শুঁড়ের মত। জোলিও তার সেক্রেটারীকে বলল। 'হংক্-হংক্ পরিহিতা চিত্রতারকা। এটা ছাপব আমরা। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল, আজ 'বাসন্তী-মঙ্গলবারের' উৎসব দিবস।'

এক সময়ে এই 'বাসন্তী-মঙ্গলবার' ছিল ছুটির দিন। বুল্ভারে জনতার ভিড়, প্রমোদ শোভাযাত্রায় সাদা কোর্তা পরা সঙ, আঁট-সাঁট পোষাক-পরা ভাঁড়, পথ-চল্‌তি যৌথনৃত্য, অদ্ভুত সব টুপি, জরী সুতো লাগানো কালো মখমলের মুখোশ আর রঙচঙে খাবার—এসব জোলিওর মনে আছে। পরে এই প্রমোদ-উৎসবটি ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসে। তা হলেও, বাসন্তী-মঙ্গলবারের এই দিনটিতে আগেকার সেই সঙ-যাত্রার খানিকটা আভাস এখনো বজায় আছে; বহুরূপীর দল ঘুরছে কাফেগুলোয়, নকল নাক আর দাড়ি লাগিয়ে মুখোশ-পরা ছোট ছেলেরা টহল দিচ্ছে পথে পথে। কিন্তু এ মুখোশগুলো আর আগেকার দিনের মুখোশ নয়—এবার ওরা পরেছে হংক্-হংক্ গ্যাস-মুখোশ। গুরুভার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল জোলিও—নিজের প্রত্যেকটি কাজেই সে একটা করুণ দুঃখের ছোঁয়াচ লাগায়—কিন্তু তাই নিয়ে কেউ তাকে ঠাট্টা করলে সে সর্বদা বলে, 'পারীর লোক যুক্তিটাই ব্যক্ত করে, মার্সাইএর লোক ব্যক্ত করে তার অনুভূতিকে।'

জোলিওর কাজকর্ম দিব্যি চলছে; গোপন সরকারী তহবিল থেকে মোটা টাকা

পাচ্ছে সে। উপহারের বোঝায় স্ত্রীকে অভিভূত করে তুলেছে : একটা নীলার কণ্ঠহার, এক বাক্‌স গয়না—বিশেষজ্ঞদের মতে এটা নাকি মাদাম রেকামিএ-র সম্পত্তি ছিল, আর লণ্ডনের বিখ্যাত জহরতের দোকান 'ক্রাফ্‌ট'-এর প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাওয়া একটা স্ফটিক-ভাস্কর্য। জোলিও রীতিমত একদল ফাল্‌তু লোকের ভরণপোষণ করে : নিষ্কর্মা সাংবাদিক, মার্সাইএর পদ্য-লিখিয়ে, ক্লিষ্ট-হৃদয় জোচ্চোরের দল—যারা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে নিজেদের নাম দিয়েছে 'নৈরাজ্যবাদী।' আজকাল আর কেউ জোলিওকে মানহানির মামলায় অভিযুক্ত করতে সাহস পায় না। ডেপুটিরা তার খোসামোদ করে, বৈদেশিক রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের সংগে সে খানা খায় আর নিজের সেক্রেটারীকে তাচ্ছিল্যের সংগে বলে, 'রুমানিয়া সম্বন্ধে একটা কথাও নয়! হাংগেরিয়ানরা অনেক দরদী; তাছাড়া, ওদের দৃষ্টিভঙ্গিও ঢের উদার......'

জোলিওর এই সাফল্য সত্ত্বেও, তাকে দেখে কেমন যেন বুড়োটে আর নির্জীব বলে মনে হয়। এমন কি, চুনির চোখ বসানো নীলমণির কাকাতুয়াওলা গলাবন্ধনীর ওই নতুন কাঁটাটাও যেন তার চেহারায় উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। তার পৃষ্ঠপোষকদের জটিল খেলায় সে ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। আপন মনে বলে, 'কি যে লিখি নিজেই বুঝি না।'

তেসা একদিন তাকে বলল, 'লাল-ফৌজের সামরিক দুর্বলতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখো। ইতালীয় দূতাবাসের সামরিক পরামর্শদাতার বিবৃতির সংগে মিল থাকা চাই লেখাটায়।'

দু দিন বাদেই তেসা আবার দাবি জানাল, 'রাশিয়ার সামরিক উপকরণ অফুরন্ত—এই কথাটার ওপর খুব জোর দিয়ে লেখা চাই।'

আজ সকালে তেসা আবার তাকে টেলিফোনে ডাকল: 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি হতে চলল। উপনিবেশগুলোর সংগে যোগাযোগ রাখা আমাদের পক্ষে বিশেষ জরুরি। কিন্তু মধ্য আর পূর্ব ইউরোপ সম্বন্ধে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই।'

জোলিও লেখাটা শুরু করল : 'শ্রীযুক্ত মারসেল্‌ দীত্‌ কথাটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—ডানজিগের জন্যে আমরা মরতে চাই না...' এর পরে কী লিখবে সে? তারপরে হঠাৎ তার ভাবের উৎস খুলে গেল, ডান চোখটা কুঁচকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লিখে চলল, 'মরতে চাই না আমরা ওয়ারশর জন্যে, বেল্‌গ্রেডের জন্যে, বুখারেস্টের জন্যে......' অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে নিজেকে এলিয়ে দিল সে। লেখাটা ঠিক মতো পরিবেশন করাটাই আসল ব্যাপার। 'মৃত্যু' কথাটা বড়ো অক্ষরে ছাপতে হবে; আর, প্রবন্ধটার নিচে ওই হংক্‌-হংক্‌-এর ছবিটা।

'লা-রিপাব্‌লিক' পত্রিকার সম্পাদক গেজিএ-র সংগে সে মধ্যাহ্ন-ভোজন করল। চেরী ফলের টক-মদে ভেজানো মিষ্টি কেক খেতে খেতে খাবার মুখে গেজিএ কৌতুক করে বলল, 'স্রেফ যতো সব বাজে খথা। চেম্বারলেন নাকি ইতালিয়ানদের টিউনিসিয়া দিতে চেয়েছে; আর যনে চেঁচাচ্ছে : তামরা বরং ওদের মাল্‌টা দিয়ে দোব! দস্তুরমত বেশ্যাবাড়ির ব্যাপার! কাল আমায় দালাদিএ বলল, 'যৌথনিরপত্তা সম্বন্ধে একটা কথাও বলা চলবে না।' আগামীকাল আমরা ইহুদী-উপদ্রব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ ছাপাচ্ছি। কথা-প্রসংগে বলে রাখি, প্রবন্ধটা একজন ইহুদীর লেখা। ওই যা বললাম, রীতিমতো বেশ্যাবাড়ি আর কি!'

খানিকটা আর্মাঞাক্ মদ খেল ওরা। গোঁজিএ-র তাড়াতাড়ি যাবার দরকার ছিল, জোলিও খানিকটা হাওয়া খাবার উদ্দেশ্যে হেঁটে ফিরল তার আপিসে; আপন মনে বলল, 'গোঁজিএটা একটা বোকা শয়তান। এর সঙ্গে মাল্টার সম্বন্ধ কি? মাল্টা কি ইউরোপে?' প্লাস্ দ্য লে-তোয়াল পর্যন্ত সে বুলেভার ভাগ্রাঁ ধরে হেঁটে এল। আবহাওয়াটা যখন তখন ভোল বদলাচ্ছে; যেই সূর্য ওঠে অমনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চারদিক, বাদাম গাছের কুঁড়িগুলো পাঁপড়ি মেলে, সুন্দর দেখায় মেয়েদের মুখগুলো; তারপরেই ঠান্ডা ভারী মেঘ জমে ওঠে আর শীতের বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। স্কোয়ারটায় পোঁছে জোলিও 'অজ্ঞাত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভে'র কাছে থেমে গেল। সেই চিরাচরিত দৃশ্য—বিবর্ণ আলোর শিখা, ফুলের গুচ্ছ, মফস্বলের দর্শকদল। স্তম্ভের ওপর বিরাট খিলান। জায়গাটা জোলিওর মনে সর্বদাই একটা আবেগের ভাব জাগায়। কখনো সে টুপি নামিয়ে নেয় মাথা থেকে, কখনো বা শিস দিয়ে 'লা-মার্সাই' গানের সুর ভাঁজে। তার বয়সের অধিকাংশ লোকের মতোই সেও যুদ্ধের বছরগুলোকে তারুণ্যের আর আত্মিক পরিপূর্ণতার যুগ হিসেবে দেখে। এমন কি, একটা আবেগ-মেশানো স্নেহের সঙ্গেই সে স্মরণ করে—সার্জেন্টের হেঁড়ে গলা, সেই খাটিয়াটি যার ওপর তাকে টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে দু মাস পড়ে থাকতে হয়েছিল, কুচকাওয়াজ করে উৎরাই পার হবার আগে সেই বিশ্রী অসুস্থ অনুভূতি আর কন্‌কনে ঠান্ডা, আর সেই যখন ফৌজকে রম্-মেশানো কফি খেতে দেওয়া হয়েছিল আর তারা ব্যগ্রভাবে হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিল গরম টিনের পাত্রগুলো। প্রত্যেকটি কমরেডের কথা তার মনে আছে—বেঁটে মোটা দরনিএ, ক্ষীণদৃষ্টি দেভাল আর ফুর্তিবাজ ক্রেম্যা—যুদ্ধে মারা পড়েছিল ও বেচারী!

এই স্তম্ভের নীচে গোর দেওয়া হয়েছে কাদের?—ক্রেম্যা? হতেও তো পারে। ক্রেম্যা আজ ফুলের তোড়া উপহার পাচ্ছে, তাকে সামরিক সেলাম দিয়ে যাচ্ছে জেনারেলরা, বৈদেশিক রাজদূতরা আর তেসা। বেচারী ক্রেম্যা—ইহুদীদের সঙ্গে তার কি কোনো শত্রুতা থাকতে পারত! ও তো বিয়ে করতে চেয়েছিল মার্সাইএর এক মেয়েকে।

জোলিওর মনে পড়ল 'ডানজিগের জন্যে আমরা মরতে চাই না।' তাহলে ক্রেম্যা মরল কিসের জন্যে? ওরা বলত 'ফ্রান্সের জন্যে।' মার্সাইএর সেই মেয়েটির হয়তো আর কারুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। এমন কি মরেও যেতে পারে মেয়েটা—এক শতাব্দীর সিকিভাগ কেটে গেছে!

আপিসের চিরাচরিত কর্মব্যস্ততায় জোলিও সান্ত্বনা পেল; আর ভাবতে পারে না সে। মন্ত্রীদের দপ্তর থেকে একটা প্রবন্ধ পাঠানো হয়েছে; প্রবন্ধটার নাম,, 'ইতালীঃ পূর্ব-ইউরোপে লাতিন-সংস্কৃতির দুর্গ-প্রাকার।' কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় হংক্-হংক্ মুখ ভেঙচাচ্ছে। বাইরে রাস্তায় কাগজউলী মেয়েরা আনুনাসিক তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচাচ্ছে, 'পঞ্চম সংস্করণ! আমরা মরতে চাই না।'

সেদিনের মতো কাজ শেষ করে জোলিও এল এক প্রমোদ-জলসায়। এরা অনেক দিন থেকেই এখানে একবার আসবার জন্যে তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে। মুখে পুরু করে রঙের প্রলেপ লাগিয়ে একজন তরুণ গায়ক গান ধরেছেঃ

'আগামীকাল বাঁচিই যদি, তবে—
থোড়াই কেয়ার করি তারপরে কি হবে!'

শ্রোতার দল ধুয়ো ধরলঃ 'থোড়াই কেয়ার করি তারপরে কি হবে!' আজ যে

'বাসন্তী মঙ্গলবার' সে কথা মনে পড়ে যাওয়ায় জনৈক অভিনেতা একটা মুখোশ পরে মঞ্চের ওপর এল—লম্বা নাকওলা সাদা মুখোশটার দুই চোখের কাছে দুটো ফুটো। হল থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'মৃত্যু!' আরেকজন বলল, 'বাজে কথা! ও হল গিয়ে তেসা। ওই তো ওর নাক।'

এই অসম্ভব বাজে হাস্যকৌতুকে বিরক্ত হয়ে জোলিও বাড়ি চলে এল। খাবার ঘরে বসে তার স্ত্রী একটা খবরের কাগজ পড়ছে। নিজের কাজকর্মেই সে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত, তাই জোলিওর কাজকর্ম সম্বন্ধে সে কখনো কোনো প্রশ্ন তোলে না। দরজি, দোকানদার আর পোশাকের হাল-ফ্যাশান নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু সম্প্রতি সে মনে মনে না ভেবে পারেনি, 'কী যে সব কাণ্ড! খবরের কাগজে কি বলতে চায় ওরা এ সব?' শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলে ফেলল স্বামীকে, 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

জোলিও হাত দুটো নাড়লঃ 'আমিও ছাই জানি না কি? কি যেন একটা ফন্দি আছে ওদের। কে জানে, হয়তো তাও নেই, শুধু ভান করছে। ওদের চালাকির ওপর শ্রদ্ধা ছিল আমার, কিন্তু এখন আর কিছু বুঝে উঠতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়—ভয়ের চোটে ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।'

স্ত্রী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপরে ফিসফিসিয়ে বললঃ 'তুমি জার্মানদের কাছ থেকে কিছু নিচ্ছ না তো? বড়ো দুর্ভাবনায় আছি আমি। ওরা এর জন্যে গুলি করতে পারে লোককে।'

জোলিও চেঁচাতে লাগল, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! এমন ধারণা কি করে ঢুকল তোমার মাথায়? আমাকে পয়সা কড়ি দেয় কারা! নিজের দেশের লোক এই ফরাসীরা দেয়, দেয় গভর্নমেন্ট!'

তারপরে হঠাৎ বিড়বিড় করে বলল, 'প্যারীর জন্যে মরা। বেচারী ক্লেম্যাঁ!'

শ্রীমতি জোলিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না তার কথার মানে।

সাতাশ

'কেমন আছেন?'

'এই এক রকম। আপনি?'

উত্তরটা না শুনেই দেসের এগিয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, সবাই যদি এই সব প্রশ্নের উত্তরে সত্যি কথাটা বলত, তাহলে কি রকম হত সেটা? বিরামহীন শোক আর আতঙ্কের জবানবন্দী চলতেই থাকত। কিন্তু একটা বাঁধাধরা বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে—তেসার বক্তৃতা, গির্জার প্রার্থনা কিংবা প্রণয়ীর শপথ বাক্যের মতোই। এ ধরনের উক্তির একটা সৌজন্য আছে—সব কিছুই যদি নগ্নরূপে প্রকাশ পেত তাহলে তো বাঁচাই হয়ে উঠত অসম্ভব।

দেসের যে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে, একথাটা কেউ আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। তার ব্যবসাগুলো ফেঁপে উঠছে; শিকাগো আর লিভারপুল আগের মতোই তার হুকুমের অপেক্ষায় থাকে। দালাদিএর সঙ্গে তার ঝগড়া আর হরতালের আগে তার সেই বক্তৃতা নিতান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঁতানির ধারণা, ওটা নেহাৎ দেসেরের 'মৌলিক কিছু করার চেষ্টা'। কথাটা শুনে তেসা মাথা নেড়ে তারিফ জানিয়ে বলেছে, 'ভারী চালাক লোকটা। সব তাল ও সামলাবে, দেখো। শয়তানের মত ওর চারদিকে চোখ......!'

দেসের কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। খেলেই চলেছে সে, কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলুড়ের আসনটা শূন্য—একটা নকল প্রতিমূর্তির সঙ্গে সে খেলছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তার কাছে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো মনে হয়। ইদানীং রোজ রাত্রে সে বাইজান্টিয়মের এক বিরাট ইতিহাস পড়ে, আর পড়তে পড়তে তার হাসি আসে—কোথায় গোলমাল হয়েছে সেটা সবাই জানে, কিন্তু সর্বনাশকে রুখবার উপায়টা কারুর জানা নেই।

অবশ্য মিউনিক ছিল আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। যে কোনো উপায়ে চুক্তিতে আসাটাও অবশ্য দরকারী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই উপায়টা কি? আর চুক্তিটাই বা কার সঙ্গে? উন্মত্ত ঝড়ের সঙ্গে? ভেল্কিবাজী! যত সব বুজরুকি!

পঞ্চাশ বছর বয়স হবার আগে পর্যন্ত দেসের কোনো গুরুতর রোগে ভোগেনি। রীতিমতো মদ খায় সে, অবিরাম পাইপ ফোঁকে, আর কোনদিনই যথেষ্ট ঘুম হয় না তার। এখন হঠাৎ ভুগতে আরম্ভ করল। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে ভারী খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে, ডাক্তারদের পরামর্শ খুব মন দিয়ে শোনে, কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপত্রের নির্দেশ মেনে চলতে তার ভারি বিরক্তি—আগেকার মতই বিশৃংখল বেপরোয়া জীবনযাপন করে যেতে থাকল সে। এমন কি আগের চেয়েও বেশি করে মদ খেতে লাগল। মৃত্যুভয়টা বেড়ে গেল। রাত্রে স্পোর্টস-মোটরগাড়িটায় চেপে পারী থেকে বহু মাইল দূরে চলে যায়, তারপরে রাস্তার ধারে কোনো ছোট্ট কাফের পাশে গাড়ি থামিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে আর হাল্কা মদ খেতে খেতে রেল-মজুরদের সঙ্গে গল্প করে, আলোচনা করে আবহাওয়া সম্বন্ধে।

তার চিন্তায়, মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় আর ব্যবহারে যে একটু জড়তা আছে, সেটাই আরো অনেক লোকের মতো দেসেরকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজকর্ম সে যথারীতি করে চলেছে, আরো দুটো নতুন কারখানা খুলেছে, রোমের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছে। এসব কাজে বিশেষ কোনো উৎসাহ সে পায়নি, কিন্তু কাজের মধ্যে সে সান্ত্বনা পায়। বাইজান্টিয়মের শক্তি হ্রাস আর পতন, হৃদপিণ্ডের বাতরোগ, কিংবা নিজের একাকীত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার চেয়ে এসব অনেক সহজ।

এমন কি, কিছুক্ষণের জন্যে আত্মবিস্মরণের আশায় সে মাঝে মাঝে জেনেতের সঙ্গে গিয়েও সময় কাটায়. ওই 'মাথাপাগলা মেয়েটা'র সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছে বলে স্বীকার করে না। জেনেতের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়ে আসার পর নিজেকে তার আরো বেশি একা বলে মনে হয়। বাড়ি ফেরার পথে মনে মনে ভাবে, 'তবু যেন ঠিক জিনিসটি হল না'—কিন্তু নিজেই জানে না কি সে চায়।

বেশ ঘন ঘন ওদের মধ্যে দেখা হয়। পারীর শহরতলীর ছোট ছোট কাফেগুলোয় দুজনে যায়। মাঝে মাঝে জেনেৎকে নিয়ে দেসের নির্জন জলে-ভেজা রাস্তা দিয়ে ঘন্টায়

নব্বুই মাইল বেগে মোটর চালিয়ে দেয় আর দেসেরের গতি-চাঞ্চল্য জেনেতের মনেও সংক্রামিত হয়ে যায়। তারপরে আবার একই পথ ধরে ফিরে আসে, সাড়ম্বরে জেনেতের হাতে চুমু খেয়ে সেদিনের মতো বিদায় নেয়। যখনই কোনো ক্লান্তিকর টেলিগ্রাম আসে কিংবা স্তূপীকৃত কাজের চাপ তাকে লেখার টেবিলে আটকে রাখে, শুধু তখনই সে জেনেতের ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে। এমন কি দেসেরের আবেগগুলো যেন প্রাকৃতিক বিশৃংখলার মতোই, মনের সংগে বোঝাপড়া করে তা দমন করা যায় না।

সেদিন জেনেতের জন্যে সে স্টুডিওতে এসে হাজির হল। কোনোদিন সে জেনেতের গলা রেডিওতে শোনেনি। কেমন যেন তার মনে হয়েছে—শোনাটা ঠিক নয়; কই, জেনেৎ তো তাকে ফাটকা বাজারের কোনো কথা জিজ্ঞেস করে না! অপেক্ষা করতে বলা হল তাকে—এনে বসানো হল লাল রঙের ভারী পর্দা-টাঙানো এক ফাঁকা ঘরে। জেনেতের গলা শুনতে পেল সে ঃ কি একটা কবিতা আবৃত্তি করছে। দেসেরের মনে হল, কোন স্কুলপাঠ্য কবিতার বইয়ে যেন কবিতাটি সে দেখেছে ঃ

‘মৃত্যুও শাসন মানে তোমার প্রেমের
উদ্বেল উচ্ছ্বাস তার পৃথিবীর সীমানা ছাড়ায়।
সংসারের খেয়াঘাটে খুঁজে নেব মোরা দুইজনে
স্মরণের পরপারে দূরযাত্রী স্বপ্নের জাহাজ
আলোঝরা সেই স্বর্গে আমাদের মুক্ত-অভিসার।’

—এর বেশি আর তার কানে গেল না। ঘন কুয়াশার মতো বিষণ্ণতা নেমে এল তার মনের পটে।

জেনেৎ আসতে সে বলল, ‘চমৎকার আবৃত্তি করছিলে তুমি।’

হেসে উঠল জেনেৎ ঃ ‘ওটা একটা বিজ্ঞাপন—চোখের জন্যে এক ধরণের সুর্মা।’

একসংগে বেরোল তারা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। জেনেৎ জিজ্ঞাসা করল—‘যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?’ স্টুডিওর কথাবার্তা মনে পড়েছে তার—দেসের জানতে পারে হয়তো। কিন্তু দেসের শুধু বলল, ‘আমি তো আর ভবিষ্যদ্বক্তা নই।’

ছেঁড়াখোঁড়া একটা পুরনো ধাঁচের কোট গায়ে দিয়ে একটা মেয়ে ওদের দুজনের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল; হাতে নানান জিনিসের মোট আর থলি বয়ে নিয়ে যেতে যেতে মেয়েটি আপন মনে বিড়বিড় করছে, ‘ওর গলার নলিটা ফুটো করে দেব আঙুল দিয়ে। বেশ হবে তাহলে!’ দেসের ফিসফিসিয়ে বলল, ‘পাগলী!’ অস্বস্তি বোধ করায় তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠল গাড়িটায়। গাড়ি চালাবার চাবিটা টিপতে একটু দেরি করল দেসের—মুহূর্তের জন্যে বসে রইল আচ্ছন্নের মতো। তারপর চলতে শুরু করল তারা। ভিজে জানলার কাঁচে লাল আর সবুজ আলোর ঝল্‌কানি খেলে যেতে লাগল। মোটর গাড়ির সামনের আলো দুটো অন্ধকারের বুকে আলোর ঢেউ তুলেছে, আর সেই আলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বৃষ্টি-ভেজা গাছগুলো। দেসের জেনেৎকে নিয়ে এল শহরতলীতে তার নিজের বাড়িতে। জেনেৎ যেতে চায় কিনা, সে কথা সে জিজ্ঞেস করেনি। সমস্ত পথটা সে একেবারে মুখ খোলেনি বললেই চলে।

বাড়ি পৌঁছে সে জেনেৎকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি এগিয়ে দিয়ে বলল—‘এক ঢোক খেয়ে শরীরটা গরম করে নাও। তোমার আবৃত্তিটা চমৎকার হয়েছে, সত্যি। থিয়েটারে যাওয়া

উচিত ছিল তোমার। মনে আছে বোধহয়, একবার বলেছিলে—তোমায় প্রযোজকের টাকা ছিল না; সেটা খুব সামান্য ব্যাপার।'

জেনেৎ মাথা নেড়ে বলল, 'না, আজকাল আর অভিনয় করতে পারি না আমি। আবৃত্তি করার সময় অভিনয়ের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করতে হবে তোমায়। যদি না করো, তাহলে শ্রোতার দলও তা বিশ্বাস করবে না। সে রকমটি হলে, নিঝুম নাটমহলে তোমার গলার স্বর হারিয়ে গেছে বলে মনে হবে। বুঝতে পারছ না? এই যেমন আমি হারিয়ে ফেলেছি সেই আগের আমিকে। এক সময়ে আমার বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর—তখন আমি একজন অভিনেতার সঙ্গে থাকতাম। লোকটা নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো, আর আমি ওর পাশে শুয়ে রাসীন-এর 'ফেদর্' থেকে আবৃত্তি করতাম...'

বাইরে বাগানে চলে এল জেনেৎ। ভিজে পাতা আর মাটির সোঁদা গন্ধ উঠছে—খুব শিগগির বসন্ত এসে যাবে; বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্ শব্দটা দ্রুত পদধ্বনির মতো মনে হল জেনেতের—আগ্রহভরে সে নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিল তাজা হওয়া। দেসের ডাক পাড়ল, 'ঠান্ডা লাগবে তোমার!' উত্তর দিল না সে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিবিড় একটা সুখ যেন নাগালের মধ্যে এসে গেছে বলে তার মনে হল, এবং আর একবার এই স্বপ্নকে সে বিশ্বাস করে বসল—ফ্ল্যারিতে যেমন করেছিল। ঘরে ফিরে এসে দেসেরের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে সে হাসল। বিব্রত বোধ করল দেসের, কিন্তু জেনেৎ বলল, 'না। ঠান্ডা লাগবে না আমার। বড়ো অভিশপ্ত জীবন আমার, দেসের, আমার মরণ নেই।'

বিষণ্ণ মনে আবেগের সঙ্গে দেসেরকে চুমু খেল সে—কিন্তু নিজেই বুঝে উঠতে পারল না—কেন সে এরকম করছে। দুঃখ আর অপমান ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু নেই; কিন্তু সেই রাত্রে বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্ শব্দ শুনতে শুনতে জেনেৎ কবিতার কথাগুলো আরেকবার আবৃত্তি করল,

'সোনাঝরা বসন্তের গান যেথা চির-মর্মরিত
বেদনা-ভাবনা-মুক্ত শান্ত মগ্ন মন
মৃত্তিকার রসস্নিগ্ধ শ্যামল সোনালী ফুলে ফুলে
মাটির বুকের কাছে শিহরিত বেনুকুঞ্জবন
সেথায়, অথবা স্বর্গে পায়ে দলে ফুলঝরা পথ
পাশাপাশি মোরা কভু ভুলিব না প্রেমের শপথ।'

হঠাৎ দেসের জিজ্ঞেস করল, 'জেনেৎ, এত বিষণ্ণতা কেন?'

'এটা বিষণ্ণতা নয়। বিষণ্ণতা ছিল ফ্ল্যারিতে—আমাদের সেই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে যেখানে; কিংবা হয়তো এই কবিতাটির মধ্যে। কিন্তু এটা হচ্ছে হতাশা। সেই পাগলীটাকে মনে পড়ছে? তোমার জীবনটাও অভিশপ্ত; দেসের—এখন বুঝতে পারছি।'

একথা বলে জেনেৎ তাকে আবার চুমু খেল।

সকালে তারা ফিরে এল পারীতে। দেসেরকে নিয়ে খবরের কাগজগুলো কেন যে এত হৈচৈ করে জেনেৎ তা বুঝে উঠতে পারে না। ওরা যেন তাকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করে; বলে—'মুকুটহীন সম্রাট'। আসলে ও কিন্তু অত্যন্ত দুস্থ, ওর মনটা ফাঁকা। আর, ও এসেছে জেনেতের কাছে—তার কাছে ও নাকি আত্মার মুক্তি খুঁজে পাবে—কী অসম্ভব রকম উপহাস্য এই কথাটি! ওর ছেলেমানুষি দেখে দুঃখ হয় জেনেতের। দেসেরও দুঃখ পায় জেনেতের জন্যে। কিন্তু করুণার ভিত্তিতে প্রেমের সৌধ গড়ে তোলা যায় না। কাব্যের

কথাই যদি ওঠে। তাহলে ওটা তো বিজ্ঞাপন মাত্র—মুখে মাখবার ক্রীম, ঘর পরিষ্কার করার যন্ত্র আর স্মরণের পরপারের স্বপ্নের স্বর্গ। ও কোনোদিন অভিনেত্রী হতে পারবে না; কোনোদিন বিয়েও করবে না তাকে। দেসের এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করায় ও হেসে উঠেছিল—না, 'মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী' হতে চায় না সে। দেসের তার নিজের কাজকর্ম নিয়ে নিজে থাকুক, সেই ভাল। এই যেমন কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে যেতে হবে কাজে—মজুররা যেমন যায়, গিয়ে বসতে হবে তাকে নিজের টেবিলটায় আর লাখের সংখ্যায় হিসেব গুণ্‌তি করতে হবে। জেনেৎ যে তার মতোই দুস্থ, এ কথাটা দেসের বুঝতে চায় না কেন? তার তো সবই লুঠ হয়ে গেছে—নিজের কিছুটা সে দিয়েছে ফিজেকে, বাকিটা লুসিয়ঁকে। এখন তার কিছু নেই আর। কালকের সেই কথাগুলো জেনেৎ বলেনি—ওগুলো বাদল-দিনের আপন কথা, কবি রঁসার্-এর কথা। একমাত্র আঁদ্রের সঙ্গেই জেনেৎ তার স্বাভাবিকতা ফিরে পায়, কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি পেয়ে আত্মকরুণা ভুলে যায়। আঁদ্রের জীবনযাত্রা জেনেতের মতোই—একটা উদ্দেশ্যমুখীতা আছে ওর জীবনে। না, তা বললে ঠিক কথাটি বলা হয় না...ও বলেছিল, 'এক ধরনের চারা গাছের মতো যা মাঠ থেকে মাঠে ভেসে বেড়ায়।' শুধু তারাই দুজনে ভিন্ন লক্ষ্যে ভেসে চলেছে। জেনেৎ কোথায় যেন পড়েছিল—এক ধরনের লোক আছে যারা 'শিল্পের বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন।' কিন্তু কেবল আঁদ্রের কথাই বা সে ভাবছে কেন? এর সহজ উত্তর এই যে, সে ভালবেসেছে আঁদ্রেকে।

এই প্রথম সে নিজের কাছে কথাটা স্বীকার করল; আর সঙ্গে সঙ্গে দেসেরের দিকে ফিরে বলল, 'আমি আর একজনকে ভালবাসি। তাতে কিছু আসে যায়না অবশ্য। ওর সঙ্গে আমার বড়ো একটা দেখাশোনা হয় না, আর কোনোদিন দেখা হবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই।'

শুকনো গলায় বলে গেল সে, প্রায় আনুষ্ঠানিক সরকারী উক্তির মতো শোনাল কথাটা। গাড়িটা থামিয়ে দেসের তার হাতে চুমু খেল। তারপর বলল :

'তুমি আমার মনকে নাড়া দিয়েছ, গভীরভাবে নাড়া দিয়েছ। তুমি থিয়েটারে যেতে চাও না—এটা খুব আফসোসের কথা। যাই হোক, সেটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়।'

জেনেৎকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে এল দেসের। সন্ধ্যায় আবার তাদের দেখা হবে—এ রকম একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল তারা। ওদের দুজনের মধ্যে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন ওদের সম্পর্কটা খুব সহজ—বোঝা-পড়ার মধ্যে দিয়ে একটা চুক্তি করে নিয়েছে তারা।

টেলিগ্রামটা পড়ল দেসের : জার্মান-বাহিনী প্রাগে এসে গেছে। হঠাৎ সে জোর গলায় হেসে উঠল। তারপর বইয়ের তাকের পেছন থেকে বের করে নিল বোতলটা : এখন আর ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলায় কি লাভ? এক বছরের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। জেনেতের কি হব? আর যাই হোক, ও আর একজনকে ভালবাসে। মেয়েটা ভালো, কিন্তু কেমন যেন ভয়ানক প্রকৃতির; ওর চোখ দুটো ঠিক সেই পাগলী বুড়িটার মতো। কিন্তু একটা কথা সত্যি—স্মরণের পারযাত্রী সেই স্বপ্নের জাহাজটা তাদের দুজনকে এক সঙ্গেই খুঁজে নিতে হবে।

আঠাশ

'ওখানে আমি তোমায় প্রায়ই যেন দেখতে পেতাম। লাল পাহাড়ী টিলা, কোথাও কোন ঝোপঝাড় নেই, ঘন ভারী বাতাস। আর কী ভয়ানক গরম। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন অনুভব করতাম তুমি রয়েছ আমার পাশেই—আর আমি জড়িয়ে রয়েছি তোমায় দুই হাতে। দেনিস, মনের কথাটি কইছি, দেনিস। ভালবাসার কথা বলছি! তুমি কি বোঝ না?'

দেনিস কোনো কথা না বলে আরও নিবিড়ভাবে তাকে চুমু খেল।

'ভাবতাম মরণ বড়ো ভয়ংকর—তাইতো বলে সবাই। মোটেই না; অতি সহজ, এমন কি, বড়ো আশ্চর্য এই মৃত্যুর অনুভূতিটা—ঠিক যেন এই মুহূর্তের অনুভূতির মতোই। সমস্তটা বুঝে ওঠা যায় না সহজে, কিন্তু সাংঘাতিক কিছু একটা নয়। সাংঘাতিক হচ্ছে এই পরাজয়টা—অসহ্য তীব্র এর অনুভূতিটা এমন যে কারুর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে হবে না তোমার। কিন্তু মৃত্যু অন্য রকম—ওটা তোমার নিজের মধ্যেই একটা নিজস্ব ক্রিয়ার মত।'

দেনিস বলল, 'জেলখানায় ঘুমহীন চোখে সারারাত শুয়ে থাকতাম। গুলির শব্দ যেন কানে ভেসে আসত। আমি জানতাম ওরা তোমায় মারতে পারবে না—কথাটা খুব ছেলেমানষি শোনাল, কিন্তু তবু কেমন যেন জানতাম আমি—কিছুতেই ওরা মারতে পারবে না তোমায়। মনে মনে আমি ছিলাম সব সময়ে তোমার পাশাপাশি।'

'দেনিস।'

'কি?'

'কিছু না।'

দেয়াল-মোড়া কাগজের গায়ে লাল অ্যাস্টার ফুল ছাপা। ঐ ফুলগুলো নিশ্চয় এক শতাব্দী রয়েছে এই দেয়ালের গায়ে, কিন্তু আজও একটুও শুকিয়ে যায়নি। দেয়ালের গায়ে ওই গোঁফওলা মার্শালের ছবিটা ঝুলছে কেন কে জানে! আর ঘর-গরম-করা উনুনের ওপরে ওই তাকটায় রয়েছে একটা পয়সা জমাবার হাত-বাক্স—লাল টুপি মাথায় এক বেঁটে বামনের মতো ওই বাক্সের আকৃতিটা। এমনি কতকগুলো আসবাবে সাজানো এই ঘরটা একটা সাময়িক ডেরা মাত্র। অন্য কেউ হয়তো এই ঘরে আজীবন কাটিয়ে দিতে পারে—কিন্তু এদের দুজনের পক্ষে এটা কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্যে একটা আস্তানা মাত্র—এক ঘন্টার জন্যেই হোক বা এক হপ্তার জন্যেই হোক, একই কথা। কিন্তু এই অ্যাস্টার ফুলগুলো শুকোবে না কোনদিন; পাকা গোঁফ কামড়ে-ধরা মার্শালের ওই মুখখানা দেখাবে অদ্ভুত আর হিংসুটে—কোথায় কোন্ যুদ্ধ যে উনি জয় করেছিলেন সে কথাটা ইস্কুলে পড়া বইয়ের পাতাতেই বিস্মৃত হয়ে আছে। বেঁটে বামনটা শূন্যগর্ভ—ওর ছোট্ট পেটে একটা পয়সাও নেই, নাকটা টিপে ধরলেও ও কিছু মনে করবে না। এই পরের বার দেনিস যখন জেলে যাবে, তখন হয়তো তার মনে পড়বে এই বামনমূর্তিটাকে। দেয়ালগুলো বিবর্ণ সাদা; চুনকাম উঠে যাওয়া জায়গাগুলো দেখে কোথাও যেন মনে হবে গাছ, কোথাও বা

মেঘ, কোনটা বা মানুষের বিকৃত মুখের মতো। আর লড়াইয়ের মাঠে গড়খাইয়ে বসে হঠাৎ হয়তো মিশোর চোখে পড়বে একটা লাল অ্যাস্টার ফুল—হাতটা বাড়িয়ে দেবে ফুলটা তুলে নেবার জন্যে, তারপরে একটা বুলেট ছুটে এসে...কিন্তু বুলেটটা নিশ্চয় মিশোর গা-ঘেঁসে বেরিয়ে যাবে।

'মিশো, তুমি সত্যিই আমার কাছে আছো—যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা!'

দেনিস গালের ওপর মিশোর নিশ্বাস অনুভব করছে, কিন্তু তার কথা শুনতে চায় সে। ওর কপালে আর রুক্ষ চুলে হাত বুলোতে বুলোতে দেনিস একান্ত-ভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল যে তারা সত্যিই আবার মিলিত হয়েছে।

তারপরে তারা দুজনে ঘরের এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল—ছোট ছেলে-মেয়ে খেলার ছলে যেমন করে।

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মিশো। নিচের তলার লোকে ভাববে কি! ও কী বেশে রাস্তায় যাচ্ছো? আয়নায় দেখো একবার নিজের চেহারাটা...'

বাধ্য ছেলের মত মিশো আয়নার দিকে তাকাল।

'কী হয়েছে?'

'তোমার চোখের দিকে তাকাও। দেখতে পাও না নাকি? পাগল কোথাকার!'

অবশেষে যেতে হল মিশোকে; নটার সময় সভা বসবার কথা আছে। নিজের চিন্তা-গুলোকে মনে মনে গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় কপাল কুঁচকে রইল।

'পার্টির শক্তি বেড়ে গেছে। শুধু সহজ উপায়ে যারা বাজীমাৎ করতে চায় তারাই খসে পড়েছে। কিন্তু অন্যদিকে তেমনি অনেক নতুন লোক এসেছে পার্টিতে। ভীইয়ার কেন মৃত্যুর কথা লেখে সেটা এখন বুঝি, ওদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই ফাঁকা। গভর্নমেন্টকে নিয়ে তো সবাই হাসাহাসি করছে। আজ বাসে একটা লোককে চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম, "ওই শয়তান দালাদিএটা! গুঁড়িয়ে দেব আমরা ওদের—দেখে নিও, গুঁড়িয়ে দেব, ঠিক তাই!"

'মিশো, সত্যিই তুমি কি?—বলো না?'

'লুক মিশো—হলফ করে বলছি অন্য কেউ নই। তোমার গ্রেপ্তার করার খবর কোথায় শুনলাম জানো? পের্‌পিঞাঁয় থাকার সময়। তখন তুমি খালাস হয়ে গেছ, কিন্তু আমি তা জানতে পারিনি। প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কোন বাঁদরমুখো পুলিশের গুপ্তচরের মাথা ফাটিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। গর্ব বোধ করেছিলাম তোমার জন্যে। কত চমৎকার সব লোক রয়েছে আমাদের! তোরে বলছে, পার্টিকে বেআইনী করে দেবে ওরা। তেসার উপযুক্ত কাজই বটে। কিন্তু গোপনে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত করা আছে আমাদের। ছোট যে সংগঠনটা করে রাখা হয়েছে, সেটা আসলে অত্যন্ত শক্তিশালী। যোগাযোগের ব্যবস্থায় কোনো গোলমাল ঘটতে না দেওয়াটাই আসল কথা। সমস্ত ব্যবস্থা করবার জন্যে আমাকে স্যাঁ-এতিএন্‌-এ পাঠানো হচ্ছে...'

'কবে যাচ্ছ?'

'এখনও ঠিক জানি না। হয়তো কাল কিংবা শনিবারে।' ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে টুপিটা পরে নিল সে—একটা কর্মব্যস্ততার ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায়। শুধু চোখ দুটোয় তার সুখের অনুভূতিটা এখনো প্রকাশ পাচ্ছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে সুড়ঙ্গ-রেলপথটা পর্যন্ত হেঁটে এল। লম্বা, প্রায়-অন্ধকার সুড়ঙ্গগুলোয় ভিড়ের ঠেলাঠেলি, ভ্যাপ্‌সা গরম বাতাস, প্রচণ্ড শব্দে দেওয়াল কাঁপিয়ে ট্রেনগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে।

টালি-ছাওয়া দেওয়ালগুলোর মাথায় বিরাট আকারের রাজহাঁস, তাদের কোনোটার মাথায় লম্বা কানাওলা মেয়েলী টুপি, কোনটার মাথায় আঁট করে বসানো ক্যাপ, কোনটার মাথায় ফেজ্ টুপি; নিচে লেখা—'কৃত্রিম উপায়ে গিলে-ফোলানো এই পাখি—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য।'

আগামী কাল আবার তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবে। এখন আর কথা বলা সম্ভব নয়—চারপাশে বহু লোকের ভিড়। ভালোবাসার কথা কিংবা গোপন রাজনৈতিক কাজের কথা এর মধ্যে বলা চলে না। সবই অত্যন্ত গোপনীয়। কিন্তু দেনিসের বুক ভরে উঠেছে মিশোর সাহসিকতায়, আগামী সংগ্রামের কথায় আর তার প্রেমের অনুভূতিতে। মিশো নিজেকে সামলাতে না পেরে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ঠিক তাই!'

ঠিক তাই—এই কথাটা হবে তাদের ইঙ্গিতবাক্য। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল তারা। মিশো ট্রেনে চেপে চলে গেল—আরেকটা লাল আলোর চিহ্ন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। দ্রুত পায়ে ফিরে চলল দেনিস—একবার নিচে নামল, তারপর ওপরে উঠল, আর একবার নিচে নামল। সুড়ঙ্গ পথের এই গলিগুলো জটিল আর ক্লান্তিকর। চারদিকে কর্ম-ব্যস্ততা, গোলমাল আর নির্বিকার ভাব। দেনিস মনে মনে ভাবল, 'একটা বিচ্ছেদ তো সয়ে গেছি আমরা, কিন্তু এরকম আরো কত সইতে হবে ভবিষ্যতে?' কী দুর্বিসহ সেই প্রতীক্ষা-কাতর জীবনের বোঝা! তারপরে লোকে হয়তো ওদের বলবে, 'সুখী হোয়ো তোমরা।' কিন্তু তখন হয়তো দেখা যাবে সময় বয়ে গেছে। না, সত্যিসত্যি ওরকম কখনো হতেই পারে না। ওদের দুজনেরই বয়স অল্প। ওদের ইচ্ছাশক্তির ওপরেই নির্ভর করছে সব কিছু, প্রবল ইচ্ছার শক্তিতে কামনা করতে হবে যাতে তারা যা চায় তাই ঘটে: তাদের মিলন, বিপ্লব আর ভবিষ্যৎ সুখ। ভাবতে ভাবতে দেনিসের কামনার সংগে সংযুক্ত হল তার ইচ্ছার রুদ্ধশক্তি। প্ল্যাটফর্মের জনতা, টিকিট কেনার যন্ত্র আর চারপাশের বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে দেনিস অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'ঠিক তাই!' মিশো, মিশো..

ঊনত্রিশ

আঁদ্রের স্টুডিওটা অস্বাভাবিক রকমের পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। খালি বোতলগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে; ছেঁড়া পুরনো বুটজোড়াটা আড়াল হয়েছে দেওয়ালগিরিটার পেছনে। ক্যানভাসগুলো নিপুণভাবে সাজানো আছে দেয়ালের গায়ে। বিরাট ফাঁকা টেবিলটার ওপর রয়েছে শুধু একটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক আর একটা পোস্টকার্ড—বালিয়াড়ি আর শাদা মেঘ-আঁকা রুজেন-এর একটা দৃশ্য। এটা আঁদ্রেকে পাঠিয়েছে সেই জার্মানটি যে দৃশ্যচিত্রের অনুরাগী বটে, কিন্তু পড়াশোনা করেছে মাছ সম্বন্ধে—লোকটার সংগে আলাপ করার সময় ভারি মজা লেগেছিল আঁদ্রের। মৎস্যবিজ্ঞানবিদ্ শুধু 'শুভেচ্ছা' কথাটা লিখে পাঠিয়েছে, কিন্তু পোস্টকার্ডটা দেখেই আঁদ্রের সংগে সংগে মনে পড়ে গিয়েছিল 'তামাক-খোর কুকুর'-এ তার সংগে পরিচয় হবার কথাটা। জার্মানটা তাকে বলেছিল, "সময় থাকতে

পারীকে দেখে নিয়েছি, এজন্যে আমি আনন্দিত।' দু বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে, পারীও ঠিক তেমনিই খাড়া আছে; কিন্তু আঁদ্রে কেমন যেন বদলে গেছে। জার্মানিটি মাছ নিয়ে এখনও মাথা ঘামায় কিনা ভেবে ঠিক করতে পারল না সে। ছবি আঁকা আঁদ্রে ছেড়ে দিয়েছে, তার স্টুডিওয় ঢুকে আর তার্পিনের গন্ধ পাওয়া যায় না। একটা মর্চে-ধরা চায়ের পাত্রের পাশে দেরাজটার ওপর পড়ে আছে তার ইজেলটা। স্টুডিওর এই কর্তাটি পর্যন্ত তার ঘরের এই পরিচ্ছন্নতা দেখে অবাক হয়, অতিথির মত সন্তর্পণে পা ফেলে সে এই ঘরে চলাফেরা করে। বাড়ির দারোয়ানটা একদিন অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল—ঘরটা সে ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে কিনা। না, আঁদ্রে যাবে না কোথাও। শোনা যায়, আসন্ন মৃত্যুর আগে লোকে তাদের ঘরদোর গুছিয়ে রাখে। কিন্তু আঁদ্রে বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান মানুষ, তিনজনের মতো খাবার সে একলা খায়, সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, আর বিছানায় এসে শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। তাই যদি হয়, তাহলে তার এই অস্বস্তির কারণটা কি?

গ্রীষ্মকালটা সে পারীতেই কাটাল। যুদ্ধ যে বাধবেই—এই নিয়ে লোকে আর্তনাদ করছে বটে, কিন্তু তবু তারা যথারীতি ছুটি কাটাতে গেছে ঠিক গত বছরের মতোই। আঁদ্রের এসব ভালো লাগে না; এই দিন গুণে চলা, খবরের কাগজের নিরর্থক গলাবাজি আর খালি তর্কবিতর্ক—এসব তাকে ক্লান্ত করে তুলছে। মৃত্যুযন্ত্রণাটা যেন হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ। জীবনটা টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল, তবু যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে এই জীবনযাত্রা। এই মাত্র সে 'হৈমন্তিক চিত্রপ্রদর্শনী'র এক নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছে 'সালো' থেকে। কী অদ্ভুত সব লোক!

পুরো ছটি মাস নিতান্ত দুস্থ অবস্থায় কাটানোর পর পিয়ের এক ফাউণ্টেন পেনের কারখানায় কাজ পেয়েছে। একদিন আঁদ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসে সে বলল, 'মনের জোর বজায় রাখা চাই!'—বলেই বিষণ্ণভাবে অন্যদিকে তাকাল। বুড়ো মানুষের মতো তার হাত দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

বুলভারে একদিন হঠাৎ লুসিয়ঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আঁদ্রেকে দেখেই ও চেঁচাতে লাগল—সব জায়গায় জোচ্চোরের দল আর শুধু নিজের সুখের জন্যে বেঁচে থাকাটাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা; কিন্তু আঁদ্রে যখন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আশা করি, তুমি বেশ ভালোই আছো?' তখন লুসিয়ঁ গাল পেড়ে বলল, 'এ যেন পায়খানায় আছি হে, বুঝেছ!'

তারপর আর একবার আতঙ্ক রটল আর কাগজগুলো ফলাও করে শিরোনামা ছাপিয়ে আবার হুলস্থুল বাধিয়ে দিল। এবারকার উত্তেজনার বিষয়টা হচ্ছে ডানজিগ। আঁদ্রে কাগজ পড়ে না, রেডিও শোনে কচিৎ কখনো। মাঝে মাঝে তার মনে পড়ে জেনেতের কথা, কিন্তু সমস্তটাই মনে হয় যেন বহুদিন আগেকার ঘটনা, আরেক জন্মের কাহিনী। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যখন সে লালচে-নীল রঙে শহরটার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন তার কানে ভেসে এল—কতকগুলো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নামের ফাঁকে ফাঁকে একটা কবিতার স্তবক। রেডিওতে জেনেতের গলাঃ

'তুমি পাশে থাকো মোর, ভাঙব না শপথ আমার
সুখের পরশে মোর বিশ্বাসেরে জিয়াও আবার;
অতীতের সব দুঃখ সব ক্ষোভ হোক বিস্মরণ
জীবনের প্রেরণায়—যে জীবন তোমারই জীবন।'

হাসিতে কুঁচকে গেল আঁদ্রের মুখ : চোখে আঁকবার কোনো সুর্মা, ভারি ভাল জিনিস—সুন্দরী মেয়ের চোখের জলেও যে জিনিস ধুয়ে যায় না! শপথ তো ভেঙেছে সবাই : সে, জেনেৎ, পৃথিবীশুদ্ধ সবাই। কারুর মধ্যেও জীবনের এতটুকু প্রেরণা নেই......

রান্নাঘরের গরমে ঘেমে-নেয়ে যোসেফিন শুধোয়, 'কেমন চলছে দোকান?' বোয়ালো বলে, 'এই এক রকম।' রু শেরস্-মিদি এখনো তেমনি প্রাণবন্ত। কেবল সেই 'দস্যুর মত প্রেম'-এর গানটা গাইত যে মুচীটা, সে পিলে-ফোলা ব্যারামে মারা গেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে তার ঘরে এসে ডেরা নিয়েছে আর একজন মুচী, লোকটার ত্রিশ বছর বয়স, সুন্দরী স্ত্রী আর একজোড়া ছেলেমেয়ে আছে। সেও বেশ আমুদে লোক, খদ্দেরদের বলে 'যুদ্ধ না বাধা পর্যন্ত এ জুতোর শুকতোলা খোয়াতে পারবেন না।'

'তাকামখোর কুকুর'-এর সেই বুড়ো টেরিয়ার কুকুরটা এখনও দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে এদিক ওদিক ভিখ মেগে বেড়ায়। একদিন আঁদ্রে সেই কুকুরটাকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমার চেহারাটা অনেকখানি তাদুর মতো দেখতে। বন্ধু হে, তুমিও হয়তো কোনোদিন ডানজিগ-এর কথা কইতে শুরু করবে।'

এবারকার গ্রীষ্মে মেয়েরা সবাই সুতো-বোনার কাজে মন দিয়েছে। ওতে নাকি-স্নায়বিক উত্তেজনাটা অনেকটা কম থাকে। সিয়েন নদীর বাঁধ-ঘেঁষা রাস্তার ওপর এক বইয়ের দোকান থেকে আঁদ্রে পুরনো এক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যবই খুঁজে পেয়েছিল—সে সুতো বোনার কাজ জানে না, নক্ষত্রলোক হয়ে উঠেছে তার কাছে শাশ্বত আর অবিনশ্বর, পৃথিবী সরে গেছে তার পায়ের তলা থেকে । দু-চার পাতা পড়ার পর ভাবনার পাখার ভর করে তার মন উধাও হয়ে যায়। অঙ্কের সংখ্যা, চিহ্নপাত আর বিচিত্র নামগুলো তার মনকে শান্ত করে তোলার কাজে সাহায্য করে।

আজ থেকে দু শতাব্দী আগে নিকাইয়া শহরে হিপারকাস সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব মেপেছিলেন। সে সময়েও ঠিক এই রকম রাজ্য-রাজধানী ভেঙে পড়ছিল চুরমার হয়ে; তখনকার লোকে ঈশ্বরকে করে তুলেছিল মাটির পুতুল আর প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করত তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারত, সৈনিকরা মারত আর তাদের বর্ম-অস্ত্রের ঝঞ্চনায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত বাতাস। তারই মধ্যে হিপারকাস নক্ষত্রমণ্ডলীর এক তালিকা তৈরি করার কাজে তাঁর সময় অতিবাহিত করেন।

আর একবার আঁদ্রের হিংসা জেগেছিল হার্শেলের ভাগ্যের ওপর। গরিব এক গায়কের এই ছেলেটি আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সূর্য যখন হৈমন্তিক বিষুবরেখা অতি-ক্রম করছে ঠিক সেই সময়। দূরবীন কেনার টাকা ছিল না তার, তাই সে নিজেই কাঁচ ঘসে লেন্স বানিয়ে নিয়েছিল। ইউরেনাস গ্রহ সে আবিষ্কার করেছিল, অন্যলোকে যেমন সামনের বাড়ির জানলায় কোনো মেয়েকে আবিষ্কার করে। ইউরোপের বুকে বিপ্লবের ঝড় বয়ে চলেছে তখন। নেপোলিয়ন ইংলণ্ড-জয়ের হুমকি দেখাচ্ছে। পীট্ তখন যুক্তমন্ত্রীসভার জাল বুনে চলেছে মাকড়সার মতো। কিন্তু হার্শেল তখন ব্যাখ্যা করে চলেছেন চলমান-নক্ষত্র আর নীহারিকাপুঞ্জের কথা।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল আঁদ্রে। কাগজওলা ছেলেরা চিৎকার করছে 'রোমের মধ্যস্থতার সম্ভাবনা! মস্কো-চুক্তির প্রতিক্রিয়া! ডানজিগ! ডানজিগ!' আঁদ্রে তার প্রিয় বইটির কাছে ফিরে গেল। এক সময়ে ওই ডানজিগে বাস করতেন হেভেলিয়স—চাঁদের একটা মানচিত্র তৈরি করার কাজে তিনি নিবিষ্ট ছিলেন; হঠাৎ ঘরে আগুন ধরে যায় আর

সেই আগুনে পুড়ে যায় তাঁর সমস্ত খাতাপত্র আর আঁকজোক। হেভেলিয়স্ তখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আবার তিনি নতুন করে তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

আঁদ্রে মনে মনে বলল, 'আর আমি কিনা ভুলে বসে আছি আমার ছবি আঁকা, নিমকহারামী করেছি আমার তুলির সঙ্গে। পারীতেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আছেন সন্দেহ নাই, এবং তাঁরা তাঁদের গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছেন; মেজো-দ্য-কুলতুর-এ যে পদার্থবিজ্ঞানীকে সে দেখেছিল, তিনিও হয়তো তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন; ডাক্তাররা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই চলেছেন; আঁদ্রের বাবা সংগ্রহ করে ফিরেছেন মোমের মতো মসৃণ, ফিকে রঙ-ধরা বছরের প্রথম আপেল ফলটি। বাবাকে দেখতে তার কি দেশে যাওয়া উচিত? না, এখান থেকে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। গড়িয়ে চলা পাথরের মতো আঁদ্রের অবস্থাটা। অনিশ্চিত মনের অবস্থায় রাস্তার কোণে মদের দোকানটায় এসে সে একপাত্র কড়া-তিতো কাল্ভাদো খেল, তারপরে রোদজ্বলা শহরের চোখ ধাঁধানো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দিনটা ভয়ানক গরম। সকাল থেকে একটা ঝড়ের ইঙ্গিতে থমথমে হয়ে ছিল আকাশটা; তারপরে মেঘটা কেটে গেছে, কিন্তু বাতাসের গুমোট ভাবটা তখনো কাটেনি। আঁদ্রে সারাদিন স্টুডিওর চাপা গরমে কাটিয়েছে। নিচের তলার লোকেরা কি সব প্যাক্ করছিল; বাক্সগুলোয় কাঁটা ঠোকার নিরবচ্ছিন্ন খট্ খট্ শব্দে তার মাথার দু পাশের শিরা দপদপ করছিল। বিকেলের দিকে সে 'তামাকখোর কুকুর'-এ যাবে বলে বেরিয়েছিল—মাথাধরার ভোঁতা যন্ত্রণাটা একমাত্র মদ খেয়ে সারানো যেতে পারে। রাস্তায় বেরিয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল—একটা কোন দুর্বিপাক ঘটে গেছে। এক গোছা থেঁত্লানো গোলাপের ওপর ফুলের দোকানের স্ত্রীলোকটি মাথা রেখে কাঁদছে। 'মারা পড়বে ওরা! সবাই মরবে!'—কাফেওলা আঁদ্রের আর নিজের জন্যে কাল্ভাদো ঢালতে ঢালতে বলল; তারপর তার গেলাশে গেলাশ ঠেকিয়ে বলল, 'আপনার উদ্দেশ্যে! যুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেল! অনেকদিন সবুর করেছে ওরা—এবার ওরা মরুক!'

লোকে তর্ক করছে পরস্পরের মধ্যে—'এখনো যুদ্ধ বাধেনি। এতো শুধু সবাইকে সৈন্যদলভুক্ত করার ব্যবস্থা জারি হল।'

'না, এবার একেবারে যুদ্ধ। এর থেকে আর আমাদের পার নেই। জাহান্নমে যাক ওই হিটলারটা!'

'আরে না না, ওসব কিছু নয়। একটা চুক্তি হবেই হবে।'

আঁটো-টুপি মাথায় একটা মজুর টেরিয়ার কুকুরটাকে একটা চিনির ডেলা দিয়ে বলল, 'আয় তু-তু! এই বেলা শেষবারের মত ভিখ মেগে নে। গেল বছর ওরা চুক্তি করতে গিয়েছিল কেন জানিস? খুব সোজা কারণঃ ভয় পেয়েছিল ওরা। রাশিয়ানরা যে দিকে দাঁড়িয়েছে সে দিকে যেতে চায়নি ওরা। এখন ভিন্ জুতো জোড়ায় পা ঢোকাতে হয়েছে, তাই ডাক পেড়ে চেঁচাতে লেগেছে। মনে মনে ওরা হিটলারের পক্ষে। আমাদের সঙ্গে বেইমানী করবে ওরা—এটা তো জলের মতো পরিষ্কার—আর লড়াইয়ে গিয়ে মরতে হবে কাদের? আমাদের। এই বেলা ভিখ মেগে নে, বাছা আমার, জুটিয়ে নে যা পারিস! আমিও তো দু নম্বর দফার সৈন্য...'

মুচীটা তার দোকানের দরজায় একটা নোটিশ মেরে দিলঃ 'বাৎসরিক সৈন্যদলভুক্তির জন্য দোকান বন্ধ।' লোকটা যুদ্ধ বাধার কথায় বিশ্বাস করল না, শুধু অসন্তুষ্ট-

ভাবে বিড়বিড় করতে লাগল, 'এর পর দেখা যাক কি হয়! অনেক জরুরি অর্ডার ছিল হাতে!' ফুলের দোকানউলী কেঁদেই চলল সমানে।

আর একবার পুরুষরা সবাই স্যুটকেশ আর ব্যাগ নিয়ে ভারী মন্থর পায়ে হেঁটে চলল রাস্তা দিয়ে। অন্ধকারে ছোট নীল বাতি জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল। বিদায় হার্শেল, বিদায় হে নীহারিকাপুঞ্জ! একটা উদাসীনতার ভাব নিয়ে আঁদ্রে তার বিরাট স্যুটকেস্‌টায় জামা কাপড়, সাবান আর দাড়ি কামাবার টুকিটাকি ভরে নিল। অলসভাবে ভাবল, 'এবারও গেল-বারের মতোই হবে ব্যাপারটা।' কিংবা হয়তো সত্যিই যুদ্ধে যেতে হচ্ছে তাদের? এ সম্বন্ধে আর বেশি ভাবল না সে—চিন্তাটা তার কাছে বিরক্তিকর। আগামী কাল তাকে যেতে হবে তুল্-এ—এতে কোনো দ্বিধার অবকাশ নেই। তারপরে কি হবে—তাতে কি কিছু যায় আসে? আর যাই হোক, সে জীবনটা আর এই জীবনের সঙ্গে মিলবে না। গানও নেই, চিৎকারও নেই; গাল পাড়ছে না কেউ, শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে চেঁচাচ্ছে না কেউ, জয়ের উচ্চকিত ঘোষণা নেই কারুর মুখে। রাস্তার চঞ্চলতা খানিকটা বেড়েছে মাত্র; আর ফুলের দোকানউলীটা এখনো ফোঁপাচ্ছে। বাদাম গাছটার পাতার ফাঁকে একটা ছোট্ট আব্‌ছা আলোর আভাস। জেনেৎ—সেই তো আঁদ্রের নক্ষত্র! কিন্তু সে তাকে আবিষ্কার করতে পারেনি; মানচিত্রে তার স্থান নির্দিষ্ট করে উঠতে পারেনি সে। আলোর ঝিলিক তুলে জেনেৎ পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেল সে—নক্ষত্র নয়, প্রাণবন্ত সেই মেয়েটি—যার হাত দুটি উষ্ণ কোমল, আর ভাগ্য যার কপালে সুখ লেখেনি? হয়তো সেও কাঁদছে ওই ফুলের দোকানের মেয়েটির মতো?

বুল্‌ভারের পথে বেয়ে ভেসে এল একটা ফৌজী শিঙার বিষণ্ণ একঘেয়ে আওয়াজ, আর মাতাল মুচীটা চেঁচিয়ে উঠল:

'কদম কদম এগিয়ে যান, ডাইনে গেলেই গোরস্থান!'

তৃতীয় খন্ড

এক

নিষ্প্রদীপ শহরের মাঝখান দিয়ে হে'টে চলেছে লুসিয়ঁ। হাঁটছে খুবই এলোমেলো ভাবে, অচেনা রাস্তা দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে চলার মতো। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। প্লেন গাছের কালো কালো পাতার মাঝখানে রহস্যজনকভাবে জ্বলছে ছোট ছোট আলো। লুসিয়ঁর মেজাজ মোটেই ভালো নেই। দু-একদিন আগে পর্যন্ত সে ভেবেছিল যে যুদ্ধ হবে না; একমাত্র তার বাবাই মন্ত্রিত্ব-সংকট ঘটানোর জন্যে একটা কিছু গন্ডগোল বাধাতে চায়। কিন্তু এখন কী আশ্চর্য! গুজব রটে গেছে যে ম্যাজিনো লাইনের ধারে ইতিমধ্যেই গোলা-গুলি চলছে। আগামীকাল বিকেলেই লুসিয়ঁকে সৈন্য-সংগ্রহ কেন্দ্রে হাজির হতে হবে। কিন্তু কিসের জন্যে যুদ্ধ করতে যাবে সে? পোলান্ডের মঁসিয় বেকের জন্যে? তার বাবা যাকে বলে 'মানবিক মর্যাদা'—তার জন্যে? সে তো মরেও যেতে পারে? কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক জিনিস আছে। ট্রেঞ্চ, কর্পোরালের ইতর ব্যবহার আর একটানা চল্লিশ মাইল মার্চ—এসবের চেয়ে অপ্রীতিকর আর কি হতে পারে?

তাছাড়া কী সাংঘাতিক বিরক্তিকর!

লুসিয়ঁ শব্দ করে হাই তুলল। একটি মেয়ে তাকে ডাকছে, 'এ্যাই, যাবার আগে ফুর্তি করবে নাকি একটু?' লুসিয়ঁ হাসল। ওরা কালক্ষেপ করছে না একটুও। গ্যাসমুখোশ পরে দলবে'ধে দাঁড়িয়ে আছে রূপজীবীরা।

লুসিয়ঁ বলে, 'তোমরা দেখছি যে যার কাজকর্মে লেগে গেছ ঠিকমতো।' দলের মধ্যে থেকে একজন মেয়ে মুখখিস্তি করে ওঠে।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে মদের দোকানে ঢুকল লুসিয়ঁ। দোকানে গিজগিজ করছে লোক। সবাই চিৎকার করছে আর মদ গিলছে। দোকানের কর্ত্রী ভেজা চোখে গ্লাস ঠোকাঠুকি করছে খরিদ্দারের সঙ্গে।

'আপনার স্বামীর কী খবর?'

'আজ চলে গেছেন তিনি।'

একজন সব্জিওলা 'রাম্' খেতে খেতে চিৎকার করে ওঠে, 'না, না, তোমায় বলতে হবে না যে এই যুদ্ধের দরকার আছে কি নেই! জাহান্নমে যাক পোলরা!'

গলা মিলিয়ে সায় দেয় সকলে।

'যদি ইংরেজরা যুদ্ধ করতে চায়, করুকগে তারা!'

'আর একথা সবাই জানে যে তেসা দশ লক্ষ ফ্রাঁ হাতিয়েছে।'

লুসিয়ঁ এই কথাবার্তায় যোগ দেয় না। চুপচাপ মদ খায় আর গজরাতে থাকে। তারপর সে দেখা করতে যায় জেনীর সঙ্গে। তাকে বিদায় জানানো দরকার। আর দরকার এই উপলক্ষে কয়েক হাজার ফ্রাঁ নিয়ে আসা। আগামীকাল সে সারাদিন মদ খাবে। তাছাড়া সৈন্য হলেও কিছু টাকা তার সঙ্গে থাকা দরকার। সৈনিকের সামান্য মাইনেতে তার চাহিদা মিটবে না।

জেনীকে খুবই মনমরা দেখাল। তবুও উৎসাহের সঙ্গেই লুসিয়ঁকে অভ্যর্থনা

দুই

প্রতি রাত্রে সাইরেনের-হুঙ্কারে পারীর লোকরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কেউ কেউ বলে তারা বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ি পর্যন্ত দেখে এসেছে। কিন্তু তেসা হেসে বলেছে, 'এটা শুধু একটা সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা। জার্মানরা সীমান্ত ডিঙিয়ে উড়ে আসা মাত্র আমরা সংকেতধ্বনি দিই। এ থেকে পারী আত্মত্যাগের শিক্ষা নিতে পারে।' অনেকে রাজধানী ছেড়ে যাওয়াই সমীচীন মনে করল। বড়ো লোকদের অঞ্চল একেবারে জন-শূন্য; শুধু নরমাণ্ডি আর ব্রিতানির সমুদ্রের ধারে স্বাস্থ্যনিবাসে লোকের ভিড়। সৈন্যরা চলেছে পূব দিকে আর সাবধানী বুর্জোয়ারা দলবেঁধে চলেছে পশ্চিমমুখো।

মাঁর্তান তার পরিবারকে ওভের্‌ঞ্‌-এ পাঠিয়েছে। 'কী চমৎকার জায়গা! একশো মাইলের মধ্যে কোথাও একটা কলকারখানা নেই।' সে বলে। নিজের সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা করে সে মন দেয় অন্য একটি আরো জটিল কাজে। নিজের সমস্ত পুঁজি আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে শুরু করে। খবরটা দুকানের কানে যেতেই 'একজন অসৎ ফরাসী' শিরোনামায় একটা প্রবন্ধ লিখে বসে সে। কিন্তু সেন্সারে আটক পড়ে সে প্রবন্ধ; সংবাদপত্রের দুটো সাদা কলমে ছেপে বেরোয় শুধু একজোড়া কাঁচির ছবি। দুকানের আক্রমণের কথা জানতে পেরে রাগে জ্বলে ওঠে মাঁর্তান, বলে, 'ও কি মনে করে যে দাত' হয়ে উঠেছে? আমার নিজের সম্পত্তি, যা শুধুমাত্র আমার ছাড়া আর কারও নয়, তা আমি বাঁচাতে চাই। আমার সর্বস্ব খোয়া গেলে ফ্রান্সের কি কিছু লাভ হবে?'

পলেৎ স্থির করেছে, মধ্য-ফ্রান্সে মরভাঁতে তার খুড়িমার কাছে চলে যাবে। গ্যাস-আক্রমণে তার ভীষণ ভয়। তেসা কিন্তু বিচলিত হয়ে পড়ল। এই দুর্দিনে স্ত্রীলোকের ভালবাসার সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত হওয়া ভয়ানক কথা!

'তুমি আমায় একলা ফেলে চলে যেতে চাও?' তেসা আপত্তি জানায়।

'পল, আমি বীরাঙ্গনা নাই।'

'তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নাই। ওরা এখানে উড়ে আসবে না। মুখের কথায় না হলেও এ-ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া আছে। ওরা যদি পারীর ওপরে হাত দেয় তাহলে আমরা বার্লিনে বোমা ফেলব। আর তাতে কোনো সুবিধে হবে না ওদের।'

পলেৎ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'কেন, কেন তুমি এই যুদ্ধ ডেকে আনলে?'

'আমি?', বিরক্তিভরা কাঁপা গলায় তেসা বলে ওঠে, 'তুমি কী করে এ কথা বলছ? তুমি জানো আমি শুধু একটা জিনিসই চেয়েছিলাম—তা হল শান্তি। আমরা কি করব বলো? ওদের মাথায় পাগলামি চেপেছে।'

পলেতের কাঁদুনি থামে না: 'লোকগুলোকে মরতে পাঠাচ্ছ কেন তাহলে?'

'কাউকেই মরতে পাঠানো হচ্ছে না। একমাত্র পোলরাই যুদ্ধ করছে। কেনই বা করবে না, এটা তো ওদেরই ব্যাপার। এ হল ডানজিগ, স্ত্রাস্‌বুর্গ নয়, বুঝলে? অবশ্য ম্যাজিনো লাইনে দু-একটা দুর্ঘটনা হতে পারে, তাতে জনকয়েক মারাও যেতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখ শান্তির সময়েও তো কত লোক রাস্তায় মারা যায়! সোনামণি, একটা

কথা বুঝতে হবে তোমাকে। সব কিছু বদলে গেছে। পুরনো দিনের চোখ দিয়ে তাকালে চলবে না। আগে যুদ্ধ বলতে যা বুঝতাম সে অর্থে এটা যুদ্ধ নয়। আমাদের আছে ম্যাজিনো লাইন, আর ওদের সিগফ্রিড লাইন। কোন পক্ষই একচুলও এগোতে পারবে না। এ ওর দিকে তাকিয়ে দু পক্ষকেই চুপচাপ থাকতে হবে। আমার আমালি বলত, 'আলমারীর মধ্যে চিনেমাটির কুকুরের মতো।' পোলরা বীরের মতো প্রতিরোধ করছে। আমি চিরকালই বলেছি ওরা বীরের জাত। বসন্তকাল পর্যন্ত কিংবা আরো বেশি দিন ওরা যুঝতে পারবে। সেই ফাঁকে আমরা ভালোভাবে তৈরি হয়ে নেব। তারপর জার্মানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবেই। তাহলে দেখছ তো, আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।'

'যাই হোক, ভয়ানক ব্যাপার কিন্তু! বিশেষ করে এই নিষ্প্রদীপের সময়ে। আর রাতের দিকে ককিয়ে ককিয়ে সাইরেন বাজে।'

কান্নাভেজা চোখে পলেৎকে আরো বেশি সুন্দর মনে হল তেসার। নিজের ছোট্ট পাখির মতো মাথাটা গুঁজে দিল পলেতের বুকের মধ্যে।

'চলে যেও না, লক্ষ্মীটি! আমার একেবারে কাহিল অবস্থা। কী ভয়ানক কাজে জড়িয়ে পড়েছি, তা তুমি ভাবতেও পার না। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তুমি তো বললে, কিছুই হবে না।'

তেসা হাসে : 'ছেলেমানুষি কোরো না। কিছু হবে না তো নিশ্চয়ই। দেশের ভেতরকার কথা বলছি। চেম্বারে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করা কি ঝকমারি ব্যাপার জানো? এ সাধারণ পুলিশের কাজ নয়। একটা বড়ো রকমের আন্দোলন দরকার। আর দরকার নেপোলিয়'র মতো একজন লোক। যাই হোক, আমরা ওদের উপড়িয়ে ফেলবই।'

টান টান হয়ে উঠে তার মুখখানা। তার ধারণা, সে নাগরিক কর্তব্য পালন করছে। কেউ কি জানে সে দেনিসকে কত গভীর ভাবে ভালোবাসে? তবুও দেনিস ফ্রান্সের শত্রুদের দলে যোগ দিয়েছে আর তেসা তার সমস্ত অন্তর থেকে মুছে ফেলেছে তার পিতৃত্ববোধ।

হঠাৎ চাপা গলায় হেসে ওঠে তেসা : 'একটা বড়ো মজার কথা বলছি শোন। বলতে পারো কাল আমি কি করব? কক্ষনো বলতে পারবে না। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে একটা পবিত্র ধর্মোৎসবে যোগ দিতে হবে আমাকে। আমায় কখনো হাঁটু গেড়ে বসতে দেখেছো! কী রকম মজার ব্যাপার, না!'

পলেতের ফোঁসফোঁসানি তবু থামে না।

ছোটবেলা থেকে তেসা গির্জার চৌকাট ডিঙোয়নি। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সব কিছুকেই সে ঘৃণা করে। যখনই সে কাউকে ঠাট্টা করতে চায়, সে বলে— 'লোকটার গা থেকে ধূপের গন্ধ বেরুচ্ছে।' পাদ্রীদের দেখে সে বলে 'দাঁড়কাক'। তার মুখে এসব কথা শুনে আমালি প্রায়ই মর্মাহত হত।

তার ধারণা গির্জায় যায় একমাত্র বুড়ীরাই। কিন্তু যখন সে পুরুষদের, এমন কি সৈন্যদের পর্যন্ত উপাসনা করতে দেখল তখন সে অবাক হয়ে গেল। গির্জার ভেতরটা আবছা অন্ধকার। জ্বলন্ত মোমবাতিগুলো দেখে মনে পড়ে, আমালির কফিনের চারপাশেও এমনি মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল। কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায় তেসা। গায়কদের মৃদু কণ্ঠস্বর এবং রঙিন জানলা থেকে চুঁইয়ে পড়া সূর্যের আলো তাকে 'হৃত

স্বর্গের' কথা মনে করিয়ে দিল। তেসা বুঝতে পারে সেই ভাষা; তার আমালি, তার ছেলেমেয়ে, তার শান্তি, সমস্ত কিছু সে হারিয়েছে। অবশ্য এসব অনুষ্ঠান কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র হানাহানি থেকে বেরিয়ে নিজেকে ভুলে থাকতে অনেক ভালো লাগে।

মোটা বিশপের দিকে সে তাকিয়ে দেখল। মুখের ওপরে লাল শিরাগুলো ফুটে রয়েছে। চোখদুটো বিষন্ন আর ধারালো। অন্য সবার মতো এই বিশপেরও নিশ্চয়ই নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা আছে। তাকেও পোপ এবং কার্ডিনালদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। জীবনটাই এক ধরনের রাজনীতি। কিন্তু সবকিছুর শেষে রয়েছে এই মোমবাতি।

একটা ছোট্ট ঘণ্টা বেজে ওঠে। হাঁটু মুড়ে বসে প্রত্যেকে। তেসা মনে মনে হাসে। এ যেন একটা রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু সেও বিনা প্রতিবাদে হাঁটু মুড়ে বসে, তারপর আর সকলের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

অনুষ্ঠান দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বার বার শব্দ করে করে হাই তোলে। হঠাৎ সে চনমন করে উঠল। তার ডান পাশটিতে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা কালো পোশাক পরা একটি মেয়ে। মেয়েটির কী চওড়া কপাল আর চক্‌চকে পাতলা ঠোঁট! ঠিক যেন ব্রঁজিনোর ফ্লোরেনটাইন ছবির মতো। সেই জাতের মেয়ে যারা উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ভয়ানক রকমের উচ্ছ্বাসপ্রবণ।

হঠাৎ বুঝতে পারে, ব্রতেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ে কেঁপে উঠে ঘন ঘন ঠোঁট নাড়তে থাকে, যেন সে প্রার্থনা করছে। বোকা লোকদের ধারণা যে ব্রতেইর হার হয়েছে, কারণ সে জার্মানির সঙ্গে একটা আপোসরফা চেয়েছিল। কিন্তু তেসা বুঝতে পারে, ব্রতেইর দিন আসছে। প্রত্যেকে অভিশাপ দিচ্ছে পপুলার ফ্রন্টকে। অর্থাৎ সরকারী পক্ষের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দক্ষিণপন্থীদের দিকে চলে যাবে। তাছাড়া যুদ্ধ চিরদিন চলবে না। হিটলারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে ব্রতেই ছাড়া সে কাজ আর কে পারবে? এ অবস্থায় গোঁড়া ব্রতেইর সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অর্গানের সুর তেসাকে আবার বিষন্ন করে তোলে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে লোকটি চমৎকার অর্গান বাজাতে পারে। ১৯১৭ সালে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। জার্মান 'বিগ বার্থা' জাহাজ থেকে গোলা এসে একটি গির্জায় লেগেছিল আর অনেক লোক মারা গিয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে যদি সেই রকম একটা বোমা এসে ফাটে? না, সে রকম কোনো সম্ভাবনা নেই; ওরাই ভয় পাচ্ছে শুরু করতে। কেউই তো যুদ্ধ বাধাতে চায়নি। সত্যি কথা বলতে কি, এই পোলরাই বুনো। জার্মানরা ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালাচ্ছে পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু ফরাসীদের তারা শ্রদ্ধা করে। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে কোনো একটা মীমাংসায় আসা গেল না। মুসোলিনীই পারত সবার মধ্যে মিটমাট করে দিতে। কিন্তু লোকে জুজু দেখতে শুরু করল। আর তারপরেই এই যুদ্ধ। জঙ্গলে যুদ্ধ চালাবার কি যেন একটা পরিকল্পনা ছিল গামল্যাঁর মাথায়। কিন্তু মাইন পাতা ছিল সে জঙ্গলে। অকারণে কতকগুলো প্রাণ নষ্ট করা! লুসিয়ঁও তো মারা যেতে পারে। অবশ্য তার জন্যে একটা কেরানির কাজ সংগ্রহ করে দেওয়াও সম্ভব ছিল। কিন্তু কোথায় যে উধাও হয়ে গেল হতচ্ছাড়াটা; খুঁজে বের করা গেল না তাকে। বড়ো দুঃখের কথা! সত্যিই বড়ো দুঃখের কথা! আচ্ছা, অর্গান বাজানো কি ওরা বন্ধ করবে না কোনোদিন?

জেনারেল ভিসেকে দেখতে পেল তেসা। কেমন ভক্তির সঙ্গে সে উপসনা করছে।

শোনা যায় সে নাকি কমিউনিস্ট ফ্রজের বন্ধু। কী অদ্ভুত! একটা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সে অথচ কেমন গ্রাম্য গণিকার মতো উপাসনা করছে! কুমারী মেরীর গর্ভ-প্রবাসের কথা সে কি সত্যিই বিশ্বাস করে? করুক গে। ফ্রজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেয়ে এতে বিশ্বাসী হওয়া বরং ভালো।

অবশেষে উপাসনা শেষ হল। গির্জার আবছায়া থেকে বেরিয়ে আসতেই শরতের ঝকমকে সূর্য এসে অভ্যর্থনা জানাল তাকে। বাদাম গাছগুলো যেন সোনার ঝরণা। সাঁজ এলিজের ওপর টুকরো টুকরো সূর্যের আলো বুদ্‌বুদ্‌-ওঠা জলের মতো ঝিকমিক করছে। বিশেষ করে মেয়েগুলোকে যেন আরো বেশি পরিপাটি দেখাচ্ছে। বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে সমস্ত বাড়ির কাঁচের জানলায় কাগজের ফিতে লাগানো আর তার ফলে এক অভিনব নক্‌শা তৈরি হয়েছে। তেসা হেসে ওঠে আর ভাবে, 'এ এক নতুন ধরনের সাজ হয়েছে তোমার।'

তিন

প্রচণ্ড বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে অক্টোবর মাস এল। পরিষদের লবিতে তেসা চিৎকার করে, 'আমি গোড়া থেকে বলে আসছি পোলরা এক মাসও ঠেকাতে পারবে না। ওরা চোর আর মাতালের জাত! কিন্তু আমরা কিছু হারাইনি। বরং পূব দিকে হিটলার জিতেছে বলে জার্মানরা শান্ত হয়েছে। এখন তারা ম্যাজিনো লাইনকে অন্য চোখে দেখবে। আগামী ১৪ই জুলাই আমরা সারা রাত রাস্তায় নাচবো গাইবো...অলো ঝলমল করবে সমস্ত রাস্তায়। তোমরা দেখে নিও।'

বোমার বদলে আকাশ থেকে ইস্তাহার পড়ল। অভিজাত পল্লীতে আবার জীবনের সাড়া জাগছে। মঁতানি তার পরিবারকে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি দিয়েছিল। একঘেয়ে গাঁয়ে পড়ে থেকে বৃষ্টিতে ভিজে কী লাভ! খাবার জিনিসের ওপর কড়াকড়ি দেখে তার স্ত্রী প্যানপ্যানানি শুরু করল।

'ভগবানই জানেন এসব কি হচ্ছে!' তার স্ত্রী বলে, 'লোকের রান্নাঘরে নাক ঢোকাতে আসবার দরকারটা কি শুনি সরকারের? কখন কি খেতে পাবে তাই জানে না লোকে। সোমবার মাংসের কাটলেট পাওয়া দায়; মঙ্গলবার গরুর মাংস বিক্রি করা বে-আইনী; বুধবার মিষ্টি খাবার তৈরি করবে না কেউ। এর চেয়ে অপমান আর কী হতে পারে!'

কয়েকদিন ধরে কোথাও এক দানা কফি পাওয়া যায়নি। মঁতানির স্ত্রী কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না—'সমস্ত দোকানে ঘুরে এলাম...এতটুকুও কফি নেই কোথাও। ব্যাপারটা বোঝ, পোলদের জন্যেই আমাদের এই দুর্ভোগ। ইংরেজরা নিশ্চয়ই চা খাওয়া বন্ধ করেনি। নিজেদেরটা ওরা পুরোপুরি বুঝে নিতে জানে। এ সব দালাদিএর দোষ। কোনো কর্মের নয় লোকটা। একজন ইস্কুল মাস্টার বই তো নয়। প্রধান মন্ত্রী হলে কী হবে!'

আবার দোকানে কফি পাওয়া যেতে লাগল। মর্তিনির স্ত্রী থিতিয়ে গেল কিছুটা।

ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে উঠছে। আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে কৃপণরা পর্যন্ত দু হাতে টাকা খরচ করছে। রেস্তোরাঁয় ঠাসাঠাসি ভিড়। শৌখিন দোকানগুলোর ব্যবসা জমজমাট। মেয়েদের টুপিগুলো ফৌজী ঢঙে তৈরি হচ্ছে। দোকানের জানলায় সাজানো ব্রোচ আর পিনের ওপর ট্যাঙ্ক আর ইউনিয়ন জ্যাকের প্রতিকৃতি; মাদুলি আর রেশমের গায়ে লেখা, 'সে ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায় রয়েছে।'

বিরক্তিকর 'ন' অক্ষরটার বদলে 'ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায়' কথাটা সবার মুখে মুখে ঘুরছে। দৈনিক পত্রিকায় খবর বেরোয়—'গতকাল ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায় জেনারেল সিকরস্কি সৈন্য সমাবেশ পরিদর্শন করেন।' জানলার নিচে বড় রাস্তার গাইয়েরা নাকী সুরে গান গাইছে, 'ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায় মনে কোরো, মনে কোরো আমার ভালবাসার কথা।'

বিদেশী সাংবাদিকদের এক ভোজসভায় তেসা বক্তৃতা দিল, 'সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দিন যে পারী ঠিক আগের মতোই দিন কাটাচ্ছে। কামানের গর্জনের বদলে আমরা গান গাইছি, পারী আজও সেই পারী।'

সৈন্যদের জীবন নাকি বড়ো একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। তাদের জন্যে গ্রামোফোন রেকর্ড, ফুটবল, তাস, ডমিনো, ডিটেকটিভ গল্পের বই, সমস্ত কিছু সংগ্রহ করা হল। পতিপ্রাণা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর জন্যে পাঠাল উটের লোমের কোট, নেপোলিয়ন ব্রান্ডি আর শহরের শ্রেষ্ঠ রাঁধুনীর তৈরি ফলের মোরব্বা।

ভয় হয়েছিল যুদ্ধের ফলে হয়তো অনেক দুঃখকষ্ট আসবে। কিন্তু এবারকার শরৎ এল অনেক বেশি জাঁকজমকের সঙ্গে। নৈশ উৎসব, অভ্যর্থনা সভা, প্রদর্শনী, সাধারণের সাহায্যের জন্যে মেলা আর নীলাম। ভাগ্যবান পুরুষ গ্রঁদেলের দেখা সব জায়গাতেই পাওয়া যাচ্ছে। তাকে বাদ দিয়ে কোন অভ্যর্থনা সভাই সম্পূর্ণ হয় না।

লড়াইয়ের গোড়ার দিকে গ্রঁদেল যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্যে গোঁ ধরেছিল; বারবার বলেছিল, 'আমি লড়াই করতে চাই।' তার সহযোগী ডেপুটিরা প্রতিবাদ করে, 'এখানে তোমার থাকা আরও বেশি দরকার।' তারপর তার খ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়ে যে দুকান হারানো দলিলের কথা তুলতে চাওয়ায় সবাই রীতিমতো সোরগোল তুলে তাকে থামিয়ে দেয়, 'ব্যক্তিগত বাদবিসম্বাদ তুলে জাতীয় ঐক্য নষ্ট কোরো না।'

গ্রঁদেল একথা গোপন করেনি যে সে নিজে একেবারে শেষ মুহূর্তেও একটা বোঝা-পড়া করার পক্ষপাতী ছিল। সে বলে, 'পয়লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যেবেলাতেও চেষ্টা করলে এই যুদ্ধ এড়ানো যেত। ব-নে টেলিফোনে সিয়ানোর সঙ্গে কথা বলেছিল। আমি চেয়ে-ছিলাম, চার প্রধানমন্ত্রী এক জায়গায় এসে আলাপ-আলোচনা করুক। আমাদের দলের ডেপুটিরাও আমাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি একটার মাথার ওপর দিয়ে আরেকটা ঘটে গেল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, কে দোষী। কিন্তু এটা তর্ক করার সময় নয়। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এখন জয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের থামা চলবে না।'

যুদ্ধ গ্রঁদেলকে সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাস ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছিল। সে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। যুদ্ধে জয়লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে তার গলায় আন্তরিক আবেগ ফুটে ওঠে।

ডেপুটিরা গ্রঁদেলের দেশপ্রেম দেখে খুশি। শিল্পপতিরা তার নাম দেয় 'স্থিরচিত্ত'।

উচ্চ সমাজের চালু মেয়েরা তার প্রেমে পড়ে। এমন সুপুরুষ আর সুবক্তা এই লোকটা যে ওকে দেখে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। মনে হবে তার সংযত স্বভাবের মধ্যে লুকিয়ে আছে আবেগের একটা উৎস।

এমন কি ব্রতেইর মনে পর্যন্ত প্রশ্ন ওঠে। সে কি ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়েছিল? রোমাণ্টিকতার ভক্ত লুসিয়ঁকে সে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, গ্রঁদেলের চালচলনে কোনো খুঁত নেই।

ব্রতেইর চোখে এই যুদ্ধ একটা নাটক। সে শেষ পর্যন্ত ভাবতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। মাঝে মাঝে সে আপন মনে বলে, 'আমাদের এ যুদ্ধ জিততেই হবে।' কিন্তু তারপরেই হেসে ওঠে। এই একঝাঁক ডেপুটির হাতে কর্তৃত্ব থাকলে এ যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। এই পার্লামেণ্টকে রদ না করে এবং বাচালদের গারদে না পুরে কি করে এই যুদ্ধ জিতনে ফ্রান্স? হতে পারে শত্রুর ঘা খেয়ে ফ্রান্স আবার নতুনভাবে গড়ে উঠবে।

গ্রঁদেলের রগের চুলে পাক ধরে আর চোখ কেমন বিষন্ন হয়ে যায়। তার দিকে তাকিয়ে ব্রতেই ভাবে, 'ওর মনেও শান্তি নেই, আমারই মতো অবস্থা দেখছি।' একদিন নির্জনে দেখা হয়ে যেতে গ্রঁদেলের হাতে হাত রেখে সে বলে, 'আগে যা হবার হয়েছে, সে-সব কথা আমরা ভুলে যাব!' গত একবছর ধরে ব্রতেই আর গ্রঁদেলের যে বিবাদ চলছিল, সে-খবর কেউ জানত না। এখন তাদের মিটমাটের কথাও কেউ জানল না। সমস্ত ডেপুটিদের চোখে ও দেশের সামনে তারা চিরদিনই বন্ধু ও সহকর্মী। কাজেই ব্রতেই যখন প্রস্তাব করে যুদ্ধ-শিল্প পরিচালনার দায়িত্বশীল পদটিতে গ্রঁদেলকে নিযুক্ত করা হোক তখন কেউ অবাক হয় না।

ব্রতেইর মনে আছে তেসাকে দিয়ে গ্রঁদেলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করানো কী কষ্টকর কাজ হয়েছিল। এমন কি এখনো হয়তো তেসা বিরুদ্ধে যেতে পারে। কিন্তু তেসার এখনকার ভাবগতিক এমন নয় যে পুরনো কথাকে সে টেনে তুলবে। লুসিয়ঁর চুরি করা সেই দলিলের ব্যাপারটা এখন তার কেমন নীরস আর সম্পর্কহীন মনে হয়। কে সন্দেহ করেছিল গ্রঁদেলকে?—ফুজে আর দুকান। ফুজে র‍্যাডিকাল পার্টি থেকে বহিষ্কৃত—মস্কো বোঝাপড়ার সময়ে চেম্বারলেনকে আক্রমণ করে ফুজে পারী আর লণ্ডনের মধ্যে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছিল আর কি! আর দুকান হয়ে উঠেছে বক্তৃতাবাজ। ভ-ভ করে কথা বলে, তবুও তার ধারণা সে গামবেতা; সবার বিরুদ্ধে তাল ঠুকছে। ভাইয়ার বলে, 'দুকান একটা পুঁথি-পড়া উগ্র জাতীয়তাবাদী!' ব্রতেই তার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা এনেছে। না, গ্রঁদেলের শত্রুপক্ষের ওপরে ভরসা রাখা চলে না। তাছাড়া সমস্ত কিছু অত্যন্ত সংযতভাবে দেখা দরকার। গ্রঁদেল কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে, কমিউনিস্টদের দলে ছিল বলে ওদের নাড়ীনক্ষত্র তার জানা। লোকের ধারণা, গ্রঁদেল একজন 'বামপন্থী' কারণ ফ্রান্সের 'দুশো পরিবারকে' সে ছেড়ে কথা বলে না এবং মার্কিন ধনিকতন্ত্রকে আক্রমণ করে একটা পুস্তিকা লিখেছে। আর যুদ্ধ-শিল্পের কথাই যদি বলতে হয় তবে এখানেই সবার আগে কমিউনিস্টদের পাইকিরি হারে গ্রেপ্তার করা দরকার। কাজেই গ্রঁদেল তাদের ধরে ধরে জেলে পুরুক, মজুরদের কাজের সময় বাড়িয়ে দিক, তাদের মজুরি কমাক। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে তাকেই দোষের ভাগী হতে হবে, তেসা এবং র‍্যাডিকালদের ওপর কোনো দোষ পড়বে না।

বেশিদিন হয়নি ব্রতেই বলেছিল যে গ্রঁদেলের মতো লোকের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে সে রাজি নয়। কথাটা হয়েছিল তেসার সঙ্গে। কিন্তু এখন দুজনেই কথাটা

ভুলে গেছে। যখন একটা যুদ্ধ চলছে সে-সময়ে দলগত বাদবিসম্বাদ কাটিয়ে ওঠা দরকার। কাজেই তেসা বলল, 'তুমি ঠিক লোকেরই নাম করেছ।'

দেসের বাদে সমস্ত বড়ো বড়ো শিল্পপতিরা গ্রঁদেলকে সমর্থন জানায়। মঁতিনি উঁচু গলায় বলে, 'অন্তত সে শান্তিরক্ষা করতে পারবে। ঘরের মধ্যে যদি অরাজকতা থাকে তাহলে কি আর যুদ্ধ চালানো সম্ভব? মজুররা কোনো কিছু ছাড়তে রাজি নয়। কথায় তাদের মন ভেজানো যাবে না। কড়া হাতে শাসন করা দরকার।'

মালিক সমিতির সভাপতি মিয়েজারও গ্রঁদেলকে সমর্থন জানায়। একদিন দুকান প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, মিয়েজার এখনো সুইজারল্যান্ড দিয়ে জার্মানদের বক্সাইট পাঠাচ্ছে। মিয়েজার বলে, 'এটা নিছক কুৎসাপ্রচার। আমার কাজের একটা ধারা আছে।' তার কাজের ধারাটি খুবই সরল। সে মনে করে, যুদ্ধটা চালানো উচিত বার্লিনের বিরুদ্ধে নয় মস্কোর বিরুদ্ধে। যে খেলনা-ঘোড়ায় চেপে মিয়েজার পাক খায় তা হচ্ছে, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে পবিত্র অভিযান।' যখন তেসা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জার্মানির বিরুদ্ধেই লড়ছি।' মিয়েজার অর্থপূর্ণ জবাব দেয়, 'ধৈর্য ধরো। এ তো সবে প্রথম অঙ্ক চলছে।' যুদ্ধ শুরু হবার পর সে মাদ্রিদে গিয়েছিল। গুজব রটে যে সেখানে সে জার্মান দূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে।

গ্রঁদেলকে নিয়োগ করার খবর শুনে শুধু দেসেরই চটে গিয়ে বলল, 'এ কাজটা হচ্ছে যন্ত্র-বিশেষজ্ঞের, রাজনৈতিক ফিচেলের নয়।' দেসেরের আগেকার প্রভাব এখন আর নেই। রাজনীতির চালে তার হেরে যাওয়া নিয়ে ব্যবসায়ী মহলে কথাবার্তা চলে। ডেপুটিরা মনে করে, সে নিজেকে বোকা বানিয়েছে। পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করে সে লীগ অব নেশনস্-এর শূন্যগর্ভ প্রস্তাবের সাহায্যে যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল। ব্রতেই প্রায়ই ঠাট্টা করে, 'ও আতর দিয়ে আগুন নিবোয়।' এমন কি তেসার কাছেও দেসের এখন বাতিল হয়ে গেছে।

এক মাস কেটে গেল। দেখা গেল, গ্রঁদেল সত্যিই একজন অক্লান্ত কর্মী। রিপোর্ট তৈরি আর উপদেশ ও নির্দেশ নেওয়ার ব্যাপারে ব্রতেইর সঙ্গে দেখা করাটা তার নিত্যকার কাজ হয়ে ওঠে। সে বলে, 'এ হল দেসের আর কমিউনিস্টদের কীর্তি! একটা নোংরা আস্তাবলের চেয়েও জঘন্য! কাজ শুরু করার আগে এই নোংরা পরিষ্কার করা দরকার।'

'সিরেন' কারখানায় মজুরদের মধ্যে মাত্র তিনভাগের একভাগ আছে: দেসের ভাবল একটা কৈফিয়ৎ নেওয়া দরকার। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে গিয়ে ঢুকল গ্রঁদেলের পড়ার কামরায়। টুপিটা হাতে নিয়ে কথা বলতে বলতে ছড়িটা ঘোরাতে লাগল। গ্রঁদেল হাসছে আর ডেস্কের ওপরকার কাগজগুলো উল্‌টেপাল্‌টে চলেছে। বড়ো মজা লাগছে তার—একদা শক্তিশালী দেসের, ব্রিয়াঁ ও বোঁকুর পৃষ্ঠপোষক, তার কাছে এসেছে আরজি পেশ করতে!

নিশ্বাস নিতে দেসেরের কষ্ট হচ্ছে। সে অসুস্থ; তার গুরুতর অসুস্থতার কথা তার নিজেরও অজানা নয়, যদিও কোনো চিকিৎসা না করিয়ে সে মদ খেয়ে যাচ্ছে। তার ব্যবসার মতো তার ব্যক্তিগত জীবনও উপেক্ষিত ও মন্দীভূত। জেনেতের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাতের মধ্যেও করুণা আর দুশ্চিন্তার ছায়া। শহরতলীর বাড়িতে তার রাত কাটে একা একা। মনের মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা ঢেউ তোলে। মরতে ভয় পায় দেসের। অনেকবার সে এই ভয়কে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। সে দেখতে পাচ্ছে, দেশ কি ভাবে ধ্বংসের দিকে চলেছে কিন্তু নিজের অক্ষমতার জ্বালাটুকু সহ্য করা ছাড়া তার

আর কিছুই করার নেই। অল্পকাল আগেও সে নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করেছিল। কিন্তু এখন সে বাতিলের দলে। তার বক্তব্য শোনে সবাই কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকায় না। তার অবস্থাটা হয়েছে বিধবা রাজমহিষীর মতো, শেয়ার বাজারের পুঁথিগত সমঝদার বা প্রাচীনকালের স্মৃতি-চিহ্নের মতো। লোকে নজর দেয় মুখফোড় মঁতিনি আর মিয়েজারের দিকে, যে মিয়েজার কয়েক লক্ষ টাকার জন্যে নিজের মাকে পর্যন্ত বেচতে পারে। দেসেরের দিকে কারও নজর নেই।

এবার সে গ্রঁদেলকে বলল, 'আপনারা কি করে আশা করেন যে নভেম্বরের মধ্যে আমি আপনাদের মাল যোগান দেব? কোনো মজুর নেই আমার হাতে। লড়াই এখনো শুরু হয়নি কিন্তু এরি মধ্যে দক্ষ মজুরদের ফ্রণ্টে পাঠানো হয়েছে।'

গ্রঁদেল বলল, 'সত্যিই বড়ো আক্ষেপের কথা কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি? এ ব্যাপারে মজুরদের বিশেষ চোখে দেখা চলে না কারণ আমাদের দেশ হল কৃষিপ্রধান। তাহলে চাষীরা বলবে কি? মজুররা দ্বিগুণ রোজগার করবে আর চাষীরা গিয়ে লড়াইয়ে প্রাণ দেবে? জানেন তো, ন্যায়নীতির কতকগুলো গোড়ার কথা আছে যা বাদ দিয়ে চললে এ যুদ্ধে কিছুতেই জেতা যাবে না।'

'কিন্তু চল্লিশের কোঠায় যাদের বয়েস তারা তো আছে? তারা তো আর ফ্রণ্টে নেই। মিস্ত্রীদের দিয়ে ব্যারাকের জানলা ধোয়ার কাজ করানো হচ্ছে।'

'মজুরদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা চলে না।'

'আমি জিজ্ঞেস করি—ইঞ্জিনের দরকার আপনাদের কি নেই? আমি দেখতে চাই আপনারা কি করে বিনা এরোপ্লেনে যুদ্ধ চালান। যদি ইঞ্জিনের দরকার থাকে আমাকে মজুরের ব্যবস্থা করে দিন। গতকাল 'সিয়েনা' কারখানা থেকে আবার দুশোজন মজুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'জানেন তো, গা-জুড়নো প্রলেপ লাগিয়ে মড়ক সারানো যায় না। পপুলার ফ্রণ্ট করার জন্যে আজ আমাদের দাম দিতে হচ্ছে।' গ্রঁদেল বলল।

'পপুলার ফ্রণ্টের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?' দেসের ছড়িটা এমনভাবে তুলে ধরল যেন গ্রঁদেলকে মেরে বসবে, 'আর তাছাড়া আপনি নিজেও পপুলার ফ্রণ্টের প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচনে জিতেছেন।'

'আমার যতোদূর মনে আছে মসিয়ঁ দেসের, পপুল্যার ফ্রণ্টের সাফল্যের জন্যে টাকা খরচ করতে আপনি এতটুকু কার্পণ্য করেননি।'

গ্রঁদেলের সুকুমার ভুরুওলা সুন্দর মুখ, খোদাই করা নাক আর ভাবহীন প্রায়-অস্পষ্ট হাসির দিকে তাকিয়ে আরও রেগে উঠল দেসের।

'আমারও মনে আছে। আমিও কিছুই ভুলিনি। সেই ফুজে-দলিল......'

গ্রঁদেল নির্বিকার। তেমনি হাসিমুখে সে বলল, 'যুদ্ধের সময়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অচল। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে, আপনি এবার যেতে পারেন।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দেসেরের হাত থেকে টুপিটা পড়ে গেল। আর হঠাৎ সে ভয়ানক ভাবে কাশতে শুরু করল। গ্রঁদেল ভান করতে লাগল যেন সে একটা রিপোর্ট পড়ছে।

সন্ধ্যের দিকে একটা ভোজ দিল গ্রঁদেল। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা, 'সৈনিকের আহার।' সুপাদস্তার প্লেটে করে অতিথিদের 'সালামিস দ্য ফেঁজা' পরিবেশন করা হল, মগ থেকে তারা সবাই খেল সব চেয়ে সেরা পানীয় 'হস্‌পিস দ্য বোন'।

অতিথিদের অভ্যর্থনা করেছে মুশ। লুসিয়'র সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর অনেক দিন ধরে তার শরীরের অবস্থা ভালো ছিল না, আলপ্‌স্‌-এ গিয়েছিল শরীর সারাতে। এখনো তাকে সুন্দরী দেখায় কিন্তু ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে সে শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। তার চলাফেরার মধ্যে ফুটে বেরোচ্ছে বিষাদ ও যন্ত্রণা।

অতিথিরা চলে যাবার পর গ্রাঁদেল তার ডিনার-জ্যাকেট আর ওয়েস্টকোট খুলে ফেলল। ঝকঝকে সাদা শার্টের ওপর চোখে পড়ল পাতলা কালো ফিতে দুটো। সে স্ত্রীকে বলল, 'কর্নেল মোরো তোমার দিকে ঝুঁকেছে বলে মনে হল। মস্ত মাতব্বর এই লোকটি। ও জেনারেল স্টাফের কর্তা হলেও আমি এতটুকু অবাক হব না।'

গ্রাঁদেল হাই তুলল। সারাদিন খুবই খাটুনি গেছে। সাবধানে পায়জামাটা বদলে ফেলল সে। হঠাৎ বলল, 'যাই হোক আমরা জিতবই।'

মুশ্‌ ওর ব্যাপারে কোনদিন মাথা গলাতে আসে না। এমন কি সেই বিশ্রী চিঠিটার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে সে। লুসিয়'র সঙ্গে তার শেষ যা কথাবার্তা হয়েছে তা তাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। যুদ্ধ, ম্যাজিনো লাইন আর বিমান আক্রমণের কথা ও স্বামীর ভবিষ্যৎ তার কাছে পরদায় ফুটে ওঠা ছবির মতো মনে হয়। কিন্তু আজ সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমরা মানে কারা?'

সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল কথাটা বোকার মতো বলা হয়েছে। গ্রাঁদেল নিশ্চয়ই তিরস্কার করবে, এই মনে করে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। শান্ত ভাবে গ্রাঁদেল জবাব দিল, 'আমরা ফরাসীরা।'

গ্রাঁদেল হল জুয়াড়ী। তার সারা জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেন জানি মনে পড়ে সবুজ কাপড়ের চারধারে চাপা চিৎকার আর ফিসফাস কথাবার্তা। সেই ভয়ংকর মাসগুলোতেও ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছিল। সে-সময়ে কতকগুলো কাজ সে করেছিল একেবারে বোকার মতো যার ফলে আরেকটু হলেই তাকে অনুতাপ করতে হত। আশি হাজার ফ্রাঁ সে হেরেছিল। ভেন্‌র্ত্ত বাঁচিয়েছিল তাকে। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে কিলমানের সঙ্গে দেখা করতে হয় এবং জার্মানদের জন্যে দলিল নিয়ে আসার কাজে লাগতে হয়। কিন্তু সে সব কথা মনে করে কি লাভ? এখন তার সামনে মস্ত শিকার। মনে মনে বলে, 'আমরা জিতবই।' কিন্তু কোন জয়ের কথা সে বলছে সে-বিষয়ে তার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। সে নিজেকে এবং মুশ্‌কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'এ প্রশ্নের কোনো অর্থ হয় না। কপালের ফের যারা মানে না তারা হচ্ছে বোকা। এ ঠিক রুলেৎ খেলার মতো —সব সময়ে একই নম্বরে দান ধরা। কিন্তু মানুষের বদলানো উচিত, দেখা উচিত কপাল কোন্‌ দিকে চলেছে, তারপর আগু বাড়িয়ে কপালের নাগাল ধরা দরকার।...এখানেই হল আসল কায়দা।'

চার

মঁপতিনি পর্যন্ত গজরাচ্ছে: 'কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা এক কথা আর বুড়ো লোকদের ধরে ধরে ব্যারাকে পাঠানো একেবারে অন্য কথা। আমার হাতে যথেষ্ট কাজের লোক নেই।' গোপন বিরোধিতার ফলে যুদ্ধ-শিল্পের সমস্যা নিয়ে মন্তব্য করাটা চেম্বারের লবীতে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল।

দেসেরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে 'ন্যায়ের নির্দেশ' সম্পর্কে গ্রঁদেল যা বলেছে তা ব্রতেইর কথার পুনরুক্তি মাত্র। ফরাসী কৃষকদের গ্রঁদেল ঘৃণা করে এবং ভয়ও করে। তার ধারণায় ওরা মানুষ নয়, একদল কিম্ভূত জীব। অন্য দিকে ব্রতেইর দৃঢ় মত— শহর ও শিল্প বড়ো বেশি বেড়ে যাবার ফলেই ফ্রান্সের এত দুর্ভোগ। গ্রামের জীবন একঘেয়ে। সেখানে সিনেমা নেই, বড়ো বেশি খাটুনি, সেজন্যে দলে দলে শহরমুখো হচ্ছে যুবকরা। সারা ফ্রান্সে এমনি সব ফেলে-আসা গ্রাম। চালাগুলো ধ্বসে পড়ছে, গোলাঘরে পচ্ ধরেছে, ফলের বাগানে আগাছা গজিয়েছে। এরই পরিণতি হল সাম্যবাদ, পপুলার ফ্রন্ট, অধর্ম আর ভাঙন। ব্রতেই ভেবেছিল, যুদ্ধের ফলে কৃষকরা সামনের সারিতে এসে দাঁড়াবে। তাই গ্রঁদেলকে পরামর্শ দিয়েছিল 'মজুরদের হয়ে ফড়োগিরি কোরো না।'

তবুও তাকে নামতে হল। অক্টোবরের শেষে সরকার সিদ্ধান্ত করল, চল্লিশ বছর বয়সের যে-সব লোককে যুদ্ধশিল্পের জন্যে দরকার, তাদের সৈন্যদল থেকে ছেড়ে দিতে হবে।

এই দলের একজন হচ্ছে লেগ্রে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে তাকে দক্ষিণে পাঠানো হয়েছিল। তার তাঁবু পড়েছিল তুলুজের কাছাকাছি। সেখানে একটা সাঁকো পাহারা দিতে হত তাকে, যে সাঁকোর ওপর দিয়ে কোনো এক সময়ে সরু লাইনের রেল যাতায়াত করত। এই শাখা-লাইন অনেক দিন আগেই উঠে গেছে, সাঁকোটা ভরে গেছে হলদে হলদে ঝোপঝাড়ে। কিন্তু সেনা-কর্তৃপক্ষের তালিকায় এ লাইনের কথা লেখা আছে। গত দু মাস ধরে লেগ্রে শুধু তাকিয়ে আছে খোলা মাঠ আর রঙচঙে গরুগুলোর দিকে।

তার হাতে চিন্তা করবার মতো প্রচুর সময়। গত যুদ্ধের কথা মনে পড়ে---আরগন জঙ্গল, ট্রেঞ্চ আর হাসপাতাল। মনে হয় যেন আগের দিনের ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে হালের ঘটনাগুলো কেমন আবছা আর ভূতুরে হয়ে গেছে, যেন এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে মাত্র একটি দিনের ব্যবধান। সে সময়ে মনে হয়েছিল যে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অনেক বেড়ে গেছে, যুদ্ধবাজরা আর কোনো দিন মাথা চাড়া দিতে পারবে না। কেউ কেউ উইলসনের নীতিতে বিশ্বাস রাখত। কেউ কেউ বলত, 'লেনিন.........লেনিন।' কেউ কি তখন ভাবতে পেরেছিল যে বিশ বছর পার না হতেই এই একই ব্যাপার আবার নতুন করে শুরু হবে?

জোসেতের কথা ভেবে মন কেমন করে লেগ্রের। মনে হয় সুখ তার কপালে নেই। গত গ্রীষ্মে তারা বিয়ে করবে মনস্থ করে নতুন ঘরের খোঁজে বেরিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়াতে ব্যাপারটা আর এগোয়নি। জোসেতের বাবা গ্রেপ্তার হয়েছে। জোসেৎ চলে গেছে তার বোনের বাড়ি বেসাসে। ছোট ছোট ব্যথাভরা চিঠি লেখে সে। রাত্রে দক্ষিণাঞ্চলের আকাশভরা তারার দিকে তাকিয়ে জোসেতের ভালবাসার কথা ভাবে লেগ্রে আর ক্লান্ত হয়ে হাই তোলে।

কারখানায় ফিরে এসে লেগ্রে দেখল পুরনো বন্ধুরা কেউ নেই। মিশো আর পিয়ের ফ্রন্টে রয়েছে। সন্ধ্যার দিকে সে পরিচিত লোকদের খোঁজে বেরুল। যে কাফেতে তার বন্ধুরা জড়ো হত সেখানে গেল, বন্ধ লাইব্রেরীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করল, তারপর মনত্রুজ ভিলজুইভে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা হল না। কতক লোক জেলখানায়, বাকি যারা তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

ভারি একা আর দিশেহারা মনে হতে লাগল লেগ্রের। পার্টি কি করছে না করছে

সে কিছুই জানে না আর এই না-জানাটা তার কাছে অন্ধতা বলে মনে হয়। সে বিরক্ত হয়ে সেই সব খবরের কাগজগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখল যারা লিখেছে—কমিউনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক, রুশরা সিগফ্রিড লাইনে যুদ্ধ করছে আর মোরিস তোরে জার্মানিতে পলাতক। তুলুজে সে শুনেছিল যে 'লুমানিতে' গোপনে ছাপা হয় এবং বিলি করা হয় কিন্তু সে কি করে তার সন্ধান পাবে? যাদের সঙ্গে সে কাজ করে তারা কেউ তার চেনা নয়। তারা সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকায় যেন সে পুলিশের লোক।

সঙ্গীহীন অবস্থা আর বাধ্য হয়ে কুঁড়ের মতো দিন কাটানো—এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো রাস্তা নেই বলে মনে হল। চারদিন কাটল এভাবে। পাঁচ দিনের দিন পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তাকে।

রাত কাটে একটা ছোট্ট হাজত-ঘরে। সব রকমের লোক সেখানে। রাজনৈতিক বন্দী আর মেয়েদের দালাল, জার্মান আশ্রয়প্রার্থী আর পোলিশ ইহুদি, রসিক লোক যাদের ধরে আনা হয়েছে দালাদিএর হজমি-পানীয় আর তেসার প্রণয়-কীর্তি নিয়ে টিপ্পনী কাটার জন্যে আর ধরে-বেঁধে আনা সেই সব মানুষ যাদের এত বড়ো বুকের পাটা যে প্রকাশ্যে আক্ষেপ করে বলেছে, 'এবার আর দুধ পাওয়া যাবে না' বা 'সতেরো বছরের ছেলেদের এবার যুদ্ধে যাবার ডাক পড়বে।'

সকালে লেগ্রেকে জেরা করার জন্যে নিয়ে গেল। পুলিশ কমিশনার ন্যাভিল গুপ্ত ইউরোপীয় তান্ত্রিক সমিতির সভ্য। সে খোলাখুলি বলে যে সে এদুয়ার দালাদিএর চেয়ে এদুয়ার এরিওকে বেশি পছন্দ করে। পুলিশের লোকের পক্ষে এটুকু বলতে পারাটাই স্বাধীন-চিন্তার পরিচয়। সে জানে যে লেগ্রে 'সিয়েন' কারখানার কমিউনিস্ট সংগঠনের একজন নেতা; লেগ্রে যদি পার্টি ছেড়ে দেয় তাহলে কিছুটা আলোড়ন হবে। কাগজগুলো লিখবে, আরেকজনের চোখ খুলেছে। তেসা ন্যাভিলের পিঠ চাপড়াবে। একজন অনুতপ্ত লোক এক হাজার পাপীর সমান।

ন্যাভিল অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার করল লেগ্রের সঙ্গে এবং একটা সিগারেট দিল।

'আমি একজন সরকারী কর্মচারী। সুতরাং ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ফ্যাশিস্ট নই। পপুলার ফ্রন্ট জিতেছিল বলে আমি সত্যিই খুশি হয়েছিলাম। তখন আমরা ভেবেছিলাম যে এবার একটা পাকা-পাকি বোঝাপড়া হবে। কিন্তু তা হল না। যাই হোক, দল পাকিয়ে খেয়োখেয়ির সময় এখন নয়। এখন সমস্ত ফরাসীকে হাত মেলাতে হবে। আপনি কমিউনিস্ট কিন্তু আপনি একজন ফরাসীও। আপনি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। আমি আপনাকে দেশ-দ্রোহী বলে মনে করি না।'

লেগ্রে কি বলে তা শোনার জন্যে সে অপেক্ষা করল। কিন্তু লেগ্রে নির্বাক। বসে বসে হাতের টুপিটা ভাঁজ করছে আর নীল ফাইল ছড়ানো টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কথা বলছেন না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না। যা বলার তা তো আপনিই বলেছেন। আমি কমিউনিস্ট ছিলাম এবং আজও আছি।'

'আপনার গোঁড়ামি আমি বুঝতে পারি। এ হচ্ছে মহৎ চরিত্রের লক্ষণ। আপনি আপনার কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান না। কিন্তু বন্ধু, আজ আর বাছবিচার করার সময় নেই। আপনি অন্যের হাতের ঘুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আপনাকে

ওরা ঠেকিয়েছে। ওরা দেশপ্রেমের বুলি আওড়ে আপনাকে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছে। কিন্তু আসলে কি হয়েছে? মোরিস তোরে আজ পলাতক।'

'আমরা পলাতক নই। আপনি বরং এ প্রসঙ্গ বাদ দিন। আমি জানি না মোরিস তোরে এখন কোথায় আছেন। কিন্তু আপনাদের কাগজগুলোতে যা লেখা হচ্ছে তা ঠিক নয়—তিনি আর যেখানেই থাকুন জার্মানিতে নেই। মনে হয় তিনি 'ল্যুমানিতে' ছেপে বের করছেন। এই হল আসল কাজ। কিন্তু আসল পলাতকরা কোথায় আছে তা আমি জানি। মিউনিকের কথা আমি ভুলিনি বলেই মনে হচ্ছে। আর স্পেনকে নিয়েই বা কী ঘটল? আমাদের লোকেরা যখন ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল তখন ব-নে ফ্রান্সের শত্রুদের সাহায্য করছিল। শিশুরাও একথা জানে। আপনার কথা শুনে অবাক হচ্ছি। আপনি ফ্যাশিস্টদের কথা বলছেন আর আপনারাই সব সময়ে তাদের ঢাল দিয়ে বাঁচিয়ে এসেছেন। এখন তো ফ্যাশিস্টরাই গদিতে বসেছে।'

ন্যাভিল প্রশ্রয়ের হাসি হাসল।

'তেতাল্লিশ বছর বয়স হয়েছে আপনার কিন্তু এখনো যুবকের মতো উদ্দীপনা আছে দেখছি।' সে বলল, 'খুবই প্রশংসার কথা। কিন্তু একমাত্র দুঃখের বিষয়, আপনি আপনার ঠুলি খুলতে চান না। আপনার পার্টি আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জার্মানির জয়ের জন্যে পার্টি এখন কাজ করছে।'

'একথা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না!'

'তাহলে পার্টি কি করতে চায় বলুন তো?'

লেগ্রে ভুরু কোঁচকাল। 'আমি জানি না পার্টি এখন কি আওয়াজ তুলেছে। আপনাদের জন্যেই তা জানা সম্ভব নয়। আপনারা 'ল্যুমানিতের' কণ্ঠরোধ করেছেন এবং সমস্ত সাচ্চা লোককে গ্রেপ্তার করেছেন। আর এখন ধুলো দিতে চাইছেন আমার চোখে। কিন্তু তবুও আপনাদের খেলা আমি কিছুটা ধরে ফেলেছি। কারা কমিউনিস্টদের পিছু নিয়েছে? দালাদিএ, তেসা, ব্লুম, ভীইয়ার, ব্রতেই, লাভাল—এক কথায় গোটা দল। না, কমিউনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক নয়—বিশ্বাসঘাতক হল তাদের চিরকেলে শত্রুরা। আজ যদি লাভাল 'সাবাস কমিউনিস্ট' বলে চিৎকার করতে শুরু করে, আমি সহজে বিশ্বাস করব না। কিন্তু, এখন আমরা জানি আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।'

ন্যাভিল সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ঘণ্টা বাজাল।

'নিয়ে যাও ওকে।' হুকুম দিল ন্যাভিল।

অন্যান্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে লেগ্রেকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বন্দী বোঝাই ট্রেনখানি নোয়াসি-ল-সেক জংশনে এক ঘণ্টারও ওপর থেমে থাকে। পুলিশ কাউকে বন্দীদের কাছাকাছি আসতে দেয় না—বলে, ওরা পলাতক সৈন্য। সৈন্যরা ও স্ত্রীলোকেরা ট্রেনের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'নচ্ছারের দল। ওদের হয়ে অন্যেরা গিয়ে মরুক এই ওরা চায়।' কেউ কেউ গলা চড়িয়ে গাল পাড়ে, 'কাপুরুষ!' আর তখন লেগ্রে 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে শুরু করল। অবাক হয়ে শুনতে লাগল প্ল্যাটফর্মের লোকেরা। গাড়ি থেকে বন্দীরা চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা পলাতক সৈন্য নই। আমরা মজুর—আমরা কমিউনিস্ট।' 'ইণ্টারন্যাশনালের' পর ওরা 'মার্সাই' গাইল। প্ল্যাটফর্মের সৈন্যরা গলা মেলাল সেই গানের সঙ্গে। পুলিশ চেষ্টা করেও ভিড় ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। জানলা থেকে ঝুঁকে পড়ে লেগ্রে বলে উঠল :

'গত যুদ্ধে আমার চোট লেগেছিল। মুখে এখনো পর্যন্ত তার দাগ রয়েছে। সে

দাগ মুছতে পারবে না কেউ। বিমান কারখানা থেকে ওরা আমাকে ধরে এনেছে। ধাঙগড়ের কাজ করাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। ব-নে, তেসা, ফ্লাঁদ্যা! ওরাই হল আসল বিশ্বাসঘাতক! ফ্রান্সের জন্যে আমরা আমাদের প্রাণ দিতে পারি।'

লেগ্রে বজ্রমুষ্টি তুলল,—সেই প্রায়-ভুলে-যাওয়া শাসানির ভঙ্গি যা ১৯৩৬ সালের বিপুল প্রত্যাশার কথা মনে করিয়ে দেয়, যা পূর্ণ হবে না বলেই জানা ছিল। পুলিশ তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। ওদিকে ট্রেন চলবার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের ধার থেকে সৈন্যরা আর স্ত্রীলোকরা শত শত বজ্রমুষ্টি তুলে বিদায়-অভিনন্দন জানাল।

পাঁচ

তালিকা এবং কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি মাফিক ধরপাকড় হচ্ছে। অপরাধীদের মধ্যে কেউ বজ্রমুষ্টি তুলেছে, কাউকে শিস দিয়ে 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে শোনা গেছে, অন্য একজন তার ঘরে ক্রেমলিনের একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছিল—এমনি সব অভিযোগ! পুলিশ-রিপোর্ট পড়ে চোখ কপালে তুলে তেসা ভাবল, কমিউনিস্টরা তাহলে সমস্ত জায়গায় গিয়েই বাসা বেঁধেছিল! নীভ্‌র এমেচার মৎস্যশিকারী সমিতি, ভার-বিভাগের দাবা-চক্র, গ্রোনোব্‌ল্‌ পর্বত-অভিযাত্রী সংঘ—সবগুলোই নাকি কমিউনিস্ট পার্টির শাখা। তেসা মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, এতেই বোঝা যায় ওদের কত ক্ষমতা! এখন বুঝতে পারি ওরা কি ভাবে দেনিসের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। বোকা মেয়েটা!'

ব্রতেই দাবি তোলে, সমস্ত কমিউনিস্ট ডেপুটিদের গুলি করে মারা হোক। তেসা এই বলে তার মুখ বন্ধ করে : 'সাবধান বন্ধু! ওরা আর যাই-ই হোক, তবুও ওরা হচ্ছে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি।' তেসা এমন কিছু করতে রাজি নয় যা একটা নজির হয়ে থাকতে পারে। যে সব ডেপুটি ধরা পড়েছে তাদের সম্বন্ধে তেসা খুবই দুঃখিত। তাদের বাঁচানো দরকার। তেসা তাদের বলে যে তারা যদি মুচলেকা সই করে যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নীতি তারা মানে না তাহলেই তারা আবার চেম্বারের আসনে বসতে পারবে। কিন্তু যখন সে শোনে যে আটক ডেপুটিরা মুচলেকা দিতে রাজি হয়নি তখন ভীষণ রেগে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'একগুঁয়ের দল! ওদের জন্যে যা করা সম্ভব তা আমি করেছি।'

ফুজে আবার আক্রমণ করতে শুরু করেছে। মার্সাই-এর গুণ্ডারা ডাণ্ডা মেরেও এই অপরিণামদর্শী লোকটির মগজে সুবুদ্ধি ঢোকাতে পারেনি। সে বলে বসল, 'কমিউ-নিস্টদের গ্রেপ্তার করার ফলে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ছে।'

তেসা খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তুমি কি হিটলারের পক্ষে?' ডেপুটিরা হাততালি দিয়ে তেসাকে প্রশংসা করল। নানা ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে মঞ্চ ছেড়ে চলে এল ফুজে।

জীবনে কখনো এতবেশি পরিশ্রম করতে হয়নি তেসাকে। পলেতের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আসবে, সে অবকাশও তার নেই। এমন ক্লান্ত লাগে যে মনে হয়

এসব ছেড়েছুড়ে দেওয়া অনেক ভালো। ভাঁড়িয়ে লাভ নেই। অনেক বয়স হয়েছে তার। আরো কতদিন বাঁচতে হবে তাকে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এ-চিন্তা উড়িয়ে দিল। যথেষ্ট বুড়িয়ে যাওয়ার পরেও কি ক্লেমসো ফ্রান্সকে বাঁচায়নি? নিজেকে কল্পনা করে ক্লেমসোর উত্তরসাধক হিসেবে। তার মর্মরমূর্তি একদিন বড়ো বড়ো পার্কে শোভা পাবে। একবার সে পলেৎকে বলেছিল, 'লা রু তেসা—কথাগুলো নেহাত মন্দ শোনায় না।'

বাধ্য হয়ে তেসাকে নানা বিষয় হাতে নিতে হয়; সমরবিদ্যা, অর্থনীতি, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত। বাধ্য হয়ে তাকে নানা বিষয়ে কথা বলতে হয় : তুলো সরবরাহ, নতুন বোমারু, ভেনিজুয়েলার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি। প্রত্যেকেই তার কাছে নানা রকম দাবিদাওয়া নিয়ে আসে, অব্যবস্থার জন্যে নালিশ জানায়। আগে তাকে ডেপুটি আর বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হত। এখন তাকে ফৌজের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, যদিও সামরিক পরিভাষার মানে সে বুঝতে পারে না, যদিও সে জানে না কোন্ কোন্ বিষয়ে কথা দেওয়া যেতে পারে বা কি-ভাবে তাদের এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে।

'ফৌজের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা,' সবাইকে শুনিয়ে সে বলে, তারপর মনে মনে যোগ করে, 'তবে একেবারে ওঁচা জায়গা।'

জেনারেল দ্য ভিসে তার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে ভুরু কোঁচকাল তেসা। সবাই জানে, এই লোকটি বড়ো বেশি খুঁতখুঁতে: ওর সঙ্গে কথা বলার সময়ে ঠিকমতো সামলে চলাটা রীতিমতো শক্ত ব্যাপার হবে।

জেনারেল দ্য ভিসের নাম প্রথম শোনা যায় ১৯১৫ সালে। তখন সে শেম্যাঁ-দে-দেম্-এ সৈন্য পরিচালনা করছিল। পায়ে চোট পেয়েও সে ঘাঁটি ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। চৌষট্টি বছর বয়সে এখনো তার প্রাণশক্তি আর উদ্দীপনা অক্ষুণ্ন আছে। রোদ-ঝড়-লাগা গোলগাল মুখে আর খাড়া হল্‌দেটে গোঁফে তাকে ঠিক ডালকুত্তার মতো দেখায়। লোকটি দয়ালু কিন্তু বদরাগী। বৌয়ের ওপর তম্বি করে আর নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের গালি-গালাজ দেয়। ফৌজ আর বাগান—এই হচ্ছে তার জীবনের দুটি ঝোঁক। অবসর সময়ে সে জলের ঝারি নিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়ায়, গোলাপের ঝাড় বাঁধে, ডাল ছাঁটে আর কলম লাগায়।

সে কখনো রাজনীতি আলোচনা করে না; কোন মন্ত্রী সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয়, 'সৈনিকরা এ ব্যাপারে একেবারে বোবা।' কেউ কেউ বলে সে একজন রাজতন্ত্রী—সিংহাসন দাবিদারদের হয়ে যারা দালালী করে তাদের সঙ্গে তার মেলামেশা আছে। অন্যরা বলে, দ্য ভিসে কমিউনিস্ট ছাড়া কিছু নয়। জেনারেল পিকারের মতও তাই। প্রতিবাদ না করে সে ফুজের কথা শোনে; সোবিয়েত বিমান-বাহিনী সম্পর্কে দু-একটা প্রশংসার কথা বলতে তার বাধে না। সেদিন দ্য ভিসেকে গির্জায় প্রার্থনা করতে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল তেসা, মনে মনে ভেবে-ছিল, 'তবুও বিশ্বাস করতে হবে যে লোকটা ফুজের বন্ধু!'

এ-সময়ে সে কি জন্যে দেখা করতে আসছে তার সঙ্গে? হয়তো সৈন্যবাহিনীতে বাম-পন্থী সংবাদপত্র পড়া নিষিদ্ধ করায় সে পিকারের নামে নালিশ করতে এসেছে? কিংবা হয়তো আসছে সৈন্যবাহিনীতে ধর্মযাজকের রীতি স্বীকার করানোর জন্যে। ভগবানই জানেন সে কি জন্যে আসছে!

জেনারেলকে অত্যন্ত আরামপ্রদ আর্ম-চেয়ারে বসতে দিয়ে তেসা তার দিকে এক

বাক্স সিগার এগিয়ে দিল।

'পার্তাগাস সিগার। খুব ভালো অবস্থায় আছে কিন্তু। এ জিনিস আর পাওয়া যাবে না, আবার চালান আসতে ঢের দেরি। জাহাজগুলো সব অন্য মালে ভর্তি। তারপর জেনারেল, আমার কাছে কী দরকার?'

তেসার সঙ্গে কি-ভাবে কথা বলবে, তার জন্যে দ্য ভিসে অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়েছে। বাড়িতে বসে সে ভেবে রেখেছিল যে প্রথমে দেশপ্রেম সম্বন্ধে বিস্তৃত একটা ভূমিকা করবে, তারপর বলবে গত যুদ্ধের শিক্ষা এবং সৈনিকের কর্তব্য সম্বন্ধে। কিন্তু এখন সমস্ত কিছু ভুলে গেল। সিগারের গোড়াটা দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে নিয়ে থু-থু করে ফেলে দিল, তারপর সরাসরি বলে বসল, 'অবস্থা বড়ো সাংঘাতিক! সব জিনিসেরই অভাব! জানেন এক-একটা ব্যাটালিয়নে ক-টা মেসিনগান আছে? বিমান বহরের কথা বাদই দিলাম। যেমন ধরুন, মাত্র দশটা বোমারু আছে আমার হাতে। হ্যাঁ দশটা, ভুল শোনেননি আশা করি। মাত্র দশটা! আর না আছে জুতো, না আছে কম্বল। অথচ এদিকে পুরোদস্তুর শীত পড়ে গেছে।'

দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে তেসা বলল, 'আমি জানি, সবই জানি। এসব হচ্ছে পপুলার ফ্রন্ট করার ফল, মাইনে সমেত ছুটি আর অন্য সব কাণ্ডকারখানার ফল। কিন্তু অবস্থা শিগগিরই বদলাবে। আমেরিকা থেকে আমরা মাল কিনব।'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন কিনুন।'

'মনে হচ্ছে অর্থতত্ত্ববিদ নন আপনি, জেনারেল।' তেসা অনুগ্রহসূচক হাসি হাসল। 'আমেরিকা থেকে উড়োজাহাজ কেনা অত্যন্ত খরচের ব্যাপার। তার চেয়ে যন্ত্রপাতি কেনা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। এর ফলে প্রত্যেকটি ইঞ্জিন পিছু খরচ কমবে। শিল্পপতিদের তো যুদ্ধং দেহী মনোভাব। মিয়েজার আপত্তি জানিয়ে বলেছে, দেশী শিল্পের ক্ষতি করলে চলবে না। তবু আমি বলছি, আমেরিকা থেকে মাল আমরা কিনবই। ইতালিতেও আমরা কিছু অর্ডার দিয়েছি। ১৯৪১ সালের বসন্তকাল নাগাদ......'

বাধা দিয়ে জেনারেল বলল, 'কিন্তু যদি তারা ১৯৪০ সালের বসন্তকালের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু করে?'

'একথা আমার চেয়ে আপনারই আরো ভালোভাবে জানা উচিত যে, ম্যাজিনো লাইন জয় করা অসম্ভব ব্যাপার।'

'কিছুই অসম্ভব নয়। ওরা কত প্রাণ বলি দিতে তৈরি আছে তার ওপরই নির্ভর করবে ম্যাজিনো লাইনের ভবিষ্যৎ। তাছাড়া উত্তর দিকে? সেখানে তো ম্যাজিনো লাইন আমাদের রক্ষা করবে না।'

'কেন লীজ দুর্গ আর আলবের খাল রয়েছে ওদিকে। বেলজিয়ানরা যদি একবার যুদ্ধে নামে তাহলে সিংহের মতো লড়বে। রীতিমতো বীরের জাত ওরা।'

'হতে পারে। কিন্তু পরের ওপর নির্ভর করাটা ঠিক নয়। উত্তর সীমান্তে প্রতি-রোধের ব্যবস্থা করতেই হবে একটা।'

'অনেক বছর লাগবে তা করতে। আর তার ওপর আমাদের সমস্ত সংস্থান একসঙ্গে জড়ো করতে হবে। এবার যার হাতে সোনা আছে সেই জিতবে এই যুদ্ধে।'

অতিথির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞের হাসি হাসল তেসা। মনে মনে বলল, 'ইস্ কী ছেলেমানুষ!' লাল হয়ে উঠল জেনারেলের মুখ। বুকের ওপর রিবনগুলো দুলতে লাগল।

'আমি ফৌজের লোক। হুকুম তালিম করাই আমার কাজ। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারি না। জেনারেল পিকার বলেন যে সিগফ্রিড লাইন দখল করার জন্যে ১৯৪২ সালে আমাদের হাতে প্রচুর কামান থাকা দরকার। কিন্তু পোলাণ্ডে কি ঘটেছিল তা আপনি দেখেছিলেন। জার্মানদের কি ধরনের যান্ত্রিক বাহিনী আছে তাও আপনি দেখেছিলেন। খুব ছোট্ট একটা এলাকায় ফ্রন্ট লাইন ভেদ করার চেষ্টা ওরা করতে পারে। তবু শুনলাম ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানের উৎপাদন বাড়ানো তো হয়ইনি, বরং কমানো হয়েছে। কেন? কারণ মজুরদের ধরে ধরে বন্দী-শিবিরে পাঠানো হয়েছে। ওদের আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। ওরা এখন থলে বানাচ্ছে। তবু ভালো চকোলেটের বাক্স বানাচ্ছে না। গ্রঁদেলের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, '১৯৪২ সালের আগে নয়।' মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এ ভয়ানক সাংঘাতিক অবস্থা। দক্ষ মজুরদের গ্রেপ্তার করে কি লাভ?'

ভয়ানক চটে উঠল তেসা, 'ফুজের কথা শোনা আপনার অন্যায়। কেবলমাত্র কমিউনিস্টদেরই বন্দী-শিবিরে পাঠানো হচ্ছে। সমরবিদ্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আপনিও রাজনীতিতে মাথা গলাতে আসবেন না!'

'এর সঙ্গে রাজনীতির কি সম্পর্ক? শুধু কামান আর বিমানবহরের কথা বলছি আমি।'

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে এক পাক ঘুরে নিল। তারপর জুরীকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করে কর্কশ গলায় বলল, 'জেনারেল, সে দিন আপনাকে গির্জায় উপাসনা করতে দেখলাম। সত্যি বলছি, দেখে ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমি নিজে একটি নাস্তিক পরিবারে মানুষ হয়েছি কিন্তু ধর্মকে আমি শ্রদ্ধা করি; ধার্মিক লোকের আবেগকেও আমি বুঝতে পারি। বলুন, আপনি একজন ক্যাথলিক হয়েও কী করে কমিউনিস্টদের হয়ে ওকালতি করছেন?'

'কমিউনিস্টদের হয়ে ওকালতি করছি না আমি। ফৌজের ভার রয়েছে আমার ওপরে। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। কাদের দায়ী হতে হবে? আমাদের, ফৌজের লোকদের। জার্মানদের আমি ঘৃণা করি। শুনে রাখুন কথাটা। তারা এই প্যারীতে পর্যন্ত হাজির হতে পারে। এ অবস্থায় যদি যুদ্ধাস্ত্র পাবার নিশ্চয়তা থাকে তাহলে শুধু কমিউনিস্ট কেন শয়তানকে দিয়ে পর্যন্ত কারখানা চালু রাখতে রাজি আছি।'

'অকারণে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন,' তেসা বলল, 'ভুলে যাচ্ছেন যে এ যুদ্ধ অন্য সব যুদ্ধের মতো নয়। এ অনেকটা প্রায় সশস্ত্র শান্তির মতো। জানি না, গামল্যাঁ কেন হুার্নট জঙ্গলে মিছিমিছি এতগুলো লোককে মরতে পাঠাল। এমনিতে ফ্রান্সের জন্মের হার ভয়ানক নিচে। আমাদের দ্বিগুণ মিতব্যয়ী হতে হবে। লোকদেখানো ঠাঁট বজায় রাখা আমাদের পোষাবে না। তাছাড়া এ যুদ্ধের জয়-পরাজয় অন্যভাবে ঠিক হবে। অবরোধ—এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র অস্ত্র। তাছাড়া যুদ্ধের আসল ঝুঁকিটা সামলাতে হবে ব্রিটিশদের। জার্মানরা দেখে দেখে ব্রিটিশদের জাহাজই ডুবিয়ে দিচ্ছে। এতে আমাদেরই সুবিধে। মার খেয়ে খেয়ে ইংলণ্ড জবর রকমের ঘায়েল হোক আর সেই অবস্থাতেই সে আসুক শান্তি-সম্মেলনে। অবরোধ হচ্ছে আমাদের মস্ত একটা যাঁতাকল। এই যাঁতাকলে জোরে চাপ দিতে হবে, খুব বেশি নয় যদিও। জার্মানদের একেবারে মরিয়া করে তোলা ভুল হবে। তা করলে ওরা হয়তো সত্যিই ম্যাজিনো লাইন আক্রমণ করে বসতে পারে। ওদের শুধু একটু ভয় পাইয়ে দেওয়া দরকার, তাহলেই ওরা আর বেচাল হবে না।

আমরা জার্মানির সঙ্গে কেন লড়ছি? এ এক মারাত্মক ভুল-বোঝাবুঝির ফল। আমাকে ভুল বুঝবেন না, মনের কথা খুলে বলাটাই আমার স্বভাব। একেবারে পেছনে থাকবে সৈন্যবাহিনী। সেনাপতিরা নয়, কূটনীতিকরাই এই যুদ্ধ জিতিয়ে দেবে।'

পরে, মন্ত্রীর সঙ্গে তার কি কথাবার্তা হয়েছে তা বলতে গিয়ে দ্য ভিসে চিৎকার করে উঠেছিল : 'লোকটা চাকরের মতো ঘর থেকে বার করে দিল আমায়; বলে কিনা ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমার! ওরা আমেরিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনবে না। ওতে নাকি ভয়ানক খরচ। এখানেও কোনো মাল তৈরি করবে না। মজুররা নাকি সব কমিউনিস্ট। এমন কি যুদ্ধের জন্যে তোড়জোড় করারও দরকার নেই; সৈন্যরা বসে বসে ঝিমোবে। কী চায় ওরা? ওদের কাণ্ডকারখানা বোঝাই ভার।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দেশের লোকদের উদ্দেশে তেসা বেতার-বক্তৃতা দিল। বেতারে বক্তৃতা দিতে তার ভালো লাগে না। এখানে মস্ত একটা জিনিস বাদ পড়ে যায়; চোখের সামনে শ্রোতারা থাকে না, উচ্ছ্বাসে যাদের চোখ জ্বলজ্বল করে বা ভিজে ওঠে। বেতারের লোকজন হাজির হতে সে তার পুরনো আর্দালী মরিসকে ডেকে পাঠাল।

'মরিস, বক্তৃতাটা যখন আমি পড়ব তুমি আমার সামনে বসে থাকবে। তোমার মুখ দেখে আমি অনুপ্রেরণা পাই।'

মরিস হাসল, তারপর বসল। মাতব্বরি চালে বক্তৃতা শুরু করল তেসা :

'এতদিনে তূণ থেকে তীর খসেছে, আমাদের এই যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর পুণ্য-অভিযান। শ্রেষ্ঠ নৈতিক সম্পদ ও খ্রীষ্টান মানবতাকে বাঁচাবার জন্যে আমরা অস্ত্র উঠিয়েছি; বর্বর যান্ত্রিক শক্তিকে আমরা পোষ মানাব। আমাদের এই অস্ত্র বড়ো মারাত্মক অস্ত্র। যুদ্ধের কোনো গোপন খবর প্রকাশ করে ফেলবার ভয় না রেখে আমি বলছি, আগে আর কখনো ফ্রান্সের আকাশে এত শক্তিশালী বিমানবহর দেখা যায়নি। আগে আর কখনো আমাদের দেশের মাটি এমনি বিরাটাকার জঙ্গী ট্যাঙ্ক-বাহিনীর গর্জনে কেঁপে ওঠেনি। ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র বাড়াবার জন্যে আমরা দিনরাত একটানা কাজ করছি। আমাদের সাহায্য করছে অমাদের মহানুভব মিত্র ব্রিটিশরা এবং আটলাণ্টিক পারের গণতন্ত্রীরা। কিন্তু আমাদের প্রধান শক্তি হল আমাদের মনোবল, আমাদের ভ্রাতৃত্ব যা আমাদের দেশের সমস্ত দল ও শ্রেণীর মানুষকে একসূত্রে বেঁধেছে, আমাদের একতা এবং জয়ের ইচ্ছা। হে ফরাসীদেশের মানুষ, সভ্যতার অভিশপ্ত শত্রুকে পরাজিত না করা পর্যন্ত আমরা অসি কোষবন্ধ করব না।'

মরিস নড়তে চড়তে ভয় পাচ্ছিল। চেয়ারের কিনারাটায় বসে সে জোর করে মুখের ওপরে হাসি ফুটিয়ে রাখছিল, ফটো তোলার সময়ে লোকে যেমন করে।

ছয়

সৈন্যবাহিনীর সদর-দপ্তর বসেছে কোনো এক ধনী আলসেশীয় শিল্পপতির পল্লী-ভবনে। জলসা-ঘর আর বিলিয়ার্ড-ঘর সমেত প্রকাণ্ড বাড়ি। সন্ধ্যেবেলা অফিসাররা বিলিয়ার্ড-ঘরে খেলে। লাইব্রেরি-ঘরটা ব্যবহার করা হয় মানচিত্র অধ্যয়ন করার জন্যে।

সেক্রেটারিরা যে ঘরটায় বসে আগে সেটা ছিল নার্সারি, এখন সেখানে সব সময়ে টাইপ-রাইটারের খটাখট শব্দ শোনা যায়। মিকি মাউসের একটা ছবি এখনো দেওয়ালে রয়ে গেছে, ছবিটার নিচে বসে স্টেনোগ্রাফার-সেক্রেটারি লুসি। খড়ের রঙের চুল মেয়েটির, বেগুনী রঙের টানা-টানা ভুরু। জেনারেলের প্রিয়পাত্র মেজর লেরয় ঘুর ঘুর করে মেয়েটির পেছনে।

বাড়ির মালিকের খুঁটিনাটি জিনিসের ভয়ানক শখ। যে লেখবার টেবিলে জেনারেল লেরিদো কাজ করে সেখানে আছে একটা দোয়াতদানি যেটা দেখতে পিসা গম্বুজের মতো, কোপেনহেগেনের চিনেমাটির তৈরি পেঙ্গুইন পাখি, আর একটা ঘড়ি যার ডায়ালে পারী সান-ফ্রান্সিসকো ও টোকিওর সময়ের নির্দেশ একই সঙ্গে মেলে। কাজ করতে বসে জেনারেল লেরিদো প্রথমেই পেঙ্গুইন পাখিটাকে একপাশে সরিয়ে রাখে; এর অন্যথা কখনো হয় না। পেঙ্গুইন পাখিটা ভেঙে যেতে পারে এই তার ভয়। কোনো রকম ভাঙাচোরার দৃশ্য সহ্য করতে পারে না সে। নক্‌শা আঁকা মেঝের ওপর এক ফোঁটা কালি পড়তে দেখলে বা সৈন্যদের বুট দিয়ে ঘাসের জমি মাড়াতে দেখলে সে ভয়ানক চটে যায়।

মনে হতে পারে, এমন যার মনের গড়ন তার পক্ষে অন্য পথ নেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু লেরিদোর পরিবারের সকলেই ফৌজে যোগ দিয়েছে। ১৯১৪ সালে লেরিদো একটা রেজিমেণ্ট পরিচালনা করেছিল। যোগ্যতা দেখানোর ফলে তাকে সেনাপতির পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল। ওপরওলাদের সঙ্গে আর তাঁবের লোকদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করতে হয় তা সে জানে। নিজেকে কখনো সে জাহির করে না। নিজের পরিচয় দেয় ফশের শিষ্য হিসেবে আর বলে, 'আমাদের কাজে সবচেয়ে বেশি দরকার স্থিরতা ও মাত্রাজ্ঞান।' সদা অমায়িক, দাড়িগোঁফ পরিষ্কারভাবে কামানো, গায়ে অ-ডি-কোলোনের গন্ধ—সবাই তাঁকে পছন্দ করে, তার উপস্থিতিতে সকলেই খুশি হয়। একটিমাত্র ব্যাপারে সে অ-দুরস্ত—তা হচ্ছে, চেহারার দিক থেকে সে খর্বকায়। সেজন্যে কেউ তার পাশে দাঁড়ালে সে কক্ষনো ফটোগ্রাফারদের ছবি তুলতে দেয় না।

জীবনে সে যে সফল হয়েছে তার কারণ সে অবস্থা বুঝে চলতে জানে। ডেপুটিদের দু-চোখে দেখতে পারে না কিন্তু অসামরিক কোনো লোক তার সামনে রাজনীতির আলোচনা তুললে সে বলে, 'দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর আমার আস্থা আছে।' ব্রতেই, দুকান ও ভীইয়ার, সকলের সঙ্গেই তার সদ্ভাব। মার্নের যুদ্ধে জয়লাভের পেছনে পঁচাত্তর মিলিমিটার কামানের অবদান বা ক্লাসিকাল কবিতার সৌন্দর্য—এই নিয়ে তাদের সঙ্গে সে সানন্দে কথা বলে। সাহিত্যের ভক্ত, রাসীন ও কর্নেই-এর বইয়ের রাজসংস্করণ কেনে, এমন কি বছর ত্রিশেক আগে মফস্বলের এক কাগজে 'স্তঁধালের কতকগুলো ভুলত্রুটি' নামে একটি প্রবন্ধও লিখেছিল। সমর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শাত্র্যস্ দ্য পার্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল প্রবন্ধটিতে।

লেরিদো তাব বৃত্তিকে ভালবাসে। কিন্তু যুদ্ধের এলোমেলো অবস্থা দেখে সেও হতাশ হয়ে পড়েছে। গোড়ার দিকের তাল ঠোকার সময়ে সৈন্য চলাচলের যে ব্যাপারটাকে নিখুঁত বলে মনে হয়েছিল এখন তা হাজারটা ফ্যাকড়ায় পণ্ড হযে গেছে। গত তিন মাসে আরো রোগা ও আরো বুড়ো হয়ে গেছে সে। মাঝে মাঝে কেমন একটা যন্ত্রণা হয়, ডাক্তার বলে তার লিভার খারাপ। কিন্তু লেরিদোর ধারণা, এটা হয়েছে দুশ্চিন্তার জন্যে। আজকাল তার মেজাজ সব সময়েই খিটখিটে হয়ে থাকে। এই তো এতটুকু ফ্রন্ট-এর মধ্যে এত সৈন্য কোথায় বসাবে? বারবার শুধু বলে, 'সৈন্যদের সংখ্যা বড়ো বেশি—আর এটাই হয়েছে মুশকিল!' মানুষগুলোকে খোলা জায়গাতেই শুয়ে থাকতে হয়।

ফলে নভেম্বর মাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা শুরু হয়ে গেল। অফিসাররা সৈন্যদের চর্ব্য-চোষ্য খাওয়াচ্ছে কিন্তু তাদের কোনো কাজে লাগাবার ব্যাপারে গাফিলতি দেখাতে থাকে। শুয়ে-বসে সৈন্যদের সময় আর কাটতে চায় না; বিরক্ত হয়ে তারা মদ খাওয়া ধরেছে। লোরিদো যখন শুনল যে সিগফ্রিড লাইন আক্রমণ করার জন্যে গামল্যাঁ প্রচুর ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র মজুত করছে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অফিসারদের হাতে একটা রিভলবার পর্যন্ত নেই।'

সদর দপ্তরের রোজকার রুটিনের ওপর লোরিদোর কড়া নজর। সবাই ভোর ছটায় ওঠে। কর্নেল মোরো রিপোর্ট নেয়। মেজর লেরয় খবরের কাগজের একঘেয়ে খবর পড়ে আর মাঝে মাঝে তাকায় সেক্রেটারিদের কামরার দিকে যেখানে লুসি তার যন্ত্রের ওপরে আঙুল চালাচ্ছে। মেজর জিসে কমিশেরিয়ট অফিসারদের তাতিয়ে তোলে। কর্নেল জাভৎ মানচিত্র দেখে। টেকোমাথা পাগলাটে ক্যাপ্টেন সাঁজে পারীর কাফেগুলোর কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর জেনারেলের কাছে রিপোর্ট দেয় : 'জুইন্‌কারে দুজন সৈন্য আহত হয়েছে......ষোড়শ ডিভিশনের বিপরীত দিকে শত্রু-সৈন্য চলাচল করতে দেখা গিয়েছে। জার্মানরা ১৮৬ নম্বর রেজিমেন্টকে ফ্রন্টে পাঠিয়েছে।.........গতকাল কোনো শত্রু-বিমান দেখা যায়নি। তান্‌ভিলে একটা যৌন-ব্যাধি হাসপাতাল খোলা হয়েছে।...' পেঙ্গুইন পাখিটাকে পাশে সরিয়ে রেখে জেনারেল বিড়বিড় করে, 'তা বটে!' তারপর বারোটার সময় সবাই লাঞ্চ খেতে বসে।

সেদিন খেতে দেওয়া হল স্ট্রাসবুর্গের 'পাতে দ্য ফোয়া গ্রা।' কর্নেল মোরো বলে যে এ হল স্থানীয় দেবতাদের উপহার। জেনারেলের মন খারাপ হয়ে গেল কারণ তার এসব খাওয়া বারণ। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সে বলল, 'স্যালাডের মতো আর কিছু নয়। বয়েস হলে শাকসব্‌জি খেয়েই বেঁচে থাকতে হয়। এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।'

ক্যাপ্টেন সাঁজে অপরাধীর মতো এক টুকরো সুস্বাদু 'পাতে' মুখে পুরে বলল, 'সত্যি কথাই বলেছেন জেনারেল।'

কথা ওঠে যে হিটলার নিরামিষ খায়। জেনারেল অবাক হয়ে বারবার বলে, 'তাইতো! বড়ো মজার ব্যাপার কিন্তু।' তারপর মেজর লেরয় খবরের কাগজের চলতি মতামত জানাতে শুরু করে।

ফিনল্যান্ড প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। রুশরা কি করবে তাই নিয়েই যত জল্পনা-কল্পনা।

জেনারেল হঠাৎ উজ্জীবিত হয়ে উঠে বলল, 'ব্যাপারটা খেয়াল করার মতো! ওরা হয়তো সাঁড়াশী আক্রমণ শুরু করবে আর সুইডেন থেকে হেলসিঙ্কিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যে বথনিয়া উপসাগরে হাজির হতে চেষ্টা করবে। আবার মানারহাইম লাইনের ওপরও সোজাসুজি হামলা চালাতে পারে। দেখা যাক কি হয়। দেখা যাক।' ফিনল্যান্ডের যুদ্ধ তার কাছে হয়ে উঠেছে একটা সামরিক সমস্যা। এই আলোচনা উঠলেই কেন জানি তার মনটা ফিরে যায় পারী শহরে তার নিজের সাজানো-গোছানো পড়ার ঘরটিতে। বুক-খালি করে একটা বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের নিজেদের ব্যাপার-স্যাপার কি রকম চলছে? সে-সম্পর্কে কিছু লিখেছে?'

'খুবই সামান্য! সেন্সার 'লেপোক্'-এর দু-কলম লেখা চেপে দিয়েছে।'

'ঠিকই হয়েছে। এ নিশ্চয়ই কেরেলি বা দুকানের কোনো প্রবন্ধ। বুঝি না কেন যে ওদের লিখতে দেওয়া হয়!'

কর্নেল মোরো জেনারেল গি…রের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তারা দুজনেই দুকানকে বরদাস্ত করতে পারে না।

কর্নেল বলল, 'পারী থেকে ওর লিখেছে যে দুকান এখানে আসতে চায়, যেন ও ছাড়া কাজ চালাতে পারছি না আমরা।'

রাগ হলে জেনারেল জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। এখনো ঘন ঘন ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, 'কক্ষনো নয়! দালাদিএ এভাবে আমাদের হকচকিয়ে না দিলেই পারে। দুকানটা তো সকলকে ভয় পাইয়ে দেয়। আমি নিজে ওকে চেঁচিয়ে বলতে শুনেছি, 'জার্মানরা এই বসন্তকালের মধ্যেই যুদ্ধের একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে।' ওসব লোকের কাছ থেকে তুমি কি আশা করতে পারো? এক সময়ে ও ছিল বৈমানিক কিন্তু সমরবিদ্যার ব্যাপারে ও আকাট মুখ্যু। সময়ের সংগে ও তাল রাখতে পারেনি, কোনো কিছু খতিয়ে দেখার ক্ষমতা ওর নেই। ওর ধারণায় ম্যাজিনো লাইন হল এইন বা সম নদীর ধারের দুর্গগুলির মতো একটা কিছু।' খুঁটিয়ে বাছাই করে সে একটা পেয়ার ফল তুলে নিল; ফলটার সর্বাংগে হাত বুলিয়ে দেখে নিল ফলটা বেশ রসালো কিনা। তারপর ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়াল; রসের ফোঁটাগুলো মুছে ফেলল হাত থেকে : 'ছুরিটা কি ভাবে যাচ্ছে, যেন মাখন। পেয়ারটা নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু হবে......চেখে দেখবে নাকি, মেজর?' পেয়ারের আধখানা টুকরো সে সাঁজের হাতে তুলে দিল। 'দুকানের কথাবার্তার মধ্যে জেনারেল দ্য গলের প্রভাব ধরা পড়ে। আমি নিজে দ্য গলের রিপোর্ট পড়েছি। গামল্যাঁর কথাই ঠিক, ও একটা উদ্ভট লোক। কিছুতেই বুঝতে চায় না যে জার্মানরা ধাপ্পা দিচ্ছে। পোলাণ্ড ও স্পেন, যেখানে অ্যানার্কিস্টরা সৈন্যবাহিনীর সংগে যুদ্ধ করেছিল, আর আমাদের ফ্রণ্ট—ওর কাছে সবই এক। যাই হোক, এটা খুবই খারাপ কথা যে লোকে যুদ্ধবিদ্যার বুনেদী তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না, খবরের কাগজের চমকদার খবর থেকেই চিন্তার খোরাক পায়। এই দ্য গল লোকটার ধারণা, নতুন কিছু ভাবার ক্ষমতা ওর আছে। কিন্তু আসলে ও খুবই গোঁড়া। ওর চিন্তা আটকে রয়েছে সিড্যান বা নেপোলিয়ঁর আমলের যুদ্ধবিদ্যার ওপর। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা ও ভুলে গেছে। ও ভাবে, এককালে যেমন ঘোড়সওয়ার বাহিনী ছুটত, তেমনি এখন ইউরোপের ওপর দিয়ে ছুটবে সারি সারি ট্যাংক। কিন্তু ত্বরিৎ-যুদ্ধের যুগ আর নেই। আমরা ফিরে এসেছি বিলম্বিত অবরোধের যুগে। এই যুদ্ধটা হচ্ছে ট্রোজান যুদ্ধের মতো। হ্যাঁ, একেবারে তাই!'

ন্যাপকিনটা সযত্নে পাট করে রিং-এর মধ্যে গলিয়ে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। ড্রয়িং-রুমে কফি পরিবেশন করা হয়েছে।

'জেনারেল ম-নে আপনাকে টেলিফোন করছেন।' কর্নেল মোরো বলল, 'ডাইভ্ বম্বিং সম্বন্ধে সৈন্যদের কিছুটা ওয়াকিফহাল করার জন্যে ওরা একটা মহড়ার আয়োজন করতে চায়।'

'মহড়া' কথাটা লেরিদোকে শান্তির সময়ের কথা মনে করিয়ে দিল। কিন্তু সংগে সংগে ভুরু কোঁচকাল সে। ম-নে নিশ্চয়ই একটা কিছুর ফিকিরে আছে। ভুঁইফোঁড়। ওর সবসময়ে নজর, কি করে সবার আগে গিয়ে দাঁড়ানো যায়।

মোরো বলে চলল, 'নগরকর্তা এই বলে আপত্তি তুলেছেন যে মুস্তে ছাড়িয়ে কোনো এলাকা থেকেই বেসামরিক লোকজন সরানো হয়নি। তাছাড়া চাষীরা ভয় পাচ্ছে ওদের আঙুরক্ষেতের ক্ষতি হবে।'

জেনারেল মাথা নেড়ে সায় জানাল, 'নগর-কর্তার সংগে আমি একমত। বিশেষ করে

আলশেসীয়দের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার হৃদ্যতাপূর্ণ হওয়া দরকার। মহড়ার আয়োজন করার কোনো অর্থই হয় না একেবারে! ব্যাপারটা কি? না, ডাইভ বম্বার! পোলাণ্ড বা স্পেন যদি হত যেখানে একটিও বিমান-ধ্বংসী কামান নেই, তাহলেও বা কথা ছিল। জার্মানরা যা-ই টোপ ফেলুক না কেন, এই মূর্খগুলো কোনো বাছবিচার না করেই তা গিলে বসে। গুজব শুনলেই ভয়ে সারা। জেনারেল মনেকে জানিয়ে দাও, সাধারণ কসরত করলেই চলবে, তার বেশি কিছু নয়। তাছাড়া লোকদের একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।'

লাঞ্চ খাওয়ার পর জেনারেল ও ক্যাপ্টেন সাঁজে ঘাঁটি পরিদর্শনে বার হল। শিল্পপতি মিয়েজারের ছেলে লেরিদোর গাড়িচালক। ছেলেটি বেপরোয়া গোছের, বাপের প্রতিপত্তির জোরে হেড-কোয়ার্টারের কাজ পেয়েছে। সর্বোচ্চ গতিতে গাড়িটাকে সে ছুটিয়ে দেওয়াল আর মনে বারবার বলতে লাগল, 'অত তাড়াতাড়ি নয় হে, অত তাড়াতাড়ি নয়।'

ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে লেরিদো। আশেপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে-বিষয়ে খবর রাখে তরুণ মিয়েজার।

'তারপর, খবর কি?'

'তেমন কিছু নয়, জেনারেল। মুস্তের একজন উকিলের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। ও এসেছিল পেরিগো থেকে নিজের মালপত্তর নিতে। ও বলল, রসেৎ-এর ঘটনাটা আলশেসীয়রা ভালো মনে নেয়নি।' 'ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই।' লেরিদো সাঁজের দিকে তাকাল, 'পারীর লোকগুলো একেবারে অন্ধ। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে রসেতের সঙ্গে জার্মান গুপ্তচর বিভাগের যোগাযোগ আছে তাহলেও ব্যাপারটাকে নিয়ে এ-সময়ে টানা-হেঁচড়া করা উচিত হয়নি। রাজনীতিক কলহ বাড়িয়ে কী লাভ?'

ছেলেটির দিকে মুখ ফিরিয়ে জেনারেল জিজ্ঞেস করল, 'কর্নেলকে তুমি ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'আমরা এরস্তাইনে গিয়েছিলাম। মেজর লেসেজ বলছিলেন যে ওখানকার সৈন্যরা নাকি শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

লোকেরা কিভাবে মেজর লেসেজের সর্বাঙ্গে গোবর লেপে দিয়েছিল সে-কাহিনী খুলে বলতে পারলে মিয়েজার খুশি হত। কিন্তু সে নিজেকে কোনো মতে সামলে নিল। গল্প শুনে হয়ত ক্ষেপে উঠবে জেনারেল। বেচারী লেসেজ—কিভাবে সে আর্তনাদ করে উঠেছিল সে-কথা ভেবে হাসি পেল মিয়েজারের।

'কী আর করা যায়!' লেরিদো বলল, 'এভাবে চুপচাপ বসে থাকাটা ওদের পক্ষে মরার সামিল। ওদের জন্যে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে।'

স্ত্রাসবুর্গের মধ্যে দিয়ে তারা চলেছে। শহরে লোকজন নেই। আগস্ট মাসের শেষ দিকের তারিখ দেওয়া কাগজগুলো এখনো ঝুলছে কিয়স্কের জানলায়। কাফেগুলোর বারান্দায় মার্বেল-টেবিল আর বেতের চেয়ার এমন ভাবে সাজানো যেন খদ্দেরের জন্যে অপেক্ষা করছে। গির্জার সামনের বারান্দায় বালির বস্তার স্তূপ। পার্কের ঘড়িগুলোর আলাদা আলাদা সময়। একটা দোকানের শো-কেসে লিলাক রঙের ড্রেসিং গাউন ঝুলতে দেখে হু হু করে উঠল জেনারেলের মন—সোফিরও এমনি একটা ড্রেসিং গাউন আছে। তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে চার বছর আগে—একজন আর্মি ডাক্তারের ছোট মেয়েকে বিয়ে করেছে সে। ছাব্বিশ বছর বয়স হলে কি হবে, এই বয়সেই মেয়েটি বিচক্ষণ ও বিচারবিবেচনাশীল। লেরিদো যখন কাজ করতে বসত তখন পা টিপে টিপে চলাফেরা করত

বাড়ির সকলে। সোফি তৈরি করতে বসত তাঁর স্বামীর সবচেয়ে প্রিয় খাবার বাছুরের মাথা দিয়ে ভিনেগ্রেৎ। 'কর্সিকান চামেলী' আতর মাখতে ভালোবাসে সোফি আর মাখে একটু বেশি পরিমাণেই।

চড়াইয়ের ওপরে একটা খাঁজে ডালপালার আড়ালে পর্যবেক্ষণ-ঘাঁটি। লেরিদো দূরবীন দিয়ে দেখল, একটা পিল্-বাক্সের কাছাকাছি জনকয়েক সৈন্য দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল যে ওরা শত্রু। তারপর তার চোখে পড়ল একটা মস্ত পোস্টার, তাতে লেখা : 'ফ্রান্সবাসীগণ, ইংলন্ড আমাদের উভয় দেশের শত্রু!' দু-পাশে হিটলার ও জোয়ান অফ আর্কের ছবি। ভুরু কুঁচকিয়ে লেরিদো ভাবল ইস্, কী জঘন্য ব্যাপার! সামরিক কাজকর্মের বদলে ওরা প্রচার করতে নেমেছে। যেন যুদ্ধ একটা নির্বাচনী প্রচার। আরও দূরে চোখে পড়ল বাদামী টালাওলা ঘরবাড়ি, নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর আঙুরক্ষেত। ভাষায় এর বর্ণনা নেই। এ এক আজব যুদ্ধ স্বীকার করতেই হবে। কল্পনা করা চলে, সৈন্য-চলাচল শুরু হয়ে গেছে, নীল বাহিনী নদী পার হতে চেষ্টা করছে। ১৯১৬ সালে যুদ্ধের চেহারা ছিল একেবারে অন্য রকম। পেরনের ধ্বংসের কথা এখনো মনে আছে, সেই পাথরের ডাঁই, খানা-খন্দ আর মরা মানুষের হাড়গোড়। 'এবার কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটবে না। সেবার আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম গান গাইতে গাইতে, প্রাণ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে। এবারে আমরা ম্যাজিনো লাইন তৈরি করেছি।

একটা কাদাভরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে লেরিদো। ভিজে মাটির গন্ধ। শীতকালের ফ্যাকাশে সূর্য মেঘের ভেতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ গানের সুর শোনা গেল, শুবার্টের গান। এই সুরটা সোফিরও খুব প্রিয়, বারবার বাজাত।

সে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার?'

রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার বলে, 'ওটা লাউড স্পীকার। গান বাজিয়ে আমরা জার্মানদের প্রচারকে ডুবিয়ে দিচ্ছি। শত্রুপক্ষও এই গান শুনছে, ওদের দেশেরই গান। আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যে জার্মানদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।'

লেরিদো বলে, 'বাঃ, চমৎকার বুদ্ধি খাটানো হয়েছে তো!'

'অনেকে প্রস্তাব করেছে যে মাঝে মাঝে গান থামিয়ে জার্মান ভাষায় সংক্ষিপ্ত আবেদন জানানো হোক। সাতাশ নম্বর ডিভিসনে এমনি ধারা প্রচার শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এতে বিশেষ কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যুদ্ধের সময়ে লড়াই করাটাই রীতি। রাজনীতি নিয়ে রাজনীতিকরাই মাথা ঘামাক। এই গান কি সারাদিন ধরে চলে?'

'আজ সকালে একবার কামান-যুদ্ধ হয়েছিল, সাতটা থেকে সাতটা চল্লিশ পর্যন্ত। ওদের কামানগুলো.........'

'জানি, ও আমি জানি। কেউ হতাহত হয়েছিল নাকি?'

'তিনজন মারা গেছে, আর একজন সার্জেণ্ট মারাত্মক চোট পেয়েছে।'

কিছুক্ষণ ভারি নিস্তব্ধ মনে হল। রাইনের ওপার থেকে ফরাসী গান ভেসে আসছে:

ওরা তোমায় বিক্রি করে
দিয়েছে যে আড়ালে আবডালে
ইংলণ্ড তার কামান পাঠায়
আর, ফ্রান্স তার বুকের রক্ত ঢালে।

২৭নং ডিভিশনের হেড-কোয়ার্টারের দিকে তারা এগিয়ে চলল। লেরিদোর মনের

মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা রয়েছে, সে জানতে চায় সত্যিই ওখানে রাজনৈতিক প্রচার নিয়ে মাতামাতি চলছে কিনা। কিন্তু যখন সে শুনল যে সকালের দিকে এরস্তেইনের কাছাকাছি একটা জার্মান জঙ্গী বিমান ভেঙে পড়েছে, তখন লাউড-স্পীকার সংক্রান্ত কোনো কথাই আর তার মনে রইল না। বিমানচালক মারা গিয়েছে এবং মৃতদেহের সঙ্গে যে দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায় যে বিমানচালকটির নাম লেফটেনেন্ট কার্ল ফন সিরাউ।

লেরিদো হুকুম জারি করল যেন জাঁকজমকের সঙ্গে মৃতদেহটির সৎকার করা হয়।

সে বুঝিয়ে বলে, 'এই হল সত্যিকারের প্রচার। আমরা দেখিয়ে দেব, শত্রুকে কি করে সম্মান দিতে হয় তা আমরা জানি। আমি ফিরে গিয়েই কর্নেল মোরোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' একটুখানি ভেবে আবার বলে, 'কী নাম বললে? ফন সিরাউ?......ফন..... নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। এই ঘটনায় জার্মানিতেও বেশ খানিকটা ভালো ধারণা তৈরি হবে। আমি নিজেও আসতে চেষ্টা করব।'

হাসপাতাল পরিদর্শন করে সে ছাউনির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। তাকে দেখে সৈন্যরা তাড়াতাড়ি কোট চাপা দিল তাসের ওপর।

'তারপর, কি হে তোমরা খুব বিশ্রাম নিচ্ছ, না?'

'হ্যাঁ, জেনারেল।'

আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে লেরিদো বেরিয়ে গেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তার কানে গেল কে যেন বলছে, 'জেনারেল বুড়ো-আংলা!' এর আগেও একবার পারীর রাস্তায় সে এই গা-জ্বালানো টিটকিরিটা শুনেছিল কিন্তু ছাউনির মধ্যে তাকে নিয়ে তামাসা করার সাহস কারও হবে, এ সে কল্পনাও করতে পারেনি। লোকটা নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট। লেরিদো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। ক্যাপ্টেন সাঁজে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল—একটু আগে সে তিন দিনের ছুটির জন্যে আর্জি জানাবে ভেবেছিল।

ফেরার সময় সারাটা পথ অপমানের কথা ভাবতে ভাবতে এল লেরিদো। শাতোর হলঘরে একটা আয়না। আয়নার কাছ দিয়ে যাবার সময় জেনারেল ফিরে দাঁড়াল, ডেকে পাঠাল কর্নেল মোরোকে।

'২৭নং ডিভিসন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। ওদের দেখে অত্যন্ত খারাপ ধারণা হল। লোকগুলোকে চৌকস করে তোলার বদলে মু-নে প্রচারকার্য নিয়ে মেতে উঠেছে। এখন ওর কাজ হয়েছে জার্মানদের উদ্দেশ করে রাজনৈতিক ধরনের বক্তৃতা দেওয়া। সম্ভবত শরণার্থীরা বা কমিউনিস্টরাই বক্তৃতা দিচ্ছে। প্রধান সেনাপতির কাছে এখনই একটা রিপোর্ট পাঠানো দরকার আর তার একটা অনুলিপি পাঠাতে হবে দালাদিএর কাছে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কর্নেল। ভেবেছিল একটু বিলিয়ার্ড খেলবে—ফিরতি-ম্যাচ দেবে মেজর জিসেৎকে—একশো একশো করে দুটো খেলা। লেরয়কে ক্যাপ্টেন বলল, 'জেনারেল ঠোঁট চাটছেন। কে নাকি ওঁকে বুড়ো-আংলা বলেছে। গতকাল আমি ভাবলাম, উনি বুঝি পারীতে চলে যাচ্ছেন। কী জীবন!'

ছটা বাজল। সেক্রেটারিদের কামরায় লুসি বাদে আর কেউ নেই। সে এখনো কাজ করছে। এক সময়ে সে শেষ লাইনটি টাইপ করল : 'দুবোয়া পিয়ের, সার্জেন্ট।' কাগজ-গুলো ভাঁজ করে রেখে টাইপরাইটারের ঢাকনাটা টেনে দিল। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখে নিল একবার, তারপর উঠে গেল ওপরে। মেজর লেরয় অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

'শ্রীমতী, কল্পনা করো আমরা ভেনিসে নৌকাবিহারে বার হয়েছি!'

সাত

ভোর থেকে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, শীতকালের একঘেয়ে কনকনে বৃষ্টি। পাঁশুটে হলদে আকাশের দিকে তাকিয়ে দম আটকে আসে। পিয়ের তার জলে-ভেজা বাদামী বুটজোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আজকাল প্রায়ই সে কোনো একটা জিনিসের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যেন কিছু একটা খুঁজছে। আসলে সে কিছুই দেখে না। এমন কি মনে মনেও কিছু ভাবে না। আশেপাশের জগৎটাকে কেমন আবছা ও অবাস্তব বলে মনে হয়। সে যে ঘুমিয়ে নেই তা প্রমাণ করার জন্যে নিজের গায়ে চিমটি কেটে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে। তবুও কোন কিছুই ঘটেনি। উনচল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্টের পল্টন হিসেবে সে শুধু জলে ভিজেছে আর লিসৎ-এর মহাকাব্য বা সার্জেণ্টের গালিগালাজ শুনেছে। আর এরই মধ্যে মাঝে মাঝে কামানের গর্জন। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই যেন একটা বিভীষিকা। ব্যাপারটাকে ভেবে দেখার সাহসটুকুও পিয়েরের নেই।

এ-ঘটনার শুরু গত আগস্ট মাসের এক গরম দিনে। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে আরামে আড়মোড়া ভেঙেছিল। আনে তৈরি করছিল কফি; দুদু খেলা করছিল মেঝের ওপর, তার ছোট্ট বাদামী ঘোড়াটা দোল খাচ্ছিল ঝলমলে রোদের আলোয়। আজ সে-সব স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর থেকে তার দিন কেটেছে কেমন একটা আবিষ্ট অবস্থার মধ্যে খুশিমতো চলাফেরা করার ক্ষমতা তার নেই, কথা বলে খুবই কম। কিন্তু তার স্বভাবটা এ-রকম যে খুব একটা হৈ-হট্টগোল না হলে তার ভালো লাগে না।

যে অঞ্চলে তার দেশ সেখানে বছরের এ-সময়টা গরম। ডিসেম্বরের গোলাপ ফোটে, দূর থেকে দেখা যায় মাউণ্ট কানিগোর ন্যাড়া ন্যাড়া বাদামী চূড়ো। একবার সে চূড়ো পর্যন্ত উঠেছিল। এখানে কিন্তু সারা দিনই বৃষ্টি—আজ, কাল, পরশু এ বৃষ্টির শেষ নেই। নোংরা পেঁজা তুলোর মতো দেখাচ্ছে আকাশটাকে।. এক্ষুনি কিন্নরকণ্ঠে গান ভেসে আসবে, মনে হবে বিরাট এক লাউড-স্পীকার পাতা হয়েছে আকাশ জুড়ে।

বাড়ি ছাড়ার আগে পিয়ের ফাঁসীর আসামীর মতো অস্থির হয়ে উঠেছিল। আনে দেখতে পাচ্ছিল যে পিয়ের ভেঙে পড়ছে আর পালাবার পথ খুঁজছে।

আনে বলেছিল, 'পিয়ের, চল আমরা কোথাও চলে যাই। আমেরিকাতেই চলো। সেখানে কাজ জুটিয়ে নেব আমরা।'

পিয়ের রাজি হয়নি : 'না, খারাপ দিন আমার একার নয়, সকলেরই। তুমি কি ভাবছ, আমি আমার নিজের চামড়া বাঁচাতে চাই? হাজার চেষ্টা করলেও আমরা পুরনো দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে পারব না।'

পুরনো দিন বলতে সে ভাবছিল পপুলার ফ্রণ্টের দিনগুলোর কথা।

আগেকার কালে তার মনে হত, প্রত্যেকটি ঘটনায় সেও সামিল হয়েছে, সকলের সঙ্গে সেও দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। এমন কি ভীইয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার পরও সে বলতে পেরেছিল, 'হ্যাঁ, আমি উড়োজাহাজ পাঠাচ্ছি।' কিন্তু এখন তার অবস্থা হয়েছে কাঠুরের

কুড়ুলের চিহ্ন দেওয়া গাছের মতো। আজ যদি তার মৃত্যু হয় তাহলেও ঘটনার গতিতে কোনো হেরফের হবে না।

আসার দিন আনের সঙ্গে সে প্রায় একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসেছিল। আনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু তুমি তো এই-ই চেয়েছিলে......'

সে বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'না, এ যুদ্ধ নয়! এ আমাদের যুদ্ধ নয়......'

আনে তফাৎটা বুঝতে পারেনি। তার কাছে যুদ্ধ যুদ্ধই—গোলাগুলি, কাদা, রক্ত আর মৃত্যু। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ভিন্ন—এ বিচার কোন্ ভিত্তিতে করছে পিয়ের? কথাটা আনে মানতে পারেনি, জবাবে বলেছিল যে পিয়েরের এভাবে তফাৎ করার চেষ্টা হচ্ছে 'কথার প্যাঁচ, রাজনীতি, বাজির খেলা।' কিন্তু পিয়েরের কাছে এ ছিল বাস্তব সত্য। যুদ্ধে-তলব-পড়া সৈনিকদের মার্চ করার শব্দ কেমন ভিন্ন, কেমন আলাদা। কারও গলায় গান নেই। যেন ধ্বংসের পথে চলেছে, এমনি সব মুখ। ভরসা করার মতো কোনো অবলম্বন খুঁজে পায়নি পিয়ের।

পিয়ের এখন বুঝতে পারছে, মিশোর সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়। তাদের পুরনো তর্ক-বিতর্কগুলো কিছুমাত্র আকস্মিক নয়। মিশো সত্যিই একটা প্রবল চরিত্র। সে ভেঙে পড়তে পারে এবং যদি পড়েই তো গতকাল জুল যেভাবে পড়েছিল তেমনি ভাবে পড়বে। কিন্তু মিশোকে বেঁকাতে পারবে না কেউ; সে হাসবে, 'ঠিক তাই' বলে চিৎকার করবে, এবং আঘাত থেকে সামলে উঠবে। সে এখন কোথায়? জলে ভিজছে? বন্দী-শালায় আটক হয়েছে? তার সঙ্গে একবার কথা বলতে পেলে কী ভালোই না লাগত পিয়েরের। কিন্তু পিয়ের জানে, এমন কি মিশোও এখন আর তাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। মিশো নিশ্চয়ই বলবে, 'সামনে তাকিয়ে দেখ। ঘটনার অনিবার্য গতি .....'

নিঃসঙ্গতার বোঝা চেপে ধরেছে পিয়েরকে। যাদের মধ্যে সে এসে পড়েছে তারা প্রায় সকলেই ব্রেতঁর ধর্মপরায়ণ ও ভীরু চাষী। তাদের বলা হয়েছে যে সে একটা নাস্তিক এ্যানার্কিস্ট, স্পেনের বহু গির্জায় সে আগুন লাগিয়েছে। লেফটেনাণ্ট এস্তেরেল ব্রতেইর 'বর্মধারী' দলের লোক, বেঁটে কুৎসিত চেহারা। লোকটি কবিতার ভক্ত, তার মতে দারিদ্র্যের মধ্যে রোমান্স আছে আর ফ্যাশিজমের মধ্যে আছে একটা 'গূঢ় অভিব্যক্তি'। দলের লোকদের দেখলে তার ঘেন্না হয়, তাদের গায়ে ঘামের গন্ধ, তাদের মুখের ফরাসী ভাষা বিশ্রী, তাদের কাঁধের চওড়া ফিতের ওপর স্যাঁ গোয়েনলের ছবি। পিয়েরকে সে ভয় করে, অন্য অফিসারদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছে যে 'ওর মতো লোক পেছন থেকে গুলি চালিয়ে খুন করতে পারে তোমাদের।' পিয়ের ইঞ্জিনিয়ার, পিয়ের 'আতেলিএ' থিয়েটারে গিয়েছে আর এলুয়ার-এর কবিতা পড়েছে—এজন্যে পিয়েরের ওপর তার রাগ।

দলের মধ্যে সে ছাড়া পারীর লোক আর মাত্র একজনই ছিল, জুল। এই জুলের সঙ্গে তার খুব ভাব জমে গিয়েছিল। জুল কাজ করত গ্যাস কারখানায়। যে কোনো অবস্থায় পড়ুক না কেন ঠাট্টা-তামাসা করতে ছাড়ত না। পিয়েরকে বলত, 'অতটা মুষড়ে পড়লে চলবে না, বুঝলে বন্ধু। তাতে কোনো লাভ নেই। মোরিস তোরে নিশ্চয়ই কিছু একটা ভাবছে। আমি কিন্তু ভাই কিছু হাতাবার তালে আছি। এখানে চারদিকে মুরগীর নোংরা পড়ে রয়েছে। কতদিন মুখভর্তি অমলেট খাইনি বলো তো!' পিয়ের না হেসে পারত না যখন সে বলত, 'আমি একজন আশাবাদী। আচ্ছা, শুয়োরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনাকে বিচার করে দেখা যাক না। যুদ্ধের আগে হপ্তায় সাতদিনই শুয়োর কাটা হত। এখন সোমবার আর মঙ্গলবার শুয়োরের মাংস বিক্রি বন্ধ। এভাবে চললে আর একশো

বছরের মধ্যেই শুয়োররা শারীরিক নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। বুঝতে পারলে!' ক্ষণিকের জন্যে পিয়েরের আচ্ছন্ন-ভাব কেটে যেত আর সে হাসত। সেই জুল আর বেঁচে নেই।

পিয়েরের চিঠিগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত। সে ভেবে পায় না আনেকে কি লিখবে। বৃষ্টির কথা? জুলের ঠাট্টা-তামাসা? বা জুল মরবার সময়ে বারবার কি ভাবে 'সালগম' 'সালগম' বলে চিৎকার করছিল সে-কথা? নাকি লিখবে লেফ্‌টেনান্ট এস্তেরেল-এর কথা, যে ভালেরির কবিতা পড়ে আর চলাফেরা করে অত্যন্ত সন্তর্পণে সৈনিকের কোটের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। আনের চিঠিগুলো পিয়েরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্নে এবং দুদুর দুষ্টুমির গল্পে ভরা। দুজনেরই দুজনের কাছে কত কি বলার আছে। দুজনেই বোবা। পিয়ের প্রায়ই আনের কথা ভাবে। আনে যেন একটা সোজা সড়ক, যে সড়ক দিয়ে জুলাইয়ের ঝলমলে রোদের আলোয় পৌঁছনো যায়। এই সড়ক দিয়ে গেলে পিয়ের কোথাও না কোথাও পৌঁছবে। কিন্তু এখন সে চৌমাথায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কোন্ পথটা ঠিক তা বেছে নিতে পারছে না। বিপথে যেতে বসেছে সে।

লেফ্‌টেনান্ট এস্তেরেল তাকে ডেকে পাঠাল। বলল, 'এটা ক্যাপ্টেন জেমিএর কাছে নিয়ে যাও।'

'যে আজ্ঞে।'

বইটা হাতে তুলে নিল পিয়ের। লেফটেনান্টের উদ্দেশ্য, তাকে খেলো করা। সে কমিউনিস্ট, কাজেই সম্ভবত শুধু প্রলেটারিয়ান কবিতাই পড়ে। অতএব খানিকটা হাঁটুক! গোলন্দাজদের শিবির এখান থেকে চার মাইল। ক্যাপ্টেন জেমিএ সাহিত্য-রসিক, পড়ার জন্যে বই চেয়ে পাঠিয়েছিল। বসে বসে কুঁড়েমি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে ছন্দের অভিধান সম্পাদনা করছিল।

পিয়ের একটা চালার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বই খুলে বসল। কবিতার বই। কবিতা-গুলোর রচয়িতা কে তা সে দেখল না, যেমন খুশি একটা পৃষ্ঠায় খুলে পড়তে লাগল :

আনন্দের এই স্পর্শটুকু
ভাগ্যে তারও হয়ত যাবে জুটে,
তবু তো সে বাঁচবে, নাইবা
উঠল ফুলের মত ফুটে।

পিয়ের শব্দ করে বন্ধ করে দিল বইটা। মনে হল আনে যেন দেখা করতে এসে তার ভিজে গাল দুটো হাত দিয়ে ছুঁয়েছে। কেমন উষ্ণ ওর হাত, কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল ঝরছে পিয়েরের মুখ থেকে।

আঙুরক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে সে এগিয়ে চলল। বাগানটা একটা ঝোপের আড়ালে। ডান দিকে গির্জা, আবহাওয়া-যন্ত্রটা ভেঙে পড়েছে গির্জার চুড়ো থেকে। গোলা পড়ে একটা গর্ত হয়েছে, পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে পিয়ের ভাবল, 'খুব কাছেই গোলাগুলি ছুঁড়ছে ওরা।' তারপর রাস্তার বাঁক ঘুরে গেল।

লাজুক আর ক্ষীণদৃষ্টি ক্যাপ্টেনের হাতে বইটা তুলে দিল পিয়ের; গোলন্দাজদের সঙ্গে বসে এক পাত্র নতুন টক মদ খেল, তারপর ফিরে চলল। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। রোজকার চেয়ে একঘণ্টা আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে লাউড-স্পীকারগুলো। নিচে কোথা থেকে যেন শোনা যাচ্ছে মেশিনগানের শব্দ কিন্তু কেউ তার জবাব দিচ্ছে না। সমস্ত রণাঙ্গণ নিস্তব্ধ। পিয়ের নিষ্প্রাণ গলায় আবৃত্তি করে চলল :

আনন্দের এই স্পর্শটুকু
ভাগ্যে তারও হয়ত যাবে জুটে......

সন্ধ্যার দিকে আনের চিঠি আসবে। চিঠিটা নিয়ে পিয়ের উঠে বসবে গোলাঘরের খড়ের মাচানে, গুমোট আর গরম জায়গাটায়, যেখানে লাল চুলওলা ইভ মনের সুখে নাক ডাকিয়ে ঘুম দেয়।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। রোজ দুবার করে এমনি শব্দ হয় কিন্তু ব্যাপারটা পিয়েরের কাছে এখনো গা-সওয়া হয়নি। মনে হয়, অকস্মাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন বদলে যাচ্ছে। এখনই আমাদের লোকরা জবাব দেবে। পিয়ের রাস্তার দিকে এসে স্যাঁৎসেঁতে মাটির ওপর বসে পড়ল। এখন একটি ঘণ্টা কাটাতে হবে এখানে। তা হোক, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা সে চিঠি পাবে আনের কাছ থেকে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের কথা পিয়ের প্রায় জানতেই পারল না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, গোলার টুকরো এসে বিঁধেছে তার কুঁচকিতে। আধঘণ্টা পরে কয়েকজন গোলন্দাজ এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল।

চোখ খুলতেই একটা ঢাকনা-না-দেওয়া বাতির ঝকঝকে আলো এসে পড়ল পিয়েরের চোখে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করল। একটু একটু করে তার মনে পড়ল সেই বই, গোলন্দাজ, মদ আর গোলার কথা। তাহলে সে নিশ্চয়ই আহত হয়েছে।......মরে যাবে না তো? তা কেন, মরবে না। ঘুমোচ্ছে নাকি?......ডান দিকে পাশ ফিরতে চাইল সে, পাশ ফিরে শোওয়াই তার চিরকালের অভ্যেস। কিন্তু পাশ ফিরতে গিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে হল। তাহলে সে নিশ্চয়ই মরে যাবে। কি একটা জরুরী কথা আছে যা তাকে যে-করে হোক মনে করতেই হবে। কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে কিছুতেই মনে করতে পারল না কথাটা কী। আনেকে দেখতে ইচ্ছে করছে, সেই চালার নিচে বসে থাকার সময়ে যেমন দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু চোখের সামনে কোন মুখ ভেসে ওঠে না। শুধু বারবার ওর নাম উচ্চারণ করে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়। নার্স এসে তার বালিশটা সোজা করে দিয়ে গেল। লম্বাটে মুখ মেয়েটির, সরল রেখার মতো। মনে মনে সে ভাবে, 'ও আমাদের জগতের মানুষ নয়।' একটা চকচকে খেলনা দেখতে পেল বিছানার চাদরের ওপর। ঝলমলে সবুজ ডোরা-কাটা লাল বালির বাক্স। একটা বালির ঢিবির ওপরে সে বসে আছে। মিষ্টি খাবার বেরিয়ে আসছে বাক্স থেকে। না, না, খাবার নয়, মাছ। নাকি লম্বা দাড়িওলা একটা বামন।...বালিগুলো শুকনো। এত শুকনো যে কোনো আকৃতি ধরে রাখা যাচ্ছে না, ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বালিগুলো এত শুকনো কেন?' নার্স এসে একটা ভিজে তোয়ালে পিয়েরের কপালে চাপিয়ে দিল। পিয়ের টের পেল না, আবার সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

বাইরে থেকে ব্যাণ্ডের বাজনা ভেসে আসছে, তৃতীয় ব্যাটালিয়ন অভিবাদন জানাচ্ছে মৃত জার্মান বৈমানিকের উদ্দেশে। জেনারেল লেরিদো বক্তৃতা দিল, 'বীর যোদ্ধার দেহাবশেষকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করছি। নিজের মাতৃভূমির জন্যে দেশপ্রেম...... কর্তব্যের প্রতি আবেগভরা নিষ্ঠা......'

তারপর বৃষ্টি নামল। আগের দিনের চেয়েও মুষলধারায়। যেন মাঝখানের খানিকটা সময়ের ফাঁকটুকু পুষিয়ে নিতে চাইছে।

সন্ধ্যেবেলা আনের কাছ থেকে পিয়েরের প্রত্যাশিত চিঠি এল। তিন দিন আপিসে পড়ে রইল চিঠিটা। তারপর, 'চিঠির মালিক মৃত' লিখে ফেরৎ পাঠানো হল চিঠিটা।

আট

সেন্সর-ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'আনাস্তাসিয়া মাসী।' জোলিওর মুখে অনুযোগ শোনা যায় যে মাসী তাকে যমের দোরে পাঠাচ্ছে। 'লা ভোয়া নুভেল্' পত্রিকার সব পৃষ্ঠাতেই কিছু কিছু জায়গা ফাঁকা থেকে যায়। কতকগুলো বিষয়ের খবর ছাপা বেআইনি—যেমন, ভস্‌জ-এ হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে বা ইতালীয়রা জার্মান রাজদূতকে বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছে বা চীনা সরকার স্পেনীয় শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে, এমনি সব খবর। জোলিও হাত ছোঁড়ে আর চেচায়, 'কাগজে লেখা চলে এমন বিষয় ছাত্র একটিই আছে, তা হল ব্রোমাইড।'

গুজব রটেছে, সৈন্যরা যাতে বৌয়ের কথা ভেবে মন খারাপ না করে সেজন্যে তাদের কফিতে ব্রোমাইড মেশানো হচ্ছে। জোলিও তার কাগজে একটা দু-লাইনের ছড়া ছেপে বের করল্ঃ

সখী, তোমার ঘরের পাশে ধৈর্য ধরে আছি প্রতীক্ষায়।
মনেও তুমি ঠাঁই দিও না ঘায়েল আমি ব্রোমাইডের ঘায়।

দেসের রাহুগ্রস্ত হওয়ার পর জোলিওকে বাধ্য হয়ে নতুন মুরুব্বির তল্লাশ করতে হয়েছে। ব্রতেই তার সঙ্গে মঁতিনির যোগাযোগ করিয়ে দিল। 'লা ভোয়া নুভেল্'-এর নীতি-পরিবর্তন এই প্রথম নয়, কিন্তু এবারে জোলিওর মনে সত্যিকারের দুঃখ হয়েছে। দেসের লোকটার মধ্যে জীবন ছিল, অপ্রিয় ব্যাপার কিছু ঘটলে ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারত সে, টাকার চেক হাতে দিত ঠিক একটা সিগারেট তুলে দেবার মতো সহজভাবে। কিন্তু মঁতিনি তার ওপরে এমন হম্বিতম্বি করে যেন সে তার চাকর। কাগজ-সম্পাদনার ব্যাপারে মঁতিনি পুরোমাত্রায় হস্তক্ষেপ করে আর জোলিও যদি কোনো র‍্যাডিকাল বা সমাজতন্ত্রীর বিয়ের খবর ছাপার কথা ঘুর্ণাক্ষরেও উল্লেখ করে তাহলেও দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু জোলিও সবার সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরাবে কিসের জোরে? হাজার হোক, মঁতিনি তো চিরকাল থাকবে না।

কোনো এক লেখক তার প্রবন্ধে 'বশ্' শব্দটি ব্যবহার করায় মঁতিনি ক্ষেপে লাল। চিৎকার করে বলল, 'এ কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না! তুমি মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তির খোরাক যোগাচ্ছ। জার্মানির সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করছি বটে কিন্তু এ যুদ্ধ হচ্ছে দু-পক্ষের বীরত্বের লড়াই। বলতে পার—একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। কিন্তু হিটলার যে মস্ত রাজনীতিজ্ঞ তাতে সন্দেহ নেই।'

সুতরাং জার্মান বৈমানিকের সাড়ম্বর সৎকারের খবর শুনে জোলিও যে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। পুরো একটি স্তম্ভ জুড়ে সে অনুষ্ঠানের বিবরণ ও লেরিদোর বক্তৃতা ছাপাল। কিন্তু পরের দিনই কী লিখবে তাই ভেবে ভেবে মাথার চুল ছেঁড়ার মতো অবস্থা। চার মাস ধরে যুদ্ধ চলছে অথচ কোথাও যুদ্ধের চিহ্ন-মাত্র নেই। এ এক নকল যুদ্ধ। সৈন্যরা ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যাচ্ছে। গতকাল চেম্বারে ঘোষণা করা হয়েছিল যে রাইন নদীর ওপর দিয়ে রেলপথের যোগাযোগ সম্পর্কে জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। ভোটে দেবার সময়ে কে একজন বলল যে বিলটি গ্রীষ্মকালে

পার্লামেন্টে তোলা হয়েছিল এবং রাইন নদীর সমস্ত ব্রিজ ইতিমধ্যেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকের মুখে মুখে যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে 'নকল যুদ্ধ'। একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, 'কি হে, নকল যুদ্ধটা কেমন লাগছে?' প্রত্যেকের ভালো লাগছে সন্দেহ নেই। একমাত্র খবরের কাগজেই লেখার মতো কোনো খবর নেই।

দেখে মনে হয়, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে কেউ জানে না। জার্মান বৈমানিকরা ইস্তাহার ফেলে আর সেগুলো হাতে নিয়ে সবাই বলাবলি করে, 'বাঃ কী চমৎকার ছাপা!' স্টাটগার্ট বেতার থেকে ফরাসী ভাষায় প্রচার হয় আর তা সবাই শোনে। প্রচার করে একজন ফরাসী! জোলিও তার নাম দিয়েছে 'স্টাটগার্ট নেমকহারাম' লোকের নমে ধরে এই নামটা; 'স্টাটগার্ট নেমকহারাম' জনপ্রিয় চরিত্র হয়ে ওঠে। ডেপুটিরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, 'কি হে, চেম্বারের গোপন অধিবেশন সম্পর্কে স্টাটগার্ট নেমকহারাম কী বলল?'

আর তারপরেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একদিন সন্ধেবেলা মঁতিনি ডেকে পাঠাল জোলিওকে। মঁতিনিকে খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল, এমন কি ব্যবহারে পর্যন্ত ভদ্র। জোলিও যা যা চায় কোনোটাতেই আপত্তি করে না। তারপর উদগ্রীব হয়ে বলে, 'রাজনৈতিক দিকটা ব্রতেইর হাতে ছেড়ে দাও। আরও পল্টনী গালগল্প আর বীরত্ব ও কৃতিত্বের চমকপ্রদ কাহিনী ছাপাও। সেরা সেরা যুদ্ধ-সংবাদদাতাদের বাইরে পাঠিয়ে দাও।'

কাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে তার হদিশ পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। দুদিন পরে যুদ্ধ-সংবাদদাতারা রওনা হল হেলসিঙ্কির উদ্দেশ্যে।

ইতালীর রাজদূতকে তেসা লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ করেছে। ইতালীয় রান্না, পিয়েডমন্টের মদ, ভেরোনার শিল্প এবং মুসোলিনীর রাজনীতিজ্ঞ-সুলভ প্রতিভা—সবকিছুর প্রশংসা করে সে। তারপর বলে, 'মুসোলিনীর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও এই যুদ্ধ বাধল—এতে আমি কত দুঃখ পেয়েছি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। গত কয়েকটা মাস আমার কেটেছে দুঃস্বপ্নের মতো। সমস্ত সংস্কৃতিবান ইউরোপবাসীর এমনি অবস্থা। কিন্তু এই প্রথম একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মস্কোর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে যে হাল ছাড়ার কিছু নেই। বিশেষ করে আমি ইতালীর কথা ভেবে আশ্বস্ত হচ্ছি। আমি বরাবর ল্যাটিন দেশগুলির ঐক্যের কথাই বলে এসেছি। মহান রোমের আমরা মিত্র। খোলাখুলিই বলা যাক, আমাদের সকলের সাধারণ শত্রু হল মস্কো। কোরিলিয়ান যোজকের যুদ্ধেই ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে পারীর, রোমের এবং বার্লিনেরও।'

সকলেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। মাদাম মঁতিনি 'উত্তরাঞ্চলীয় মঙ্গলবার' উদ্‌যাপনের আয়োজন করে, অভিজাত মহিলারা ফিনিশ সৈন্যদের জন্যে মোজা আর স্কার্ফ বোনার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যায়। ম্যানারহাইমের উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্যে মিয়েজার পনেরো লক্ষ ফ্রাঁ দান করে আর খুবই ঘটা করে সেই চেকটা দেওয়া হয় ফিনল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতির মেয়ের হাতে। মার্সাইয়ের গুণ্ডা-সর্দার বিলে দাবি তোলে যে রু মস্কো রাজপথটার নাম বদলিয়ে রু হেলসিংফোর্স রাখা হোক।

মাদলেনে ফিনল্যাণ্ডের বিজয় কামনা করে প্রার্থনা-সভা বসল। নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করল ব্রতেই। গির্জা থেকে বেরিয়ে সোজা রওনা হল 'লা ভোয়া নুভেল্'-এর আপিসে। 'এক্ষুনি ভাঁইয়ারের কাছে যাও একবার। ফিনল্যাণ্ডের ওপর কয়েকটা প্রবন্ধ লিখতে বল

তাকে।' এই কথা শুনে জোলিও রীতিমতো আশ্চর্য হল, যদিও সে কদাচিৎ আশ্চর্য হয়।

ভাইয়ারকে মঁতিনি দু-চোখে দেখতে পারে না। সে প্রায়ই চিৎকার করে বলে, 'ঐ লোকটাই তো মজুরগুলোকে বিগড়ে দিয়েছে, ও-ই তো বলেছে—যাও তোমরা সমুদ্দুরের ধারে ফুর্তি করে এস!' নতুন মুরুব্বির খামখেয়ালিপনার সঙ্গে তাল রেখেই চলতে হয়। কাজেই জোলিও ভীইয়ারকে এড়িয়ে চলত। একবার প্যালে বুরব'র কাছে মারিয়ুস রেস্তোরাঁয় দেখা হয়ে গিয়েছিল ভীইয়ারের সঙ্গে। ভীইয়ার সখেদে বলেছিল, 'তুমি তো আমাকে ভুলেই গিয়েছ।'।

জোলিও আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, 'আপনি কি দেবতা পেয়েছেন আমাকে? মার্কারির মতো আমিও দেবতাদের দূত মাত্র। আপনি তো জানেন মঁতিনিটা কী শয়তান। দেসেরকে যে সরে দাঁড়াতে হল সেটা একটা দুর্ভাগ্য। শুধু আমার পক্ষে নয়, ফ্রান্সের পক্ষেও। এখন আমায় ব্রতেইর নির্দেশমতো লিখতে হচ্ছে। লোকটার মধ্যে এতটুকু রসবোধ নেই আর বুনো বেড়ালের মতো হিংস্র। মার্সাই-এ ওর জুড়ি নেই। গ্যালিক্ মোরগ আর জার্মান নেকড়ে-হাউন্ডের মেশান জীব ও। আমি তার কাছে অনেকবার আপনার কথা তুলেছি। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে আমরা শুধু মুখেই জাতীয় ঐক্যের কথা বলি। জাতীয় ঐক্যটা একটা মুখের কথা। ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার অনুরাগী, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার চেয়েও বড়ো কথা—আপনাকে আমার ভাল লাগে।'

ম্লান হেসে ভীইয়ার একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসেছিল। ডাক্তারের নির্দেশমতো লাঞ্চের অর্ডার দিতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছিল তাকে। নিষিদ্ধ খাদ্যের একটা তালিকা সর্বদাই তার কাছে কাছে থাকে এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। 'পালং শাক? না। টম্যাটো? না গাজর? ওটা চলবে।'

আর এখন ব্রতেই জোলিওকে সেই ভীইয়ারের কাছেই পাঠাচ্ছে। গোলগাল চেহারার সম্পাদকটি এ-ব্যাপারে এতই ঘাবড়ে যায় যে সারাটা পথ বিড়বিড় করে আপন মনে। এ কি দিনকাল পড়েছে! পর-পর দুটো দিন যেতে না যেতেই পাল্টে যাচ্ছে সবকিছু। মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। এই মুহূর্ত পার হলে ঠিক পরের মুহূর্তটিতেই কার দিকে তাকিয়ে হাসতে হবে আর কাকে পথে বসাতে হবে—এটুকুও নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই।

বই আর ছবির মধ্যে ডুবে থেকে ভীইয়ার এখন অবসরের দিনগুলো কাটাচ্ছে। বাধ্য হয়ে একটা খারাপ নাটক দেখতে হলে দর্শকের যেমন বিরক্তি আসে তেমনি বিরক্তির সঙ্গে সে ঘটনাগুলোকে লক্ষ্য করছে। মনে মনে বলে, 'আমি এর কোনো অর্থ বুঝি না।' তারপর আত্মসন্তুষ্ট হয়ে নিজের সম্পর্কে ভাবে, 'যাই হোক আমি ভাগ্যবান। ভাল সময়েই তেসা আমার কাছ থেকে দায়িত্বটা নিয়েছে। গণ্ডগোলটা পাকিয়ে তুলেছে ওরাই। ওরাই মেটাক।' অবশ্য চেম্বারে ভীইয়ার গভর্নমেন্টের পক্ষেই ভোট দিয়ে আসছে এবং দুবার দেশপ্রেমাত্মক বক্তৃতাও দিয়েছে। কিন্তু তার গলার স্বরে সেই আবেগ নেই, মনে হয় যেন সে কতকগুলো নীরস উদ্ধৃতি আবৃত্তি করছে। তার ধারণা হয়েছে যে এই নকল যুদ্ধটা একটা অকারণ হৈ-চৈ। এর মধ্যেই চীনে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। কমিউনিস্টদের ওপর হামলা শুরু হতেই সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তার মনের পুরনো বিক্ষোভগুলো আবার নাড়া খায়। সে মনে করে, কমিউনিস্টদের জন্যেই তাকে হারতে হয়েছে। ওই লোকগুলোই তো দল পাকিয়ে কারখানা দখল করার মতলব করেছিল, দোকানদারদের মতিবিভ্রম ঘটিয়েছিল, দালাদিএকে ঠেলে দিয়েছিল ব্রতেইর দলে। দেশপ্রেমের নামে তখন ওদের কতই না গলা-

বাজি, মিউনিক কলঙ্কের কথা বলতে গিয়ে মৌচাকের মৌমাছির মতো গুঞ্জন তুলত। কিন্তু যেই যুদ্ধ শুরু হয়েছে অমনি সবাই পিছনে সরে গেছে। এখন শ্রমিকরা বলছে যে একমাত্র কমিউনিস্টরাই যুদ্ধবিরোধী ছিল। ভীইয়ারের ধারণা, এ হল একটা কুচুটে নির্বাচনী চাল। মনে মনে ভাবে, লাখ লাখ ভোট পাবে ওরা। অবশ্য কমিউনিস্ট ডেপুটিদের গ্রেপ্তার করার প্রস্তাব সে এই বলে সমর্থন করেছিল যে 'এতে আপত্তি জানানো অসম্ভব। এই-ই তো যথার্থ ব্যবস্থা।' যখন শোনে যে পরিষদের সভ্য কাশ্যাঁ এখনও ধরা পড়ে নি, তখন খুশি হয়নি। কাশ্যাঁকে সে দু-চোখে দেখতে পারে না। এক সময়ে তারা একই পার্টিতে ছিল এবং একই মঞ্চে বক্তৃতা দিত। তরুণ কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তার মতামত এই যে তারা অন্য এক গ্রহের জীব আর কাশ্যাঁকে সে দলত্যাগী মনে করে। কোনো সংস্কৃতিবান মানব-প্রেমিক ও গণতন্ত্রীর পক্ষে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না ভীইয়ার!

রোজ শ'য়ে শ'য়ে লোক গ্রেপ্তার হচ্ছে। কতকগুলি প্রদেশে সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত বাদ পড়ছে না। ভীইয়ার ভয় পেয়ে যায়। এই হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার উলটো কামড়। তার মনে হয়, সে-ই তো ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক—শ্রদ্ধেয় ও শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। তার মনে প্রশ্ন জাগে, এ-ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে তার কিছু করা উচিত কিনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনাটা এই বলে নাকচ করে দেয় যে এ-সময়ে কিছু করতে গেলেই কমিউনিস্টদের হাতে পুতুল হয়ে পড়তে হবে।

ভীইয়ার আবার তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে ফিরে আসে। সম্প্রতি সে সেজানের একটা 'স্টিল-লাইফ' সংগ্রহ করেছে—গালার থালায় দুটি আপেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেয়। আপেল দুটি আলাদা আলাদা জগৎ—পরিপূর্ণ ও অনন্ত-ভার, বস্তুর সারভাগ যেন।

ভীইয়ার ভেবেছিল, কোনো কিছুই তার মধ্যে সাড়া জাগাতে পারবে না। কিন্তু এখন নিজেকেই নিজে প্রায় চিনে উঠতে পারে না। ফিনল্যাণ্ডের ঘটনায় আবার সে যৌবন ফিরে পেয়েছে। চেম্বারে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয় সে—তার প্যাশনে ঠিক বিশ বছর আগেকার মতো ভঙ্গিতে ওঠা-নামা করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধটা তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে। ভীইয়ার বলে, 'এই কমিউনিস্টরাই হল গিয়ে রুশ সাম্রাজ্যবাদের গুপ্ত বাহিনী।'

জোলিও ব্রতেইর অনুরোধের কথা বলাতে ভীইয়ার জবাব দিল, 'নিশ্চয় লিখব, খুশি হয়েই লিখব। আমার অবশ্য বয়েস হয়েছে, শরীরটাও সুস্থ নয়, কাজ করতে ডাক্তার নিষেধ করেছে। কিন্তু যখন দুর্বলকে সাহায্য করার কথা ওঠে তখন আমি তৈরি। খুব ভাল কথা যে ব্রতেই দলাদলির কথা ভুলে গিয়েছে। এখন আমরা কথায় নয়, কাজে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারি।'

প্রথম প্রবন্ধটা কাঁপা ও আবেগভরা গলায় বলে গেল ভীইয়ার : 'ক্রোধ ও ঘৃণা আমার মধ্যে ফুঁশছে। এক সময়ে ভন গলৎস-এর বাহিনী সত্যাদর্শের জন্যে সংগ্রাম করেছিল। মার্শাল ম্যানারহাইম সংগ্রাম করছেন ন্যায়ের জন্যে।'

পরে সে জোলিওকে বলল, 'আমাদের এক প্রবল পরাক্রান্ত মিত্র আছেন। তিনি হলেন সেনাপতি তুষারঝঞ্ঝা।'

জোলিও হাত নেড়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, ফিনল্যাণ্ড দেশটা কোন্‌খানে তা আমার জানা নেই। শুনতে পাই ওখানে নাকি শীতের দাপট খুব বেশি। আমাদের

লোকদের ওদেশে পাঠালে ওরা ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে প্রাণ হারাবে। এ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। কিন্তু ইতালীর হাবভাব সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? জানেন তো, আমি একজন মার্সাইয়ের দেশপ্রেমিক। ওরা যদি মার্সাই আক্রমণ করে!'

'কক্ষনো না। মস্কোর ওপরে আমাদের যতখানি বিদ্বেষ, ওদেরও তাই। ইতালীর দিক থেকে আমাদের আর ভয় পাবার কিছু নেই।'

পরের দিন ভীইয়ারের মেয়ে লুই বাবার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার স্বামীকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে।

সে বলল, 'গাস্ত' চিঠি দিয়েছে যে সেনাদলে নাকি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। ওখানে একটাও ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান নেই। সৈন্যদের পায়ে বুট নেই। ওদের ভাবগতিক মোটেও সুবিধের নয়। গাস্ত' ওদের কিছু বলতে ভয় পায়। আচ্ছা বাবা, ফ্রান্সের কী হবে বলতে পার?'

অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো শুনল ভীইয়ার, তারপর বলল, 'কী ভয়ংকর! আমি গোড়া থেকেই বলে আসছি যে এ যুদ্ধে কোনো কিছুর মীমাংসা হবে না। এ যুদ্ধ নিরর্থক। এখন আবার ফিনল্যান্ডে শুরু হয়েছে—অবশ্য ফিনল্যান্ডের কথা আলাদা।'

ক্যারেলিয়ায় সৈন্য-চলাচল, স্কি-বাহিনী ও ম্যানারহাইমের জন্যে অর্থসংগ্রহ সম্পর্কে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল সে। লুই বাধা দিল, 'আজকাল আমার রাত চারটে পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমই আসে না। ভাবি, কেবল ভাবি.........সত্যিই জার্মানরা যদি জেতে তাহলে কী হবে বাবা!'

'ওরাই হয়তো জিতবে।'

এত সহজভাবে কথাটা বলল ভীইয়ার যে লুই একেবারে আঁতকে উঠল।

'বাবা! কী বলছ তুমি?'

ভীইয়ার দেখল মেয়ের ঠোঁট দুটো কাঁপছে—হয়তো এখনই কেঁদে ফেলবে। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে সে বলল, 'ভয় পেও না, আমাদের ম্যাজিনো লাইন আছে।'

খবরের কাগজ আসতে ভীইয়ার দেখল, 'লা ভোয়া নুভেল্'-এ তার প্রবন্ধটা ছেপে বেরিয়েছে। মনোযোগ দিয়ে সে আগাগোড়া লেখাটা পড়ল আর মাথা নেড়ে নেড়ে নিজের লেখার তারিফ করতে লাগল। তারপর তার নজর পড়ল একটা ছবির ওপরে। ধু-ধু করছে বরফ—তারই মধ্যে দুটি মৃত সৈনিক দাঁড়িয়ে, শীতে জমে তাদের শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছে। হাতে রাইফেল। দেখে মনে হয়, যুদ্ধে চলেছে আর মৃত্যুর মধ্যেও ফুটিয়ে তুলেছে সজীব গতিভঙ্গিমা। ভীইয়ারের কাছে কেমন বীভৎস মনে হল ছবিটা—ছবির মধ্যে কোথাও আপোসের চিহ্ন নেই বা বাইরে বেরিয়ে আসার পথ নেই।

লুই চলে গেল। আর্ম-চেয়ারে বসে বসে বিশ্রাম নেওয়ার আনন্দে গা ঢেলে দিল ভীইয়ার। এখন সে বুঝতে পারছে, যুদ্ধে কে জিতল আর কে হারল তাতে তার কিছু যায় আসে না। এমনকি ফিনল্যান্ডের যুদ্ধ সম্পর্কেও এই একই কথা। তার কী? এখানে-ওখানে কিছু লোক ছুটোছুটি করছে, কিছু লোক মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে আর কিছু লোক ঠাণ্ডায় জমে মরছে। এই-ই তো জীবন। কিন্তু সে এ সবের ঊর্ধ্বে। ছবির আপেলের মতো সেও নিজের মধ্যেই আলাদা একটি জগৎ। উত্তেজনা তার জীবনে প্রচুর এসেছে, কথাও বলেছে অজস্র, দুশ্চিন্তাও অনেক। এখন তার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

'লা ভোয়া নুভেল্'-এর ফটোগ্রাফার এসে তার শান্তিভঙ্গ করল। জোলিও যে

শহরে থাকে সেই শহরেরই লোক, স্বভাবটা ছটফটে আর কেমন একটু মায়া হয় লোকটিকে দেখে।

লোকটি বলল, 'আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম বলে মাপ চাইছি। ফিনল্যাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে প্রথম পাতায় আপনার একটা ছবি ছাপানো বিশেষ দরকার। শিরোনামা দেওয়া হবে—ন্যায় ও স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা।'

ভীইয়ার তার প্যাঁশনে ঠিক করে নিয়ে মুখে একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি আনবার চেষ্টা করল।

নয়

ছিমছাম যে-মেয়েটি শৌখিন পোশাক তৈরি করছে আর ফ্যাশনদুরস্ত স্ত্রীলোকদের কাছে পোশাক বিক্রি করছে—তাকে দেখে তেসা নিজের মেয়ে বলে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। মেয়েটির চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা আর বেশ ঘনভাবে ঢেউ তোলা, ঠোঁটদুটো টকটকে লাল, মাথায় যে টুপি পরেছে সেটা সর্দার-রাঁধুনীদের টুপির ক্ষুদে সংস্করণ, আর হাতে বেগুনী রঙের ফিতে বাঁধা একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স।

বুলভার মালএরব-এ একটা দরজীর দোকানে কাজ নিয়েছে দেনিস। মেয়েরা এখানে মডেল মাফিক সান্ধ্য-পোশাক তৈরি করে। শো-রুমে লম্বা লম্বা আয়না। খদ্দের খুবই কম আর দোকানের মালিক প্যানপ্যান করে যে ব্যবসা মন্দা। লোকটি মাঝবয়েসী, মুখের ওপরে একজোড়া ক্ষুদে আর কটা গোঁফ, চোখদুটো ড্যাবডেবে। মাঝে মাঝে সে 'লা জারদ্যাঁ দে মোদ্' বা 'ভোগ'-এর পাতা ওলটাচ্ছে। আবছা আলোয় মডেলগুলো দেখে খদ্দের বলে ভুল হয়। সেলাইয়ের কল চলার একটানা আওয়াজ উঠছে, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি অনবরত ওঠানামা করছে, মেলে-রাখা সিল্কের কাপড়ের ওপরে আঙুলের নখ ভুড়ভুড়ি কাটছে। গোলমালটা অসহ্য। কিন্তু পেছনকার ঘরে ওজের নামে একটি খোঁড়া লোক একটি ছোট ছাপার মেশিনে কাগজ আঁটছে। এটি হল কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী ছাপাখানা। দোকানের মালিকের ফ্যাশন সম্পর্কে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। সে রাজনৈতিক ইস্তাহার লেখে আর দেনিস তার হাতের চমৎকার কাডবোর্ডের বাক্সে সেগুলো ভর্তি করে নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিলি করতে বেরিয়ে যায়।

আজ দেনিসের ছুটির দিন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে চলেছে বেলভিলে। ঠিকানাটা পাওয়া গিয়েছে। সেখানে মিশোর সঙ্গে দেখা হবে। চার মাসের বিচ্ছেদের পর এই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

মিশোর নাম ছিল নৌ-বাহিনীর রিজার্ভে, কাজেই তাকে গোড়ায় পাঠানো হয়েছিল ব্রেস্ত্-এ। কিন্তু তার সার্ভিস রেকর্ড পড়ে তার ওপরওলারা রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল আর এই 'আগুনে' লোকটাকে বিদেয় করার উপায় খুঁজতে লাগল। দু সপ্তাহ পরে আরাসে এক পদাতিক বাহিনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাকে। সেখানে তার কাজ হল সৈন্য-ব্যারাকের মেঝে ধোয়া। ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার ছিল মেজর ফেবর। লোকটা

ফূর্তিবাজ আর মাতাল; রাজনীতির ওপরে খাপ্পা আর কর্তৃপক্ষের ওপরে অনাস্থা। ওর প্রিয় বচন হল, 'জীবনে দুটি বড়ো মধুর ব্যাপার আছে—একটি ট্যাক্‌সি অন্যটি ক্যাকটাস।' গোড়ার দিকে সে মিশোকে চোর বলে মনে করত কিন্তু যখন জানতে পারল যে 'অপরাধী লোকটা' স্পেনে যুদ্ধ করেছে তখন সে তার নাম দিল 'ডন কুইক্‌সোট' আর তাকে নানাভাবে সুনজরে দেখতে লাগল। এবার সে মিশোকে দিন দুয়েক পারীতে কাটিয়ে আসার ছুটি দিয়েছে।

দেনিস উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সরু আর অন্ধকার রাস্তাটা খুঁজে বের করতে রীতিমতো বেগ পেতে হল। রাস্তাটা আর পাঁচটা রাস্তার মতোই, আলাদা করে চিনে নেবার উপায় নেই। একটি বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিলেন। তখনো মিশো এসে পেঁাছয়নি।

'বস বাছা, কফি করে দিচ্ছি তোমায়। ঠান্ডায় জমে গেছ, না? মিশো এক্ষুনি এল বলে।'

কিন্তু মিশোর অনেক দেরি হচ্ছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার জিনোকে কখনো দেখোনি, না? কারখানায় ফ্যাশিস্টরা খুন করেছিল ওকে।'

ক্ল্যমাঁস সম্পর্কে মিশোর গল্পগুলো মনে পড়ে গেল দেনিসের :

'অপানিই নাকি!'

অ্যাপ্রন দিয়ে চোখ মুজলেন ক্ল্যমাঁস। জিনো! ঘরে যে-সব জিনিসপত্র রয়েছে সে-গুলোর অর্থ এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে এল দেনিসের কাছে। বড়ো কানওলা একটা ছেলের ছবি ঝুলছে দেওয়ালে। দেরাজগুলো বই-খাতায় ভর্তি। পেরেকের ওপর একটা পুরনো ক্যাপ। ছেলের ব্যবহারের জিনিসগুলো আগলে ছিলেন ক্ল্যমাঁস। জিনোর কমরেডদের তিনি দেখাশোনা করতেন, তাদের খাওয়াতেন, তাদের জামার বোতাম সেলাই করে দিতেন। যুদ্ধ যখন বাধল তখন সারা সন্ধে একা বসে বসে কাঁদতেন তিনি। একে একে সবাইকে যেতে হয়েছে, কেউ তাঁর কাছে নেই! কিন্তু নভেম্বরে একজন নতুন লোক এল তাঁর কাছে।

লোকটি বলল, 'মিশোর কাছ থেকে আসছি। রাতটা এখানে কাটাতে পারব কি? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি......'

এখন কমিউনিস্টদের আশ্রয় দিচ্ছেন ক্ল্যমাঁস। তিনি কখনো কারও নাম বা কাউকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন না। খাবার তৈরি করে দিয়ে বিছানা পেতে দেন। তারা তাঁর কাছে সমস্ত খবর বলে আর তারা যে তাঁকে এতখানি বিশ্বাস করে তা ভেবে তিনি গর্ব বোধ করেন।

'ফিনল্যান্ড সম্পর্কে সোরগোল তুলে কাগজওলারা লোকের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়।' তিনি দেনিসকে বললেন।

তারপর দেনিসের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে ক্ল্যমাঁস হাসলেন, 'আমি মিশোকে গোড়া থেকে বলে আসছি যে ওর পক্ষে একা থাকা ঠিক নয়। ভাল কথা যে ও তোমার নজরে পড়েছে। ও ভয়ানক লাজুক, কিন্তু ওর মনটা খুবই ভাল। তাছাড়া, খুবই বুদ্ধিমান। দেখো না অল্পদিনের মধ্যেই ও মোরিস তোরের মতো লোক হয়ে উঠবে। শুধু একজন স্ত্রীলোক থাকা দরকার ওর পেছনে। জিনো যেমন পেয়েছিল আমায়।'

যদিও দেনিস এমনিতে স্বল্পভাষী, সে কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করল না। এ যেন তার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া কথা বলছেন তার সঙ্গে।

অবশেষে মিশো এল। পল্টনী সাজে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে!

'তুমি!'

ক্ল্যামাঁসকে আলিঙ্গন করল মিশো। ক্ল্যামাঁস সঙ্গে সঙ্গে কফি নিয়ে এলেন।

তিনি বললেন, 'আমার এখন কাজে যেতে হবে। তুমি যদি আমার আসার আগে বাইরে যাও তাহলে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা মাদুরের নিচে রেখে যেও। কিন্তু সাবধান মিশো, ওরা যেন খুন করতে না পারে তোমায়। শুনছি এখনো নাকি যুদ্ধ 'শুরু' হয়নি। কিন্তু মানুষ-মারা ঠিকই চলেছে। তোমাকে না হলে আমাদের কিছুতেই চলবে না। আমি ওকে বলছিলাম যে তুমি একদিন মোরিস তোরেের মতো লোক হয়ে উঠবে।'

তিনি চলে গেলে মিশো দু-হাতের মধ্যে টেনে আনল দেনিসকে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম এতদিন। নিশ্চয়ই ছিলাম, ঠিক তাই!'

জানুয়ারীর ছোট দিন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এল। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার আবছায়াকে মনে হচ্ছে নীল কুয়াশা। ক্ল্যামাঁস এক্ষুনি ফিরবেন কিন্তু এখনো অনেক কথা বলার আছে দুজনের।

'সমস্ত কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে আছে। আমাদের রাখা হয়েছে বেলজিয়ামের সীমান্তে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ওখানে ঘাঁটি তৈরি করা হবে, পরে মত বদলে গেল। কর্নেলকে একদিন চিৎকার করতে শুনলাম, 'যারা হতাশাবাদী তারাই শুধু বলে যে জার্মানরা এখানে আসবে!' হতাশাবাদী কথাটা ওদের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু কারা হতাশাবাদী? ওরা নিজেরাই। জার্মানরা যাতে আমাদের গুঁড়িয়ে দিতে পারে, সর্বদিক থেকে তারই বন্দোবস্ত করছে ওরা। অবশ্য অন্য ধরনের গভর্নমেন্ট হলে ব্যাপারটা বদলাবে। শত্রুকে ঠেকানো যাবে। আমার কি ভয় হচ্ছে জান, শুরুতে আমরা মার খাব কিন্তু পরে আমাদেরই অবস্থা শোধরাতে বলা হবে। লোকে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। যখনই আমার হাতে ইস্তাহার আসে ওরা সেগুলো কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নেয়। অফিসাররা সবাই ফ্যাশিস্ট। শুধু ফ্যাশিস্ট নয়, নাৎসীপন্থী। শুধু আমার অফিসারটি অন্যরকম, ও ক্যাকটাস নিয়ে পাগল। কিন্তু অন্যরা বলছে যে এর জন্য দায়ী পপুলার ফ্রণ্ট, কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা আর এমনি সব কথা। সাধারণ সৈন্যদের ওরা ভয় করে। আর সাধারণ সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে তা তারা নিজেরাই জানে না। বারুদের অভাব নেই কিন্তু তাতে আগুন দেবার জিনিসেরই অভাব। পারীতে যদি একবার শুরু হয় তাহলে ওরা এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

'এখানেও ঠিক একই অবস্থা।' দেনিস বলল, 'কারখানার মানুষগুলো ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে কিন্তু কিছু বলে না। এই ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারটাতেই ওরা একটা নাড়া খেয়েছে। ওরা বলেছে, ফিনল্যাণ্ডের ফ্যাশিস্টদের জন্যে ওরা কিছুতেই বিমান তৈরি করবে না। হয়তো ধর্মঘট করে বসতে পারে। তাহলেই আগুনে ঘি পড়বে।'

বিদেশের খবরাখবর জিজ্ঞেস করল মিশো। জিজ্ঞেস করল সোবিয়েত ইউনিয়নের খবর। দেনিস সবকথা বুঝিয়ে বলে।

মিশো হাসে : 'দেখছ তো, তুমি আর এখন যা-তা লোক নও। মনে পড়ে, কিভাবে প্রথম মিটিঙে নিয়ে গিয়েছিলাম তোমায়?'

ওদের প্রেমের প্রথম দিনগুলির কথা মনে পড়ছে, সেই দ্বিধা আর সংকোচ। ওদের

ঠোঁট, হাত, এমন কি চোখ পর্যন্ত ওদের হৃদয়াবেগের গভীরতাকে ব্যক্ত করতে পারছে না। এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে হবে দুজনকে।

দেনিস বলে, 'কোনো এক জাহাজের ইংরেজ ক্যাপ্টেনের কথা পড়ছিলাম কাগজে। নতুন বছরের কাছাকাছি সময়। তারা ডিনার খেতে বসেছে। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হল। একটা জার্মান সাবমেরিন। লোকটির সঙ্গে ছিল তার তরুণী স্ত্রী। স্ত্রীর গায়ে লাইফ-বেল্ট এ'টে দিয়ে তাকে সে টানতে টানতে নিয়ে এল জাহাজের ধারে। মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল। ভেবেছিল, স্বামী পাগল হয়ে গিয়েছে। তারপর লোকটি তার স্ত্রীকে জলের মধ্যে ছু'ড়ে ফেলে দিল। বে'চে গেল মেয়েটি। কী আত্ম-সংযম! কী প্রবল অনুভূতি! মিশো, বে'চে থাকতে হলে আজ আমাদেরও চাই সাহস। তুমিও আমাকে এই কথাই বলো, চিৎকার করে বলো যাতে আমি জোর পেতে পারি। বিপদের কথা বলছি না, আমার সামনে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু যখন আমরা বিদায় নিই, তখন আমার কেবলই মনে হয়, এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা, আর কখনো দেখা হবে না।'

'আমরা সবাই রয়েছি একটা ভেলার ওপরে। জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা। আমরা কিছুতেই হাল ছেড়ে দেব না। তীরে আমরা পৌঁছবই, দেনিস। তুমি দেখে নিও।'

দুটো অন্ধকার রাস্তা এসে যেখানে মিলেছে, যে রাস্তাদুটোকে মনে হচ্ছে রাতের নদীর মতো চওড়া আর নিশ্চুপ—সেখানে দাঁড়িয়ে ওরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিল। মিশোর জ্যাকেটের নীচে গোঁজা এক বাণ্ডিল ইস্তাহার ও দু কপি 'লুমানিতে'। ট্রেন ছাড়তে এখনো তিন ঘণ্টা বাকি। হাঁটতে হাঁটতে সে স্টেশনের দিকে এগোল। নিষ্প্রদীপ পারীকে মনে হচ্ছে একটা আশ্চর্য নতুন শহর। মাঝে মাঝে পাতাঝরা গাছের ডালগুলো বেরিয়ে আসছে অন্ধকারের ভেতর থেকে। কিন্তু বাড়িগুলো দেখা যায় না; আবছা-ভাবে অনুভব করা যায় যে সেগুলো আছে, অনেক দূরের পাহাড়ের সারির মতো। একটি শিশু হেসে ওঠে। একজন স্ত্রীলোককে বলতে শোনা যায়—'আমার দস্তানাটা পড়ে গিয়েছে।' একটা বাসের হর্ন বেজে ওঠে, একটা সিগারেটের আগুন দেখা যায়। সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে আবছা আর নীল কুয়াশা আর শহরের গোঙানি—মনে হয় যেন সমুদ্র ফুঁশে উঠেছে।

মিশো ভাবছে দেনিসের কথা। যেন ভীষণ তাড়া এমনিভাবে বিদায় নিয়েছে দুজনে। ভেতরের ব্যথা বাইরে প্রকাশ করতে কেউ চায়নি। দেনিস বলেছিল, 'তোমার পকেটে কতকগুলো সিগারেট দিয়ে দিয়েছি।' সে বলেছিল, 'গলাটা ঢেকে রেখো, ঠাণ্ডা লাগবে।' আবার কবে দেখা হবে দুজনের? কোনো দিন হবে কি?

চওড়া রাস্তাগুলো নদীর মতো ঢেউ তুলে তুলে চলেছে। কে যেন একটা টর্চ নিয়ে এগিয়ে অসছে তার দিকে। ক্ষীণ আলোটাকেও জোরালো দেখাচ্ছে অন্ধকারে। ফুট-পাতের খানিকটা অংশ, একটা গাছের চারপাশের রেলিং আর সেই মানুষটির পায়ে আলো পড়েছে। এমন দিন কি কখনো ছিল যখন রাস্তায় জোরালো আলো জ্বলত? লোকটি মোড় ফিরতেই বাতিটাকে আর দেখা গেল না। নিষ্প্রদীপ রাত্রে টর্চের আলোর মতো তাকেও কিনা জাগিয়ে রাখতে হবে তার প্রেমকে—আর সেই প্রেমের আলোয় পার হতে হবে এই অন্ধকার বছরগুলো!

দশ

আঁদ্রেকে পাঠানো হয়েছে পোয়াতিএর-এ। রোজই গুজব শোনা যায় যে এই রেজিমেন্টটাকে নাকি ম্যাজিনো লাইনে পাঠান হবে কিন্তু গুজবটা এখনো পর্যন্ত পাকা খবর হয়ে ওঠেনি। চার মাস কেটে গিয়েছে। মারকিস্ দ্য নিওর ড্রইংরুমে প্রায়ই আসে কর্নেল। বাকুর যুদ্ধে জেনারেল গ্রাঁদমেজোঁর অধীনে কাজ করেছিল সে। স্থানীয় প্রত্নবিদরা সব সময়েই তাকে জিজ্ঞেস করে, পোয়াতিএর-এর ওপর বিমান-আক্রমণ হবার আশঙ্কা আছে কিনা। অফিসাররা তাদের রক্ষিতাদের জন্যে শহরে বাসা নিয়েছে। প্রত্যেকটি মদের দোকানে দেনা হয়েছে সৈন্যদের, সবকটা বেশ্যাপল্লীতে পুরো টহল দেওয়া হয়ে গিয়েছে। রোজ সন্ধেবেলা ডায়েরির পৃষ্ঠায় কাটাচিহ্ন দিয়ে এক-একটি দিন পার হচ্ছে আঁদ্রে।

তার বন্ধু লরিএ বলে, 'আজকের দিনটা আমরা হারালাম, না জিতলাম তা খতিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।'

জেলখানার জীবনের মতো এখানকার জীবনও নীরস ও একঘেয়ে। তারা রুট-মার্চে বার হয়, উঠোন ঝাঁট দেয়, সালগমের ঝোল খায়। তারপর শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, দোকানের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমায়, সিনেমায় পুরনো ছবি দেখে আর খিদে-বাড়ানো মদ খায়। তারপর ব্যারাকে ফিরে এসে লোহার স্টোভের সামনে বসে বসে হাই তোলে আর ঝিমোয়। আঁদ্রে তাকিয়ে থাকে লোকগুলোর মুখের দিকে। ধীরে ধরে তাদের মুখ থেকে দুশ্চিন্তা আর চাতুরীর ছাপ মুছে যায় আর সেই মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ল্যান্ডস্কেপের কথা মনে পড়ে আঁদ্রের। মাঝে মাঝে ভাবে, মানুষের সঙ্গে মাটির একটা সাদৃশ্য আছে, একটা যোগসূত্র আছে কুমোরের সঙ্গে কাদামাটির। এমনি মুহূর্তে আঁদ্রে কাজের প্রেরণা পায়। নিজেকে ঠাট্টা করে বলে, 'যখন পারীতে ছিলাম তখন আঁকতে ইচ্ছে করত না, এখন রঙের জন্যে মন উশখুশ করে।' লরিএ বলে, 'দ্যাখ না, এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা ফ্রন্টে যাব।' আঁদ্রে স্বপ্ন দেখে, পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠছে, ঠান্ডা শিরশিরে সকাল, কাঁটাতার আর ফ্যাকাশে ও নিরবয়ব মৃত্যু। ঠিক সেইসব সূর্যহীন কিন্তু প্রদীপ্ত ও অসহ্য দিনের মতো যখন বস্তুর আকার ও রং লোপ পায়।

আঁদ্রে খুব সহজে লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে। পারীতে নিজের স্টুডিওতে সে থাকত একা একা, ছবি-আঁকার মধ্যে ডুবে থাকত। কিন্তু এখানে সে আছে অন্য অনেক মানুষের মধ্যে—হাসছে, গল্প বলছে, ঠাট্টা-তামাসা করছে। বিশেষ করে লরিএর সঙ্গেই তার বেশি ভাব। লরিএ হল আভিঞ্যঁর এক কাফের বাজনদার, ছেলে-মানুষের মতো হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চলে, দক্ষিণ অঞ্চলের লোক। সে গায় 'ভুত ভা বিয়', মাদাম লা মারকিস্' পরমুহূর্তেই বলে, 'এই যুদ্ধ একশো বছর চলবে।' বলতে 'কর্নেল আগে থেকেই মেরী মাতাকে মোমের হাত-পা উপহার দিয়েছে যাতে সে নিজে আহত না হয়।'

ইভ্-এর দেশ ব্রেত', দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে, 'এখানকার মাটি খুব ভাল। আর এখানে ছাগলের সংখ্যাও খুব বেশি। আমাদের দেশে এত বেশি ছাগল নেই। আচ্ছা বলতে পার, যুদ্ধ শুরু করার বুদ্ধিটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে?' প্রত্যেকটি গাছের কাছে সে থামে যেন কোনো গাঁয়ের লোকের সাক্ষাৎ মিলেছে। সার আর রাই সম্পর্কে তার সঙ্গে আঁদ্রের দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। বৌ-ছেলেমেয়ের জন্যে আর বাড়ির জন্যে মন কেমন করে তার।

নিভেল্ কোন একটা কাফেতে ওয়েটারের কাজ করত। সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হবার জন্যে দু' মাস তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। একবার তার বৌ তাকে জেরেনিয়ম ফুল এনে দেয়। সে শুনেছিল, জেরেনিয়ম ফুলের গন্ধ শুঁকলে নাকি হার্ট দুর্বল হবে এবং সেক্ষেত্রে সে পল্টন থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই ঘটেনি। সে বলে, আমাকে এখানে আটক রাখা হয়েছে কেন? আমি রোজ আশি ফ্রাঁ করে কামাচ্ছিলাম।। দিনে আশি ফ্রাঁ হলে মাসে কত হয় হিসেব করে দেখ। আর এখন ব্যবসার অবস্থা কত ভাল! কাল কাফে দ্য পারীর ওয়েটারের কাছে শুনলাম, আগের চেয়ে এখন সে ডবল রোজগার করছে। নিজেই হিসেব করে দেখ, দিনে আশি ফ্রাঁ হলে মাসে হয় গিয়ে দু' হাজার চার-শো, তাকেও আবার দুই দিয়ে গুণ করতে হবে। আমি জানি আমার ব্যবসা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই, আমারও ভারি মাথাব্যথা পড়েছে ওদের জন্যে! আমার মত লোকের সংখ্যা কি কম? অন্তত তিরিশ লাখ। তাহলেই বোঝো একবার ব্যাপারখানা—চার হাজার আটশোকে গুণ করতে হবে তিরিশ লাখ দিয়ে!' দাঁতে কামড়ানো একটা টুকরো পেনসিল খুঁজেপেতে বার করল সে : 'হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে—এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ। এবার বারো দিয়ে গুণ কর।'

হিসেব-রক্ষক লাবোন-এর বিমান সম্পর্কে ভয়ানক ভয়। সে বলে, 'সাধারণ গুলি-গোলাকে ভয় পাই না। কিন্তু যখন আকাশ থেকে বোমা পড়ার কথা ওঠে তখন তুমিই বল ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়!' তার বৌ এসব বিপদ থেকে দূরে আছে এটুকুই তার সান্ত্বনা। সারাক্ষণ সে বেশ্যাপল্লীতেই পড়ে আছে। বলে, 'মরবই তো জানা কথা। যতক্ষণ সময় আছে খুশিমতো ফুর্তি করে নেওয়া যাক।'

আর আছে জিভের। ছেলেমানুষের মতো চেহারা, কমজোরী বুক। কবিতা লেখে। কবিতার বিষয়বস্তু হল আঁধার রাতের রাস্তা আর একটা পাগল অর্গান-বাজিয়ে।

এমনি সব লোক। একই ধরনের একঘেয়েমির মধ্যে একসঙ্গে থাকে আর মদ গেলে। কেউ হয়তো হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে ঘোষণা করে, 'কাল চলে যেতে হবে আমাদের।' সঙ্গে সঙ্গে ছাউনির মধ্যে সাড়া পড়ে যায় আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অমনি সবাই চিঠি লিখতে বসে বাড়িতে আর স্থানীয় আলাপী মেয়েদের কাছে বিদায় নেয়। তারপর শোনা যায়—'মহড়া দেবার জন্যে মিথ্যে খবর ছড়ানো হয়েছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইভ্ বলে, 'কী যে হয় এসব করে!'

একদিন আঁদ্রে লরিএকে বলল, 'ব্যাপারটা বোঝাবুঝির বাইরে চলে গেছে! সবটাই একটা জগাখিচুড়ি! কে যে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে কে জানে! এ যেন ভিড়ের মধ্যে আটক পড়ে যাওয়া......শুধু তফাতটা এই যে ভিড়টা নড়ছে না, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কি বলছে তা শুনে কী লাভ? যাই বলুক, সত্যি কথাটা কিছুতেই বলবে না। ওদের এখন চেষ্টা, কে কাকে ঠকাতে পারে আর কে কত বেশি চালাকি করতে পারে। এ যেন আমি আঁকতে বসে টিউব থেকে রঙ বের করছি। তুমি সিঁদুরে রঙের টিউবটা টিপছ, কালো

বেরিয়ে আসছে। আবার সাদা টিপলে বেরোচ্ছে লাল। না, এর চেয়ে একেবারে না ভাবাই ভাল।'

রেডিওতে নাচের বাজনা শেষ হবার পর যেই খবর বলা শুরু হয় অমনি সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মুখ বন্ধ করে দাও শালার!' রোজ একই ধরনের খবর শুনতে হয় তাদের—যেমন, সাংস্কৃতিক আদর্শের ত্রাণকর্তা হচ্ছেন দালাদিএ, রণাঙ্গনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি, জার্মানরা আরেকটি সতেরো হাজার টনের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে, ইত্যাদি। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে।

শহরে কারও আর মনে নেই যে একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সৈন্যদলের ছাউনি পড়াতে প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ শহরে খানিকটা চাঞ্চল্য এসেছিল। এখন আবার সেই আগেকার মতো নিস্তরঙ্গ জীবন। তেমনি দু-একটা ঘটনা। হেয়ারড্রেসার শারদোনে দু লক্ষ ফ্রাঁ লটারী জিতেছে। 'প্রত্নতত্ত্ব পত্রিকা'র চলতি সংখ্যায় আফগানিস্থানের এক খননকার্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। মারকুইস দ্য নোয়ার মুখে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গিয়েছে সুতরাং তিনি বাধ্য হয়ে বাগানের মালীকে বরখাস্ত করেছেন আর বাগান দেখাশোনা করার ভার চাপিয়েছেন মোটর গাড়ির ড্রাইভারের ওপরে। মালীটিও মারকুইসের সোনার ঘড়ি আর পারিবারিক স্মৃতিবিজড়িত একখানি রেকাবী চুরি করে শোধ তুলেছে। তারপর সে ধরা পড়েছে এক গণিকালয়ে। স্থানীয় কাগজগুলোতে উরুগুয়ে উপকূলের নৌ-যুদ্ধের চেয়েও এ ঘটনার গুরুত্ব বেশি। বড় স্কোয়ারে এক সার্কাস-দলের তাঁবু পড়েছে। তিনটে উত্ত্যক্ত চিতাবাঘকে অনবরত লাফাতে হচ্ছে এক চেয়ার থেকে আরেক চেয়ারে।

জানুয়ারী মাসে একদিন ইভ্‌কে ধাতানি দিল কর্নেল : 'পল্টনী সেপাই হওয়া তোমার দ্বারা হবে না, তোমাকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন গাঁয়ের দমকলের লোক।' ব্যারাকগুলো তকতকে ঝকঝকে করে তোলা হল, বড়ো রাস্তায় এ-মুড়ো ও-মুড়ো টাঙ্গানো হল সারি সারি তেরঙ্গা নিশান।

পোয়াতিরএর-এর ডেপুটি—বর্তমানে মন্ত্রী—পদার্পণ করবেন বলে সমস্ত কিছু তৈরি। নগরকর্তা তেসাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন, পুরনো যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আর ক্লেমসোর সঙ্গে তুলনা করলেন তেসার। 'কী যে বলেন' গোছের মুখের ভাব করে তেসা মাথা দোলাতে লাগল। নগরকর্তার বক্তৃতা শেষ হবার পর তেসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাবলাম, যে-শহর আমার প্রতি আস্থা জানিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছে, এই ঐতিহাসিক দিনে সেই শহর পরিদর্শন করে আমি আনন্দ পাব। আমি জানি পোয়াতিএর-এর সন্তানদের বুকে আজও পবিত্র আগুন জ্বলছে। প্রাচীনকালে পোয়াতিএর-এর রক্ষাকর্তা ঋষি স্যাইলারিও এই পবিত্র আগুন থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। আর আজ এই পবিত্র আগুন থেকে প্রেরণা পাচ্ছে ম্যাজিনো লাইনের রক্ষীরা। অমাদের যা কিছু ভাবনা-চিন্তা সমস্তই একটিমাত্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত—তা হচ্ছে জয়লাভ।'

তেসা এসেছে ভিয়েন ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু জমি কিনতে। আগেকার দিনে যা কিছু সে আয় করত তার প্রতিটি পয়সা খরচ করে ফেলত। কিন্তু এখন পয়সা নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। যে-সব কোম্পানীর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে তাদের সকলেরই বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। অবশ্য টাকাগুলো সে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে পারে কিন্তু তাতে টাকাগুলো হয়ে উঠবে অঙ্কের একটা সংখ্যা, একটা নিরবয়ব অনুভূতি। তাছাড়া টাকার ব্যাপারে কোনো ক্ষেত্রেই পুরোপুরি নিশ্চয়তা নেই। শেয়ার কিংবা ডলার—কোনোটার ওপ-

রই আজকাল আস্থা নেই তেসার। জমিই একমাত্র জিনিস যা বদলায় না। একটা চমৎকার বাগান-বাড়ি কেনা কত ভালো! তাহলে ইস্টারের সময় সেখানে পলেৎকে আনা যেতে পারে। ফুলের রাজ্যে বেড়াতে বেড়াতে মন থেকে সমস্ত চিন্তা মুছে ফেলা যেতে পারে—এই যুদ্ধ, এই ব্রতেই,.এসব জেনারেল, সমস্ত কিছু। সম্প্রতি সে লাভালকে নিয়ে তামাসা করেছিল, 'ও লোকটা একটা কঞ্জুস। জমি কেনা ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু ও জানে না।' সলিসিটরের আপিসে গিয়ে তেসা অনেকগুলো প্ল্যান আর ফটো দেখল। একটা বাড়ি পছন্দ হয়ে গেল তার। বাড়ির সামনের দিকটা আঠারো শতকের বাড়ির মতো দেখতে, বাগানটা পেতি ত্রিয়ান'র ধরনে সাজানো, ভেতরে সমস্ত রকম আধুনিক সাজসরঞ্জাম লাগানো আছে। বাগানবাড়িটার নাম প্রী-দে-দ্যাঁ। পরদিন তেসা মোটরে করে প্রী-দে-দ্যাঁর দিকে রওনা হল। যাবার আগে ভেতরে উলের জামা আর দুটো হাতে-বোনা ওয়েস্ট-কোট পরে নিতে ভুলল না। যা শীত! লুসিয়ঁর কপালে কী ঘটেছে কে জানে! ঠাণ্ডায় জমে মরে যায়নি তো? ভাবতেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সলিসিটরকে তেসা বলল, 'কী বিশ্রী শীত! ঠিক ফিনল্যাণ্ডের শীতের মতো। আচ্ছা, আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন? জার্মান নামওলা মার্শালটি কিন্তু বড়ো চমৎকার লোক! আমার বিশ্বাস ও জিতবেই।'

বাড়ির সামনে একটি নগ্ন পরীর মূর্তি, হাতে ব্রোঞ্জের পাত্র। পাত্রের কিনার থেকে বরফের লম্বা লম্বা ফোঁটা ঝুলছে। মনে হচ্ছে, এমন কি পরীটিরও ঠাণ্ডায় জমে যাবার মতো অবস্থা।

তেসা বলল, 'বড়ো চমৎকার বাড়ি। সামন্ত যুগের পঞ্চদশ লুই আমলের সিলিং-এর সঙ্গে হাল আমলের কেন্দ্রীয় উত্তাপ-ব্যবস্থা—এই সমন্বয় বড়ো ভালো লাগে আমার।'

শহরে ফিরে এল সন্ধের দিকে। মনে পড়ল, রুটি-মিষ্টির দোকান থেকে সে দেনিসের জন্যে এক বাক্‌স চকোলেট কিনেছিল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপর প্রায় চার বছর কেটে গিয়েছে। যুদ্ধ না বাধলে এতদিনে আবার তাকে নির্বাচন-এলাকার ভোটদাতাদের সামনে এসে দাঁড়াতে হত। কিন্তু এখন তাকে অন্য বিষয় নিয়ে দুর্ভাবনা করতে হচ্ছে। কী চমৎকার ছিল সে-সময়টা! সে ছিল একমাত্র প্রার্থী। অন্য সবাই তাকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। আমালি আর ছেলেমেয়েরা বাড়িতে প্রতীক্ষা করছিল তার জন্যে। দেনিস হাসছিল; এমন কি লুসিয়ঁও চেষ্টা করেছিল তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে। সে প্রে-দে-দ্যাঁ কিনছে শুনলে কী খুশিই না হত আমালি। পল্লী-জীবন, মুরগী আর শাক-সবজি—তিনটেই ছিল তার প্রিয়। আর এখন এই সম্পত্তি কার জন্যে কিনছে সে? পলেতের জন্যে? কিন্তু ও তো মিয়েজারের ছেলের মতো কোনো পয়সাওলা নবাবপুত্তুরের খোঁজ পেলেই খেদিয়ে দেবে তাকে। না, এ জমিটা তার নিজের জন্যেই, একমাত্র তার নিজের জন্যেই। আচমকা তার মনে পড়ে গেল যে পির লাশেস-এর গোরস্থানে ঠিক আমালির কবরের পাশেই খানিকটা জমি রেখে দেওয়া হয়েছে। মনে পড়তেই চোখে জল এসে গেল প্রায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল যে সন্ধেবেলা মারকুইস দ্য নিওর বাড়িতে তাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে। এই ঘটনার প্রাধান্য তার কাছে এত বেশি যে অতঃপর নিজেকে সামলে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

তাকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে উৎসাহে কলকল করে উঠল মারকুইস :

'আপনি আমাদের প্রতিবেশী হতে চলেছেন, এজন্যে আমরা আনন্দের সঙ্গে আপ-

নাকে স্বাগত জানাচ্ছি। গোয়াতুতে আসবেন ঠিক করে সত্যিই খুব ভাল কাজ করেছেন আপনি।'

সালোঁয় গিয়ে তেসা স্থানীয় অভিজাত, প্রত্নবিদ, কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মচারী এবং তার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রাঁদমেজোঁর দেখা পেল। গ্রাঁদমেজোঁ চিৎকার করছে, 'ওদের শিক্ষা দিতে হবে! ইংরেজদের যে কোথায় বাধছে আমি বুঝি না। কৃষ্ণসাগরে গিয়ে এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার।'

দর্শকরা তেসাকে ঘিরে ধরল। ফিকে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে বোঝাতে লাগল, 'সমস্ত কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে। জার্মানদের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা আছে এ-কথা ধরে নেওয়া ভুল। এই শীতকালে অনেক শিক্ষা পেতে হয়েছে ওদের। সামরিক জয়ের চেয়েও থাইসেনের পাড়ি দেওয়ার গুরুত্ব বেশি। রাইখের কর্তারা তো ক্ষেপে আগুন। জার্মানদের সঙ্গে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হবার সম্ভাবনা আমি দেখছি। গোয়েরিং-এর মতো লোক অবস্থার গুরুত্ব পুরোপুরি বোঝে। আর হেস্-এর কথা যদি বলতে হয়!'

নির্বাচনের সময়কার প্রতিদ্বন্দ্বীদের খবরাখবর নিল তেসা। ব্রতেইর পক্ষপুটাশ্রিত দুগারের সৈন্যদলে ডাক পড়েছে আর এখন তার ওপরে তেলের যোগান দেবার ভার পড়েছে। তালা-কারিগর দিদিএকে পাঠানো হয়েছে রে দ্বীপের বন্দীশালায়। তেসা আক্ষেপ করে বলল, 'এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হওয়া ভয়ংকর কথা। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। শত্রু এসে পৌঁচেছে ফ্রান্সের দোরগোড়ায়।'

পরদিন সকালে তেসা মোটরে পারী রওনা হল। ব্যাটালিয়ন থেকে গার্ড-অব-অনার দেওয়া হল তাকে। আঁদ্রে বহুবার লুসিয়াঁকে তার বাবার সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছে কিন্তু তাকে কখনো চাক্ষুষ দেখেনি। এখন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল আঁদ্রে, ঠিক ছোট্ট পাখির মতো দেখতে। গার্ড-অব-অনার পরিদর্শন করে তেসা তার চামড়ার দস্তানা দিয়ে লম্বা নাকটা মুছল। শীতের বাতাস 'মার্সাই'-এর সুরে গম-গম করে উঠেছে।

তেসাকে নিয়ে আলোচনা ওঠে সৈনিকদের মধ্যে। তারা সবাই জেনেছে যে তেসা একটা বাগান-বাড়ি কিনেছে। ইভ্ সখেদে বলে, 'কুত্তার বাচ্চাটা এধারে নাক ঢোকাতে এসেছে। নাক ডুবিয়ে দেখল জমিটা খাসা, তাই পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করেনি। শুনেছি আশেপাশের জমির দর নাকি তিন ফ্রাঁ থেকে বারো ফ্রাঁয় উঠে গেছে।'

নিভেল ঘোঁত ঘোঁত করে ওঠে : 'এতে ওর কি যায় আসে? প্রত্যেকটা টোটা থেকে ওর পকেটে কিছু না কিছু আসে। যেমন আমার আসত বিয়ারের প্রত্যেকটা গ্লাশ থেকে। কিন্তু হলে কি হবে, ও আমাকে কিছুতেই পল্টন থেকে ছেড়ে দেবে না।'

লরিএ বলে 'কেমন গুরুগম্ভীর মুখখানা ওর। একমাত্র শবযাত্রায় যোগ দিতে হলে লোকে ঐ রকম মুখ করে। আর ও কিনা তবুও 'যুদ্ধজয়' 'যুদ্ধজয়' বলে চেঁচায়! চল, সার্কাসে যাওয়া যাক। যাবে নাকি?'

সার্কাসে পাউডার ও জন্তুর প্রস্রাবের গন্ধ। অশ্বারোহী মেয়েটির স্কার্টে কাচের বলগুলো ঝিকমিক করে। কসরৎ দেখাতে দেখাতে বাঁদরটা হাঁচে আর মস্ত ব্যারেল-অর্গানটা গর্জন করে। ১৪ই জুলাইয়ের কথা মনে পড়ল আঁদ্রের—সেই নাগরদোলা আর চকচকে নীল হাতী। জেনেৎ এখন কোথায়? আজও কি সে ওষুধের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করছে? আজও কি সে কাঁদছে! ভাগ্য কারও প্রতি প্রসন্ন নয়। সে ভাবত, সে ভাগ্যহীন। আজ সে বুঝেছে যে সবাই ভাগ্যহীন। লরিএ ঠিক কথাই বলে : জীবনে শান্তির মুখ দেখে যেতে

পারবে না তারা। এমনকি শান্তি-চুক্তি যদি হয়ও তো বড়ো জোর এক-বছর কি দু-বছর টিকবে, তারপর আবার নতুন করে শুরু হবে গণ্ডগোল।

ইভের কতকগুলো নিজস্ব ভাবনা আছে। আপন মনে সে বলে, 'বড় চমৎকার এখানকার জমি। কিন্তু চাষীরা বড়ো চতুর। গমের সঙ্গে সঙ্গে ডালের মেশাল দিয়েছে যাতে সবটা হাতছাড়া হয়ে না যায়। গোরুবাছুর মেরে ফেলছে। ওরা বলে, আমাদের কাছে কাগজের টাকার কী দাম। ওরা কাউকে বিশ্বাস করে না। আর দেখ, জমির দর কিভাবে চড়ে গেছে! কে আছে এ সবের পেছনে?'

উজ্জ্বল আলোয় চোখ পিটপিট করছে চিতাবাঘগুলো, কান ঝুলিয়ে দিয়েছে। বেগুনী ফ্রককোট পরা ছোট্ট বেঁটে সার্কাসের লোকটা শপাং শপাং করে চাবুক চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই।

জিভের বলে, 'ওদের পক্ষে চেয়ারগুলো বড়ো ছোট।'

ব্যারেল-অর্গানটা আবার গর্জন করতে শুরু করে।

আঁদ্রে লরিএর সঙ্গে বেরিয়ে আসে। বলে, 'লোকের এই যে নির্বিকার ভাব, এটাই সবচেয়ে খারাপ। সবাই সার্কাসে যাচ্ছে, কাফেতে গিয়ে ভিড় করছে। এদিকে তেসা জমি কিনছে। গম লুকিয়ে রাখছে চাষীরা। কিন্তু কাল কী হবে? গত যুদ্ধের সময়ে অবস্থা একেবারেই অন্যরকম ছিল। হয়তো এমন অনেক কিছু ছিল যার কোনো অর্থ হত না কিন্তু সে-সবের মধ্যেও মানবিকতা ছিল। লোকে চিৎকার করে বলত, 'বার্লিন চলো', জার্মানদের দোকান লুট করত আর জার্মানদের ঘৃণা করত। সবচেয়ে বড়ো কথা, তারা লড়াই করেছিল। তাদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব ছিল না। ক্লেমসো শিরদাঁড় সোজা করে বলেছিলেন—'আমরা প্রতিরোধ করব, প্রতিরোধ করব পারীর সামনে, পারীতে, পারীর ছেড়ে এসেও!' তারপর ঘোষণা শোনা যেত—'লেনিন অমুক কথা বলেছেন, লেনিন তমুক কথা বলেছেন...' সবকিছু যেন ফুঁশে উঠেছিল। কিন্তু এখন সবকিছু এত শান্ত যে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। বোধ হচ্ছে আমরা হয়ে উঠেছি ওই চিতাবাঘগুলোর মতোই। প্রচার করার সময় বলা হয় যে এই জন্তুগুলো হিংস্র ও মাংসাশী কিন্তু আসলে ঘেয়ো বুড়ো বেড়ালের চেয়ে বেশী হিংস্র নয় ওরা। এই অবস্থা আমার ভালো লাগে না লরিএ।'

লরিএ বলে, 'আমারও না।'

এগারো

লোকে ঠাট্টা করে লুসিয়ঁকে জিজ্ঞেস করে, তেসার সঙ্গে তার কোনো রকম আত্মীয়তা আছে কিনা। লুসিয়ঁ বলে, 'শুধু নামের দিক থেকে।' তবু নাম এমন একটা জিনিস যাকে মর্যাদা দিতে হয়। সাবধানী মেজর হাসপাতালের বেয়ারার কাজে নিযুক্ত করল লুসিয়ঁকে যাতে বুলেটের ছিটেফোঁটা লাগার সম্ভাবনাও তার না থাকে।

পুরনো মঠ-বাড়িতে মানসিক চিকিৎসার হাসপাতাল হয়েছে। লুসিয়ঁর কাজ হল একগুঁয়েদের শাসনে রাখা আর মুষড়ে-পড়াদের রবারের টিউবের সাহায্যে নাক দিয়ে খাওয়ানো। একজন সার্জেন্টকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে; মানুষ দেখলেই সে বেয়নেট

চার্জ করতে চায়। বেরা নামে একটি তরুণ সৈনিক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে; এই লোকটি যা কিছু দেখে তাতেই ভয় পায়, তা সে চুলের বুরুশই হোক, পিকদানিই হোক বা ডাক্তারের চশমাই হোক। আরেকটি রোগী কেবল মেয়েদের মতো বুকওলা উলঙ্গ সৈনিকেরা ছবি আঁকছে। আরেকটি পাগল এসেছে মার্সাই থেকে—সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যুদ্ধ-সংবাদের ফরমুলা আওড়ায় : 'উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি......উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি।'

আর একজন লুসিয়ঁকে খোলাখুলি বলল, 'আমি ইচ্ছে করে পাগল সেজেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম লিভারের গোলমালেই কাজ ফতে হয়ে যাবে। লিমোজে-এ একসঙ্গে পনেরোটা ডিম গিলে ফেললাম। ভাবতেই পারা যায় না ব্যাপারটা! কিন্তু কিছু হল না। এরা ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিল আমায়। তারপর ঠিক করলাম গরুর মতো হামলাতে আরম্ভ করব। কিন্তু কারও কাছে এ কথাটা বলবেন না যেন।'

লুসিয়ঁ ঘাড়-ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমার ভারি বয়ে গেছে। যত ইচ্ছে হামলাও না তুমি।'

বেয়ারারা তাস খেলে আর মহা উৎসাহে বেশ্যাবাড়ি যায়। হাসপাতালে তাদের কোয়ার্টারের ঘুলঘুলিগুলোতে আগে থাকত সাধু-সন্তদের মূর্তি এখন রয়েছে মদের বোতল। আগুনের ধারে বসতে লুসিয়ঁ ভালো লাগে। এই তার একমাত্র আনন্দ। মনে মনে বলে, 'অগ্নি-উপাসকদের আমি বুঝতে পারি।' আজ সে আগুন থেকে নতুন প্রেরণা পেল। আগুনটা নিভে গিয়েছিল কিন্তু হঠাৎ আবার জ্বলে উঠেছে আর কাঠগুলোকে গ্রাস করছে। লুসিয়ঁর চুলগুলোকে দেখাচ্ছে আগুনের শিখার লেলিহান অংশের মতো।

জেনী লিখেছে, সে আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছে। তাকে নাকি ফিরতেই হবে, আমেরিকার কন্সাল নাকি বিশেষ করে ফিরে যেতে বলছে। তারপর সে লিখেছে, প্যারী কিংবা নিউইয়র্কে আবার তাদের দেখা হবেই। আগুনের মধ্যে চিঠিটা ছুঁড়ে দিল লুসিয়ঁ। এখন, ঠিক এই সময়েই, লুসিয়ঁ বুঝতে পেরেছে যে জেনেৎকে সে ভালবাসে। লোকে বলে, সময় মানুষের শত্রু। কথাটা সত্যি নয়। সময় ওপরকার আবরণকে ক্ষয়ে ফেলে, কপট শোক ও কৃত্রিম কামনা মুছে যায় কিন্তু সত্যিকার আবেগ বেঁচে থাকে। জেনীর কাছ সে বিদেশী এবং তার কাছেও জেনী ঠিক তাই। এ যেন ঠিক জিগ্-স' ধাঁধার মতো। পুরো ছবিটাকে সাজাতে হবে কিন্তু কোনো একটা টুকরো আরেকটা টুকরোর সঙ্গ মিশ খাচ্ছে না।

রেডিওর চেঁচানি শোনা গেল : 'ফ্রন্টে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।' সঙ্গে সঙ্গে মার্সাই-এর লোকটাও গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।'

নতুন বছরের পর লুসিয়ঁ ফ্রন্টে যাবে বলে আবেদন জানাল। ভাবল, মৃত্যুর কাছাকাছি থাকতে পারলে তার মনের বিমর্ষতা কেটে যাবে। কিন্তু ফ্রন্টের জীবন তার কাছে কেমন আদিম, প্রাণহীন ও অভিশপ্ত মনে হল। গোলাগুলি লেগে কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। কিন্তু সৈনিকেরা কেমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে এ সবে। তারা হাই তুলে বলে, 'এ হল একটা লটারী।'

লুসিয়ঁ কথা বলার সঙ্গী পেল একজন—নরমাণ্ডির লোক, ঘোড়ার মতো চোয়াল আর ভাঁটার মতো চোখ। পেশার কি থেকে প্রত্নবিদ। নাম আলফ্রে। লুসিয়ঁর কাছে সে গল্প করে কিভাবে সাহারা মরুভূমিতে খননকার্য করা হয়েছে আর সেখান থেকে পাওয়া

গিয়েছে এক লুপ্ত জগতের নানা চিহ্ন। লুসিয়ঁর মনে পড়ে বরফ আর পেঙ্গুইন পাখির কথা। একদিন তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলফ্রের মনে এই বিশ্বাস আছে যে দালাদিএ স্বাধীনতার পক্ষে, আর যুদ্ধজয়ের পরে শিল্পজগতে আবার জোয়ার আসবে, তৈরি হবে নতুন এথেন্স ও নতুন রেনেশাঁস। লোকটির মোহ ভেঙে দেবার তাগিদ লুসিয়ঁর নেই, সে শুধু মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে বলে, 'ভালো কথা যে লোকটাকে তুমি নিজে জান না।'

একটি সৈনিকের পা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গিয়েছে, তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। গরম মোজা পাবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। গুজব রটে যে ফিনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠানো হবে।

ফেব্রুয়ারীর এক শীতার্ত সকালে—যখন পৃথিবীটাকে দেখাচ্ছিল সাদা একটা মাঠের মতো আর সেই মাঠের ওপরে লাল একটা সূর্য ভাসছিল—এমনি সময়ে এক পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধি-দল ঘাঁটি পরিদর্শনে এল। সঙ্গে ছিল জেনারেল পিকার।

সম্প্রতি গুজব রটেছিল যে পিকারকে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওয়েগ্যাঁ নিজের সম্পর্কে বলেছে যে সে একজন 'অগ্নিনির্বাপক' এবং নিকট প্রাচ্যের আগুন নেবাবার ভার দেওয়া হয়েছে তাকে। পিকার আপত্তি জানিয়ে বলেছে, 'যুদ্ধে হোস্-পাইপের চেয়ে আগুনে-বোমা অনেক বেশি কাজের।'

কি ভাবে অভিযান চালানো হবে তার পরিকল্পনাটির খসড়া তৈরি করে ফেলেছিল পিকার। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সে বলত 'বাকু সৈন্যবাহিনী'। কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ঘটনায় সে উত্তর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হল। তেসাকে বলল, 'একটা শক্তিশালী অভিযাত্রী বাহিনী পাঠাতে হবে এখান থেকে। জার্মানদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করতে পারি না। তাছাড়া চাইও না। এদিকে সৈন্যদের বেকার বসিয়ে রাখাও বিপজ্জনক। কমিউনিস্টরা উঠে-পড়ে লেগেছে। এই বসন্তেই গণ্ডগোল বাধবে। এই গোলমেলে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র রাস্তা—ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে চূড়ান্ত রকমের একটা জয়লাভ।

ল্যাপল্যাণ্ডের আকর, 'গোদা মানুষের কাদা-পা' আর রোমের সহানুভূতি—এই নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয় পার্লামেণ্টের লবিমহলে। ম্যাজিনো লাইনে কোনো ফাটল নেই, এ-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ডেপুটিরা ফ্রণ্টে ঘুরে যাচ্ছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সম্মতি দেবার আগে দেখে নেওয়া দরকার যে সবকটা দরজা ঠিকমতো বন্ধ আছে। প্রতিনিধি-দলে তিনজন র‍্যাডিকাল, দুজন দক্ষিণপন্থী এবং একজন সমাজতন্ত্রী। ব্রতেইকে বাদ দিলে এই প্রতিনিধি-দলে এমন কেউ নেই যার যুদ্ধবিদ্যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে। প্রেক্ষাগৃহের একদল দর্শককে আচমকা রঙ্গমঞ্চের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিলে যে-অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও তাই। পরনের ট্রাউজার আর মাথার টুপির জন্যেও মনে মনে তাদের লজ্জা হচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন হাসিখুশি মোটাসোটা লোক নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে একটা টিনের টুপি চেয়ে বসে।

আবোল-তাবোল নানান সব প্রশ্ন করতে করতে তারা ঘাঁটিগুলো দেখে আর মাঝে মাঝে বলে ওঠে, 'বাঃ,' 'চমৎকার'—যেন একদল টুরিস্ট মধ্যযুগীয় কোনো দুর্গ দেখছে। ভারী কামানের কাছাকাছি তারা আসে না, জড়োসড়ো হয়ে তফাতে সরে যায়।

জেনারেল পিকার ব্রতেইর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। উত্তরমুখী অভিযানের ভালোমন্দ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছে দুজনে। ব্রতেইকে মনে হচ্ছে প্রাণের আনন্দে ভরপুর।

ব্রতেই বলে, 'আমরা এবার মোড় নেবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।...ভয় ছিল যে সমাজ-

তন্ত্রীরা বাধা দেবে কিন্তু ব্লুম চুপ করে আছে আর ভীইয়ার লড়াইয়ে নেমেছে। শাস্যর আর্লাপিনদের পাঠানোর প্রশ্ন দু-একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

একটা সামরিক ঘাঁটি তারা পার হয়ে যায়। লুসিয়ঁ স্যালুট করে। ব্রতৈই তাকে চিনবে কিনা এই ভেবে কয়েকটা অস্থির মুহূর্ত কাটিয়েছে লুসিয়ঁ। কিন্তু গভীর আলোচনায় ডুবে আছে ব্রতৈই আর তাছাড়া প্রাইভেটদের দিকে নজর দেওয়ার অভ্যাসও তার বড়ো একটা নেই।

অতীতের বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো লুসিয়ঁর মনে পড়ে যায়। মনে করতেই হয়। ডেপুটিরা এমনভাবে কুঁজো হয়ে হাঁটছে যেন তাদের মাথার ওপর দিয়ে বুলেট ছুটছে—এই দৃশ্য দেখেও এখন আর তার মজা লাগছে না। লজ্জায় মরে যাওয়া কি জিনিস তা বুঝতে পারছে লুসিয়ঁ। হ্যাঁ, তার অতীত সত্যিই লজ্জাকর। এই হৃদয়হীন লোকটার ওপর কি করে একদিন আস্থা রেখেছিল সে? পিকারের সঙ্গে ব্রতৈই কি কথা বলছে তা অনায়াসে অনুমান করা যায় : ফ্রান্সকে নতজানু করবার মতলব আঁটছে ওরা ১৯৩৬ সালের প্রতিশোধ। সিরিয়ায় আর ফিনল্যান্ডে ওরা সৈন্য পাঠাবে, সিরিয়াআর ফিনল্যান্ড যেখানেই হোক না কেন। হিটলারকে পথ ছেড়ে দেবে ওরা। লুসিয়ঁর মনে পড়ল, তার বাবা যখন ধর্মঘটের ওপরে ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন তখন তিনি বলতেন, 'এর চেয়ে জার্মানদের আসা অনেক ভালো!' ওরা সব এক জাতের মানুষ। বোধহয় একদিক থেকে ওদের মধ্যে গ্রঁদেলই সবচেয়ে কম ক্ষতিকর। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষ তো মারা পড়ছে। গতকাল মরেছে শার্ল। সে ছিল পাহাড়-অঞ্চলের মেষপালক, ব্যাগপাইপ বাজাত। তাকে কেন মৃত্যুর মুখে পাঠাল ওরা? বেইমানের দল!

সন্ধের দিকে লুসিয়ঁ আর আলফ্রে শিবির-আগুনের ধারে বসল। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে দুজনে, মুখ দিয়ে কারও কথা বেরোচ্ছে না। একসময়ে আলফ্রেই কথা বলল, 'লীগ অফ নেশনস্-এ যে-সব প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, তারপরে—'

বাধা দিয়ে লুসিয়ঁ বলল, 'চুলোয় যাক! সবই ফাঁকা কথা—কথাগুলো বলা হয় সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জঘন্য বিদ্বেষ ঢেকে রাখার জন্য। ব্রতৈইকে দেখেছ? উনি মোক্ষলাভ করেছেন। স্বর্গে যাবার চেষ্টায় আছেন। বলা বাহুল্য উনি একজন 'দেশপ্রেমিক'ও। উনি যখন লোরেন্ সম্বন্ধে কথা বলেন তখন কান্নার সুর শুনতে পাবে ওঁর গলায়। কিন্তু গ্রঁদেল যে জার্মান গুপ্তচর—এ-খবরটি উনি বরাবরই জানেন। গ্রঁদেলকে উনিই আড়াল করে রাখছেন। তুমি কি মনে কর পিকার্ যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে? কক্ষনো না! ও অন্য একটা কিছু নিয়ে লেগে আছে। ফ্যাশিস্ট বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে ও। মেশিনগানগুলো এল কোত্থেকে? ড্যুসেলডর্ফ থেকে। এবং পয়সার ব্যবস্থা করল কে? কিলমান নামে এক জার্মান। সমস্তটা মিলিয়ে হীন চক্রান্ত একটা। লীগ অফ নেশনস্-এর নাম উচ্চারণ কোরো না আমার কাছে। তার চেয়ে বরং আমাকে বল, শার্লকে কি জন্যে প্রাণ দিতে হল।'

তারপর অনেকক্ষণ ধরে লুসিয়ঁ বলতে লাগল ব্রতৈইর 'মন্ত্রশিষ্য', মঁতিনির বাড়ির সভা আর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কথা। শুধু কিলমানের চিঠিটা কি করে তার হাতে এল, সে-কথাটা বলা প্রয়োজন মনে করল না। সে যে তেস্যর ছেলে এ-কথা স্বীকার করতে তার আপত্তি। তার মনে হল, একথা স্বীকার করলে তাকে আরো বেশি লজ্জায় পড়তে হবে। আলফ্রে মুখে একটা চরম হতাশার ভাব নিয়ে বসে রইল। সে বারবার বলে উঠছে, 'কিন্তু......', তারপরে আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সে বলতে পারল,

'এই যদি ঘটনা হয় তাহলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ওদের। ফ্রান্সকে আমরা বাঁচাবই।'

লুসিয়ঁ শেলষের সঙ্গে হাসে, বলে, 'ঠিক জেনীর মতো! মেয়েটি আমেরিকান। আমি তার সঙ্গে থাকতাম, বরং তার ডলারের সঙ্গে থাকতাম কথাটাই ঠিক। সেও ঠিক এই কথাই বলত : তাহলে তো তোমাদের বিপ্লব দরকার। অনেক দেরি হয়ে গেছে, বুঝলে খোকা। আমরা ১৯৩৬-এ কী করছিলাম? এখন আর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ওরা আমাদের পিষে মারবে আর ব্রতেই হয়ে উঠবে গাউলাইতর। কিংবা সব কিছুকে সরাসরি জাহান্নমে পাঠাবে ওরা। তোমাকে আমাকে বাদ দেবে না। ব্যাপারটা দাঁড়াবে ঠিক তোমার খননকার্যের মতো। দু হাজার বছর পরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাবে একটা ডানহিল লাইটার, একটা মেসার্শমিট ইঞ্জিন ও মহদাশয় ভীইয়ারের মাথার খুলি। আর তখন রব উঠবে, দেখেছ, কি আশ্চর্য সভ্যতা! একটা সান্ত্বনা যে, এ কথা বলার জন্যে আমরা তখন বেঁচে থাকব না। উঃ! কী ভয়ানক শীত! সত্যি কথা বলতে কি, কোথাও কোনো বৈচিত্র্য নেই।'

বারো

জোলিও নতুন বছর উদ্‌যাপন করে স্ত্রী ও শ্যালক আলফ্রেকে নিয়ে। আলফ্রে সৈন্যদলের ডাক্তার, তিন দিনের ছুটিতে এসেছে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে তারা দু বোতল শ্যাম্পেন খায়। কতকগুলো মেয়ে গোলাপী আর নীল কাগজের গুলি পাকিয়ে ছোঁড়ে তাদের দিকে। আলফ্রে লজ্জায় চোখ মিটমিট করে বলে, 'এগুলো বোমা।'

পানপত্র হাতে নিয়ে জোলিও ঘোষণা করে, 'জয়ের উদ্দেশে! আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সৈন্যরা বার্লিনে বসে নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছে।'

কথাটা বলেই সে মজ্জাগত কুসংস্কার বশে টেবিলের ধারের কাঠ ছোঁয়। মুখ ফিরিয়ে নেয় আলফ্রে। জোলিওর বেসামাল চালচলন দেখলে তার অস্বস্তি লাগে। মারি কিন্তু তারপরেও তার ভাইয়ের দিকে মমতাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'ততোদিন যদি বেঁচে থাক—তবেই তো'!

জোলিও তার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেয় : 'এটা আমার মনগড়া কথা নয়—একেবারেই নয়। বছরটা ঘুরুক না, তখন জার্মানদের যেখানে থাকবে একটা ভারী কামান, আমাদের পাঁচটা।'

আলফ্রে বলে, 'জানি না। ওসব ব্যাপারে আমি তেমন দুরস্ত নেই। কিন্তু সীরাম নেই আমাদের। ভয় হয় একদিন আচমকা বিপদে পড়ে যাব। গত যুদ্ধে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল......'

জোলিও তাকে থামিয়ে দেয়। রোগ আর মৃত্যু সম্পর্কে কোনো কথা সহ্য করতে পারে না সে।

পরদিন আলফ্রে চলে গেল। জোলিওর মুখেও আর কখনো আলফ্রের কথা শোনা যায় না। জোলিওর ধারণা, ছেলেটা খুব ভালো কিন্তু কেমন ভোঁতা। মারি প্রায়ই চোখের

জল ফেলে। তার সব সময়েই ভয় যে ভাইটি যুদ্ধে মারা যাবে। জোলিও বৃথাই আশ্বাস দেয় যে ডাক্তাররা থাকে ফ্রন্টের পেছনে, সুতরাং বিপদ থেকে তারা অনেক দূরে। স্ত্রী তবু বলে, 'যদি হঠাৎ কিছু ঘটে?'

জোলিও তেমনি ব্যস্তবাগীশ, যা তার স্বভাব। হালে ফিনদেশীয় খটমট নামগুলি তার মাথায় বোঝাই হয়ে আছে। রাত্রিবেলা ভালো ঘুম হয় না, তন্দ্রার ঘোরে অদ্ভুত সব দৃশ্য হানা দেয়—যেন একদল শীতে জমে-যাওয়া অসাড় মানুষ আকাশ থেকে ঝুরির মতো ঝুলছে। কেমন শীত শীত করে; কম্বলটা মাথার ওপরে টেনে দিয়ে মুড়িশুড়ি দিয়ে শোয়।

জোলিও লোকটা লোভী নয়; সে চায় সবাই কিছু কিছু ভাগ নিক। জন বারো বন্ধুকে সে ফিনল্যান্ড আর স্টকহোমে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার এক সম্পর্কিত ভাই আছে, নাম মারিয়ুস, ভালো জাতীয় সংগীত গাইতে পারে। তাকে সে বলল, 'একটা জমকালো জলসার ব্যবস্থা কর। ম্যানারহীম সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলবে। টাকাটা ফিনল্যান্ডের সাহায্যে দিতে পার। অনেক টাকা উঠবে কিন্তু।'

দু সপ্তাহ পরে অভিজাত শ্রোতাদের এক সমাবেশে গান গাইল মারিয়ুস। যোসেফিন মর্তিনির ওপর চোখ রেখে বাঁশির মতো গলায় সুর তুলল : 'একদিন এক গাছের নিচে বসে আছেন মার্শাল। সেই ভয়ংকর বিপ্লব তখন সবে শুরু হয়েছে। ছেঁড়া জামাকাপড় পরা বেআদব একটা সৈন্য—একটা বলশেভিক—এসে দাঁড়াল মার্শালের সামনে। মার্শালের কাছে আগুন চাইল। বলতে ভুলে গেছি যে মার্শালটি সিগার খাচ্ছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে সৈন্যটার দিকে তাকালেন এবং জীবন বিপন্ন করে উত্তর দিলেন, জলন্ত সিগারটা এক্ষুনি গিলে ফেলব আমি।'

মহিলারা ঘন ঘন হাততালি দিলেন। বলা বাহুল্য, টাকা যা উঠল সবই গেল মারিয়ুসের পকেটে—ফিনল্যান্ডের সাহায্যে নয়।

জোলিও অনেকবার ভেবেছে যে সুযোগ পেলে মুদ্রাকর পোয়ারিএর উপকার করবে, কেননা পোয়ারিএ আজ পর্যন্ত কখনো তাকে টাকার জন্যে তাগাদা দেয়নি। এবার সুযোগ পাওয়া গেল। সেনাবাহিনীর সদর-দপ্তরে ফিনল্যান্ডের একটা মানচিত্র দরকার। জোলিও পোয়ারিএর নাম সুপারিশ করল। তারপর টেলিফোন করে পোয়ারিএকে বলল, 'ওহে, এ একেবারে রাস্তা থেকে চারশো হাজার ফ্রাঁ কুড়িয়ে পাওয়ার সামিল। মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখবার দরকার নেই। তাহলে কিছুতেই আর মাথা সামলে রাখতে পারবে না। আমি যখন ফিনল্যান্ডের খটমট নামগুলো উচ্চারণ করবার চেষ্টা করি, মনে হয় জিভে কি একটা আটকেছে যেন।'

কাগজ থেকে ফলাও আয় হচ্ছে কিন্তু দিন দিন কেমন দমে যাচ্ছে জোলিও। কিসের যেন একটা ভয়, অথচ ভয় যে কিসের তা সে নিজেই জানে না। দিনে দু বার করে ফ্রন্ট থেকে সংবাদ আসছে 'উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি......!' দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে পারী আর আনন্দে মেতে উঠছে।

'একবার ব্যাপারখানা দেখ, ওরা রেশমের পরদার মতো বাড়ি আর গাড়ি কিনছে।' জোলিও বলে।

লা ভেয়া নুভেল্-এ ফিনিশ সৈন্যদের পাশাপাশি শামনি ও অন্যান্য শীতকালীন ক্রীড়াকেন্দ্রের স্কিয়িং প্রতিযোগিতার ছবি ছেপে বার হল; পারীর অভিজাত মহিলারা ফিনিশ সৈন্যদের থেকে পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। কিন্তু সুন্দরী স্কিয়ার বা সরকারী

সংবাদ—কারও ওপরেই আস্থা নেই জোলিওর। পৃথিবীতে একটা ভয়ানক কিছু ঘটেছে। এমন ঠাণ্ডা আগে আর কখনো পড়েনি। সেভিল-এ বরফ পড়ছে আর আর্জেণ্টিনে সর্দিগর্মিতে শ'য়ে শ'য়ে লোক মারা যাচ্ছে। তুরস্কে ভূমিকম্প হয়েছে। এসব থেকে বোঝা যায় যে কোথাও গণ্ডগোল বেধেছে একটা। জোলিও আরো বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, সর্বদা একটা কাঠের টুকরো হাতের কাছে রেখে দেয়। রাত্রে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে সারাদিন সে মইয়ের নিচ দিয়ে যাতায়াত করেছে নাকি! মারি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'অনেক দিন হল আলফ্রের কোনো চিঠিপত্র আসেনি।' জোলিও জবাব দেয়, 'কোথাও গিয়ে ফুর্তি করছে হয়তো।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদের আশঙ্কায় পকেটের ভেতরকার কাঠের টুকরোটা চেপে ধরে।

রুরের ধনকুবের থাইসেন এসেছে পারীতে। ফটোগ্রাফাররা ছেঁকে ধরে তাকে, ফিটফাট স্ত্রীলোকেরা হাসে তার দিকে তাকিয়ে। থাইসেনের ছোট্ট কুকুরটার ছবি 'লা ভোয়া নুভেল্'-এ ছাপা হয়। জোলিওর জানা ছিল, ব্রতেই দহরমমহরম করছে লোকটার সঙ্গে।

শুধু ছবি ছাপিয়েই ব্যাপারটা হল না। ব্রতেই ফোন করে বলল যে কাগজে থাই-সেনের স্মৃতিকথা বের করতে হবে।

'ঠিক এই জিনিসই আমরা চাই। পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ তৈরি হবে এ থেকে।'

জোলিও ক্রিলোঁ রওনা হল, যেখানে থাইসেন নেমেছে। জমকালো একটা লাউঞ্জে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল তাকে। তারপর একটি দাম্ভিক প্রকৃতির লোক বেরিয়ে আসে। জোলিও সাড়ম্বরে অভিনন্দন জানায়, হাসে, তারপর স্বাধীনতা ও জাতিসমূহের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে আলোচনা তোলে। থাইসেন নীরসভাবে জবাব দেয়, 'ক্ষমা করবেন। এখন ভয়ানক ব্যস্ত আমি।'

পাণ্ডুলিপিটা জোলিওর হাতে দিয়ে সে উঠে যায়। লেখাটার দিকে তাকাতে জোলিওর চোখে পড়ে : 'সেই বসন্তকালে হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করে আমি কমিউ-নিস্ট-বিরোধী অভিযানের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা করলাম......'

পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে জোলিও। মারিকে কাঁদতে দেখে সে বলে, 'আলফ্রের জন্যে দুশ্চিন্তা কোরো না। যুদ্ধ শুরু হয়নি, কোনোকালে হবেও না। ঐ জার্মানটাকে যদি দেখতে! লোকটার উপযুক্ত জায়গা হল বন্দীশালা। কিন্তু এক্ষুনি ও তেসার সঙ্গে দেখা করতে গেছে, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। কাল তার স্মৃতিকথা ছেপে বার করছি আমরা। ম'তিনি আমাকে বলেছে, 'যোগাযোগ স্থাপন করছি আমরা।' এর অর্থ বুঝতে পারলে? কেঁদো না মারি লক্ষ্মীটি। কোনো অমঙ্গল হবে না আলফ্রের। ফিন-ল্যাণ্ড বাদে আর কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে না।'

মুখের ওপর থেকে রুমালটা সরিয়ে নেয় জোলিওর স্ত্রী, তারপর মৃদুস্বরে বলে, 'আলফ্রে মারা গেছে।'

এবার টেবিলের ওপরে পড়ে-থাকা বড়ো হলদে খামটার ওপর নজর পড়ে জোলিওর।

তেরো

মিশোর রেজিমেণ্টকে পাঠানো হয়েছে লা হেভ্‌র-এ। মিশোর আশংকা হচ্ছে তাদের এই দলটিকে ফিনল্যাণ্ডে পাঠানো হবে।

তার জীবন যে ব্যর্থ নয় এবং সুখ যে শূন্যগর্ভ নয় তার প্রতিভূ হিসেবে সে তাকিয়ে আছে মস্কোর দিকে। মস্কোতে যা কিছু ঘটছে সমস্তই অবাক লাগে তার কাছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে, এ সবের সঙ্গে সে পরিচিত ও অঙ্গীভূত। যখন সে রেডিওতে আবখাসিয়ার লেবুবনের গল্প শোনে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক আনন্দময় হাসিতে। মস্কোর ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণের খুঁটিনাটি খবর সে মন দিয়ে শোনে যেন তারা ওর নিজের বাড়ি তৈরি করছে। 'ব্রাসেল্‌স্‌-এ আমাদের পিয়ানো-বাজিয়েরা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে,' সে বলল। 'আমাদের'—কথাটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার মনে এসেছে। একবার সে দেনিসকে বলেছিল, 'এমন কি এই ফুলগুলো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সাধারণ ফুলগুলো—ডেজি আর বাটারকাপ।' আর যখনই মনে হয়, এই অবস্থা আর সে সহ্য করতে পারছে না তখনই সে তাকিয়ে থাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের মানচিত্রের দিকে, সবুজ রঙের মস্ত ছোপটা তার জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। এমন কি দেনিসের সঙ্গে গত সাক্ষাতের সময় সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মস্কোর প্রদর্শনী কেমন চলছে?' কল্পনায় সুদূর শহরটিকে দেখতে পায় সে, যেন কত বছরই না থেকেছে সেখানে। এর জন্যে সে মরতেও তৈরি এবং সে একাই নয়। তার মতো শত শত সৈনিক এই মতাবলম্বী—এই বিশ্বাস বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। এবং অন্যান্য পল্টনেও তাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে এ এক গোপন ভ্রাতৃত্ববোধ।

আর এখন লা হেভ্‌র্‌-এর চওড়া রাস্তা দিয়ে হু হু করে বাতাস ছুটছে—পরদা ছিঁড়ে পড়ছে, কাত হয়ে পড়ছে বিজ্ঞাপনের বোর্ডগুলো, পথচারীরা ঘুরপাক খাচ্ছে ঘূর্ণির মধ্যে। বন্দরের সাইরেনগুলো ককিয়ে উঠছে, দাঁত কড়মড় করছে কপিকলগুলো। দিনরাত কাজ হচ্ছে। অভিযাত্রী বাহিনীর কথা বলাবলি করছে লোকে।

মিশো এক-এক করে সৈন্যদের আড়ালে ডেকে নিয়ে আলাপ করছে। সে জানে না, কে কমিউনিস্ট আর কে নয়, কিন্তু অনেক কিছুই আভাসে বোঝা যায়—কেউ হয়তো, বলে যে 'লুমানিতে'র সংখ্যাটা হাতে আসে নি, আবার কেউ হয়তো ভীইয়ারের মহানুভবতার কথা উঠলে নাক সিঁটকোয়, বা তোরে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে 'আমাদের মোরিস।' মিশো চাপা স্বরে বলে, 'ওরা যদি আমাদের রুশদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠায়, আমরা কিছুতেই যাব না। ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা যাবে না। সারা দেশ জানবে।'

জবাব আসে, 'জানি না। অন্যেরা কী বলছে? তোমার মনে রাখা উচিত এটা একটা নির্বাচনের ব্যাপার নয়। না যেতে চাইলে ওরা গুলি করে মারবে।'

মিশোর তেজস্বী কথাবার্তা আর হাসিখুশি স্বভাবের জন্যে সবাই তাকে পছন্দ করে। সার্জেন্টকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করলে সবাই তাকে বাহবা দেয়। কিন্তু তাই বলে বিদ্রোহ

করা সম্পূর্ণ আলাদা একটা জিনিস। মিশো নিজেই জানে না কথাটাকে সবাই কি ভাবে নেবে। সে চেষ্টা করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সবাইকে স্ব-মতে নিয়ে আসতে; উৎসাহের সঙ্গে লেনিনগ্রাদের গল্প করে, যে-লেনিনগ্রাদকে রক্ষা করার জন্যে রুশরা লড়াই করছে। ওখানে একটা মস্ত নদী আছে, ওখানকার মজুররা প্রাসাদে বাস করে। লেনিন থাকতেন ওখানে। যে-সব বিশ্বাসঘাতক ফ্রন্টকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে চায় তাদের সে গাল দেয়। এক-একজনের সঙ্গে এক-একভাবে কথা বলে মিশো, কথা বলতে বলতে উত্তেজিত ও ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে, এমন ভাব দেখায় যেন কালই সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কর্নেল কুয়েরিএ যখন শুনল যে অভিযাত্রী বাহিনীর মধ্যে তার রেজিমেণ্টটিকেও ধরা হয়েছে তখন তার চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেল। রাতগুলো কাটাতে লাগল তাস খেলে। লোকটার মেজাজ চড়া আর চরিত্র দুর্বল। গত যুদ্ধে সে সাহসের পরিচয় দিয়েছে আর সেজন্যে পদক পেয়েছে দুবার। মৃত্যু সম্পর্কে সে নির্লিপ্ত কিন্তু জীবন, কর্তৃপক্ষ, রাজনীতির চতুর জাল, নিন্দাবাদ আর মিছিলকে রীতিমত ভয় করে চলে।

সারাটা শীতকাল রেজিমেণ্ট ছিল পিকার্ডিতে। লোকগুলোকে শুধু শুধু বসিয়ে রাখা কিছুতেই চলে না, তাই কুয়েরিএ ভেবেছিল যে প্রতিরোধ-দুর্গ তৈরি করার কাজে লাগিয়ে দেবে সবাইকে। কিন্তু জেনারেল পিকার দাবড়ানি দিল, 'আতঙ্ক সৃষ্টি করতে কে বলল আপনাকে? এখানে ওদের আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। হতাশাবাদীদের কথায় কান দিচ্ছেন আপনি।'

কুয়েরিএ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ওদের বোঝে কার সাধ্য? এ হল রাজনীতির ব্যাপার। কাজ থামাবার নির্দেশ দিয়ে সে ঘোষণা করল, 'প্রতিরোধ-দুর্গ বানিয়ে কোনো লাভ নেই। শুধু হতাশাবাদীরাই মনে করে যে প্রতিরোধ-দুর্গ বানানো দরকার। জার্মানরা এদিকে আসবে না।'

আর এখন ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সৈন্যরা কি বলবে তা কেউ জানে না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ওরা ওখানে গিয়ে রুশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসবে। সে যাই হোক, পরিকল্পনাটা বেরিয়েছে কার মাথা থেকে? কথায় বলে দুটোর চাইতে একটা শত্রু শ্রেয়। রাশিয়া জয় করা কি কথার কথা? এমন কি নেপোলিয়ঁ পর্যন্ত আটকে পড়েছিল ওখানে। গামল্যাঁ কি সত্যি সত্যিই এ ব্যাপারটা ঘটতে দেবে? কিন্তু গামল্যাঁরই বা কতটুকু ক্ষমতা! আসলে যা করার করবে রাজনীতিকরা।

হতাশায় কর্নেল তাসগুলো ফেটিয়ে নিল; তবু মনের মত তাস মিলল না। দুটো গোলাম দরকার তার। এই নিয়ে ছয়বার গোলাম পেল না সে! যাক—আজকের রাত্তিরের মতো যথেষ্ট হয়েছে।

মিশো তার কমরেডদের বলছে, 'সীমান্ত এলাকা দেখেছ তো? কোনো প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নেই। আর এখন সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কেন, না, রুশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। আর এদিকে হিটলারের সৈন্য এসে সমস্ত দখল করে নিক! এই ওদের ফন্দি!'

কম-জোরের বাতির আলো পড়েছে লোকগুলোর মুখের ওপরে। চুনকাম-করা দেওয়ালে দপ্‌দপ্‌ করছে লম্বা লম্বা ছায়াগুলো। লোকগুলো কেন যে চুপ করে আছে আর এই চুপ করে থাকার অর্থটা কী, তা চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারছে না মিশো। নানা ধরনের লোক। আর্সেনিএর থেকে তালা-কারিগর এসেছে একজন; মনে হয় লোকটা কমিউনিস্ট। আরেকটি লোক, সে কৃষক—নিজের ফেলে-আসা ঘরসংসারের কথাতেই সে

মশগুল। তৃতীয় লোকটি টহলদার ব্যবসায়ী, সেলাইএর কল বিক্রি করে। একজন কুলি, একজন কসাই ও একজন ডাকপিয়ন। কী ভাবছে ওরা?

ভেতরের কথাটা আচমকা জানাজানি হয়ে গেল। পিকার্ এসেছে সৈন্য পরিদর্শন করতে। দু দল পল্টনকে দাঁড় করানো হয়েছে। কুয়েরিএ মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে, কেমন অন্যমনস্ক ভাব, লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। হঠাৎ পেছন থেকে একদল লোকের চিৎকার শোনা গেল, 'কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের?'

কর্নেলের মুখটা লাল হয়ে ওঠে। রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বলে, 'কে চিৎকার করছে?'

জবাব আসে, 'আমরা সবাই!'

ব্যাপার দেখে কুয়েরিএ পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। ভয় দেখাবার বা বোঝাবার চেষ্টা পর্যন্ত করল না। শুধু বন্দুকগুলো কেড়ে নেওয়া হল। গুজব রটে যে সামরিক আদালতে বিচার হবে তাদের। রাত্রে কারও চোখে ঘুম আসে না। শৈশবের দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মনে পড়ে পরিবার-পরিজনের কথা, শান্তির সময়ে তাদের জীবন।

তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমাদের সর্দার কে?' প্রত্যেকের মনে মিশোর ছবি ভেসে ওঠে কিন্তু তার নাম বলে না। আর চৈতালী ঝড় সারাক্ষণ তোলপাড় করে শহরটাকে।

পরদিন পিকার্ কর্নেলকে বলল, 'ওদের মধ্যে তিন-চারজনকে গুলি করে মারতে হবে যাতে একটা দৃষ্টান্ত থাকে।'

এতক্ষণে কুয়েরিএর মুখে কথা ফুটল : 'সেক্ষেত্রে ফলটা কি হবে ভাবতে পারছেন? ওরা আমাদের খুন করবে।'

কথাটা বলেই নিজর ভুল বুঝতে পেরে মাথা নিচু করে রইল। এবার বোধ হয় তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে সামরিক আদালতে দাঁড় করানো হবে। মনে হতে পারে, সে-ই দলের সর্দার।

পিকার্ পাশ ফিরে নোংরা জানলার কাচে আঙুল বাজাতে লাগল। ভুলে গেল একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। আপন মনে বলে চলল, 'মার্ন, ভের্দ্যা...সে সমস্ত অতীতের কথা। একে ফৌজ বলবে কেউ? যত সব জংলী, ছোট-লোকের দল।' ভাবল, কতবার না সে ব্রতেইকে বলেছে, 'সাবধান। এর কর্মফল ভোগ করতে হতে পারে আমাদের।' অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের লড়াইয়ে সামিল হতে পারলে লোকের মনোবল দৃঢ় হবে। কিন্তু র‍্যাডিকালদের যা স্বভাব, মনস্থির করতে পারেছে না। আর সৈন্যদের মধ্যে অনেক কমিউনিস্ট আছে। কী যে হবে? অফিসাররা অবশ্য জার্মানদের বিরুদ্ধে যাবে না। এর চাইতে 'আত্মসমর্পণ করছি' কথাটা বলা অনেক ভালো। খেলার ঘুঁটিগুলো এখনো নিরাপদ আছে, শুধু খেলাটায় হার হয়ে গেছে একেবারে।'

পিকার্ জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখল। এক খবরের কাগজের হকারকে ঘিরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। হাওয়ায় কাগজগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে চওড়া রাস্তার ওপর।

'লা ভোয়া নুভেল্! তাজা খবর! হেলসিঙ্কি ও মস্কোর মধ্যে আপোসরফার গুজব।'

চৌদ্দ

তেসা ডিমসেদ্ধ খাচ্ছিল, এমন সময়ে একটা টেলিগ্রাম এল। 'শান্তি প্রস্তাব—স্টকহোম—ফিনিস প্রতিনিধিদল'—টেলিগ্রামের কথাগুলো নেচে উঠল চোখের সামনে। কপালটাকে এমন ভাবে কুঁচকে রইল যেন শরীরের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। সুস্থ বোধ করার পর ফোন করল দালাদিএকে।

'হায়, হায়, এ কী দুঃসংবাদ!' সখেদে মন্তব্য করল সে। উত্তরে দালাদিএ বলল যে সে একটা বেতার-বক্তৃতা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ফিনদের সে পরামর্শ দেবে যে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাক, তাদের সাহায্য করার জন্যে একটি অভিযাত্রী বাহিনী তৈরি হয়েই আছে।

তেসা মাথা নাড়ল। 'বড় দেরি হয়ে গেছে বন্ধু। ওরা তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। অন্য কোনো উপায় ভাবা দরকার।'

'ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ট্র্যাজেডি'র কথা বলতে শুরু করল দালাদিএ। শুনে তেসা আর নিজের রাগ চেপে রাখতে পারল না, বলল, 'তা বটে, ট্র্যাজেডি বই কি! কিন্তু শুধু ওদের বেলাতেই নয়। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখছি যে মন্ত্রিসভা এক সপ্তাহও টিকবে না।'

কোন পক্ষে কত ভোট যেতে পারে তা হিসেব করে দেখল তেসা। বেশির ভাগ ভোট বিপক্ষেরই যাবে। জগতে সুবিচার বলে কিছু নেই। কোথাকার কে ম্যানারহীম নামে একটা লোক—তার ভুলের জন্যে দাম দিতে হবে সকলকে। ফিনদের গালাগালি দিল তেসা : অসভ্য বর্বর।

যেমনটি সে ভেবেছিল তাই ঘটল। গভর্নমেন্টের পক্ষে ভোট পড়ল খুবই কম। নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের ভার পড়ল রেনোর ওপরে। লোকটাকে তেসা ঘৃণা করে, বামনের মতো চেহারা, খোকা-খোকা কিম্ভূত একটি জীব, মানুষ নয়—বানর। তেসাকে তার মন্ত্রী-পদ না ছাড়তে প্রস্তাব করল রেনো।

তেসা বলল, 'আমি ভেবে দেখব। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।'

তারপরেই কালবিলম্ব না করে ছুটল দালাদিএর সঙ্গে দেখা করতে। দালাদিএ বসে বসে হজমী মদ খাচ্ছে। ভুরু পাকিয়ে তেসাকে একবার দেখে নিয়ে সে বলল, 'দেশের চরম দুর্ভাগ্য যে রেনোর হাতে ক্ষমতা এসেছে। কিন্তু আমি নিজের জায়গা ছাড়ব না ঠিক করেছি। একেবারে শেষ পর্যন্ত ধরে থাকব।'

দালাদিএর কাছে এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানা গেল না। তখন তেসা ঠিক করল যে ব্রতেইর সঙ্গে দেখা করবে। ও-ই হচ্ছে আগামী দিনের মানুষ। ব্রতেই যদি তাকে বিপক্ষে যেতে বলে তাহলে সে মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেবে। অপেক্ষা করার আর নাগরিক শৌর্য দেখানোর কায়দাটা জানতে হবে তাকে।

ব্রতেইর পড়ার ঘরে এক দীর্ঘ, নীলচক্ষু লোকের সঙ্গে দেখা হল তেসার। সে বলল, 'মার্সাই সম্মেলনের ঠিক আগেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।'

তেসার আবছা মনে পড়ল লোকটা কোলমারের প্রতিনিধি, ফজেকে বক্তৃতা দিতে যে বাধা দিয়েছিল। 'নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈকি,' বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে তেসা বলল।

বাইস চলে যাবার পর ব্রতৈই তেসাকে বলল, 'র‍্যাডিকালদের আমার কাছে আসতে দেখে অবাক হয়ে যেও না। জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলছি আমরা। ভাইস গ্রুদেলের সঙ্গে কাজ করছে। মোটামুটি আমার মনে হয়, কাজগুলো নেহাৎ মন্দ এগুচ্ছে না।'

ব্রতৈইর গলার স্বরে কোনো রকম অস্পষ্টতা বা দ্বিধা নেই। তেসা হক্‌চকিয়ে গেল, বলল, 'আমার মতে অবস্থা খুবই খারাপ। ফিনরা ডুবিয়ে দিয়েছে আমাদের। আর রেনো......ও লোকটা সব কিছু করতে পারে।'

ব্রতৈই বলল, 'আমিও যে লোকটাকে খুব পছন্দ করি তা নয়। ও তো ইংল্যাণ্ডের হাতের পুতুল। ও ডোমিনিয়নের আওতায় নিয়ে যেতে চায় আমাদের। কিন্তু লোকটার আসলে কোনো স্থিতি নেই। গ্রীষ্মকাল পর্যন্তও টিকতে পারবে না। ইতিমধ্যে ওকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। গামল্যাঁকে হটিয়ে দেবে ও, তাতে সুবিধে হবে আমাদের। আমরা পিকারকে তুলে ধরব। তাছাড়াও কথা আছে। বামনটা রণ-পা লাগিয়ে মস্ত লম্বা হয়ে উঠেছে। এবার লোককে তাক লাগাবার মতো একটা কিছু করতে হবে ওকে। কিন্তু লাফ দিতে গেলেই ওর পতন অনিবার্য।'

'আমাকে মন্ত্রীপদ দিতে চেয়েছে। ভাবছি রাজি হব না।'

'এমন কাজও কোরো না! দেশের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে তোমাকে। মন্ত্রীসভায় আমাদের একজন লোক অবশ্যই থাকা দরকার।'

কথাটা তেসাকে দু-বার বলতে হল না, রাজি হবার জন্যেই সে তৈরি। যাক্‌, এবার তাহলে রেনোর সঙ্গেই কাজ করবে সে। এতে সে বামপন্থীদের সুনজর অনেকখানি ফিরে পাবে। দক্ষিণপন্থীদের সম্বন্ধে আশংকা ছিল তার। কিন্তু স্বয়ং ব্রতৈইর মুখ থেকেই তো অনুমোদন পাওয়া গেল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, মন্ত্রিসভায় থাকবে বৈকি! মন্ত্রী হবার মতো সুখ আর কি আছে। আর এ-সমস্ত টানাপোড়েনের চেয়েও অনেক বেশি সম্মানের কথাটা হচ্ছে এই যে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করবে যে যুদ্ধের সময়ে তেসা তার দায়িত্ব ফেলে পালায়নি।

নতুন গভর্নমেণ্টের মন্ত্রীদের তালিকা জোলিওর হাতে আসতে সে চিৎকার জুড়ে দিল, 'ভাব দেখি একবার কী কাণ্ড! তিরিশজন মন্ত্রীর মধ্যে ষোলজনই হচ্ছে উকিল। এই বুঝি যুদ্ধ-মন্ত্রীসভা!'

সংবাদদাতাদের তার এল। খবর পড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে জোলিও বলে উঠল, 'সর্বনাশ! এট্‌না আবার আগুন ওগ্‌রাতে শুরু করেছে! তার মানে, ভীষণ একটা কিছু অমঙ্গলের ব্যাপার ঘটবে। ওরা অভিযোগ করছে যে ফিনল্যাণ্ডের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার তো ভয় হচ্ছে, মুররা মার্সাইএ এসে পড়বে।'

মুদ্রাকর পোয়ারিএ মানচিত্র ছাপাবার অর্ডার পেয়েছিল, সেগুলো দিতে গেলে সেনাবাহিনীর সদর-দপ্তরের কর্তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফিনল্যাণ্ডের মানচিত্র আমাদের কী দরকার?'

অবশ্য মানচিত্রের দাম দিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

তিন সপ্তাহ কাটল। একদিন ভোরবেলা জোলিও শুনল নরওয়ে উপকূলে মাইন পাতা হচ্ছে। তক্ষুনি টেলিফোনে পোয়ারিএকে ডেকে বলল, 'আরেকটা অর্ডার পাওয়ায় অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। মেরু দেশের ভাল্লুকদের সঙ্গে আলাপ করতে চায় রেনো।

এখন নরওয়ের মানচিত্রের দরকার পড়বে ওদের, দেখে নিও। তোমার দামটা কমিও না কিন্তু।'

মঁতিনি জমকালো একটা সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করল—দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে তেসাকে এই প্রথম সম্বর্ধনাজ্ঞাপন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছে ব্রতেই, লাভাল, ফ্লাঁদ্যা গ্র'দেল, মিয়েজার ও জেনারেল পিকার।

মহিলারা আলোচনা করছে ছুটিতে বেড়াতে যাবার পক্ষে কোন্ জায়গাটা ভাল তাই নিয়ে। মাদাম পিকার্ ব্রিয়াঁক'র পক্ষে।

'জানি, জায়গাটা ইতালীয় সীমান্তের কাছে।' সে বলল, 'কিন্তু আমার স্বামী বলেন, মুসোলিনী কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। এই ভয়ংকর যুদ্ধ থেকে দূরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চাই আমি। ও জায়গাটা আশ্চর্য রকমের নিরিবিলি আর শান্ত।'

মাদাম মিয়েজার বলল, সে বিয়ারিৎস-এ কয়েক সপ্তাহ কাটাতে চায়। ওখানকার লোকগুলো কী চমৎকার। তাছাড়া আটলাণ্টিককে সে ভালবাসে।

মুশ্ কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করল সবাই। মুশ্ বলল, 'উনি তো চান আমি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে বিশ্রাম নিই। কিন্তু জানি না......' সুইজারল্যাণ্ডের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল, টুরিস্ট্‌দের চড়া গলার হাসি, কিলমানের ঘাড়, গরুর গলায় বাঁধা ঘন্টার টুং-টুং শব্দ—সবই একে একে মনে পড়ছে মুশের। মনে পড়ছে তার পরের সেই ঘটনাগুলো যে জন্যে তাকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। লুসিয়ঁর সেই বন্য আচরণ ও হিংস্র মুখ।

অবিশ্বাস্য রকমের নিচু করে কাটা পোশাক থেকে বেরিয়ে-থাকা নগ্ন কাঁধ দুটোয় পাউডারের পুরু প্রলেপ দিয়ে মাদাম মঁতিনি অতিথিদের তদারক করছে : 'মঙ্গলবার একটা ভয়ানক দিন—মাংস নেই, মিষ্টি কেক নেই, মদ নেই। ভাগ্যিস, ফরাসীরা অত খুঁতখুঁতে নয়। জেনারেল, এই আর্মাঞাক্‌টা একটিবার খেয়ে দেখুন। আমার ভাইয়ের ভাঁটিখানার মদ। কি এত ভাবছেন বলুন তো ?'

'না, না, কিছু নয়। হ্যাঁ, এই আর্মাঞাক্‌টা খাসা।'

'কোনো খবর আছে ?'

'খুশি হবার মতো কিছু নয়। মানে যুদ্ধের কথা বলছি।' জেনারেল দীর্ঘশ্বাস ফেলল, শুনছি যে বার্জেন-অস্‌লো রোড যাতে হাতছাড়া না হয় সেজন্য প্রতিরোধ করা হবে। কিন্তু জার্মানরা কোনো বাধাই মানছে না। উত্তরাঞ্চল বাদে আর কিছু বাকি নেই। অবস্থা......'

শেষ কথাটা কানে গিয়েছিল তেসার, সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিল, 'অবস্থা যে আগের চেয়ে ভালো সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমার আশা ছিল বেশির ভাগ ভোট আমরাই পাব—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি চেম্বারের সর্বসম্মত ভোট আমাকে অবাক করে দিয়েছে। রাজনৈতিক বিচারে কতখানি পরিণত হলে এমনটি হতে পারে বলুন তো! আজ আমরা সারা ফ্রান্সের প্রতিনিধি—তাই নয় কি জেনারেল ?'

বার্জেন আর পাহাড়ী খালের কথা বলতে শুরু করল পিকার। তেসা রীতিমতো ভঙ্গিসহকারে হাত নেড়ে বলল, 'ওসব কথা রাখুন—ওসব হল খুঁটিনাটির ব্যাপার!'

পিকারের কথা শুনে তেসা বিরক্ত হয়েছে। লোকটার মধ্যে কেমন একটা সৈনিকসুলভ অন্ধতা আছে। আরে বাপু, এটুকু তো স্বীকার করতে হবে যে জার্মানরা যে-সব অঞ্চল

দখল করেছে তা এমন কিছু উল্লেখ করার মতো নয়। খানিকটা বুনো হা-ঘরে এলাকা। নিতান্ত মাথাখারাপ না হলে কেউ মরুভূমির সূর্যকে তারিফ করার জন্যে ওসব অঞ্চলে যায় না। সুখের বিষয় যে জার্মানরা টোপ গিলেছে। আর তার ফল হয়েছে এই যে ফ্রান্সের সীমান্ত থেকে অনেকটা দূরে ঠেলে দেওয়া গিয়েছে ওদের।

সে বলল, 'নরওয়ের ব্যাপার নিয়ে প্যাঁচ কষা—এটা হচ্ছে একটা বৃটিশ চাল। এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যাড্‌মিরাল দার্ল্যাঁ তো রীতিমতো অসন্তুষ্ট হয়েছেন। উনি বলছেন এর চেয়ে হিটলার আসা অনেক ভালো।'

আকর্ণ হেসে ব্রতৈই বলল, 'বৃটিশদের কথা বলছ! ১৯১৬ সালে সম্-এ দেখেছিলাম তাদের। রোজ সকালে ট্রেঞ্চে বসে বসে দাড়ি কামাত। উত্তরের তুন্দ্রা অঞ্চলে ওরা কি করে একবার দেখতে চাই।'

অতিথিরা একসঙ্গে সায় জানাল : 'বসে বসে ওরা ওদের প্রিয়খাদ্য কডমাছ খাবে।' 'কিংবা কডমাছ খাবে ওদের।' 'রেনো কী ভয়ই না পেয়েছিল!' 'সত্যি, ক্ষুদে ভাল্লুকটার সময় বিশেষ সুবিধের যাচ্ছে না। আমার তো ধারণা, এমন কি অস্ট্রেলীয় সরকারও এর চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে।' 'হাঃ, হাঃ, আমাদের অবস্থাটা দেখছি অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারুর মতোই।'

সরকারের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ানো নিজের কর্তব্য বলে মনে করল তেসা। বলল, 'রেনো যে ইংরেজভক্ত আর উঁচকপালে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কাউন্টেস এলেন দ্য পর্ৎ অত্যন্ত চতুর মহিলা। তিনি পুরুষমানুষের কাছে প্রেরণা ও সহায়তার প্রতীক। আমি অবশ্য কাউন্টেসের বন্ধু বোদুয়ার মারফত কাজকর্ম করি।'

কে একজন মন্তব্য করল, 'অপরের রক্ষিতার প্রেমিক!'

তেসা বলে চলল, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে ব্রতৈই ও লাভাল মন্ত্রিসভায় নেই। কিন্তু এ-বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে নরওয়ের ব্যাপারে আমরা কোনো দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি না। আমিই প্রথমে ফিনল্যান্ডকে সাহায্য করার কথা বলেছিলাম। দুর্বলকে সাহায্য করতে ফ্রান্স সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু নরওয়ের ভাগ্যে কি ঘটবে তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। ওটা জার্মান আর ইংরেজদের মধ্যে একটা ঝগড়ার ব্যাপার। চার্চিল গিয়ে গন্ডগোলটা মেটাক। আমাদের দেশের আঞ্চলিক নিরাপত্তার দিক থেকে যদি বিচার করতে হয় তাহলে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে আচমকা কিছু ঘটা সম্ভব নয়। হল্যান্ডের পথ দিয়ে জার্মানরা এগোতে পারবে না কারণ ডাচরা বাঁধগুলো খুলে দেবে। ওরা পরীক্ষা করেছিল, চমৎকার উতরেছে পরীক্ষাটা। আর বেলজিয়ান প্রতিরোধ ব্যবস্থা তো ম্যাজিনো লাইনের মতোই মজবুত। অবশ্য বিমান ও ট্যাঙ্কের দিক থেকে জার্মানদের ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি—কিন্তু তাই বলে এতটা বেশি নয় যে প্রয়োজন মিটতে পারে। জেনারেল লেরিদো বলেন যে জবরদস্ত আক্রমণ করতে হলে আমাদের একটা বন্দুকের মুখোমুখি জার্মানদের ছটা বন্দুক খাড়া করতে হবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ওদের কোনো আশা নেই।'

মিয়েজার বলল, 'আসল বিপদটা দেশের ভেতরেই। কমিউনিস্টরা আবার মাথা তুলছে। কুরনাভের ধর্মঘটটা ছড়াতে পারে। ওদের ইস্তাহারগুলো পড়ে দেখুন। এই যে, পড়ে দেখুন এগুলো।'

'অসহ্য!'

'ডেপুটিদের গুলি করে মারাই ভালো ছিল।'

'ওদের কিন্তু নিজেদের পক্ষে প্রচারের খুব একটা সহজ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গ্রুজে যে বক্তৃতা দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করছে সকলে।'

'কোর্টে হাজির করাটাই ভুল হয়েছে। আমি দালাদিএ-কে একথা বলেছিলাম। দেশ-দ্রোহিতার অপরাধে ওদের বিনাবিচারে আটক রাখা উচিত ছিল।'

তেসা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আইন আমাদের মেনে চলতেই হবে। আর বিচারের রায় কী হয়েছে দেখুন—দুই বা তিন বছরের কারাবাস। কার সাধ্য তা আটকায়! রেনোর বুদ্ধিশুদ্ধি এখনো পাকেনি। আর মাঁদেল অন্ধ হিটলার-বিরোধী। ওর সম্পর্কে ভয়ের কথা এই যে গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে ও লোককে একেবারে মাতিয়ে তুলতে পারে। কমিউনের প্রতিনিধি হবার তালে রয়েছে ও। আমি সেরলের সহযোগিতা পাব আশা করছি। লোকটা সমাজতন্ত্রী কিন্তু খাসা লোক। ভাগ্যিস, ওকে আইন বিভাগের মন্ত্রীপদ দেওয়া হয়েছে। ও তো খোলাখুলি বলে যে মস্কোর মড়ককে গরম লোহার ছেঁকা দিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।'

এক প্লাশ আর্মাঞাক্ মদ খেল তেসা। মনটা ভার-ভার লাগছে। মনে পড়ছে দেনিসের কথা। দেনিসও তো গুলি খেয়ে মরতে পারে! কিন্তু সংগে সংগে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার সমস্ত কিছু ভুলে থাকতে চাইল আর মনের জোর ফিরিয়ে আনল। অতিথিরা তাকে তারিফ করে কথাবার্তা বলছে আর তা শুনে সে চাংগা হয়ে ওঠে। চিনির ডেলা তুলবার চিমটে হাতে নিয়ে গোল টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে তেসা। ভাবে, রাষ্ট্রের হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ততক্ষণে পিকার সকলের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। জেনারেল গর্ সম্পর্কে নানা রকম গল্প বলছে সে।

যোসেফিন মর্তিনি তেসার কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'লুসিয়ঁ কোথায়?'

তেসা হক্চকিয়ে গেল। এই প্রথম কেউ তাকে তার ছেলের খবর জিজ্ঞেস করছে। কিছু না ভেবেই সে জবাব দিল, 'ওর কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।' কিন্তু সংগে সংগেই বুঝল যে জবাবটা তেমন স্পষ্ট হয়নি, তাই নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'হয়তো মারাই গেছে। বেচরী লুসিয়ঁ!' তেসার গলা কেঁপে উঠল।

যোসেফিন মর্তিনি এত বিচলিত হল যে কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। তেসাও বুঝল তার চোখে জল জমেছে, তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে পাখির মতো নাক ঝাড়ল।

মর্তিনি তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে সামলে নিল তেসা। এভাবে ভেঙে পড়া ঠিক নয়। ক্লেমসোর মত দৃঢ় হতে হবে তাকে।

সে বলল, 'হিটলার আরেকটা ভুল করেছে। জল-গণ্ডারদের সংগে লড়তে চলেছে ও। ইতিমধ্যে আমরা নিজেদের কাজ করে যাব। দালাদিএ স্থির করেছে, ফৌজ থেকে পাঁচ লাখ চাষীকে রেহাই দেবে। চাষবাস করতে হবে আমাদের। রুটি না খেয়ে বাঁচতে পারি না আমরা। দুকান আর ফুজের যত খুশি দাঁতকপাটি লাগুক। পৃথিবীকে আমরা দেখিয়ে দেব যে ফরাসীদের সহ্যশক্তি কতখানি।'

মর্তিনি মাথা নাড়িয়ে সায় জানাল। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক বটে। তারপর তেসাকে জড়িয়ে ধরে সবাই শুনতে পায় এমনভাবে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'পোয়াতুতে জমি কিনে কাজের কাজ করেছেন আপনি। জায়গাটা সীমান্ত থেকে অনেক দূরে, ফ্রান্সের ঠিক মধ্যিখানটিতে। আমার জমিটা সাভরতে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভয়

পাচ্ছি। জানেন তো, ইতালীয়ানরা বড়ো একরোখা জাত! কিন্তু এ-ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। পোয়াতুতে কেউ কখনো আসবে না। আমি ব্রতেইকে সব সময়ে একটা কথা বলে আসছি যে আপনার মন খাঁটি রাজনীতিজ্ঞের মন।'

পনের

দালাদিএর গদি রেনো পেয়েছে, খবরটা পেয়ে মিয়েজার গ্রঁদেলকে বলল, 'পয়লা মের মধ্যে একশো আশিটা বোমারু ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু অবস্থা বদলেছে এখন। মন্ত্রীমশাইকে বলবেন, বোমারুগুলো আরো ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার।'

গ্রঁদেল হেসে বলল, 'বুঝেছি। রেনো লোকটার কোনো কান্ডজ্ঞান নেই, যা খুশি করে বসতে পারে। সত্যিকারের একটা যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে বিচিত্র নয়। শাস্যর আর্লাপিনকে নারভিক্-এ পাঠাবার দরকারটা কী ছিল? আশা করি লোকটাকে শিগরিরই ভাগিয়ে দেওয়া হবে। ভালোমতো একটা হার হওয়াই যথেষ্ট। জার্মানরা উঠে-পড়ে লেগেছে। গুজব উঠেছে ও নাকি দেসেরকে অভিনন্দন জানিয়েছে। খুব ভাল লক্ষণ, দেসেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কোন সুবিধে হবে না ওর।'

দেসের আজকাল হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে-দেসের অল্প কিছুকাল আগেও ছিল সর্বশক্তিমান। ব্যঙ্গ-চিত্রকররা তার ছবি এঁকে বেশ দু পয়সা কামাচ্ছে। ব্রতেই জোলিওকে নির্দেশ দিয়েছে, 'ও যে একটা আন্তর্জাতিক বণিক, কামান-ব্যবসায়ী আর স্বেচ্ছাচারী—একথাটা অনবরত প্রচার করতে থাক। অবিশ্যি ও চায় যে জয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হোক। তুমি যত ইচ্ছে ওর দুর্নাম রটাতে পার। তেস্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সেন্সার তাতে বাধা দেবে না।'

মঁতিনিও জোলিওকে দেসেরের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করতে বলল।

প্রতিবাদ জানাল ক্ষুদে সম্পাদকটি : 'রাজনীতির ধারাকে বদলানো চলে, তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আমার চরম দুঃসময়ে দেসের আমাকে সাহায্য করেছে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে বেইমানি করাটা কি জিনিস তা আপনি জানেন। আর তা ছাড়া লোকটা সৎ। অবশ্য ও মার্সাই-এর লোক নয়, কিন্তু মার্সাইকে ভালবাসে। মার্সাইয়ের জেলেদের সঙ্গে ও যেভাবে কথা বলে তা আমি শুনেছি। লোকটা খাঁটি ফরাসী। আর এখন আমাকে কিনা লিখতে হবে যে ও একজন অস্ট্রীয় ইহুদি, আমেরিকানদের দালাল।'

আগেকার দিনে দেসেরের আসন ছিল বড়ো বেশি উঁচুতে। টলটলায়মান অবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে ধরে নিল যে তার পতনের আর বাকি নেই। লোকে বলতে লাগল, লোকটা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, যদিও এখনো সমস্ত কারখানা ও শেয়ারসম্পত্তি তার হাতে। তার কাজকর্ম কেমন চলছে সে-সম্পর্কে একবার খোঁজ নেবার দরকার আছে বলেও কেউ মনে করল না। 'সিয়েন' কারখানার ইঞ্জিনিয়াররা বলল, 'বার্ষিক সভা বসার

আগে পর্যন্ত ও কোনরকমে টেনেহিঁচড়ে চালিয়ে নেবে।' এমন কি, বাগানের পুরনো মালীর মনেও মনিবের অর্থসংগতি সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ায় সে মাইনেটা আগাম চেয়ে বসল।

দেসেরের মদের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মানুষের সংগে সে আর কোনো সংশ্রব র‍্যাখে না, বুকের ব্যথাটার কথাও জেনেতের কাছে কিছু বলেনি। বন্ধুদের সংগে দেখা হলে ঠাট্টা করে বলে, 'শোনো হে অমার পরিচয়টা শুনে যাও। আমি হচ্ছি একজন অস্ট্রীয় ইহুদী যার মালী আগাম মাইনে চায়।' যাদের সংগে কথা বলতে যায় তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার মুখের দিকে তাকাতে ভয় করে। রোগ আর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ছিল তার মুখের ওপর, আর এখন মুখটা হয়ে উঠেছে কেমন থলথলে আর কদাকার।

লোকটাকে দেখে জেনেতের করুণা হয়, প্রায় অসহ্য রকমের একটা করুণা। এই মনোভাবের মধ্যে একটা হীনতা আছে যা দুজনকেই ছোট করে। একাধিকবার জেনেৎ জোর করে নিজের মধ্যে রাগ জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে, দেসেরকে কড়া কড়া কথা বলতে চেয়েছে যাতে দেসের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার মতো মেজাজ ফিরে পায়। কিন্তু দেসের শুধু ঘাড় তুলে বুড়ো কুকুরের মতো নিরীহ ও ম্লান চোখে তাকিয়ে থাকে। তখন জেনেৎ দেসেরের গলা জড়িয়ে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে। দেসের জবাব দেয়, 'জেনেৎ!' মন্ত্রোচ্চারণের মত ফিসফিস করে বলে কথাটা যেন জেনেৎ-ই তাকে বাঁচাবে। সে জানে, একমাত্র জেনেতের জন্যেই জীবনের সংগে তার যোগ রয়েছে। মৃত্যুকে আগের চেয়েও বেশি ভয় করে—মৃত্যুর যন্ত্রণাকে নয়, শূন্যতাকে। কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, না ভালো,. না মন্দ। কথাটা ভাবলেই চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। অনেক সময় দেসেরের মনে হয়, সে জেনেতের সর্বনাশ করছে। তখন প্রতিজ্ঞা করে যে জেনেতের সংগে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। কয়েক সপ্তাহ টিকেও থাকে প্রতিজ্ঞাটা। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে টেলিফোন করে বসে জেনেৎকে, উদভ্রান্তের মতো গিয়ে হাজির হয় তার কাছে। জিজ্ঞেস করে, 'আসতে পারি?' জেনেৎ তার রুক্ষ সাদা চুলে হাত বুলোয়, জেনেতের বড়ো বড়ো বিহ্বল চোখ ছাপিয়ে জল গড়াতে থাকে।

পয়লা মে কার্লতঁ বার-এ ঢুকতে গিয়ে ম্যিয়েজারের সংগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দেসেরের।

ম্যিয়জার বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি অসুস্থ?'

'না, না, ভালোই আছি।'

'আসল কথা হল স্বাস্থ্য, বিশেষ করে আমাদের বয়সে। জান, আজকের দিনটা কি? আজ পয়লা মে। কিন্তু কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না দিনটা নিয়ে। মনে আছে গত বছর কী দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়েই না আমরা কাটিয়েছিলাম! ভয় ছিল ধর্মঘট হবে, মিছিল বার হবে। কিন্তু এখন দিনটা সপ্তাহের অন্য যে কোনো দিনের মতই। নিখাদ মন্দ বলে কিছু নেই, তার মধ্যে কিছু না কিছু ভালো থাকবেই। ঠিক না?' দেসেরকে 'কমিউ-নিস্ট' বলে বলে, ম্যিয়েজার এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে সে নিজের রটনাতেই নিজে বিশ্বাস করতে শুরু করছে। কিন্তু দেসের অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'সত্যি, চারদিক বেশ শান্ত। মনে হচ্ছে আমি নিজেও বেশ থিতিয়ে গেছি।'

রাস্তায় একটি মেয়ে ফুল-বিক্রি করতে করতে তার কাছে থামল। বলল, 'লিলি অফ দি ভ্যালি কিনুন। আনা দশেক দাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে আপনার।'

মেয়েটি শিখরীদশনা, ভীত সন্ত্রস্ত চোখ। দেসের এক গোছা আধ-ফোটা ফুল

কিনল। ফুলগুলি কি তার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে? না, তা নয়! চোখের সামনে ভেসে উঠল মিয়েজারের হাসি, ফুলউলী মেয়ের চোখ আর জেনেৎ। পালাবার পথ নেই। সবাইকে প্রাণ দিতে হবে। কারা? জেনেৎ, সে নিজে, প্রত্যেকটি মানুষ...কাছাকাছি একটা বার-এ গিয়ে অধৈর্য হয়ে কোনিয়াক মদ খেল সে। রেডিওটা চিৎকার করে চলেছে :

'এই নদীটির ধারে কোথাও সুখ হয়তো আছে
কিন্তু সে সুখ যায় ভেসে যায় চঞ্চল তার স্রোতে।'

এক সপ্তাহ পরে জেনেতের সঙ্গে দেখা হল দেসেরের। জেনেৎ তাকে লক্ষ্য না করে চলে যাচ্ছিল। যেতে যেতে হাসছিল। দেসের বুঝল তাকে ছাড়াই জেনেৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ-ব্যাপারটায় এবার ছেদ টানা দরকার।

প্রায়ই সে জেনেৎকে বাসা পরিবর্তন করতে বলেছে কিন্তু জেনেৎ রাজী হয়নি। জেনেৎ এখনো থাকে রু বোনাপার্তের সেই ছোট্ট পুরনো হোটেলে। হোটেলের পাউডার-মাখা মোটা বাড়িউলীকে দেসের ভালো করেই জানে। আর জানে অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়িটা যেটা দিয়ে প্রায়ই তাকে ওপরে উঠতে হয়েছে, উঠতে উঠতে হাঁপিয়েছে আর প্রতি পদে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। যাতায়াতের পথে পায়খানা, সস্তা সুগন্ধী আর রান্নার গন্ধ। জেনেতের কামরাটা সরু আর লম্বা। তাকের ওপর দাফ্‌নিস-এর একটা নোংরা ব্রোঞ্জ মূর্তি; মূর্তিটা গত পঞ্চাশ বছর ধরে ক্লো-কে চুমু দিচ্ছে। কারা থাকত আগে ওখানে? মশালিগ্সু কোনো শিল্পী? ফোলি বের্জেরের এক সুন্দরীর প্রেমে পাগল কোনো হিসেব-রক্ষক? চুলে প্লাস্টার দেওয়া আর বাহারে টাই-পরা কোনো কুদর্শন লোক? কিংবা অনুমতিপত্রহীন কোনো জার্মান উদ্বাস্তু? ঐ গুমোট আর বিশ্রী ঘরে নিঃসঙ্গতা যেন ক্রমেই ভারী হতে থাকে আর আত্মার ওপরে চেপে বসে।

দেসের শান্তভাবে জেনেৎকে বলল, 'আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ এবার থেকে বন্ধ হোক।' ঠিক এই কথাগুলো বলবে বলেই তৈরি হয়ে এসেছিল। ভয় ছিল, জেনেৎ হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'কেন?' কিংবা তার দিকে এমনভাবে তাকাবে যে সে আর নিজেকে সামলাতে পারবে না। কিন্তু জেনেৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।' মনে মনে ভাবল, 'কোনো সঞ্চয়ই আর নেই, এমন কি মনকে চোখ ঠারার সঞ্চয়টুকু পর্যন্ত নয়!' যাক্, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে! আর দেসের নিজের স্থিরতায় নিজেই অবাক হয়ে গেল : এই তো মৃত্যু, কিন্তু যতটা ভয়াবহ মনে করেছিল ততটা তো নয়।

মে মাসের উষ্ণ রাত্রি। অন্ধকার শহরের ওপর ঝিকমিক করছে তারাগুলো। বাদাম গাছের পাতাগুলো থেকে ঝর-ঝর শব্দ হচ্ছে। কাছাকাছি যে গীর্জাটা রয়েছে তার ঘড়িতে সিকি-ঘন্টার ধ্বনিটা নির্ভুলভাবে বেজে উঠল।

'এ রাত প্রেমিক-প্রেমিকাদের রাত', দেসের হেসে বলল। জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'প্রেমিক-প্রেমিকা বলে কিছু নেই। আছে শুধু তারা, গাছপালা আর কবিতা। দেসের, তুমি আর আমি দুজনেই বুড়িয়ে গেছি।' জেনেৎ বলল।

'তোমার জীবন এখনো শুরু হয়নি। পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি। আর আমি বাধা দেব না। আর আমি তোমার পথের কাঁটা হব না—আর আমি বাঁচতে চাই না......'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষের কথাগুলি মুখে দিয়ে বেরিয়ে এল। নিজের ওপর রাগ হল তার : এবার জেনেৎ করুণা করবে তাকে। ভাববে, অনুনয়-বিনয় করছে সে। দেসের

কখনো ভুলে যায়নি যে পয়সা দিয়ে ভালবাসা কেনা যায় না। কিন্তু এ ভুলও তার যেন না হয় যে চোখের জল ফেলে জেনেৎকে পাওয়া যেতে পারে। দেসেরের ভাবাবেগকে লক্ষ্য না করে জেনেৎ বলল, 'আমিও বাঁচতে চাই না। এক সময়ে বাঁচতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি। তোমার ব্যাপারটা কি?'

'মৃত্যুকে আমি ভয় পাই। অর্থাৎ, মৃত্যু কি জিনিস আমি বুঝি না।'

দেসের চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় বিমান-বিধ্বংসী কামান গর্জে উঠল। এ যেন একপাল শিকারী কুকুর বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে অনবরত শুধু গুজরাচ্ছে। নরম মখমলের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে সার্চলাইটের আলো। সাইরেনগুলোর উন্মত্ত আর্তনাদে কি যেন একটা জীবন্ত ও হিংস্র ককানি।

'কী ব্যাপার?' জেনেৎ জিজ্ঞেস করল।

'খুব সম্ভবত এই হচ্ছে শুরু। এটা বসন্তকাল। একটু আগে তোমাকে বলছিলাম এ-রাত প্রেমিক-প্রেমিকাদের রাত। ওরা ভেবেছিল জার্মানরা বসে বসে অপেক্ষা করবে। মিয়েজার খুশি হয়েই আমাকে বলেছিল, দেখেছ, কেমন শান্ত! অন্ধকারের জীব যত সব! না, তারও অধম। ওরা বিশ্বাসঘাতক। যাই হোক, কিছুই যায় আসে না.........
জেনেৎ, তুমি কি বলতে চাও যে সত্যিই তুমি মৃত্যুকে একেবারেই ভয় পাও না?'

'না, পাই না।' স্থির ও প্রায় ভাবাবেগশূন্য গলায় জবাব দিল জেনেৎ।

কামানগুলো সমানে গর্জে চলেছে।

এক সময় বিমান-আক্রমণের সংকেত শেষ হল। জানলার ধারে একটা আর্ম-চেয়ারে বসল দেসের; জেনেৎকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছে সকাল পর্যন্ত সে এখানে থাকতে পারে কিনা। সরল ও ক্ষুদ্র আওয়াজ তুলে পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হল। ঘরের মধ্যে সূর্যের তেরছা আলো, লম্বা লম্বা ছায়া আর ঠাণ্ডা বাতাস। সবজি-বোঝাই গাড়িগুলো বাজার-মুখো চলে গেল। তারপর গেল এক গয়লানী। দেসেরের মনে হল যেন কিছুই ঘটেনি—রাত্রের বিমান-আক্রমণের সংকেত, দুজনের কাছে দুজনের মন খুলে ধরার চেষ্টা, কিছুই নয়। জেনেতের দিকে সে তাকাল। জেনেৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। জেনেতের মুখখানা শান্ত আর নির্লিপ্ত। দেসের ভাবল, চোখ বুজে থাকলে জেনেৎকে খুবই সাধারণ দেখায়। জেনেতের ঘুম ভেঙে গেল, যেন ঘুমের মধ্যেই সে দেসেরের চিন্তাটাকে ধরতে পেরেছে। চোখ মেলে তাকাল দেসেরের দিকে। মুখ ফিরিয়ে নিল দেসের।

'সুপ্রভাত, দেসের।' খুশিভরা স্বরে জেনেৎ বলল।

হয়তো জেনেৎ ভুলে গেছে সব কিছু। স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাসির শব্দ আসছে রাস্তা থেকে।

'যদি বেহেমথ তম্বি করে তাহলে নির্ঘাত গণ্ডগোল বেধে যাবে একটা।' একজন বলল। 'চৌবাচ্চার অঙ্কটা করতে হবে আমাকে।' আরেকজন বলল, 'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমরা—মৃত্যুর চুম্বন।'

তারপর রেডিওতে শোনা গেল সংবাদঘোষকের নাকী সুর : 'তৃতীয় ঘণ্টাধ্বনিতে ঠিক সাতটা বেজে এক মিনিট হবে। এবার আমরা সকালের খবর বলব। গত রাত্রে জার্মান সৈন্যবাহিনী হল্যান্ড ও বেলজিয়ামে প্রবেশ করেছে.......'

জেনেৎ চিৎকার করে জানলার দিকে ছুটে গেল। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে খবর শুনছিল : 'ডাচ্ অঞ্চলে প্যারাসুট বাহিনী নেমেছে.........'

স্ত্রীলোকটির হাতে একটা ঝুড়ি ছিল, সেটা পড়ে গেল মাটিতে, ঝুড়ির ভেতরকার ফ্যাকাশে গোলাপী স্ট্রবেরীগুলো ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়।

জেনেতের দিকে তাকাল দেসের, বলল, 'আমি তোমাকে বলিনি যে এই হচ্ছে শুরু।'

রাস্তায় খবরের কাগজের কিয়স্কে ভিড় জমেছে—শ্রমিক, দোকানদার, স্ত্রীলোক—সবাই আলোচনা করছে খবরটা নিয়ে।

'ঠিক সেই ১৯১৪ সালের অবস্থা...ওরা এখানেও হাজির হতে পারে......'

'তাহলে এখানেই ওদের আটকা পড়তে হবে। ধরো হল্যান্ড পর্যন্ত ওরা নিয়ে নিল। কিন্তু তারপর? এতে আমাদেরই সুবিধে।'

'খবরের কাগজে তো খুব লেখা হয়েছিল যে আক্রমণ হলে ডাচরা নাকি গোটা দেশটাকে জলে ভাসিয়ে দেবে.........'

'খবরের কাগজের লেখার কোনো দাম নেই। পয়সা পায় তাই লেখে। কিন্তু জার্মানরা প্যারাস্যুটে একেবারে সাঁজ-দ্য-মার-এ নামতে পারে...'

দেসের শব্দ করে জানলাটা বন্ধ করে দিল। 'এই যে লোকগুলো কথা বলছে এদের মধ্যে অনেককেই মিথ্যে কথা বলে ভোলানো হয়েছে!' সে আর্ম-চেয়ারে এসে বসল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, হাত আর কাঁধ দুটো টনটন করছে। 'জেনেৎ, আমার দিকে তাকাও। তোমার চোখ দেখে ভয় পাই আমি...তাকাও আমার দিকে! ভাল করে তাকাও! আমিও লোককে ভুলিয়েছি। হয়তো অন্যের চেয়েও বেশী! আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম... কাকে? কাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম? তেসাকে? এই তার শাস্তি। জানি না আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে। হিটলার আসবে। তারপর আর ফ্রান্স বলে কিছু থাকবে না। পিয়ের ঠিক কথাই বলেছিল—চুকিয়ে দাও সব জঞ্জাল। আমি মরে গেছি। কিন্তু আমার বদলে ওরা পিয়েরকে খুন করেছে। জেনেৎ, তোমাকে যেন ওরা খুন না করতে পারে! এবার বিদায়! দেখেছ, আমাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কি জিনিস এসে মিলেছে! থিয়েটারে ঠিক এমনটি ঘটে আর তার ফলও পাওয়া যায়। বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সরল.....তবে খুবই ভয়াবহ।'

শুকনো ঠান্ডা গলায় কথা বলছে দেসের, কথা আটকে যাচ্ছে বারবার। তারপর টুপিটা মাথায় দিয়ে দরজা পর্যন্ত এসে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল জেনেতের হাতে। দেসের যে কতখানি বিচলিত, কতখানি অসুস্থ আর কতখানি হতাশাগ্রস্ত তার সবটুকু ফুটে উঠল এই চুমুর মধ্যে, বাঁকানো পিঠের ভঙ্গিতে, হাতের কাঁপুনিতে।

'জেনেৎ, তোমার জন্যে আমি একটি পাশপোর্ট আর ভিসা যোগাড় করে দেব। চলে যাও এ-জায়গা ছেড়ে। আমেরিকায় চলে যাও।'

জেনেৎ মাথা নাড়ল। না, সে বড় ক্লান্ত। একটা করুণার ঢেউ তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে, অসহ্য একটা করুণা। সবার জন্যেই কষ্ট হচ্ছে তার—ডাচদের জন্যে, রাস্তায় যে লোকগুলো এখনো সোরগোল করছে তাদের জন্যে, দেসেরের জন্যে—দেসেরের জন্যেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট। লোকের ধারণা, দেসের সর্বশক্তিমান, কিন্তু জেনেতের চেয়েও দেসের অভাগা। দেসের একটা গোলাম, একটা পুতুল, একটা ছায়া। আর এই প্রথম জেনেৎ দেসেরকে তুই বলে সম্বোধন করল।

'ভাবনা করে শরীর খারাপ করিস নে। এসব দিন কেটে যাবে। দেসের সোনা আমার মণি আমার, এবার তাহলে বিদায়!'

ষোল

মেজর লেরয়ের মুখটা কালো হয়ে উঠেছে। চোয়াল কাঁপছে, যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে সে।

'আমি বুঝতে পারছি না এ-ব্যাপারের সঙ্গে সাঁকোর কি সম্পর্ক?' জেনারেল লোরিদো বলল।

'জেনারেল মোকে তাই বলেছেন......আমি টেলিফোনে কথা বলেছিলাম।'

'এ-ধরনের কথাবার্তার জন্যে সামরিক আদালতে জেনারেল মোকের বিচার হওয়া উচিত। শত্রুপক্ষ সাঁকো থেকে ষাট মাইল দূরে। আমার স্থির ধারণা, আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এ হচ্ছে শত্রুপক্ষের একটা ছল, কারণ আমাদের মূল বাহিনী কাতো-ভেরভ্যাঁর দিক দিয়ে বেলজিয়মে ঢুকেছে। আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক যে এ-অবস্থায় সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে তাই ঘটবে, অর্থাৎ সরাসরি আক্রমণ করা হবে আমাদের। তাহলে মাস্-এ পোঁছুতে জার্মানদের একমাস সময় লাগবে, তাও যদি খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদের পাল্টা আক্রমণের কথাটাও তো রাখতে হবে। সপ্তম বাহিনী অ্যান্টওয়ার্প পোঁছে গেছে। এটা আত্মরক্ষা না আক্রমণ—কী মনে হয় আপনার? যে-সময়ে আক্রমণের ভিত্তিতে সৈন্য চলাচল হচ্ছে তখন একমাত্র নির্বোধরাই সাঁকো উড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। বুঝতে পারলেন আমার কথা? এবার বিড়বিড় করা বন্ধ করুন তো।'

'কিন্তু আমি......'

'আপনি? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গত যুদ্ধে আপনি সমস্ত সময় পারীতে বসে বসে কাটিয়েছেন। প্রথম কথা হল স্থৈর্য। যুদ্ধ এখন একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পোঁছেচে। পোঁছবারই কথা। কিন্তু আমাদের কাজ করে যেতে হবে ঠিক আগের মতোই। এই হল যুদ্ধ জেতার রহস্য। যাক, এখন আজকের কাগজে কি কি খবর আছে বলুন দিকি?' লেরয় নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করল। তারপর খবরের কাগজ থেকে পড়তে লাগল, 'ল ফিগারোর সামরিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন নামুর-অ্যান্টওয়ার্প রণাঙ্গনেই শত্রুপক্ষকে বাধা দেওয়া চলতে পারে।'......তার চোয়ালটা আবার কাঁপছে। 'জেনারেল, জার্মানরা কিন্তু চল্লিশ মাইল দূরে আছে, ষাট মাইল দূরে নয়। ওরা মার্শ অধিকার করেছে।'

'আপনার কথা শুনে যে কোনো লোকের ধারণা হবে যে আপনি একজন অফিসার নন, সামান্য সহকারী মাত্র। প্রথমত, এই রিপোর্টটি সমর্থিত নয়। দ্বিতীয়ত, শত্রুপক্ষ যদি মার্শ পর্যন্ত এসেও থাকে, তাতেও কিছু প্রমাণ হচ্ছে না। আপনি যান। কর্নেলকে একবার পাঠিয়ে দিন।'

লোরিদো একটা বড় মানচিত্র খুলে বসল। ঘরে ঢুকল মোরো তার প্রকৃতিগত বেখেয়াল ভঙ্গিতে। বললে, 'কী চমৎকার দিন! পুকুরগুলো দেখতে গিয়েছিলাম, এইমাত্র ফিরছি। ভারি সুন্দর এ-জায়গাটা—সত্যিই, অদ্ভুত সুন্দর এই জায়গাটা : চারদিকে জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়।

লেরিদো গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। সে বলল, 'গোটা এলাকাটা টুকরো-টুকরো ভাগ হয়ে রয়েছে, খুবই পাকা ব্যবস্থা। কাজেই আতঙ্কগ্রস্ত হওয়াটা বোকামি। দেখুন— নীল পেন্সিল দিয়ে ফ্রন্টলাইন চিহ্নিত করেছি। আপনার খবরের সঙ্গে কি মিলছে?'

বেঁটে লেরিদোর পাশে কর্নেলকে দেখাচ্ছে দৈত্যের মতো। জেনারেলের সঙ্গে কথা বলার সময় তার মধ্যে নিজের সম্পর্কে মশগুল থাকার ভাব আর একটু যেন পিঠ-চাপড়ানি প্রকাশ পায়। সে বলল, 'ফ্রন্টলাইন এটা নয়। আপনি মার্শ লিব্রাম'-এ দাগ কেটেছেন। সে ছিল সকালে, আর এখন হল বিকেল চারটে।'

'আপনি বলতে চান ওরা তারপরেও এগিয়ে আসছে?'

'হু-হু করে এগিয়ে আসছে।'

মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে চোখ বন্ধ করল লেরিদো। গালদুটো হয়ে উঠল লাল আর মাংসল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'তাই যদি হয় তাহলে ওদের পক্ষেই অবস্থাটা আরো বেশি খারাপ হচ্ছে বলতে হবে। বেরিয়ে-আসা মুখটা ক্রমশই বড়ো হচ্ছে কিন্তু এই মুখের দু-দিকেই সৈন্য আছে আমাদের। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে, ওদের দুর্বল জায়গাটা খুঁজে বার করা। জেনারেল পিকারের সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে আমাকে। ভালই হল, আপনি আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের মেজরের তো মাথার ঠিক নেই। মোকেরও সেই দশা। অবস্থাটা এমন কিছু নয় যে সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। কর্নেল, আপনি কি মনে করেন?',

'জেনারেল পিকার রিজার্ভ-ফৌজ দিতে চাইবেন কি না সন্দেহ। যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আপনার অজানা নয়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু অবস্থাটা এখন বদলে গেছে। ওরা এগিয়ে আসছে। আমাদের কিছু না করে উপায় নেই।'

'আমার মনে হয় আমাদের কিছু করবার নেই। ওরা কমসে কম সাতশো ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদিকে আমাদের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল। সাতচল্লিশ মিলিমিটার কামানের উপযুক্ত গোলা আমাদের নেই।'

'ও সব খুঁটিনাটির ব্যাপার। আমাদের সৈন্যরা ফিল্ড্ কামান ব্যবহার করতে পারে। আপনি দেখছি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। ১৯১৪ সালের আগস্টের কথা মনে করুন। তখন এর চেয়েও শোচনীয় অবস্থা। শার্লরোয়া থেকে মেওতে পালানোর কথা আমার মনে থাকবে চিরদিন। গোলন্দাজরা কামান ছেড়ে ঘোড়ার ওপর উঠে বসল। কিন্তু সপ্তাহ দুই পরেই জার্মানদের আমরা আইনে পর্যন্ত হটিয়ে দিলাম। ফন ক্লুক তার বাহিনীর দক্ষিণ-দিকটা শক্তিশালী করতে পারেনি কাজেই তাকে সেজন্যে দাম দিতে হয়েছিল। এবার ওরা এগিয়ে আসছে খুবই সরু একটা ফলকের আকারে। এ স্রেফ পাগলামি! ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমরা যে-কোনো সময়ে বিপর্যস্ত করে দিতে পারি।'

যুদ্ধবিদ্যার রীতিনীতি, যুদ্ধে হার-জিতের অনিশ্চয়তা আর ফরাসী পদাতিক বাহিনীর উৎকর্ষ সম্পর্কে সে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কথা বলে চলল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কর্নেল তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। সারি সারি ঢালু পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে দাবার ছকের মতো চৌখুপি কাটা মাঠ। বিমূঢ় একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। পরে সে বিমান-বিধ্বংসী কামানের ঘাঁটি পরিদর্শনে বেরুল। একা পড়ে রইল লেরিদো। রুমাল দিয়ে ভুরু মুছে সে ভাববার চেষ্টা করল। মোরো লোকটা কখনো মাথা গরম করে না। কিন্তু এই লোকও আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে। তাহলে বুঝতে হবে লক্ষণ সুবিধের নয়। স্বীকার করতেই হবে যে

শত্রুপক্ষ অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়ে আসছে। হয় জার্মানিরা পাগল, নয় দানবের মত শক্তিশালী। পরিকল্পনা মাফিক সৈন্য-চলাচল হওয়ার বদলে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কার সাধ্যি হদিশ রাখে! ম্যাজিনো লাইনের অবস্থা এর চেয়ে অনেক শান্ত। সেখানে এ-ধরনের আকস্মিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। যাকে বলা হয় আধুনিক যুদ্ধ—একি তাই? সমস্তটা একটা বিশ্রী হট্টগোল ছাড়া কিছু নয়।

সৈন্যদলকে নতুন করে সাজানো হয়েছিল এপ্রিল মাসে। সে সময়ে সেদান অঞ্চল ছিল ফ্রন্টলাইনের পেছনে—শান্তিপূর্ণ এলাকায়। সৈন্যরাও খুশি হয়েছিল—মনের আনন্দে চোরাই চালান দেওয়া বেলজিয়ান তামাক টানত। কিন্তু লেরিদোর বড়ো একঘেয়ে লাগত। তার স্থির ধারণা ছিল যে জার্মানরা বেলজিয়মের মধ্যে ঢুকবে না। সে বলত, 'উইলহেলম্ যে ভুল করেছিল সে-ভুল আবার কেন করতে চাইছে ওরা? নরওয়ের অভিযান সম্পর্কে সে খুঁটিয়ে খবর সংগ্রহ করত আর ব্রিটিশদের গাল পাড়ত : 'ওরা যোদ্ধা নয়, বেনিয়া!' সন্ধেবেলা সে হয় কর্নেলের সঙ্গে দাবা খেলত নয় মস্ত মস্ত চিঠি লিখত সোফিকে :

প্রাণাধিক সুরসাধিকা,

তিনদিন হল তোমার চিঠিটা পেয়েছি। দুশ্চিন্তায় মরে আছি। সাঁজে বলছিল, পারীতে নাকি ভয়ানক পেটের ব্যারাম হচ্ছে। কাঁচা ফল আর সালাড কিন্তু কক্ষনো খেও না, লক্ষ্মীটি। আমি খুব সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ আছি যদিও গত কয়েক দিন ভয়ংকর পরিশ্রম গেছে। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছ যে শত্রুপক্ষ বড় রকমের যুদ্ধের তোড়জোড় করছে। তার ফল হবে এই যে ওদের বেশিদিন ধরে যুঝবার ক্ষমতাই ফুরিয়ে যাবে। গতকাল জেনারেল পিকারের সহকারী মেজর দ্য গ্রাভ দেখা করতে এসেছিল। বয়স কম, সংগীতের ওপর দখল আছে। আমাদের গ্রেগ বাজিয়ে শোনাল। আমি ওর সংগীতের প্রশংসা করলাম কিন্তু মনে মনে ভাবলাম আমার প্রাণের সোফির চেয়ে অনেক নিচু স্তরের গাইয়ে। সোনামণি, তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে! আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখছি যেদিন আমি আবার দেখব তোমার ছোট ছোট হাতদুটো গাংচিলের মত পিয়ানোর চাবির ওপর দিয়ে উড়ে-উড়ে চলেছে। স্তঁধাল ঠিক কথাই বলেছিলেন যে সত্যিকার ভালবাসা......

বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠল লেরিদো। খানিকটা কালি পড়ে গেল কাগজের ওপর। ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল রাগে। জানানি না দিয়েই মোরো এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। বলল, 'আমাদের নিচে যাওয়া দরকার।'

তলঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। তাকের ওপরকার ধুলোমাখা বোতলগুলো রহস্যজনকভাবে চিকচিক করছে। বাতাসে মদের গন্ধ। অফিসাররা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। মোরো বসেছে একটা মদের পিপের ওপরে আর মিটমিট করে হাসছে। চিঠিটা শেষ না করতে পারায় জেনারেলের মনটা কেমন খিঁচড়ে গেছে। তাকে একটা টুল দেওয়া হল।

'ওরা এই জায়গাটার ওপরেই তাক করেছে।' আধো আধো গলায় বলল লেরর।

মোরো সায় জানাল : 'ওদের গোপন খবর সংগ্রহের ব্যবস্থা খুবই চমৎকার। আমরা কোনো এক জায়গায় বাসা বাঁধতে না বাঁধতেই ওরা গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে অভিনন্দন জানাতে কার্পণ্য করে না। সকালে আমাদের অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। কিন্তু নতুন জায়গায় কিছুতেই ঘুম হয় না আমার।'

'কোন উপায় নেই।' জেনারেল বলল, 'এটা একটা যুদ্ধ, যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা নয়।

কিন্তু তবুও একথা আমি নিশ্চয়ই বলব যে মানুষ বন্য হয়ে গেছে। গত যুদ্ধে সেনা-কর্তৃপক্ষের গায়ে হাত দিত না কেউ॥ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কিছুটা শ্রদ্ধা থাকা উচিত। কিন্তু এখন ওরা এমন ভাবে আমাদের পেছনে লেগেছে যেন আমরা গোলন্দাজ সৈন্য। শৌর্য বলতে যা বোঝায় তাকে আমরা জলাঞ্জলি দিতে বসেছি। এখন ওরা সব কিছু করতে পারে। কর্নেল, পম্পের কথা মনে আছে আপনার? কর্নেই-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—বিশেষ করে সেই দৃশ্যটা যেখানে কর্নেলিয়া পম্পের জন্যে বিলাপ করতে করতে চক্রান্তের কথা জানতে পারল। সে সীজারকে বলছে, 'তুমি আমাদের শত্রু। আমার দেশের ওপর তুমি কালছায়া ফেলেছ। এবারে দাসরা তোমার পতন ঘটানোর জন্যে চক্রান্ত করেছে। কিন্তু আমি দাসদের সাহায্য নেব না'। একেই তো বলে চরিত্র! কী মহৎ লাইনগুলো!'

বিস্ফোরণের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সে কর্নেলিয়ার বক্তৃতার বর্ণনা দিয়ে চলল। তারপর ক্লান্ত হয়ে চুপ করল। হাই উঠছে, কিছুতেই চেপে রাখা গেল না। মেজরের একটা সিগারেট ধরানো দরকার! ঠোঁটের কাছে নিয়ে যেতে যেতে হাতটা কেঁপে ওঠে। কিন্তু সাঁজে শিস দিয়ে উঠল : তুত ভা বিয়', মাদাম লা মারকিস।

'চুপ করো!' মেজর চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি দুঃখিত। এই পরিবেশ—এই বোতল, পিপে আর কবিতাই এর জন্যে দায়ী। মনে হচ্ছিল, আমি যেন মঁমার্ৎ-এর কাবেরেতে বসে আছি।'

বোমাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর লেরিদো তার অসমাপ্ত চিঠিটা শেষ করতে বসল। কিন্তু আবার বাধা। মোরো ঘরে ঢুকেছে।

'ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই থামেনি। জার্মান ট্যাংক পালিজেল-এ এসে পৌঁচেছে।' সে বলল।

একবার মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে লেরিদো পায়চারি করতে শুরু করল। অত্যন্ত চিন্তিত সে; কিন্তু সে যে ভুল করেছে একথা মোরোকে জানতে দিতে চায় না।

'কর্নেল, আমি তো আগেই বলেছিলাম, এ হচ্ছে নিছক পাগলামি। বেরিয়ে আসা মুখটাকে আরো বড়ো করে তোলবার চেষ্টা পর্যন্ত ওরা করছে না।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'যাই হোক, অমার মনে হয় মঁতের্মে আর নুজোঁর মাঝামাঝি সমস্ত সাঁকো উড়িয়ে দেওয়া উচিত। মোকের সঙ্গে যোগাযোগটা ঠিক আছে তো?'

'সকালে ঠিকই ছিল কিন্তু মনে হচ্ছে নুজোঁ থেকে ওরা সরে গেছে।'

'তাহলে ক্যাপ্টেন সাঁজেকে পাঠিয়ে দিন। আর যদি স্যাপারদের দিয়ে এ-কাজ করানোর মতো সময় না থাকে তাহলে বোমা ফেলে উড়িয়ে দিন সাঁকোগুলো।'

তারপর আবার চিঠিটা শেষ করতে বসল :

> 'পরিস্থিতি তেমন সুবিধের নয়। তবু আশা করছি তোমার সঙ্গে আগামী মে মাসে দেখা হবে। প্রচুর পেট্রল আর মানুষ খোয়ানোই সার হবে ওদের, থামতে বাধ্য হবে ওরা। শরীরের যত্ন নিতে ভুলো না কিন্তু।'

কফির কাপে কিছু ব্র্যান্ডি ঢেলে নিয়ে এক ঢোঁকে গিলে ফেলল সাঁজে, তারপর লেরিদোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বলল, 'যাচ্ছি বটে তবে যাওয়াটা খুব যে আরামের হবে তা নয়।'

এক ঘণ্টা পরে মেজরের কাছে খবর এল যে সাঁজে আর তার ড্রাইভার এখান থেকে

বেরিয়েই গুলি খেয়ে মারা গেছে। চাষীরা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল : 'ঐ জার্মানদেরই কাণ্ড!'

লেরিদো হুঙ্কার ছাড়ল, 'বাজে কথা! আমি নিজেই দেখছি গিয়ে ব্যাপারটা।'

সাঁজেকে কে খুন করেছে বোঝা গেল না। গাড়ীর মধ্যে মৃতদেহ দেখে স্যালুট করল লেরিদা। ততোক্ষণে সে পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে।

'আপনি কি যেতে বলেন আমাকে?' কর্নেল মোরো জিজ্ঞেস করল।

'না।'

লেরিদো কাকে পাঠায় তা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। কিন্তু গাড়িতে ফিরে গিয়ে লেরিদো বলল, 'কারও যাওয়ার দরকার নেই। হাজার হোক, মোকে তো আর ছেলেমানুষ নয়। আকাশ থেকে বোমা ফেলে ও নিজে থেকেই সাঁকোগুলো উড়িয়ে দেবে। আপনি ভেতরে আসুন, কর্নেল।'

'আমরা কি ফিরে যাচ্ছি?'

'না! রেতেল-এ যাচ্ছি আমরা। নিজেদের জীবন বিপন্ন করবার অধিকার আমাদের নেই। এ তো অ-আ-ক-খর মত সোজা কথা।' মৃত ক্যাপ্টেনের হাঁ করা মুখ মনে পড়তেই সে ঠোঁট চাটল : 'আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমাদের পেছনদিকের অবস্থা একেবারেই যাচ্ছেতাই।'

গাড়িটা আস্তে আস্তে চলেছে। রাস্তাগুলো ট্যাঙ্ক, লরি আর ঘোড়ায় ভরতি—ওরা সব এগিয়ে আসছে। লেরিদো খানিকটা শান্ত বোধ করল। বলল, 'যাক নতুন সৈন্য না বাড়ালে যে ভাঙন ঠেকানো যাবে না তা বুঝতে পেরেছে।'

শার্লভিলের কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন সৈনিক চিৎকার করে গাড়ি থামাল। জেনারেলকে দেখতে পেয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না তাদের।

'কী হয়েছে?' লেরিদো জিজ্ঞেস করল।

পেছন থেকে কে একজন বলল, 'জার্মানরা!'

তারপর একসঙ্গে রব তুলল : 'প্যারাস্যুটে করে নেমেছে......স্টেশন মাস্টারকে খুন করেছে!......প্যারাস্যুটবাহিনী......দুজন অফিসারকে গুলি করেছে!...'

লেরিদো সামনের দিকে ঝুঁকে ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'চুপ করো সবাই! তোমরা এদিকে কোথায় চলেছ?'

সৈনিকরা নিরুত্তর।

মোরো হেসে বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, এরা সব পলাতক সৈন্য।'

এমন সময়ে পেছন থেকে কার যেন চাঁচাছোলা গলা শোনা গেল, 'হে হে, পালিয়ে যাচ্ছেন নাকি জেনারেল মশাই?'

লেরিদো সংযম হারাল না। হুকুম জানাল, 'চুপ করো!' যে লোকটি তাকে অপমান করেছে তার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। একজন আহত সৈনিক। চারদিকে মাটি রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। লেরিদো তক্ষুনি তার নির্দেশ জানিয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'মিয়েজার, এ্যাম্বুলেন্স-স্টেশনে নিয়ে চল লোকটাকে।'

আহত লোকটিকে ড্রাইভারের পাশের সিটে তুলে নেওয়া হল। লোকটি কোনো কথা বলল না। তার চোখদুটো বন্ধ।

মিয়েজার হর্ন বাজাচ্ছে কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না। রাস্তায় দলে দলে ভিড় করেছে আশ্রয়প্রার্থীরা। অনেকে আবার তাদের গরুবাছুর পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে চলেছে।

এ সবের মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছে গাড়িটাকে। দুটো সার বেঁধে চাষীদের গরুর গাড়িগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করতে করতে চলেছে।

লোরিদোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল : 'এভাবে চললে আমরা কোনো কালেই পৌঁছতে পারব না। মানুষগুলো পালাচ্ছে আতঙ্কে! আতঙ্ক ছাড়া কিছু নয়!'

মিয়েজার গাড়ি থামিয়ে শুনল। জেনারেল জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখল। মাথার ওপর বোমারু উড়ছে। আশ্রয়প্রার্থীরা আর সৈনিকরা মাঠজঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দৌড়তে লাগল। আর একটুও এগোনো সম্ভব নয়। গরুর গাড়িতে আর গরু-বাছুরে সমস্ত রাস্তা আটকে গেছে। জেনারেলের গাড়িটাকে একপাশে সরিয়ে আনা হল। কর্নেল শুয়ে পড়ল মাটিতে, দেখাদেখি মিয়েজারও তাই। লোরিদো ভাবল, সেও যদি মাটিতে শোয় তব সেটা তার পক্ষে অবমাননাকর ব্যাপার হবে। বেঁটে শরীরটাকে টান করে সে দাঁড়িয়ে রইল আর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। মাথার ওপর নটা উড়োজাহাজ উড়ছে।

লোরিদো বলল, 'বেশ সার বেঁধে উড়ছে।'

কাছাকাছি একটা ছোট জঙ্গলে বোমা পড়ল। গাড়িতে ফিরে এসে আবার যখন তারা রওনা হচ্ছে তখন চোখে পড়ল স্ট্রোরের ওপরে ছ'-সাত বছরের একটা মেয়ে—বোমার ছিটকে আসা টুকরো লেগে তার পা দুটো উড়ে গেছে। লোরিদো ফোঁস ফোঁস করে নাক টেনে মৃদুস্বরে কর্নেলকে বলল, 'দেখেছ, কী ভয়ানক!'

তারপর আহত সৈনিকটির দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বলল, 'বীর পুরুষটির কি খবর?'

সৈনিকটি জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে মিয়েজার বলল, 'অনুমতি দেন তো লোকটাকে বাইরে ফেলে দিই! বারবার ঢলে পড়ছে আমার গায়ে। অসুবিধে হচ্ছে।'

'পাগল হয়েছে! আহত লোককে কখনো ফেলা চলে?'

'লোকটা মরে গেছে। একদম ঠাণ্ডা।'

সৈনিকটির শরীর দোল খেতে লাগল, পেছন থেকে মনে হল সে ঢুলছে। রেলওয়ে স্টেশনের ধারে তারা থামল—রেডিয়েটারে জল নেবে মিয়েজার। প্ল্যাটফর্মটা গোলাবারুদে বোঝাই। লোরিদো গাড়ী থেকে নেমে সেগুলো দেখতে গেল। বলল, '৪৭ নম্বর মিলিমিটার কামানের গোলা! আপনি বলছিলেন এ জিনিস নাকি একটাও নেই। এ সব এখানে পড়ে কেন? এমনি অব্যবস্থার কথা কস্মিনকালেও শোনেনি কেউ।'

সমস্ত স্টেশনটা ঘুরে একটা জনপ্রাণীরও সাক্ষাৎ মিলল না। একজন সৈন্য টেলিগ্রাফ আপিসের মেঝের ওপর বসে খোলা পায়ে কি যেন চিবুচ্ছিল, জেনারেলকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বুট জোড়া পায়ে দিতে লাগল।

লোরিদো জিজ্ঞেস করল, 'তোমার রেজিমেন্টের নম্বর কত?',

'১৭৩ নম্বর। পায়ে ফোস্কা হয়ে দলছাড়া হয়ে গিয়েছি।',

'তোমার বন্দুক কোথায়?'

সৈন্যটি জবাব দিল না।

'স্টেশনমাস্টার কোথায়?',

'সবাই পালিয়ে গেছে। জার্মানরা নাকি কাছাকাছি এসে পড়েছে। মোটর সাইকেলে আসছে ওরা। কী সাংঘাতিক ব্যাপার!' লোকটা ছোটছেলের মত ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল লোরিদো।

জল ভরে নিয়ে আবার যাত্রা। জেনারেলের মুখে একটি কথাও নেই। কেবল রেতেল-এ ঢোকবার মুখে সে হঠাৎ মোরোকে বলল, 'যুদ্ধজয়ের আর কোনো আশা নেই! ডেপুটিরা কি ভাবছে জানি না। ওরা হচ্ছে এক পাল মূর্খ আর অপরিণামদর্শী লোক—আর ওদের সর্দার হয়েছে রেনো। তবে আমরা এবার হাত ধুয়ে সরে বসতে পারি। আমাদের সাধ্যমতো আমরা করেছি। এবার, রোমানরা যেমন বলত, অন্যে এসে ভাল করুক যদি পারে।'

সতেরো

ব্যাটালিয়নটি যে-গ্রামে ঘাঁটি করেছে তা এই অস্থির জগৎ থেকে অনেক দূরে। এখানকার চাষীরা ঝাউগাছের ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালায়, চিমনির আগুনে শুয়োরের মাংস সেঁকে। মোটাসোটা গরুগুলো আদ্যিকালের দেবীদের মত তাকিয়ে থাকে ফৌজী লরিগুলোর দিকে। লুসার্ন আর ক্লোভার জাতের প্রচুর ঘাস জন্মায় মাঠে আর গাছের তলায় মেটে রঙের ক্রোকার ফুল ফুটে থাকে।

খবরের কাগজ এলেই সৈন্যরা পেছনকার পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জার্মানরা কত টন জাহাজ ডুবিয়েছে বা ট্রনডিএম-এর যুদ্ধে কী হয়েছে—সে-খবরে তাদের আগ্রহ নেই। পারীতে কি কি ঘটছে সে-সব খবর তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, বিজ্ঞাপন-গুলো গেলে। পেছনে অনেক দূরে ফেলে আসতে হয়েছে সেই জায়গাটি যেখানে অনেক থিয়েটার, অনেক কাফে আর অনেক মেয়ে। ঝলমলে ফিটফাট সব মেয়ে!

পারীর কথা ভেবে আঁদ্রের কিন্তু মন কেমন করে না। নরমাণ্ডির এক চাষীর ছেলে সে, এই মন্থর আর টেনে-টেনে চলা গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে কি করে যেন সে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। জেনেতের হাসি কিংবা ছাই-রঙা ঘরবাড়ি বা ঘুঘুরঙা সীন নদী নিয়ে না-আঁকা ছবি—এইসব অতীতের স্মৃতি পর্যন্ত তার কাছে ঝাপসা আর অবাস্তব বলে মনে হয়। ছাউনি ফেলে বসার পর সৈন্যরা চাষীদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। সবুজ-চোখ এক ঝিয়ের উদ্দেশে কবিতা লিখেছে জিভের, কবিতায় তাকে সে তুলনা করেছে রূপকথার গল্পের ডাইনীর সঙ্গে। লরিএ একটা বাঁশি যোগাড় করে নিয়ে বিয়ের আসরে বাঁশি বাজাচ্ছে। নিভেল বিজ্ঞের মত স্থানীয় এক কাফের মালিককে বুঝিয়ে ছাড়ল যে 'ক্রুসিফিক্স' ভারমুথ বিক্রি করার চেয়ে 'সিনৎসানো' বিক্রি করা অনেক লাভ-জনক। ইভ বলে, 'মাইরি, এখানকার মাটিটা খাসা।' সে এই ভেবে অবাক হয় যে এই পৃথিবীর মাটি সব জায়গাতেই খাসা। আঁদ্রে সবার প্রিয়পাত্র। তেমনি বেমানান হাসি হেসে সে শেষ খামচি তামাক ইভের হাতে তুলে দেয়, জিভেরের একটা ছবি এঁকে দেয় 'তার বধূর জন্যে।'

শান্তির সময়ে কোম্পানী-কমাণ্ডার লেফটেনেণ্ট ফ্লেসিনে ছিল ফটোগ্রাফার; বিবাহিত দম্পতি, সদ্যজাত শিশু ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের ছবি তুলে বেড়াত। লোকটা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ায়, যদিও স্বভাবটা একটু খুঁতখুঁতে আর একটু বেশী রকম স্পর্শপ্রবণ।

ভের্দ্যুর গল্প বলতে সে বড় ভালবাসে। বলে, 'তখনকার কালে লোকগুলো ছিল অন্য রকম। অনেক বেশি বোকা ছিল কিন্তু অনেক বেশি ভদ্রও ছিল।' সৈন্যরা

অমায়িকভাবে হাসে। বীরত্বে তারা বিশ্বাস করে না, কীর্তি-স্থাপনে তাদের আস্থা নেই। এই যুদ্ধের সঙ্গে তারা একাত্ম নয় কারণ এই যুদ্ধকে তারা বোঝে না, নিজেদের বলেও মনে করতে পারে না। আর ফ্রেসিনে রাত্তিরবেলা ভাবে, 'এ কি একটা ফৌজ? ওরা গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবে আমাদের। কিন্তু দালাদিএ কিছুই দেখে না।'

গমের দানাগুলো মোটা হচ্ছে। বাছুরগুলো গুম হয়ে গিয়েছে, তাদের চোখে অকাল বিষণ্ণতার ছাপ। দিন গরম হতে শুরু করেছে। কাফেতে বসে সৈন্যরা গ্রগ-এর বদলে বিয়ার খায় আর খুশিমতো গ্রামোফোন বাজায়। রেকর্ডের সংখ্যা খুবই কম, মাত্র কয়েকটা। অনবরত শুধু নাকী সুরের একটা বিলাপ শোনা যায়, 'না, না, তুমি তো জান এর শেষ নেই।' প্রত্যেকটি সৈন্য গলা মেলায় গানের সঙ্গে। ব্রিতানিতে নিজের ছোট্ট সাদা বাড়িটার কথা মনে পড়ে ইভের। আঁদ্রে তাকিয়ে থাকে তারাভরা আকাশের দিকে আর হের্শেলের নীহারিকার কথা ভাবে।

আর ঠিক এই সময়ে, যখন কেউ-ই তৈরি নয় এই অবস্থায়, ফৌজের ওপরের তলার ও নিচের তলার সকলকে চমকে দিয়ে আচমকা যুদ্ধের আবির্ভাব ঘটল। ১৯৩৮-এর শরৎকালে সৈন্যরা যুদ্ধ ও মৃত্যুর জন্যে অনেক বেশি তৈরি ছিল কিন্তু এতদিন চুপচাপ বসে থেকে কিছু করার ক্ষমতাই চলে গিয়েছে। লরিএ যখন ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলল, 'শুরু হয়ে গেছে,' কেউ তার কথায় বিশ্বাস করল না। ইভ খানিকটা গালা-গালি দিয়ে তাসটা ভাল করে ফেটিয়ে নিল। নিভেল বলল, 'দূর ছাই, শয়তানই জানে তুই শালা কেমন তাস দিয়েছিস এবার!'

চার দিন কেটে গেল। সবই ঠিক আগের মতো। রেডিওর ঘোষণা শোনা গেল যে ফরাসী সৈন্যবাহিনী হল্যাণ্ডের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছেছে; জার্মানির পরদেশ-আক্রমণকে রুজভেল্ট নিন্দে করেছেন, বেলজিয়ামের রাজা—যাঁর নাম তারা দিয়েছে 'ল রোয়া শেভা-লিএ'—লিএজের বীর প্রতিরোধকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু পঞ্চম দিন ভোর থেকে মোটরগাড়ি আর মোটর-সাইকেলের ছুটোছুটি আরম্ভ হল। তাজা সকালটির শান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল দূর থেকে ভেসে-আসা কামানের শব্দে। ফ্রেসিনে মুখ কালো করে বলল, 'এই হচ্ছে হল্যাণ্ডে জেতার নমুনা!'

দুপুরবেলা জার্মান বোমারু আকাশ থেকে বোমা ফেলল গির্জা ও আরো কতক-গুলো বাড়ির ওপর। একটি স্ত্রীলোক মারা গেল। গাঁ থেকে গাঁয়ে যাতায়াতের সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে আশ্রয়প্রার্থীরা ভিড় করে আসছে। তারা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে, 'জার্মানরা মেরে ফেলছে লোকদের।' গ্রামবাসীরা বোমায় ভয় পায়নি কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদের দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। মেয়েরা কান্না জুড়ে দেয়, তারপর ক্যাঁচকোঁচে গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই করতে শুরু করে। শুয়োরছানাগুলোকে মেরে, গরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে চলে পুরুষরা। একজন চাষী নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, আর সেই আগুন নিবুতেই হিমসিম খেয়ে যায় সৈনিকরা। বৃথাই ফ্রেসিনে সবাইকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। সে বলে, 'কোথায় চললে তোমরা? রাস্তাতেই মারা পড়বে যে।' কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় না। ভাষাহীন ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সন্ধ্যেবেলা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল সবাই। আঁদ্রে একটা ঘরে ঢুকল, সে-ঘরে স্টোভটা তখনও গরম আছে আর এক হাঁড়ি স্টু চাপানো আছে তার ওপর।

আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে সৈন্যরাও মিশে আছে, সেই সব সৈনিক যারা বন্দুক ফেলে পালাচ্ছে। লোকে বলছে, জার্মানরা নাকি আর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে।

'ট্যাঙ্কও আসছে।' সবাই বলাবলি করে।

'আমাদের লোকেরা গুলি ছুঁড়ছে না কেন?'

'গুলি ঠিকই ছুঁড়ছে কিন্তু গোলাগুলো সুবিধের নয়। জার্মানদের ট্যাঙ্কগুলো পাহাড়ের মতো বড় বড়।'

নিভেল তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আমরাও যাব নাকি?'

রাগে থুতু ফেলে ইভ বলল, 'যেতে ইচ্ছে হয় যাও।'

নিভেল রাগে ফুঁসে উঠল। বলল, 'আমায় ভীতু ভাবলে নাকি? তুমি যদি থেকে যাও তাহলে আমিও আছি।'

আঁদ্রে ইভের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। এ তো ভাবা যায় না! এ কি সেই লোক যে শুধু বলত, 'এখানকার মাটিটা খাসা।' আঁদ্রে এখন বুঝল এই মাটির সঙ্গে আর এই পরিত্যক্ত গ্রামের সঙ্গে তার নিজের টান কত গভীর। এক ঘণ্টা আগেও সে ভেবেছিল যে এই যুদ্ধের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই, যুদ্ধটা কেবল ছোট ছোট নিশান-চিহ্নিত মানচিত্র আর তেসার নীতি। কিন্তু এখন একেবারে যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। চিন্তা বা তর্ক করার এতটুকু ইচ্ছা নেই। খোলা পাহাড়ের ওপর শুয়ে সে অপেক্ষা করে রইল। সে কি এসব ছেড়ে চলে যাবে, এই মাঠ, পপ্‌লারের সারি দেওয়া এই রাস্তা, পাহাড়ের নিচে এই নীড়? কক্ষনো না। তার সমস্ত ভাবনাচিন্তা মুছে গেল, রইল শুধু এক অস্পষ্ট আর জ্বলন্ত আবেগ; 'আমি কক্ষনো যাব না!' তার পাশেই জিভের শুয়ে। রোগা ছেলেটা অনেক দিন ধরে কঠিন কণ্ঠনালী-প্রদাহে ভুগছে। রূপকথার ডাইনীদের নিয়ে কবিতা লেখে। ইভের মতো সেও বলল, 'আমরা এক পাও নড়ব না·····।' লরিএ রসিকতা করতে চেষ্টা করল, 'চুপ কর ইভ্! ট্যাঙ্কগুলো ভয় পেয়ে যাবে। ভাববে ফাঁদে পড়ল বুঝি!' কিন্তু ইভ তবুও তার প্রকাণ্ড মুখখানাকে হাঁ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। লেফটেনেন্ট ফ্রেসিনে বিষণ্ণ গলায় বলল, 'দুয়াম'-র অবস্থা এর চেয়েও খারাপ ছিল। তবে মানুষগুলো ছিল অন্যরকম।'

'আমাদের কথা বলছেন?' আঁদ্রে প্রশ্ন করে।

'না, কিন্তু পারী......' ফ্রেসিনে হাত ঝাঁকায়।

রাত্রি এল। অন্য গ্রামেও এই একই রাত্রি : কুকুরের ডাক, ঘরের কোণে বুড়োদের নাক-ডাকা, শিশুদের কান্না। কিন্তু এই গ্রামে কোনো কুকুর বা শিশু বা বুড়ো নেই। গ্রামটা মরে গেছে। শুকনো জমির ওপরে নির্বাক হয়ে রাত কাটাচ্ছে সৈন্যরা। দেখতে দেখতে রাত কেটে গেল। ভোর হল চারটের সময়। সূর্যের প্রথম কিরণ সবে ঝিকিয়ে উঠেছে এমন সময়ে উড়োজাহাজ দেখা দিল আকাশে। ব্যাটালিয়নের ১০৯ জন লোকের প্রাণ গেল।

সৈন্যরা আবার পাহাড় থেকে নিচের দিকে দৌড়তে লাগল। চিৎকার করে বলল, 'গোলা নেই আমাদের! বিষ্যুদবার থেকে গোলাবারুদ আসা বন্ধ। পেট্রল নেই নাকি ......কী ভাবে ওরা?...দুটো পয়সার বদলে আমাদের ওরা বিকিয়ে দিয়েছে!'

নিভেলের মনে হল, এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু একা থাকার ইচ্ছা তার নেই। কিন্তু অন্যদের কাছে বলতে গেলে তারা শুধু হাত নেড়ে বলছে, 'ইচ্ছে হয় তুমি যাও!' মনের চাঞ্চল্যকে চাপা দেবার জন্যে সে হিসেব করতে শুরু করল : ক্ষতি কম হয়নি, তিন ভাগের দু-ভাগ খোয়া গিয়েছে। তার মানে, ১৬৬ জনের মধ্যে ধরা যেতে পারে ৬৭ জন...আবার তিনজন আহত হয়েছে তো একজন হয়েছে নিহত। তার মানে প্রতি একশোজনে সতেরজন মারা গিয়েছে। এক্ষেত্রে বাঁচা সম্ভব হতে পারে......

রেল-স্টেশনের ইঁটের পাঁজার ধার দিয়ে জার্মান ট্যাঙ্কবাহিনী এগিয়ে আসছে। পাহাড় ঘুরে আসছে ওরা। এবার চারদিকে গুলির শব্দ শোনা গেল। এই পাহাড়টাকে

আঁকড়ে বসে আছে কেন তারা? সামনে জার্মানবাহিনী, ডানদিকে ও পেছনেও তাই। কিন্তু বাঁদিক? বাঁদিকে কি হচ্ছে তা কি ছাই কেউ বলতে পারে? বাঁদিকটায় নিজেদের লোকই তো থাকা উচিত। তৃতীয় ব্যাটালিয়ন। কিন্তু বাঁদিকেও তো সবাই পালাচ্ছে... পালিয়ে গেলে কেমন হয়? না! মনে হচ্ছে এই পাহাড়টার যা দাম, তা আর কোনো কিছুর নয়। পাহাড়টা তাদের কাছে খুবই আপন, খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলা হয় ঘাঁটি—তা নয়। জীবনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার প্রতীক। আঁদ্রের মনে হল, মেশিনগানের পাশে যে-জায়গাটিতে সে রয়েছে সেখানেই তার জন্ম। অন্যদেরও তাই মনে হচ্ছে। জিভের বিড়বিড় করে কি যেন বলছে, কবিতা নয়, অভিশাপ। ফুঁসে-ফুঁসে উঠছে সে।

বোমারুগুলো আরেকবার এল। এবার নিহত হল নিভেল। হাসিখুশি হোটেল-পরিচারকটির জীবন শেষ হল। এখন থেকে আর কেউ তিক্ত-মধুর হংজমী মদ সম্পর্কে কথা বলবে না। আর কেউ বলবে না : 'বলতে পার, আকাশে কত তারা আছে? কোথায় যেন পড়েছিলাম আঠারো হাজার তারার নাম দেওয়া হয়েছে। তারও একশো গুণ....'

স-নাম আর নামহীন তারাভরা আকাশ নিয়ে আরেকটি রাত্রি এল। শুকনো বিস্কুট চিবিয়ে খিদে মেটাতে হল তাদের। উৎসাহ ও উদ্যম ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন শুধু অপেক্ষা কখন ভোর হবে, কখন যুদ্ধ শুরু হবে, কখন আসবে মৃত্যুর দাক্ষিণ্য।

সাড়ে চারটের সময় ফ্রেসিনে হাঁক দিয়ে উঠল, 'মেশিনগান চালাও!'

লরিএ দেখল রাস্তার পেছনে হালকা রুপোলী কুয়াশাটা কেঁপে উঠে নড়তে শুরু করেছে।

'মেশিনগান নং ১, ফিল্ড নং ৯৭!'

'গুলি চালাও!

জার্মানরা ভেবেছিল কোনো বাধা পাবে না, ফরাসীরা অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছে। আঁদ্রে প্রচণ্ড একটা উল্লাস বোধ করল। অনুভূতিটা মদের মতো উঠে এল মাথায়। পাশ থেকে ইভ্ চিৎকার করে উঠল, 'লেজ তুলে পালাচ্ছে বেটারা!'

রাস্তার ধারে একটা নিচু জমিতে জার্মানরা আশ্রয় নিয়েছে। মিনিট বিশেক পরে তারা পাহাড়ের চুড়ো লক্ষ্য করে কামান দাগতে শুরু করল। কামানের গোলার পয়লা ঝাঁকটা উঁচু দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'গাঁয়ের ঠিক মাঝখানটিতে গিয়ে পড়বে। ব্যাটারা নিজেদের লোকদের ওপরেই কামান দাগছে!'

তার পরের গোলাগুলো পাহাড়ের ওপরে এসে পড়তে লাগল। এক্-একটা গোলা ফাটছে আর ছিটকে ছিটকে মাটি উঠছে। গোলা ফাটার আওয়াজ যখন থাকছে না তখন শোনা যাচ্ছে মানুষের চিৎকার। দিশ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষগুলো আর্তনাদ করে উঠছে, অমানুষিক আর্তনাদ। সূর্যের আলো এসে পড়ছে তাদের চোখে। তাদের একমাত্র চিন্তা, কিছুতেই পিছু হটবে না। এই কেঁপে-কেঁপে-ওঠা ছিটকে-ছিটকে-পড়া মাটির মধ্যে শেকড় গজিয়ে তারা এই মাটিকে আঁকড়ে থাকবে, এই মাটির সঙ্গে তারা উড়ে যাবে, কিন্তু তবুও পিছু হটবে না। কিছুক্ষণ পরে গোলাবর্ষণ বন্ধ হল। চারদিক নিস্তব্ধ। মনে হল কেউ কোথাও নেই। চারদিকে তাকাতে গিয়ে জিভেরকে দেখতে পেল আঁদ্রে। অবাক হয়ে দেখল জিভের চোখ মিটমিট করছে। তাহলে সে বেঁচে আছে। লরিএ হাসছে। তাহলে লরিএও বেঁচে আছে। ঘাসের ওপর বসে আপন মনে ডাকছে একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন পাখি। ফ্রেসিনে ধূমপান করছে। কিন্তু ইভ্ কোথায়? হয়তো মারা গেছে। এই চিন্তাগুলো খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আঁদ্রের মনকে ছুঁয়ে গেল। করুণা বা ভয় কিছুই বোধ করল না সে। ভাবল, এখনি হয়তো আমিও মারা যাব। তাতে কীই বা যায় আসে? শুধু দেখতে

হবে—জার্মানরা যাতে কাছে ঘেঁষতে না পারে। মেশিনগানটাকে সে এখন যতটা আবেগের সঙ্গে ভালবেসেছে তেমন আর কাউকে ভালবাসেনি।

'ছশো পঞ্চাশ!'

আবার উড়োজাহাজ দেখা দিয়েছে। পাথরের মতো বোমাবৃষ্টি হচ্ছে আকাশ থেকে।

হাঁটুর ওপরটায় ভয়ানক একটা যন্ত্রণা অনুভব করল আঁদ্রে। কি হয়েছে একবার দেখবে মনে করল। চোখ রগড়াল অনেকক্ষণ ধরে। ঘুম পাচ্ছে তার। চোখ খুলতেই লরিএর মুখখানা দেখতে পেল। রক্তমাখা। তা হোক। কিন্তু ওদের কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে দিও না! আঁদ্রেকে টেনে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হল।

'জিভের, তুমি কর্নোর জায়গায় যাও!'

ছুঁচলো ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল আঁদ্রে। আবার জার্মানদের আক্রমণ শুরু হল।

মেশিনগানের খট্-খট্ আওয়াজ হচ্ছে, অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় শুনতে পাচ্ছে আঁদ্রে। এই অবস্থায় মেশিনগানের আওয়াজের মধ্যে অনেক কাহিনী শোনা যায়, আঁদ্রে শুনছে, শুনতে ভালো লাগছে। আচমকা মেশিনগানের আওয়াজটা থেমে গেল। জিভের চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যা, মেশিনগানের ড্রাম খুলে গেছে!'

শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে বুকে হেঁটে হেঁটে আঁদ্রে মেশিনগানের কাছে এগিয়ে গেল। সে কিছু বলতে চাইছে, কিছু একটা বোঝাতে চাইছে। কিন্তু চেষ্টা করেও জিভ নাড়াতে পারল না। হাত তুলে সে প্রাণপণ চেষ্টায় হাতের তালু দিয়ে ধাঁই করে ড্রামের ওপরে ঘা মারল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এইবার!' মাথাটা আবার এলিয়ে পড়ল মাটিতে।

যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত হয়েছে। তার চারদিকে শুধু খড়। প্রথমে মনে হল, মাঠের মাঝখানে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার বাবাকে যেন সে জিজ্ঞেস করছিল, 'এত তাড়াতাড়ি ফসল তোলা হচ্ছে কেন?' তারপর মনে পড়ল সে আহত হয়েছিল। লরিএ ছিল তার পাশে। লরিএর মুখটা দেখা গেল না কিন্তু গলার স্বর শুনল, 'তুমি নাকি?'

'হ্যাঁ আমি।'

যন্ত্রণায় আঁদ্রে ভুরু কোঁচকাল। কত কথাই না তার বলার আছে।

'লরিএ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? মেশিনগানটা ছিল বলে আমরা বেঁচে গিয়েছি। আচ্ছা তোমার মনে পড়ে, তেসার নাকটা কি কুচ্ছিত। লোকটা জমি কিনতে এসেছিল। আমার তো ভয় হচ্ছে, ইভ বেঁচে নেই। এখানকার জমিটা খাসা। সত্যিই, মজার ব্যাপার, কি বল? না, না, এ কখনো শেষ হবে না। দেখে নিও।'

'না, কখনো না।' মৃদু গলায় বলল লরিএ।

এবার যখন আঁদ্রের ঘুম ভাঙল তখন সে বিছানায় শুয়ে। কে যেন তার পাশে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে মাথা ফেরাল সে।

'ইভ্! তুমি! আমি ভেবেছিলাম তোমাকে ওরা মেরে ফেলেছে!'

'আমাকে?' ইভ্ জ্বলে উঠল, 'কচুপোড়া খা! কিন্তু তুমি আর কথাটি বোলো না। নার্স বারণ করেছে। আমাকে তো ঢুকতেই দিচ্ছিল না।'

'বাজে কথা রাখ! আচ্ছা ইভ্, জার্মানদের আমরা ঠেকাতে পেরেছি?'

'হ্যাঁ পেরেছি। আমাদের ট্যাঙ্ক-বাহিনী গ্রামটা আবার দখল করে নিয়েছে। চারটে ট্যাঙ্ক। ঠিক সাতটার সময়। তারপর সদর দপ্তর থেকে এক সংবাদবাহক এসে হাজির। তার মারফত হুকুম পাওয়া গেল যে আমাদের হটে আসতে হবে।'

'কী বলছ?'

'হ্যাঁ, হুকুম দিয়েছেন জেনারেল পিকার্। ক্লেসিনে হুকুমনামাটা পড়েই একটানে রিভলবারটা বার করল, তারপর দুম! ঠিক মগজের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে গুলিটা। একটা খাঁটি কথা বলছি শোনো। ক্লেসিনে লোকটা ভালোই ছিল। মনের জোরটা ছিল একটু কম, এই যা! ওর স্মৃতির উদ্দেশে মোমবাতি জ্বালাব আমি। নিজেদের জন্যেও জ্বালাব একটা। দুঃখের কথা যে পাহাড়টা ছেড়ে আসতে হল।'

আঁদ্রেও দুঃখিত হয়েছে। মনে পড়ছে পপলারের সারি দেওয়া সেই রাস্তা, পাহাড়ের তলায় নীড়ের মতো ছোট্ট বাড়ি, আর ছুঁচলো ঘাস। এখানকার মাটিটা খাসা!......মাটি...... জেনেৎ....

'ইভ্, তুমি যেও না। আমাকে ছেড়ে যেও না। শুনতে পাচ্ছ? ছেড়ে যেও না কিন্তু।'

আঠারো

কাগজওয়ালারা লিখল যে জার্মানরা সময় নিচ্ছে। কিন্তু পরাজিত নবম বাহিনীর সৈন্যরা পারীর পূর্ব উপকণ্ঠে হাজির হতে শুরু করেছে। মার্তিনি তার পরিবারকে পাঠিয়েছে বিয়ারিৎস-এ। কাদিলাক, হিসপানো-সুইজা, বুইক—শৌখিন মোটরগাড়িগুলো শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে বোয়া দ্য বুলোঞ্‌-এ। লোকের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে রহস্যজনক প্যারাসুট-বাহিনী আর পঞ্চম-বাহিনী সম্পর্কে নানা কথা। ব্রতেই বলে যে বিদেশী লোক আর আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়েই পঞ্চম বাহিনী। তার হুকুমে পুলিশ কয়েক হাজার জার্মান ইহুদী, ফ্যাশিস্ট ইতালী থেকে পালিয়ে আসা মজুর আর স্পেনীয় রিপাব্লিকানদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশের হাতে রাইফেল দেওয়া হয় আর রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তারা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। আগের মতোই চলতে থাকে এই মস্ত শহরের জীবন। কাফেগুলোতে তেমনি ভিড়, দোকানগুলোয় ফলাও ব্যবসা। মারি আঁতোয়ানেৎ-এর অটোগ্রাফ আর দিরেক্তোয়ার আসবাবপত্র নীলামে ওঠে। শীতকালের জন্যে নতুন নতুন ফ্যাশনের পোশাক তৈরির তোড়জোড় এর মধ্যেই শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে শেয়ার বাজার ভয়ানক তেজী। এই অবস্থার মধ্যেও প্রত্যেকটি শেয়ারের কয়েক পয়েন্ট করে দাম বেড়ে গেছে। মিলিটারি থেকে নিয়ে নেওয়ার ফলে পারী শহরের রাস্তায় বাসের চলাচল বন্ধ। বাস উঠে যাওয়ায় পারীবাসীরা স্বস্তিবোধ করছে। মার্নযুদ্ধের আগেকার দিন-গুলির কথা মনে পড়ছে তাদের। সে-সময়ে জেনারেল গালিএনি ট্যাক্সিগুলোকে মিলিটারি কাজের জন্যে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং জার্মান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। ১৬ই মের সকালবেলা তেসার সেক্রেটারী তেসাকে খবর দিল যে জার্মান ট্যাঙ্ক লাওঁ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তারপর অর্থপূর্ণভাবে বলল, 'পাঁচ দিনে একশো চল্লিশ কিলোমিটার পথ এগিয়েছে ওরা। আর জানেন তো, লাওঁ থেকে পারীর দূরত্ব মাত্র একশো ত্রিশ কিলোমিটার।'

তেসা ক্ষেপে আগুন। চিৎকার করে বলল, 'কী সাহসে এই সব গুজব ছড়াচ্ছ তুমি? আমাকে তাহলে কড়া ব্যবস্থাই নিতে হবে!'

সেক্রেটারী চলে যাওয়ার পর রেনোকে টেলিফোনে ডাকল তেসা, 'শুনুন, জার্মানদের সম্পর্কে যা শুনছি মনে হচ্ছে সবই বাজে কথা, কি বলেন?'

'ওরা লাওঁর কাছাকাছি এসে পেঁীছেছে।'

'তার মানে আপনি বলতে চান পারীতে আসবার আঁটঘাট বাঁধছে ওরা।'

'সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।'

'তাহলে তো এখানে পেঁীছতে বড় জোর চারদিন সময় লাগবে ওদের। দিনে ত্রিশ কিলোমিটার এগোচ্ছে ওরা। আমি হিসেব করে দেখেছি।'

'গামল্যাঁ তো বলছে ওরা আজ সন্ধ্যা নাগাদ পারীর উপকণ্ঠে পেঁীছে যেতে পারে। আমি সরকারী দপ্তরগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি। শহর ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি করে রাখা উচিত। এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ফোন করব আপনাকে।'

তেসা সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল, বলল, 'একটু কড়া কথা বলে ফেলেছি খানিক আগে। কিন্তু বুঝতেই পারছ খবরটা যে কোনো লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অবিশ্যি আমি নিজে একটুও বিচলিত হইনি। কিন্তু জরুরি অবস্থার জন্যে তৈরি থাকতে হবে আমাদের। প্রথমত, সরকারী দপ্তরগুলো পুড়িয়ে ফেল। দ্বিতীয়ত, যে-সব সরকারী কর্মচারীদের শহর ত্যাগ করা দরকার তার একটা তালিকা তৈরি কর। আর সোফারকে বল গাড়ি তৈরি রাখতে। গাড়ি ছেড়ে যেন ও কোথাও না যায়। লাঞ্চের পরে আমাকে হয়তো বেরোতে হতে পারে।'

পলেতের কথা মনে পড়ছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। লোকে ক্ষেপে আছে। আর পলেতকে সবাই চেনে। হয়তো বিশ্রী ঘটনা ঘটতে পারে। সমাজতন্ত্রীরা ব্যাপারটা নিয়ে তিলকে তাল করবে। কিন্তু পলেৎকে কি করে বলা যায় কথাটা? ও এ জগতের মানুষ নয়। ও হয়তো কেঁদে ভাসাবে। তার চেয়ে কথা ফোনে বলা অনেক ভালো :

'সোনামণি, এখান থেকে তুমি এক্ষুনি চলে যাও····তোমায় বলতে পারছি না...... ভয়ংকর খবর......সন্ধেবেলা ওরা এখানে পেঁীছে যাবে। এটা একেবারে পাকা খবর। লোকে কিন্তু এ সম্পর্কে এখনো কিছু জানে না। তোমাকেও বলে রাখছি, যাই কর না কেন, ভুলেও কাউকে কিচ্ছু বোলো না যেন। আতঙ্ক ছড়িয়ে কি লাভ? গার দ্য লিয়ঁতে চলে যাও, প্রথম যে ট্রেন পাবে চেপে বসো......আমি? না, না, আমি যেতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আমাকে আমার জায়গায় থাকতেই হবে। আমাদের বলতে হয় না, নিজেদের গরজেই আমাদের বীর হতে হয়····বিদায় সোনামণি।'

রিসিভারটা নামিয়ে হঠাৎ টেবিলের ওপর কপাল রেখে কাঁদতে লাগল তেসা। কী শোচনীয় দুর্ভাগ্য! ভাবাও যায় না যে মাত্র এক সপ্তাহ আগে সমস্ত কিছু কত শান্ত আর সুন্দর ছিল। তখন তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নরওয়ের যুদ্ধ। মনে মনে তেসার একটা পরিকল্পনা ছিল যে পলেৎকে নিয়ে একবার প্রে-দে দ্যাঁ-এ ঘুরে আসবে। পাঁচ দিনে একশো চল্লিশ কিলোমিটার! এ যে দানবীয় ব্যাপার! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ফরাসী সৈন্যরা জার্মানদের দেখা মাত্রই চম্পট দিয়েছে! সৈন্যদেরই বা দোষ কি! মিছিমিছি কে প্রাণ দিতে চায়? বেচারা ফ্রান্স!

শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকাল তেসা। রেনো এখনো ফোন করল না? ওরা সবাই পালিয়ে গেছে, তার কথা কারও মনে নেই।

তেসা ঘণ্টা টিপে সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল। 'বের্নারকে গাড়ি তৈরি রাখতে বল। আর হ্যাঁ, পেট্রলের কয়েকটা বাড়তি টিন নিয়ে রাখতে বল সঙ্গে। রাস্তায় কি অবস্থায় পড়তে হবে তা কিছুই বলা যায় না।'

সেক্রেটারী সায় জানাল, তারপর বলল, 'একটা কথা বলার আছে। মঁসিয় দেসের বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'দেসের?····এমন বেচাল মানুষ তো দেখিনি! এখন কি দরকার পড়ল তার? আর পিকারকে।'

'তুমি খেয়াল রেখে কথা বলছ কি? আমরা দুজনে পুরনো বন্ধু ঠিকই, কিন্তু আমি দায়িত্বশীল পদে রয়েছি। আমি একজন মন্ত্রী আর তুমি রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাতে চাও আমাকে দিয়ে?'

'আমি বলছি, হয় তোমরা বিদেয় হও নয়তো যুদ্ধ কর। প্রত্যেকটি রাস্তার জন্যে আচ্ছা আসতে বল তাকে।'

চোখে চোখ পড়ে না যায় এমনিভাবে নিঃশব্দে করমর্দন করল দুজনে। তেসার চোখ দুটো লাল। দেসেরকে দেখাচ্ছে বুড়ো মানুষের মতো, ঘন আর কটা ভুরুর নিচে তার চোখের ফ্যাকাশে মণি দুটো প্রায় অদৃশ্য। দস্তানার ভাঁজ ঠিক করে সিগারেটের বাক্স বার করল পকেট থেকে, কিন্তু সিগারেট ধরাল না। শুধু কাগজ-চাপাটা একবার সামনে একবার পেছনে নাড়াতে থাকল। তেসার কাছে অসহ্য মনে হল এই চুপচাপ থাকাটা।

তেসার কাছে অসহ্য মনে হল এই চুপচাপ থাকাটা।

'জুল, কী বলতে চাও তুমি?' সে জিজ্ঞেস করল।

সোজা সামনের দিকে তাকাল দেসের। সে নিজেই জানে না কেন সে তেসার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এখানে আসার আগে উন্মাদের মতো সে সর্বত্র ছুটোছুটি করছিল। সেনা-বাহিনী আর মন্ত্রিমণ্ডলীর দপ্তরে গিয়েছিল, গিয়েছিল রেনো, মাদেল আর জেনারেল জর্জের কাছে। সকলকে সে নিজের মতে আনতে চেষ্টা করেছে, ভয় দেখিয়েছে, শাসিয়েছে। কিন্তু কেউ তার কথা শোনেনি, অত্যন্ত অমায়িকভাবে বাইরে বেরুবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

অবশেষে দেসেরের মুখে কথা ফুটল : 'জার্মানরা কালই হয়তো পারী অধিকার করে বসবে। মাঝখানে শুধু কয়েকটা মুহূর্ত কাটার অপেক্ষা। সরে দাঁড়াও! নয়তো বলো যে তোমরা রুখে দাঁড়াবে। যা বলবে মন সাফ করে সোজাসুজি বলো। চারদিকে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ধরে ধরে গুলি করে মার। মজুরদের নয়—ঐ লাভাল, গ্রঁদেল, ব্রতেই আর পিকারকে।'

'তুমি খেয়াল রেখে কথা বলছ কি? আমরা দুজনে পুরনো বন্ধু ঠিকই, কিন্তু আমি দায়িত্বশীল পদে রয়েছি। আমি একজন মন্ত্রী আর তুমি রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাতে চাও আমাকে দিয়ে?'

'আমি বলছি, হয় তোমরা বিদেয় হও নয়তো যুদ্ধ কর। প্রত্যেকটি রাস্তার জন্যে প্রতিরোধ গড়ে তুলে পারীকে আমরা বাঁচাতে পারি।'

'কৃতার্থ হলাম! তাহলে মজুর মহোদয়দের কমিউন প্রতিষ্ঠা করতে খুব সুবিধা হয়, তাই না? না, নিজের সম্মান বাঁচিয়ে আমি চলতে চাই।'

'কিন্তু ফ্রান্স····

'১৮৭১-এর ধাক্কার পরও ফ্রান্স উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবারও দাঁড়াবে।'

'সে সময়ে বেলফর রুখে দাঁড়িয়েছিল আর ওরা যুদ্ধ করেছিল লয়ারের ধারে। গ্যামবেতা সেনাদল তৈরি করেছিল, অবরোধ সত্ত্বেও পারী নতিস্বীকার করেনি, আর ছিল গেরিলা বাহিনী। কিন্তু এখন জার্মানদের লড়াই করতেও হচ্ছে না, তাদের মূর্তি চোখে পড়া মাত্র সবাই পালাচ্ছে।'

'তুমি কী করতে চাও?'

প্রতিরোধ করতে চাই। যদি পারীকে বাঁচানো না যায়, এস লয়ার-এ গিয়ে রুখে দাঁড়াই। সেখানেও যদি জার্মানদের না ঠেকাতে পারি তো চল যাই আলজিয়ার্সে। আমি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী আছি, শুধু টাকাপয়সা নয়, প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। আর

আমার মতো আরও প্রচুর লোক আছে। তোমার বোঝা উচিত যে তোমাদের মন্ত্রীদের আর এতটুকুও বিশ্বাস করে না কেউ।'

তেসা দপ্‌ করে জ্বলে উঠল, বলল, 'আমাদের ওপরে তোমাদের আস্থা না থাকলেও আমাদের চলবে। আমাদের পেছনে সমস্ত চেম্বারের অর্থাৎ দেশের লোকের সমর্থন রয়েছে। কাল হয়তো তুমি বলে বসবে ম্যাদাগাস্কারে যাওয়া উচিত আমাদের।'

দেসের বুঝল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। জবরদস্তি অনুরোধ করে কোনো লাভ নেই। সে সুর পালটাল :

'পল, নিজের কথাটা ভেবে দেখ! যদি জার্মানিরা জেতে তাহলে আর পার্লামেণ্ট বলে কিছু থাকবে না। এখানেও ওরা গাউলাইতার খাড়া করবে—ব্রতেই বা লাভাল। এমনিতে যথেষ্ট আপোসরফা করেছ। কী করতে চাও এখন?'

'যে করে হোক চালিয়ে নেব। তবে কথাটা উঠলই যখন বলে রাখি, কমিউন হবার চেয়ে ব্রতেইর শাসন অনেক ভালো। তোমার পরামর্শ মঙ্গলের নয়। আমার কোনো কুসংস্কার নেই, তবু আমি মনে করি তেরো সংখ্যাটা আমার জীবনে পয়া সংখ্যা। আমালি মারা গিয়েছিল চোদ্দ তারিখে। তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে নিজস্ব একটা পয়া-অপয়ার ব্যাপার আছে। আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি সব সময়েই অপয়া। ঠিক ব্রিটিশদের মতো। তুমি ব্রতেইকে সমর্থন করেছিলে, ফল হল পপুলার ফ্রন্ট। ভীইয়ারের পক্ষ নিলে, সঙ্গে সঙ্গে পতন হল লোকটার। তুমি প্রতিরোধ করতে বলছ তার মানে অতি অবশ্যই আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত।'

দেসের উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। তেসার দুঃখ হল লোকটার জন্যে। বলল, 'জুল, তুমি আমেরিকা চলে গেলেই পার। প্রচুর পয়সা আছে তোমার। আমেরিকা দেশটা একটা স্বর্গ। আমি যেতে পারছি না কারণ আমার হাত-পা বাঁধা। তোমার মঙ্গলের জন্যেই কথাটা বলা, অন্য কিছু ভেবো না····আহা, একটু সবুর কর না, এটা কি ঝগড়া করার সময়, আমার কথা শোন—যেখানে হোক চলে যাও।'

দেসের বুক টান করে দাঁড়াল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো, হাসি ফুটল মুখে, বলল, 'চলে যাব? জানি, আমি একটা অপদার্থ ফরাসী। রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রথম লোকটাই যদি আমাকে অপমান করে তাতেও আমি অবাক হব না। তবুও, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলতে পারি, আমি অ-ফরাসী নই।'

তেসা কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে দরজাটা দেসেরের পিঠের ওপর বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সমস্ত কথা। নিজের সঙ্গে কি কি জিনিস নিয়ে যাবে তার একটা ফর্দ বানিয়ে ফেলল : সদর-দপ্তরের একটা মানচিত্র, ডাকঘরের ফর্ম, এক কপি লা রেভ্যু দে দ্য মনদ্‌, যকৃতের নির্যাস, এক বোতল পুরনো আর্মাঞাক্‌ মদ আর এক কপি রাস্তার বিবরণ-দেওয়া বই। ঠিক বেরুতে যাবে এমনি সময়ে রেনোর টেলিফোন এল :

'লাওঁ জেলার অবস্থা ভালোর দিকে,' রেনো বলল, 'জার্মানদের মূল আক্রমণ চালিত হয়েছে এক নম্বর সেনাদলের বিরুদ্ধে—স্যাঁ ক্যাঁতাঁ পেরন অঞ্চলে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা ওদের। আমি আজ চেম্বারে বিবৃতি দেব।'

খুশিতে উপচে উঠল তেসা। আত্মসন্তুষ্টির হাসি হেসে সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, 'আমি বলেছিলাম আতঙ্কিত হবার কিছু নেই! বুড়ো হলেও সাহসিকতার শিক্ষা আমাকেই দিতে হচ্ছে যদিও ওটা তরুণদেরই ধর্ম।'

পলেংকে ফোন করল তেসা। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে : পলেং আগেই চলে গিয়েছে শহর ছেড়ে। তারপর সে জোলিওকে ডেকে দেখা করতে বলল। উত্তেজনায়

দিশেহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির বেঁটেখাটো সম্পাদকটি। তারপর এক দমকে অনেকগুলো কথা বলে গেল : 'সমস্ত শহরে আতঙ্ক। ম'তিনি অন্টরম্ভা দেখিয়েছে। আমার ক্যাশ-বাক্সে মোট আছে একশো ফ্রাঁ। সব কটা কাগজই পারীর বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যাই কোথায়? মার্সাই-এ? কিন্তু রোমের ভাবগতিক তো দেখছি। আমার মনে হয়, ইতালীয়রা কালই আমাদের আক্রমণ করবে।'

'টাকাপয়সার জন্যে ভেবো না, তার ব্যবস্থা হবে।' তেসা বলল, 'এত ঘাবড়াবার কি আছে বুঝতে পারছি না। অবস্থা এখন যতটা সুদৃঢ় এমন অনেককাল হয়নি। তুমি ভাবছ জার্মানরা পারীতে আসছে? মোটেও না! লণ্ডনে যাচ্ছে ওরা।' তেসা সন্তোষের হাসি হাসল।

জোলিও আপত্তি জানিয়ে বলল, 'ওরা খুব ভালো করেই জানে, এখানে কি ঘটছে না ঘটছে। তাছাড়া ওরা কি মতলব এঁটেছে, তাই বা কে জানে?'

যাই হোক, তেসা যখন বলল যে সে তার গুপ্ত অর্থ-ভাণ্ডার থেকে তিন লক্ষ ফ্রাঁ তাকে সাহায্য করবে তখন একেবারে থিতিয়ে গেল জোলিও। কাগজের আপিসে ফিরে প্রধান সম্পাদকীয় লিখতে আরম্ভ করল : 'শত্রুর গতিবিধি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মিত্রপক্ষের ফ্রন্টে যা সবচেয়ে দুর্বল জায়গা—সেই গ্রেট ব্রিটেন দখল করতে চায় জার্মানরা। আমাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে আমাদের চ্যানেল-পারের বন্ধুরা এ সম্পর্কে অবহিত আছেন।' বাড়ি ফিরে সে স্ত্রীর ওপর চোটপাট করে উঠল, 'মালপত্র সব খুলে ফেল। জার্মানরা ইংলণ্ডে যাবার রাস্তা ধরেছে। তেসা তিন লক্ষ ফ্রাঁ দিয়েছে আমায়। ইংলণ্ডের এখন কি অবস্থা তা কল্পনা করতে পারছি! যাই হোক, আমরা আরো মাসখানেকের মতো সময় পেয়ে গেলাম, এইটুকুই যা আমাদের লাভ!'

জোলিওর প্রবন্ধ পড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পারীবাসীরা। খবরের কাগজে দুটি সরকারী নির্দেশ ছেপে বার হল। আগামীকাল নৎরদাম-এর গির্জায় প্রার্থনা সভা হবে—আর রেনো সেখানে উপস্থিত থাকবে। আর পারী শহরে কমিউনিস্ট সংগঠন বলতে বাদ-বাকি যা কিছু আছে সবগুলোকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে স্বরাষ্ট্র আর আইন-মন্ত্রীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। আটজন মজুরের হাতে 'লুমানিতে' কাগজ পাওয়ায় তাদের পাঁচ বছর করে জেল হয়ে গেল। খবরের কাগজে আরো জানা গেল যে বেলজিয়ামে জার্মান সৈন্যরা প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করছে এবং অনেকগুলো ইউনিট যুদ্ধ করতে চাইছে না। শেয়ার বাজারে বেশ তৎপরতা দেখা গেল।

চেম্বারে বক্তৃতা দিল রেনো, বক্তৃতায় সে বলল সাহস আর দৃঢ়তার কথা। বক্তৃতা শেষ হলে তেসা তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন আপনি আজ। গভর্নমেণ্ট সকালবেলাতেই অন্যত্র চলে না যাওয়াতে ভালোই হয়েছে। যখন আপনি বললেন যে জার্মানরা লণ্ডনের দিকে যাচ্ছে....'

অবাক হয়ে ভুরু তুলে রেনো বলল, 'লণ্ডনের দিকে যাচ্ছে? আমি তো বলেছিলাম সমুদ্রতীরের দিকে এগোতে চাইছে ওরা। ওরা যাচ্ছে আমিএঁতে; আমাদের বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে চায়। বুঝলেন?'

তেসা মাথা নাড়ল কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করল না। মিনিট পাঁচেক পরে ব্রতেইকে চাপা স্বরে বলল, 'রেনো তার প্রভুর জন্যে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। ওর কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারা যায়? আসলে ও ইংরেজদের পোষা লোক! কিন্তু এখন ও শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। জার্মানরা যদি আমিএঁ পর্যন্ত পৌঁছয় তাহলে রেনোর পতন অনিবার্য। আর যত তাড়াতাড়ি তা হয় ফ্রান্সের পক্ষে ততই ভালো।'

উনিশ

শুনতে কষ্ট হচ্ছে। ভাঙা ভাঙা বুড়োটে গলার স্বরটা জেনারেল প্রায় ধরতেই পারছে না বলা চলে। দ্য ভিসে চেঁচাচ্ছে, 'কিছু শুনতে পাচ্ছি না।' গোলমালে তার কথা ডুবে যাচ্ছে। আচমকা গোলমালটা থেমে গেল, পিকারের গলাটা গমগম করে উঠল, যেন পাশের ঘর থেকে কথা বলছে : 'শত্রু লাওঁ-এর ওপর চড়াও হয়েছে। ফলে রাজধানী বিপন্ন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।'

দ্য ভিসে চটে উঠল, 'বাজে কথা! ওরা দেখাচ্ছে যেন লাওঁ আক্রমণ করবে। আসলে আক্রমণটা আমিএ'র দিকে। আপনি যদি আরো সৈন্য পাঠান তাহলে এখানকার অবস্থাটা গুছিয়ে আনতে পারা যাবে। দ্য গলের ট্যাঙ্কবাহিনী পাঠিয়ে দিন···· শুনলেন কথাটা?'

আবার গোলমাল শুরু হল। একটি স্ত্রীলোক ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বারবার বলছে, 'পারী......পারী......' অবশেষে দ্য ভিসে শুনতে পেল : 'ট্যাঙ্কবাহিনী......পাঠানো...... হবে না।'

ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম! তেতে-ওঠা টেলিফোন রিসিভারটা থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। দ্য ভিসে কলারটা ঢিলে করে এক গ্লাস গরম জল খেল। তার না-কামানো মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। লাল চোখ দুটোর কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা। তিন রাত্তির সে ঘুমোয়নি।

সদর দপ্তরের কর্তা এসে ঢুকল, 'জেনারেল গর এইমাত্র খবর পাঠিয়েছেন যে সকাল ছটায় আক্রমণ শুরু করা হবে।'

'১১নং ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন?'

'জেনারেল ভিঞঅর মাথার ঠিক নেই। তিনি বললেন যে ডিভিশনটাকে সত্যি সত্যিই নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাঁ দিকে আক্রমণ ঠেকাবার দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'ট্যাঙ্ক আক্রমণ?'

'না, পদাতিক-বাহিনী। মোটর-লরি চেপে আসছিল।'

'বটে,' জেনারেল ক্রুদ্ধ হয়ে আরেক গ্লাস জল খেল, 'কী বিশৃঙ্খলা! কিন্তু যাই হোক না কেন, ব্রিটিশকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে, যদিও একথা আমি বলবই যে একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে জেনারেল গর আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে পারতেন। ১১নং ডিভিশনের দপ্তর এখন কোথায়?'

'গ্রাঁজে-এ।'

'এখান থেকে কতদূর?'

'সতেরো কিলোমিটার। জানি না ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে কি না। শত্রুপক্ষ যে কোথায় আছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ ঠিক নেপোলিটান আইসক্রীমের মতো : আমরা, ওরা, আমরা, ওরা।'

রাস্তা বন্ধ। একটা ট্যাংক এসে আটকে আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছাগল চরাচ্ছে। সারাটা রাস্তায় ভাঙাচোরা গাড়ি এলোমেলো ছড়ানো। আশ্রয়প্রার্থীরা—বেশীর ভাগই বেলজিয়ান,—ভাঙাচোরা বাড়িগুলোর দিকে ভয়-পাওয়া চোখে তাকিয়ে আছে।

জেনারেলের গাড়ি আধঘণ্টার জন্যে আটকে গেল। একটা চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে, সঙ্গে বাড়তি চাকা নেই। এক বুড়ী চাষী এসে দাঁড়াল জেনারেলের কাছে। তার মুখের ভাঁজ-পড়া ঘন বাদামী চামড়াকে দেখাচ্ছে জমির মতো। কাঁদতে কাঁদতে সে এপ্রন দিয়ে চোখের জল মুছছে।

'সৈন্যরা চলে যাচ্ছে কেন? আমাদের ফেলে ওরা চলে যাচ্ছে কেন?' বুড়ী জিজ্ঞেস করল।

দ্য ভিসে জবাব দিল, 'আপনি শান্ত হোন। আমার বয়েস হয়েছে, আমি অনেক দিনের সৈনিক—মিথ্যে কথা বলব না। এ জায়গা ছেড়ে আমরা যাব না। আপনারাও যাবেন না যেন।'

গ্রাঁজে পৌঁছবার ঠিক আগে সোফারকে গাড়ি থামাতে বলল জেনারেল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বার করল।

'এই যে প্রেফে মশাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

বোতাম-ঘরে লাল গোলাপ লাগানো সুন্দর সুট-পরা লম্বা লোকটা ঘাবড়ে গেল। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল একটা দস্তানা। গাড়ির মধ্যে একটি তরুণী—মালপত্র আর কার্ড-বোর্ডের বাক্স পরিবেষ্টিত হয়ে বসে। প্রেফে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং চেষ্টা করছে আশ্রয়প্রার্থীদের ছাড়িয়ে একেবারে আগে গিয়ে থাকতে।

'আমি····' তোতলাতে লাগল সে।

ভিসে হুংকার ছাড়ল, 'তোমার সম্পর্কে স্পষ্ট করে একটা কথা বলছি। তুমি কাপুরুষ!'

মাটি থেকে দস্তানাটা কুড়িয়ে নিল প্রেফে। শান্ত আর নির্লিপ্ত হবার ভান করে বলল, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর নির্দেশ মতোই কাজ করছি। আপনার গৌরবময় অতীতের কথাটা ভেবে আপনার অপমানটা····'

কথাটা শেষ হবার আগেই দ্য ভিসে একটা চড় মারল প্রেফের মুখে। গাড়ির ভেতরে মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। তারপর জেনারেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কসাই!'

অপ্রীতিকর ঘটনাটা তৎক্ষণাৎ ভুলে গিয়ে দ্য ভিসে ভাবতে বসল, পরের দিন কিভাবে সৈন্য সাজানো যেতে পারে। জার্মানদের পক্ষে ব্যাপারটা অনেক সহজ—কারণ ওদের সেনাপতিত্ব করে একজন। জেনারেল গর তার পরামর্শ নিল না কেন? বেলজিয়ানরাও নাকি নিজেদের খুশিমতো কাজ করছে। বিশৃংখলার চূড়ান্ত! কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। ব্রিটিশরা অন্ততপক্ষে আট ডিভিশন সৈন্য সরিয়ে নেবে। বিমানবহর ঠিকমতো কাজ সারতে পারলেই হল!

সমস্ত আক্রমণ পরিকল্পনাটা জেনারেল ভিঞঅকে বোঝাল দ্য ভিসে; একটিও কথা না বলে জেনারেল ভিঞঅ শুধু শুনল। দ্য ভিসে ভাবল, লোকটাকে একটু নাড়া দেওয়া দরকার। বলল, 'সবচেয়ে বড়ো কথা পারীর দিকে নজর দেবার দরকার নেই। ওখানে এখন একটা বেসামাল অবস্থা। ওরা ভেবেছিল যুদ্ধটা কেবল একটা বিতর্কের ব্যাপার—হিটলার তিনটে বক্তৃতা দেবে তো দালাদিএ ছ'টা। আজ পর্যন্ত ওদের সমস্ত কাজকর্মে ওরা শুধু বোকামির পরিচয় দিয়েছে। হল্যাণ্ডে 'অভিযান' চালানোর ব্যাপারটাই ধরুন না কেন····জার্মানরা ভালো করেই জানত যে আমাদের দুর্বল জায়গা হল নবম বাহিনী।

লোরিদোর কথা ছেড়ে দিন। ও হচ্ছে ছাঁদনাতলার জেনারেল! কিন্তু হাওয়া-বদলের কিছু কিছু আভাসও এখন পাওয়া যাচ্ছে। রাজকীয় বিমানবহর খাসা কাজ করছে। যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকেও স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে যে জার্মানদের ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক। আরাস অঞ্চলে পদাতিক-বাহিনী আর ট্যাঙ্ক-বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আশা করছি আমাদের এখানে দ্য গল ব্রিগেড পাঠানো হবে। আগামীকাল কিভাবে যুদ্ধ চালানো হবে তার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। আমরা যদি এমন জায়গায় পৌঁছতে পারি যা—'

ভিএঞঅ বাধা দিল। বুড়ো মানুষটির চেহারা সুন্দর, টক্‌টকে মুখখানা মেয়েলি-মেয়েলি, ছিমছাম সাদা গোঁফ। বলল, 'জেনারেল রামিঞকে বলেছি আরো সৈন্য না পাঠালে আমার ডিভিশনের পক্ষে আত্মরক্ষা করা পর্যন্ত সম্ভব হবে না। গত তিন দিন ধরে আমাদের বিমানবহরের তো পাত্তাই নেই। আপনি বলছেন জার্মানদের ট্যাঙ্কবাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হয়নি। আমাদের গুলি লেগে ওদের সাঁজোয়া গাড়ির প্লেট পর্যন্ত ছেঁদা হয় না। কথাটা আমিও জানি, আপনিও জানেন। গতকাল আমরা তিন হাজার দুশো সৈন্য খুইয়েছি। কারও আর মনোবল নেই। অফিসাররা নির্দেশ মানে না। আর যখন চোখের ওপরেই দেখা যাচ্ছে যে জার্মানরা কী ভীষণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে....'

দ্য ভিসে টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুষি মারল। একটা ছাইদানি লাফিয়ে উঠে পড়ে গেল মেঝেতে।

'আমরা মিটিং করতে বসিনি,' দ্য ভিসে গর্জন করে উঠল, 'এসব কি কথা বলছেন আপনি? ওরা এগোচ্ছে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বাধা না দিলে ওরা তো এগিয়েই আসবে। আপনি বলছেন, অফিসাররা নির্দেশ মানছে না! না মানার কারণ তো খুবই স্পষ্ট। ওদের কাছে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে কে! আপনি নিজে। আক্রমণের পরিকল্পনাটা আপনাকে দেখালাম আর আপনি নাকী-কান্না শুরু করলেন। সামরিক আদালতে বিচার হওয়া উচিত আপনার। লজ্জার কথা, এমন গৌরবময় জীবন আপনার আর আপনি কিনা কচি খোকার মতো ব্যবহার করছেন।'

একাদশ বাহিনীর কর্তব্য সম্পর্কে আরেকবার নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্য ভিসে। জেনারেল ভিএঞঅ তার সহকারীকে বলল, 'আমাদের দ্বারা আক্রমণ সম্ভব নয়। সামরিক আদালতে কে কার বিচার করে দেখে নেব....'

একাদশ বাহিনীর সদর-দপ্তরের শিবির হয়েছে একটি মস্ত খামারে। সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে গিয়েছে খামারের মালিক। মুরগীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে খুদের সন্ধানে। চশমা-পরা ছোকরা-গোছের একজন লেফ্‌টেনেণ্ট মুরগীগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। দ্য ভিসেকে দেখে সে স্যালুট করল, তারপর হড়বড় করে বলতে লাগল, 'জেনারেল মশাই, আক্রমণ করার হুকুম দিয়ে দিন। নইলে লোকগুলো সব ছত্রখান হয়ে যাবে। জেনারেল মশাই....'

দ্য ভিসে মাথা নেড়ে পেছন ফিরল। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে সে বিচলিত হয়েছে। ৪২নং ডিভিশনের ঘাঁটিতে যাবার হুকুম দিল সোফারকে।

পেরনের রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে চলে। রেডিওটা খুলে দেয় জেনারেল। পারীর রেডিওতে ফকস্‌-ট্রটের বাজনা। রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে স্ট্যাটগার্ট ধরে, স্ট্যাটগার্ট থেকে যে ডাচ ওয়েভ-ব্যাণ্ডে ফরাসী ভাষায় প্রচার করা হয় সেটি শোনা যায়: 'ডাচ সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্ট অংশ যা এতদিন ধরে প্রতিরোধ করছিল তা গতকাল আত্মসমর্পণ করেছে। আমাদের সৈন্যবাহিনী স্যাঁ ক্যাঁতাঁ শহর অধিকার করেছে এবং লিল ও পেরনের মাঝখানের বিস্তৃত ফ্রন্ট

জনুড়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে। অগ্রগতির শনুরু থেকে এ পর্যন্ত ডাচদের বাদ দিয়েই আমরা মোট এক লক্ষ দশ হাজার সৈন্যকে বন্দী করেছি এবং অনেক গোলা-বারুদও আমাদের হাতে এসেছে। সনুইস সাংবাদিকদের সংবাদে প্রকাশ, পারী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বহনু মন্ত্রী ইতিমধ্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। চুক্তি সম্পাদনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কাউণ্ট সিয়ানো বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন : ইতালী আর শনুধনু দর্শক থাকবে না।'

দ্য ভিসে ভাবতে শনুরু করে। জার্মানরা হয়তো কালই পেরনে এসে উপস্থিত হবে। গতিক দেখে মনে হয়, শেষ অঙ্কের অভিনয় আসন্ন। ওয়েগ্যাঁর জায়গায় গামল্যাঁ এলেই কিছনু ইতরবিশেষ হবে? মাননুষ দনুটো অবশ্য আলাদা কিন্তু মনের গড়নের দিক থেকে দনুজনের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দনুজনেই অতীতকে আঁকড়ে আছে, কিছনুতেই বনুঝতে চাইবে না যে সময় বদলে গেছে। আর একদল মনুর্খ ও অপদার্থের হাতে পড়েছে দেশের শাসনভার। তেসার কথাগনুলো মনে পড়ে যায় : 'সৈন্যবাহিনী থাকবে একেবারে পেছন দিকে।' জার্মানরা হয়তো অনেক আগেই পারী দখল করে নিতে পারত; কিন্তু ওরা চাইছে ফ্রান্সের জীবন্ত প্রাণশক্তিকে ধনুংস করতে। আগামীকাল যেভাবেই ফ্রণ্ট সাজানো হোক না কেন, তাতে বোধ হয় আর বিশেষ লাভ হবে না। সব জায়গাতেই ভিঞ্রঅর মতো কাপনুরনুষরা আছে—আর তার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা কত তাই বা কে জানে?

রেডিওর কাঁটাটা আবার পারীর দিকে ঘোরায়। ঘোষকের খনখনে গলা : 'আজ চার্চিল এক বিবনৃতিতে বলেছেন—ফ্রান্সের শাসকরা আমায় প্রতিশ্রনুতি দিয়েছেন যে যাই ঘটুক না কেন, ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত লড়বে।' দ্য ভিসে হাসে। চার্চিলকে এই প্রতিশ্রনুতিটা দিল কে? তেসা বোধ হয়? নইলে আর কে হবে? তেসাই তো গলাবাজী করে বলেছিল, 'আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব।' কিন্তু সে নিজেই নিজের রক্ষিতাটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রেফের মতো কেটে পড়েছে। সত্যি শনুধনু একটি কথাই : সৈন্যদের শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। কিন্তু তারা কেউ লড়তে চাইছে না। পিকার আর ভিঞ্রঅ কিসের স্বপ্ন দেখছে? আত্ম-সমর্পণের! নিজের জায়গায় টিঁকে থেকে প্রাণ দেবার দনুষ্টান্ত রেখে যাওয়া প্রয়োজন। তাহলে উত্তরপনুরনুষরা জানবে যে ফ্রান্সের এই দনুর্দিনেও এমন জনকয়েক ছিল যারা সত্যিকারের ফরাসী। চশমা-পরা তরনুণ লেফ্‌টেনেণ্টটির কথা মনে পড়ে, কি যেন একটা দলা পাকিয়ে ওঠে গলার মধ্যে। নিজের জন্যে দ্য ভিসে এখন শনুধনু এইটনুকুই কামনা করে যে তার মনৃত্যু যেন যোগ্য মর্যাদার মধ্যে হয়। নিজের অজান্তেই সে ভগবানের নাম জপতে শনুরনু করে, যেমন সে ছেলেবেলায় পরীক্ষায় বসার আগে করত। তার খেয়াল থাকে না যে তারা পেরনে পৌঁছে গেছে।

সহকারী গাড়ি থেকে নামল। কিছনুক্ষণ পরে কাঁধ-ঝাঁকুনি দিতে দিতে ফিরে এসে বলল, 'কারও টিঁকিটি পর্যন্ত নেই। অথচ স্কুলবাড়িতেই হেড-কোয়ার্টার হয়েছে শনুনেছিলাম!'

এমন কেউ নেই যাকে জিজ্ঞেস করা চলে, গোটা শহরটা খাঁ খাঁ করছে। লোকগনুলো বোধ হয় বোমার ভয় পেয়েছিল। ছড়ানো-ছিটনো জঞ্জাল, বিধনুস্ত ঘরবাড়ির ভাঙাচোরা আসবাব—এসবের মধ্যে দিয়ে আর এগোনো সম্ভব নয়। গাড়ি থেকে নেমে জেনারেল চারদিকে তাকিয়ে দেখল। একটা দরজা দিয়ে একজন বনুড়ী বেরিয়ে আসছে।

'আচ্ছা বনুড়ী-মা, এখানে মিলিটারি কোথায় থাকে বলতে পার?'

টাউনহলের দিকে আঙনুল দেখিয়ে কাঁদতে লাগল বনুড়ী। টাউনহলের ঘরগনুলো খালি। ঘরে ঘরে দেখল দ্য ভিসে। কাগজের টুকরো, টিনের টুপি আর হ্যাভারস্যাক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সহকারীকে খবরাখবর নিতে পাঠিয়ে বড়ো টেবিলটার সামনে বসে অপেক্ষা করতে লাগল দ্য ভিসে। টেবিলের ওপরে এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে, অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে

মনে হল কাগজটা কার যেন জন্মের সার্টিফিকেট। চিন্তা এসে আবার ভিড় করল তার মনে। ভালে'স-এ নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ছে। তার আদুরে নাতনীটা হয়তো খেলা করছে বেড়ালছানার সঙ্গে। ওদের কারও সঙ্গেই আর দেখা হবে না····বীরের মতো মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছে দ্য ভিসের। এত ক্লান্ত হয়েছিল যে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন জার্মান অফিসার আর কয়েকজন সৈন্য। অফিসারের গালে একটা কাটাদাগ। তার একচক্ষু চশমাটা ঝলক দিয়ে উঠল। অভদ্রের মতো দাঁত বের করে ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে সে বলল, 'আপনিই জেনারেল দ্য ভিসে, না? আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে····'

কুড়ি

'দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে····যেসব ভুল করা হয়েছে তার জন্যে প্রাণদণ্ড.উপযুক্ত শাস্তি নয়। মনে রাখবেন, আমাদের সৈনিকরা লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দিচ্ছে। কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব আমরা। ফ্রান্সকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র অলৌকিক শক্তি এবং সেই শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি।'

রেনোর বক্তৃতা শেষ হবার পর ভদ্রভাবে হাততালি দিল সেনেটররা। পুরনো ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ তারা। তারা জানে শিগগিরই মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে। ডেপুটিদের গ্যালারিতে বসে ফুজে কাঁদছে। দাড়িওলা স্বপ্নবিলাসীকে ছিটের রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখে হেসে উঠল সাংবাদিকরা।

তেসা সবে গাড়িতে উঠেছে এমন সময়ে ফুজে তার হাত চেপে ধরল। বলল, 'এক্ষুনি তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। রেনো ঠিক কথাই বলেছে যে, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। বেশ নির্ভীক ও অকপট উক্তি, চাবুকের মতো ধারালো! এখন আমাদের কাজ করা দরকার·····'

গত কয়েকদিন ধরে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছে তেসা, অনিশ্চয়তা আর হতাশার মধ্যে দোল খেয়েছে। পরস্পরবিরোধী সংবাদ আসছে। কতকগুলোতে পাল্টা আক্রমণের সাফল্যের সংবাদ, আবার কতকগুলোতে এমন সংবাদ যাতে বোঝা যায় যে পারীর পতনের আর দেরি নেই। পেত্যাঁ ঘোষণা করেছে যে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী বলে কিছু নেই। যা অবশিষ্ট আছে তা হল কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দল মাত্র। মাঁদেল প্রমাণ করছে যে প্রতিরোধ করা সম্ভব। মন্ত্রীরা একবার ঠিক করছে পারী ত্যাগ করাই শ্রেয়, আবার ঘোষণা করছে রাজধানীতে কোনো আশঙ্কা নেই। তেসার আহার-নিদ্রা বন্ধ। তার ধারণা সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ভীত হয়ে সে ফুজের দিকে তাকাল—লোকটার মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চায় না সে। কিন্তু ফুজে গাড়ির মধ্যে উঠে বসে চেঁচাতে শুরু করল, 'গণবাহিনী গঠন করব আমরা!'

ক্লান্তভাবে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে তেসা বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর সম্ভব নয়। আমি তান্ত্রিক নই, দৈব-ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না আমি। গতকাল জার্মানরা আরাস

রয়েছে সে, তেসা, যাকে এবার সাহসের সঙ্গে দান দিতে হবে। মস্কোর সঙ্গে আপোস করবে সে। তাহলে আর ইতালী কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। হ্যাঁ, তাই, এমনকি জার্মানরাও ভয় পেয়ে যাবে। একটা পরিবর্তন দেখা দেবে ফ্রান্সে। সাধারণ মানুষের মনে সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস তৈরি হবে যে যুদ্ধ জয় হবেই। প্রত্যেকে স্বীকার করবে যে তেসাই দেশকে বাঁচিয়েছে —যেমন ক্লেমসো বাঁচিয়েছিল ১৯১৭ সালে।

ফুজেকে ডেকে পাঠাল তেসা। বলল, 'শোনো বন্ধু, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভালো হয়েছে। অনেক ব্যাপারে চোখ খুলে গেছে আমার। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, আমরা মাছের তেলে মাছ ভাজছি। কিন্তু আরো ব্যাপকভাবে দেখা দরকার। তাহলে আমার পরিকল্পনাটা তোমায় বলি। তোমাকে কিংবা কংকে আমরা মস্কোয় পাঠাব।'

'মস্কোয়? কিসের জন্যে?'

'তোমাকে ওরা খুবই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তুমি যদি না যেতে চাও তাহলে আমরা কংকে পাঠাব।'

'কিন্তু কিসের জন্যে?'

'কিসের জন্যে? এর ফলে ওদের মনের ওপরে জবর রকমের একটা ছাপ ফেলা যাবে, যার প্রভাব পড়বে ইতালীর ওপর। ফলে আমাদের মনোবল দৃঢ় হবে। আর তাছাড়া, রাশিয়ানরা আমাদের গোলাবারুদ দিতে পারে—যেমন ধরা যাক এরোপ্লেন।'

ফুজে ক্ষেপে গেল। চিৎকার করে বলল, 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? রুশদের কি এমন দায় পড়েছে যে তোমাকে উড়োজাহাজ দিতে যাবে? মাস দুয়েক আগে তুমি নিজেই গলাবাজি করে বেড়াচ্ছিলে যে বাকুকে ধ্বংস করে ফেলা উচিত।'

'ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে এর বিরোধীই ছিলাম। এর মূলে রয়েছে দালাদিএর একগুঁয়েমি। ওকে 'ভাকলুসের ষাঁড়' বলাটা ঠিক নয়। ও একটা গাধা। নির্ভেজাল গাধা। কিন্তু পুরনো কথা খুঁচিয়ে তুলে লাভ কি? এখন আমরা মস্কোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। আর এ-ব্যাপারে তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার?

'রুশরা জাহান্নমে পাঠাবে তোমায়, আর সেটা কিছু অন্যায় হবে না। প্রথম প্রশ্ন হল : তুমি কাদের মুখপাত্র হয়ে কথা বলছ? তোমার পেছনে তো কোনো জন-সমর্থন নেই। মজুরদের এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। খবরের কাগজে আজ আরো আটজন কমিউনিস্টের বিচারের কথা বেরিয়েছে। তোমার ঐ 'ভাকলুসের গাধাটাই' তো পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী। ফরাসী জনসাধারণ মস্কোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারে—কিন্তু তুমি পার না। আমার পরামর্শ যদি শোনো তাহলে এখন তোমার পক্ষে মাত্র একটি কাজই করা সম্ভব—তা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের কাছে তোমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেওয়া। আমাদের একটা জননিরাপত্তা কমিটি দরকার।'

ফুজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা। তেসা ভাবতে লাগল—আর কি করতে পারে সে। কমিউনিস্টদের কাছে একটা আবেদন জানালে মন্দ হয় না! কী দুর্ভাগ্য, দেনিসের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তার!

তেসা স্থির করল ফেরনের কাছে প্রস্তাবটা তুলে দেখবে। লোকটা উকিল, আদালতে প্রায়ই কমিউনিস্টদের পক্ষ সমর্থন করে। তাকে শিগগিরই এসে দেখা করতে বলবে সে।

'জানি বহু কমিউনিস্টের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার। আশা করি এই চিঠিটা পৌঁছে দিতে আপনার আপত্তি হবে না।' তেসা বলল।

'কাকে?'

তেসা লজ্জা পেল, বিড়বিড় করে বলল, 'আমার মেয়েকে। চিঠিটা ভয়ানক জরুরী। যত তাড়াতাড়ি পারেন দেবেন—এর ওপর আমার একজন প্রিয়জনের জীবন নির্ভর করছে।'

ফেরনে বলল 'আচ্ছা।'. তারপর একটু মুচকি হেসে কথাটা শেষ করল : 'যদি আপনার পুলিশরা আমার পিছু না নেয় তাহলে চিঠিটা বিকেলেই দিয়ে দেব।'

তেসা লিখেছে :

দেনিস,

তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। কথাটা ব্যক্তিগত নয়, অতীব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে। আমার অনুরোধ, কাল সকালে নটার সময়ে একবারটি এসো। আবার বলছি কথাটা আমাকে নিয়ে নয় বা কোনো স্বার্থ নিয়ে নয়। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার আসার খবর কেউ জানতে পারবে না।

তোমার দুঃখী বাবা
পল তেসা

সন্ধেবেলা তাকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে হল। রেনো রিপোর্ট দিচ্ছিল : 'ওয়েগাঁ ফিরে এসেছে। বলা বাহুল্য, পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক। তা সত্ত্বেও আমরা পাল্টা-আক্রমণের তোড়জোড় করছি। ব্রিটিশদের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। পঞ্চম ডিভিসন আবাস্-এর দিকে অভিযান করেছে।' রিপোর্টে তেসা তেমনভাবে মন দিতে পারল না, নিজের চিন্তাতেই ডুবে রইল। সভা শেষ হবার পরে রেনোকে ডেকে নিয়ে এল একপাশে।

'মস্কোর সঙ্গে একটা আপোস করা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?' তেসা শুধোল।

রেনো বলল, 'গত কয়েকদিন পরিস্থিতিটা এত সংকটজনক হয়ে উঠেছে যে আমি শুধু সামরিক বিষয় নিয়েই ডুবে আছি। কূটনীতিক ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিয়েছি বোদুয়াঁর হাতে।'

বাড়ি ফিরে তেসা ঘুমের ওষুধ খেল। ঘুম ভাঙল আটটার সময়ে। প্রাতরাশে বসেছে এমন সময়ে খবর এল যে একজন মহিলা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছে। তেসা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওকে এখানে নিয়ে এসো।'

ঘটনার স্রোতে সে এমন গা ভাসিয়ে দিয়েছে যে সে ভুলেই গেল যে সে বাবা। তার মনে হতে লাগল যেন এক রাষ্ট্রদূতকে সে অভ্যর্থনা করছে।

দেনিস নীরস গলায় বলল, 'যদি বিশেষ কোনো একটা মতলব নিয়ে আমাকে ডেকে থাকো তাহলে তাতে ফল হবে না। পার্টিকে জানিয়েই আমি এখানে এসেছি।'

তেসা বল, 'পার্টিকে জানিয়ে এসেছ তো? খুবই ভালো হয়েছে। দেনিস, তোমাকে আর কি বলব, অবস্থাটা খুবই গুরুতর। পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এ সময়ে আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। ফ্রান্স বাঁচে কি বাঁচে না—এমনি অবস্থা। এখন চাই উদ্দীপনা—তা ছাড়া দেশকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। আমিই প্রথম কমিউনিস্টদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। দমননীতি আমরা বন্ধ করব। কিন্তু কমিউনিস্টরাও তাদের প্রচার বন্ধ করুক। বুঝলি ব্যাপারটা? কমিউনিস্টদের নাগরিক কর্তব্য হল মস্কোর ওপর প্রভাব বিস্তার করা। আমরা বোধ হয় কংকে মস্কো পাঠাচ্ছি। প্রথমে ফুজের কথা ভেবেছিলাম কিন্তু ওর বয়েস হয়েছে আর লোকটা কেমন যেন বিদ্যাবাগীশ। শুধু তোকেই বললাম কথাটা, বাইরের লোকের কানে যেন না ওঠে। আমার প্রস্তাবটা তুই তোরে বা দুক্লোস বা কাশ্যাঁ—অর্থাৎ তোর ওপরওলাদের কাছে গিয়ে বলবি। দরকার হলে আমি ওদের সঙ্গে দেখা করব। আমি কোনো কিছুতেই পিছ্-পা নই।'

দেনিস বলল, 'আমার মনে হয় না তোমার কথায় কেউ গুরুত্ব দেবে। এখনো চৌত্রিশ হাজার কমিউনিস্ট জেলে রয়েছে। আগে তাদের মুক্তি দাও। তারপর নিজেরা সরে দাঁড়াও। জনসাধারণের হাতে তুলে দাও ক্ষমতা।'

'ক্ষমতাটা মোড়কের মতো হাতে তুলে দেওয়া যায় না।' উত্তেজিত হয়ে তেসা বলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংযত করল নিজেকে। 'শাসনতন্ত্র মাফিক আমরা চলি। যতক্ষণ না পার্লামেন্টের আস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ততক্ষণ সরে দাঁড়াতে পারি না। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ব্যাপারটা হয়তো সম্ভব হবে না। সমাজতন্ত্রীরা এর বিরুদ্ধে। সেরল্ আমায় গতকাল বলছিল যে কমিউনিস্টদের সে দেওয়ানি আইনের পর্যায়ভুক্ত করতে রাজী নয়। কিন্তু আমি যখন তাকে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম সে জবাব দিল, কমিউনিস্টরা আগে অস্ত্রত্যাগ করুক। পরিস্থিতিটা খুবই ঘোরালো! আর ওদিকে দক্ষিণপন্থীরা তো সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা কমিউনিস্টদের মুক্তি দিলে প্রথম ব্যালটেই সরকারের পতন হবে।

দেনিসের মন এমনিতেই চিন্তাভারাক্রান্ত। গত কয়েকদিন ধরে সে সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের মুখে শুনেছে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভীরুতার ভয়ংকর সব কাহিনী। আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড়ে প্যারী ছাপিয়ে উঠছে, মানুষের দুঃখ রাখার আর জায়গা নেই। কিন্তু কমিউনিস্টদের ধরপাকড় সমানে চলেছে। গতকাল গ্রেপ্তার হয়েছে লুসি। এই মেয়েটির সঙ্গে দেনিস কারখানায় কাজ করত আর সারাক্ষণ হাসত মেয়েটি। পুলিশ ওকে রাস্তায় গ্রেপ্তার করেছে। মেয়েটি বাড়িতে তার কোলের শিশুকে রেখে এসেছিল, বাড়ি গিয়ে তাকে আনতে চাওয়ায় পুলিশ বলেছে, 'ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।' মিশো রয়েছে উত্তরাঞ্চলের সৈন্যবাহিনীতে, যে-বাহিনী ঘেরাও হয়ে পড়েছে। মে মাসের যুদ্ধের পর দেনিস মিশোর কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি। এতক্ষণে দেনিসের মানসিক স্থৈর্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। কেঁদে ফেলল দেনিস।

আর দেনিসের কান্না তেসার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। অন্য সমস্ত চিন্তা মুছে গেল তার মন থেকে। ভুলে গেল ফুজের কথা, তার নিজের পরিকল্পনার কথা। শুধু থাকল দেনিস। তার মেয়ে দেনিস। ইস্, কী রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা! নিশ্চয়ই বড় দুঃসময় যাচ্ছে। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে বোধহয়, প্রতিটি রাত কাটাচ্ছে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায়।

'আহা রে, বাছা আমার!' মৃদু স্বরে বলল তেসা।

কথাটা শুনে দেনিস প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল তেসার দিকে।

'তুমি কক্ষনো বুঝবে না কেন আমি কাঁদছি। তুমি যে আমার বাবা, আমরা দুজনেই ফরাসী ভাষায় কথা বলি আর একই বোমায় আমরা মারা পড়তে পারি এ যেন আমি ভাবতেই পারি না। ভাবতে কষ্ট হয়! বুঝতে পারছ আমি কী বলছি? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে—এ চিন্তা আমার পক্ষে অসহ্য. ....'

'কিন্তু তুই যে আমার মেয়ে একথা আমি কোনদিন ভুলিনি।' তেসা ঘরের শেষ পর্যন্ত হেঁটে গেল। মনে পড়ল, দেনিসকে রাজী করাতেই হবে। তখন বলল, 'দেনিস, আমাদের দলগত ঝগড়া তোলা থাক এখন। তোর সাহায্য আমি চাই। ফ্রান্সকে বাঁচাতে চাই আমি, ফ্রান্সের খাতিরে.........'

'থাম! আগে যেমন তুমি বলতে মা-র খাতিরে। কিন্তু ফ্রান্স হচ্ছে ফ্রান্স।'

দেনিস চুপ করে গেল। আশ্রয়প্রার্থী আর সৈনিকদের কথা মনে পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে গলার ভেতরটায় দলা পাকিয়ে উঠছে কি যেন। কিন্তু পাছে তেসার কাছে আবার তার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল দেনিস।

ক্রুদ্ধ হয়ে তেসা মনে মনে ভাবল, কী ভয়ানক গোঁড়া মেয়েটা! লুসিয়ঁটা অপদার্থ ছিল ঠিকই কিন্তু অনেক বেশী দয়ামায়া ছিল তার। আর এই মেয়েটা নিজেও বেঁচে নেই, অন্য কেউ বাঁচুক তাও চায় না! একেবারেই বাতিকগ্রস্ত!

কং-এর দৌত্য সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে বোদ্যুঁয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেল তেসা। বোদ্যুঁয়া ফাঁকা ফাঁকা জবাব দিল আর ইতালীর প্রসঙ্গে টেনে ঘুরিয়ে নিল আলোচনাটা। তার ধারণা, কিছু ত্যাগস্বীকার করা উচিত এখন, জিবুটি কিংবা টিউনিসিয়ার একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ওপর পালটা চাপ দেওয়া যাবে যে ওরাও কিছু ছাড়ুক। যেমন, মাল্টা। মুসোলিনী তো আপোস করতে রাজী; কিন্তু সেজন্যে লাভাল বা ব্রতেইর মতো উপযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাতে হবে রোমে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে তেসা ফুজেকে টেলিফোন করল। বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আমার কথাটা সঠিক বুঝতে পারনি তুমি। আমরা তোমায় বা কংকে অনির্দিষ্ট কিছু একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে চাই। যেমন ধর, গালিসিয়ান শিল্পের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একটি মীমাংসা করা বা কাঠ কেনা। তারপর সেখানে গিয়ে ব্যাপারটার আভাস দিতে চেষ্টা করলে। এভাবে হাজির হলেও বিষয়টি সমান গুরুত্ব পাবে। কিন্তু এতে আমাদের দিক থেকে সুবিধে এই যে আমরা কোনো বাধ্যবাধকতায় পড়ছি না। দক্ষিণপন্থীদের আমরা বলব: মস্কোতে আমাদের একজন রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত নেই। ব্রতেইও আমাদের সঙ্গে ঝগড়া পাকিয়ে তুলতে পারবে না—বিশেষ করে এখন তো নয়ই, কারণ আমরা মুসোলিনীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা শুরু করতে চলেছি। ব্রিটিশরা কথা দিয়েছে যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার আওতা থেকে তারা ইতালীয় জাহাজ বাদ দেবে। এই তো একটা জিত। কি বলো?'

কোনো জবাব এল না। রাগে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছে ফুজে।

তেসার এত জল্পনা-কল্পনা সবই মাটি। শহরের বাইরে গিয়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চাইল সে। কী অদ্ভুত সুন্দর দিন! লিলাকে, জেসমিন আর উইস্‌তারিয়া ফুল ফুটে রয়েছে, চারিদিকে তার মৃদু সৌরভ। তেসা সত্যিই সান্ত্বনা পেল; এত সব ঘটনা সত্ত্বেও বসন্ত এসেছে আবার।

ফেরবার পথে বোয়া দ্য ভ্যাঁসেন-এ কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে দেখা। সৈন্যরা ট্যাঙ্ক-রোধী ট্রেঞ্চ কাটছে। দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করল তেসা; স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, আমি বলছি, পারীতে ঢোকার কোনো সুযোগই ওরা পাবে না। সিংহের মত আত্মরক্ষা করবে পারী।'

একুশ

এই শহরটিও খুবই ছোট, পিকার্ডির অন্য সব শহরের মতো। স্কোয়ার আছে, আছে একটা লম্বা রাস্তা, রাস্তার দু-ধারে নিচু নিচু ইঁটের বাড়ি। স্কোয়ারের মধ্যে শোভা পাচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর গম্বুজওলা টাউন হল, গম্বুজের চুড়োয় সোনালী সিংহ। টাউন হলের পরেই দুটো কাফে, একটি বিভাগীয় দোকান ও 'সাদা ঘোড়া' নামে একটা হোটেল।

শহর থেকে মাইল খানেক দূরে একটা সাইকেলের কারখানা। সেই কারখানার কর্মচারীরাই এই শহরের জনসংখ্যার প্রধান অংশ। শহরের অনেক মেয়েই ভালো লেস তৈরি করতে পারে। খোলা জানলার ধারে বসে বসে তাদের বুনবার কাঠি চালাতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে গ্রীষ্মকালে টুরিস্টরা আসে। তারা প্রাচীন টাউন হলটি দেখে আর স্কোয়ারে বসে বিয়ার খায়। শীতকালে মজুররা গিয়ে বসে কাফেতে, পোড়ামাটির তৈরি লম্বা

লম্বা পাইপে তামাক টানে আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে। যুদ্ধের আগে একজন কমিউনিস্ট মেয়র হয়েছিল, টাউনহলের ওপরে তেরঙা আর লাল দুটো ঝান্ডাই উড়ত তখন। দেওয়ালের লেখাগুলো আজও মুছে যায়নি : 'ফ্যাশিজম ধ্বংস হোক!' 'পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ!' লেখার সঙ্গে জবড়জং ধরনের আঁকা হাতুড়ি-কাস্তের ছবি। রবিবার লোকে জিন খায় আর মোরগের লড়াই দেখে। সেদিন সিনেমায় 'মৃত্যু-চুম্বন' ছবিটা দেখানো হয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা খালের ধারে ঘুরে বেড়িয়েছে আর জলপদ্ম তুলেছে। শহরের মানুষ সকাল সকাল ঘুমোতে গেল; রাত এগারোটায় রাস্তায় একজন মানুষও নেই! শুধু টাউনহলের ঘড়ির ঘন্টার রেশ সুরের মূর্ছনা তুলে রাত্রির প্রহর জানাতে লাগল বা কোনো একটা ছোট্ট বাড়ির ঘরে ভেতর থেকে শোনা যেত লাগল স্ত্রীলোকের গলায় ঘুমপাড়ানী গান : 'খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো!'

প্রথম বোমাটা পড়ল রেল-স্টেশনের কাছাকাছি বাড়ি দুটোর ওপরে। বোমায় মারা গেল এক বুড়ো কামার আর আহত হল দুজন স্ত্রীলোক। দ্বিতীয় বোমায় ধ্বসে পড়ল টাউনহলটা। ভাঙা ইঁট-পাথরে ছেয়ে গেল সমস্ত স্কোয়ারটা। সোনালী সিংহ পড়ে রইল আবর্জনার মধ্যে। শহরের মানুষ পালাতে আরম্ভ করল। আঠারো হাজার লোকের মধ্যে রইল শুধু একশোজন।

একটি স্ত্রীলোক নীল এনামেলের কফি-পট এনে মিশোর জন্যে কফি ঢালল। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি চলে যাচ্ছ?'

'এই তো সবে আমরা পৌঁছেছি।'

'শুনলাম তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ। সবাই চলে গেছে। আমি যেতে পারিনি। মা-র অসুখ। মাকে আমি রোজই বলি যে তোমরা আমাদের ছেড়ে যাবে না।'

মিশো হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই যাব না। চারদিকে যা ব্যাপার ঘটছে তা দেখে-শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। সবাই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। কেউ থামাচ্ছে না তাদের। কী সব মানুষ! ওরা আমাদের ফিনল্যান্ডে পাঠাতে চেয়েছিল আর এখন ওরাই জার্মানদের দেখে পালাচ্ছে। লজ্জার কথা! মানুষগুলো যদি অন্যরকম হত! সাহস হারিও না। চলে যাচ্ছি না আমরা। ভালো তলঘর আছে তোমার? তাহলে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে নিয়ে গিয়ে চুপচাপ বসে থাক। যেভাবেই হোক আমরা টিকে থাকব।'

ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ফেব্রুকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শহর রক্ষা করতে হবে। সবাই মনে করত লোকটার মাথায় ছিট আছে, তবে কারও কোনো ক্ষতি করে না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খিদে-বাড়ানো মদ খায়, আর ক্যাক্টাসের সৌন্দর্য সম্পর্কে কথা বলে। কিন্তু গত কয়েকদিনে প্রমাণ হয়েছে যে সে সাহসী আর কোনো অবস্থাতেই হতবুদ্ধি হয় না। কামব্রাই থেকে পিছু হটার সময় ব্যাটালিয়ন জোর প্রতিরোধ দিয়েছে শত্রুকে। দু দুবার পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে জার্মানদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে বিশজন মানুষ, যাদের ফেলে আসতে হয়েছিল বলে জার্মানরা বন্দী করেছিল। যখন বোমারুর আক্রমণ শুরু হল, ফেব্রু একজন সৈনিকের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে বোমারুর উদ্দেশে গুলি করতে লাগল। ফলে, শান্ত হল লোকে, কেউ আর তেমন আতঙ্কগ্রস্ত হল না। একটা বোমারু গুলিতে ঘায়েল হল। তবু আট দিনে এক-তৃতীয়াংশ শক্তি ক্ষয় হল ব্যাটালিয়নের। ওপরওলার নির্দেশ পেয়ে হকচকিয়ে গেল ফেব্রু, 'সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শহরকে রক্ষা করা' বলাটা ওদের কাছে সহজ। জার্মানরা যদি তাদের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক-আক্রমণ করে তাহলে কী দিয়ে ঠেকাবে তারা?

ফেব্রু জানে, দলের মধ্যে মিশোকে সবাই পছন্দ করে। কর্নেল কোরিয়ে যখন ভয়ে ও আতঙ্কে দুটো কোম্পানী ভেঙে দিতে চেয়েছিল তখন ফেব্রু প্রতিবাদ করেছিল। ফলে

লা হেভ্‌র্‌-এর বিদ্রোহের কথাটাও চাপা দিতে হয়েছিল। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ফেব্‌র্‌ মিশোকে জিজ্ঞেস করে, 'এ বিষয়ে মঁসিয় ডন কুইকসোটের মতামতটা কি?' এবারও সে তাই করল।

মিশো বলল, 'আমরা প্রতিরোধ করব।'

পার্টির নির্দেশ কি তা মিশোর জানা নেই: অনেক দিন পারীর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই; সুতরাং তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হল। এ ব্যাপারে ইতস্তত করার কোনো কারণ নেই, কমিউনিস্টরা কাপুরুষ নয়! তারা দেখিয়ে দেবে—তারা লড়তে পারে। এখন প্রশ্নটা রেনো, তেসা বা দালাদিএকে নিয়ে নয়, এ হল ফ্রান্সের জন্যে সংগ্রাম করার প্রশ্ন।

চারদিকে শত্রু। কেউ হাতে হাতকড়া পরাচ্ছে, কেউ বোমা ফেলছে।

থায়েলমানকে ফাঁসিকাঠে উঠিয়েছিল আর স্পেনকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল যে মৃত্যু-দূত নাৎসীরা—তারা এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যেও ফ্যাশিস্টরা সক্রিয়, যারা হিটলারের বন্ধু, ব্রতৈই, গ্রঁদেল আর পিকার।

যে ফ্রান্স ছিল নিরুদ্বেগ শান্তির দেশ সে-ফ্রান্স আর নেই। শত্রুর দাক্ষিণ্যের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দেশকে। এমনকি এখানেও ধ্বংসস্তূপ আর মেয়েদের কান্না। 'তোমরা কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?' মিশো টাউনহলের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রইল। অধ্যাপক মালে একবার এই দালানটি সম্পর্কে বলেছিলেন—'রেনেসাঁর মুক্তো।' মিশোর চোখে পড়ল, একটা দেওয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে—'রুটি, শান্তি, স্বাধীনতা।' মনে পড়ল ১৯৩৬-এর কথা—ধর্মঘট, ঝাণ্ডা আর গান দিয়ে ভরা সেই দিনগুলি! এই সময়ে—যখন দেশকে দুর্ভাগ্য গ্রাস করছে—তখন তার দেশপ্রেম আরো জোরালো হয়ে উঠল। কত কিছুর সংমিশ্রণেই না এই আবেগের সৃষ্টি—তার শৈশবের লীলাভূমি সাভোয়ার পর্বতমালা আর সেখানকার কলমুখর নদী ও রোদ-ঝলসানো মাঠ; পারী—মিশোর পারী, ছাইরঙা বাড়ি আর হাসি দিয়ে গড়া যে-শহর, যেখানে জিনোর মৃত্যু হয়েছে আর যেখানে ক্র্যামাঁস বেঁচে আছেন, পারী আর দেনিস। মনে হল, আলপাইন ফুলের মতো নীলচোখ পল্‌কা একটি মেয়েকে সে বাঁচাতে চলেছে। নিজের অজান্তেই তার মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল : 'ফ্রান্স... দেনিস...'

সারাদিন ধরে ওরা ট্রেঞ্চ কেটেছে, বালির বস্তা ভরেছে আর ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান ও মেশিনগান আড়াল করার কাজে ব্যস্ত থেকেছে। সন্ধেবেলা হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলল ফেব্‌র্‌। ওরা বলল, 'সব জায়গাতেই আমরা শত্রুকে কোণঠাসা করেছি। নতুন সৈন্য পাঠানো হচ্ছে। যদি পিছু হটেন তাহলে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নকে সৈন্যদলের পেছন দিক রক্ষা করার কাজে লাগাবেন।'

মিশো কারখানার ভেতরটা তাকিয়ে দেখল। মেশিনগান বসানো হয়েছে। আগের দিন এখানে বোমা পড়েছিল। সকালে বৃষ্টি হয়েছে, কারখানার একটা বোমা-ধ্বসা গর্তে টলটল করছে বৃষ্টির জল। জলের ওপরে যন্ত্রের কতকগুলো অংশ বেরিয়ে আছে। কারখানার আরেক অংশে চোখে পড়ল, একটা মিলিং মেশিন অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। খুশি হয়ে উঠল মিশো যেন শৈশবের কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বস্তু ও যন্ত্রকে ভালোবাসে সে, তাদের মধ্যে প্রাণ আরোপ করে, এমনভাবে তাদের শাসন ও শুশ্রূষা করে যেন তারা তার সন্তান। দেশের মানুষের কী অবস্থা, তাই সে মনে মনে ভাবতে লাগল। তারা চায় কাজ আর ভালোবাসা আর সুখী জীবন। কিন্তু সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে, ভেসে থাকাটাই এখন একটা সংগ্রামের ব্যাপার। বন্দরে পৌঁছুতে পারবে না সে, তার আগেই তার মৃত্যু হবে। কিন্তু অন্যরা পৌঁছুবে। পিয়ের, লেগ্রে, বুড়ো দ্যুশেন—ওরা থাকবে। যন্ত্রপাতিগুলো থাকবে—আর থাকবে দেনিস...ম্যাগ্‌নিটোগর্ক্‌স্‌-এর মতো বড়ো বড়ো কারখানা গড়ে তুলবে ওরা।

ম্যাগ্‌নিটোগর্ক্‌স্‌ কারখানার ছবিগুলো মনের মধ্যে ভেসে উঠল। গতকাল তারা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে মার্চ করে এসেছে। পায়ের নিচে চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে ফসলগুলো। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না, ফসল কেটে ঘরে তুলবে এমন লোক থাকবে না কেউ। কিন্তু আবার বসন্ত আসবে, আবার ফসল বোনা হবে। জয়ী হবে জীবন। কিন্তু এখন বড়ো দুর্দিন...

শহরের সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হল মিশো। তার সঙ্গীদের ঘুমে ঢলে পড়বার মতো অবস্থা, তবুও জেগে আছে আর কী করে প্রতিরোধ করবে তা-ই আলোচনা করছে। সংখ্যায় তারা মাত্র তিনশোজন। এদিকে জার্মানদের সঙ্গে ট্যাঙ্ক আছে। মিশো তাদের উৎসাহ দিল এবং স্পেন-যুদ্ধের গল্প বলল :

'কখনো কখনো আমরা মাত্র তিরিশজন পুরো একটা ব্যাটালিয়নের মুখোমুখি হতাম। ওদের ট্যাঙ্ককে শায়েস্তা করতাম হাত-বোমা দিয়ে। আমাদের হাতে অন্য কিছু ছিল না। পেপে বলে একটা ছেলে আট-আটটা ট্যাঙ্ক খতম করে দিয়েছিল।'

'সে ছিল অন্য রকম ট্যাঙ্ক। কিন্তু জার্মানদের ট্যাঙ্কগুলো সাঁজোয়া, এর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা হয় না।'

'এই ট্যাঙ্কগুলোকেও খতম করা যায়। কিন্তু তার জন্যে দরকার স্পেনের সেই লোকদের মত যোদ্ধা। লোহা দিয়ে তৈরি মানুষ।'

'ওখানে তুমি জানতে কিসের জন্যে তুমি যুদ্ধ করছ। আমি নিজেও ওখানে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে কেন আমরা প্রাণ দিচ্ছি? কাকে রক্ষা করছি আমরা? তেসাকে?'

মিশো জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই দিল না। সে নিজেও চিন্তিত, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সে সচেতন।

মিশো দৃঢ়ভাবে বলল, 'না, ওদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশটা আমরা পরে করব। কিন্তু এটা তো আমাদের নিজেদেরই দেশ। এখানকার মেয়েদের দেখেছ তোমরা? ওদের স্বামীরা ফ্রন্টে রয়েছে, ঠিক যেমন আমরা রয়েছি। আমাদের থাকতেই হবে! বিশেষ করে কমিউনিস্টদের, কমিউনিস্টরাই হবে দৃষ্টান্ত। তাছাড়া, বাস্তবিকই সব কিছু ছেড়ে যাওয়া কি সম্ভব? একটা মিলিং মেশিন দেখেছি আজ...'

তার কথা শেষ হবার আগেই একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। ভোর না হতেই প্রথম গোলাটা এসে হাজির। পাণ্ডুর আকাশে গলে-গলে-পড়া তারাগুলোকে দেখা যাচ্ছে এখনো। আর ঠিক এই সময়েই বিস্ফোরণের শব্দকে বড়ো ভয়ংকর বলে মনে হতে লাগল। সূর্য ওঠার আগেই গোলাবর্ষণ শুরু হবে কেউ ভাবতে পারেনি। কেমন শীত শীত বোধ করল মিশো, বোধ হয় হিম পড়ছে; কিন্তু ঠান্ডাটা আসছে শরীরের ভেতর থেকে। মেশিনগানটা আঁকড়ে ধরল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশান্তি বোধ করল সে।

মিনিট পনের পরে কিছুক্ষণের জন্য গোলাবর্ষণ থামে। ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে আকাশে, মাঠে মাঠে পাখির কলগুঞ্জন শুরু হয়, জলে গোলাপী রং ধরে। কারও মুখে কথা নেই। দেনিসের কথা ভাবছে মিশো।

স্পেনে থাকতে যেমন সে দেনিসের বুকের উষ্ণতা আর ঠোঁটের নোনা স্বাদ অনুভব করত আজও ঠিক তেমনি একটা অনুভূতি এল। পাইন পাতার গন্ধ ভেসে আসছে। মিশো মনে মনে বলল, 'দেনিস! প্রিয়তমা! এই-ই শেষ!' এখন আর হাল্‌কা সুরে কথা বলা চলে না, বিষয়টি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তবুও ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছে না। শুধু একটা বিষণ্ণতা যে দেনিসের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না...

ট্যাঙ্কগুলো খালের ধারে এসে পৌঁছচ্ছে। চারদিকে প্রচণ্ড গর্জন; যেন পৃথিবীটাই আর্তনাদ করছে। চারদিকটা একনজর দেখে নিতে গিয়ে চোখ পড়ল ফেব্‌র্‌-এর ওপর, ফেব্‌র্‌ হাত দোলাচ্ছে।

'গোলা ছোঁড় ওদের ওপর!'

আবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ।

'ওরা আবার এক্ষুনি চলতে শুরু করবে। ওরা জানে কোথায় আছি আমরা।'

'তাতে কোনো ক্ষতি নেই।' মিশো হাসল, 'আমি ওদের স্পেনে দেখেছি। লোককে পালাতে দেখতে ওরা ভালোবাসে। কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার পছন্দ করে না ফ্যাশিস্টরা।'

'মিশো, তুমি কি চাও প্রতিরোধ করি আমরা?'

'আমি বলি, নিশ্চয়ই। ঠিক তাই!'

নটা নাগাদ জার্মানরা নতুন করে আক্রমণ শুরু করল। বাড়িগুলোর কি দুর্দশা, গোলা লেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। মিশোর কাছ থেকে তিন গজ দূরে একটা ট্যাঙ্কে আগুন ধরেছে।

'বাঁ দিকে, আলুর ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসছে...'

জার্মান মোটর সাইকেল-বাহিনী। ওরা থামল। তারপর ট্যাঙ্কগুলো আবার এগিয়ে আসতে লাগল। আহত লোকগুলোর ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে ট্যাঙ্কগুলো। চিৎকার করে উঠল ফেব্রু, 'জানোয়ারদের কাণ্ড দেখ! নিজেদের লোকদের চাপা দিয়েই এগিয়ে আসছে!'

গোলা লেগে কোম্পানী কমাণ্ডারের মৃত্যু হল। দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে তলঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল সার্জেণ্ট। ফেব্রু বুকে হেঁটে মিশোর কাছে এসে বলল, 'কারও কথা শুনো না। চালিয়ে যাও। টের পাইয়ে দাও ব্যাটাদের।'

সেই মুহূর্তের পর কত সময় কেটেছে—কয়েকটা মুহূর্ত না পুরো এক ঘণ্টা? অনবরত শুধু বিস্ফোরণের শব্দ। মিশো নিজের বাঁ হাতে ঝাকুনি দিল, রক্তে ঢেকে গেছে হাতটা।

'হামাগুড়ি দিয়ে এস এদিকে!...'

মিশো কিন্তু নড়ল না। এমনকি কথাটা শুনল না পর্যন্ত।

'আরেক বেল্ট্ গোলা দাও!...এইবার বেজাতের দল, দ্যাখ কেমন লাগে!...'

দুপুরে সূর্য মাঝ-আকাশে ঝকমক করতে লাগল, নিচের পৃথিবী শান্ত। গোলাগুলির শব্দ নেই, চিৎকার নেই। আহতদের গোঙানি পর্যন্ত থেমে গিয়েছে, নিস্তব্ধতায় তলিয়ে গিয়েছে মনে হয়। পরে তাদের একটা লরিতে বোঝাই করা হল। মিশো তার কমরেডদের দিয়ে নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধালো কিন্তু যেতে চাইল না। নিহতদের কবর দেওয়া হল। তারপর গরম জল খেল সবাই; জলে টিনের বাক্সের গন্ধ। শক্ত অসুখে ভুগে উঠলে শরীরে যেমন আর জোর পাওয়া যায় না, তেমনি মনে হতে লাগল সকলের। তারা হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তারপর একটু একটু করে তারা সচেতন হল যে খুবই সাধারণ অথচ খুবই আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটেছে—আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিয়েছে তারা।

মিশোর কাছে গিয়ে ফেব্রু বলল, 'সাবাস, ডন কুইকসোট! স্পেনে তুমি কী ছিলে?'

'লেফ্টেনেণ্ট।'

'এ জন্যে কর্নেল তোমায় হাজতে পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি জেনারেল করে দিতুম তোমায়। শুনেছি তুমি নাকি কমিউনিস্ট? যত সব গাঁজাখুরি গল্প!...এখন আমরা জেনেছি তুমি সত্যিই কী!......'

চোখ দুটো মুছে বোতল থেকে এক ঢোক 'রাম' খেয়ে সে আবার বলল, 'আমি হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। সুসংবাদটা জানানো উচিত ওদের।'

হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেই আগেকার মতোই নির্লিপ্ত একটা গলার স্বর কানে এল। আগের দিন ওরা ফেব্রুকে বলেছিল, 'যে কোন উপায়ে ঠেকিয়ে রাখুন।' আজ

ওরা তার যা বলার আছে সমস্তই শুনল, তারপর বলল, 'রাত্রির অন্ধকারে শহর ছেড়ে চলে আসুন।' ফেব্র্ চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?' জবাব এল, 'নতুনভাবে সৈন্য সমাবেশ করছি আমরা।'

রিসিভারটা সশব্দে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফেব্র্, 'জেনারেল? ও বেটা জেনারেল না আর কিছু। অপোগণ্ড একটা!'

'বিশ্বাসঘাতক ওরা!' মিশো তার কমরেডদের বলল, 'দেশকে ওরা বিকিয়ে দিচ্ছে।'

সত্যটা উপলব্ধি করল প্রত্যেকে আর নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

বিদায় মিলিং মেশিন! বিদায় টাউনহলের সোনালী সিংহ! বিদায় হে দয়াবতী, নীল পাত্রে কফি এনেছিল যে, রুগ্না মা, উদ্‌ভ্রান্ত ও বিহ্বল দুটি চোখ! বিদায়! ধুলো-ভরা রাস্তা দিয়ে বিমর্ষভাবে হেঁটে চলল মিশো। মস্ত লম্বা এই রাস্তা, যে-রাস্তা দিয়ে পিছু হটতে হচ্ছে। দুপুরবেলার উত্তাপ ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে সে জয়ের স্বপ্ন দেখল। তার চোখ দুটি ঠিক সেই স্ত্রীলোকটির মতো, যে কফিভরা পাত্র এনেছিল।...হে সাধের স্বপ্ন, বিদায়!......

বাইশ

সন্ধ্যেবেলার পারী জনশূন্য জঙ্গলের মতো হয়ে ওঠে। এমনকি ছোট ছোট নীল বাতি-গুলো পর্যন্ত নিবিয়ে দেওয়া হয়। পথচারীদের রাস্তায় থামিয়ে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হয় তাদের। লোকের মুখে মুখে রটে যে শহরে গুপ্তচর আর প্যারাসুটধারীরা হাজির হয়েছে। রু শেরস্ মিদির এক খোঁড়া দুধওলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; সে নাকি আকাশের এরোপ্লেনের উদ্দেশ্যে সংকেত পাঠাচ্ছিল। লোকে হলফ করে বলছে পারীতে ৪০,০০০ ছদ্মবেশী জার্মান সৈন্য হাজির হয়েছে। তিনজন 'মন্ত্রশিষ্য'কে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল মাঁদেল। জনকয়েক ইতালীয়র নামঠিকানার তালিকা এবং বিমান-বিধ্বংসী কামানের অবস্থিতি চিহ্নিত পারীর মানচিত্র পাওয়া গিয়েছে তাদের কাছে।' ব্রতৈই ক্ষেপে আগুন। বলল, 'সৎ, সাধু ফরাসীদের গ্রেপ্তার করার অর্থটা কি?' পরের দিন সকালে 'মন্ত্রশিষ্য'রা ছাড়া পেল। ব্রতৈইর স্ত্রী এই বলে কাঁদছে যে 'জার্মানরা এসে পড়ল এখানে!' ব্রতৈই বলল, 'ভগবানের নাম নাও। ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না! হয়তো মার্শাল পেত্যাঁই ফ্রান্সকে রক্ষা করবে......'

শহরের রাস্তায় আশ্রয়প্রার্থীদের দেখা পাওয়া যেতে লাগল। অন্যমনস্কভাবে তারা রেলস্টেশনের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় আর শূন্য ও দৃষ্টিহীন চোখে পারীর দিকে তাকিয়ে থাকে। শহরের কোলাহল কিন্তু তাদের কানে পৌঁছয় না। মোটরচালকরা বৃথাই হর্ন বাজায় আর দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে; আশ্রয়প্রার্থীরা শুনতে পায় না কিছু; মনে হয় অন্য কোনো ভয়ানক শব্দে কান দিয়ে আছে তারা।

স্ত্রীলোকেরা ফুটপাথে এসে গা এলিয়ে দেয়। ভিড় জমে আর সবাই তাদের কাছে জানতে চায় যে তারা কোত্থেকে এসেছে। এখনো পারীবাসীদের ধারণা যে যুদ্ধ অনিশ্চিত রকমের অনেক দূরে; সংবাদপত্রওলারা এখনো উত্তর নরওয়ের যুদ্ধ সম্পর্কে খবরাখবর দিচ্ছে। কেবল আশ্রয়প্রার্থীরাই শান্তিভঙ্গ করে বলছে, 'জার্মানরা মানুষজনকে মেরে ফেলছে। কোন-

ক্রমে পালিয়ে আসছি আমরা।' যারা এসব কথা শোনবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ছে তাদের সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। যে-সব গল্প শুনলে আতঙ্ক হয় তা কেন শুনতে চায় লোকে?

বেশী সতর্ক যারা, তারা গ্রামাঞ্চলে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। অন্যেরা কাজকর্ম করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, ফুর্তি করছে। প্রথম দিনের বিমান-সংকেতধ্বনির পর যে ক্যাবারেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলো খোলা হবে কি হবে না তাই নিয়ে আলোচনা চলেছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়। বৃদ্ধরা তরুণদের এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, '১৯১৪ সালের মতো এবারেও ওদের হটিয়ে দেওয়া হবে।'

পেত্যাঁর প্রতিভা, ওয়েগ্যাঁর নীতি বা দৈব ঘটনা—কোনটিতেই আস্থা নেই ভীইয়ারের। তার ধন-সম্পত্তি বাক্সবন্দী করতে ব্যস্ত সে। ভোর থেকে তার ফ্ল্যাটে হাতুড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুলিরা যাতায়াত করছে। ভীইয়ারের এখন একমাত্র ভাবনা ছবিগুলো নিয়ে, ছবিগুলোর কি গতি হবে কে জানে। ছবির ক্যানভাসগুলোকে কালো বাক্সের মধ্যে রাখা হচ্ছে আর পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সে। তারপর নির্লিপ্তভাবে চোখ বুলিয়ে নিল খবরের কাগজে। বুঝল, সবই শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন বাকি আছে শুধু শেষের শেষটুকুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকার একঘেয়েমি।

তার এই একঘেয়েমি-বোধের মধ্যে ক্রোধও আছে। তার চোখদুটো এমনিতে অমায়িক ও বিষণ্ণ কিন্তু এখন সেই চোখেই একটা রাগের ঝিলিক চমকে চমকে উঠতে লাগল। কেন ওরা তার কঠোর জীবনকে নিরুপদ্রবে কাটাতে দিল না? সে জানে না কার ওপরে দোষারোপ করবে, সুতরাং সবার প্রতি ঘৃণা বোধ করতে লাগল—জার্মানরা আর দালাদিএ, তেসা আর কমিউনিস্টরা, ব্রিটিশরা আর অপদার্থ সেনাপতিরা।

পেরেক-আঁটা বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল ভীইয়ার। আভিঞঁতে তার ছোট বাড়িটার কি হবে? উইসটারিয়া-ঢাকা ছোট্ট লতামণ্ডপ আর বাদামী বালির ওপর সূর্যের ঝিকিমিকির কথা ভেসে উঠল তার মনে। পারীকে আর বাঁচানো যাবে না। কিন্তু জার্মানরা যদি আরো এগিয়ে যায়! না, তা হতেই পারে না। জার্মানরা আসুক পারীতে, দু-তিন দিনের জন্যে দখল করুক পারী, যাতে তাদের প্রুশিয়ান অহমিকা চরিতার্থ হয়—তারপর তাদের সঙ্গে সন্ধি করা হবে। আসলে আলসাস-লোরেনটা একটা খেলার ঘুঁটি —সামনে পেছনে ছুটোছুটি করছে কেবল। বিশ বা চল্লিশ বছর স্ট্রাসবুর্গ জার্মানদের দখলে থাকবে। অন্যদিকে কিন্তু এর ফলে শান্তি আসবে। কিন্তু তবুও তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। পারীর পতনের পরও যদি চার্চিল রেনোকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে? ফ্রান্স তো এখন ব্রিটিশদের একটা উপনিবেশ মাত্র। এই সময় ভীইয়ার কাশল আর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল তার চাকর আর কুলিদের দিকে। এতে আর ওদের কী? ওরা খাটে, চুরি করে তার ফূর্তি করে।

দরজার বেল বাজার শব্দ হল, একটু পরেই তেসাকে নিয়ে আসা হল ঘরে। তেসাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল ভীইয়ার। তেসার না-কামানো জীর্ণ মুখখানা দেখে কেমন একটা আনন্দ হল তার। তাহলে তেসারও দুঃসময় যাচ্ছে! জঞ্জালটা সে-ই সাফ করে দেখুক না!

জাঁকালো একটা কিছু খবর বলছে এমনি ভঙ্গিতে তেসা বলতে শুরু করল, 'মন্ত্রিসভায় মার্সাল পেত্যাঁকে নেবার সময় ভেবেছিলাম যে ও সমস্ত দুরূহ সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু পরিস্থিতিটা দিন-দিনই জটিলতর হয়ে উঠছে। ভয়ানক দুসংবাদ জানাতে এসেছি তোমায়। বেলজিয়ামের রাজা আত্মসমর্পণ করেছে।' তেসা ভীইয়ারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভীইয়ার চশমার কাঁচ মুছছে, খবরটা সম্পর্কে তার বিশেষ কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হল না। তেসা বলে চলল, 'জেনারেল ব্লাঁশারকে পর্যন্ত আগে থেকে সতর্ক করেনি। সৈন্যবাহিনীর অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। শয়তানিটা কতদূর বুঝতে পারছ?

লোকে ওর বাবা আলবেরকে বলত 'লা রোয়া শেভালিএ' কিন্তু ইতিহাসে লিওপোল্ডের নাম মূর্তিমান ধূর্ত হিসেবে লেখা হয়ে থাকবে।'

'রাজা যা ভালো বুঝেছেন করেছেন।' ভীইয়ার শান্তভাবে বলল, 'এছাড়া আর কীই বা করতে পারতেন তিনি? কতকগুলো অবস্থায় আত্মসমর্পণ করাটাই বীরত্বের কাজ।'

'আমরা ওরকম 'বীরত্ব' দেখাতে চাইলে হিটলার আমাদের কী শর্ত মানতে বাধ্য করবে তা একবার ভেবে দেখেছ? ও হয়তো আলসাস চেয়ে বসবে। এমনকি লিল্ দখলে আনতে চাইবে ও।'

'একথা তোমার আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। আমি দোষ দিচ্ছি না কিন্তু যুদ্ধে যাতে হার না হয় সেজন্যে কিছুই করনি তোমরা। যুদ্ধ না করেই সমস্ত ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছ। পরাজয়ের রাস্তা তো মিউনিক থেকেই তৈরি হয়ে রয়েছে। আর ঠিক সেই সময়েই তুমি মন্ত্রিসভায় ঢুকেছিলে।'

'সে কথা যদি তোল তাহলে আমিও বলব যে তুমি তা সমর্থন করেছিলে। তাছাড়া পরাজয়ের কারণই যদি খতিয়ে দেখতে হয় তাহলে ১৯৩৬-এর ধর্মঘট আর চুয়াল্লিশ ঘণ্টা সপ্তাহের কথা ভুলে গেলে চলবে না। শিল্পে বিশৃংখলা আনল কারা? আর স্পেন? স্পেনের ব্যাপারটাই বা কেন? মুসোলিনীকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল ব্লুম। তুমি ফ্রাঙ্কোকে ক্ষেপিয়ে দিলে, তারপর আবার সেই ফ্রাঙ্কোকেই যুদ্ধজয়ে সাহায্য করলে। এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে?'

তেসার গলার স্বর সপ্তমে উঠেছে, গত কয়েক সপ্তাহের সমস্ত উত্তেজনা ফুটে বেরুচ্ছে তার গলার স্বরে। ভীইয়ার কথা বলছে অসংলগ্নভাবে, তার ফাঁপা গলার স্বর শোনাচ্ছে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ আওয়াজের মতো। অনেকক্ষণ ধরে তারা একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে চলে আর কথার পিঠে কথায় নানান প্রসঙ্গ উঠে পড়ে—যেমন, পার্লামেন্টারী কূটকচালি, অবিবেচনাপ্রসূত ঘোষণা, চেম্বারের ভোট ভাগাভাগি ইত্যাদি।

প্রথমে তেসাই সামলে নিল নিজেকে। বলল, 'একে অপরকে গালিগালাজ করে কোনো লাভ নেই। মাথা ঠিক রাখাটাই এখন বড়ো কথা। বড়ো ভয়ংকর সময়ে আমরা বাস করছি, এখন আমাদের একজোট হতে হবে। আমি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি যে তুমি মন্ত্রিসভায় যোগ দাও। রেনো একটা কিছু চমকপ্রদ করবে বলে তৈরি হচ্ছে। মন্ত্রীসংকট দেখা দিলে বিদেশে একটা খারাপ ধারণা হবে, সুতরাং আমরা ঠিক করেছি ব্যাপারটা ঘরোয়াভাবে সেরে ফেলব। সবার আগে দালাদিএটাকে হটিয়ে দিতে হবে। গর্দভটার জন্যে ফ্রান্সের সর্বনাশ হতে আর বিশেষ কিছু বাকি নেই। আরো কিছু রদবদল করার ইচ্ছে আছে আমাদের সারোকে সরাতে হবে। বোদুয়াঁ আর প্রুভোসকে দলে নিতে হবে। কাজের লোক ওরা। কিন্তু জাতির বিবেকের প্রতীক হিসেবে তুমি আমাদের সবার প্রিয়। তাছাড়া তোমাকে পাওয়া মানে শ্রমিকশ্রেণীকে সঙ্গে পাওয়া।'

ভীইয়ার শ্লেষের হাসি হাসল। ওরা কি বোকা ভেবেছে তাকে? আত্মসমর্পণের ঠিক আগেই সে মন্ত্রিসভায় ঢুকবে? তার মানে বশ্যতা স্বীকার করা, আদর্শের জন্য তার পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামকে মুছে ফেলা। কিসের জন্যে? না, তেসা বাইরে বলে বেড়াতে পারবে, 'দেখ, ভীইয়ারও সই দিয়েছে।' না, নিজেকে অতটা নিচে নামাবে না সে!

ভীইয়ার বলল, 'রেনো আর তোমার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমি রীতিমত অভিভূত হয়েছি। কিন্তু মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে চাই না। আমার পার্টির প্রতিনিধি তো মন্ত্রিসভায় আছেই। সমাজতন্ত্রীরা যে দায়িত্ব এড়াতে চায় একথা বলতে সাহস পাবে না কেউ। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা আমাকে সহ্য করতে পারবে না। এমনকি ইংলণ্ডেও ওরা একজন তরুণকে মন্ত্রী হতে দেখলেই খুশি হবে। আমি শুধু এই কাজটুকু করব যে ভার-সাম্যটা যেন বজায় থাকে।'

তেসা তর্ক করে তাকে রাজী করাতে চেষ্টা করল, 'ওগুস্ত, না বলতে পারবে না তুমি! খাদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। যা কিছু আমাদের কাছে প্রিয় সবই লোপ পাবে— ফ্রান্স, পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি, আমাদের ধ্যানধারণা যা মায়ের দুধ খেয়ে আমরা অর্জন করেছি।......'

নিজের কথায় নিজেই অভিভূত হয়ে গেল তেসা; মনে পড়ল আমালির মৃত্যু, দেনিসের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎ, আশ্রয়প্রার্থী, পেত্যাঁর ঘেঙানি আর সব কথায় সেই একই জবাব : 'বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।' তার গলার স্বরে কান্নার আভাস ফুটে উঠল।

ভীইয়ার স্বস্তিবোধ করল কিন্তু কথাবার্তার ধরন তার মনঃপূত হয়নি। তেসাকে একহাত নেবার জন্যে সে বলল, 'ধ্যানধারণার কথা বলছ? কোন্ ধ্যানধারণা? আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। বলা বাহুল্য, অর্থনীতির ক্ষেত্রে তুমি যে উদারপন্থার পক্ষে সায় জানিয়ে থাক, সেখানেও তোমার চিন্তাধারা দেউলে হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলেছি। হিটলার কী নিয়ে আসছে? সমাজতন্ত্রবাদ! অবশ্য কিছুটা বিকৃত সমাজ-তন্ত্রবাদ—বলা চলে, জার্মানির সঙ্গে খাপ খায় এমনভাবে কাটছাট করা। কিন্তু আমরা যদি এই জাতীয়-সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করি এবং তার সঙ্গে স্যাঁ-সিমোঁ, প্রুধোঁ ও আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের নৈতিক শিক্ষাগুলি যোগ দিই তাহলে পুরোপুরি খাঁটি ও সত্যিকারের ফরাসী একটা কিছু লাভ করব আমরা।'

ভীইয়ারের কথায় তেসার আর কান নেই, মতবাদ নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে নেই তার। হঠাৎ চোখে পড়ল ঘরে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা—চারদিকে ট্রাংক আর বাক্‌স ছড়িয়ে আছে এলোমেলোভাবে।

'তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?' তেসা জিজ্ঞেস করল।

বিব্রত হয়ে ভীইয়ার বলল, 'হ্যাঁ, মানে, আমি নিজে থাকছি। শেষ পর্যন্ত না দেখে আমি নড়ছি না। কিন্তু ছবিগুলো অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। সংগ্রহগুলোকে নষ্ট করার কোনো অধিকার আমার নেই। ফরাসী আত্মার শ্রেষ্ঠ প্রতীক এই ছবিগুলো। রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা উচ্ছন্নে যেতে পারে কিন্তু শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলোকে খামকা বোমা লেগে ধ্বংস হতে দিতে পারি না।'

হল পর্যন্ত তেসাকে পৌঁছে দিল ভীইয়ার। বিদায় জানাবার সময় হঠাৎ কেবল একটা উষ্মা পেয়ে বসল তেসাকে, বলল, 'যত বিপদই আসুক না কেন, আমি পারীতেই থাকতে চাই। আমার কোনো সংগ্রহ নেই। আর ফ্রান্সের কথা ভাবতেই হবে আমাকে......'

তেইশ

মিয়েজার-এর মধ্যে আতঙ্কের কোনো লক্ষণ নেই; স্বাভাবিকভাবেই সে কাজকর্ম করে চলেছে। শুধু রাত্রিবেলা শুতে যাবার সময়ে একডোজ ভেরোনল খায় যাতে বিমান-ধ্বংসী কামানের গর্জনে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। ভাবাবেগশূন্য তার মুখটা দেখে মনে হয় না যে সে লিয়ঁ-র লোক। তার চাইতে জার্মান বা সুইড মুখের সঙ্গে তার মুখের আদল বেশি। এই মুখের হাসিটি বজায় আছে। লোকটা স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর, নিজের চেহারার ওপর রীতিমতো যত্ন নেয়। মোটা না হবার জন্যে টেনিস খেলে। তার বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে কেমন একটা

থমথমে নিস্তব্ধতা। তার পড়ার ঘরে কোনো ছবি বা কোনো টুকিটাকি জিনিস পর্যন্ত নেই। লেখবার টেবিলের সামনে নেপোলিয়নের একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি। কয়েকটা রেফারেন্স-বই বাদে বুককেসটা একেবারে খালি। মিয়েজার পড়তে ভালোবাসে না, বরং সে সংগীত পছন্দ করে, বিশেষ করে বাক্। মিয়েজার বলতে ভালোবাসে, 'এ আমার ধর্মের অনুকল্প।'

দুটি সন্তানের বাবা সে। তার ছেলে সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা শেষ করেছে। কেউ যাতে তাকে ভুল না বোঝে সেজন্যে মিয়েজার ছেলেকে সৈন্যদলে পাঠিয়েছে এবং চেষ্টাচরিত্র করে তাকে লেরিদোর দপ্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক বিরাট পয়সাওলা লোকের সঙ্গে, যে কালক্ষেপ না করে সমস্ত নিকেলের শেয়ার কিনে নিয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডে থাকে ওরা।

মিয়েজার ছ-ছটা ভাষা জানে। দেশভ্রমণে তার জুড়ি মেলা ভার। সব জায়গাতেই সে সমান স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে; বলে—সাংহাই-এর রেস্তোরাঁয় বাঁশের ডগা দিয়ে মুরগীর তরকারি, কালিফোর্নিয়ার ফল বা আলজিরিয়ার সুরুয়া, সবই তার পছন্দ। টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায় না, ও-সব সে ইঞ্জিনীয়ারদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কাঁচামালের দর আর বাজারের হালচাল সম্পর্কে তার দৃষ্টি সজাগ। সব জায়গাতেই তার ব্যবসায়গত লেনদেন। জার্মানির কেমিক্যাল শিল্প, নরওয়েজীয় নাইট্রেট বা চ্যাকো প্ল্যাটিনাম —সব কিছুতেই তার আগ্রহ। মিয়েজারের ধারণা দেসের লোকটা অজ্ঞ ও অপরিণত; সে বলে, 'একমাত্র যুদ্ধ-পরবর্তীকালের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগেই এ-ধরনের লোকের পক্ষে প্রাধান্য লাভ করা সম্ভব।' চেহারা ও সাজগোজের দিকে দেসেরের অমনোযোগ এবং তার অমার্জিত আচারব্যবহার দেখে মিয়েজার বিদ্রূপের হাসি হাসত।

দেসেরের প্রাধান্য খর্ব হতে দেখে মিয়েজার খানিকটা খুশি। ঘটনা তো আর এমনি ঘটে না, তার পেছনেও নিজস্ব একটা পারম্পর্য থাকে। কিন্তু ভয়ানক দুঃসময় এটা, মনে মনে ভাবল মিয়েজার। ব্যবসা খুব ভালো চলছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরে কি ঘটবে? যুদ্ধমান দেশগুলির ক্লান্ত কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়। যদি পরাজয় ঘটে তাহলে গোল-যোগ দেখা দেবে, হয়তো বিপ্লব হবে একটা। আর যদি জয়লাভ হয় তাহলে তো দেসেরের মত লোক প্রাধান্য লাভ করবে, একঘণ্টার খলিফা হয়ে উঠবে। মিয়েজার তার বংশ নিয়ে গর্ব করে; তার ঠাকুরদা ছিলেন রেলওয়ে ব্যবস্থার তিন-সিকির মালিক; আর তার ঠাকুরদার বাবা ছিলেন মস্ত ব্যাংক-মালিক—যার কথা বালজাক লিখে গিয়েছেন।

যুদ্ধটা তার কাছে প্রাচীনকালের একটা স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। দেশপ্রেমাত্মক কথাবার্তা শুনলে সে শ্লেষের হাসি হাসে। অবশ্য হাসি গোপন করতে সে জানে যাতে অপরে না মর্মাহত হয়; যেমন, তার বৌ লুর্দের অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে কিন্তু এই নিয়ে সে কক্ষনো তার বৌকে ঠাট্টা করে না। তার বিচারে মধ্যযুগীয় এমন সব কিছুতেই সে শুধু কাঁধঝাকুনি দেয়, কিন্তু বৌকে পয়সা দেবার বেলায় কার্পণ্য করে না, যদিও তার বৌ এই পয়সায় নানান গির্জার খরচ চালায়। মিয়েজার মনে করে জাতি যখন সংকীর্ণভাবে জীবন-যাপন করে তখন যুদ্ধ ন্যায্য। কিন্তু এখন এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্রিটিশ রবার ছাড়া আমেরিকানদের চলে না। জার্মানদের দরকার তেল এবং সেজন্য তাদের ডেটেরডিং বা বলশেভিকদের ওপরে নির্ভর করতে হয়। ফরাসীরা তো প্রত্যেকটি ব্যাপারেই পরনির্ভর। এ অবস্থায় যুদ্ধ করে কি লাভ? ইউরোপটা একদল নির্বোধের শাসনে না থেকে মিয়েজারের মতো ব্যবসায়ী লোকদের শাসনে থাকলে একটা ব্যবস্থাপনার মধ্যে আসা যেত।

যুদ্ধ শুরু হবার পরে মিয়েজারের বিশ্বাস ছিল না মিত্রশক্তির জয় হবে। এমনকি জার্মানরা জিতবে কিনা তাতেও সন্দেহ ছিল। তার ধারণা ছিল যে যুদ্ধে জিতবে তৃতীয়

কোনো পক্ষ। এই ভবিতব্যকে সে বাধা দিতে চেয়েছিল আর তাই মাদ্রিদে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে কথা বলেছিল। তারপরে শীতের সময়ে তার মনে হয়েছিল, সাধারণ বুদ্ধি প্রাধান্য লাভ করছে কিন্তু আসলে উল্‌টোটাই ঘটল। চেম্বারলেন বিদায় নিল আর এদিকে খেদিয়ে দেওয়া হল ব-নেকে। তারপর এল ১৯৪০-এর মে মাস।

এখন সময় এসেছে যখন তলিয়ে ভাবতে হবে আর খুব দেরি হয়ে যাবার আগেই যেটুকু বাঁচানো সম্ভব বাঁচাতে হবে। যুদ্ধে ফ্রান্সের হার হয়েছে। এক সময় হয়তো একথা শুনে লোকে বিচলিত হত; ফরাসীদের কাছে ফ্রান্সই ছিল গোটা পৃথিবী। কিন্তু এখন...... হিটলারকে অবশ্য তার দেশের লোকের মনোভাবের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে; ভার্সাই-সন্ধির শোধ নিচ্ছে ওরা। কিন্তু হিটলার লোকটা চালাক। তাছাড়া, ছিচকাঁদুনেদের কাছে এ-সমস্তই শুধু হৃদয়াবেগের ব্যাপার। সৌভাগ্যবশত পল দেরুলেদে ও তার স্বদেশী গানের অনুরাগীরা আজ আর নেই। যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই ফ্রান্সকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। ছিচকাঁদুনেরা অবশ্য কিছু সময়ের জন্যে চিৎকার জুড়ে দেবে। তারপর থিতিয়ে যাবে আস্তে আস্তে। আর তারপর দেশের ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে আসবে।

সুতরাং জেনারেল পিকার যখন হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, 'আপনি যা বলছেন তার অর্থ তো আত্মসমর্পণ,' ম্যিয়েজার জবাব দিয়েছিল, 'কথাগুলো শুনে ভয় পাবেন না। বর্তমান অবস্থায় একমাত্র যে কাজটি করা যেতে পারে তাই করছি বলছি আমি।'

এরপর একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটল। নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল জেনারেল পিকার্। দুপুরবেলা লাঞ্চের সময়ে পারীর যেসব চাকুরে মেয়েদের দেখা যায় তারাও কেঁদেছে কিন্তু তারা তো এমনিতেই কাঁদে। কিন্তু পিকার তো ছেলেমানুষ নয়। সে জানে কিসের আয়োজন চলেছে। সে নিজে ব্রতৈইর বন্ধু। সে তো অনেকবারই বলেছে, 'জার্মানরা আমাদের হারিয়ে দেবে।' তাহলে 'আত্মসমর্পণ' শব্দটা শুনে আঁতকে উঠল কেন সে?

ম্যিয়েজার বলেছিল, 'আমি আবার বলছি এই-ই একমাত্র উপায়। উত্তরাঞ্চলের সৈন্য-বাহিনীর কপালে কি আছে তা তো আগে থেকেই বলে দেওয়া যায়। বেলজিয়ানদের দফা শেষ হয়েছে। ব্রিটিশদের হাবভাব সেই সব কুমারীর মতো যারা কোনো পুরুষকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কিন্তু জার্মানরা ইংলণ্ডের ওপর হাওয়াই হামলা করলেই ওদের সতীপনার বড়াই কেটে যাবে। ব্রিটিশদের থেকে এক-পা এগিয়ে থাকা—অন্তত একটা আলাদা সন্ধি করে—তাতে তো আমাদেরই সুবিধে। আমরা যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাই তাহলে হিটলার এসে পারী দখল করবে আর মার্সাই দখল করবে ইতালীয়রা। আর ওদিকে কমিউন গড়ে উঠবে লিয়ঁতে। কোন্‌টা বাঁচানো সব চেয়ে জরুরী—পুরনো সীমান্ত না সভ্যতা? সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই কমিউনিস্টরা একটা অভ্যুত্থান ঘটাবে......'

মাস কয়েক ধরে পিকারের সমস্ত চিন্তা একটা ঘূর্ণির মধ্যে পাক খাচ্ছে। দিনে দশবার করে সে মত বদলায়। কখনো বলে, 'আমরা হেরে যাব, এবং হেরে যাওয়াই উচিত। এখনই এই কলঙ্কিত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো দরকার।' আবার কখনো কখনো ফরাসী সৈন্যবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা মনে করে পিকার্ ভাবে, 'হয়তো আমরাই জিতব।' হিটলারকে সে শ্রদ্ধা করে, হিটলার সম্পর্কে তার মনে কোনো শত্রুভাব নেই। জার্মান আশ্রয়প্রার্থীদের সে দু-চোখে দেখতে পারে না; ঘৃণার সঙ্গে তাদের সে নাম দিয়েছে 'দলত্যাগী'। জার্মান অগ্রগতির গোড়ার দিকে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তখন তার এমন অবস্থা যে এই হয়তো কোনো হুকুম দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই তা পাল্‌টে দিচ্ছে। আর এই বলে চেঁচাত যে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। কিন্তু প্যারাট্রুপ সম্পর্কে তার নিজের সাংঘাতিক একটা ভয় ছিল, ভাবত, যদি ওরা সদর দপ্তরের ওপর আক্রমণ চালায়! রাজনৈতিক খেলায়

জড়িয়ে পড়েছিল পিকার্। ব্রতেইর কাছে গিয়ে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করল সে। ব্রতেই বলল, 'শত্রুকে অন্তত এক মাস ঠেকিয়ে রাখ। আমরা রেনোকে সরিয়ে দেব আর তারপর জার্মানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসব।' পিকার্ হৃদয়স্পর্শী নির্দেশ পাঠাল : 'সৈনিক-গণ, বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও নয়!' 'এক পাও পিছু হোটো না!' জার্মানরা দিনে ত্রিশ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে আসছিল। পিকার্ ব্রতেইর কাছে গিয়ে ফেটে পড়েছিল 'আমরা আর ঠেকাতে পারছি না।' ব্রতেই ধীরভাবে জবাব দিয়েছিল, 'তোমরা যে ঠেকাতে পারবে একথা মনেও ঠাঁই দিইনি আমি।'

যাই হোক, এতদিন পর্যন্ত কেউ পিকারের কাছে আত্মসমর্পণ করার কথা বলতে আসেনি। কাজেই মিয়েজার যখন সোজাসুজি বলে বসল যে 'আমাদের বেলজিয়মের পথ অনুসরণ করা উচিত', পিকার তা সহ্য করতে পারল না। কাঁদতে লাগল সে। কিছুটা শান্ত হবার পর সে অস্ফুট গলায় বলল, 'ওরা কিন্তু আমাদের হাতে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দেবে না...'

মিয়েজার বলল, 'আমি বুঝি, এটা আপনার পক্ষে একটা মস্ত বড় আঘাত। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারালে চলবে না। ১৯৩৬ সালে আমি ভেবেছিলাম সমস্ত বুঝি ডুবে গেল। ধর্মঘটীরা দখল করে বসেছিল আমার কারখানাগুলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কাজ করে যেতে লাগলাম। হয়তো ওরা অল্প কিছু সৈন্য আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে। তরুণ অফিসারদের সামরিক শিক্ষা দিতে পারবেন আপনি। আপনার জ্ঞান তখনো কাজে লাগবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি পারীকে বাঁচাতে পারেন। আমি প্রতিরোধের কথা বলছি না। মন্ত্রীদের মধ্যে অবশ্য অনেক স্থিতধী লোক আছে। গতকাল দ্যমঁজি আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। কিন্তু রেনো আঁতকে উঠেছে। তাছাড়া মাঁদেলের একটি ভূমিকা আছে, তাও ভুলে গেলে চলবে না। ও লোকটা ফ্রান্সের দুষ্ট প্রতিভা। ও পারীতে প্রতিরোধ খাড়া করতে চায়। তার মানে রাজধানীর ধ্বংস আর অশ্রুতপূর্ব নরহত্যা। আপনার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। গভর্নমেণ্টকে আপনি জানিয়ে দিন যে সামরিক দিক থেকে পারীর প্রতিরোধ একটা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। এভাবেই আপনি ফ্রান্সের একটা মস্ত উপকার করবেন।'

পিকারের মনে পড়ল,—জুলাইয়ের সেই ঝলমলে দিন, আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফের কাছে বজ্র-মুষ্টি আর লালঝাণ্ডার মেলা।

'আচ্ছা, আমি আমার কর্তব্য পালন করব।' পিকার জবাব দিল, 'শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব। কিন্তু যদি ওরা ওয়েগ্যাঁর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসে তাহলে পারী ছেড়ে পিছু হটে যাওয়ার প্রস্তাব করব আমি। আমাদের ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনীদের জন্যে পারীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শহরকে যথাযথভাবে শত্রুর হাতে তুলে দিতে হবে, পুলিশবাহিনীকে পর্যন্ত সরানো চলবে না।'

চব্বিশ

গ্রঁদেলের পরামর্শে যুদ্ধ-কারখানাগুলোর নিরাপত্তা বজায় রাখার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আল্সাসের লোক ভাইসের হাতে। উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে ভাইস কাজে লাগল। তার পরামর্শে পুলিশের বড়োকর্তা গোয়েন্দা পাঠালেন কারখানায় কারখানায়—আর এই

গোয়েন্দার দল নজর রাখতে লাগল যেন কোথাও কোনো স্যাবোটাজ না হয়। কারখানায় কিভাবে কাজ হয় সে-সম্পর্কে এই গুপ্তচরদের কোনো ধারণাই ছিল না। তাদের বোকার মতো কথাবার্তা, অযথা হয়রানি ও হুমকিতে শ্রমিকরা উত্যক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

বিশেষ করে মিয়েজারের বিমান-কারখানায় গুপ্তচররা খুবই তৎপর। একজন মেয়ে-শ্রমিক রাগের মাথায় এই বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ওহে বীরপুঙ্গবরা, তোমরা বরং যুদ্ধে গিয়ে লড়াই কর। জার্মানরা ষোভাস-এ এসে পড়েছে। লোকের কাজে বাধা দিচ্ছ এটা বুঝতে পারছ না তোমরা?' মেয়ে শ্রমিকটিকে গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ রিপোর্টে বলা হল, মেয়েটি নাকি কারখানার যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছিল।

দিনটা গুমোট, ঝড় উঠতে পারে। সাদা আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। নিশ্বাস নেবার জন্য হাঁপাচ্ছে লোকগুলো। মিয়েজারের কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা। জার্মানরা পারীর কাছাকাছি এসে গিয়েছে। সৈন্যরা বলছে তাদের হাতে একটিও বিমান নেই। বড়-লোকরা শহর থেকে চম্পট দিচ্ছে। এমন কেউ নেই যে এই ডামাডোলের মধ্যে হাল ধরতে পারে।

দুপুরে খাওয়ার সময়ে কারখানার পেছনে পতিত জমিতে শ্রমিকরা একটা সভা ডাকল। জমির ওপর পোড়া কয়লার গায়ে জংলী আগাছা জন্মেছে। হিটলার, পুলিশের চর আর আসন্ন জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করল শ্রমিকরা।

এই বেআইনী কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্যে তরুণ তালা-কারিগর ক্লোদই ছিল প্রেরণা-দাতা। সে মাত্র গত জানুয়ারি মাস থেকে কারখানায় কাজ করছে কিন্তু তাকে আপনার জন বলে চিনে নিতে শ্রমিকদের দেরি হয়নি। যক্ষ্মা হবার ফলে সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে সে। তার জ্বলজ্বলে চোখ দেখে এই ভুল ধারণা হতে পারে যে সে একটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই সে আবেগে ফেটে পড়ছে। কিন্তু তার এলোমেলো নিশ্বাস নেওয়ার ভঙ্গিতে তার অসুস্থতা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ক্লোদ কল্পনাবিলাসী। সারা রাত গোগ্রাসে সে বই পড়ে : টলস্টয় ও ফ্লবেয়ার, শলোকভ ও মালরো। পাঁচ বছর আগে সে মেজোঁ দ্য কুলতুর-এ প্রায়ই যেত, সেখানে আলাপ হয়েছিল লুসিয়র সঙ্গে। একদিন অনেকক্ষণ কথা বলেছিল ওরা দুজন। লুসিয় কেবল 'চিরন্তন ঝড়ের' কথাই বলে যাচ্ছিল। ক্লোদ বিনীতভাবে জবাব দিয়েছিল, 'আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। সব বিষয়েই আপনার জ্ঞান আছে। কিন্তু আরো কিছু থাকা দরকার। আমার মতে কবিকে মানুষ হিসেবে সৎ হতে হবে। তাই নয় কি?' লুসিয় মনে মনে বলেছিল, 'মধ্যবিত্ত মন!' ক্লোদকে ভালো লেগে গিয়েছিল ভাইয়র, সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি নিশ্চয়ই কবিতা লেখেন। আপনার কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে।' ক্লোদ জবাব দেয়নি। সে কবিতা লেখে ঠিকই কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা পায়। তার কবিতাগুলো শেষ পর্যন্ত কেমন অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ায়। সে নিজেই জানে না কেন সে অমন কবিতা লেখে। তার কবিতা শুরু হয় ধর্মঘটের বর্ণনা দিয়ে কিন্তু তারপরই হঠাৎ সে লিখতে আরম্ভ করে জলাভূমির জঙ্গলের মধ্যে জ্বলজ্বলে পাতাবাহার বা জাহাজের মাস্তুল ও দড়িদড়ার বর্ণনা। মনে মনে সে বলে, 'এসব হচ্ছে আমার ছেলেমানুষি!'

দু বছর আগে সে স্পেনে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সীমান্তে আটক করে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পারীতে। তখন সে 'সিয়েন' কারখানায় কাজ করত। ল্যাগ্রা তাকে বলেছিল, 'তুমিই আমাদের প্রধান প্রচারক।' যদিও ক্লোদ কেমন অস্থিরচিত্ত আর নিতান্তই নিরীহ গোছের মানুষ কিন্তু অপরকে নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে স্বমতে নিয়ে আসার ক্ষমতা তার আছে। অপরের সঙ্গে কথা বলার সময়ে সে কখনো নিজের কথাটাকেই শেষ কথা হিসেবে তুলে ধরে না, বরং কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞেস করে। তার কথা

বলার ভঙ্গি, কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাওয়া, সঠিক শব্দটি খুঁজে পাবার জন্যে তার আপ্রাণ চেষ্টা—এসবের মধ্যে এমন একটা ছেলেমানুষি ও গভীর আন্তরিকতা আছে যে লোকে তার কথায় বিশ্বাস করে।

যুদ্ধের গোড়াতে ক্লোদ গ্রেপ্তার হয়ে চার মাস জেল খেটেছে। ছাড়া পেয়েছে চিকিৎসকদের পরীক্ষার পর। কোনো চাকরি পাবে এ-আশা ক্লোদের ছিল না কিন্তু হঠাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। মিয়েজারের কারখানায় টার্নার নেওয়া হচ্ছিল। আবেদনকারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল আপিসে। 'ক্লোদ দ্যুভাল'—নামটাও নজরে পড়েছিল। কিন্তু পৃথিবীতে কত দ্যুভালই তো আছে। তাকে নেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুপ্ত-চক্র গড়ে তুলেছিল সে।

শ্রমিকরা আজ তাকে ঘিরে ধরল। তার বক্তব্য ওরা জানতে চায়। ক্লোদ বলল, 'দালাদিএর চেয়ে রেনো কিসে ভালো? সবাই আমাদের সঙ্গে বেইমানি করবে....' সে কাশতে আরম্ভ করল।

শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'কাগজে তো লিখেছে যে প্রতিরোধ খাড়া করা হবে। পল্টনরা নাকি আর পিছু হটবে না। পারীর বাইরে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।'

ক্লোদ বলল, 'ওরা যদি সত্যিই প্রতিরোধ করতে চায়, তাহলে আমরা ওদের সঙ্গে আছি। ভূতের মতো খাটব। ঠিক বলিনি? মিয়েজারের কাছে অবশ্য সবই সমান। রেনোই হোক আর হিটলারই হোক ওর মুনাফা ঠিকই থাকবে। কিন্তু এই এরোপ্লেনগুলোকে আমি অন্য চোখে দেখি। এরোপ্লেন থাকলে পারীর ওপরে আকাশ থেকে বোমা ফেলা আমরা ঠেকাতে পারি। বাঁচাতে পারি ফ্রান্সকে। সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওরা শুধু জিজ্ঞেস করে—আমাদের বিমানবাহিনী কোথায়? জার্মানরা আমাদের আশ্রয়প্রার্থীদের ওপরে বিমান থেকে মেশিনগান চালাচ্ছে, কিন্তু একটাও জঙ্গী বিমান নেই আমাদের। সৈন্যদের আমরা যতটা পারি সাহায্য করব। শুধু পুলিশের চরগুলোকে হটিয়ে নিয়ে যাক এখান থেকে। এই পাজীর পাঝাড়াগুলো যদি ঘুরঘুর করে তাহলে কাজ করা অসম্ভব। তাই না?'

শ্রমিকরা ঠিক করল যে কয়েকজনকে প্রতিনিধি করে পাঠাবে। তারা উৎপাদন বাড়াতে রাজী আছে—একথা ঘোষণা করবে—প্রতিনিধিদল কিন্তু অন্যদিকে কারখানা থেকে ঐ গুপ্তচরদের সরিয়ে নেওয়ার জন্যে চাপ দেবে।

প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করতে গেলে ক্লোদের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতার হাসি হেসে ভাইস বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। পারীর শ্রমিকদের দেশপ্রেমের কথা আমি ভালো করেই জানি। প্রত্যেকটা বাড়তি বিমান যুদ্ধজয়ের সময়কে আরও সংক্ষিপ্ত করে তুলবে। আপনারা যাদের ছদ্মবেশী পুলিশ বলছেন, তাদের কারখানায় পাঠানো হয়েছে ছদ্মবেশী কমিউনিস্টদের খুঁজে বের করার জন্যে। আমার বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছেন আশা করি?'

ভাইসের নীল চোখের সঙ্গে ক্লোদের চোখাচোখি হল। মুখ ফিরিয়ে নিল ক্লোদ।

মিয়েজারের কারখানার শ্রমিকরা চলে যাবার পর অন্যেরা এল। সমস্ত বড়ো বড়ো কারখানার শ্রমিকরাই জানিয়ে গেল যে তারা আরো বেশি সময় কাজ করতে রাজী আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দাবি জানাল যে পুলিশী তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

১১৪ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্যে ভাইস মিয়েজারের সঙ্গে দেখা করতে এল। তালিকার ওপরে নির্লিপ্তভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিয়েজার বলল, 'এরা সবাই দক্ষ কারিগর! যাই হোক, তাতে এখন আর কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ভালো কথা, শহরত্যাগের ব্যবস্থা কি হয়েছে বলুন দেখি।'

'সমস্ত মজুরকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। গোলমালের সময় ওরা এখানে যত কম থাকে তত ভালো।'

'ঠিক কথা। কিন্তু যন্ত্রপাতি সরাতে চাই না আমি। ভয়ানক হাঙ্গামার ব্যাপার, তাছাড়া কোনো লাভ নেই ওতে।'

ভাইস হেসে বলল, 'আতঙ্কগ্রস্ত হননি দেখে খুবই খুশি হলাম মঁসিয় মিয়েজার। এ পর্যন্ত যত লোক দেখলাম, কারুরই মাথার ঠিক নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে যন্ত্রপাতিতে আমরা হাতও দেব না।'

ক্লোদের বন্ধুরা তাকে সময়মতো সাবধান করে দিতে পেরেছিল। কারখানার ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গীরা তাকে কারখানার উঁচু বেড়া ডিঙোতে সাহায্য করল। হঠাৎ হুইশিলের শব্দ এল কানে। ক্লোদ ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল এক বস্তিতে। পুরনো কাপড়ের ব্যবসা করে এমনি একদল লোক থাকে এই বস্তিতে। এক স্তূপ ছেঁড়া কাপড়ের মধ্যে একজন বুড়ী বসে আছে। বুড়ী চিৎকার করে উঠল, 'প্যারাস্যুটসৈন্য!'

ক্লোদ নরম গলায় বলল, 'ভয় পেও না। আমি একজন ফরাসী, একজন মজুর।'

বুড়ী তাকে আশ্রয় দিতে রাজী হল। ঝড় শুরু হবে টের পাওয়া যাচ্ছে। ছোট্ট বস্তিঘরের মধ্যে একরাশ নোংরা কাপড়ের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে ক্লোদের দমবন্ধ হয়ে এল। তার সঙ্গীদের সাবধান করে দেওয়া দরকার। বাইরে এসে তাকিয়ে দেখল ক্লোদ। কেউ কোথাও নেই। হাঁটতে হাঁটতে 'পের ওজেন' কাফেতে পৌঁছে গেল। এখানে সচরাচর তার সঙ্গীরা এসে জড়ো হয়।

দুটি ঘর নিয়ে এই কাফে। বাইরের ঘরে জিঙ্কের কাউন্টার। এখানে অনিয়মিত খরিদ্দারেরা এসে বিয়ার খায় আর মালিক 'পের ওজেন'-এর সঙ্গে গল্প করে। লোকটি মোটা আর হাসিখুশি, মুখে ঘন কালো গোঁফ, কখনো কোট পরে না। জীবনে দুটি মানুষের ওপর তার অনুরাগ। একজন তার মোটাসোটা গোঁফওলা বৌ, অপরজন মোরিস তোরে। প্রায়ই সে বলে, '১৯৩৭ সালে ময়দানের সেই সভার পর আমি মোরিসের কাছে গেলাম, তিনি করমর্দন করলেন।' কথাগুলো সে গর্বের সঙ্গে বলে। পের ওজেন জানে তার কাফের পেছনকার ঘরে কমিউনিস্টরা মিলিত হয়। ওঘরে কোনো অপরিচিত লোককে যেতে দেয় না সে। বলে, 'বিলিয়ার্ড ঘরটায় লোক আছে।' আর ওদিকে বিলিয়ার্ড টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা পার্টির নির্দেশ আলোচনা করে। তাদের হাতে থাকে বিলিয়ার্ডের কাঠি, আচমকা বাইরের কেউ ঢুকে পড়লে যেন মনে করতে পারে যে তারা বিলিয়ার্ড খেলছে।

ভেতরে ঢুকেই 'নোম' কারখানার জুল-এর দেখা পেল ক্লোদ। পরে অন্য অনেকে এল। সবার মুখে গ্রেপ্তারের আলোচনা। সাতশো মজুরকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

একটু পরেই দেনিস এসে চারজনের বিচারের কথা বলল, 'ধ্বংসকার্যের অপরাধে ওদের চারজনকে গুলি করে মারা হবে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির বয়স আঠারো। ফেরোনে ওদের পক্ষে উকিল হয়েছিল। একটু আগে কথা বলছিলাম ফেরোনের সঙ্গে। ও বলছে, ব্যাপারটা যে আগাগোড়া বানানো তা সহজেই বোঝা যায়। আদালতেই তা জাহির হয়ে গেছে। ফেরোনে ভাইসকে সন্দেহ করছে।'

ক্লোদ বলল, 'বড় সাংঘাতিক লোক। ওর সঙ্গে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম ও একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়েছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল আমি কে। আর ও যে কে তা বুঝতে আমারও বাকি থাকেনি। দেনিস, কী সব কান্ড হচ্ছে বল তো। হিটলারের চররা ফ্রান্সের গদি দখল করেছে।'

ক্লোদকে উৎসাহিত করতে চাইল দেনিস কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু জনসাধারণ......'

সে কি বলতে চাইছে ক্লোদ বুঝল না কিন্তু কোনো প্রশ্নও করল না।

কথাটা বলেই দেনিস বাইরে চলে গেল। একটু পরেই ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বলল, 'ক্লোদ, তোমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছি। ওখানে তুমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে।'

আবছা ও ছোট কাফের ভেতরটা উষ্ণ ও নিরিবিলি। কারও মুখে কথা নেই। দূরে বিমান-বিধ্বংসী কামানের গর্জন। মুহূর্তের জন্যে এই গর্জন তাদের কাছে মেঘের গর্জন বলে মনে হল আর খুশি হল তারা। তারপর সাইরেনগুলো কঁকিয়ে উঠল। এতটুকু নড়ল চড়ল না কেউ। তেমনি বসে রইল সরু সোফার ওপরে। সবাই খুব শ্রান্ত। সবাই ভাবছে জটিল পরিস্থিতির কথা। জার্মানরা কি সত্যিই আসছে?

আধঘণ্টা পরে কান-ফাটানো সোঁ সোঁ শব্দ করে বৃষ্টি নামল। ক্লোদ নিশ্বাস নেবার জন্যে রাস্তার দিকে তাকাল। ম'দো আর স্যাঁ ক্লু-র অরণ্য যেন পারীতে চালান হয়ে এসেছে। প্লেনগাছের পাতাগুলোকে দেখাচ্ছে এক পাল ভেড়ার মতো। সোঁদা মাটির গন্ধ উঠেছে।

দেনিস তার পেছনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ক্লোদ, কবে যে ফ্রান্স......।' এবারেও দেনিস কথা শেষ করতে পারল না। ওজেন বিয়ার আনল।

'মিশোর কাছ থেকে কোনো চিঠিপত্র পেয়েছ?' ওজেন জিজ্ঞেস করল।

'অনেক দিন কোনো চিঠি পাইনি। উত্তরাঞ্চলের কোথাও আছে সে।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার সে বলল, 'দূর ছাই! ওরা ওখানে লড়ছে আর মরছে কিন্তু এরা এখানে কী করছে? সৎ লোকদের ধরে ধরে শুধু জেলে পুরছে! আর এইসব কাজ করছে কারা? জার্মানির গুপ্তচররা! মোরিস যদি আজ মন্ত্রী থাকত তাহলে পারীর ত্রিসীমানায় পৌঁছতে পারত না জার্মানরা!'

পরে সন্ধ্যের দিকে ভাইস গ্রঁদেলের সঙ্গে দেখা করে তার কাছে সারা দিনের ঘটনার বিবরণ পেশ করল।

ভাইস বলল, 'মোটের ওপর প্রত্যেকটি জিনিস বেশ ভালোই উতরেছে। আমার মনে হয় এখন আমরা কারখানার সবচেয়ে হাঙ্গামাকারী লোকদের হটিয়ে দিতে পেরেছি। অবশ্য যত তাড়াতাড়ি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা যায় ততই ভালো। বিচারটা সহজেই চুকে যাওয়াতে ভালোই হয়েছে। এবার বাছাধনরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'অবশ্য যদি দণ্ডটা ওরা রদ না করিয়ে দেয়। ফেরোনে প্রেসিডেণ্ট লেব্র'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। লেব্র' তার কথা শুনে যথারীতি কেঁদেছে। ব্রতৈইর কথাই ঠিক, যত লোক তৃতীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে ওই লেব্র'টাই সব চেয়ে ছিচকাঁদুনে। তবে, মোটের ওপর ওর ব্যবহারটাই খুব ভদ্র।'

'তার মানে?'

'মানে, যা-যা করা দরকার লেব্র' সবই করে। কিছু করার না থাকলে শুধু কাঁদে।'

দুজনে হো-হো করে হেসে উঠল।

ভাইস চলে যাবার পর গ্রঁদেল টাইটা ঢিলে করে সোফার ওপর শরীরটা সটান এলিয়ে দিল। সে ক্লান্ত বটে কিন্তু তার কাজকর্ম খুব চমৎকার এগোচ্ছে। নিজের ভবিষ্যৎ কি সে নিজেই ভাবতে পেরেছিল? নিতান্ত ঘটনাচক্রেই সে কিলমানের সংস্পর্শে এসেছিল। জুয়া-খেলায় ক্রমাগত ক্ষতিস্বীকার ও আত্মহত্যার চিন্তার মধ্য দিয়ে এর শুরু। সে ভেবেছিল— এ একটা ভ্রম, মারাত্মক রকমের পদস্খলন, তার কুল-মর্যাদার কলঙ্ক। কিন্তু এই পথেই তার সাফল্যের সূত্রপাত হল। অবশ্য সঠিক পথের সন্ধান পেতে তার সময় লেগেছে। এর জন্যে অনেক বিপর্যয়, অপমান ও হীনতা মাথা পেতে নিতে হয়েছে তাকে। তেসা—ঐ

ছি'চকে ঘুষখোর তেসাটা পর্যন্ত তার দিকে এমনভাবে তাকাত যেন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা রাস্তার ছোঁড়াকে দেখছে। কুছপরোয়া নেই, একদিন সমস্ত কিছুর শোধ তুলবে সে। যখন জার্মানরা প্যারী দখল করবে, সে-ই হবে সর্বসর্বা। তখন সবাই খোসামোদ করবে তাকে। জুয়াখেলায় সবচেয়ে আসল কথা, সঠিক নম্বরটা আঁচ করতে পারা। আর ঠিক নম্বরটার ওপরই বাজী ধরেছে সে। এখন কেবল বাকি সময়টুকু ধৈর্য ধরে থাকা। তারপরই শক্তি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। সবার মুখের ওপর নিঃসংকোচে তাকাতে পারবে সে। কিলমান? জার্মান মুদ্রা? চুলোয় যাক ওসব! বিষয়ীর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না; বিষয়টাই আসল, সেদিক থেকে সে হবে ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা। আত্মসমর্পণের শর্তে যথাসম্ভব অল্পে রাজী করাবে জার্মানদের এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন সম্ভব করে তুলবে। এই হচ্ছে সত্যিকার দেশপ্রেম—দুকানের মতো বাতিকগ্রস্ত লোকদের অর্থহীন তড়পানি নয়।

কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নিজেকে বড়ো করার ইচ্ছা পেয়ে বসল গ্র'দেলকে। শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। চওড়া বিছানার ওপর শুয়ে আছে মুশ্। অনেক দিনের অসুস্থতা তাকে একেবারে ভেঙেচুরে ফেলেছে। গ্র'দেল মনে মনে বলল, 'ভাবতেই পারি না, একে কোনোদিন জড়িয়ে ধরেছিলাম!' গ্র'দেলের মনে হল মুশ্ আজ অর্ধ-মৃত। ওষুধের গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল তার। গ্র'দেল বলল, 'তিন বছর আগে অসতী হবার খেয়াল চেপেছিল তোমার। সে-সময়ে আমি কিছু বলিনি। কেন বলিনি জান? তুমি তাহলে হয়তো ভাবতে যে আমার হিংসে হচ্ছে। কিন্তু এখন আমরা এ-বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলতে পারি। আশা করি এখন তুমি প্রেমিকদের নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ করেছ। তোমার এখন পরলোকের কথা ভাবা উচিত। আমার চেয়ে একটা অপদার্থ হতচ্ছাড়াকে তোমার বেশি পছন্দ হল, কেমন? তবে কি জান, ওর বাবার চেয়েও ও নিচু দরের লোক। শ্রীমতী, ওর কোঁকড়া চুল আর সম্ভ্রান্ত ভাবভঙ্গি দেখে মজে গিয়েছিলে তুমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তোমার নাগর একজন ছি'চকে চোর আর বেশ্যার দালাল। ভেবেছিলে—আমি অপদার্থ, সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক আর গুপ্তচর। ভয়ানক ভুল করেছিলে, শাহাজাদী! আমিই একমাত্র লোক যে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে।'

মুশ নড়ল চড়ল না, যেমন ছিল তেমনি শুয়ে রইল। বালিশ থেকে মাথাটা ঝুলে পড়েছে তার।

'শাহাজাদী নির্বাক যে? কথা বল না খুকী।'

মুশের ফ্যাকাশে ঠোঁটে ছোট ছোট বুদবুদ নজরে পড়ল—সদ্যজাত শিশুর ঠোঁটে যেমন দেখা যায়। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভুরু পাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল গ্র'দেল।

পঁচিশ

বিকেলের দিকে রোদ ওঠে আর সমুদ্রের ওপরকার দুধরঙের কুয়াশা হয়ে ওঠে ফ্যাকাশে কমলা। বালিয়াড়িগুলোকে দেখাচ্ছে চাঁদের মানচিত্রের মতো। চুলের হালকা ঢেউয়ের মতো থাক্-থাক্ বালি। বালির পাহাড়ের চুড়োগুলোতে শুকনো লতানে ঘাস জড়িয়ে আছে, মনে হয় যেন জমে-যাওয়া পাথর। কাছেই সমুদ্র ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে—এইমাত্র

ভাঁটা পড়েছে সমুদ্রে। বিস্ফোরণে জলের পশলা শূন্যে ছিটকিয়ে উঠছে; ফেটে-যাওয়া গোলা পড়ে ফুলে ফুলে উঠছে সমুদ্রের জল। বোমাবর্ষণের গর্জন সত্ত্বেও জল ও বালি দিয়ে গড়া এখানকার এই জগৎ কেমন রহস্যময় আর নিষ্প্রাণ!

লুসিয়'র ইচ্ছে হতে লাগল, এই কুয়াশার দেওয়ালকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় আর বালির স্তূপকে উড়িয়ে দিয়ে সমুদ্রকে কাছে ডেকে আনে। নরম বালিতে বারবার হোঁচট খাচ্ছে সে। ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী কাছাকাছি কোথাও আছে, ঠিক কোথায় তা সে জানে না। গোলাবারুদ তার কাছে যা ছিল সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। রয়েছে শুধু একটি হাতবোমা, তার এখনকার এই উত্তেজিত জীবনে সেটিই তার একমাত্র অবলম্বন। হাত-বোমাটার দিকে সস্নেহে তাকাল লুসিয়'—জলের শেষ বিন্দুর মতো এই জিনিসটিও তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

গত এগারো দিন ধরে যুদ্ধ চলেছে। এমনকি মানচিত্রটার দিকে পর্যন্ত সে তাকায়নি। এই তো সমুদ্র—তার মানে এখানেই শেষ! তার সঙ্গীরা তাকে ডাকছে; কুয়াশার আস্তরণের ওপারে রয়েছে ব্রিটিশ জাহাজ আর চ্যানেলের ওপারে জীবন। এখান থেকে ফিরবার ইচ্ছে নেই তার। সারা দিনটা সে কাটিয়েছে ব্রিটিশদের সঙ্গে, তারপর চলে এসেছে। এখন এই অভিশপ্ত বালিয়াড়ির মধ্যে সে একা।

যুদ্ধের সেই প্রথম দিন থেকেই লুসিয়' মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সারাক্ষণ ঘুরেছে মৃত্যুর সন্ধানে। মেশিনগানের গোলাবর্ষণের মধ্যে দিয়ে সে যাতায়াত করেছে, হাত-বোমা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ট্যাঙ্কের পিছু পিছু গিয়েছে, এক বেলজিয়ান গোলাবাড়ির চিলেকোঠা থেকে জার্মান প্রহরীকে গুলি করেছে। কিন্তু মৃত্যু যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গিয়েছে তাকে। সে কখনো খবরের কাগজ পড়ে না। একদিন টমেটো-মোড়া এক টুকরো কাগজের ওপর চোখ বুলিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল : 'যন্ত্রসজ্জিত যোয়ান অফ আর্ক আমাদের সাহায্য করবে।' কাগজের টুকরোটা সে উড়িয়ে দিয়েছিল, মুখ থেকে একটা গালিও বেরোয়নি। তার সঙ্গীরা 'বিশ্বাসঘাতকতা' কথাটা নিয়ে গলাবাজি করে। কেউ কেউ জার্মানদের গাল দেয়, কেউ বা ইংরেজদের, আবার কেউ বা ফরাসী জেনারেলদের। লুসিয়' কোনো কথা বলে না। মাঝে মাঝে সে অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে :

'এই যে রে তোর খাটিয়া আর এই যে তাতে বিছানা তোর পাতা,
সাঁই করে এক শব্দ হবে, ফাটবে বোমা গুঁড়োবে তোর মাথা।'

বেলজিয়ানরা আত্মসমর্পণ করেছে তাহলে? জাহান্নমে যাক ওরা। লুসিয়' বিশ্বাস করে না যে যুদ্ধে জয় হবে। গোপন কাগজপত্র কিভাবে সে ব্রতৈইর হাতে তুলে দিয়েছিল তা সে ভুলে যায়নি। সে জানে যে তার বাবা ও জেনারেল পিকার করতে পারে না এমন কিছু নেই। গোটা দলটাই হিটলারের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়েছে। অর্থাৎ এখানেই সবকিছুর সমাপ্তি। অতীতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মৃত্যু কামনা করেছে লুসিয়'। একেবারে তলা পর্যন্ত ডুব দিয়ে দেখেছে সে, এখন চায় সাঁতরে পার হয়ে যেতে। কিন্তু অনুগত ও পরাজিত বাহিনীর সৈনিকের পক্ষে বেপরোয়া সাহসিকতাই একমাত্র পথ। বিপদ এসে ব্রতৈইর জাল থেকে মুক্তি দিয়েছে লুসিয়'কে, মুক্তি দিয়েছে ডলারের নোংরা ছোপ ও যৌবনের কলঙ্ক থেকে, যার মধ্যে মর্যাদা-হানিকর ভাঁড়ামি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। গত দশ দিনের মধ্যে একটি মাত্র ঘটনাই তাকে নাড়া দিয়েছে, তা হল অভিনেতা জ'তোইর সঙ্গে তার দেখা হওয়া। পারীতে জ'তোইর নাম কে না জানে? দেবতাদেরও প্রিয়পাত্র সে, সুদর্শন, খুব একটা প্রতিভা নেই। তবে সে সবাইকে হাসাতে পারে, আরামে থাকতে ভালোবাসে, পয়সা নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলে যেন জীবনটা তাসের টেবিলের সবুজ ময়দান। ছোট্ট পাখিরা যেমন অনায়াসে খুঁটে খুঁটে

খাবার বেছে খায় তেমনি অনায়াসে সে মেয়েদের যৌতুক ও বিধবাদের সঞ্চয় হাতের নাগালের মধ্যে খুঁজে পায়। আর এখন সে কিনা ট্যাঙ্কচালকে রূপান্তরিত হয়েছে! আটটি ফরাসী ট্যাঙ্ক শত্রুপক্ষের ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল, কিন্তু পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়ায় সেখানেই থামতে হয় তাদের। সন্ধ্যে পর্যন্ত তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করে। সাহায্য পৌঁছেছিল সকালবেলা। পাঁচটি ট্যাঙ্ক পুড়ে গিয়েছিল। কোনোমতে বেঁচে গিয়েছিল জঁতোই। সর্বাঙ্গ কালো হয়ে গিয়েছিল। যখন তাকে ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল সে কোনো কথা বলেনি। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আঁরির কথা মনে পড়েছিল লুসিয়ঁর। কয়েকটা মুহূর্ত মানুষকে কি-ভাবেই না বদলে দিতে পারে!

জীবনটা অনেক সহনীয় হয়ে এল লুসিয়ঁর কাছে; সঙ্গীদের সঙ্গে হল সম্প্রীতি। সঙ্গীদের উদ্ধার করার জন্যে বারকয়েক সে নিজের থেকেই এগিয়ে গিয়েছে, সেজন্যে তাকে একটুও ভাবতে হয়নি বা ইতস্তত করতে হয়নি। চোখের সামনে সমুদ্র দেখতে পেয়ে খুশি হল সে। মনের মধ্যে প্রথম যে-চিন্তাটা এল তা এই : 'এবার আলফ্রে বেঁচে যাবে।' কিন্তু আলফ্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? আলফ্রে একজন প্রত্নবিদ, ভাগাড়ের শকুনী আর আস্ত একটা হাবা যে বিশ্বাস করে যে ন্যায়ের জয় হবে। কিন্তু তারপরেই সে নিজের মনে মনে বলল, 'না, মানুষকে এভাবে বিচার করাটা ঠিক নয়। আলফ্রে সত্যিই ভালো লোক।' এর আগে আর কখনো এধরনের সহজ কথাগুলো লুসিয়ঁর মাথায় ঢোকেনি; তখন সে মানুষকে বিচার করত তার মেধা, দীপ্তি আর প্রতিভা দিয়ে। আর সে-ই কিনা এখন বলছে, 'লোকটা ভালো'। হঠাৎ লজ্জা পেল লুসিয়ঁ: মনে পড়ল কেমিস্টের দোকানের বাইরে জেনেতের চোখ। মুশের যন্ত্রণাকাতর কান্না আর গিল্টি-করা শববাহী গাড়ির মতো জেনীর শোবার ঘরের বিরাট বিছানাটা।

সৈন্যবাহিনীর বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলগুলো সমুদ্রতীরে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখছে। আজ স্থানত্যাগের শেষ দিন। সমুদ্রতীরের বালির স্তূপের মধ্যে ছোট ছোট সংঘর্ষ চলছে; যোদ্ধারা বালিয়াড়ির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে পরস্পরের কাছে আসছে, তারপর আক্রমণ করছে হাত-বোমা, বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে। এরই মধ্যে কুয়াশার সাদা সাদা স্তম্ভগুলো সূর্যের আলোয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল।

একটা বালির স্তূপের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে লুসিয়ঁ শুয়ে রইল। দূরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রতীরের জলে-ভেজা বালি। প্রায়-উলঙ্গ মানুষগুলো বুকে হেঁটে গিয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে সমুদ্রের জলে। এদের মধ্যে অনেকের শরীরেই বুলেট বিঁধেছে। প্রকাণ্ড কোনো মাছ যেমন খেলার ছলে জল তোড়পাড় করে তোলে তেমনি ফেনিয়ে উঠছে সমুদ্র। আরও দূরে গোলা পড়ে জলের ফোয়ারা উঠেছে। একমাত্র বেপরোয়া সাহসিকতাই বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষগুলোকে। অন্যেরা আরও অসমসাহসী ও মরিয়া হয়ে বালির স্তূপের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করছে। তারপর জার্মান বোমারুগুলো জলে ও ডাঙায় অজস্র বোমা ফেলতে লাগল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, সমুদ্রের জলকে দেখাচ্ছে ঘোলাটে আর থমথমে।

শুকনো ঘাসের মধ্যে লুসিয়ঁ একটা হেলমেট নড়ে উঠতে দেখল; নিচে জার্মান সৈন্যরা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। চকিতে লুসিয়ঁ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা হুংকার ছেড়ে ছুড়ে মারল হাতবোমাটা। বালির স্তূপগুলো সশব্দে ফেটে পড়ল আর তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে যেতে কামানের গর্জনের মধ্যে মিশে গেল। একজন জার্মান ছুটে এগিয়ে এল তার দিকে। লুসিয়ঁও বালিতে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল। তারপর একই সঙ্গে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, যেন দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করছে।

জার্মান সৈন্যটাকে কি করে পরাস্ত করল মনে নেই লুসিয়'র। শুধু এইটুকু তার মনে আছে যে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল—লোকটা দু-হাতে তার গলা টিপে ধরেছিল। হাত দুটো লিকলিকে কিন্তু বেশ সবল, হাতের শিরা-গুলো ফোলা ফোলা। লুসিয়' একবার শুধু ভাবল, 'লোকটা নখ কাটেনি!' কিন্তু লোকটার মুখের দিকে সে একবার তাকিয়েও দেখল না। জাহান্নামে যাক ও!

কিন্তু এখন শেষ হাত-বোমাটি পর্যন্ত নেই। ভিজে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল লুসিয়'—সমুদ্র সরে গিয়েছে। ভাবল, অতদূর কক্ষনো যেতে পারবে না সে। তারপর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগল। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নয়—বুলেট আর গোলার কাছাকাছি পৌঁছবার জন্যে। পরিশ্রমের দরুন তার মুখটা হাঁ হয়ে আছে। আর তার বাদামী চুলগুলো আগুনের মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে।

মৃত্যু আবার মুখ ফিরিয়ে নিল তার দিক থেকে; সাঁতার কাটতে কাটতে একটা ব্রিটিশ মোটরবোটে পৌঁছে গেল লুসিয়'। তারা তাকে এক জোড়া ট্রাউজার আর এক বোতল হুইস্কি দিল। পান করতে করতে প্রচণ্ড একটা রাগ পেয়ে বসল লুসিয়'কে। তার স্বপ্ন শেষ হল এতদিনে! একজন ইংরেজ—তার মুখের হাসিটা বাচ্চা ছেলের মতো—লুসিয়'কে ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে বলল, 'এই যুদ্ধ জিততে হবে আমাদের।'

লুসিয়' মাথা নেড়ে সায় জানাল। মনে মনে বলল, 'মানুষকে বাঁচতেই হবে। বাঁচাটাই সহজ। সহজ ও যন্ত্রণাকর।'

ছাব্বিশ

প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে কানাকানি করে। আনে কেন ভেঙে পড়ছে না তার কারণ খুঁজে পায় না তারা। কেউ কেউ প্রশংসা করে বলে, 'দেখেছ, কী শক্ত মানুষ! কেউ বা আড়ালে একটু নিন্দেও করে : 'স্বামীর জন্যে ওর ভারি বয়েই গেছে!' আনের সময় কাটছে আগের মতোই—স্কুলের খাতা দেখা, গাছের পাতা বা ফুলের কেশর আঁকা, ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আর দুদুর জন্যে ছোট ছোট প্যান্ট বোনা। সরকারী হলদে খামটা পাওয়ার পর আনের জীবনে যেন কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি। তাকে ছ-শো ফ্রাঁ (উপার্জনকারীর মৃত্যুতে তার প্রাপ্য স্বরূপ) দিয়ে বলা হল, 'রসিদে সই কর।' আনের কলম একটুকু কাঁপল না, চোখ দিয়েও জল পড়ল না এক ফোঁটা। দুদু বারবার জিজ্ঞেস করে, 'বাবা কোথায়?' আনে জবাব দেয়, 'শিগগিরই আসবে।' সকালে দুদুকে বুড়ী মেলানির কাছে নিয়ে যায় সে; আনে স্কুলে গেলে সেই তাকে দেখাশোনা করে। দুদুকে দেখে প্রায়ই কান্না পায় মেলানির। দুদু জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কাঁদছ কেন?' সে জবাব দেয়, 'দাঁত ব্যথা করছে।' আনে কক্ষনো কাঁদে না। আগে একমাত্র পিয়েরই তার চরিত্রের সবলতা বুঝত, বলত, 'বুলেটের মুখোমুখি হতে পারবে ও।' শোক আর নিঃসঙ্গতা তার চেহারাকে পর্যন্ত বদলে দিয়েছে; তার মমতাভরা ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো কেমন কঠিন হয়ে গেছে আর আগে যেখানে সে কুঁজো হয়ে চলত এখন টান হয়ে চলে। বুড়ীরা বলাবলি করে, 'বসন্তের ডেজি ফুলের মতো ফেটে পড়ছে ও। দেখে নিও, শিগগিরই ও আর একটা স্বামী জুটিয়ে নেবে।'

এমনকি রাত্রেও আনে কাঁদে না। চোখদুটো বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকে আর বৃথাই ঘুমের প্রতীক্ষা করে। যা ঘটে গেছে তা বুঝবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। কিসের জন্যে প্রাণ দিল পিয়ের? এই চিন্তা তার মনে তোলপাড় করে। পিয়েরের সঙ্গে কখনো-সখনো সে উত্তেজিত তর্ক করেছে—এখন সে-সব কথা আবার তলিয়ে ভাবে। রাজনীতিতে পিয়েরের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ও বিপ্লবে বিশ্বাস করত আর স্পেনের প্রতিটি শহরের পতনে যন্ত্রণায় ছটফট করত। আনে ওর সঙ্গে একমত না হলেও এটুকু বুঝত যে ওর মনের গড়নটা একান্তধর্মী আর সেজন্যে মাঝে মাঝে পিয়েরকে সে হিংসে করত। পিয়ের স্পেনে যাবার পর আনের এত দুশ্চিন্তা হয়েছিল যে কিছুতেই মনস্থির করতে পারত না। দরজায় ঢোকার জন্যে অপেক্ষা করত আর ভাবত, 'ও মারা যেতেও পারে।' তারপর যুদ্ধ শুরু হল আর পিয়ের চলে গেল কোনো কথা না বলে, কোনো আশা না রেখে—ফাঁসীর আসামীর মতো। স্টেশনে ও আনেকে বলেছিল, 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়।' আর এখন কিনা অপরের যুদ্ধে তাকে প্রাণ দিতে হল! মনে মনে আনে ভাবতে চেষ্টা করে, পিয়েরের শেষ চিন্তাটা কী ছিল? আনে ও দুদু সম্পর্কে? কিংবা অন্য যুদ্ধ—'সত্যিকার' যুদ্ধ সম্পর্কে? পিয়রের সঙ্গে মনে মনে একটা বোঝাপড়া করতে চায় আনে; জানতে ও বুঝতে চায়—সত্য কী। কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে না। তখন উঠে দাঁড়িয়ে দুদুর ছোট খাটটার কাছে যায় আর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুদুর নিশ্বাসের শব্দ শোনে। আচ্ছা, ওরা যদি দুদুকেও খুন করে? যে-জীবন সে আর ফিরে পাবে না, সেই বসন্ত-দিনের একমাত্র স্মৃতি দুদু।

কিন্তু রোজ সকালে যখন সে ক্লাশে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে দেখে সবল ও সতেজ মনে হয়। তার রাত্রিগুলি কিভাবে কাটে কেউ বুঝতে পারে না।

আনের এই সাহস সহজাত। কঠিন পরিশ্রম, জীবন-সংগ্রাম আর প্রিয়জনের মৃত্যুতে অভ্যস্ত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এ জিনিস সে আহরণ করেছে; পারীর উপকণ্ঠের ঘর-গুলোর মতো আনের পূর্বপুরুষরাও রাস্তার লড়াইয়ের ধোঁয়ার মধ্যে জারিত হয়েছে। তার বাবার মুখে শুনেছে, যুদ্ধের সময়েও সর্বক্ষণ তিনি কাজ করতেন। প্যান্ট সেলাই করতেন, লাইটার বানাতেন, চাষীদের কুঁড়েঘরের জানলার চৌকাঠ মেরামত করতেন আর বিচুলির বোঝা বইতেন। তারপর হেসে বলতেন, 'বুঝলে, এইভাবে টিকে ছিলাম আমি।' ঠিক এইভাবেই টিকে থাকতে হচ্ছে আনেকে।

শহরের রাস্তায় আশ্রয়প্রার্থীদের দেখা যেতে লাগল, শিশু বোঝাই একটা গাড়ি চোখে পড়ল—যা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। দেখে শিউরে উঠল আনে। পিয়েরের মৃত্যু বা দুদুর ভবিষ্যতের চিন্তা তার মনে এসেছিল, তা নয়। কিন্তু আতঙ্কিত না হয়েও পারেনি। বিধ্বস্ত যন্ত্রটাকে তার যন্ত্রণা-ভরা রাত্রিগুলির জের টানার মতো মনে হয়েছিল।

বাড়ির জানলাগুলো আবার সরু সরু কাগজের ফালিতে ছেয়ে গেল। একটা জটিল নকসা তৈরি করল আনে। তার জানলা দেখে মনে হল যেন জানলাটা শিশিরে ঢেকে গিয়েছে—গোলাপ ফুল আর পামগাছের সমারোহ। দুদু জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি?' আনে প্রথমে বলল, 'উড়োজাহাজ', তারপরে বলল, 'ফুলের বাগান।' পিয়েরের ছোট বেলায় লেখা কবিতা মনে পড়ল আনের। কবিতাটা তাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল পিয়ের:

মৃত্যুর মুহূর্তে দেখা ভাগ্যের সে লতাজালখানি—
হেমন্তের জীর্ণ হাতে গেঁথে তোলা যৌবনের গ্লানি।

দিনগুলো গড়িয়ে চলে। আরো বেশি বেশি সংখ্যায় আশ্রয়প্রার্থীরা এসে ভিড় করে পারীতে। তাদের মধ্যে আছে লিলের অধিবাসী, ভালেঁসিয়েনের তাঁতী, লেঁ-র খনিমজুর আর পিকার্ডির চাষী। যে স্কুলে আনে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে সেই স্কুলবাড়ি তাদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হল এবং আনে মনপ্রাণ ঢেলে দিল তার এই নতুন কাজে। দুদুকে নিয়ে স্কুল

বাড়িতেই এসে সে আশ্রয় নিল। পীড়িতদের সেবা, খাবার আর ওষুধ দেওয়া, রান্না করা, সবই করতে লাগল সে। এক মস্ত পরিবারকে দেখাশোনা করছে যেন, তাদের সান্ত্বনা দিয়ে আর মন দিয়ে শুনছে তাদের এলোমেলো দীর্ঘ কাহিনী। ফুরমি-র এক মহিলা তাকে তার কাহিনী শুনিয়েছে : 'ঠিক সাতটা তখন। জার্মান উড়োজাহাজ এসে পড়বে তা জানতাম না।' বাদামী রক্তমাখা একটা গলার বিব্ আছে মহিলাটির কাছে, বিব্‌টা সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। মহিলাটি বলে, 'ও তখন পরিজ খাচ্ছিল। শয়তানের দল।' এক বেলজিয়ান মহিলা—খনি মজুরের বৌ—আনেকে বলেছে, কি করে পথে আসতে আসতে তার পাঁচ বছরের মেয়েকে হারিয়েছে সে। রুরের এক বুড়ো তার ছেলের বৌ আর নাতিদের তল্লাসে ফিরছে। আনে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা চলে এলে কেন?' কেউ কেউ বলে, 'সে বড়ো ভয়ানক অবস্থা! জার্মান বোমারুরা খুব নিচু থেকে একেবারে সরাসরি বোমা ফেলছিল।' অন্যেরা বলে, 'জার্মানদের রাজত্বে থাকব? না, পুরনো অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। গত যুদ্ধে চার বছর তাদের শাসনে কাটিয়েছি। পারীর লোকরা কিছু জানে না বটে কিন্তু আমরা জানি। গত যুদ্ধে রুবে-তে জার্মানরা জামিন-বন্দীদের গুলি করে মেরেছিল। আমাদের এলাকায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের দিয়েই তাদের কবর খোঁড়ানো হয়েছিল, তারপর খুন করা হয়েছিল। শিশুদের ওপরেও ওদের এতটুকু দয়ামায়া ছিল না। ভাগাড়ের শকুনীর দল!' কেউ কেউ খোলাখুলিই বলে, 'আমরা দেখলাম সবাই পালিয়ে যাচ্ছে, তাই আমরাও চলে এলাম।' একজন মজুরনী বলে, 'শহরে বেরজের এসে হাজির। আমরা তো জানি লোকটা ফ্যাশিস্ট। সবাইকে ও বলতে লাগল, যত তাড়াতাড়ি পার পালিয়ে যাও। না গেলে একেবারে মারা পড়বে। কিন্তু জার্মানদের মোলাকাত পাবার জন্যে ও নিজে থেকে গেল। বেইমান!'

আশ্রয়প্রার্থীদের দলগুলো অনবরত বদলে যাচ্ছে। এক-একটা দলকে দক্ষিণাঞ্চলে পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দল এসে হাজির। থেকে গেল একমাত্র বুড়ো রিকো। লোকটা অসুস্থ, কোনোমতে পারী পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছে।

আনেকে সে বলে, 'অনেকদিন আগেই বুড়ী মারা গেছে। ছেলেটাকে যেতে হয়েছে পল্টনে। জানি না ও বেঁচে আছে কিনা। একাই থাকতাম। পড়শীরা এসে বলল, ভাগাড়ের শকুনীরা আসছে। চল, চলে যাই। আমার খরগোশ ছিল, এত ভালো খরগোশ তা আর কি বলব। সব ফেলে আসতে হল। কিন্তু আমার কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে এল, খাসা কুকুর কিন্তু। ওর নাম ফোলেৎ। বারো বছর ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, ওকে ছাড়া আমার চলে না। কপিএঞ-তে আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। তখন হাঁটতে শুরু করলাম। ভাগাড়ের শকুনীরা এসে সরাসরি মাথার ওপরে বোমা ফেলতে লাগল। গত যুদ্ধের সময়েও ঠিক এই-ভাবেই বোমা ফেলেছিল। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমি যখন চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফোলেৎকে দেখতে পেলাম না।'

আনে প্রায়ই লক্ষ্য করেছে, বুড়ো লোকটা যখন ঝিমোয় তখন তার ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে আর সে ফোলেৎকে ডাকে।

বোমারুরা যেদিন পারীর ওপরে উড়ে এল সেটি চমৎকার এক গ্রীষ্ম-দিন। গোটা আকাশটা গমগম করে ওঠে গর্জনে। ঝনঝন করে ওঠে জানলার কাঁচগুলো। দুদু চেঁচায়, 'বুম-বুম!' আনে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। কি মনে করে ছুরিটা একবার রাখে, তারপর আবার তুলে নিয়ে কাজে মন দেয়। একটু পরেই লোকজন ছুটোছুটি করতে শুরু করে। খবর শোনা যায় যে দু-হাজার লোক নাকি মারা গেছে।

আনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দুদুর হাত ধরে। ভয় হয়, দুদুও খুন হবে না তো? কিন্তু নিজের ভয় দেখে নিজেই লজ্জা পায় আনে, মনে মনে বলে, 'এখন আর আমার ভয় পাবার কি আছে?'

সন্ধ্যেবেলা একটু বেড়াবার জন্যে নদীর ধারে আসে আনে। মস্ত একটা বাড়ি ধ্বসে পড়েছে আর একদল লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেদিকে। উষ্মা প্রকাশ করছে আর ঠাট্টাতামাসা করছে। কে একজন হেঁড়ে গলায় বলে, 'যাই বল, লক্ষ্য কিন্তু নিখুঁত!' জীবনটা যেন তার বিভিন্ন উপাদানে ভাগ হয়ে গিয়েছে—পাথর, লোহা, কাঠ আর থাম। আনের নজরে পড়ে, এক জায়গায় একটা চামড়া-বাঁধানো বই পড়ে আছে, ওপরে কার যেন নাম লেখা। একটা দাঁড়ানো দেওয়ালের গায়ে বিয়ের পোশাক-পরা এক মহিলার ছবি। হঠাৎ একটি শিশুর দোলনা দেখতে পায় আনে, বারান্দার রেলিং-এর গায়ে ঝুলছে। সে আর দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায় না, বাড়ির দিকে ছোটে। কিন্তু এই ধ্বসে-পড়া বাড়ির ঠিক পাশেই কাফের বারান্দায় বসে একদল লোক মনের আনন্দে হাসছে, আর শত শত মদের পিপের নলগুলো ঝলমল করছে নীল আকাশের মতো।

সে-রাত্রে আনে আবার পিয়েরকে দেখল। বুঝল, পিয়ের কিছু ভাবছে না; অসুস্থ, শীত-শীত আর ফাঁকা বোধ করছে। পিয়েরকে উষ্ণ করে তুলতে চাইল সে কিন্তু পারল না; বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে সে পাগলের মতো প্রলাপ বকতে লাগল। তারপর ভোর হওয়ার আগেই গর্জন করে উঠল বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলো। আর দুদু ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি-সব ছেলেমানুষি কথা বলতে লাগল।

সাতাশ

তেসা ঘুম থেকে উঠেছে খুবই চমৎকার মেজাজ নিয়ে।

জোলিওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জাঁকালোভাবে তেসা বলল, 'ওয়েগ্যাঁর সৈন্যবাহিনীর কাছে ওরা ছাতু হয়ে যাবে। তুমি কাগজে লিখতে পার যে এক বিরাট যুদ্ধের সবে সূচনা হয়েছে।'

জোলিও বলল, 'কথাটা লেখা সহজ। কিন্তু প্রশ্নটা আসলে তা নয়। আপনি ঠাট্টা করতে পারেন কিন্তু আমার যে কুসংস্কার আছে তা কোনোদিন গোপন করিনি। আমার তো মনে হচ্ছে জার্মানদের ডেকে আনা হয়েছে। 'জার্মানরা আসছে! জার্মানরা আসছে!'—কথাটা কতবার বলা হয়েছে ভাবুন তো। আর এখন সত্যিই জার্মানরা এসেছে।'

'ও সব মেয়েলী কথা। জার্মানরা আসেনি—এই হচ্ছে একেবারে গোড়ার ঘটনা। সোম্-এর ধারে যুদ্ধ চলছে।'

'হতে পারে। জায়গাটায় যাইনি কোনোদিন। কিন্তু একটা কথা খুব ভালো করেই জানি যে গতকাল মার্সাই-এর ওপর বোমা পড়েছে। ব্যাপারটা বুঝলেন? মার্সাই ফ্রান্সের অপর এক প্রান্তে। কে ভাবতে পেরেছিল ওদের এতটা সাহস হবে? আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে কাল কিংবা পরশু ইতালীয়রা আক্রমণ শুরু করবে। ওদিকে ওয়েগ্যাঁ তার সৈন্যবাহিনীকে ইতালীয় সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন ওই হতভাগা সোম্ নিয়ে আমরা কী করব বলতে পারেন?'

নির্বিকার ও নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল তেসা। তারপর বিচলিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ইতালীয় রেডিওর ঘোষণা শুনেছ?'

'ঘণ্টাখানেক আগে শুনেছি। ওরা একেবারে চুপচাপ। মানে, ওরা পম্পেইর চিত্রের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছে। লক্ষণ সুবিধের নয়।'

'চিত্র?' তেসা হাসল, 'ঠিক ভীইয়ারের মনের মতো জিনিস'। হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, 'কীর্তিমান যোদ্ধাটি' তার মালপত্তর বাক্সবন্দী করে ফেলেছে। মনে হয়, কেটে পড়বার তাল। 'আচ্ছা, আবার দেখা হবে! সন্ধ্যেবেলা এসো একবার, কিছু ভালো খবর দিতে পারব হয়তো।'

তেসা মনে মনে মন্ত্রীসভার আংশিক পুনর্গঠন সম্পর্কে চিন্তা করছিল।

সবেমাত্র সে 'রিগোলেত্তো' থেকে একটা সুর শিস দিতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় পিকার এসে হাজির—কোনো খবরবার্তা না দিয়েই। তেসা তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়েই বুঝল, ব্যাপার সুবিধের নয়। পিকার জানাল যে, জার্মানরা সোম-এর প্রতিরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। রুয়ে'র দিকে এগিয়ে আসছে ওদের ট্যাঙ্কবাহিনী। দু-তিন দিনের মধ্যে সমস্ত কিছু নির্ধারিত হয়ে যাবে।

তারপর বলল, 'এখনো যারা পারীতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলছে এবং সে-কথার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে—তারা পাগল ছাড়া কিছু নয়।'

তেসা মাথা নেড়ে সায় ছিল। বিষণ্ণ আর থমথমে হয়ে উঠল তার মুখখানা। ঠিক এমনি মুখ করেই সে মন্ত্রী বা সেনেটরদের শবযাত্রায় যোগদান করে থাকে। নীরবে সে পিকারের করমর্দন করল। জেনারেল চলে যাবার পর তেসা মনে মনে বলল, 'এই মুহূর্ত-গুলো মারাত্মক! আমরা আলোচনা করেছি, চিন্তিত হয়েছি আর আশা করেছি আর এখন শেষ অঙ্কের অভিনয় প্রত্যক্ষ করছি।' তার এই উপলব্ধিকে অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইল সে। কিন্তু তারপরেই ভাবল যে আতঙ্ক সৃষ্টি করাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় হবে না।

মন্ত্রীসভায় পৌঁছনোর পর তেসা ফ্রান্সের ভাগ্যের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল। মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কতকগুলি নিয়োগ যে রীতিমত সাফল্যমণ্ডিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বৈদেশিক নীতি যে বোদুয়াঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এটা সত্যিই একটা কাজের মতো কাজ। তথ্য বিভাগের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হয়েছে তেসার বন্ধু প্রুভস্ত। অন্যদিকে দেল্‌ব'র নিয়োগে সে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এ নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত—সবাই জানে দেল্‌ব ফুজের বন্ধু। তার চেয়েও বেশি বিরক্ত হল সে দ্য গলকে জাতীয় প্রতিরোধ বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হতে দেখে। স্রেফ পাগলামি! দায়িত্বশীল পদে একজন অপরিণামদর্শীকে বসানোটা কী বিপজ্জনক!

তেসা নিজের চিন্তার মধ্যে এতই ডুবে ছিল যে অন্যদের কথায় কর্ণপাত করেনি। ওরা আলোচনা করছিল ফ্রন্টের অবস্থা সম্পর্কে। পিকারের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তেসা রেনোকে বলল, 'আপনি কিসের ওপর ভরসা করছেন?'

রেনো বলল যে ম্যাজিনো লাইন আর ইতালীয় ফ্রন্ট থেকে নতুন সৈন্য আসছে। ব্রিটিশরা কিছু কানাডীয় ডিভিশন পাঠাবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গতকাল রেনো নিজে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্‌ট্‌কে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছে।

তেসা বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'আমার বক্তব্য হল, জার্মানরা যখন পারীতে এসে পৌঁছবে তখন কী করবেন আপনি?'

রেনো জবাব দিল যে, গভর্নমেণ্টকে তুর-এ স্থানান্তরিত করা হবে, দরকার হলে সেখান থেকে বোর্দোয়।

'তারপরে সেখান থেকে?'

'সে রকম অবস্থায় পড়লে আলজিয়ার্স-এ চলে যাব। আমাদের হাতে নৌবহর আছে, উপনিবেশও আছে।'

তেসা চুপ করে রইল। পাগলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আসলে এ একটা গভর্নমেণ্টই নয়, আত্মহত্যা সমিতি মাত্র। একমাত্র ব্রতেই বাঁচাতে পারে তেসাকে। কিন্তু ব্রতেই তা করবে

না। 'মন্ত্রশিষ্য'দের ইস্তাহারের কথা মনে পড়ে তেসার, সে চোখ বোজে। তেসা ভয় পেয়েছে।

তারপরেও তেসা ব্রতেইর সঙ্গে দেখা করতে গেল : এরকম দুশ্চিন্তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। ব্রতেই যদি তাকে এই বিপদের সময় সাহায্য না করে তাহলে সে ফুজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবে—কিংবা চলে যাবে আমেরিকায়।

স্থির হয়ে লেখবার টেবিলের সামনে বসে আছে ব্রতেই। ঋজু আর উদ্ধত ভঙ্গি, যেন ছবি তোলাবার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে।

সকালবেলা একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গিয়েছে ব্রতেইর সঙ্গে তার স্ত্রীর। হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে তার স্ত্রী বলেছে, 'জার্মানরা পারী অধিকার করবে। এই-ই তো তুমি চেয়েছিলে! পশু কোথাকার!' রাজনৈতিক শত্রুদের আঘাতে ব্রতেই বিচলিত হয় না; সে জানে দুকান আর ফুজে সমস্ত দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়। যেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা যে একটা অপরাধ এ সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দেয়নি ব্রতেই! কিন্তু যে স্ত্রী তার ছেলের স্মৃতি মনে পড়ায় চিৎকার করে উঠেছে, 'তুমিই তাকে খুন করেছ! সবাইকে খুন করবে তুমি!'—তাকে সে কী উত্তর দেবে?

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল ব্রতেই। আত্মসমর্পণ, শান্তি...কিন্তু তারপর? গতকাল যারা শত্রু ছিল তারা কি আজ বুঝবে যে ফ্রান্স ঠিক আলবানিয়া নয়, বা এমনকি চেকোস্লোভাকিয়াও নয়? না বোঝার সম্ভাবনাটাই বেশি, কারণ ওরা আলাদা জাতের মানুষ, সম্পূর্ণ আলাদা মানসিক গঠন ওদের। তারপর সেখানেই সব কিছুর শেষ। লোরেন, তার আপনার দেশ লোরেন, জার্মানির হাতে তুলে দেওয়া হবে! আগামী যুগের মানুষ অভিশাপ দেবে ব্রতেইর নামকে। তাদের চোখে ঐ ভাঁড় দুকানটাই হবে ইতিহাসের নায়ক।

ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়েই ব্রতেই অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে। একটিমাত্র উপলব্ধি যা তাকে বিচলিত করেছিল তা হল পপুলার ফ্রন্টের প্রতি ঘৃণা। হিটলার, মুসোলিনী ও ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ তার কাছে নিজের জয়লাভ বলে মনে হয়েছিল। বেনেস যে এখন আর প্রাগে নেই এতে সে রীতিমতো খুশি এবং ডেনমার্ক সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণা শুনে সে এই ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা আবার পিছু হটছে।

তাহলে হঠাৎ তার স্থৈর্যচ্যুতি ঘটল কেন? ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে স্নায়বিক। স্থৈর্য বজায় রাখতে হবে তাকে। এবার সমস্ত সরকারী কর্তৃত্ব নিজের হাতে আনবে সে। এই পার্লামেন্টকে ভেঙে দেবে, ফিরিয়ে আনবে শান্তি। অনেক অসম্মান, দুঃখ ও চোখের জল দিয়ে মূল্য দিতে হবে এর। তবুও এই নতুন ফ্রান্স—হোক সে শোকসন্তপ্তা বিধবা বা কৃচ্ছ্র-সাধিকার মতো—'রঙ্গিনী মারিয়ান'-এর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর মনে হবে তাকে।

তেসা যখন এসে পৌঁছল তখন স্ত্রীর ভর্ৎসনা আর নিজের কাপুরুষতার কথা সমস্তই ভুলে গিয়েছে ব্রতেই। কেমন নিরুৎসাহ ও উদাসীন দেখাচ্ছে তাকে।

'ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' তেসা চেঁচাতে লাগল, 'ঐ হনুমানটার ম্যাডাগাস্কারে যাবার মতলব—সেখানকার আনকোরা জঙ্গলগুলো ভোগ করতে চায়। কিন্তু এদিকে জার্মানরা রুয়েঁতে এসে গেল বলে। আমাদের একটা কিছু করতেই হবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছি।'

'আমি তো তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম!'

'আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল? কি ভাবে? আমায় মন্ত্রীসভায় থেকে যাবার পরামর্শ কে দিয়েছিল? তুমি। আর এখন সমস্ত ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াতে চাও, কি বল?' হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে তেসা চারদিকে নেচে বেড়াতে লাগল : 'আমি জানি, তোমার 'মন্ত্র-

'শিষ্যরা' আমার খুব বিরোধী। কিন্তু ও সমস্তই ভুল বোঝাবুঝির ফল। ব্যাপারটা তুমি তাদের বুঝিয়ে বোলো। তোমার সমর্থন পেয়েই আমি চেম্বারে নির্বাচিত হয়েছিলাম। এখন এই সংকটের সময়ে তুমি বন্ধুদের বাতিল করতে চাইছ—তা কিছুতেই হতে পারে না!'

'অকারণে উত্তেজিত হচ্ছ।' ব্রতৈই বলল, 'আমি বলতে চেয়েছিলাম, প্রতিরোধ যে নিরর্থক সে-বিষয়ে তোমাকে সাবধান করেছিলাম আমি। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মহলগুলো তোমায় খুব শ্রদ্ধা করে। এখানে সবাই তোমার আপন জন। কিছু ভেবো না। পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর সেই সঙ্গে বিবেচনা করব নতুন গভর্নমেণ্টে কাকে কাকে নেওয়া যাবে।'

'মন্ত্রীসভা আজ নতুন করে গড়া হয়েছে।'

'এটা হচ্ছে তালির ওপরে তালি লাগানোর ব্যাপার। আমি বলছি নতুন গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে। কয়েকদিনের মধ্যেই শান্তি-প্রস্তাব আলোচনার কথা উঠবে। এই অবস্থায় দেশের পক্ষে যা অবশ্য দরকার তা হচ্ছে একটি সুদৃঢ় গভর্নমেণ্ট। কমিউনিস্টরা কোনো দুর্বলতা পেলেই তার সুবিধে নেবে। শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব নেবে মার্শাল। তাছাড়া নামটাও চমৎকার—ভের্দ্যার বীর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করে ফেলা যেতে পারে।'

'রেনোর কী হবে?'

'ও সরে পড়বে। নইলে আমরাই ওকে রাষ্ট্রদূত করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। তাহলে ওই বুড়োকেই সর্দার হিসেবে পাব আমরা। তারপর লাভাল তো আছে। আমিও আছি। পুরনো মন্ত্রীদের মধ্যেও দু-একজনকে ডাকব আমরা।'

'আমার মনে হয় বোদুয়াঁকে বাদ দেওয়াই উচিত।'

'ঠিক। ইতালীয়রা ওকে বড় বেশি পছন্দ করে। তারপর প্রুভস্ত রয়েছে। ওতো শিল্পপতিদের প্রতিনিধি। মিয়েজারের ধারণা ও খুব করিৎকর্মা। তালিকায় তোমার নামও রেখেছি আমি।'

তেসা তার আনন্দ গোপন করতে পারল না, কিন্তু বিনয় দেখাবার জন্যে মুখে বলল, 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তরুণদের মধ্যে কাউকে নিলেই তো ভালো হত।

'না, তোমাকে খুবই দরকার এখন। এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে দেশের লোকের মনে হতে পারে যে মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন হচ্ছে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন। এখন অবস্থা আয়ত্তে আনাটাই একটা মস্ত কাজ। কিন্তু তুমি সকলের চোখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছ। তুমি যদি মন্ত্রিসভায় থাকো তাহলে গড়পড়তা মানুষ নিশ্চিতভাবেই ধরে নেবে যে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তোমার থাকাটাই এ ব্যাপারে একটা নিশ্চয়তা। এই সময়ে সবচেয়ে জরুরী কাজ হল দেশকে শান্ত রাখা।'

তেসা খুশিতে গদগদ হয়ে উঠল। ঐ ইস্তাহারটা তাহলে একেবারে ভাঁওতা। ঐ শয়তান ফুজেটারই কাণ্ড। ব্রতৈই বুঝেছে যে সে—তেসা—একজন সৎ ফরাসী। এতক্ষণের সমস্ত দুশ্চিন্তা ভুলে গিয়ে নতুন মন্ত্রিসভার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে বসল।

সে বলে, 'আমরা যদি মন্ত্রিসভার বিবৃতিতে ঘোষণা করি যে শান্তি-প্রস্তাব আলোচনা করতে আমরা তৈরি আছি তাহলে সেই বিবৃতির পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে। আমার শুধু ভয় হচ্ছে যে জার্মানরা মাত্রাধিক দাবিদাওয়া পেশ করবে। এত সব চমকদার জয়লাভে মাথা ঘুরে যাবে ওদের! কিন্তু ওদের বুঝিয়ে রাজী করাতে পারলে কাজের কাজ হবে একটা। তোমার তালিকা থেকে একটি নাম বাদ গেছে কিন্তু, বুঝলে। নামটি আমি বলছি, তুমি অবশ্য নামটি শুনেই বুঝতে পারবে যে এই নামটি রাখতে অনেকখানি বুকের পাটা থাকা দরকার। কেউ কেউ মনে করতে পারে,

এতে বরং খানিকটা ঝুঁকিই নেওয়া হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের আরো সহনশীল হতে হবে।'

'ভীইয়ারের কথা বলছ?'

'ভীইয়ার?' তেসা অবাক হয়ে ব্রতৈইর দিকে তাকাল : 'ঐ বেতো ঘোড়াটা! ভালো কথা, ও বোধ হয় কেটে পড়েছে। না আমি গ্রঁদেলের কথা ভাবছিলাম। আমরা দুজনে পুরনো বন্ধু, মন খুলেই কথা বলতে পারি। অবশ্য ঐ দলিলের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার....'

ব্রতৈই ক্রুদ্ধ হয়ে রুল দিয়ে টেবিলে বাড়ি মারল। বলল, 'আমি আগেই বলেছি ওটা একেবারে জাল। আজকের দিনে এসব ইতরামির ব্যাপার তোমার মাথায় থাকে কি করে বুঝি না!'

'আমায় ভুল বুঝেছ। কথাটা আমি ওকে ছোট করার জন্যে বলিনি। বরং তার উলটোটাই। বার্লিনে গ্রঁদেলের অনেক বন্ধুবান্ধব আছে নিশ্চয়ই। আজকের দিনে ওর মতো লোকের দামই তো সবচেয়ে বেশি।'

ব্রতৈই নীরস কেতাদুরস্ত গলায় জবাব দিল, 'আমার মতো সেটা অপ্রাসঙ্গিক। অবশ্য বাইরে গ্রঁদেলের নাম আছে। লোকটা সুবক্তা আর পণ্ডিত। আমাদের গভর্নমেণ্টে ও খুব কাজে আসবে। কিন্তু পারীতে আমাদেরই কাউকে রেখে যেতে হবে। একজন বড়ো রকমের রাজনীতিজ্ঞকে থাকতে হবে পারীতে। লাভাল আর আমাকে তো ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যে রেনোর পিছু নিতে হবে। তোমাকেও আমি পারীতে থাকতে বলতে পারি না। পার্লামেণ্টারী দলগুলো সম্বন্ধে তুমি জানোশোনো সুতরাং তুমি হবে আমাদের কাছে আরো বেশি প্রয়োজনীয়। তাছাড়া এই দুরূহ অবস্থার মধ্যে তোমায় ফেলে যেতে চাই না —একজন ফরাসীর পক্ষে পারীতে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি সহ্য করা সহজ কথা নয়। আর তাছাড়া তোমাকে না পেলে জার্মানরা মোটেই দুঃখিত হবে না। ওদের পক্ষে আমাদের সূক্ষ্ম চালগুলো বুঝে ওঠা রীতিমতো শক্ত ব্যাপার। ওরা তোমাকে পপুলার ফ্রণ্টের পুতুল বলে মনে করে, বজ্রমুষ্টিওলা এক মানুষ......'

কি রকম হয়ে গেল তেসার মুখখানা। অনেকক্ষণ তারা দুজনেই চুপ করে বসে রইল। পাশের ঘরে ব্রতৈইর বৌ কাঁদছে আর ব্রতৈই তার ফোঁপানি শুনে ভুরু কোঁচকাচ্ছে থেকে থেকে। অবশেষে তেসা কথা বলল, 'কী মনে হয় তোমার? ওরা কি খুব শিগগির এসে পড়বে?'

'কয়েক দিনের মধ্যেই, বা হয়তো কয়েক ঘণ্টা......'

কেমন একটা বিমূঢ় অবস্থায় ব্রতৈইর কাছ থেকে ফিরে এল তেসা। নতুন মন্ত্রি-সভায় তারও স্থান আছে তা জেনেও সে এখন আর খুশি হতে পারছে না। জগৎটাকে কেমন দুর্বোধ্য আর শত্রুভাবাপন্ন মনে হচ্ছে। আচ্ছা, রেনো যদি জানতে পারে যে সে ব্রতৈইর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসেছে? মাঁদেল সব কিছু করতে পারে; তাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিতে পারে, গুলিও করতে পারে। তাদের চোখে সে হয়ে উঠবে বিশ্বাস-ঘাতক। আর জার্মানরা তো তাকে প্রায় কমিউনিস্ট বলেই মনে করে। রাজনীতিটাই জঘন্য ব্যাপার। সৈন্যরাই বেশ সুখে আছে—ওরা অন্তত জানে যে শত্রু কোথায়। কিন্তু তেসার শত্রু তো সর্বত্র....

তেসা কুঁজো হয়ে বসল। তার সেক্রেটারি দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল, 'বৃহস্পতিবারের অভ্যর্থনার আয়োজনটা আমি সেরে রেখেছি।'

তেসা মনে মনে ভাবল, 'আহাম্মুকের দল জানেই না যে বৃহস্পতিবার জার্মানরা এসে পড়বে এখানে। কেউ কিছু জানে না....' বেড়াতে যাবে মনস্থ করল তেসা। হয়তো খোলা হাওয়ায় তার বমি বমি ভাবটা কেটে যাবে।

অন্ধকার শহরটা কেমন অসহ্য লাগছে। চারদিকে আর্তনাদ, চিৎকার আর দুর্বোধ্য আওয়াজ। দোরে দোরে মানুষের ভিড়। নানা রকম টিপ্পনি কানে এল তেসার :

'ওরা বলছে গামল্যাঁ নাকি গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।'

'রেনো তো সরে পড়েছে আমেরিকায়।'

'ওরা সবাই পালাবে আর আমাদেরই এখানে থেকে সমস্ত জঞ্জাল সাফ করতে হবে।'

'জার্মানদের আমি ভয় পাই না। আমার কি যায় আসে! আমি কেউ নই। জার্মানরা আমাকে ছোঁবেও না। আমার ভয় বোমাকে।'

'ঐ জার্মানগুলো শুয়োরের অধম! বাবার কাছে শুনেছি, ১৯১৫ সালে ওরা আমার কাকা জাক্‌কে জ্যান্ত কবর দিয়েছিল।'

'তেসা তো হিটলারের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করে ফেলেছে।'

গলার স্বর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তেসা। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। কল্পনায় মনে হতে লাগল, রাস্তার ওপরে সৈন্যদলের মার্চ করার শব্দ শুনছে সে। চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল। চোখ বন্ধ করে সামলাতে লাগল নিজেকে। কাদের পায়ের শব্দ? কিন্তু এ তো শুধু বৃষ্টির ফোঁটা—বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো কাফের চাঁদোয়ার গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল।

তার সারা জীবনে কখনো সে এমন ভয় পায়নি। কোনোমতে দপ্তরখানার দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গেল। নিজের পড়ার ঘরে জোরালো আলো দেখতে পেয়ে শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠল সে।

তারপর শুরু হল বিমান-ধ্বংসী কামানের গর্জন। জানলার কাছে ছুটে এসে পরক্ষণেই আবার সে পিছিয়ে গেল। প্যারীর দিকে এগিয়ে আসছে জার্মানরা। জার্মানদের ধারণা, সে কমিউনিস্ট। এদিকে শ্রমিকরা বলছে, সে হিটলারের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করেছে। সবাই তার বিরুদ্ধে। ওরা তাকে গুলি করে মারবে। কিংবা পীড়ন করবে। ও কিসের বিস্ফোরণ! নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও বোমা ফেটেছে। একেবারে মন্ত্রীদের দপ্তরখানাটাই লক্ষ্যবস্তু হয়েছে মনে হয়। পাঁচশো পাউণ্ডের বোমা। এখন যদি এই বোমায় সে মরে তাহলে তার মৃতদেহ দেখে কেউ চিনতেও পারবে না। একটা কিছু করা দরকার! নিরাপদ আশ্রয়ের চেষ্টা করা উচিত।

কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল তেসা। একবার বসে আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মনে হতে থাকে যেন সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসছে। শেষে সেক্রেটারিকে টেলিফোনে ডেকে হুকুম দেয় : 'গাড়িটা তৈরি রেখো। পেট্রল যেন প্রচুর থাকে। শহরের বাইরে চলে যাব আমি।'

তেসার প্রতিশ্রুত ভালো খবরের জন্যে জোলিও যখন সাড়ে আটটার সময় হাজির হল তখন তাকে বলা হল, 'মন্ত্রীমশাই শহরের বাইরে চলে গিয়েছেন।' জোলিও আর কোনো প্রশ্ন না করে বাড়ির দিকে দৌড়ল। বৌকে গিয়ে বলল, 'মারি! এক্ষুনি চলে যেতে হবে আমাদের। জোচ্চোরটা আগেই কেটে পড়েছে। হারামজাদা! সকালবেলা ও আমাকে বলছিল, বাগানটা কী সুন্দর! এতদিন লোকে বলত—ইঁদুররা জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখন আর ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ক্যাপ্টেনরাই সরে পড়ছে। ইঁদুরদের ফেলে রেখে যাচ্ছে তাদের ভাগ্যের ওপরে। কিন্তু এমনকি ইঁদুরও ঠিক বোকা নয়। চলো, চলো, চটপট গুছিয়ে নাও।'

আঠাশ

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জেনেতের কেমন উদাস অন্যমনস্ক ভাব। বাস্তবিকই কোনো কিছুতে তার আগ্রহ বা কৌতূহল নেই। কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগী যেমন প্রায় একটা আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তার জীবনটাও তাই। দেসেরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর যে শূন্যতা তাকে পেয়ে বসেছিল তা এখন যেন তার গলা চেপে ধরে তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে।

স্টুডিওতে তার কাজ করে যাচ্ছে জেনেৎ। চারপাশের লোকের মুখে যুদ্ধের কথা-বার্তা, খবরের কাগজের শেষ সংস্করণগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি। এসব কথাবার্তায় কান দেয় না সে। আগের মতোই ওষুধের বড়ি আর মদের প্রশস্তি গায়, তেমনি অনুরণিত স্বরে যা মানুষের মনে বিভ্রান্তি জাগাতে পারে। তারপর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে গাছপালা, নিস্তব্ধতা আর বাতাস নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলে, যে-সব কথা কারও কোনো প্রয়োজনে লাগে না। অনেকদিন আগে থেকেই জেনেৎ বিজ্ঞাপন থেকে কবিতাকে আর আলাদা করে চিনতে পারে না। এমনকি নিজের পালা আসার আগে ঘোষকরা যে-সব কথা বলে তাও যেন তার কাছে কোনো এক বিচিত্র কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বলে মনে হয়; যেমন, এত টন রেজিস্ট্রীকৃত জাহাজ ডুবে গিয়েছে.... তেলের দাগ দেখা গিয়েছে জলের ওপর।

শহরের ব্যস্ততা আর কোলাহলের মধ্যে নিজেকে ভুলে থাকার উদ্দেশ্যে রবিবার সে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। কী চমৎকার দিন! পারীবাসীরা মন খারাপ-করা গুজবের কথা ভুলে গিয়ে বোয়া দ্য বুলোঞ-এ ভিড় করেছে—টেনিস খেলছে, জলের ওপর নৌকা বাইছে বা ছায়াঘন কাফেতে বসে সবুজ পিপারমেণ্টের আরক বা কমলালেবুর সোনালী সরবত পান করছে। ছোট ছোট ছেলেরা বালির মধ্যে অদ্ভুত সব পিঠে বানাচ্ছে। একটা চনমনে কালো পাখি দেখতে পেল জেনেৎ। পাখিটা ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে। জেনেৎ ক্লান্তস্বরে ডাকল, 'কালো পাখি' আর অমনি উড়ে গেল পাখিটা। একটা অন্ধকার রাস্তায় সে এক দম্পতিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল—একটি সৈনিক আর গোলাপী ফ্রক পরা, মুখে মেচেতার দাগ, নিবিড় আলাপে মগ্ন একটি মেয়ে। সৈনিকটির মুখে ছেলেমানুষের গাম্ভীর্য, গোঁফজোড়া কালো। সে তার টিনের টুপিটা হাতে ধরে আছে আর মেয়েটি কাঁদছে। সৈনিকটি বলল, 'দেখে নিও, এ শেষ হয়ে যাবে।' জেনেৎ কেমন একটা ঈর্ষার জ্বালা বোধ করল। এমনিভাবে বিদায় নেওয়া কী সুখের! আর সে পড়ে আছে আশাহীন, অশ্রুহীন একটি মেয়ে, যার এমনকি দুঃখের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত আজ নেই।

সোমবার সকালে জানলার সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ করে বাড়িতে বসে রইল জেনেৎ। আলোর মুখোমুখি হতে চায় না সে। কিন্তু বিকেলে বাইরে বেরিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। পারীকে যেন একেবারেই চেনা যায় না। দোকানপাট আর কাফেগুলো সমস্তই বন্ধ। কাঁপা হাতে লেখা 'দোকান বন্ধ'-র ছোট ছোট সাদা বিজ্ঞপ্তি দরজাগুলোয় আঁটা। কোনো কোনো বাড়িতে লোকেরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জানলায় কাঠ লাগাচ্ছে বা তোরঙ্গ, বাণ্ডিল আর তাড়াহুড়ো করে বাঁধা পোঁটলা বার করে আনছে। রাস্তা পার হওয়া অসম্ভব; সার বেঁধে

মোটর চলেছে, যার শেষ নেই। গাড়ির মাথায় চাপানো হয়েছে গদি আর তোশক আর গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে কতকগুলো ভয়-পাওয়া চোখের-জলে-ভেজা মুখ।

মাত্র গতকাল পারীবাসীরা আশ্রয়প্রার্থীদের জিজ্ঞেস করছিল, 'কেন তোমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে না? ওয়েগ্যাঁ ব্যুহের খবর কী?' আর এখন তারাই চলে যাচ্ছে। রেল স্টেশনে গিয়ে ভিড় করছে, লরির ছাদে উঠছে আর তাদের বাঁচাবার জন্যে ড্রাইভারদের কাকুতি-মিনতি করছে। প্রতি ঘণ্টায় জনশূন্য হয়ে উঠছে শহর—ঠিক একটা ফুটো বস্তা থেকে ময়দা ঝরে পড়ার মতো।

দপ্তরখানার অবসরভাতা বিভাগের সামনে লরি দাঁড়িয়ে। যে কোনো কারণেই হোক আপিসের আসবাব বাইরে নিয়ে আসা হচ্ছে; ফুটপাথে ছড়ানো-ছিটনো টেবিল আলমারি আর ডেস্ক্। এক বুড়ী একঘেয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো বলে চলেছে, 'আমাকে নিয়ে চল! আমাকেও নিয়ে চল!'

আতঙ্কিত হয়ে জেনেৎ জিজ্ঞেস করল, 'ইস! এসব কী ব্যাপার!'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বুড়ী, তারপর বলল, 'জান না বুঝি? জার্মানরা রুয়েঁতে এসে পড়েছে।' বুড়ীর হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গিয়ে সমস্ত জিনিস রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল—উলের একটা বল, একটা তোয়ালে, মোমবাতি আর কমলালেবু। কাঁদতে লাগল বুড়ীটা। সঙ্গে সঙ্গে জেনেৎও কেঁদে ফেলল। কিছু একটা করা দরকার। খুব শিগগিরই জার্মানরা এসে পড়বে এখানে। বোমা ফেলবে আর গুলি করবে। জেনেৎ ছুটতে লাগল। জেনেৎ আর জেনেৎ নেই, সে যেন নিরাশার আবছা পথে উড়ে-চলা খড়ের একটা কুটো মাত্র।

জেনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল—কোথায় যাবে সে? বিষাদমাখা লিয়ঁর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে বাবার খিটখিটে বুড়োটে মুখখানা। আর তারপর মনে পড়ে ফ্ল্যরি—সেই আঙুর ক্ষেতের নীলচে পাতার মেলা, সেই উষ্ণ দিন আর নিস্তব্ধতা যেখানে মৌমাছির গুনগুন ছাড়া আর কিছু শোনা যেত না। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়, এমনভাবে এর আগে আর সে বাঁচতে চায়নি। যে জীবন নির্মম ছিল, তা-ই মধুর মনে হতে থাকে। হ্যাঁ, এখান থেকে চলে যাবে সে।

গার দ্য লিয়ঁতে যায় সে। স্টেশনে পৌঁছবার অনেক আগেই চোখে পড়ে লম্বা রাস্তাটা মানুষের ভিড়ে ঠাসা। স্টেশনের ভেতরে ঢোকাই একটা অসম্ভব ব্যাপার। সার সার পুলিশের দল পর্যন্ত ভিড়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। লোকে হাত-মুখ নেড়ে চেঁচাচ্ছে : 'নরকের কীট সব! আমাদের ফেলে রেখেই নিজেরা পালিয়েছে! বেইমানের দল! ইঁদুরের মতো ফাঁদে পড়ে গিয়েছি আমরা!'

পুলিশরা ভাসা-ভাসা উত্তর দেয় যে সন্ধ্যে নাগাদ আরো ট্রেন আসবে। লোকে সন্ধ্যের খাবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে; ফলে আরো খিদে পায় তাদের, আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর তারা খুঁজতে বেরোয় কোনো দোকান খোলা আছে কি না কিংবা ফুটপাথে বসে সঙ্গের সামান্য জলখাবার দিয়েই সন্ধ্যের খাওয়া সারে। একজন বুড়ো মজুর নিখুঁতভাবে কাটা একটুকরো রুটি আর কয়েক টুকরো সসেজ খেতে দেয় জেনেৎকে। জেনেৎ ধন্যবাদ জানাতে চায়, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না—ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে শুধু। খিদেতেষ্টার কোনো অনুভূতিই তার নেই—মনে হতে থাকে যেন সারা গায়ে আগুন ধরে গিয়েছে।

অন্য দিনের চেয়ে অনেক আগে রাত্রি আসে। শহরের ওপরে ঝুলে থাকে শবাচ্ছাদনের মতো কালো একটা পর্দা। লোকে বলে যে রুয়েঁ পুড়ছে। তাদের শান্ত করার জন্যে কে যেন বলে, ওটা শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ধোঁয়ার আড়াল।

অন্ধকারে মেয়েরা জন্তুর মতো চেঁচিয়ে ওঠে। জেনেতের মনে হয় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ভোরের প্রথম আবছা আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই আরো লোক এসে ভিড় করে স্টেশনে। কিন্তু স্টেশনে একটি গাড়িরও দেখা নেই।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে এসে পৌঁছয় জেনেৎ। চোখদুটো ভয়-পাওয়া, দৃষ্টিহীনের মতো। কিন্তু সেই চোখের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখছে না; এখন সবার চোখই তার মতো হয়ে উঠেছে। রাস্তা দিয়ে লোক যায় আর তাদের থামিয়ে তারা জিজ্ঞেস করে কোথায় সুটকেস আর হাতগাড়ি পাওয়া যেতে পারে। টুকরো টুকরো খবর একসঙ্গে জট বেঁধে ভেসে বেড়াচ্ছে : 'জার্মানরা মাঁৎ-এ এসে পড়েছে'—ওরা শাঁতিলিতে এসে পড়েছে। প্যারাস্যুট বাহিনী নেমেছে সাঁজ-এলিজেতে'—'ট্রেনগুলো গার দোস্তেরলিৎস থেকে ছাড়ছে'—'না, তা নয়'—'ওরা আমাদের সঙ্গে বেইমানী করেছে, ওরা আমাদের......!'

একটি মেয়ে হ্যাংলার মতো আইসক্রীমের মুণ্ডি চাটতে চাটতে কাঁদছে। রাস্তা দিয়ে একজন জেনারেল চলে গেল। একটা বুড়ো লোক তার দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁপা গলায় বল্লে, 'তোমাদের লীলাখেলা শেষ হয়েছে!' পাশের রাস্তায় একটি ছোট্ট মেয়ে একটা মস্ত মুণ্ডহীন পুতুলকে জড়িয়ে ধরে চেঁচাচ্ছে।

রু স্যাঁ জাক্-এর মোড়েই এক রুটিওলার দোকান খোলা। টাটকা রুটির গন্ধে জেগে ওঠে জেনেৎ—আবার নতুন করে উপলব্ধি করে যে সে বাঁচতে চায়। মনের ভেতর কতকগুলো অস্থির চিন্তা খেলে যায় : কী করবে সে? স্টুডিওর দিকে এগিয়ে চলে। দরজাগুলো বন্ধ। এমনকি কুলিরা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তারপর মারেশালের কথা মনে পড়ে। মারেশালের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখে যে সে একটা স্যুটকেসে কিছু বই, একটা ফ্লাস্কে আর একটা নিগ্রো-পুতুল পুরছে। পুতুলটা কিছুতেই ভেতরে যাবে না; বারবার কেবল লাফিয়ে ওঠে আর কুটিল চোখে হাসে।

মারেশাল বিড়বিড় করে বলে, 'নতুন খবর—ইতালীয়রা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, ওরা আজকের দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছে। হাড়-শয়তানের দল! আর এদিকে গভর্নমেণ্টও কেটে পড়েছে। এই তোমার 'জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করার সংকল্প!' প্রচুর মোটরগাড়ি কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা একসঙ্গে দল বেঁধে একটা কিনেছি। গ্রঁদেৎ পেট্রলের খোঁজে বেরিয়েছে। যদি পেট্রল পায়, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

জেনেৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'ক্ল্যারিতে পৌঁছে দেবে আমায়?'

কিন্তু ভোর নাগাদ বিরক্ত গম্ভীর মুখে ফিরে আসে গ্রঁদেৎ। পেট্রল পাওয়া যায়নি।

সে বলে, 'শার্ল গতকাল মোটরে বেরিয়েছিল, কিন্তু তাকে হেঁটে ফিরে আসতে হয়েছে। কোথাও এতটুকু পেট্রল নেই, উচ্ছন্নে যাক সব! যদি আমরা একটা ঘোড়াও পেতাম! তাহলে নির্ঘাত বেরিয়ে পড়া যেত। পের লাশেস কবরখানায় ওরা কামান বসিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখলাম। সৈন্যরা কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। কিছুই বুঝলাম না। ওরা বলছে আমেরিকাও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমার তো বিশ্বাস হয় না।'

মারেশাল চেঁচিয়ে ওঠে, 'খবরের কাগজ নেই! রেডিও নেই! কোথাও আর গোলমাল পাকাতে বাকি রাখেনি। এর অর্থটা বুঝতে পেরেছ? ওরা প্যারী ত্যাগ করেছে!'

তারপর দম নেবার জন্যে একবার থেমে জেনেৎকে বলে, 'আমাদের হেঁটে রওনা হতে হবে।'

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্যে চাঙ্গা হয়ে ওঠে জেনেৎ। তার একটা ছেলেমানুষি ধারণা আছে যে ক্ল্যারিতে হেঁটে যাওয়াটা বেশ মজার। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে সে আপন

মনে বলে, 'অন্য কোনো একটা জুতো পরা দরকার। এই জুতো পরে গেলে ওখানে আর পেঁাছতে হবে না।'

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার উত্তেজনা মিইয়ে আসে। রাস্তায় প্রচণ্ড কোলাহল—মোটর গাড়ির হর্ন আর মানুষের ঠেলাঠেলি, চিৎকার আর কান্না—সমস্ত কিছু তাকে ক্লান্ত ও বিষণ্ন করে তোলে। কোথায় পালাবে সে? আর পালিয়েই বা কী লাভ? যেখানেই যাক, তার ভাগ্যে সবই সমান।

হোটেলের কর্ত্রী এমনভাবে জেনেতের সঙ্গে কথা বলে যেন সে তার কত নিকট আত্মীয়া। বলে, 'আপনি না গিয়ে ভালোই করেছেন। জায়গাটায় একটা জনপ্রাণীও নেই। এসব স্রেফ আতঙ্ক ছাড়া কিছু নয়। দেখেশুনে নিজেরই কেমন লজ্জা করে। কী জন্যে ওরা পালাচ্ছে? দয়া করে বলবেন একটু! ১৯১৪ সালে জার্মানরা মো-তে পেঁাছেছিল। সে সময়েও লোকে পালিয়েছিল। কিন্তু জার্মানরা পারী পর্যন্ত পেঁাছতে পারেনি। দুধউলীটা বলছিল চল্লিশ ডিভিশন সৈন্য আজই এসে পেঁাছবে। তার মানে, জার্মানদের নির্ঘাত ভাগিয়ে দেওয়া যাবে।'

জেনেৎ কথা বলে না, মাথা নেড়ে সায় দেয়। তারপর একঘণ্টা বা তারও বেশি সময় নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। যে ছোট ঘরটায় হোটেল-কর্ত্রী থাকে এবং হোটেলের আপিস হিসেবেও যেটা ব্যবহৃত হয় তার গায়ে রোদ এসে পড়েছে। একফালি রোদকে ধরবার জন্যে বাঁধানো পাথরের ওপরে খেলা করছে একটা বেড়ালছানা। জেনেৎ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তারপর লাফিয়ে ওঠে। যদি সেও বাঁচতে পারত!

তাড়াতাড়ি মারেশালের ফ্ল্যাটে ফিরে যায় সে। দরজার ওপরে একটা খবর লেখা: 'জেনেৎ, আমি তোমার জন্যে দ'ফের রোশেরো মেট্রো স্টেশনের বাইরে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করব।' ব্যাকুলভাবে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জেনেৎ। এরই মধ্যে তিনটে বেজে গেছে। তবু সময় আছে এখনো। একটা দোকান খোলা থেকে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে এক বোতল ও-ডি-কোলন কেনে। দোকানী অনেক সময় নিচ্ছে দেখে জেনেৎ একটু হাত চালাতে অনুরোধ করে তাকে।

স্টেশনগুলো কী করে ঘুলিয়ে ফেলল সে। পাঁচটা পর্যন্ত আলেসিয়া স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করে থাকে। তারপর হাতব্যাগ থেকে কাগজটা বার করে পড়ে আর পৃথিবীটা দুলে ওঠে চোখের সামনে। তারপর যখন সে দ'ফের-রোশেরো স্টেশনে পেঁাছল সেখানে একটিও লোক নেই। ডাকঘরে ধাওয়া করে জেনেৎ। কিন্তু ডাকঘরও বন্ধ হয়ে গেছে। হোটেলে না পেঁাছনো পর্যন্ত টেলিফোন করার কথাও তার মনে আসে না। তারপর দেসেরকে ফোনে ডাকে। এখন আর মান-অভিমানের প্রশ্ন নয়। দেসের তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ঠিক। কিন্তু ফোনে কোনো জবাব নেই। জেনেৎ তার নোট বই বার করে সমস্ত নম্বর একবার করে ডাকে, ভেবে দেখে না কাকে ডাকছে। কিন্তু একটানা গুন-গুন আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না। আতঙ্কিত হয়ে জেনেৎ বলে ওঠে, 'কেউ নেই।'

ইতিমধ্যে হোটেল-কর্ত্রী তার ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা করেছে। সে বলেছে, 'এখানে কোনো ডিভিশনই নেই। কেবল পুলিশ আর অগ্নিনির্বাপক দল শহরে রয়ে গিয়েছে। জেনারেল গিয়েছে শাঁতিলিতে জার্মানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।' উত্তর দিক থেকে কামানের গর্জন ভেসে আসে। জেনেৎকে 'কেউ নেই' কথা দুটো উচ্চারণ করতে দেখে হোটেল-কর্ত্রী দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে উন্মাদের মতো মালপত্র গোছাতে শুরু করে।

জেনেৎ ওপরে উঠে আসে তার ঘরে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে জানলায়। দীর্ঘ পথ দিয়ে দলে দলে মানুষ চলেছে। কেউ কেউ হাতগাড়িতে আসবাব বোঝাই করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো হাতগাড়ির ওপরে একটা বুড়ী বসে আছে বা ছোট্ট কুকুর ঘেউ ঘেউ

করছে। সমস্ত বাড়ির জানলার খড়খড়িগুলো খুব শক্ত করে বন্ধ করা। জেনেৎ আবার বলে ওঠে, 'কেউ নেই!'

একটা লোক কাঁধে আর্ম-চেয়ার নিয়ে চলেছে। একটা ছেলে একটা কাঠের ঘোড়া আঁকড়ে ধরে আছে—ঘোড়াটাকে ছাড়তে কিছুতেই রাজী নয় ছেলেটা। এক বুড়ী পাখির খাঁচা দোলাতে দোলাতে চলেছে। প্যাশনে-পরা একটি লোক থলির মধ্যে বেড়াল নিয়ে যাচ্ছে। বেড়ালটা ছটফট করছে আর চিৎকার করছে। এক বুড়ী ঠাকুরমাকে হাতগাড়িতে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর অন্য একটি স্ত্রীলোকের দুই কাঁকে দুই শিশু। সাইকেল-আরোহী-দের শেষ দল উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিয়েছে। কী ভয়ংকর এই জনশূন্য শহর!

জেনেৎ ছুটে নিচে নেমে আসে। হোটেল কর্ত্রী আগেই চলে গিয়েছে। সবকিছু ফেলে গিয়েছে। যাবার আগ জেনেৎকে খবর পর্যন্ত দেয়নি, তালাও দিয়ে যায়নি নিজের ঘরে। জেনেৎ রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলে। কেমন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তেলের ট্যাংকগুলোয় আগুন লেগেছে। তারপর বৃষ্টি নামে, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে যায়। কালো অশ্রু নামে জেনেতের গাল বেয়ে। ফাঁকা মন আর ঠিকরে-আসা চোখ নিয়ে জেনেৎ ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়, তারপর ধোঁয়ায় কালো হয়ে ওঠা শহরের গ্রাস থেকে পালাতে শুরু করে।

ঊনত্রিশ

সারাটা সকাল আনে খবরের কাগজ খুঁজেছে। যে-সমস্ত খবরের কাগজের স্টল এপর্যন্ত খোলা ছিল সেখানে শুধু গোটাকতক পুরনো সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়ে আছে। তারপর সেগুলোও একে একে বন্ধ হয়ে গেল। লোকের মুখে শোনা যায় যে খবরের কাগজ আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে কাগজওয়ালার চিৎকার শুনে তার হাত থেকে একটা কাগজ ছিনিয়ে নিল আগে। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা ছবি—সিয়েন নদীর ধারে একজন মহিলা কুকুরকে স্নান করাচ্ছেন, ছবিটির শিরোনামা দেওয়া হয়েছে : 'পারী আজো সেই পারী।' আনে ক্ষেপে উঠল—লোকটা তাকে পুরনো কাগজ গছিয়ে দিয়ে গেল নাকি! না তারিখটা ১০ই জুন......ছুটতে ছুটতে স্কুলে এসে আনে আগে রেডিওটা খুলে দিল। রেডিওতে উপাসনা-উৎসবের ঘোষণা। তারপর মার্কিন রাষ্ট্রদূত বুলিট যোয়ান অফ আর্কের মূর্তির পাদদেশে একগোছা রক্তগোলাপ রেখে পরিষ্কার অ্যাংলো-স্যাক্সন টানে বলে উঠলেন : 'ওদের রক্ষা করো, যোয়ান!' তারপর শোনা গেল ট্যাঙ্গো নাচের সুর :

কিরে ছোঁড়া, কিলো ছুঁড়ি
কিসের তরে চাস আনারস ঝুড়ি ঝুড়ি?

অবশেষে শোনা গেল ঘোষকের দৃপ্ত ঘোষণা : 'নারভিক-এর পূর্ব দিকে আমাদের বীর 'শাস্যার আলপিনরা' অগ্রসর হয়ে চলেছে......'

রিকে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছে ওরা রেডিওতে?'

'কিছু না। হয়তো রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। আগামীকাল আমাদের জানাবে।' আনে জবাব দেয়।

কিন্তু পরদিন সকালে রেডিও নির্বাক। আনে হতাশ হল। প্রথমে ভাবল ডাক্স-এ তার বাবার কাছে চলে যাবে। সেখানে কক্ষনো পৌঁছতে পারবে না জার্মানরা।

শূন্য ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল আনে। চারদিকে ছেঁড়া নেকড়া আর খালি টিনের কৌটো। আশ্রয়প্রার্থীরা গতকাল পর্যন্ত এখানে ছিল। ওদের মধ্যে একমাত্র রিকেই রয়ে গেছে। ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে বলেছে, 'আমি নড়তে পারব না।' আনে কি করবে তা সে জিজ্ঞেস করেনি। সে বুঝেছে যে আনেও চলে যাবে। তবুও তার উৎকণ্ঠিত চোখদুটো দিয়ে সে আনের গতিবিধি লক্ষ্য করছে—যেন সে আশা করছে আনে হয়তো শেষ পর্যন্ত যাবে না। একা থাকাটাকে সে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।

'সবাই তো চলে গেছে। শহরে কী হচ্ছে এখন?' রিকে জিজ্ঞেস করল।

'সবাই চলে যাচ্ছে।'

একটু থেমে আনে বলল, 'আমি যাচ্ছি না।'

রিকে হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু হাসির বদলে তার মুখে ফুটে উঠল একটা স্নায়বিক আক্ষেপ। দুদুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনে অবাক হয়ে ভাবল—কেন সে এখানে পড়ে থাকবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? সে রিকের জন্য দুঃখিত বলে? কিন্তু তাকে তো দুদুর কথাও ভাবতে হবে। নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত দুদুকে। অবশ্য রাস্তায় যেতে যেতেও দুদু হারিয়ে যেতে পারে। যেমন বেলজিয়ান মহিলাটি তার মেয়েকে হারিয়েছিল। কিন্তু এখানে তো বোমা পড়বেই। আরো হাজার দুয়েক লোক মারা যাবে। এর চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর হবে অবস্থা। সে চলে যাচ্ছে না কেন? এশুধু তার পক্ষে একটা অহঙ্কারের প্রকাশ বৈ তো নয়! ঘণ্টাখানেক আগে রেডিওতে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু না শুনতে পেয়ে কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল আনে। এখন মনে হয়, পালিয়ে যাওয়াটা লজ্জাকর। তার ইচ্ছাশক্তি তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে এবং তার মনে হতে থাকে যে পরিত্যক্ত শহরে থেকে গিয়েই সে একটা কাজের কাজ করছে।

ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল মেলানি। আনেকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে সে বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল, 'মজুরদের সঙ্গে আমরা চলে যেতে পারি। চারটে লরি আছে ওদের। হাজার হোক, আপনার লোকের মধ্যেই থাকব।'

আনে বলল যে সে এখানে থাকবে স্থির করেছে। মেলানি ক্ষেপে যায়—তাহলে লোকে যা বলে তাই ঠিক; আনের হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই। যারাই তার স্বামীকে খুন করে থাকুক না কেন তার কাছে সবাই সমান। জার্মানদের সঙ্গে থাকবে সে!

মেলানি বলে, 'তোমার ব্যাপার তুমিই বোঝো।'

রিকেকে খেতে দিয়ে আনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। লোকে এখনো শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে যেতে পারলে কী ভালোই না হত! আনে বারবার একগুঁয়ের মতো নিজেকে শাসায়: 'কক্ষনো না।' মেরির দেওয়ালে একটা ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে। বিজ্ঞপ্তির শুরুতে লেখা: 'ফরাসী রিপাবলিক। স্বাধীনতা। সাম্য। মৈত্রী।' তার নিচে: 'পারীকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে—জেনারেল দেনৎস, সামরিক গভর্নর।' খড়ের টুপি পরা ছোটখাটো এক বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞপ্তিটা পড়ছিল।

'উন্মুক্ত শহর মানে?' আনে জিজ্ঞেস করে।

বুড়ো লোকটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'জানি না। শহরটা যে দুর্গ নয়—এই কথাই বোঝাতে চাইছে হয়তো। কিংবা এটা পোপের অনুরোধ। যাই হোক, এতে খুশি হবার কিছু নেই, মাদাম।'

একজন মজুর বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বেইমানের দল! তলে তলে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে ওদের সঙ্গে!'

লোকটার একটা চোখ কাঁদছে। অন্য চোখটা নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে আছে আনের দিকে—কাঁচের চোখ ওটা।

বিরাট দাড়িওলা মোটা মতো একটা পুলিশ দাঁত বার করে হেসে বলে, 'শান্তিরক্ষার জন্যে ওরা আমাদের এখানে রেখে গেছে। 'উন্মুক্ত শহর' মানে জার্মানরা আমাদের মারবে না। এবার চটপট সন্ধি হয়ে যাবে।'

লোকে এখনো শহরত্যাগ করছে। লোকগুলোকে দেখে হিংসে হচ্ছে আনের—হাঁটবার একটা সুবিধে এই যে, তখন কিছু না ভাবলেও চলে।

সন্ধ্যের সময় আনে রিকেকে সান্ত্বনা দিল : 'পারীকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার মানে ওরা গুলিও করবে না, বোমাও ফেলবে না।'

'আমি বোমায় ভয় পাই না। পথে আসার সময় ওরা সমস্তক্ষণ বোমা ফেলেছে। আমার ভয় হয় ওরা পারী পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

আনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কাঁদতে শুরু করেছে সে, এতক্ষণ পরে এই প্রথম কান্না। সে উপলব্ধি করে, রিকের মতো তারও একমাত্র ভয় যে জার্মানরা আসবে। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজেকে সমস্ত ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল; ভেবেছিল : 'এতে কীই বা যায় আসে?' জার্মানরা অন্য সবার মতোই মানুষ, শুধু পোশাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন রকম। আর এখন বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা বোধ করে সে—ওরা কি সত্যিই আসবে? পারীতে আসবে জার্মানরা! কথাগুলো বারবার আপন মনে বলে আর চোখের জল গড়াতে থাকে তার গাল বেয়ে।

স্থির হয়ে বসে থাকতে না পেরে সে ছুটে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। ধুলোমাখা ক্লান্ত শরীর নিয়ে সৈনিকরা মাথা হেঁট করে ঢালু পথ দিয়ে চলেছে। তাড়াহুড়ো করে শহর ছেড়ে চলে যেতে যেতে তারা বন্ধ জানলাগুলোর দিকে ক্লান্ত চোখে তাকায়। তাদের একজনকে কিছু রুটি আর চকোলেট দেয় আনে। তার দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটি শান্তভাবে বলে, 'ধন্যবাদ। বিদায়!'

তার চোখদুটো ভুলতে পারবে না আনে। আর অমন অদ্ভুত কথা বলল কেন লোকটা —'বিদায়?'

বাড়িতে পৌঁছে তাড়াহুড়ো করে রেডিও খুলে বসল আনে। তুলুজ বেতারকেন্দ্র থেকে রেনোর বক্তৃতা প্রচার করা হচ্ছে। রেনো বলছে, রুজভেল্ট্‌কে সে শেষ আবেদন জানিয়েছে। তার গলা প্রায় শুনতেই পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরেই শোনা গেল একজন বিশপ জনসাধারণকে অনুশোচনার জন্যে আহ্বান করে বলছেন—'এ হল দৈবের শাস্তি।' নানা রকমের আওয়াজ মিশে অদ্ভুত শোনাতে লাগল এরপর। আর তারপরেই আচমকা আরেকটা গলা শোনা গেল—আওয়াজটা যেন পাশের ঘর থেকে আসছে : 'জাতীয় জাগৃতি' বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করছি। আত্মসমর্পণ করুন! আমরা গুপ্ত বাহিনী গঠন করেছি। আমাদের ১৬নং বাহিনী আর্লসের সমস্ত তান্ত্রিক ও মার্কসবাদীকে গুলি করে মেরেছে। গ্রেনোব্‌ল্‌-এ ৪৭নং বাহিনী...'

রিকে অনুনয় করে বলল, 'বন্ধ করে দিন। ওসব শুনতে চাই না। অসহ্য!'

আনে ঘুমোতে পারল না। সারারাত সে অন্ধকার জানলার ধারে বসে ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ আওয়াজ আর কামানের গর্জন শুনল। মানুষ মরে গেলে যে শোক জাগে পারীর জন্যে ঠিক তেমনি শোক তার। সকালবেলা দুদুকে নিয়ে বের হল, দুদুর আর রিকের জন্যে কিছু দুধ সংগ্রহের আশায়। না, সমস্ত দোকানই বন্ধ। আশেপাশে একটি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কোনো জনপ্রাণীও নেই। স্ত্রীলোকটি একটা ছোট্ট গাড়িতে এক পাল ছেলেমেয়ে বোঝাই করে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এখনো তাহলে লোক যাচ্ছে।

রাস্তার একটা মোড় থেকে একজন সৈন্য ছুটে এল। তাকে দেখে পিয়েরের কথা মনে পড়ে আনের—সেই তামাটে রং আর দুই চোখের মণির দুপাশে অনেকখানি জুড়ে সাদা অংশ।

'পোৎ' দ্যরলেআঁয় যাবার রাস্তা কোন্‌টা? শিগগির বলুন!' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সৈন্যটি।

রাস্তাটা বলে দিয়ে আনে প্রশ্ন করল, 'জার্মানরা এখন কোথায়?'

সৈন্যটি হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে ছুটে চলে গেল। আনে এগিয়ে চলে। সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ। একটি জনপ্রাণীও চোখে পড়ে না। স্কোয়ারের ঘড়িটা পর্যন্ত থেমে গিয়েছে। ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে তিনটে। চারদিকে মড়ার মতো স্তব্ধতা।

তারপরেই গোঁ-গোঁ আওয়াজে আকাশ আলোড়িত হয়ে ওঠে। খুব নিচুতে উড়তে উড়তে এগিয়ে আসে বিমানগুলো। পাখার ওপরে কালো স্বস্তিকা চিহ্নগুলো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

'এবার ওরা বোমা ফেলবে', আনে ভাবে। নিজের স্থৈর্যে নিজেই অবাক হয়ে যায় সে। দুদুকে মেরে ফেলতে পারে ওরা, কিন্তু তাতেই বা তার কি যায় আসে? আনের মনে হয়, নিশ্চয়ই তার মাথা খারাপ হয়েছে; কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

দুদুকে নিয়ে বুলভার পর্যন্ত এগিয়ে আসে। তারপরেই থেমে যায় হঠাৎ—জার্মানরা তার দিকে এদিকে আসছে। রাইফেল নিয়ে খোলা গাড়িতে বসে আছে সৈন্যরা। কোনো কিছু না ভেবেই আনে তার হাত দিয়ে দুদুর চোখ দুটো ঢেকে দিল যাতে দুদু ওদের দেখতে না পায়। আনে নিজেই জানে না সে এখন কী করবে। তাকিয়ে দেখতে চায় না সে, তবুও বিদেশী মুখগুলোর দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকে। ওদিকে সারাক্ষণ সে মনে মনে বলে চলেছে, 'ওরা এসেছে! ওরা এসেছে!'

একটা বাড়ির ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল আনে। মাথায় কালো রুমাল-বাঁধা এক বুড়ী বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, জার্মানদের দেখে কাঁদতে কাঁদতে আবার ফিরে গেল। ভুরু পর্যন্ত লাল রং মেখে দুজন গণিকা রাস্তায় টহল দিচ্ছে; হেসে হেসে রুমাল নাড়াচ্ছে এক অফিসারের উদ্দেশে।

দুদু হঠাৎ খুশিভরা গলায় বলে ওঠে, 'মা, মা, কত সৈন্য দেখেছ? বাবা আসছে—না মা?'

আনে চেঁচিয়ে ওঠে, 'চুপ! ওরা জার্মান!'

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে যায়। দুদু কাঁদতে আরম্ভ করেছে। দুদুর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করে আঁকড়ে একটা সরু গলি ধরে আনে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটল।

তারপর দুপুরের রোদ অসহ্য হয়ে ওঠে। রাস্তার নোংরাগুলো রোদের মধ্যে পচতে থাকে। প্রত্যেক বাড়ির বাইরেই একটা করে ডাস্টবিন। তিনদিন আগে—যে সময়ে পথে লোকজন ছিল—এই ডাস্টবিনগুলো বের করে দেওয়া হয়েছিল। স্কুলের ফটকের কাছেই পড়ে আছে একটা মরা জানোয়ার। পচা মাংসের দুর্গন্ধে রাস্তার হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। ফেলে-যাওয়া কুকুরগুলো পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে বিষন্নভাবে ফুটপাথ শুঁকে বেড়াচ্ছে, আর আকাশের দিকে নাক তুলে কেঁউ কেঁউ করছে।

বারান্দায় রিকেকে দেখতে পেল আনে। চিৎ হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে আছে। আধ-খোলা দরজার কিনারাটা আঁকড়ে আছে দু-হাতে। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিভটা।

'কী হয়েছে কাকার?' দুদু জিজ্ঞেস করে।

আনে নিরুত্তর। রাস্তা থেকে সৈন্যদলের মার্চ করে চলার দৃপ্ত সুর ভেসে আসছে।

ত্রিশ

আঁদ্রে পেছনে পড়ে গিয়েছে। যখন সে বুঝতে পারল জার্মানরা পারীর দিকে এগিয়ে আসছে তখন ট্রেন বা গাড়ি পাওয়া আর সম্ভব নয়। চোট-লাগা পা নিয়ে সে হেঁটে যেতেও পারবে না। যে বাড়িতে সে থাকে সেখানে এখন একটা মানুষও নেই। দু-দিন ধরে জার্মান সৈন্যদের মার্চের সুর আর বুটের শব্দ শুনল সে। ঘরে একছিটে খাবার নেই, কিন্তু খিদেও পায়নি তার। কি ঘটেছে তা বোঝবার চেষ্টা করল না; একটা ওপড়ানো গাছের মতো সোফায় শুয়ে রইল আর মাঝে মাঝে ঝিমোতে লাগল। এত স্বপ্ন দেখল যা সে জীবনে দেখেনি। নানা রকম স্বপ্নের একটা জগাখিচুড়ি। আঁদ্রে স্বপ্নে দেখল, আপেল বাগানে এক মেশিনগানের ধারে সে শুয়ে আছে আর তার বাবা তার হাতে কার্তুজের পেটি তুলে দিচ্ছেন। হঠাৎ বিয়ের বাসরের দৃশ্য ভেসে ওঠে। তার হাতে সাইডার মদ দিচ্ছে নিভেল; আর জেনেৎ বলছে, 'এইমাত্র বিয়ে হল আমার।' কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে হল? আঁদ্রে ঘুম থেকে উঠে আবছা স্টুডিওর চারদিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে তো পারীতে রয়েছে। যে পারীতে রয়েছে জার্মানরা।

রাস্তা থেকে জার্মান সৈন্যদের হেঁড়ে গলা তার কানে আসে। জানলা থেকে দূরে থাকার দরুণ ওদের সে দেখতে পায় না। আঁদ্রে মনে মনে বলে, 'আমার কপালটাই মন্দ যে এখনো বেঁচে আছি!'

তৃতীয় দিন দরজায় টোকা মারার শব্দ শোনা গেল। আঁদ্রে উঠে জামাকাপড় ঠিক করে নিল একটু। কে হতে পারে? নিশ্চয়ই জার্মানরা ছাড়া আর কেউ নয়। সাবধান হতে হবে তাকে। কিন্তু দরজা খুলে দেখল যে একটা চোখে কালো ব্যাণ্ডেজ বেঁধে লরিএ দাঁড়িয়ে আছে।

'ও, তুমিও তাহলে রয়ে গেছ?' আঁদ্রে বলল।

'যেতে পারলাম না। আমার যা কিছু সবই দিতে চেয়েছিলাম—টাকা আর ঘড়ি। একটা লোক তার গাড়িতে আমায় নিতে চেয়েছিল কিন্তু হঠাৎ সে মত বদলাল। আমার মা বুড়ী হয়েছেন। তাঁকে একা ছেড়ে যেতে পারলাম না। আঁদ্রে, কী ঘটে গেল বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝিনি। বুঝতে চাইও না।'

'আমরা তো তবু একটা ছোট্ট পাহাড়কে রক্ষা করেছি। কিন্তু অন্যেরা কী করেছে? ওরা এমনিই ছেড়ে দিয়েছে পারীকে।'

আঁদ্রে নিরুত্তর রইল।

'তুমি কি একা আছ এখানে?'

'হাঁ একাই। জার্মানরা আসার পর আমি আর বাইরেও বের হইনি। কিন্তু এবার বেরুতে হবে, তামাক শেষ হয়ে গেছে।'

রু শের্‌স্ মিদিতে একটি মানুষও নেই। তামাকের দোকান বন্ধ। আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গিয়ে মনে মনে ভাবল 'এ সমস্তই কী অদ্ভুত সুন্দর!' শহর যেন ধুয়ে মুছে তকতকে হয়ে উঠেছে। ভোরবেলার ম্লান আলোয় ছাড়া আর কখনো আঁদ্রে রাস্তাগুলোকে এমনটি দেখেনি। কিন্তু

এখন তো দুপুর—ঝলমলে রোদ আর ছোট ছোট ছায়া। আর চারদিকে কী গভীর প্রশান্তি... পম্পেইর রাস্তা দিয়ে টুরিস্টরা যখন হাঁটে তখনো নিশ্চয়ই এমনি মনে হয়। তবে টুরিস্টদের পক্ষে এমনি মনে হওয়াটা স্বাভাবিক হতে পারে—কিন্তু সে আর লরিএ তো টুরিস্ট নয়, তারা যে এখানকার বাসিন্দা।

'এ যেন অনেকটা পম্পেই শহরের মতো অবস্থা হয়েছে।' কথাটা বলে আঁদ্রে ক্লান্তভাবে হাসল।

দুধের দোকান আর যে দোকানের পাইপগুলো আঁদ্রে তারিফ করত সেই দোকান ছাড়িয়ে গেল দুজনে। তারপরে প্রাচীন সংগ্রহের দোকান, যেখানে বুড়ো বোয়ালো চিনে-মাটির মেষপালিকা-মূর্তির ওপর থেকে ধুলো ঝাড়ত। আর একটু এগিয়েই যোসেফিনের রেস্তোরাঁ—যোসেফিন মাংসের কোর্মা পরিবেশন করত ওখানে। কিন্তু ওখানে ওটা কি জিনিস? বাড়ির এক কোণে সামনের দিকে পেলিকেন পাখি তার বাচ্চাদের রক্তপান করাচ্ছে। পাখিটার বয়স পাঁচশো বছরেরও বেশি, নিশ্চয়ই সে অনেক কিছুই দেখেছে। কিংবা হয়তো কিছুই দেখেনি—কেবল বাচ্চাদের খাইয়েছে, অন্যদিকে তাকাবার ফুরসতই পায়নি।

লরিএ তার মায়ের গল্প করছিল : 'মা কেবলই জিজ্ঞেস করে গীটার দিয়ে কী করবি? কিছুই করবার নেই। অবশ্য যদি না জার্মানদের বিয়ের উৎসবে বাজাই।'

আঁদ্রেকে চাঙ্গা করে তুলতে চাইছে সে। হাসতে চাইছে। বোমায় ঘায়েল-হওয়া বাড়ির মতো দেখাচ্ছে তার চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখখানা। আঁদ্রে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রুটির দোকানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। হঠাৎ খিদে পেল আঁদ্রের। ভেতরে ঢুকলো দুজনে। চমৎকার ফিটফাট দোকানটা; স্যাঁ জেরম্যাঁ অঞ্চলের বাড়িগুলোয় খাবার যায় এখান থেকে। বছর পঞ্চাশেক বয়েসের গালে রং-মাখা দোকান-কর্ত্রী একজন মহিলা খরিন্দারের সঙ্গে আলাপ করছিল।

দোকান-কর্ত্রী বলছে, 'সবাই বলত—বর্বররা আসছে। কিন্তু খুবই ভদ্র ওরা, প্রত্যেকটি জিনিস দাম দিয়ে কেনে।'

'আমাদের গিন্নী বলে—ওরা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে আর মজুরদের দিয়ে কাজ করাবে। কথাটা ঠিক বটে!'

আঁদ্রে একমুখ মিষ্টি রুটি খেতে খেতে বলল, 'বেশ খাসা গিন্নীটি তোমার!'

কেশিয়ার ফিসফিস করে বলল, 'ও হল মাদাম মিয়েজারের বাড়ির পরিচারিকা। দামটা কিসে দেবেন আপনি—ফ্রাঁ, না মার্ক-এ?'

আঁদ্রে হেসে বলল, 'আমার কাছে একটিও মার্ক নেই। একটি মার্কও রোজগার করতে পারিনি আমি। আমি তো আর মঁসিয় মিয়েজার নই!'

আঁদ্রের কথার শ্লেষটুকু ধরতে না পেরে কেশিয়ার ব্যবসায়ী ভঙ্গিতে বলল, 'ওরা বলে মার্কগুলো নাকি খাঁটি নয়। জার্মানিতে নাকি এ টাকা অচল। আমার মনে হয়, কথাগুলো একেবারে ভুয়ো। রীতিমতো ভদ্রলোক ওরা, অচল টাকা ওরা কক্ষনো দেবে না।'

লরিএর পিঠ থাবড়ে আঁদ্রে বলল, 'কথাগুলো শুনলে? মাদাম মিয়েজার। আমাদের লেফটেনেণ্ট ফ্রেসিনে এদের উদ্দেশ্য আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। লোকটা বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। ও বেঁচে গেছে কিন্তু তুমি আমি কী করব?'

যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আঁদ্রে সেখানকার প্রতিটি বাড়ি আর ল্যাম্পপোস্ট তার চেনা। কিন্তু এখন তার নিজের শহরে নিজেকে কেমন বিদেশী মনে হচ্ছে।

মিষ্টি রুটি খেয়ে খিদে পেয়ে গেছে আঁদ্রের। দুজনে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। সমস্ত টেবিলগুলোই জার্মানরা অধিকার করে বসে আছে। পেটুকের মতো খাচ্ছে সবাই, বড়ো বড়ো থালাভরা খাবার গোগ্রাসে গিলছে আর বিয়ার ও শ্যাম্পেন পান করছে। ভোজে মত্ত হয়ে আছে বিজয়ীরা। উৎসবের আবহাওয়া। ঝান্ডা উড়িয়ে বা বিউগল বাজিয়ে নয়—ক্ষমতায় মত্ত মানুষের গোগ্রাসে গেলা আর ঢেঁকুর তোলার মধ্যে। দশটি ডিমের তৈরি এক-একটি অমলেট। প্রত্যেকের জন্যে এক-একটি আস্ত মুরগী। পাঁচ বোতল শ্যাম্পেন। নতুন মার্কের নোটগুলো খসখস করে উঠছে ফিচেল চোখওলা খোসামুদে রেস্তোরাঁ মালিকদের হাতের মধ্যে।

আঁদ্রে আর লরিএ আশেপাশের কারও দিকে না তাকাবার চেষ্টা করছে। এমন নিঃশব্দে আর এমন গভীর মনোযোগে তারা খাচ্ছে যে দেখে মনে হতে পারে যে ভয়ানক একটা শক্ত কাজ করতে হচ্ছে দুজনকে। হঠাৎ লরিএ প্লেট সরিয়ে রাখল, কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তাকে।

আঁদ্রে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার?'

'ওটা দেখেছ?'

একটা বড়ো আয়নার দিকে আঙুল দেখাল লরিএ। আয়নার ওপরে লেখা : 'ইহুদীদের আহার পরিবেশন নিষিদ্ধ।'

'ওতে কি হয়েছে?' আঁদ্রে বিড়বিড় করে বলে, 'নতুন প্রভুদের সম্মানে জায়গাটাকে সাজিয়েছে ওরা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি......' মুহূর্তের জন্যে এত উত্তেজিত হয়ে ওঠে লরিএ যে তার কথা আটকে যায় : 'আমি একজন ইহুদী—! আগে একথা কোনোদিন মনে হয়নি আমার।'

আঁদ্রে তার খাওয়া শেষ না করেই উঠে দাঁড়িয়ে দামটা দিয়ে দিল। দোকানের মালিক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে অনুনয় করে বলল, 'ভালো করে খেয়েছেন তো, মঁসিয়ে?'

আঁদ্রে তার দিকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে বলল, 'ঐ বিজ্ঞপ্তিটা কেন টাঙিয়েছেন?'

লোকটা ফিসফিস করে বলল, 'এতে আমার কোনো হাত নেই। খদ্দেরদের কথা বিচার করতে হবে আমাদের। ভাববেন না যে আমি····ওটা শুধু ওদের জন্যেই।'

লরিএ তার দিকে একচোখে তাকাল, বড়ো বেশি রকমের জ্বলজ্বলে যে-চোখটা; তারপর ব্যান্ডেজ-বাঁধা চোখটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর এটা কিসের জন্যে? ওদের জন্যে না আমাদের জন্যে?'

বাইরে বেরিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল দুজনে। কী কথা বলবে এখন?—পাহাড়ে মেশিনগানের পাশে শুয়ে দিন কাটছিল যখন তাদের, তখন তারা ছিল স্বাধীন মানুষ আর এখন তারা আত্মসমর্পণ করেছে জার্মানদের কাছে। তাদের হাতঘড়ি আর দেওয়াল ঘড়িগুলোকে এখন বার্লিনের সময় মেনে চলতে হবে—দেওয়ালে তারই নির্দেশনামা। জার্মানদের চিন্তাধারা ও হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে এখন তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কিন্তু তারপর তারা কী করবে? জার্মানদের বিবাহ-উৎসবে বেহালা বাজাবে? তুলি দিয়ে রুবেন্‌সীয় ধরনে বার্লিনের খাতা-লিখিয়েদের ভোজ-উৎসবের ছবি আঁকবে? আঁদ্রে মনে মনে ভাবল, 'না, আজ আর এখানে তুলি বা নীহারিকা বা জেনেৎ কিছুই নেই।'

শয়তানিভরা চোখে এক মাতাল ভবঘুরে বেঞ্চির ওপর বসে আছে! তার পাশেই পড়ে আছে একটা বোতল।

'শান্তি?' নেশায় বুঁদ হয়ে লোকটা বকে চলেছে, 'এক টুকরো কাগজ দাও আমায়, আমি সই করে দিচ্ছি। কেনই বা সই করব না? গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেবারে, একটু মাল দাও দিকি বাবা।'

তরুণ জার্মান সৈন্যরা এবারে রু শেরস্ মিদি দিয়ে মার্চ করে চলেছে। তাদের চোখগুলো জ্বলজ্বলে আর ভাবলেশহীন।' চিৎকার করে তারা গান করছে আর পুরনো পাশুটে বাড়িগুলো তা শুনছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। একজন সৈন্য দাঁড়িয়ে পড়ে ফাটলের মতো সংকীর্ণ একটা গলির দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর হেসে উঠে বলল, 'কী নোংরা শহর! আর এর নামই পারী! জায়গাটা নিগ্রোদের থাকার উপযুক্ত।' কথাটা বলে আবার সে মার্চ করতে লাগল।

আঁদ্রে বলে, 'আমরা এখনো ভাবছি আমাদের কী করা উচিত। সোজা কথা—পারীকে সাফ করতে হবে আমাদের। এখন এ জায়গাটা নিগ্রোদেরও নয়, ফরাসীদেরও নয়।'

আঁদ্রের বাড়ির কাছে এক গয়লানী তার দুই বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে। জার্মানদের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে আঁদ্রেকে অভিবাদন জানায় স্ত্রীলোকটি, তারপর বলে, 'ব্যাপারটা বুঝুন একবার! এ অবস্থা কি করে মেনে নিই বলুন তো!'

সৈন্যদের মধ্যে থেকে একজন মাঝবয়সী ক্লান্ত চেহারার লোক গয়লানীর কাছে এগিয়ে এসে কী যেন বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে চায় যেন। ওর ভাষা গয়লানী বোঝে না। লোকটা একটা ছবি টেনে বের করে পকেট থেকে। ছবিতে সৈনিকটিকে রবিবারের পোশাকে দেখা যাচ্ছে; তাকে ঘিরে রয়েছে চারটি ছেলেমেয়ে। গয়লানীকে বোঝানোর জন্যে সে চারটে আঙুল তুলে ধরে। গয়লানীর ছেলেমেয়েকে একটু আদর করতে যায় কিন্তু ভয়ে বাচ্চা দুটো মা-র আড়ালে মুখ লুকোয়। সৈন্যটিকে ধন্যবাদ জানায় গয়লানী, এমনকি মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতেও চেষ্টা করে। তারপর সৈন্যটি চলে যাবার পরে আঁদ্রেকে বলে, 'সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা—ওকে দেখে একটুক্ষণের মন খারাপ হয়েছিল আমার। এখন আর মন খারাপ করার সময় নেই। এখন আমাদের····' আবার সে কেঁদে ফেলে। সে কী বলছে কিছুই বুঝতে পারে না আঁদ্রে। আস্তে আস্তে, ভারী ভারী পা ফেলে, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়।

'এখন কুঠরীতে ফিরে আসা গেছে। এস তামাক ধরানো যাক। জানি না আমরা কী করতে পারি। ১৯৩৬ সালে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম, অন্তত ভেবেছিলাম যে বুঝতে পেরেছি। পিয়ের বলে আমার এক বন্ধু ছিল। স্ট্রাসবুর্গের কাছে ও মারা গেছে। না, পিয়েরকে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ওর উদ্দীপনা ছিল, আর ছিল বিশ্বাসের জোর। তখনকার সময়ে জনসাধারণও ছিল আশাবাদী। ওরা কথা বলত, তর্ক করত আর হাসত। কিন্তু এখন তুমি আর আমি একা। আমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। সকলের অবস্থাই তাই। বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। এদিকে পারীতে এসে গেছে জার্মানরা।'

লরিএ নিরুত্তর। অনেকক্ষণ দুজনে মুখোমুখি বসে চুপচাপ ধূমপান করল। বাইরে থেকে ভেসে-আসা উঁচু গলার গান শুনে মনে হতে লাগল যেন একটা হুংকার উঠছে।

একত্রিশ

ভোর না হওয়া পর্যন্ত জেনেৎ হেঁটেছে। পায়ের শব্দ, ছেলেমেয়েদের কান্না আর দূর থেকে ভেসে-আসা গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়েছে অন্ধকারে। সকালবেলা দুমড়ানো ঘাসের ওপর নেতিয়ে পড়ল জেনেৎ আর তার সঙ্গীরা। কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর পর বিস্ফোরণের শব্দে লাফিয়ে উঠে বসে দেখল দূরে ধোঁয়া দেখা দিয়েছে। সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে, যেন মিশিয়ে যেতে চাইছে মাটির সঙ্গে। একটু পরে গুলি খেয়ে পেট চিরে-যাওয়া একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে গেল পাশ দিয়ে। ফোস্কা-পড়া পা নিয়ে পরিশ্রান্ত জেনেৎ আরো বিশ মাইল পথ হাঁটল। তার পা দুটো যন্ত্রণায় ভারী হয়ে উঠেছে আর খিদেয় সে কাতর। সঙ্গীদের সঙ্গে যখন সে একটা গ্রামে এসে পৌঁছল, গ্রামটা তখন একেবারে পরিত্যক্ত। গ্রামের সমস্ত লোক পালিয়ে গেছে। একটা বন্ধ দোকানের বাইরে জড়ো হল সবাই। কার যেন উঁচু গলা শোনা যায় : 'এতে কোনো দোষ নেই। দুদিন আমার ছেলেমেয়েরা কিছু খেতে পায়নি।'

দোকানটা লুট হয়ে যায়। বোতল আর টিন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে। এক বুড়ী জ্যাম লেপে নিয়েছে নিজের সর্বাঙ্গে। একজন মজুর জেনেতের হাতে একটিন ফলের মোরব্বা আর কিছু বিস্কুট দেয়। জেনেতের ভয়, এ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে সে হেঁটে এসেছে তাদের থেকে পিছিয়ে না পড়ে। সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে পড়বে শুধু সেই ভয়ই নয়— অনেক কিছু সে হারাবে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির ধবধবে সাদা চুল, ছোট ছেলেটির সারেঙী কোট আর ঝমঝমিয়ে-চলা চায়ের পাত্র সমেত হাতগাড়ি। জেনেৎ তার সঙ্গীদের ধরবার জন্যে দৌড়ল আর খেতে থাকল সঙ্গে সঙ্গে।

পাশের গ্রামে তখনো কিছু চাষী ছিল। একটা বাড়ির দরজার সামনে একজন লোক আর তার বৌ দাঁড়িয়ে। জেনেৎ এক গ্লাশ জল চাইল তাদের কাছে।

রেগেমেগে বৌটি বলে, 'এটা প্যারী নয়। কুয়ো থেকে জল তুলে আনতে হয় আমাদের। একটা ফ্রাঁ দাও।'

স্বামীটি বৌয়ের দিকে এমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে যেন তাকে আগে কোনোদিন দেখেনি। তারপর হুংকার ছাড়ে : 'হতভাগী!'

তারপর ইঞ্জিনের শব্দে আবার ভারী হয়ে ওঠে আকাশ। মানুষজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, টান হয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে। গরম ধুলো এসে ঢেকে দিয়ে যায় জেনেৎকে। তারপর আবার যখন সে চলতে আরম্ভ করেছে, তখনো তার কানে আসছে সেই বৌটির আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না। তার স্বামী মারা গিয়েছে।

পথের ধারে জনকয়েক সৈন্যের সঙ্গে দেখা। আশ্রয়প্রার্থীরা জিজ্ঞেস করে, 'জার্মানরা কোথায়? আমরা কি লয়ার নদীর বাঁ দিকে প্রতিরোধ করব?'

'প্রতিরোধ না আর কিছু!' সৈন্যরা বলে, 'কে জানে ওরা কি করবে। কর্নেল তো সরে পড়েছে। ওরা বলছে বাঁ পাড়ে নাকি এসে গেছে জার্মানরা। ঐখানেই আমাদের শেষ। এ তো খুব সহজ কথা। দালাদিএ এর জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ পেয়েছে। সেই

হিসেবে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাচ্ছে ওরা। বেইমানের দল! গর্দান নিলেও ওদের উচিত শাস্তি হয় না।'

দলের মধ্যে একজন ছোটখাটো সৈনিকের মাথায় বিরাট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জেনেতের কাছে ছুটে এসে সে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'প্রথমে স্পেন। তারপর চেক্‌রা। এ সবের জন্যে কে দণ্ড দিচ্ছে? আমি। আমি এর শাস্তি ভোগ করছি। ওরা তো বোর্দোতে সরে পড়েছে। বলতে পার, একটা লোক আর কতটা সহ্য করতে পারে?'

জেনেৎ তার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে জবাব দেয় : 'অনেকটা।'

রাত্রে আশ্রয়প্রার্থীরা গির্জায় আশ্রয় নিয়েছিল। গির্জার মধ্যে ধূপ আর শুকনো ফুলের গন্ধ। একটি মা জেনেতের পাশে গুড়িসুড়ি মেরে বসে তার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাইয়েছে। এক বুড়ী বিলাপ করেছে বেদীর কাছে বসে। কিন্তু সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চুপ। রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের বেগুনী আলো এসে পড়েছে। বুড়ী নিশ্চল হয়ে শুয়ে। তার খাড়া নাকটা গম্বুজের দিকে ফেরানো। কেউ বুঝতে পারছে না সে ঘুমোচ্ছে, না, মরে গেছে।

জেনেৎ বসে বসে ঝিমোচ্ছে। টুকরো টুকরো স্মৃতি যাওয়া-আসা করছে তার মনের মধ্যে, বিশেষ করে সেই জুলাই-এর রাত্রি যখন সে আঁদ্রের সঙ্গে সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল····নাগরদোলার সেই চকচকে নীল হাতি, লণ্ঠন, আর ঝাঁকড়ামাথা বাদাম গাছের নিচে সেই চুমু-খাওয়া।

আস্তে আস্তে নড়াচড়া শুরু হল। শুরু হল গোঙাতে গোঙাতে পথ ধরে চলা। সেই বুড়ীই কেবল পড়ে রইল রোদ-ঝলমলে চুনকাম-করা গির্জার মধ্যে।

দুপুর বেলা পাহাড়ের ওপর থেকে জেনেৎ দেখতে পেল ফ্ল্যারির দৃশ্য। সেখানকার নদীর বুকে চিকন ঢেউগুলো পর্যন্ত তার দৃষ্টি এড়াল না। জেনেৎ মনে মনে বলল, 'আমি বেঁচে গেছি।' অন্যান্য পথযাত্রীদের মতো সেও ভাবছে, লয়ার পার হলেই ওপারে জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে পোড়া আর ফেলে-যাওয়া মোটরগাড়ি। গুলিগোলায় গাছপালা বিপর্যস্ত। টেলিগ্রাফের তারগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ঝুলছে। একটা মরা ঘোড়ার ওপরে হোঁচট খেল জেনেৎ। তার বড়ো বড়ো হলদে দাঁতগুলো বাইরে বেরিয়ে আছে, দেখে মনে হয় ঘোড়াটা হাসছে। রাস্তার ধারে একজন আহত স্ত্রীলোক। আরেকজন স্ত্রীলোক প্রথম স্ত্রীলোকটির পাশে বসে হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে আছে। গিঁয় শহরের ধ্বংসাবশেষ। সস্‌প্যান, বই আর সৈনিকদের রসদের ঝুলির ডাঁই। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা-পাওয়া একটি দেওয়ালে ঘোষণাপত্র লটকানো : 'লয়ারের দুর্গগুলি ফ্রান্সের মুক্তার সমতুল্য।'

জেনেৎ কোনোমতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলেছে। ওপরে আগুন-ঝরানো সূর্য। নিচে পাথরের স্তূপের ভেতর থেকে অস্বাস্থ্যকর গন্ধ উঠছে—পাথরের নিচে চাপা পড়েছে অসহায় মানুষের মৃতদেহ। এখানে ওখানে পাথরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে মানুষের মাথা, মেয়েদের জুতো-পরা দুটো পা বা বুড়ো মানুষের হাত। জেনেৎ বাতিকগ্রস্তের মতো এগিয়ে চলেছে, কিছুই তার চোখে পড়ছে না—তবে নদীর দিকেই যাচ্ছে সে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়তে হল জেনেৎকে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। সাঁকোটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা পাথরের ওপর বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। ঠিক কয়েক দিন আগে যেমন সে ট্রেনের প্রতীক্ষা করেছিল। তেমনি অসাড় মগ্নতা, তেমনি কিছু না-দেখা বা না-ভাবা। তারপর যখন জার্মান বোমারুগুলো আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর

মেশিনগান চালাতে লাগল তখনো জেনেৎ এতটুকু নড়ল না। সকাল পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকত যদি না তার সঙ্গীরা এসে তাড়া দিত তাকে। একই দুর্ভাগ্য তাদের সবাইকে সমব্যথী করে তুলেছে। তারা সবাই খাবার ভাগ করে খায়, আহতদের তুলে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, এমনকি এক বুড়ীর পোঁছিয়ে-পড়া কুকুরকে পর্যন্ত খুঁজে এনে দিয়েছে।

কে যেন জেনেৎকে বলে, 'কতকগুলো ডিঙ্গি আছে ওখানে।' জেনেৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভিড়ের পিছু নেয়।

নদীর ওপারে গিয়ে হাসিতে উপচে পড়ে জেনেৎ। গাছপালাদের বলতে চায়, 'এই যে, বেঁচে ফিরে এসেছি আমি!'

একটা পাহাড়ে উঠতে শুরু করে, যদিও এক পা ফেলার পর আরেক পা টেনে তোলার ক্ষমতাও তার নেই।

'জেনেৎ!' কে যেন ডাকছে।

নোংরা, না-কামানো চেহারার সৈনিকটি যে লুসিয়ঁ—এটা বুঝতে কিছু সময় লাগে জেনেতের। তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয় লুসিয়ঁ, আর হাসে। চার বছর দুজনের দেখা হয়নি। কেবল একবার থিয়েটারের হলঘরে তাকে দেখেছিল লুসিয়ঁ আর তারপর তার অলক্ষ্যে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। আর এখন আনন্দে উঁচুগলায় হাসছে—ঠিক এই সময়টিতে জেনেতের দেখা পাওয়াটা কী আনন্দের! হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিশেষ একজনের সঙ্গে এইভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটা অসাধারণ ভাগ্যের কথা। লুসিয়ঁ বুঝতে পারে, জেনেতের প্রতি তার ভালবাসা কোনোদিন মরে যায়নি। তারপরে অনেক কিছুই ঘটেছে—সেই ষড়যন্ত্রের খেলা, জেনী, বালির পাহাড়, অনেক কিছুই—কিন্তু সমস্তই একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন মাত্র। এই তো জেনেৎ কথা বলছে, জেনেতের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে সে!

'লুসিয়ঁ! কী হয়েছে বল তো? দেখলে শিউরে উঠতে হয়! নদীর ওপারের কথা বলছি। ওরা মেয়েদের আর বাচ্চাদের মেরে ফেলেছে—এইমাত্র মারা গেল একটা ছোট্ট ছেলে। কিছুই বুঝছি না।' জেনেৎ বলে।

শ্লেষের হাসি হেসে লুসিয়ঁ বলে, 'শুধু এই রাস্তাতেই বিশ হাজার আশ্রয়প্রার্থী মারা গিয়েছে। আর এ-রকম কত রাস্তাই তো আছে। উত্তরাঞ্চলের অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে আমরা সৈন্যরা চলাচল করতে পারিনি। আর জার্মানরা ঠিক ঐ আশ্রয়প্রার্থীদের মুখোমুখি ছিল। বুঝতে পারছ? চক্রান্ত-কারীরা এইটাই চেয়ে এসেছে বরাবর। সৈন্যবাহিনীকে ফাঁদে ফেলে চম্পট দিয়েছে ওরা। আমাদের একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে। ঐ চক্রান্তকারীদের মধ্যে আমার বাবাও একজন। কতবার উনি বলেছেন—জার্মানদের আসাটা এর চেয়ে ভালো। এবার সেই 'ভালো'কে পেয়েছে ওরা!'

বিষণ্ণভাবে জেনেতের হাতে হাত বোলাতে বোলাতে লুসিয়ঁ আবার বলে, 'আর দাঁড়িয়ে থেকো না। জার্মানরা বোমা ফেলবে এবার। কত সৈন্য চারদিকে দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ক-জন অফিসার আছে জান? তিনজন। বাকি সবাই পালিয়ে গেছে। এই পাহাড়টার জন্যে নাকি প্রতিরোধ করা হবে। আমার তো বিশ্বাসই হয় না। এই-ই তো দেখছি সব সময়ে। যেই আমরা ট্রেঞ্চ কেটে ঘাঁটি গেড়ে বসি অমনি পিছু হটার নির্দেশ আসে। তখন জার্মানরা এসে বোমা ফেলে। হাঁটতে শুরু কর, জেনেৎ।'

'লুসিয়ঁ, তুমি কি এখানে থাকবে?'

'আমি? আমি ডানকার্কে ছিলাম। মরতে যদি পারি—তাহলেই ভালো।'

'কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি। আমি বাঁচতে চাই, লুসিয়ঁ।'

ল্দসিয়'কে নিবিড়ভাবে চুম্ খেয়ে নিজের পথ ধরল জেনেৎ। পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে সে থামল। অস্তগামী সূর্যটা কেমন প্রকান্ড আর লাল। পাহাড়ের ওপর থেকে ধ্বংসাবশেষগুলো চোখে পড়ে না, সারা পৃথিবীটা মনে হয় কেমন শান্ত, চারদিক কেমন সবুজ আর সতেজ। দূরে চওড়া অগভীর লয়ার নদীর অলস ঝিকিমিকি। ছোট ছোট বালিয়াড়ি দ্বীপগুলো ঝোপেঝাড়ে ঢাকা। জেনেতের কাছাকাছি দুটো গাছ সান্ত্রীর মতো স্থিরভাবে পাহারা দিচ্ছে, ঘন কালো পাতাগুলোর নক্‌সা আকাশের বুকে খোদাই করা। দূরের গাছগুলো ঘন নীল। বাবুই পাখি খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে। অনেক দূরে একটা কুকুর ডাকছে ভারী গলায়। একটা পরিত্যক্ত ছোট্ট সাদা বাড়ি নিরুপদ্রব আশ্রয়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে হাতছানি দিচ্ছে তাকে। ব্যাগ থেকে একটা বিস্কুট বের করতে করতে জেনেৎ ভাবল : 'কী অদ্ভুত সুন্দর এই জায়গাটা!' জীবনের অনাবিল আনন্দের মোহ আচ্ছন্ন করল তাকে।

আবার সেই আকাশের গুনগুন আওয়াজ। গা ছেড়ে দিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল জেনেৎ। তার সঙ্গীরা আগে যেভাবে শুয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে সে-ও সবার অলক্ষ্যে শুয়ে শুয়ে ঘাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইল নিজেকে। আর কী অদ্ভুত ঘাসের গন্ধ—তার শৈশব আর বসন্তের প্রথম উল্লাসের গন্ধ এই ঘাসের মধ্যে। ঢিপ ঢিপ করছে জেনেতের বুক। গুন্‌গুন্‌ আওয়াজটা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। আর এই অবস্থার মধ্যেও জেনেৎ ভাবছে : 'নিশ্চয় কোনো সুগন্ধী ঝাড় আছে কাছাকাছি। সুগন্ধী ঝাড়ের গন্ধ আসছে......'

জেনেতের মৃত্যু-যন্ত্রণা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তার জামাকাপড় আর চারদিকের ঘাস লাল হয়ে উঠল রক্তে। মুখখানি তার শান্ত দেখাচ্ছে। বাতাসের ঝলকে তার লম্বা ঢেউখেলানো চুলগুলো নাচছে। আর বড়ো বড়ো স্বপ্নময় চোখদুটো তাকিয়ে আছে প্রথম পান্ডুর তারাগুলোর দিকে।

বত্রিশ

'কক দ্য' অর' রেস্তোরাঁয় স্পেনের রাজদূতের সঙ্গে দুপুরের ভোজে মিলবার কথা তেসার। আশংকা হয় আলোচনাটা রীতিমতো ক্লান্তিকর হবে। কিন্তু বোর্দোর রান্না আর রেস্তোরাঁর বিখ্যাত মদের ভাঁড়ারের কথা ভেবে এই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে।

একটা ভয়ংকর সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তেসাকে। মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের আসার দিন দুই আগে সে তুর-এ পৌঁছেছিল। আর সেই কারণেই এমনি চমৎকার একটা থাকবার জায়গা সংগ্রহ করতে পেরেছে। অন্যান্য মন্ত্রীদের গৃহহীন ভবঘুরের মতো অবস্থা। বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে শহরটা। রেনো রুজভেল্‌ট্‌কে কতকগুলো তার পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। তেসা রসিকতা করে বলেছে, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইউনাইটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত হয়েছেন।' বিশৃংখলা এতই বেশি যে রুজভেল্‌টের কাছে পাঠানো একখানা তার সারারাত টেলিগ্রাফ আপিসেই পড়ে রইল। আর এদিকে জার্মানরা দিনে ত্রিশ মাইল বেগে এগিয়ে আসছে।

তেসা ব্রতেইর সঙ্গে দেখা করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেমন গুম হয়ে গিয়েছে ব্রতেই, কিছুতেই তার সাড়া মিলছে না। ব্রতেই জানিয়েছে যে তার স্ত্রী নাকি স্নায়বিক অসুস্থতায় শয্যাশায়ী। বাজে অজুহাত! তেসা নিজে কেন ভেঙে পড়েনি তাইতেই সে অবাক হচ্ছে। ফুর্তিতে আছে একমাত্র লাভাল। তার সাদা ধবধবে টাইটা দেখাচ্ছে ঠিক নতুন বরের প্রসাধনের মতো। কিন্তু তেসাকে আদপেই আমল দিচ্ছে না লাভাল। মন্ত্রি-সভার অন্যান্য সভ্যরা বোকার মতো হারানো মালপত্রের সন্ধানে রেনোর বাড়ি থেকে শহর পর্যন্ত ছুটোছুটি করেছে। সেক্রেটারিরা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' মন্ত্রীরা তাদের প্রশ্ন গ্রাহ্যই করে না।

মন্ত্রিসভায় আপোস-আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব আনল তেসা। রেনো বাধা দিয়ে বলল, 'মিত্রশক্তির সঙ্গে আমাদের যে-সব বাধ্যবাধকতা আছে তার কী হবে? আমাদের অপেক্ষা করে দেখা উচিত রুজভেল্ট কি জবাব দেয়।' মাঁদেল তেসার দিকে একদৃষ্টে তাকাতেই তেসা চোখ ফিরিয়ে নিল। ও লোকটা সব কিছু করতে পারে। ওর ধারণা, তেসা বিশ্বাসঘাতক। এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জানে যে, মাঁদেল যাকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার মৃত্যুসংবাদ আগে থেকে লিখে রাখা যায়। মুখখানা কী বীভৎস—এক ফোঁটা রক্ত নেই মুখে! ছিদ্রান্বেষী!

সাহায্য পাওয়া গেল অন্যদিক থেকে, যা আশা করা যায়নি। জেনারেল পিকার দাবি জানিয়েছে, তাকে সভায় কিছু বলতে দিতে হবে—ভয়ানক জরুরী খবর দেবার আছে। সাধারণত সংযত পিকারকে কেমন উত্তেজিত মনে হচ্ছে। জড়িয়ে জড়িয়ে কী বলতেই তেসা হঠাৎ লক্ষ্য করল পিকারের মুখে একটাও দাঁত নেই। দাঁতগুলো খোয়া গেল কি ভাবে? তেসা প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে জেনারেল কথা বলছে। পিকার বলেই চলেছে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমিউনিস্ট বিপ্লব। একদল ছোটলোক গিয়ে দখল করছে এলিজে প্রাসাদ। ভীষণ আগুন লেগেছে....'

আতঙ্কে তেসার চোখদুটো বন্ধ হয়ে এল। বোমা বা গোলাগুলিকে সে ভয় পায় না। এমনকি বন্দিজীবনকে কল্পনা করে তার সঙ্গেও সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। অবশ্য ব্যাপারটা ভাবলে শিউরে উঠতে হয় কিন্তু জার্মানরা সংস্কৃতিবান মানুষ, মন্ত্রীর সঙ্গে কয়েদীর মতো ব্যবহার করবে না নিশ্চয়ই। কেবল কমিউনিস্টদেরই সে ভয় করে। দেনিসের সঙ্গে কথা বলে এটুকু বুঝেছে তেসা যে, কমিউনিস্টরা তাকে ঘৃণা করে। ওরা ক্ষমতা পেলেই হাড়িকাঠে তুলবে তাকে। তাহলে ফ্রান্সের কী দুর্ভাগ্য! জার্মানরা যেদিন পারীতে ঢুকবে সেদিনটাই কিনা উদ্‌যাপিত হবে জাতীয় শোক-দিবস হিসেবে। তবু জার্মানরা কিন্তু কমিউনিস্টদের তুলনায় অনেক ভালো। এলিজে প্রাসাদে নিজেদের ঝাণ্ডা ওড়াবে জার্মানরা, কিন্তু প্রাসাদকে এতটুকু স্পর্শ করবে না। আর কমিউনিস্টরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সাফ করে দেবে সমস্ত কিছু, যেমন করেছিল ১৮৭১ সালে। এখনি আগুন জ্বালাতে শুরু করেছে। একগুঁয়ে বুনো জানোয়ারের দল!

মাঁদেল পারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে আধ ঘণ্টা পরে ঘোষণা করল, 'পারীতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।' পিকার প্রথমে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিল, শেষে আত্ম-সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল, 'অবশ্য জেনারেল দেন্‌ৎস আমার বন্ধু। সামরিক নেতাদের মধ্যে ও একজন ক্ষমতাবান লোক। শত্রুকে যে-সব সন্ত্রাসবাদীরা সশস্ত্র বাধা দিতে চেষ্টা করবে তাদের গুলি করে মারবার জন্যে পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছে ও!'

তেসা বারবার বলতে লাগল, 'তুর ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে!' আরেকটা দিন কাটল। আরো ত্রিশ মাইল এগিয়ে এল জার্মানরা। ১৪ই জুলাই—কী ভয়ানক দিন আজ! তেসার বদ্ধমূল ধারণা—চোদ্দ নম্বরটা তার জীবনে অত্যন্ত মারাত্মক। চোদ্দ

তারিখেই আমালি মারা গিয়েছে। নাপিতের দোকানে থাকার সময়ে তেসা খবর পেল যে জার্মানরা-পারী অধিকার করেছে। যদিও ঘটনার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েই ছিল, তবু ঘটনাকে মন দিয়ে গ্রহণ করতে খানিকটা বাধছে। তেসার গলা থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে : 'কী দুর্ভাগ্য!' নাপিতও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে! 'চলে যান! চুল কাটতে মন লাগছে না আর!' লোকটা নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট!

সন্ধ্যাবেলা তেসা বোর্দো রওনা হল।

মাত্র গত পরশুর ঘটনা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একশো বছরের পুরনো। কত দীর্ঘ সময়ই না সে অতিক্রম করে এসেছে! একটা দিন থেকে আর একটা দিনকে আলাদা করে চিনবার ক্ষমতা নেই তার। জার্মানরা ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে; লয়ারের ধারে এসে পৌঁছেছে ওরা। পারীতে যারা থেকে গিয়েছিল কী সৌভাগ্যবান তারা—তাদের পক্ষে সমস্ত কিছু চুকে গেছে! কিন্তু এখানে কিছু করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। চার্চিল ভয় দেখিয়ে সুবিধে আদায় করছে। গুজব রটেছে—দ্য গল নাকি বোর্দোয় এসে পৌঁছেছে। কে জানে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতেও পারে হয়তো! শহরে অনেক ডক-মজুর। প্রেফেক্ট-এর ধারণা, ওরা নাকি ভয়ানক জীব। রেনোকে সরানো দরকার, কিন্তু লেব্র্যা' এখনো মনস্থির করতে পারেনি। কেবল কাঁদছে বসে বসে। এখানে চোখের জলের কোনো স্থান নেই। এখন সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় তা হল কড়াহাতের শাসন।

তেসাকে স্পেনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলতে বলেছে ব্রতেই—বার্লিন থেকে আপোসের শর্তগুলো জানা দরকার। ব্রতেই বলে, এই আলোচনার ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে। এই দৌত্যকর্মের ভার পেয়ে তেসার যেমন গর্ব হল তেমনি সে খানিকটা নিরুৎসাহও হল। কার্যক্ষেত্রে সে স্পেনদেশীয় লোকটির সঙ্গে রসিকতা জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্রদূতটি বোর্দোর মদের প্রশংসা করায় তেসা কূটনৈতিক চালের সঙ্গে জবাব দেয়, 'আপনাদের 'রিওজাও' আমি খেয়ে দেখেছি। আমাদের শ্রেষ্ঠ মদের তুলনায় কোনো অংশে খারাপ নয়।'

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আপনাদের দেশের সেই যুগান্তকারী ঘটনার সময়ে আমার ছেলে সালামাংকায় ছিল। অনেক ফ্যালাঞ্জিস্টদের সঙ্গেই গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল ওর, আর জেনারেল ফ্রাংকোকে ও নিজে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল।'

'উনি এখন কোথায়?'

'মারা গেছে। কমিউনিস্টরা তাকে খুন করেছে।'

মুরগীর রোস্ট 'আ লা ব্রোশ' খাওয়ার পর তেসা আসল কথা শুরু করে। বার্লিনের শর্তগুলি কী? গোড়ার দিকে লোকটির অস্পষ্ট জবাব : খুঁটিনাটি বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি হবেই, ফ্রান্সকে হেয় করার ইচ্ছা বিজেতাদের নেই। তারপর সে আসে 'খুঁটিনাটি বিবরণে'। শুনতে শুনতে তেসার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামে।

চিৎকার করে ওঠে সে, 'এ সব কথা উঠতেই পারে না।'

'অবশ্য কতকগুলো বিষয় বদলানো যেতে পারে। আমি এক্ষুনি যা বললাম—আসল কথা হল, দু-পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ হওয়া। আপনাদের নৌবাহিনীর ভাগ্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। মার্শাল ক্ষমতা পাবার পর তিনি সমস্ত কিছু আয়ত্তে আনতে পারবেন বলে বার্লিনের তেমন ভরসা হচ্ছে না। তাছাড়া বিশেষ করে মরক্কোয় আর সিরিয়ায় কিছু কিছু অপ্রীতিকর মনোভাবের পরিচয় পেয়ে জার্মানরা উদ্বিগ্ন।'

'ও শুধু ভুল বোঝাবুঝির ফল। ভের্দ্যাঁর বীরের মতো প্রভাব ফ্রান্সে আর কারো নেই।'

'তাহলে তো ভালো কথা...ঠিকই বলেছেন আপনি। এখানকার আর্মাঞাকটা দেখছি সত্যিই খাসা।'

লাঞ্চের পর ব্রতেইর কাছে গেল তেসা। বলল : 'জার্মানরা একেবারে পাগল। এমন শর্তের কথা জীবনে কেউ কোনোদিন শোনেনি। আমি তো সোজা কথা বলছি—শর্তগুলো অসম্মানকর। আমার মনে হয় রেনোই ঠিক—শেষ পর্যন্ত আমাদের ম্যাডাগাস্কারে সরে দাঁড়াতে হবে।'

তেসা যখন দেখল ব্রতেই জার্মান শর্ত শুনে এতটুকু বিস্মিত হল না, সে থিতিয়ে গেল। বলল, 'অবশ্য বিষয়টিকে খুবই সাবধানে বিচার করতে হবে আমাদের। তাছাড়া, মোটের ওপর, শর্তগুলো গোড়াতেই যতটা বীভৎস মনে হয়েছিল আসলে তা নয়। আমার শুধু মনে হয় শর্তগুলো এখনই প্রকাশ করা উচিত হবে না। আগে আমরা দস্তখত করে দিই তারপর ছেপে বের করব। নইলে কমিউনিস্টরা এই নিয়ে একটা গোল বাধাবে। কিংবা দ্য গল একটা কিছু করবে। ভালো কথা, ও এখন বোর্দোতেই রয়েছে। জানা দরকার এখানে বসে বসে কী করছে লোকটা। হ্যাঁ, আগামী কয়েকটা দিন আমাদের পক্ষে সংকটজনক। কিন্তু পরে সমস্ত কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে।'

সন্ধ্যাবেলা রেনো পদত্যাগ করল। তেসা পেত্যাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'বিজয়ীর গৌরব লাভ করেছেন আপনি।'

ফাঁপা জীর্ণ গলায় মার্শাল জবাব দিলেন, 'ধন্যবাদ।'

গভীর রাত্রে তেসা জোলিওকে নতুন মন্ত্রীসভার নামগুলো বলল। বেঁটেখাটো সম্পাদকটি ইতিমধ্যে বোর্দোয় এসে 'লা ভোয়া নুভেল'-এর একটি ক্ষুদে সংস্করণ বের করতে সমর্থ হয়েছে।

'অবশ্য মন্ত্রীসংকটের ব্যাপারটাকে ঠিক যে নিয়ম-মাফিক কাটিয়ে ওঠা গেছে তা নয়। মার্শাল আগে থেকেই একটা তালিকা তৈরি করে রেখেছিলেন। আপোসের শর্ত চেম্বারে ঘোষণা করা সম্ভব হবে না। উপায় নেই—বর্তমানে আমাদের অবস্থা আশ্রয়প্রার্থীদের মতো।'

'জার্মান শর্তগুলি কী?' জোলিও জিজ্ঞেস করল।

'ও সম্পর্কে আমি কিছু বলব না—ব্যাপারটা গোপন আছে এখন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে শর্তগুলো আমাদের মর্যাদাহানিকর নয়। অন্য কিছু হলে মার্শাল তা কিছুতেই গ্রহণ করতেন না।'

সন্দেহে একটা চোখ কোঁচকাল জোলিও। বলল, 'মর্যাদা অবশ্য এমন একটা জিনিস যা খুশিমতো বাড়ানো-কমানো চলে। আমি যেটুকু জানতে চাই তা হল—জার্মানদের এখানে আসতে দেওয়া হচ্ছে কিনা? আমি একটা চলনসই ছাপাখানা যোগাড় করেছি। আর তাছাড়া, মোটরগাড়িতে বাস করা আমার পোষায় না।'

'তুমি এখানেই বসবাস করতে পার। বোর্দোই হবে দ্বিতীয় রাজধানী।'

ঘণ্টাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, যেন এক-একটা মাস। জার্মানদের কাছ থেকে কোনো জবাব নেই, এ-ব্যাপারে ওদের কোনো তাড়াহুড়ো আছে বলে মনে হয় না। ওরা শুধু এগিয়েই আসছে। দিনে দুবার করে মানচিত্রের ওপর শত্রু-অধিকৃত শহরগুলোতে দাগ দিচ্ছে তেসা : অরলেআঁ, শেরবুর্গ, রঁন্, দিজোঁ, বেলফোর। চতুর্থ দিন তেসা মানচিত্রটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়। অত্যন্ত ক্লান্তভাবে পোমারেকে বলে, 'তার চেয়ে কোন্ কোন্ জায়গা এখনো আমাদের হাতে আছে তাই বল।'

হঠাৎ একদিন শোতাঁ আসে তেসার কাছে তার প্রতিবাদ জানাতে। বলে, 'ওরা আমাদের একেবারে খতম করে দিতে চায়। শর্তগুলোও এমন যে কোনো ফরাসীই তাতে সই দিতে রাজী হবে না।' তারপর খানিকটা হেসে শোঁতা আবার বলে, 'অবশ্য, তোমার ঐ গ্রাঁদেল ছাড়া. কিন্তু সে তো পারীতে রয়ে গেছে।'

'গ্রঁদেল আবার আমার হল কবে থেকে?' তেসা রেগে যায়; 'আর তাছাড়া, আমি যা বলে আসছি তার মানে কোনোক্রমে এই নয় যে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সম্মান বজায় রেখে সন্ধি করতে চাই। এ তো খুবই স্বাভাবিক। দরকার পড়লে আমরা আলজিয়ার্সে চলে যাব। অবশ্য গোড়াতে পেরপিঞাঁতে গেলেও চলবে—ওখানে ভঁদর-বন্দর থেকে জাহাজ পেতে অসুবিধে হবে না।'

এমনকি প্রতিরোধ করার কথাও ভাবতে শুরু করেছে তেসা। অনেকক্ষণ ধরে সে মানচিত্র অধ্যয়ন করে, জেনারেল লেরিদোর সঙ্গে কথা বলে তাই নিয়ে আর তারপর দেশের উদ্দেশ্যে বেতারে আবেদন জানায় : 'সৈনিকগণ ও নাবিকগণ! এখনো পর্যন্ত সন্ধি হয়নি। সংগ্রাম চলছে। মিত্রশক্তির হাতে হাত দিয়ে জলে-স্থলে-আকাশে আমাদের সম্মান বাঁচিয়ে চল।'

সন্ধ্যেবেলা তেসা বেড়াতে বেরুলো—মাথা ধরেছে, খোলা হাওয়া লাগানো দরকার। ঘাটের ধারে কয়েকজন ডক-মজুর চিৎকার করে ওঠে তেসাকে চিনতে পেরে : 'বেইমানদের জলে চুবিয়ে দিলে কেমন হয়! কিংবা ল্যাম্পপোস্টে লট্‌কে দিলে!'

একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তেসা তাতে লাফিয়ে উঠে পড়ে। গুমোট আর গরম হওয়া সত্ত্বেও জানলাগুলো তুলে দেয়। আর অনবরত মনে হতে থাকে এই বোধ হয় ওরা তার পিছু নিয়েছে। এবং কালবিলম্ব না করে সে গিয়ে হাজির হয় ব্রতেইর বাড়িতে।

'শোঁতা আবার ঘোঁট পাকাচ্ছে', তেসা বলে, 'ও চায়, আমরা প্রথমে পেরপিঞাঁ আর তারপর আফ্রিকায় চলে যাই। চার্চিলটা আবার তার ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। শোঁতা কখনো পয়সা থেকে হাত ফিরিয়ে নেয় না। স্ট্যাভিস্কির ব্যাপারটা মনে করে দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি মনে করি জার্মানদের শর্ত মেনে নেওয়াই উচিত। বিপ্লব আর বিশৃঙ্খলায় ডুবে যেতে বসেছি আমরা।'

কিন্তু জার্মানদের পক্ষ থেকে জবাব দেবার ব্যাপারে তেমনি গড়িমসি ভাব। আর বোর্দোর দিকে সমানে এগিয়ে আসছে ওরা।

ভোরবেলা বিস্ফোরণের নিদারুণ শব্দে ঘুম ভাঙল তেসার। জার্মান বোমারু শহরের ঠিক মাথার ওপর নেমে এসে উড়ছে। একঘণ্টা পরে খবর এল যে সাতশো হতাহত হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেই হল একবার। আহত শিশুদের দেখে আর ঈথারের গন্ধে আচ্ছন্ন বোধ করল সে।

'আমরা ওদের কাছে তারের বার্তা পাঠাই আর ওরা বোমা ফেলে তার জবাব দেয়।' আর্তস্বরে তেসা বলে উঠল। বোর্দোর মেয়র মার্কে দু-দুবার এসে দাবি জানাল যে শহরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্টকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। তারপর শুরু হল আতঙ্কের রাজত্ব। তেসা সারাদিন কাটাল স্পেনের রাজদূতের সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা সগর্বে জোলিওকে বলল, 'জনসাধারণকে তুমি আশ্বাস দিতে পার। জার্মানরা মার্শালকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ওরা এই শহরকে স্পর্শ করবে না।'

কথাটা জোলিওকে বলেছে বলে পরের দিন রীতিমতো অনুতাপ বোধ করল তেসা। নানা জায়গার উন্মত্ত আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড় এসে শহরটাকে ঘিরে ধরেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটা পর্যন্ত একটা অসম্ভব ব্যাপার। রুটিওয়ালার দোকানে এক টুকরো রুটি পর্যন্ত পড়ে নেই। স্কোয়ারে শুয়ে লোকেরা রাত কাটাচ্ছে। তবু শহরে এসে জমায়েত হচ্ছে তারা।

প্রেফেক্ট-এর ডাক পড়ল তেসার কাছে। তেসা হুকুম জারি করল : 'কাউকে শহরে ঢুকতে দিও না। তাহলে মারা পড়ব আমরা। অটোম্যাটিক পিস্তল দিয়ে পুলিশদের দাঁড় করিয়ে দাও। সৈন্যদের উপর নির্ভর করে কোনো লাভ নেই—ওদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। আশ্রয়প্রার্থী, জার্মান আর কমিউনিস্ট—সবাইকেই ঢুকিয়ে বসে থাকবে ওরা।'

তুর শহর প্রতিরোধ করছে জানতে পেরে তেসা ভয়ানক ক্ষেপে উঠল। কী—পাগলামি! কী লাভ হবে হিটলারকে চটিয়ে? তার নির্দেশ মাফিক ফ্রান্সের সমস্ত শহর 'উন্মুক্ত' বলে ঘোষণা করা হল।

বেতারে আরেকটা বক্তৃতা দিল তেসা। আবেগে তার গলার স্বর কাঁপতে থাকে; সে বলে : 'আমরা আশা করি আমাদের শত্রুপক্ষ উদারতার পরিচয় দেবেন। ফরাসীরা চিরদিনই বাস্তববাদী মানুষ। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি আমরা। আমাদের যদি তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে হয় তবু আমরা বলব—আত্মিক শক্তির পরাজয় নেই। কিন্তু হায় এই মুহূর্তে আত্মিক শক্তির চেয়ে ট্যাঙ্কই বেশি শক্তিশালী!'

ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে তেসা, তার মুখ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। ভাইস ঘরে ঢোকে। আগে থেকে খবর না দিয়ে ভাইসকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়াতে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে যায় তেসা। তেসা যে একজন মন্ত্রী আর বোর্দো যে বর্তমান রাজধানী—এ কথা যেন মনেই নেই ওদের।

ভাইস এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলে, 'সই করে দিন!'

'কী ওটা?'

ভাইস বুঝিয়ে বলে : 'একদল বৈমানিক ইংলণ্ডে উড়ে যাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। ওদের আটকানো দরকার। ওরা যাতে পেট্রল না পায় সে-বন্দোবস্ত করা দরকার।'

'কিন্তু ও আমার কাজ নয়। আপনি গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে দেখা করুন।'

ধূর্ত হাসি খেলে যায় ভাইসের মুখে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে : 'দরকার পড়লে কোনোদিন জেনারেলের দেখা মেলে না। আর এ ব্যাপারটা জরুরী। আমার কথাটা শুনুন—নিয়মানুবর্তিতার কথা বাদ দিন আপনি। এখন আর মন্ত্রিত্বের মার্কা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। আর প্রতিটি ঘাটতি বিমানের জন্যে জার্মানদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাকে। বুঝতে পারলেন?'

তেসা চিৎকার করে উঠতে চায়, 'শয়তান! গুপ্তচর!'—ঢোঁক গিলে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে ভাইসের দিকে। তারপর কলমটা বার করে চোখদুটো কুঁচকে কাগজটায় সই করে। বিনীত হয়ে ধন্যবাদ জানায় ভাইস।

তেত্রিশ

তুর শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখেছে। শহরের প্রতিরোধকারীরা দু-দুবার উড়িয়ে দিয়েছে ভাসমান সাঁকোগুলোকে। ছাইরঙা ঘরের জটলা আর তারই সামনে ঝলমলে লয়ার নদীর দিকে জার্মানরা তাকিয়ে আছে অবাক চোখে। পোয়াতিয়েরে বা পোয়াতিয়ের ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে যাবার এইটেই রাস্তা বা তুরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এখানে এভাবে আটকে পড়তে হবে জার্মানরা ভাবেনি, কাজেই জার্মানদের অগ্রগামী বাহিনী বিরক্ত বোধ করছে। একজন জার্মান জেনারেল—পাণ্ডিত্য প্রকাশে যার অশেষ আগ্রহ—তার অফিসারদের বলল, 'তোমরা এদের কাছে কী প্রত্যাশা করতে পারো? ফরাসী ব্যাঙাচিরা বালজাকের জন্মস্থান রক্ষা করছে।'

তুরকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়নি এ-ব্যাপারটা কি সম্ভব হল? শোনা গিয়েছে মেয়র নাকি নাগরিকদের প্রতিরোধ করতে আবেদন করেছিলেন এবং নাগরিকদের

সাহসিকতায় সৈন্যরা এতদূর লজ্জিত হয়েছিল যে তারাও পিছু হটেনি। গোড়ার দিকে কয়েকটি হামলা স্থানীয় হাসপাতালের আহতরাই ঠেকিয়ে দিল। মাটির নিচের কুঠরিগুলোতে মদের পিপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নাগরিকদের মধ্যে তৈরি হল নানারকম গুজব। ব্যাটালিয়নগুলো ফেঁপে গিয়ে পরিণত হল ডিভিশনে। লোকের আলোচনায় গোলাগুলো হয়ে উঠল এমন একটা ভূতুড়ে ব্যাপার যে জার্মান ট্যাঙ্ক নাকি পটাপট ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে। তুর যে কেন প্রতিরোধ করছে একথা কেউ বুঝে উঠতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঘোর আতঙ্কের সময়েও এমন লোক ও এমন শহর থাকে যারা সাহসের পরিচয় দিতে পারে। দু ব্যাটালিয়ন সৈন্য, কয়েক শো আহত সৈনিক ও অল্প কিছু স্বেচ্ছাসেবক—বয়স্ক লোক যারা গত যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল আর অল্পবয়সী ছেলের দল যাদের পল্টনে যাবার বয়স হয়নি—সবাই মিলে তুরের প্রতিরোধ খাড়া করে রাখল।

প্রতিরোধকারীদের মধ্যে লেফ্‌টেনেন্ট দুকান অন্যতম। পার্লামেন্টের ডেপুটি লেফ্‌টেনেন্ট দুকান। সৈন্যরা তাকে বলে—'দাদু'। গত এক বছরে ভয়ানক বুড়িয়ে গেছে সে। জীবনে যে সব আশাকে অবলম্বন করে তার বেঁচে থাকা সবই মিথ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে অন্ধ নয়, নিজের ভুল সে বুঝতে পারে। কিন্তু মনের গোপনে সে এই আশাই পোষণ করছে যে আত্মত্যাগী মানুষের রক্ত আবার পুরনো ফ্রান্সকে পুনরুজ্জীবিত করবে, যে পুরনো ফ্রান্সের সঙ্গে তার পরিচয় বইয়ের মারফত। তুরের প্রতিরোধ তার চোখে ভাগ্যের শেষ উপহার।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে দুকান তার কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর এক পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সে-সময়ে তরুণ দুকানের ভাগ্য ছিল বিমুখ, চেহারার মধ্যে চোখে পড়ত দু-পাশে দুটো বড়ো বড়ো কান। তখন সে স্বপ্ন দেখত যে সে বৈজ্ঞানিক হবে। কবি শার্ল পেগি গোটাকতক কবিতা আবৃত্তি করত :

স্বদেশের চতুঃসীমা তরে
ন্যায়যুদ্ধে প্রাণ দেন যাঁরা
যুগে যুগে বরণীয় তাঁরা।'

যুদ্ধের প্রথম দিনেই পেগি মারা গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর সে-যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল মার্নের যুদ্ধ। যুদ্ধে যে জয় হবে একথা জানত না সে; চারদিকে পরাজয়, আতঙ্ক আর পালিয়ে-যাওয়া—এরই মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছিল। পারী প্রতিরোধ করতে প্রাণ দিয়েছিল সে। আর অবশেষে জয়ী হয়েছিল ফ্রান্স। এই দুঃসময়ে তার কবিতার প্রিয় লাইনগুলি মনে মনে আবৃত্তি করে দুকান। হতাশার মুহূর্তে পেগির কবিতা তাকে জিইয়ে রাখে। বোর্দোয় কি ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। অশেষ ক্লান্তি, গোলাবর্ষণের শব্দ আর আহতদের আর্তনাদের মধ্যে রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে কাটানোর পরেও সে যুদ্ধজয়ে বিশ্বাস করে। এই ছোট শহরের প্রতিরোধ করাটাই তার কাছে গোটা ফ্রান্সের জন্যে যুদ্ধ করা।

লয়ারের ডান তীর থেকে সমানে জার্মান গোলা এসে পড়ছে আর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তুর। আর এই ধ্বংসকার্যে সাহায্য করছে বোমারুগুলো। ভারী ভারী বোমায় ভেঙে পড়ছে মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের স্তম্ভ আর চুড়োওলা বাড়িঘর। প্রতিরোধকারীদের খাবার, ওষুধপত্র আর গোলাগুলি ফুরিয়ে গিয়েছে। ফরাসী কামান থেকে আর গোলাবর্ষণ হচ্ছে না। শুধু মেশিনগানগুলো এখনো চলছে আর তারই সাহায্যে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে শত্রুকে।

দ্বিতীয় দিনের শেষে একটা সংক্ষিপ্ত বিরাম পাওয়া গিয়েছে। দুকান আর সার্জেন্ট মাইয়ো রাত্রের খাবার খাচ্ছে জেটির সামনের এক বাড়িতে বসে। সৈন্যরা কিছু রুটি আর এক টুকরো মাংস সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে তাদের। মনের আনন্দে তারা চিবিয়ে খাচ্ছে আর অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় সেই চিবিয়ে খাওয়ার শব্দ শোনাচ্ছে ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিধ্বনির

মতো। বালির বস্তায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে জানলাগুলো। ঘরখানা কেমন অন্ধকার। আসবাব-পত্র পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়; তাকের ওপর গোলাপী মোরগ আঁকা চীনেমাটির পাত্রগুলি সাজানো। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ, খালি টিন আর ছেঁড়া চিঠিপত্রে মেঝেটা ছেয়ে আছে। পাশের ঘরে সৈন্যরা বিশ্রাম নিচ্ছে।

কে যেন রেডিওর সুইচটা ঘুরিয়ে দিল। বোর্দো থেকে তেসার বক্তৃতা। নতুন গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী ট্যাঙ্ক আর 'অপরাজেয় আত্মিক শক্তি' সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছেন।

'মুখ বন্ধ করে দাও বেইমানটার!' দুকান হুংকার ছাড়ে।

সৈন্যরা হো-হো করে হেসে ওঠে : 'ও বেটা দাদুকে শান্তিতে খেতে পর্যন্ত দেবে না!'

রেডিওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সার্জেণ্ট মাইয়ো এক মুখ খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি আর ফুলে-ওঠা লাল চোখ নিয়ে হঠাৎ দুকানকে প্রশ্ন করে : 'তুমি ওদের সাহায্য করেছিলে কেন ১৯৩৬-সালে? তুমি খাঁটি মানুষ। এখন যা অবস্থা তাতে মনে হয় না আমরা আর এখান থেকে বার হতে পারব। আমি বুঝতে চাই...'

'বুঝতে চাও?' দুকান হাসে : 'আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। সাদা হয়ে গেছে কালো আর কালো সাদা। আর তাই আমরাও অন্ধ হয়ে গেছি। কিংবা একটা কিছু দেখতে পেয়েছি আমরা। জানি না ঠিক। কিছু খাঁটি লোক নিশ্চয়ই আছে—যেমন দ্য গল। ব্রিটিশরা মাথা নোয়াবে না। কিন্তু আমাদের ভাগ্য...।' হাতের একটা ভঙ্গি করে দুকান থেমে যায়।

মাইয়ো বলে, 'গত যুদ্ধে আমি ছিলাম উত্তরের আরাসে। বলতে গেলে গোটা শহরটাই লোপাট হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর বুক থেকে। এবারেও যুদ্ধের গোড়ার দিকে আমি আবার আরাসেই ছিলাম। অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে। দেখলাম বিশ বছরে লোকে আবার গড়ে তুলেছে শহরটাকে। কেমন নিরিবিলি চারদিক। বেলজিয়ামের পেছন দিকে এই শহরটি। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে যুদ্ধটা ওখান পর্যন্ত গড়াবে। কিন্তু যুদ্ধ এল। আমরা যখন আরাস্ ছেড়ে এলাম তখন সেখানে আর কিছু নেই—শুধু ধুলো আর ডাঁই করা নোংরা। ওরা আবার গড়ে তুলবে। কিন্তু একী উদ্ভট অবস্থা! এভাবে জীবন কাটিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? একটা কিছু বদলাতেই হবে এবং ঠিকভাবে...'

'তুমি কি কমিউনিস্ট?'

'না, আমি ছিলাম মাস্টার। পপুলার ফ্রণ্টের পক্ষে এবং বোমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম। রাজনীতি নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন আর আশাভরসা করার মতো কিছু নেই প্রায়। গতকাল ক্যাপ্টেন গ্রেমি বলেছিল—আমি সাচ্চা ফরাসী নই। এই অবস্থাই কি চলবে চিরদিন?'

দুকান গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করে : 'আমরা যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমিই সবার আগে বলব—না! কিন্তু তার সময় এখন নয়। তবে একটা কথা জানতে চাই—তুমি কি... তুমি...মানে...' দুকান তোতলাতে থাকে, তারপর অতি কষ্টে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—'মানে, এ-শহর প্রতিরোধ করবে না?'

জবাবে গোলার গর্জন কানে আসে—বিরাম শেষ।

তৃতীয় দিন সবকিছু নির্ধারিত হয়ে গেল। তুরের মধ্যে অবরোধ ভেঙে ঢুকে পড়ল জার্মানরা। লাইব্রেরিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। বুলভার আর জাহাজ-ঘাটের মাঝামাঝি সরু রাস্তাগুলোতে শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। আর ধোঁয়ার মধ্যে ড্যাবডেবে লাল হয়ে রইল সূর্যটা। পোড়া গন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল।

ছাদের ঘরের জানলার ধারে দুকান দাঁড়িয়ে। তার চোখের সামনে টালি-দেওয়া ছাদ আর বাঁকাচোরা রাস্তা। গুলির নিশানা তার খারাপ নয়। যে ছোট শহরটিতে সে মানুষ হয়েছে, সেখানে 'হুইট্‌সান্‌টাইড্' পরবে মেলা বসত। মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা

করতে পারে না দুকান কারণ সে তোতলাত আর নিজের কুৎসিত চেহারায় নিজেই ছিল লজ্জিত। কিন্তু গুলিছোঁড়ায় তার খুব নাম ছিল। মেলায় দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলাবলি করত, 'কী গুলিই ছোঁড়ে ছেলেটা!' সেটা ছিল তরুণ বয়সের আত্ম-গরিমা। আর তাই হবে তার শেষ ভরসা। সস্তায় জীবন দেবে না সে।

দূরে কয়েকটা জার্মানকে দেখতে পেল দুকান। ছাইরঙা দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে। রাস্তার মাঝখানে পিপে, আসবাবপত্র আর তোশকের অবরোধ।

হঠাৎ একজন ফরাসী সৈনিককে দেখা গেল। লোকটা সার্জেন্ট মাইয়ো। ও কী করছে? পাগল হয়ে গেছে নাকি? জার্মানদের দিকে ছুটে গেল মাইয়ো তারপর থেমে দাঁড়িয়ে হাতবোমা ছুঁড়ল। শানের ওপর পড়ে গেল তিনটে জার্মান। বাকি সবাই চম্পট।

আনন্দে দুকান একেবারে আত্মহারা। গর্জে উঠল, 'সাবাস সার্জেন্ট!' পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাইয়ো। গুলির শব্দ হল একটা। হাত দুখানা উঁচিয়ে পড়ে গেল মাইয়ো।

আবার জার্মানরা আসতে শুরু করেছে। তাক করে করে মারা দুকানের গুলি একটাও এদিক-ওদিক হল না। ঠেকাতে না পেরে জাহাজ-ঘাটার দিকে পালিয়ে গেল জার্মানরা।

রুমাল দিয়ে ঘেমে-ওঠা কপালটা মোছে দুকান। ফ্লাস্কটা টেনে বার করে—কিছুক্ষণ থেকেই ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। তারপর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে। বাড়ির ছাদের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে আসছে জার্মানরা। লম্বা লাল চুল-ওলা একটা সৈন্য ঠিক তার চোখের সামনে। অনেকক্ষণ লড়াই চলে দুজনের মধ্যে। তারপর জার্মানটাকে ঘায়েল করে দুকান।

কিছুক্ষণের জন্যে চারদিক শান্ত। একটা ভোমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে একঘেয়ে গুন গুন করে চলেছে। দুকান রাইফেলটা তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে—জার্মানরা ছাদের ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। আরো দুটো গুলি ছোঁড়ে সে। তারপর ভাবে, 'এই নিয়ে ন-টা......' আর এই ভাবনা শেষ হবার আগেই কাটা গাছের মতো সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়।

চৌত্রিশ

ক্লান্ত হয়ে তেসা সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে। মাছিগুলো জ্বালাতন করছে তাকে—কখনো নাকে বা কপালে এসে বসছে, কখনো কানে শুড়শুড়ি দিচ্ছে। তবুও নড়াচড়া করছে না; স্থির হয়ে ঘুমের অপেক্ষা করছে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হচ্ছে সময়ের ক্লান্তিকর মরুভূমির মতো। কিন্তু তার জীবনেও এমন সময় ছিল যখন দিন আর মাসগুলো হু-হু করে কেটে যেত। উদ্বেগের সঙ্গে দেনিসের কথা মনে পড়ল তেসার। এখন সে কোথায়? জার্মানদের হাতে পড়েছে হয়তো। আর পোলেৎ নিশ্চয়ই মারা গেছে। নইলে ও যে করে হোক তেসাকে খুঁজে বার করত—মন্ত্রীকে

খুঁজে বার করা কী আর এমন শক্ত ব্যাপার। সবাই বলাবলি করছে পথঘাট নাকি আশ্রয়-প্রার্থীদের মৃতদেহে ছেয়ে গিয়েছে। আর লুসিয় নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। যে রকম ছটফটে ছেলে ও! ওর মতো মানুষ সবার আগে মরে।

এবার কী হবে? লাভালের মুখে শুধু একটা হাসি-হাসি ভাব। মার্কের মুখে শুধু বোর্দোর মদের বাখানি। ব্রতেইর মুখে শুধু এক কাঠখোট্টা জবাব : 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' আলোর ক্ষীণতম রেখাটুকুও কোনোদিকে দেখা যাচ্ছে না। জার্মানরা এগিয়েই আসছে, ব্রেস্ট আর লিয় দখল করা হয়ে গেছে। বোর্দোর অনতিদূরে লা রশেল-এ এসে পৌঁছেছে ওরা। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে একটি সরকারী প্রতিনিধিদল রওনা হয়ে গিয়েছে; সঙ্গে রয়েছে পিকার। কে জানে জার্মানরা কি বলবে! ওরা হয়তো ইচ্ছে করেই দেরি করছে। এদিকে ফুঁসে উঠছে সারা দেশ। পমারে বলেছে, কমিউনিস্টরা নাকি মার্সাইএর ময়দানে ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর এই বোর্দোর লোকগুলোর মনোভাবও কী জঘন্য! ডকমজুরদের সঙ্গে তার সাক্ষাতের সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়ায় তেসা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দ্য গল তো সোজাসুজি অসহযোগ করতে উস্কানি দিচ্ছে : 'বিমান আর যুদ্ধের মালপত্র ধ্বংস করো, যাতে সেগুলো শত্রুর হাতে গিয়ে না পড়ে!' অবশ্য ভাইস লোকটা একটু উগ্রচণ্ডী ধরনের, কিন্তু ওর কথাই ঠিক—বিমানগুলোর হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে জার্মানদের। কোনো কোনো র‍্যাডিকালপন্থী আফ্রিকায় পালিয়ে যাবার কথা ভাবছে। মতলবটা মন্দ নয়! ওরা 'মার্সিলিয়া' জাহাজে একটা বার্থ পর্যন্ত তেসাকে দিতে চেয়েছিল। তেসাও তো প্রায় রাজীই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রতেই বলে, 'মার্সিলিয়ার যাত্রীদের আমরা গুলি করে মারব।' তেসাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঠিক কথা! এই দুঃসময়ে লোকে কখনো নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে?'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। মন্ত্রীদের সভায় ডাক পড়েছে তেসার।

লেব্র্যাঁকে নাক ঝাড়তে দেখামাত্রই তেসা বুঝল খবর সুবিধের নয়। পিকারের টেলিগ্রাফ করা জার্মান শর্তগুলো ব্রতেই সমাধি-স্তরের মতো ঘ্যানঘ্যান করে পড়তে লাগল।

তেসা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে : 'শর্তগুলো লজ্জাজনক!'

ব্রতেই তার দিকে কড়ানজরে তাকিয়ে বলে, 'আমরা যে হেরে গেছি একথা ভুলে গেলে চলবে না।'

তেসা মাথা নেড়ে জবাব দেয় : 'বুঝতে পেরেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্যই সই করারই পক্ষে।'

ক্লান্তিতে আধমরা হয়ে তেসা মাইকের কাছে উঠে এল এবং তারপর গলাটা সাফ করে নিয়ে তার স্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা শুরু করল : 'আসুন, নিরুৎসাহ হয়ে লাভ নেই! সন্ধির যে-সব শর্ত আমাদের প্রতিনিধিরা মেনে নিয়েছেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু তাই বলে অপমানজনক নয়। শর্তগুলো মর্যাদাপূর্ণ। আমার গোটা জীবনটাই তার জামিন হয়ে রইল!'

কিন্তু পরে, এক গ্লাশ সোডা খাওয়ার পর অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় ব্রতেইকে বলল, 'দেখো, বক্তৃতাটা যেন ছাপা না হয়। অন্তত সৈন্যরা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত। আগুন নিয়ে খেলা করে লাভ নেই। ওদের মধ্যে অনেক মাথা-গরম লোক আছে।'

পিকার বোর্দোয় ফিরে এল। তেসা তৎক্ষণাৎ ছুটল তার সঙ্গে দেখা করতে। কৌতূহলে সে পেট ফেটে মরছে।

'তারপর, কী রকম দেখলে? মানে, আবহাওয়াটা দেখলে কেমন?'

ম্লান ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থেকে জেনারেল বলল, 'আমার নিজের ইউনিফর্মের কথা ভেবে বারবার মাথা হেঁট হয়ে আসছিল।'

'শুধু এইটুকুই? আমার কিন্তু খুঁটিনাটির ওপরেই বেশি আগ্রহ।'

'খুঁটিনাটি? নিশ্চয়ই। একটা টেবিল ছিল, তাতে এক জগ্ জল; একটা কলমদানি আর কিছু কলম। অফিসারটি জলের জগের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে বলল, 'আমরা আপনাকে গভীর মহানুভবতার সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি, তাই মনে হচ্ছে না আপনার? তারপর তার সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বলল, আমি তো আর মার্শাল ফশ নই।'

'তাহলে ও লোকটা বলতে চায় কী? তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল?'

'লোকটা ফিল্মের অভিনেতার মতো। সদর্পে পায়চারি করল, হৈ চৈ করল আর তারপর বক্তৃতা দিল—কী ভাঙাভাঙা হেঁড়ে গলা লোকটার! মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো দিয়ে ঘাস মাড়াল, যেন বলতে চাইল : 'আমি ফ্রান্সের মাটিকে পায়ের নিচে দলছি।' ব্যস এইটুকু। বাকি যা ঘটেছে তা আমি নিজের কাছেও বলতে পারব না—ভয়ানক লজ্জাকর সমস্ত ব্যাপারটা।'

আরো তিন দিন কাটল। তেসা ব্যতিব্যস্ত রইল কাজে। সারাদিনের ভাবনাচিন্তা তাকে তার নিজস্ব চিন্তাস্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। নানা কাজ করতে হল তাকে—সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা, পুলিস বেষ্টনীগুলো পরীক্ষা করা, ময়দার সরবরাহ তদারক করা আর স্পেনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দহরম-মহরম করা। আর—তারপর মন্ত্রীসভা পুনঃগঠিত হল। নতুন মন্ত্রী নেওয়া হল দুজন।

আপোসপ্রার্থী দূতরা রওনা হল রোমে। সবাই শেষ সমাধানের প্রতীক্ষায়। এদিকে শহরগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ করে চলেছে জার্মানরা।

'আমার আর কারো ওপরে আস্থা নেই।' জোলিও ঘেঁডিয়ে ঘেঁডিয়ে মন্তব্য করে : 'দেখে নিও, ওরা ঠিক বোর্দো পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

অবশেষে আপোসের শর্তগুলো সাধারণ্যে প্রকাশ করা হল। ব্রতেই প্রস্তাব করে 'জাতীয় শোকদিবস' উদ্‌যাপন করা হোক।

তেসা হেসে বলে, 'ও লোকটা শুধু একটা জিনিস জানে, তা হল খ্রীষ্ট-নাম জপ করা। ধূপের গন্ধ ওর খুব পছন্দ।'

শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে পবিত্র উপাসনা-সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পেঁত্যা এবং সমস্ত মন্ত্রীই উপস্থিত হল সেই সভায়। শবযাত্রায় যাওয়ার মতো তেসা একটা কালো টাই পরে এসেছে। গির্জার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কিছু লোক চিৎকার করে বলছে, 'মার্শাল দীর্ঘজীবী হোক!' তেসা বিরক্ত হল; আবার ওরা মার্শালকে আলাদা করে দেখছে!

উৎসবটা এত বেশি বিরক্তিকর মনে হল তার কাছে যে নানা রকম অর্থহীন চিন্তা তার মাথার মধ্যে আনাগোনা করতে থাকল। আচ্ছা, পোলেৎ যদি বেঁচে থাকে আর প্রেমে পড়ে থাকে অন্য কারো সঙ্গে। অবশ্য ভীইয়ার যে মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়নি তাতে ভীইয়ারের খুশি হবার কারণ আছে। পরে সে বলে বেড়াবে : 'আমি এসবের মধ্যে নেই। আমি সইও দিইনি।' দু-এক দিনের মধ্যেই তাদের অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। কী হাস্যকর পরিণতি! আর হিটলারের ছোট্ট গোঁফটা কিনা ঠিক চার্লি চ্যাপলিনের মতো। গির্জার ভেতরটা কী গরম!

গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতেই এক সুদর্শন লোক এসে তেসাকে ধরল। লোকটার বোতাম-ঘরে একটি ফিতে লাগানো।

তেসা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'কী চাই আপনার?'

কোনো উত্তর না দিয়ে আগন্তুকটি একটা চড় মারে। তেসা গালে হাত দিয়ে শুধু চিৎকার করে ওঠে, 'কী জন্যে?'

কালো ক্রুদ্ধ দু-চোখে তাকিয়ে থেকে লোকটি বলে, 'আমি আমার দু-দুটো ছেলেকে হারিয়েছি!'

লোকটি আর কিছু বলতে পারল না, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। একটু একটু করে ভিড় জমল। এক শোকাচ্ছন্ন বৃদ্ধা কাঁদছে। কে যেন চাপা হাসি হেসে বলে ওঠে, 'জোর ঘুষিটা মেরেছে ওর চোয়ালে।' তেসা লাফিয়ে উঠে বসল তার গাড়িতে।

জোলিও যখন হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌঁছল তখনো তেসা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি।

'আবার আপনি আমায় গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়েছেন!' জোলিও চেঁচিয়ে ওঠে, 'দেখা যাচ্ছে, শর্ত অনুযায়ী ওরা বোর্দো দখল করবে। আমার অবাক লাগছে, এই সঙ্গে মার্সাইও কেন দেওয়া হচ্ছে না!'

তেসা বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। বলল, ক্লেরম-ফের‍্যায় ভালো ভালো ছাপাখানা আছে এবং ওখানে খবরের কাগজও খাসা চলবে। কিছু টাকার বরাদ্দও তেসা করে দিতে পারবে।

জোলিও আর্তনাদ করে ওঠে : 'যেন আপনার সাহায্যের জন্যে আমি হা-পিত্যেশ করে আছি! ওর আর কানাকড়িও দাম নেই। একজন ভদ্রলোকের দালালী করা যেতে পারে কিন্তু তাই বলে দালালের দালালী করা চলে না! তার চেয়ে মার্সাইয়ের পথে পথে মাছ ফিরি করে বেড়াব আমি।'

জোলিও অনেকক্ষণ বসে বসে গজরালো। তারপর ফিরে গেল হোটেলে; মারি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। শান্ত হতে কিছু সময় লাগে জোলিওর। পুরো একপাত্র মদ খাবার পরে অবশেষে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারে। স্ত্রীকে বলে, 'তেসা ক্লেরম-ফের‍্যায় চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে চার নম্বর রাজধানী। এরপর হবে পাঁচ নম্বর। কিন্তু আমার ঘেন্না ধরে গেছে। এবার পূর্ণচ্ছেদ। যাই হোক জার্মানরাই তো এখন ফ্রান্সের শাসনকর্তা। সুতরাং আমরা পারীতে ফিরে যেতে পারি। অন্তত ওখানে আমাদের নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে।'

'কিন্তু প্যারীতে গিয়ে কি করব?'

'যা আগে করতাম। লা ভোয়া নুভেল্ চালাব। জার্মানদের বুঝি আর কাগজের দরকার নেই! আর কে আমার পিছু লাগবে? তেসা? ও এইমাত্র চোয়ালে একটা ঘুষি খেয়েছে। গাল ফুলে গেছে। তবু যা হোক কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল!'

কয়েকদিন পরেই গভর্নমেণ্ট ক্লেরম-ফের‍্যায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। তেসা তার দলিলপত্র ভরে নিল বিরাট হাত-ব্যাগটায়, আর তোরঙ্গের তালাগুলো ঠিক আছে কিনা দেখল। তারপর জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকাতে গিয়ে চমকে সরে আসতে হল তাকে। রাস্তা দিয়ে জার্মান সৈন্য মার্চ করে আসছে। ফিটফাট লেফ্‌টেনেণ্টটি বিনয়ের ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে কয়েকজন পথচারীর দিকে। তেসা চটে যায়—সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না জার্মানরা! সত্যিই কী বিশ্রী! একই সঙ্গে স্বাধীন গভর্নমেণ্টের অবস্থান আর বিদেশী শক্তির প্রবেশ। বিদেশে লোকে কি ভাববে? ভেলভেটের পরদাগুলো টেনে দেয় তেসা—জার্মানদের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে নিজেকে।

সেক্রেটারি এসে খবর দিল গাড়ি তৈরি হতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। ইঞ্জিন মেরামত করা হচ্ছে। রওনা হবার আগে খানিকটা শুয়ে নিল তেসা। সূর্যের সোনালী আলো পরদার মধ্যে দিয়ে এসে দেওয়ালের গায়ে খেলা করছে। হঠাৎ তেসার মনে হল যে-লোকটা তাকে অপমান করেছিল তার ধাতব চোখগুলো সে যেন দেখতে পাচ্ছে। লোকটার কী হল কে জানে। তবে লোকটার মধ্যে বাৎসল্যের ভাব যে পুরোপুরি আছে তা স্বীকার করতেই হবে।......দেনিস কী করছে? আর লুসিয়ঁ?

এইসব চিন্তার পর তেসা প্রিফেক্টকে ফোন করল : 'তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আজ একটা লোক আমায় আক্রমণ করেছিল। হ্যাঁ, ধন্যবাদ, ঠিক আছে। আমি চাই লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। ও বলছিল ওর ছেলেরা নাকি যুদ্ধে মারা গেছে। তোমারও তো ছেলেমেয়ে আছে। তুমি বুঝবে এটা কত বড়ো দুর্ভাগ্য। এ অবস্থায় মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে। আমারও দুটি ছেলেমেয়ে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারা গেছে ওরা।'

তেসা কোনোমতে কথাটা শেষ করল, কান্নায় তার গলা বুজে গেছে।

সেক্রেটারি এসে জানাল, গাড়ি তৈরি। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তেসা উঠে দাঁড়াল কিছুক্ষণ বাদে যে-লোকটি গাড়িতে এসে বসল সে মনে মনে বিশ্বাস করে যে সারা জাতির আস্থার অধিকারী সে।

পঁয়ত্রিশ

সরকারী দপ্তর ক্লেরম'-ফেরঁ্যায় স্থাপিত হয়েছে তার কারণ আশেপাশে অনেকগুলো ধাতু-মেশানো জলের ঝরনা আর চারদিকে স্বাস্থ্যকর জলের স্পা ও আরামপ্রদ হোটেল। লাভাল ক্লেরম'-ফেরঁ্যায় রইল। আর বাকি মন্ত্রীরা কেউ ভিশি, কেউ বা মোঁ-দোর বা লা বুরবুল পছন্দ করল। তেসার বিচারে রয়া-ই সবচেয়ে উপযোগী জায়গা—রিপাব্‌লিকের সভাপতির জন্যে আসন সংরক্ষিত করা হয়েছিল এখানে।

বড়ো খাবারের দোকান 'লা মারকিস দ্য সেভিনি' খদ্দেরের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। খালি টেবিল পাওয়ার আশায় বাইরে লোকে ভিড় করে অপেক্ষা করছে। রয়া-র স্বনামখ্যাত ঘন চকোলেটের আকর্ষণ আশ্রয়প্রার্থীদের কাছে ততটা নয় যতটা তার অভিজাত সমাজের। এত সব বিভীষিকার পর নিজের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলতে আর নিজের আড্ডার দল খুঁজে পেতে অদ্ভুত লাগে। মনে হয় যেন সাঁজ এলিজের সমস্ত কাফেই এখানে উঠে এসেছে—'মারিনি', 'কার্লতঁ' বার আর লুসিয়ঁর প্রিয় কাফে 'ফুকেৎ'।

গরমে আর দুঃখের বোঝায় হাঁপাতে হাঁপাতে মাদাম মঁর্তানি তার গল্প বলে চলেছে : 'সর্বনাশের শুরুর এক সপ্তাহ আগেই আমায় পারীতে ফিরতে হল—আমার স্বামী কণ্ঠপ্রদাহে ভুগছিলেন। ওখান থেকে কোনোরকমে চলে আসতে পেরেছি আমরা। উঃ, কী ভীষণ পথ! নেভের্-এ আমাদের ক্যাডিলাকখানা ফেলে আসতে হল—পেট্রল পাওয়া গেল না। তারপর কে কোথাকার এক গুণ্ডা ভিশিতে পৌঁছে দিয়ে গেল আমাদের। আশা করি গাড়িটা এখনো অক্ষত অবস্থায় আছে......' অন্য একটা টেবিলে এক শৌখিন নাট্যকার তার দুঃখের কথা বলছে: যোলো তারিখেই প্রথম অভিনয় হবার কথা কিন্তু দশ তারিখ থেকেই গণ্ডগোল বাধল আর এখন কে জানে নাটকের মরশুম কবে শুরু হবে......'

শেয়ার বাজারের এক দালাল তার এক-কানে-যন্ত্র-লাগানো কালা সঙ্গীকে চিৎকার করে বলছে, 'নিউইয়র্কের বাজার দর না দেখে নিশ্চিত কোনো কিছু বলা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমি ঝুঁকি নেব না। যখন সব কিছু থিতিয়ে যাবে শেয়ারের দাম আপনিই বাড়বে।'

গাল-গল্প, অনুযোগ-অভিযোগ আর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে শুনে দেসের দুঃখের হাসি হাসল। কি ঘটেছে ওরা এখনো বুঝতে পারেনি। ভাবছে, এক সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে আবার পুরনো জীবন ফিরে আসবে।

দেসেরই বা এখানে এসেছে কেন? অভিজাত জায়গার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই এবং চকোলেটের চেয়ে মদই সে বেশি পছন্দ করে। আর এইসব হতভম্ব আর চিন্তা-কুল মেয়েদের প্রলাপ, ধুলোটে বিছানা-পত্রওলা পুরুষদের বিলাপ, পিকনিজ আর বাচ্চা টেরিয়ারদের তোলপাড়, দীর্ঘশ্বাস ('মুল্যোঁয় আমি আমার সুটকেশটা হারিয়েছি') বড়াই ('কুলিটাকে একটা ঘরের জন্যে আমি তিন হাজার ফ্রাঁ দিয়েছি'), অভিজাত সমাজের উত্তেজনাপ্রসূত হুড়োহুড়ি আর তাদের মোসাহেবদের ছুটোছুটি—সমস্ত কিছু দ্বিগুণ বীভৎস মনে হল দেসেরের কাছে। কিন্তু সে নিজেও চাইছে পেট পুরে খাওয়াদাওয়া করতে। তেসাকে খাবারের দোকানে ঢুকতে দেখে দেসের গাড়ি থেকে নামল।

চারদিকের হুল্লোড় দেখে শ্বাসরোধ হয়ে এল দেসেরের। সমস্ত নীচতা আর নোংরামি জড়ো হয়েছে এখানে! দেসের এখনো চোখের সামনে রক্ত দেখতে পাচ্ছে। পারী থেকে নীস পর্যন্ত যে-রাস্তাটিকে বলা হয় 'নীল রাস্তা' সেই রাস্তা দিয়েই এসেছে সে। আগে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করত পয়সাওলা ফুলবাবু, ছোট-ইজের পরা রমণী, ফোতো-বাবু আর সেইসব লোক যারা দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াতে কিংবা রুলেৎ খেলতে ভালোবাসে। এখন এই রাস্তাতেই আশ্রয়প্রার্থীদের জটলা। জার্মান উড়োজাহাজ তাদের মাথায় ওপরে নিচু হয়ে ওড়ে আর পাইলটরা হাসতে হাসতে একে অপরকে পথ ছেড়ে দেয়। দেসের সেই দঙ্গল কবরগুলো দেখে এসেছে আর দেখে এসেছে হাজার হাজার আশ্রয়হীন মানুষ। পারীর বাস্‌গুলো বাসস্থানে পরিণত হয়েছে আর বাসের বাসিন্দারা সেজন্যে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। উপোসী সৈন্যরা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায় বীট আর সালগমের সন্ধানে। মেয়েরা হারানো সন্তানের উদ্দেশে উন্মাদের মতো ডাক ছেড়ে কাঁদে। আগে যেখানে ছিল শহর এখন সেখানে ধ্বংসস্তূপ। না-দোয়ানো গোরুগুলো তারস্বরে হামলায়। চারদিকে পোড়া আর মড়ার গন্ধ।

'নীল রাস্তার' কথা মনে পড়তে দেসের চোখ বুজল। চোখ মেলতে হল তেসার হাসি শুনে।

'আরে, তুমিও দেখছি এখানে!' তেসা বলছে, 'সত্যি পৃথিবীটা বড়োই ছোট! কে ভাবতে পেরেছিল যে এত কাণ্ডের পর আবার লা মার্‌কিস দ্য সেভিনিতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে!'

দেসের কিছু বলল না। তেসা বলে চলল, 'তোমাকে সুস্থ দেখাচ্ছে না। জুল, এটা খুব খারাপ কথা কিন্তু। চাঙ্গা হয়ে ওঠা উচিত তোমার। আমার নিজের তো আশঙ্কা ছিল অবস্থা আরো অনেক খারাপ হবে। কিন্তু সবকিছুই ঠিকঠিক হয়ে গেল। আহাম্মক-দের ব্যাপার তো জানই—মাঁদেল আর তার দলবল—ওরা সরে পড়তে চেয়েছিল আফ্রিকায়। কিন্তু আমরা যেতে দিলাম না। এই সময়ে সমস্ত জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। খুব শিগগিরই সমস্ত চুকেবুকে যাবে। জার্মানরা ধাওয়া করবে লণ্ডনের দিকে। আর দু-তিন মাসের মধ্যেই যা হবার হয়ে যাবে। এ-ব্যাপারটা থেকে আমরা সরে গেছি আর এতে আমাদেরই সুবিধে। তুমি কী করবে ভাবছ? তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার—আমরা দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিচ্ছি। হাসছ কেন? কথাগুলো মিছিমিছি বলছি না।'

দেসেরের হাসি মিলিয়ে গেল। গুম হয়ে গিয়ে বলল, 'তোমার মাথায় কিছুই ঢোকে না তা একপক্ষে ভালোই। তোমার ভাববার দরকার নেই, চকোলেট খাও। আসলে তুমি

একটা ছারপোকা। রাগ কোরো না, তুমি সত্যিই একটি বনেদী ও অভিজাত ছারপোকা। থাকতেও তুমি একটি বনেদী ও অভিজাত বাড়িতে। এখন বাড়িটা জ্বলে-পুড়ে গেছে। কিন্তু তুমি সেই অভিজাত ছারপোকাটি থেকে গিয়েছ। কিন্তু তার আর কি রইল? তোমার অবস্থা দেখে আমার সত্যিই দুঃখু হচ্ছে।'

তেসা অপমানে ফেটে পড়ল, 'তুমি বরং নিজের জন্যে দুঃখিত হলেই ভালো কাজ করবে! আমি তোমার করুণার অপেক্ষায় বসে নেই। আমি ফুজে নই, বুঝলে! হাল আমলের ধ্যান-ধারণাওলা মানুষ আমি। আসলে তুমিই অতীতকে আঁকড়ে ছিলে—পপুলার ফ্রণ্ট, উদারনীতি আর আমেরিকা। জেনে রাখ, দেশের সমস্ত জঞ্জাল আমরা দূর করব। আমি নতুন গঠনতন্ত্র লেখার কাজে হাত দিয়েছি। হিটলারের মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে মূল্যবান সে সবই আমরা নেব—যেমন, শ্রেণী-সহযোগিতার আদর্শ, অধিকারের ব্যাপারে ভেদাভেদ, শৃঙ্খলা, আর আমরা তার সঙ্গে মেলাব আমাদের ঐতিহ্য, পরিবারগত ধ্যানধারণা, আমাদের জাতিসুলভ সৎ-বুদ্ধি, আর তারপর......'

দেসের কিছু শুনছে না। সে শুধু আপন মনে বলে চলেছে, 'আহা বেচারা ছার-পোকা!'

তেসা চলে গেল। দেসের তবু বসে রইল সেখানে। আশেপাশের লোকজনের কথাবার্তা আর শুনছে না সে বা তাদের দিকে তাকিয়েও দেখছে না। শেষে উঠে দাঁড়িয়ে এলো-মেলো পা ফেলে হেঁটে গেল দরজা পর্যন্ত। কে একজন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'এই যে দেসেরও দেখছি এখানে! তার মানে সবই ঠিক আছে।'

দেসের ফিরে দাঁড়াল না; হয়তো সে শুনতে পায়নি। তার চোখের সামনে আবার সেই দৃশ্য ভেসে উঠেছে। সেই ঘন আবছায়ায় মোড়া পারী, ঠেলাগাড়ি নিয়ে চলা আশ্রয়প্রার্থীর দল আর জঞ্জালের পাহাড়। এই ফ্রান্সকেই তো সে বাঁচাতে চেয়েছিল—তার ছেলেবেলার ফ্রান্স, যারা মাছ ধরার জন্যে ছিপ ফেলে বসে থাকে তাদের, চীনা লণ্ঠন ও কাফে দ্য কমের্সের।

একবার সে এক নিরিবিলি নির্জন রাস্তার ধারের আলো জ্বালা জানলাগুলো দেখিয়ে-ছিল পিয়েরকে—যেখানে লোকে সুপ খায়, পড়া তৈরি করে, বেল্ট্ বোনে, প্রেম করে আর চুমু খায়। এখন আর সেখানে সে-সব কিছু নেই; আছে শুধু চোখের কোটরের মতো অন্ধ-কারাচ্ছন্ন জানলা, বোমা-চিহ্নিত দেওয়াল আর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ জার্মানদের ভিড়। তাকে অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। কত কিছুই তো সে বাঁচাতে চেয়েছিল! কিন্তু আসল কাজের বেলায় সে শুধু ছারপোকা পুষেছে, পালে-পালে শুয়ে শুয়ে ছারপোকা। সে ভালোবাসত সাদাসিধে মদের দোকান আর লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন। কিন্তু সে সবই ভুয়ো! আর এজন্যেই চিন্তিত বোধ করত জেনেৎ। তার এতদিনের জীবনে এই একটি মেয়েকেই সে ভালোবেসেছিল, এই মাথা-পাগলা সাদাসিধে ভালো মেয়েটি। জেনেতের খবর কি, কে জানে? হয়তো সে কাছেই কোথাও রাত্রের আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাকি পথেই মারা গিয়েছে? নাকি পারীতেই থেকে গিয়েছে আর লম্বা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে? পুরনো রাস্তা দিয়ে এখন পাঁশুটে-সবুজ ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা চলেছে মার্চ করে। সত্যি, জেনেৎকে সে বাঁচাতে পারেনি। কাউকেই পারেনি।

হোটেল, দোকানপাট আর গাড়ির ভিড় ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে দেসের। গাড়ি চালিয়ে চলতে চলতে টের পেল, ঘাসে-ঢাকা জমি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত চোখদুটি খুশি হয়ে উঠল ঘন-সবুজ ঘাস দেখে। কোথায় চলেছে তা না জেনেই গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল দেসের। তারপর কেন কে জানে সে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল দক্ষিণের পাহাড়ের রাস্তাটার ওপরে। কী ঠাণ্ডা আর খোলা বাতাস! কী বুকজুড়ানো আর মিষ্টি! গাড়িটা থামিয়ে নেমে পড়ল সে। জায়গাটা একেবারে নির্জন।

অনেক দিন পরে এই প্রথম সে একা হতে পেরেছে। মাঠ আর হলদে-গোলাপী-বেগুনী ফুলগুলোর দিকে খুশিভরা চোখে তাকিয়ে রইল দেসের। ঐ ফুলগাছগুলোকে লোকে বলে 'স্ন্যাপড্রাগন'। কি ছেলেমানুষি নাম! আরো একটু দূরে ঘন নীল পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের ওপরকার মেঘগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক ভেড়ার পালের মতো।

এখানকার হাওয়াটা এত পরিষ্কার যে দেসের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে নিশ্বাস নিল। সম্প্রতি তার মনে হচ্ছিল তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। কিন্তু এখানে এসে তার বুকটা আরো তাড়াতাড়ি ওঠা-নামা করছে, কপালের রগদুটো টিপ-টিপ করছে আর কানদুটো ঝাঁ-ঝাঁ।

অনেকদিনের পুরনো এক বন্ধু বেরনারের কথা মনে পড়ল। প্রত্যেকেই বেরনারকে অভিজ্ঞ অস্ত্র-চিকিৎসক বলে জানত। গতকাল দেসের খবর পেয়েছে যে বেরনার গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। ওর মুখখানা ছিল ঠিক যেন ইবসেন-বর্ণিত কোনো পাদরীর মতো নীরস আর দৃঢ়। কিন্তু জীবনকে ও ভালোবাসত, ফুলের বাগান তৈরি করত আর খেলা করত নিজের ছোট মেয়ের সঙ্গে। সেই বেরনারই কিনা বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে। জানলার ধার দিয়ে জার্মানদের যাতায়াত করতে দেখে আজেবাজে একটা প্যাড থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সে লিখেছিল : 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এর চেয়ে মরণ ভালো।'

এক সময়ে মৃত্যুর কথা ভাবতে দেসের আতঙ্কিত হত। মনে হত, মৃত্যু দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য। এখন বেরনারের মৃত্যুকে সমীচীন মনে করল সে, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত এই মৃত্যু। দেসের হঠাৎ বুঝতে পারল যে মৃত্যু জীবনেরই একটা অংশ; আর মরণের ভয় কেটে গেল তার মন থেকে।

মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা গাছ পর্যন্ত হেঁটে গেল দেসের। অদ্ভুত তার হাঁটবার ভঙ্গি—ফুলগুলোকে মাড়াতে চায় না সে। গাছটা দেখে ফ্ল্যারি আর জেনেতের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা মনে পড়েছে দেসেরের।

'সংসারের খেয়াঘাটে খুঁজে নেব মোরা দুইজনে
স্মরণের পরপারে দূরযাত্রী স্বপ্নের জাহাজ
আলোঝরা সেই স্বর্গে আমাদের মুক্ত অভিসার......'

আর এইতো সেই বিস্মৃতির লীলাভূমি, স্বর্গ!

এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না—একজন গোলগাল প্রৌঢ় লোক লম্বা ওভারকোট পরে মাঠের মাঝখান দিয়ে পা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে হাঁটছে আর হাত নাড়িয়ে বিড়-বিড় করে বলছে, 'শস্য...ভালোবাসা...ঠান্ডা'। কিন্তু তাকে দেখবে এমন কেউ এখানে নেই। শুধু পাহাড়ের ধারে রাখালরা নিশ্চিন্ত মনে আগুন জ্বালছে; রেডিওর চিৎকার বা আশ্রয়প্রার্থীদের আর্তনাদ ওরা শোনেনি। অতীতের শান্তির মধ্যে বাস করছে ওরা।

পাহাড়ের নিচে সূর্য ডুবে গেল। হাল্কা কুয়াশার রূপ নিয়ে মৃত্যু এগিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। কুয়াশাটা কেমন সজীব আর কম্পমান, ভেড়ার পালের মতো নড়াচড়া করছে। অন্যমনস্কভাবে আপন মনে হাসতে লাগল দেসের। তারপর প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে টেনে বের করল মস্ত একটা রিভলবার। রিভলবারের নলের ওপর সে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল ব্যগ্রভাবে, যেন এটা একটা বোতলের মুখ আর গ্রীষ্মের দিনে তেষ্টায় ছটফট করছে সে।

গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। রাখালরা চমকে উঠে দাঁড়িয়েছে; ভাবছে, সর্বনাশা যুদ্ধের কালোছায়া তাদেরও গ্রাস করতে চাইছে বুঝি।

ছত্রিশ

ইতিমধ্যে জুলাই মাস শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু লিমুস্যাঁর মাঠগুলো মে মাসের মতোই ঝকঝকে সবুজ। লুসিয়ঁ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে এই সবুজ বিস্তৃতির দিকে। সত্যিই, চোখ জুড়িয়ে যায়। তারপর মাঠ থেকে উঠে পড়ে চলতে শুরু করে। সে নিজেই জানে না কোথায় চলেছে। খিদের জ্বালায় চলতে হচ্ছে তাকে, নইলে অনেক আগেই ঐ মস্ত অ্যাশ্ গাছটায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকত। মানুষের আর সব অনুভূতি চলে গেলেও এই একটি অনুভূতি থেকে যায়—কথাটা ভেবে আপন মনে হাসে লুসিয়ঁ। গাজর আর বীট খেয়ে বেঁচে আছে সে। কখনো কখনো তারই মতো অপরিচ্ছন্ন আর দাড়ি না কামানো কোনো পল্টনীর সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যায় আর সে তার রুটির ভাগ দেয় লুসিয়ঁকে। কখনো বা কোনো গ্রামে একবাটি টাটকা দুধ জুটে যায় লুসিয়ঁর ভাগ্যে আর টাটকা রুটির গন্ধ ভেসে আসে। আগে এই গন্ধে তার গা গুলিয়ে উঠত, কিন্তু এখন মনে হয় অপরূপ—প্রথম যৌবনের স্মৃতির মতো, জীবনের সৌরভের মতো।

লুসিয়ঁ নিজের জন্যে একটা ছড়ি বানিয়ে নিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত সে রণাঙ্গনের ৮৭নং পল্টনের সৈনিক ছিল। কিন্তু এখন আর সৈন্যবাহিনী বলে কিছু নেই, লুসিয়ঁ তার নিজের ধারণায় একজন ভবঘুরে মাত্র। ছোট্ট এক গ্রামে সে তার বাবাকে বেতারে আপোসের শর্ত ঘোষণা করে বক্তৃতা দিতে শুনল। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বুড়ী বলে উঠল, 'চুকে গেল তাহলে? যাক বাবা, এ একটা ভালো খবর বৈকি!' তারপরে সে তার শুয়োরটাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল—শুয়োরটার গোলাপী রং যেন কোনো চিত্রকরের আঁকা নগ্ন নারীদেহের মতোই। সৈন্যরা গাল পাড়তে লাগল কিন্তু লুসিয়ঁ মন দিয়ে শুনতে লাগল তার বাবার গলার স্বরের ওঠানামা। হ্যাঁ, এই তো তার বাবারই স্বর। অনেক পুরনো শৈশব স্মৃতি জেগে উঠল মনের মধ্যে। মনে পড়ল, তার রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বাবা একবার বলে-ছিলেন, 'আমালি, লক্ষ্মীটি, চিন্তা কোরো না। বিজ্ঞানের অসাধ্য কিছু নেই।' আর এখন তার বাবা বলছেন, 'আত্মিক শক্তি অপরাজেয়।' কিন্তু জেনেৎ তো বাঁচতে চেয়েছিল। লুসিয়ঁ আরও অনেককে দেখেছে যারা বাঁচতে চেয়েছিল। ঐ জার্মান পাইলটগুলোর অসুরের মতো নার্ভ আছে বলতে হবে—স্ত্রীলোকদের আর শিশুদের লক্ষ্য করে সোজাসুজি গুলি করতে পারে।...কী অর্থ এই বক্তৃতার? গতিক দেখে মনে হচ্ছে, ব্রতৈইর কাছ থেকে খানিকটা প্রশ্রয় মঞ্জুর করে নিয়েছেন তার বাবা আর খুব সম্ভবত হিটলার তাঁকে একটা 'লৌহক্রশ' দেবে। লুসিয়ঁ ঘন ঘন হাই তোলে। কেউ কি দুধ খেতে দেবে তাকে? কিন্তু হাজার হাজার সৈন্য তো আগে এ-পথ দিয়ে চলে গিয়েছে। সন্ত্রস্ত চাষীরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে তাকে দেখে। সেই বুড়ীর সঙ্গ ধরে ফেলেছিল লুসিয়ঁ, সে তার গোলাপী শুয়োরটাকে আগলিয়ে রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'আমার কিছু নেই, কিছু নেই!'

সন্ধ্যাবেলা ভয়ানক খিদে পেল লুসিয়ঁর। বন্দুক দিয়ে ভয় দেখাল বুড়ীটাকে। কান্না থামিয়ে বুড়ী শুয়োর-বাঁধা দড়িটা আরো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে বিড়বিড় করে বলল, 'দেবার

মতো কিছুই নেই আমার।' মাটিতে থুতু ফেলে লুসিয়' গর্জন করে উঠল, 'ফের গজগজ করছিস!' শুয়োরটার ওপরে নজর ছিল লুসিয়'র।

আরো এগিয়ে যেতে রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে একটা খামার। খড়খড়িগুলো বেশ শক্ত করে বন্ধ করা। রাত্রির দিকে তাকাতে ভয় পায় চাষীরা। কুকুরদের একটানা ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়া আর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। লুসিয়' চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই হতভাগারা, কিছু খেতে দে আমায়!' কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, শুধু কুকুরগুলোর চিৎকার আরো প্রচন্ড হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাস্তার ধারে ছোট্ট নদীটার দিকে এগিয়ে গেল লুসিয়'। নদীর জলে শ্যাওলার গন্ধ, সেই জলই খেল। তারপর একটা গরু-ভেড়া থাকবার আটচালার নিচে শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল মেয়েলী গলার স্বর শুনে। একটি মেয়ে তাকে ডাকছে, 'পল্টন, ও পল্টন!' মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। ঘুমোনোর সেমিজের ওপরে মেয়েটি পুরুষদের ওভারকোট পড়েছে। জ্যোৎস্নার আলোয় মেয়েটির দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল লুসিয়'। এমনকি মনে মনে ভাবল : 'মেয়েটি দেখতে মোটেই খারাপ নয় তো।' জীবন্ত একজোড়া চোখ আর খাঁদা নাকে চমৎকার মানিয়েছে তাকে যদিও উচ্ছ্বসিত হবার মতো কিছু নেই। মেয়েটি বরাবর বলে চলেছে : 'ও পল্টন, ঘুমোলে নাকি? ও পল্টন...' মেয়েটি তার জন্যে মস্ত এক টুকরো রুটি আর মাংসের জমানো চর্বি এনেছে।

মেয়েটি বলল, 'গিন্নীমা ঘুমোতে গেলেন তবে না আসতে পারছি। উনি এই মাংসের চর্বির টুকরোটা শুধু বাইরে রেখেছিলেন, বাকি সব ভাঁড়ারে তালা বন্ধ। তোমায় আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আসলে কত্তা লোক খারাপ নয় কিন্তু আজকাল তোমাদের মতো কত লোকই তো আসছে। উনি বলেন, আমরা নিজেরাই না খেতে পেয়ে মরব। আমি বাইরে এসে দেখি তুমি নদীর দিকে নেমে যাচ্ছ। যেই না ওরা শুতে গেলেন অমনি আমি খাবার নিয়ে দৌড়ে এসেছি।

লুসিয়' কথা বলল না, শুধু তার ছুরিটা বের করে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখল মেয়েটি। অনেকক্ষণ ধরে খেল লুসিয়'—পেট ভরে খাবার পরেও খেতে লাগল। ক্লান্তিতে আর ঘুমে শরীরটা অবসন্ন লাগছে, তবুও মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বাড়ির মেয়ে?'

'আমি ঝি।'

অবশেষে খাওয়া শেষ হলে ঘাসের ওপর ছুরিটা মুছে নিয়ে মেয়েটির দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল লুসিয়'। বুঝল, মেয়েটিও তার দিকে খুশিভরা চোখে তাকিয়ে আছে। রীতিমতো অবাক লাগল লুসিয়'র—তার ধারণা তার চেহারাটা যে কোনো লোককে ভয় পাইয়ে দেবার মতো বুনো হয়ে উঠেছে। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা শক্ত বাদামী দাড়ি, কিন্তু তার সবুজ চোখদুটো সব সময়ে জ্বলজ্বল করে। ধুলোয় আর ঘামে নোংরা পোশাক। লুসিয়' হাতের ইশারায় মেয়েটিকে বসতে বলল। মেয়েটি শুনল তার কথা। লুসিয়'র চেয়ে মেয়েটি প্রায় এক-মাথা বেঁটে। নিঃশব্দে—এমন একটা ভঙ্গিতে যে মনে হতে পারে সে ভেবেচিন্তেই কাজটা করছে—মেয়েটির গলা জড়িয়ে ধরল লুসিয়', তারপর আলতোভাবে মেয়েটির মাথা হেলিয়ে চুমু খেল তাকে। মনে হল যেন সে জল খাচ্ছে। সস্নেহে লুসিয়' তাকে অনেকগুলো চুমু খেল। তারপর দুজনে শুয়ে পড়ল ঘাসের ওপরে আর মেয়েটি ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'পল্টন গো, ও পল্টন!'

ভোর হতে শুরু করেছে। মেয়েটি ছটফট করে উঠল। চুপি চুপি বলল, 'এইবার গিন্নী-মা উঠবেন।'

লুসিয়' জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

'জেন গ্রেলি।'

বুকটা তোলপাড় করে উঠল লুসিয়ঁর। আস্তে আস্তে মেয়েটির লাল রুক্ষ হাতে হাত বোলাতে বোলাতে ঠোঁট নাড়াল—কিছু একটা ভালোবাসার কথা বলতে চাইছে সে। কিন্তু পারল না। অবশেষে বলল, 'জেনেৎ...'

'আর তোমার নাম?'

'লুসিয়ঁ।'

'আর কি?'

'লুসিয়ঁ দুভাল।'

ইউনিফর্ম থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলে পথ চলতে শুরু করল লুসিয়ঁ, একবার পেছন ফিরে তাকাল না। নদীর ধারে এই রাত-কাটানো তার কাছে মনে হচ্ছে যেন ভাগ্যের উপহার, যে-মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই তার স্বপ্ন। কিন্তু এখন আর স্বপ্নের ঘোর নেই। দুভাল, দুরা, প্রেলি—তেসা বাদে যে-কোনো নাম নেওয়া যেতে পারে! নিজের নামে পরিচয় দিলে ওরা তো তাকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচত, কিন্তু সে কিছুতেই তা স্বীকার করবে না! নইলে, একবার শুধু বললেই হয় যে সে তেসার ছেলে, তাহলেই ওরা তাকে খাওয়াবে, পরাবে এবং গাড়িতে করে ভিশিতে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর চেয়ে সে বরং ঐ বুড়ীটাকে খুন করবে, সেই বুড়ী—একটা শুয়োর ছিল যার সঙ্গে।

এক অপরিচিত সৈনিকের দেখা মিলল, লোকটি লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল দুজনে।

সৈনিকটি রসিকতা করে বলল, 'মার্শাল মশাই দেখছি পল্টন হারিয়ে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, আলপিনের মতো।'

তারা যে যার আলাদা পথে চলে গেল। নতুন দিন শুরু হয়েছে, খাবারের সন্ধানে ঢুঁড়ে বেড়াতে হবে তাদের।

অবশ্য মার্শাল পেত্যাঁর মাথাব্যথাটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে নয়। গতকালই তিনি ফরাসী জাতিকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিয়েছেন। বলেছেন, কারো সঙ্গে তিনি প্রতারণা করতে চান না। ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বারবার বলেছেন : 'রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করবেন না। রাষ্ট্র কিছু দিতে পারবে না আপনাদের। আপনাদের সন্তানসন্ততিদের ওপর নির্ভরশীল হোন। তাদের মধ্যে ধর্মভাব ও পারিবারিক নীতিবোধ জাগিয়ে তুলুন। তারাই আপনাদের বাঁচিয়ে রাখবে।' মার্শালের বক্তৃতা শুনে তেসা প্রথমে ভয়ানক মুষড়ে গেল। তাকে তো কেউ বাঁচিয়ে রাখবে না—ঐ হতচ্ছাড়া লুসিয়ঁটাও নয়, রগচটা দেনিসও নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে শ্লেষের সঙ্গে লাভালকে বলল, 'পঁচাশি বছর বয়সে একথা বলতে কোনো বাধা নেই, বিশেষ করে যখন ছেলেমেয়েরা নয়, রাষ্ট্রই ওঁর ভরণ-পোষণ করছে।'

সৈন্যদের কথা কারও মনে নেই। মন্ত্রীরা নানান কাজে ব্যস্ত—যেমন, রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধি বাছাই করা, ব্রতেইর নেতৃত্বে পারীতে প্রতিনিধিদল পাঠানো, নতুন গঠনতন্ত্র লেখা, যুদ্ধের মালমশলা জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া আর দ্য গলের গ্যেরিলা দলের সঙ্গে লড়াই করা। সৈন্যবাহিনী আপনা থেকেই ভেঙে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। রেলগাড়ির চলাচল বন্ধ। অনধিকৃত এলাকার লোকেরা প্রায় হেঁটে দক্ষিণমুখো আসছে। পারীবাসীদের আর উত্তরাঞ্চলের লোকদের অবস্থা ঠিক ভবঘুরের মতো। এদিকে চাষীরা সৈন্যদের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যে পুলিশের কাছে অনুনয়-বিনয় করছে।

লুসিয়ঁ একটা পাহাড়ের চুড়োয় উঠল। সারাদিন মড়ার মতো শুয়ে রইল ঘাসের ওপর, দিনটা ঠাণ্ডা। আকাশে ফোলা ফোলা মেঘ, মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে পূর্বদিকের পাশের শহরের দুটো ছাইরঙা গম্বুজের দিকে আর এই মেঘের আড়ালে সূর্য বারবার ঢাকা পড়ছে। মেঘের

এই গতিবিধি দেখতে দেখতে লুসিয় কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। এখন আর কিছুই সে স্পষ্ট করে মনে করতে পারছে না, পুরনো দিনের ছবিটাকেও মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা করল না। তবে মেঘগুলো চলছিল, সেই দেখে সে বুঝতে পারল যে সময়ও চলছে। তার মনে হতে লাগল, আবার যেন সে সেই অল্প কয়েকদিনের উদ্দাম জীবনে ফিরে গিয়েছে। আঁরির মৃত্যু, কেমিস্টের দোকানের বাইরে জেনেতের চাউনি, বালিয়াড়ির পেছনকার সমুদ্র আর ঐ দুটি গম্বুজের ওপরকার হালকা কুয়াশা—সমস্ত কিছু যেন এক সঙ্গে মিশ খাওয়ানো। তারপর যখন সূর্য ডুবল আর দ্রুত ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে মেঘগুলো গেল হারিয়ে তখন তার মনে হতে লাগল যেন জীবনটাও ফুরিয়ে গিয়েছে। খানিক ঠান্ডায় আর খানিক ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল সে। এর আগে সে কোনোদিন মৃত্যুকে ভয় করেনি। কিন্তু কুয়াশা ঢাকা আবছা তারাগুলোর নিচে পাহাড়ের এই স্যাঁতসেঁতে সন্ধ্যায় সে ভয় পেল কেন? সে নিজেই অবাক হল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'রুটি!' সারাদিন সে কিছুই খায়নি। তাকে উঠে গিয়ে রুটির সন্ধান করতেই হবে।

উপত্যকার মধ্যে নেমে পড়ল লুসিয়। গাছপালার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ছোট চৌকো একটা জানলায় মিটমিটে আলো। দরজায় ঘা দিয়ে লুসিয় হাঁক দেয় : 'পল্টনের জন্যে কিছু রুটি মিলবে?' কোনো জবাব নেই। সের্জে নামে এক একগুঁয়ে বুড়ো এই বাড়িটার মালিক। পাদরির কাছে স্বীকারোক্তি করার দরুন নিজের স্ত্রীকে সে না খেতে দিয়ে মেরেছে। সিংহের মতো তার ক্ষমতা; হাতের জোরে তামার পয়সা বেঁকাতে পারে। গুহার মধ্যে ওত পেতে থাকা ভল্লুকের সঙ্গে তুলনা করা চলে এই লোকটিকে। ভয়ে জড়োসড়ো একটি অল্পবয়সী ঝি-কে নিয়ে সে একা থাকে। মনিবের বকুনি খেলেই মেয়েটি হেঁচকি তুলতে শুরু করে। সের্জে'র বড়ো ছেলে বহুদিন হল কানাডা চলে গিয়েছে। ছোট ছেলেটি পাশের গ্রামে তার শ্বশুরের সঙ্গে থাকে। মাসখানেক আগে সের্জে'র পল্টনে ডাক পড়েছে যদিও ন্যাটা বলে আগে একবার সে অব্যাহতি পেয়েছিল। ভাগ্যই লুসিয়'কে সের্জে'র বাড়িতে এনে উপস্থিত করল।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে লুসিয় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কিছু রুটি দে না!' পাশের জানলা থেকে বাঁধাকপি আর পেঁয়াজের গন্ধ ভেসে আসছে, সুপ তৈরি করছে ঝিটা। গন্ধ পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে লুসিয়। একটা বন্য ভাব জেগে উঠেছে তার মধ্যে, আলোকিত জানলাটা কিন্তু নিস্তব্ধ। লুসিয়'র আর সহ্য হল না। বাড়ির মালিক তাকে গালাগালি দিয়ে খেদিয়ে দিক্—কিন্তু সাড়া দেয় না কোন্ সাহসে? উচ্ছন্নে যাক সব! কাদের জন্য তাহলে যুদ্ধ করল সে?

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। নেটের পর্দার মধ্যে দিয়ে একটা বুড়োর মুখ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে ব্রতেইর কথা মনে পড়ে লুসিয়'র। সের্জে মোটেই 'মন্ত্রশিষ্য'দের নেতার মতো দেখতে নয়, কিন্তু লুসিয় এতটা রেগে উঠেছে যে তার মনে হতে থাকে এই লোকটির মধ্যে সে ব্রতেইর সাদৃশ্যই দেখতে পাচ্ছে। খানিকটা পিছিয়ে এসে লুসিয় জোর গলায় চিৎকার করতে থাকে : 'দোর খোল শয়তান কোথাকার! নইলে গুলি করব।'

লুসিয় ঐ আলোকিত বিদঘুটে জানলাটা লক্ষ্য করেই গুলি করত কিন্তু তার আগেই গুলির শব্দ হল। লুসিয় যেন নাচছে এমনিভাবে পা দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে মাটিতে পড়ে গেল।

মাটিতে পড়বার সময়ে লুসিয়'র গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোয়নি। কিন্তু প্রচন্ডভাবে আওয়াজ করে উঠেছে সের্জে। আশেপাশে বাড়িঘর থাকলে লোকেরা তক্ষুনি ছুটে আসত, কিন্তু সের্জে'র বাড়িটা একটা নির্জন উপত্যকার মাঝখানে আর সেখান থেকে কেবল একটা প্রতিধ্বনি ফিরে এল : 'অ্যাই!' আর রান্নাঘরের ঝিটা ভয়ে হেঁচকি তুলতে তুলতে নিস্তেজ হয়ে এল।

যে-বন্দুকটা দিয়ে সের্জে গুলি করেছে সেটা একসময়ে সে ব্যবহার করত শুয়োর শিকার করার জন্যে। বন্দুকটা ফেলে সে তাড়াতাড়ি লুসিয়ঁর কাছে দৌড়ল। লুসিয়ঁ শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। কুয়াশাঢাকা চাঁদের সবুজ আলো এসে পড়েছে লুসিয়ঁর গালে। বেড়ালের চোখের মতো চকচক করছে চোখদুটো আর তার চুলগুলোয় যেন আগুন ধরে গিয়েছে। কোনো জনপ্রিয় ফিলমের কন্দর্পকান্তি দস্যুর মতো দেখাচ্ছে তাকে। সের্জের লণ্ঠনের আলোয় তার ইউনিফর্মের ওপরকার রক্ত ঘন টাটকা রঙের মতো ভেসে উঠল।

লণ্ঠনটা নিচে নামিয়ে রেখে সের্জে মৃতদেহের পাশে গিয়ে বসল। মাঝরাত পর্যন্ত বসে রইল এইকইভাবে; মাঝে ধূমপান করার ইচ্ছে হওয়ায় তামাকের থলিটা টেনে বার করল কিন্তু তারপরেই ভুলে গেল সেকথা। স্থির হয়ে বসে রইল সের্জে; কেবল উস্‌কোখুস্‌কো পাকা চুল মস্ত মাথাটা একটু-একটু এদিক-ওদিক দুলতে থাকল।

ঝিটা বাইরে বেরিয়ে আসে। ভীরু পায়ে মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে, 'আহা, কী সুন্দর চেহারার মানুষটা গো!' তারপরেই হেঁচকি উঠে তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায়। সের্জে গর্জে ওঠে : 'চুপ!' মেয়েটি চলে যেতে চায় কিন্তু সের্জে থাকতে বলে তাকে। তারপর একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত আবেগহীন গলায় সের্জে বলতে থাকে: 'ডাকাতের দল!' কিন্তু কে সে? একজন সৈনিক! একজন ফরাসী......'

মেয়েটি হঠাৎ ভয়ে ছাই-এর মতো সাদা হয়ে যায়—কারণ সে দেখছে তার মনিব মৃত লোকটির পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছে : 'পিয়েরো! আমার খোকা!'

সকালে একটা রিপোর্ট লেখা হল। সের্জে সই করে দিয়ে বলল, 'এবার আমার নিয়ে চলুন।' কিন্তু পুলিশের হাতে ইতিমধ্যে বহু লোক জমা হয়ে গিয়েছে—আর দরকার নেই। সার্জেন্টটি বলল, 'ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখা হবে। তারপর দরকার পড়লে ডাকা হবে আপনাকে।' লুসিয়ঁর পকেট হাতড়ে কোনো কাগজ পাওয়া গেল না। তাই রিপোর্টে লেখা হল : 'অপরিচিত লোক—পরনে সৈনিকের ইউনিফর্ম।' হঠাৎ মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই যে পেয়েছি!' লুসিয়ঁর কোটের ভেতরকার পকেট থেকে যে কাগজের টুকরাটা সে পেয়েছে সেটা দেখাল মেয়েটি। সার্জেন্ট কাগজটা খুলল। বড়ো বড়ো হরফে তিনটি কথা লেখা আছে কাগজটিতে : 'ফ্রান্স, জেনেৎ, মেরদ্‌।'

থুতু ফেলে সার্জেন্টটি মন্তব্য করে ওঠে, 'ডাকাত!'

সাঁইত্রিশ

ক্ল্যামাসের ফ্ল্যাটে দেনিস আত্মগোপন করেছে। বৃদ্ধা মহিলাটি যে এখনো প্যারীতে আছেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই। ট্রামের বাজনা বা গানের শব্দ এই আঁকাবাঁকা গলির ভেতর পৌঁছয় না। অসহ্য স্তব্ধতা। দেনিস অনেক বার চলে যেতে চেয়েছে কিন্তু ক্ল্যামাস বলেকয়ে ধরে রেখেছেন তাকে।

ক্ল্যামাস বলেছেন, 'দুটো দিন সবুর করে যাও। দেখছ তো লোকজন আর কেউ নেই। এখন বেরোলেই ধরা পড়বে।'

প্রতিদিন সকালে ক্লমাঁস থলে হাতে বেরিয়ে যান, ফিরে আসেন রুটি আনাজ আর মাঝে মাঝে কিছুটা মাংস নিয়ে। রান্না করতে বসেন খুশি মনে যেন জেনোকে আদর দিচ্ছেন।

সমস্ত খবর তিনি বলেন দেনিসের কাছে : 'দেভিলরা তো ফিরে এসেছে। রুশো আর তার বৌকেও দেখলাম। আরো অনেকে নাকি ফিরে আসছে। দেভিলের তো দেখলাম বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাবার মতো অবস্থা। আমাকে জিজ্ঞেস করল, কমিউনিস্টরা কোথায়? বললাম কমিউনিস্টরা গা-ঢাকা দিয়েছে, সহজে ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার মতো লোকও কমিউনিস্টরা নয়। এছাড়া ওকে আর কীই বা বলা যায়? ও কিন্তু একটু ক্ষুণ্ণই হল যেন। সবাই বলছে, 'আমরা আর কিসের আশায় বেঁচে থাকব?' জার্মানদের আধিপত্য কেউই চায় না। ওকি, আর একটু সসেজ খাও। বাজারে মাংস নেই, দু-একদিনের মধ্যে অন্য কোনো জিনিসও আর পাওয়া যাবে না। জার্মানরা হাতের কাছে যা পাচ্ছে চালান দিচ্ছে। টাকার তো আর অভাব নেই, খুশিমতো নোট ছাপিয়ে সৈন্যদের ভেতর বিলি করা হচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি তক্‌মাধারী ফৌজ রাশি রাশি মালপত্র মাথায় নিয়ে চলেছে। কোনো বাছবিচার নেই। কফি, মোজা, জুতো—হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই নিচ্ছে। যা পার খেয়ে নাও। কে জানে, হয়তো দু-দিন পরে উপোস শুরু হবে। কিন্তু তোমাদের ক্ষমতা যেন এক তিলও ক্ষয় না হয়। দেভিলের কথাই ঠিক—তোমরাই এখন আমাদের ভরসা।'

আতঙ্কের শুরুতেই দেনিসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে যেন শহরেই থাকে এবং গাস্ত'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পারীর কাজ চালিয়ে যায়। জার্মানরা আসবার আগের দিন। দেনিসকে যে ঠিকানাটা দেওয়া হয়েছিল সেখানে সে গেল। দরজা খুললেন একজন বৃদ্ধা মহিলা, জলভরা চোখে তিনি বললেন, 'গাস্ত'কে ধরে নিয়ে গেছে। আমি আর এখানে থাকব না, পায়ে হেঁটেই পালাচ্ছি।' দেনিস একে একে সমস্ত কমরেডের বাড়ি ঘুরে এল। বাড়িগুলো ফাঁকা। সবাই কি পালাল নাকি? না, গা-ঢাকা দিয়েছে?

তারপরের দিনগুলোর নিষ্ক্রিয়তাটা সবচেয়ে ভয়ংকর মনে হল তার কাছে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। রাত্রিবেলা ঘড়িটার একটানা টিক্-টিক্ শব্দ শুনে প্রচণ্ড একটা ইচ্ছে হত ওটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আর বেসিনের ওপর কলের জল পড়ত ফোঁটা ফোঁটা—টিপ, টিপ, টিপ।

মিশো কোথায়? মিশো বেঁচে আছে কিনা সে খবরটা না জেনেই হয়তো তাকে মরতে হবে। হয়তো সে আর কোনোদিন মিশোকে বলতে শুনবে না 'ঠিক তাই!' ইচ্ছা করলেই তারা দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারত; সুখী হত দুজনে। কিন্তু এখন আর কিছুই নেই—না আছে সভাসমিতি, না আছে জীবন। পারী জার্মানদের কবলে। কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। আর মিশো নেই। হয়তো নিহত বা বন্দী হয়ে জীবিত অবস্থায় জার্মানদের হাতে ধরা পড়াটা কী ভয়ংকর। গোটা এক একটা বাহিনীকে ওরা বন্দী করেছে।

দেনিসের মনে হতে থাকে জুন মাসের দীর্ঘ রাত্রির যেন শেষ নেই। বারবার উচ্চারণ করে : 'মিশো! মিশো!' আর শেষ পর্যন্ত মনে হতে থাকে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে মনে পড়ে ক্লদের কথা; ক্লদ তাকে বলেছিল যে ও পারীতেই থাকবে। ওকে খুঁজে বার করবে সে। ওর ঠিকানা সে জানে। মে মাসের হাঙ্গামার সময় ওর জন্যে সে ঘরভাড়া করেছিল। সেই বাড়িতেই এখনো ও আছে কিনা কে জানে?

বেরুবার আগে ক্লমাঁস দেনিসকে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যেন সে অনেক দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে।

ক্লমাঁস বললেন, 'ঠোঁটে আর একটু রং মেখে নাও। ঐ শ্রেণীর মেয়েদের জার্মানরা ছোঁয় না।'

পারী শহরের কেন্দ্রস্থল দিয়ে দেনিসের যাবার রাস্তা। প্রথম জার্মান সৈন্য চোখে পড়তেই দু-পা সরে গেল সে, প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যাবার মতো অবস্থা। কী কুৎসিত মুখ! জামার আস্তিনে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা। কিন্তু এতটা ঘাবড়ে গেলে চলবে না—নিজেই নিজেকে বলে। সমস্ত কিছু গোপন করে চলতে হবে এখন। তারপর আবার নিজের পথ ধরে এগিয়ে চলল। ভাবতে লাগল ক্লদকে খুঁজে বার করে আবার সে কাজ শুরু করতে পারবে কিনা।

বুলভারে পেঁাছে সে চেষ্টা করল কোনো দিকে না তাকাতে কিন্তু না তাকিয়েও পারল না। বড়ো বড়ো কাফের বারান্দায় জার্মান অফিসার আর বেশ্যাদের ভিড়। মেয়েগুলোর সাজ-পোশাকের ঘটা দেখলে মনে হয় যেন ওরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে। মোজা ছাড়া পায়ে স্যাণ্ডাল, এনামেল করা হাতের নখগুলো চুনির মতো। হো হো করে হাসছে, শ্যাম্পেন গিলছে আর গ্লাশে গ্লাশে ঠোকাঠুকি করছে। দোকানের জানলায় জানলায় অভিধান আর জার্মান ভাষায় পারীর পথ-বিবরণী। সৈন্যদের জন্যে থরে থরে সাজানো নানা রকমের টুকিটাকি উপহার—খেলনার আকারে ঈফেল টাওয়ারে প্রতিরূপ, ছোটখাটো অলংকার, পোস্ট-কার্ডে ছাপানো ছবি আর অশ্লীল ফটো। ফলাও ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। ফ্রাঁ বদলে মার্ক নিচ্ছে সবাই। খবরের কাগজওয়ালারা হাঁকছে, 'ল্য মাত্যাঁ', 'লা ভিক্‌তোয়ার'।

একটা খবরের কাগজ কিনে দেনিস তাকিয়ে দেখল। প্রথমেই চোখে পড়ল এক জায়গায় লেখা—'আমাদের অমায়িক অতিথিরা যে ফরাসী খাবারের সূক্ষ্ম স্বাদ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' তারপরেই একটা বিজ্ঞাপন—'আমি দুইটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছি। জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারি। পরিচারকের কাজ পেলে অনুগৃহীত হই।' কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দেনিস।

পরিত্যক্ত অধিকৃত শহরে কীট আর পিশাচের অস্বাস্থ্যকর গোপন রাজত্ব শুরু হয়েছে। নিজের বলতে আর কিছুই নেই কারও। দেওয়ালের ছবি, গায়ের জামা, মুখের হাসি, এমনকি শেষ আত্মসম্মানটুকু বিক্রি করছে লোকে। ঘৃণার সঙ্গে দেনিস নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, 'এই কি পারী?'

নদীটা পার হয়ে বাঁ পাড় ধরে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল। রাস্তায় লোকজন নেই, জনশূন্য রাস্তাগুলো আরো বেশি লম্বা বলে মনে হয়।

যেন এক মন্ত্রমুগ্ধ শহর! দোকানগুলো পরিত্যক্ত, কিন্তু সচরাচর যেমন থাকে তেমনি-ভাবে সাজানো রয়েছে টাই, খেলনা, খোদাই করা মদের পাত্র। একটা আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করা দরজায় বুড়ো মানুষের মতো ঠেস দিয়ে রয়েছে একটা ভুলে-ফেলে যাওয়া ছাতা। ওপাশে বারান্দায় একটা ফুলের টবে গাছটা শুকিয়ে ঝরে গেছে। বারান্দায় ঝোলানো পাখির খাঁচা, ভেতরে একটা মরা ক্যানেরি পাখি। 'নিদ্রিতা সুন্দরী' কথাটা মনে পড়ল দেনিসের। রূপ-কথার বইয়ে দেখা সেই ছবিটাও মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

কারুকার্য করা অট্টালিকা, রেনেশাঁসের প্রতিমূর্তি, আঠারো শতকের স্তম্ভ,—এমন খুঁটিয়ে এসব জিনিসকে সে আর কোনোদিন দেখেনি। একদিন এই পাথর ধারণ করেছিল মানুষ, আজ মানুষের পরাজয়ে পাথরের বিজয়োৎসব।

বুলভার পোর্ং রয়াল-এ একটা কুঁজো লোক গাছের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে একজন অন্ধ রাস্তা পার হয়ে গেল। ওপাশে এক যুবক নেঙচাতে নেঙচাতে পথ চলছে। যত বিকালঙ্গ আর পিশাচ বেরিয়ে এসেছে গর্ত ছেড়ে। অন্যদের মতো এরা পালিয়ে যেতে পারেনি, শহরের মানুষ বলতে এখন এরাই।

লেবু গাছে ফুল ধরেছে, বাতাসে দূরাগত গ্রাম্য গন্ধ। আতঙ্কিত পাখির দল এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে—আকাশের যান্ত্রিক গর্জনে ওরা এখন পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে উঠতে

পারেনি। অধিকৃত শহরের ওপর দিন-রাত্রি জার্মান বিমান উড়ে বেড়াচ্ছে। এত নিচু দিয়ে উড়ছে মনে হয় ছাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে বুঝি।

তারপর এই জনশূন্য জায়গাটায় হঠাৎ লোকজন দেখা দিল। ফুটপাথ দিয়ে ঘুমন্ত শিশু কোলে আশ্রয়প্রার্থীরা হেঁটে চলেছে। এক সপ্তাহ আগে ওরা শহর ছেড়ে পালিয়েছিল। তখন ওদের মুখে ছিল ভয় আর আশার চিহ্ন। বারবার জিজ্ঞেস করেছিল কোন্ রাস্তা ধরে এগুতে হবে, শাপ দিয়েছিল বেইমানদের, নিরাপদ জায়গায় পৌঁছবার চেষ্টায় ছুটোছুটি করেছিল এখানে সেখানে। আর এখন কসাইখানার দিকে গরু-ভেড়ার দল যেমন পা টেনে টেনে চলে তেমনিভাবে চলেছে। এই ক'দিনে কী ভয়ংকর সব দৃশ্যই না তারা দেখেছে! মেশিনগানের গুলিগোলা থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছে, ট্রেন লুট করেছে, বিষাক্ত কুয়োর জলের ওপর চোখের জল ফেলেছে। অনেকেরই প্রিয়জন মারা গিয়েছে আর এরা সবাই আশাহীন। পালিয়ে যাবার সময় কেউ বুঝতে পারেনি যে পারী চারদিক থেকে অবরুদ্ধ। শার্ৎর, অরলেআঁ আর জিয়ঁতে পৌঁছে জার্মানদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেখান থেকে হটিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে ওদের। পলাতক আসামীর জেলে ফিরে আসার মতো ওরা ফিরে এসেছে তাদেরই আপন শহরে। জার্মানদের দিকে আতঙ্কভরা চোখে তাকিয়ে যে-শিশুটি চিৎকার করে কাঁদছে তার কানেকানে মা বলছে, 'চুপ! একদম চুপ!'

একটা প্রাচীরপত্র চোখে পড়ল দেনিসের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একজন জার্মান সৈন্যের কোলে একটি শিশু, পাশে একটি হাস্যমুখী মহিলা। তলায় লেখা, 'ফরাসী জনসাধারণের রক্ষাকর্তা!' তার পাশেই একটা ফ্যাকাশে ছেঁড়া পোস্টার : 'ওদেয়'.. প্রথম অভিনয়...শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক!' জার্মান সৈন্যটির চোখ ঝকঝকে নীল। এই রকমের আরো অনেক জোড়া চোখ এখন চারদিক থেকে দেনিসের দিকে তাকিয়ে আছে। দেনিস চোখ ফিরিয়ে নিল, তবুও সেই চোখ এড়াতে পারল না। রাস্তাটা পার হয়ে অপর দিকে এসে দাঁড়াল, কিন্তু সেখানেও সেই ঝকঝকে মিনে করা নীল চোখ। আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল দেনিস—দেওয়ালের গা থেকে বেরিয়ে এসে চোখদুটো তার দিকে এগিয়ে এল যেন। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি যে ওটা জীবন্ত মানুষ। কিন্তু লেফ্‌টেনেন্টটি ঠাট্টাচ্ছলে ঠোঁটে ঠোঁট টিপল।

পরের রাস্তাটার নাম 'অ্যাভেনু্য দে গোব্‌ল্যাঁ'। চন্‌চনে রোদে বিশ-ত্রিশজন স্ত্রীলোক লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কে যেন বলে উঠল, 'ওরা সৈন্যদের বন্দী করছে।'

সামনে একটা বাড়ির দিকে স্ত্রীলোকেরা ছুটে গেল। খানিকটা নীলচে দুধ ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর। বাড়ির ভেতর থেকে একজন যুবককে বন্দী করে নিয়ে বেরিয়ে এল একদল পুলিশ। যুবকটির পরনে ফৌজী পাৎলুন, আর শ্রমিকের নীল কোর্তা। কে যেন বলে উঠল, 'ওর মা আসুক!'

একজন বৃদ্ধা মহিলা—মুহূর্তের জন্যে দেনিসের মনে হল যেন মহিলাটি ক্ল্যামীস—এগিয়ে গিয়ে সৈনিকটিকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'আসি মা!' ফিসফিস করে বলল যুবকটি।

একটি পুলিশ-ভ্যানের ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল যুবকটিকে। পুলিশের দলটা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। তাদের দিকে তাকিয়ে মহিলাটি কঠোর স্বরে বললেন, 'ও এতক্ষণে তাহলে বোঝা গেল কাদের গোলামি করছ তোমরা!'

তারপর আবার সেই মিনে-করা নীল চোখ—কনিয়াক মদ টানছে, সসেজ খাচ্ছে, ঘোঁত ঘোঁত করছে।

মোড় ঘুরে দেনিস গিয়ে দাঁড়াল 'প্লাস দিতালি'র পেছনে গরীব পাড়াটায়। বাড়ি-গুলো কেমন নেড়া নেড়া। চারদিকে নোংরা আর আবর্জনা। এখন আর কোনো সাজসজ্জা নেই—না আছে কলরবমুখর জনতা, না আছে আলোকোজ্জ্বল দোকানের জানলা। এক জায়গায় কয়েকজন বুড়ো তাস খেলছে। দরজায় দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বহু স্ত্রীলোক, ভঙ্গিটা এমন যেন সৈন্যদের দেখামাত্রই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জার্মানরা এখানে আসে না।

দেনিস ঘণ্টা টিপল কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। কী ব্যাপার কে জানে। শেষ সময়ে লোকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পালিয়ে গেছে। বিরাট চলমান জনতার ছন্দোবদ্ধ পদধ্বনি এবং দূরদেশে পালিয়ে যাবার উন্মাদ ইচ্ছা তাদের চালিত করেছে। তাছাড়া ক্লোদ গ্রেপ্তারও তো হতে পারে। জার্মানরা বাড়ি বাড়ি ঢুকছে। দরজায় কান পেতে দেনিস শুনতে চেষ্টা করল। কোনো শব্দ নেই।

কিন্তু ভেতরে দরজার ছিট্‌কিনিতে হাত রেখে ক্লোদ উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবছিল, 'এবার ওরা এসেছে!' কিছুক্ষণ সে দরজা খুলল না—আরও কিছুক্ষণ সে স্বাধীনতাটুকু উপভোগ করে নিতে চায়।

'তুমি!'

অনেকক্ষণ দুজনে কোনো কথা বলতে পারল না। কথা শুরু করল ক্লোদ : 'আমাদের কপালে শেষকালে এই ছিল! কোনো দিন ভাবিনি যে এমন ঘটনা ঘটবে! কথাটা বুঝতে পারছ বোধ হয়—পারীতেও জার্মানরা এসে হাজির হল!'

দেনিস ওর দিকে তাকাল। গাল দুটো ফ্যাকাশে—কিন্তু চোখের ভেতর আগুন জ্বলছে যেন। খুবই শ্রীহীন ঘরটা। টেবিলের ওপর এক টুকরো রুটি, কবিতা লেখা একটা খাতা, আর একটা বই—নাম 'ইস্পাত'।

দেনিস বলল, 'আমাদের কিছু একটা করতে হবে। তোমার সঙ্গে আর কারও যোগাযোগ আছে?'

'না। আমাদের লোকজন যারা ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জুলিএ'র থাকবার কথা। কিন্তু ওর ঠিকানা আমি জানি না। ভেবেছিলাম ও নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ও রাস্তায় বেরুতে পারবে। আমরা এখন দাগী লোক হয়ে উঠেছি। আমাদের তল্লাশে ওরা ঘোরাফেরা করছে। শিয়াপ যে এখানে থেকে গেল, তার কারণটা এখন পরিষ্কার—ও এখন জার্মানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

'ক্লোদ, কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। আশ্রয়প্রার্থীরা ফিরে আসছে। প্রথমেই ওরা কাদের কথা জিজ্ঞেস করছে জান? কমিউনিস্টদের কথা। বসে থাকলে চলবে না। এখন বসে থাকাটা রীতিমতো অপরাধ। আমার এখানে হেক্টোগ্রাফ যন্ত্র, কালি আর কাগজ আছে কিন্তু ওসব দিয়ে আর কি কাজ হবে? ঠিক এই মুহূর্তে কি ধরনের লেখা দরকার তা কি আমরা জানি?'

কথাটা বলে ক্লোদ টেনে টেনে কাশতে লাগল। কোনো কথা বলল না দেনিস। সে বুঝতে পারছে, কথাটার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ক্লোদ যে খুবই ভালো কমরেড, যে-কোনো কাজও যে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দেনিস নিজে যতটা জানে ও তা জানে না আর—এমন কেউও নেই যার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে জানলার পাশে বসল দেনিস। সামনে লম্বা প্রাণহীন রাস্তা। হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে যায় দেনিসের। এই রাস্তা দিয়ে মিছিল গিয়েছিল। বারান্দায় বারান্দায় লাল কাপড় আর জনতার গান। গাছের ডালে ডালে ছোট ছেলেদের চড়ুই পাখির মতো লম্ফঝম্প—সব মনে পড়ে যায় দেনিসের। মেয়েরা বজ্রমুষ্টি তুলেছিল আকাশের দিকে।

বিচিত্র, উজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল সব কিছু। আর সেই মিছিলের আগে আগে ছিল মিশো। টান হয়ে বসল দেনিস। মিশো, কোথায় তুমি? মিশো সাড়া দেয় না। সামনে দৃষ্টি রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে মিশো। সকলের মাথার ওপরে মাথা, প্রাণের আনন্দে ভরপুর মিশো। জার্মানদের পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পরিখার পর পরিখা পার হয়ে চলেছে। মিশো জানে, সে ভুল করবে না, সে থামবে না কোনোদিন। এগিয়ে চলেছে সে।

দেনিস অস্পষ্ট হাসে, তার ঠোঁটদুটো নড়ে ওঠে।

'ক্লোদ, আমাকে এক টুকরো কাগজ দাও তো।'

ক্লোদ ভাবল, দেনিস কবিতা লিখছে। পা টিপে টিপে এক কোণে সরে গেল সে। কিন্তু দেনিস কথা খুঁজে পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কথাগুলো সে ধরতে পেরেছে। তবুও কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না। বুলভারে যেতে যেতে যে কথাগুলো তার মনে ভেসে এসেছিল, সেগুলো আবার মনে পড়ে যায় : 'বিপ্লবের লালনাগার...কমিউন প্রতিষ্ঠাকারী নগরী...ফ্রান্সের হৃৎপিণ্ড...'

তার মনে হতে থাকে যেন সে অনেক মানুষের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে। যে-সব সৈন্য অভাগার মতো সর্বজন-লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের গলার স্বর, নাৎসীদের বিদ্রূপ শুনতে শুনতে যে-সব যুদ্ধবন্দী রাস্তার পাথর ভাঙছে তাদের গলার স্বর, যে-সব আশ্রয়প্রার্থী শেষহীন রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাচ্ছে তাদের গলার স্বর। এ স্বর ফরাসী জনসাধারণের। আর এই জনশূন্য নগরীতে একটিমাত্র মেয়ে কান পেতে শুনছে সমস্ত কান্না, সমস্ত নিস্তব্ধতা, আশা ও ক্রোধের সমস্ত বাণী। একবারও না থেমে সে লিখে চলে যেন অন্য কেউ তাকে বক্তব্যবিষয় বলে দিচ্ছে।

আগাগোড়া পাণ্ডুলিপিটা নিঃশব্দে পড়ে ক্লোদ চোখ মুছল। হাতে খানিকটা বেগুনী কালি লেগেছিল—কালি লেগে নোংরা হয়ে গেল মুখটা।

'দেনিস, কি করে লিখলে তুমি?'

'চুপ!'

টহলদারী সৈন্যের ভারী পায়ের শব্দ তার কানে গিয়েছিল। তারপর গাড়ির ছাদে লাগানো লাউড-স্পীকারের গলা ভেসে এল :

'বাড়ি ফিরে যাও! সময় হয়ে গিয়েছে! বাড়ি ফিরে যাও! সময় হয়ে গিয়েছে!'

আটত্রিশ

মার্শাল পেত্যাঁর আহ্বানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ভিশিতে হবার কথা। এই উপলক্ষে কাসিনো হলঘরটিকে সাজানো হয়েছে। অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্ত এইখানেই মঁতিনি বাজি ধরে তাস খেলত আর লুসিয়্যর আকর্ষণ ভুলবার জন্যে একটা প্রাণপণ চেষ্টায় যোসেফিন ট্যাঙ্গো নাচত ভোঁনিজুয়েলার সংবাদ-বিভাগের প্রতিনিধির সঙ্গে।

ফ্রান্সের এই বিপর্যয় এমন একটা সময়ে ঘটেছিল যখন কয়েক হাজার বাইরের লোক ভিশিতে আসে এখানকার জলবাতাসে যকৃতের অসুখ ভালো করবার জন্যে। শীতকালে কয়েকটা হোটেলকে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। এখন পীড়িত আর আহত

সৈন্যরা অদ্ভুত জনতার দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভিশিকে এখন আর চেনা যায় না। শুধু যে ডেপুটিরা আর সেনেটররা ভিড় করে এসেছে তা নয়, পারীর অভিজাত সমাজ উঠে এসেছে এখানে। শিল্পপতি, দালাল, বড় বড় কর্মচারী, সাংবাদিক, বেশ্যা —সবাই এসেছে এখানে। চলতে ফিরতে নানারকম মন্তব্য শোনা যায় : 'এই যে কাউন্ট, তুমিও এখানে!' 'আরে জুল, তুমিও আসতে পেরেছ দেখছি?' 'কিন্তু সেই ক্ষুদে বান্ধবীটি গেল কোথায়?'

সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এই অভূতপূর্ব বৎসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আজ ঘটবে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এই ঘটনার কেন্দ্রমূল। লাভালের ইচ্ছে, কোনোরকম জাঁকজমক না হয়। কিন্তু ব্রতেই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি রাখতে চায় না। সুতরাং, যথাযোগ্য সমারোহের সঙ্গে তৃতীয় রিপাব্লিকের কবর দেবার ব্যবস্থা হল।

তেসা অনেক দিন ধরে এই ঘটনার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছে। স্বভাবতই সে এখনো আশাবাদী। দীর্ঘ ভ্রমণের উত্তেজনা কেটে যাবার পর সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, বেঁচে থাকবার ইচ্ছেটা পেয়ে বসেছে আবার। বারবার সে নিজেকে এই কথা বলেছে যে মার্শালের পরিকল্পনা তার পক্ষেই সুবিধাজনক, এখন আর তাকে নির্বাচিত হতে হবে না, সে মনোনীত হবে। মনোনীত হওয়াটা অনেক বেশী নির্ঝঞ্ঝাটের। কিন্তু তবুও মনে মনে উদ্বেগ অনুভব না করে পারছে না। দেসেরের মন্তব্যটা কিছুতেই মন থেকে দূর করা গেল না: 'বেচারা বনেদী ছারপোকা' অবশ্য দেসেরের তো মাথার ঠিক নেই, কিন্তু এই অপ্রীতিকর মন্তব্যের ভেতর কিছুটা সত্যি আছে বৈকি! সে, তেসা, অপরের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর তারা গা-ঢাকা দিয়েছিল তার দেশজোড়া খ্যাতির আড়ালে। আর আজ তারাই তাকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করছে। আগামী কাল যে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? দক্ষিণপন্থীরা তাকে র‍্যাডিকাল বলে মনে করে। বোর্দোতে সবাই তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল আর এখানে লাভাল তো তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কুশল পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল ন। লেবুর রস তৈরী হয়ে যাবার পর নিংড়ে-নেওয়া লেবুটাকে নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

প্রায় কান্না পেল তেসার। সবাই তাকে অপমান করছে। সে কি লাভালকে সাহায্য করেনি? জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করা যখন প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন সেই ভয়ংকর স্পেন-দেশীয় লোকটির সঙ্গে কে বোঝাপড়া করেছিল? কে গোড়াতেই বলেছিল কোঁপিএন-এ গৃহীত শর্তাবলী সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য? লোকের স্মরণশক্তি এত কম। এমনকি তার নিজের পরিবারের লোকেরাও তাকে বুঝতে পারেনি। ওই খামখেয়ালী দেনিসের কথাই ধরা যাক না কেন। ওকে সে কত ভালোবেসেছে, কত আদর করেছে। আর এখন জার্মানরা তো ওর মাথা কেটে নেবে। ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়! ঠাট্টাতামাসা করে কোনো কথা হিটলার বলে না; বলে না বলেই হিটলারের জয়লাভ হয়েছে। দেনিসের কপালে কি আছে কে জানে? দুবার নাক ঝাড়ল তেসা, জল গড়াতে লাগল চোখ থেকে। তারপর লুসিয়ঁর বাদামী রঙের চুলের কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠল তেসা। ও নিশ্চয়ই তেসার নাম ডোবাবে। এটা ওর রক্তের দোষ, ঠিক ওর কাকা রোব্যার-এর মতোই ও হয়েছে। তফাত শুধু এই যে রোব্যার চার বছর জেল খেটেই ছাড়া পেয়েছে কিন্তু লুসিয়ঁটা হাড়ে হাড়ে বদমাইশ। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে ও মারা গেছে? তাহলে তেসার বংশ এখানেই শেষ। আর ফ্রান্সেরও তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। হাতের একটা ঝাঁকুনি দিল তেসা। হঠাৎ তার মুখেচোখে একটা রাগের ভাব ফুটে উঠেছে পোলেতের কথা ভবছে সে। ওই নরকের কীটটা এখন বোধ হয় জার্মানদের মন ভোলাচ্ছে। জাতির বিপদে ওর কি আসে যায়, অল্পবয়সী ফূর্তিবাজ কোনো লোককে পেলেই ওর হল।

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল তেসার মনের অবস্থা একেবারে পালটে গিয়েছে। কারণ ছোট্ট একটি ঘটনা। ব্রতেই টেলিফোন করে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবরাখবর নিয়েছে। এখন তেসা বুঝেছে যে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। যদিও জাতীয় পরিষদের সভায় বড় রকমের ভূমিকা নিতে সে রাজী হয়নি কিন্তু ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা সে দেবে। 'লুমানিতে' কাগজে একজন আল্‌শেসিয়ান ইহুদীর আসবাবের দোকানের বিজ্ঞাপনের দিকে হঠাৎ তার নজর পড়েছিল। বিষয়টির উল্লেখ করে সে মন্তব্য করবে: 'এই হচ্ছে ইহুদী পুঁজি আর কমিউনিস্টদের ভেতর যোগসূত্র। এই আত্মঘাতী যুদ্ধের মূল এখানে।'

একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রতেই তেসাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলল, 'শোন, তোমার আজ বক্তৃতা না দেওয়াই ভালো।' বিরক্তিতে চোখ পিটপিটিয়ে তেসা তাকিয়ে রইল। ব্রতেই বুঝিয়ে বলল যে 'বক্তৃতা না দেওয়াটাই বিচক্ষণতার পরিচয়। লোকের বিভ্রান্তি ভাবটা এখনো কেটে যায়নি, সবাই চেষ্টা করবে অতীতের সমস্ত ঘটনা টেনে বার করতে। স্তাভিস্কি, পপুলার ফ্রন্ট এবং এমনি আরো নানা কথা উঠবে।' তেসা রাজী হল বটে কিন্তু আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। বেঁচে থাকতে চায় সে, কিন্তু তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন।

মনের এই ভাবটা একটু কাটল সদ্য পারী-প্রত্যাগত গ্রঁদেলের কথায়। বাইরে বারান্দায় তেসা দাঁড়িয়েছিল। গ্রঁদেল তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গভাবে পারীর খবরাখবর বলতে আরম্ভ করল: 'প্রথম দিকে ওখানে লোকজন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু একে একে সবাই ফিরে আসছে। দু-একদিনের মধ্যে অপেরাগুলো শুরু হয়ে যাবে। মোটামুটি বলা চলে, জার্মানরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। আর ওদের ব্যবহারও খুব ভালো। ওরা সে বিজয়ীর জাত তা বোঝাই যায় না। মনে হয় যেন অভিভাবক...'

আশেপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ডেপুটি নিঃশব্দে গ্রঁদেলের কথা শুনছিল। একজন সেনেটর বলে উঠল, 'অঃ!' শব্দটা আনন্দের না বিরক্তির তা একেবারেই বোঝা গেল না।

তেসার হাতে সজোরে একটা নাড়া দিয়ে বের্জেরি বলল, 'এখানে এসে তুমি যে আবার কর্তব্যভার তুলে নিয়েছ তা খুবই সুখের কথা। ফ্রান্সের এই বিপদের দিনে তুমি যে নিজের জায়গায় মোতায়েন থাকবে না আমি জানতাম।'

উত্তরে তেসা তার পাখির মতো মাথাটা অল্প একটু কাত করল। খাড়া নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। বের্জেরির মন্তব্য অভিভূত করেছে তাকে। দেখা যাচ্ছে যে কয়েকজন লোক খুব ভালো করেই তার গুরু দায়িত্বের কথা বোঝে। একটা লজ্জাকর সন্ধি-শর্তে স্বাক্ষর করে এসে অতীতের কবর রচনায় অংশ নেওয়াটা কি খুবই সহজ ব্যাপার?

সে বলল, 'আমি ফ্রান্সের সেবক। হ্যাঁ, ভালো কথা, এখানে ব্লুম আর ফুজে দুজনেই হাজির। ভোটাভুটির সময় ওরা কি করে দেখতে হবে। বিশেষ করে ফুজে। পড়ে পড়ে মার খেতে পারাটা তো আর সহজ ব্যাপার নয়, কি বল হে! দেখ না কী কাণ্ডটা হয়! 'বিরুদ্ধে' ভোট দিতে সাহস হবে না ওর। দুকান এখানে নেই, বড় আফসোসের কথা। থাকলে দেখা যেত যুদ্ধ লাগাবার জন্যে কত উস্‌কানি ও দিতে পারে।'

'কোথায় আছে ও?'

'খুব সম্ভব ফৌজে।'

গ্রঁদেল যোগ করল, 'আর খুব সম্ভব ও-ই সবার আগে হাল ছেড়ে বসে আছে। ওই সব 'শেষ রাতের মারদেনেওলা ওস্তাদদের' আমি খুব ভালো করেই জানি।'

'কিন্তু ভীয়ার কোথায়?'

'কেউ জানে না। আমরা তুর ছেড়ে আসবার পর আর কোনো খোঁজ নেই।'

'আমি শুনেছি ও স্পেন হয়ে লিসবনের দিকে পালিয়েছে।'

'বল কি? স্প্যানিয়ার্ডরা ওকে ওদেশের মাটি মাড়াতে দেবে ভেবেছ?'

'ভারি মজার ব্যাপার কিন্তু—ভীইয়ার যাচ্ছে ফ্রাঙ্কের কাছে ভিসা চাইবার জন্যে!'

'শোনা যাচ্ছে যে স্প্যানিয়ার্ডরা নাকি সীমান্তে মেশিনগান খাড়া করে রেখেছে। সীমান্ত পার হয়ে ওদিকে গেলেই বন্দীশিবিরে যেতে হবে।'

তেসা হাসল। ইতিহাস আসলে কী? অনেকটা চারজোড়া মেয়ে-পুরুষের চতুষ্কোণী নাচের মতো একবার সামনে, একবার পিছনে, আর মাঝে মাঝে সঙ্গীবদল...... স্প্যানিয়ার্ডরা হয়তো ভীইয়ারকে ধরে গারদে পুরেছে; নাকের ডগায় প্যাঁশনে ঝোলা অবস্থায় ভীইয়ারের রাগী চেহারাটা বেশ কল্পনা করা যায়। আর ওর ছবিগুলোর কি হল? ছবিগুলো কি সত্যই ওর আভিঞঅ'তে ফেলে গিয়েছে?

তেসা বলল, 'দুঃখের ভেতরেও কিছুটা ব্যঙ্গ থাকে। ভীইয়ারের কথা ভেবে আমার মজা লাগছে। কি রকম ভয় পেয়েছে ভাব যে ছবির সংগ্রহ পর্যন্ত ফেলে যেতে হয়েছে! ওর মুখের চেহারাটা কল্পনা করতে পার?'

তেসার পেছন থেকে আহত গলায় কে যেন বলল, 'কল্পনা করতে না পার তো চোখে দেখে নিলেই পার। পল, তোমার ঠাট্টাটা মাঠেই মারা গেল।'

তেসা আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল, 'আরে ওগুস্ত, তুমি? কোত্থেকে এলে?'

'আভিঞঅ' থেকে। আমাকে দেখে এত অবাক হবার কি আছে? চিরদিনের মতো আজও আমি স্বস্থানেই আছি।'

তারপর ভীইয়ার ব্যাখ্যা করতে শুরু করল যে সে নতুন ব্যবস্থার একজন উৎসাহী সমর্থক। বলল, 'পরাজয়ের ভেতর দিয়ে আমরা ব্যাধিমুক্ত হব। বিজয়ীদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। হিটলার পারীতে আসতে পারল কি করে? কারণ তার সাহস ছিল। মার্শাল পেত্যাঁ এই হিসেবে পথ-প্রদর্শক। বয়স আশি হলে কি হবে কিন্তু এখনো তিনি দুঃসাহসী। আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করি।'

ভীইয়ারের কথা শুনে গ্রঁদেল পর্যন্ত বিব্রত বোধ করছে। তেসা ভাবল, 'বেটা ধূর্ত শেয়াল! বুদ্ধিতে এখনো সবাই ওর কাছে হার মানবে।'

অবশেষে সভাপতির ঘণ্টা বেজে উঠল। বক্তাদের কথায় কান দিল না তেসা। লাভাল তো এখন বলবেই। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে কেন ও চুপ করে ছিল? ভীইয়ারের প্রশংসায় হল ফেটে পড়ছে। ব্রুমের চোখেমুখে রাগ। ব্রুম যে 'বিরুদ্ধে' ভোট দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—যাই করুক ওর দিন শেষ হয়ে গেছে।

বিরতির সময় ডেপুটিরা গ্রঁদেলকে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই ওকে খোশামোদ করছে, আর মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে উদাসীন গলায় ও বলছে, 'আচ্ছা, বেশ, বেশ, এ সম্পর্কে আমি আবেৎস-এর সঙ্গে কথা বলব।' লুসিয়ঁ যে দলিলটা চুরি করেছিল সেটার কথা মনে পড়ল তেসার। তুচ্ছ একটা গুপ্তচর আজ ফ্রান্সের ত্রাতা—একথা কল্পনা করাও অসহ্য।

বিরতির পরে ব্রতেই বক্তৃতা দিল। বক্তৃতায় সে বলল যে দেশের এই দুরবস্থা পাপের শাস্তি ছাড়া কিছু নয়, এক 'মহান প্রায়শ্চিত্তের' ভেতর দিয়ে দেশকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর ব্রিটিশকে গালাগালি দিল কিছুক্ষণ এবং অবশেষে দু-হাত প্রসারিত করে উদাত্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের দেশকে যাঁরা জয় করেছেন তাঁরা যে কত মহৎ তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।' তেসা হাই তুলল—কত বড়ো ভণ্ড লোকটা! ওর নিজের দেশ লোরেনেই তো জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কী পাষাণ্ড! আর তার ওপর একেবারে নীরেট!

হঠাৎ সবাই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। মঞ্চের ওপর ফ্যুজে উঠেছে। উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হুংকার দিয়ে বলতে শুরু করল, 'দেশের যারা শত্রু যারা নীচ, তারা যখন হাত তোলে...' তাকে আর বলতে দেওয়া হল না। তারপর শুরু হল ভোটাভুটি। আধ ঘণ্টা পরে সভাপতির ঘোষণা শোনা গেল, 'পক্ষে—৪৬৯, বিপক্ষে—৮০।'

তেসা এমন ক্লান্ত বোধ করতে লাগল যেন সে একটা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে উঠেছে। বাগানে মহিলারা চিৎকার করছে, 'লাভাল দীর্ঘজীবী হোক!' এই চিৎকার শুনেও তেসার মনে এতটুকু ঈর্ষা এল না। মাথা ধরেছে তার। ক্লান্ত পায়ে সে হোটেলে ফিরে গেল। কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন। হোটেলের বসবার ঘরে একটি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে নজরে পড়ল। উন্নত বুক, সিঁদুরের মতো টকটকে ঠোঁট, মেয়েটিকে দেখে পোলেতের কথা মনে পড়ল তেসার। উৎফুল্ল হয়ে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। এতক্ষণে তার নজরে পড়ল যে মেয়েটির চোখে জল।

মেয়েদের কান্না চিরকালই তেসার কাছে তাদের বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে। উত্তেজিত হয়ে সে বলতে শুরু করল ফ্রান্সের নানা দুর্ভাগ্যের কথা। অপরিচিত সুন্দরী মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিল। কথার শেষে অত্যন্ত বিনীতভাবে তেসা যোগ করল, 'মন্ত্রী হিসেবে আমি...' মেয়েটি হাসল তারপর নিজের নানা দুর্ভাগ্যের কথা বলতে শুরু করল। নেভের-এ সে একটা ট্রাঙ্ক হারিয়েছে। তার মা পড়ে আছে পারীতে। এখানে তার কাকার আসবার কথা। তিনি শ্রম-দপ্তরে কাজ করেন এবং দেখেশুনে মনে হয় যে তিনি ক্লেরম-ফের‍্যাঁতেই থেকে গেছেন। এখন সে নিজে যে কি করবে জানে না। তার ব্যাগে মাত্র একশো ফ্রাঁর একটা নোট ছাড়া কিছু নেই।

তেসা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিল এবং সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেও খানিকটা সান্ত্বনা পেল যেন। দুজনে একসঙ্গে রাতের খাওয়া খেল। ফুর্তি ও আমোদের ভাবটা ফিরে এল তেসার। 'অমর ফ্রান্স' আর 'অমর প্রেমের' উদ্দেশ্যে শ্যাম্পেন খেল দুজনে।

রাত্রে হালকা সুরে তেসা বলল, 'পুতুলরানী, আমার বয়স কত আন্দাজ করতে পার?'

'পঞ্চাশ?'

তেসা হাসল তারপর মেয়েটির মুখের সামনে হাতের আঙুল নাচাতে নাচাতে বলল, 'উঁহু! প্রেমের ব্যাপারে আমার বয়স আঠারো। কিন্তু সাধারণের কাছে অনেক বেশি। অবশ্য মার্শাল আমার বাবার বয়সী।'

হঠাৎ এই ঐতিহাসিক দিনের ঘটনাগুলো নতুন করে মনে পড়ল তেসার: ব্রতেইর রূঢ় দৃষ্টি, ভীইয়ারের শঠতা, ফ্যুজের দাড়ি, আর সেই বিরক্তিকর সংখ্যা ৮০। মাত্র আশি জন অপাপবিদ্ধ! ভবিষ্যতের স্মৃতিকথায় এই আশিজনের সম্পর্কে নিশ্চয়ই এই কথা লিখিত হবে যে এরা 'আত্মসমর্পণের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ভবিষ্যৎ বংশধররা এই ক্লান্তিকর দিনটিকে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের দিন বলে মনে করবে। আর অধিবেশনের সারাটা সময়েই তার বুকজ্বালা করছিল। ভারতীয় কায়দায় রাঁধা স্নাইপের মাংসটা তার খাওয়া উচিত হয়নি। মাংসটা খাবার পর থেকেই তার শরীর খারাপ লাগছে, অসহ্য মাথা ধরেছে। কিংবা হয়তো এটা শ্যাম্পেন খাবার ফল। চেয়ার থেকে একটু উঠে সে তার পুতুলরানীর ঘুম-জড়ানো চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। মনে হল গলার ভেতর কি যেন একটা আটকেছে।

'আজ কাসিনো হলে কি কাণ্ড ঘটল জান?' বিড়বিড় করে বলল তেসা।

'বেয়ারার মুখে শুনলাম। কি যেন একটা জরুরী অধিবেশন ছিল।'

'আসলে কি হয়েছে জান? হারাকিরি। বুঝতে পারছ না বোধ হয়। আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি। ডেপুটিরা আর সেনেটররা তো এল দল বেঁধে। বক্তৃতা হল লাভালের।

জানো পুতুলরানী, লাভাল সব সময়েই সাদা টাই পরে। তারপর হ্যাঁ, তারপর আমরা আত্মহত্যা করলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না, না? আমি হলফ করে বলছি। প্রথমে আমরা ঘোষণা করলাম যে আমরা মরে গেছি তারপর প্রচণ্ডভাবে হাততালি দিলাম। ৫৬৯টা মড়া আর ৮০ জন বেয়াড়া লোক ছিল সেখানে। ব্যস, এখন তোমার সামনে যে বসে আছে সে তেসার ভূত, তার ছায়া মাত্র।' একটা হেঁচকি তুলে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে সে আবার বলল, 'এতটা শ্যাম্পেন খাওয়া আমার উচিত হয়নি, কিন্তু এখন আর কিছু আসে যায় না। মৃত্যুর পরোয়ানা অনেক আগেই এসে গেছে।'

মেয়েটির ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু জোর করে ঘুম চেপে বলল, 'দুঃখু করে লাভ কি? জার্মানরা যখন পারী ছেড়ে চলে যাবে, আমরা আবার আগের মতো দিন কাটাব। আপনি নিজেই বললেন যে মনের দিক থেকে আপনি তরুণ..' তারপর একটা হাই চেপে ফিসফিস করে বলল, 'আপনি—আপনি একজন সত্যিকারের প্রেমিক।'

মাথা নেড়ে তেসা বলল, 'না। ওসব অতীতের কথা। আজকে স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলবার দিন এসেছে। শোন, নিজের সম্পর্কে একটা কথা বলছি। আমি একটা ছারপোকা। ফাটলের ভেতরে বুড়ো বনেদী ছারপোকা।'

কথাটা বলে সে টলতে টলতে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ভীষণ একটা উত্তেজনা নিয়ে ফুজে কাশিনো হল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। হাত-পা নেড়ে অনবরত সে বিড়বিড় করছে, যেন একদল অদৃশ্য শ্রোতার উদ্দেশে কথা বলছে। একদল কাপুরুষের হাতে রিপাবলিকের মৃত্যু হল। কিসের জন্যে ভাল্মির বীরেরা আত্মদান করেছিল? কিসের জন্যে বীরের মতো সংগ্রাম করেছিল ভের্দ্যুর সৈন্যরা। এ লজ্জা ঢাকবে কিসে বন্ধুগণ! ফ্রান্সকে হিটলারের পদলেহন করতে দেখে সমস্ত পৃথিবী যে ঘৃণায় মুখ ফেরাবে। অবশ্য ফুজে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু ওরা তাকে সত্যপ্রকাশ করতে দেয়নি। এখন সে ফিরে চলেছে নিজের হোটেলে। তারপর হোটেলের পরিচারক সুপ নিয়ে আসবে আর সুপটা খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে তাকে। কিন্তু আজকে যা ঘটে গেল. তারপরে এই নিশ্চিন্ত জীবন একেবারেই অসহ্য। শহীদ হতে চায় সে। বোমা ফাটুক, গিলোটিন নেমে আসুক। লোকগুলোর কাণ্ড দেখ না! কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে কাফের বারান্দায় বসে ভারমুথ টানছে!

সারা রাত্রি সে ঘরের ভেতর অস্থির হয়ে পায়চারি করে বেড়াল। মারি-লুই বা ছেলের চিন্তা এখন আর নেই। সমস্ত শরীর রি রি করে উঠছে। কব্‌লেনৎস-এ সে ছিল। হ্যাঁ, ভিশি হচ্ছে দ্বিতীয় কব্‌লেনৎস। ১৭৯২ সালে এই কব্‌লেনৎস-এ বহিরাগত প্রতি-বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। কে ছিল সেই বিশ্বাসঘাতকদের নেতা? সেই লোকটি যদি লাভাল হয় তো কেউ আশ্চর্য হবে কি? সবাই জানে লাভাল এমন একটা জীব যে শয়তানের কাছেও নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে। লোকটার প্রকৃতিতে যেমন লোভী আকৃতিতেও ঠিক যেন একটি গোরুচোর। তেসা থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পয়সার জন্যে ও লোকটা সব কিছু করতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকদের দলে রয়েছেন রিপাব্‌লিকের একজন সৈনিক—বৃদ্ধ মার্শাল। চিরকালের জন্যে সৈনিকদের নাম কলঙ্কিত হয়ে রইল। বৃদ্ধদের পাকাচুলের আর সম্মান রইল না। কাকে বিশ্বাস করা যায়? সমস্ত কিছু কলঙ্কিত, অপব্যয়িত, নিঃশেষিত কাফের বারান্দায়—আত্মসম্মান ও সাধারণ সৌজন্যবোধ দুটোর কোনোটাই আর অবশিষ্ট নেই।

আগামী কাল হয়তো চিৎকার শোনা যাবে, 'ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা মহানহৃদয় জার্মানরা দীর্ঘজীবী হোক!' প্রাশিয়ানদের সামনে নতজানু হয়ে তোষামোদ করবে সবাই! গোয়ে-

রিংকে যোয়ান অফ আর্ক আখ্যা পর্যন্ত দেওয়া হতে পারে। ব্যাপারটা হাস্যকর নয়—রীতিমতো ঘৃণ্য।

কার উদ্দেশে ফুজে কথা বলছে? দেয়ালের প্রজাপতি? আয়নায় নিজের অস্পষ্ট ছায়া? ফ্যাকাশে ভোরবেলা?

নটার সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। একদল পুলিস—পরনে আলপাকার কোট। একজন বলল, 'কোনো একটা অনুসন্ধানকার্যের জন্যে আপনাকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা নিয়ে আমরা এসেছি।'

হাসতে হাসতে ফুজে বলল, 'দেখি। কিন্তু জার্মান ভাষায় লেখা নয় কেন? এবার জার্মান ভাষাটা শিখে ফেলুন! কত আর অনুবাদ হবে! মূল ভাষাই আমি পছন্দ করি, যাক্‌গে, লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। আপনারা তো আর ভের্দ্যর বীর নন।' তারপর দাড়ি আঁচড়িয়ে টুপি পরে সে আবার বলল, 'আমি প্রস্তুত। রিপাব্‌লিক জিন্দাবাদ!'

নিচে সিঁড়ির মুখে তেসার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দাড়ি কামিয়ে প্রাতরাশ শেষ করে তেসা চলেছে উকিলদের একটা বৈঠকে। ফুজেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল তেসা। কেমন কঠিন আর থমথমে হয়ে উঠল মুখটা—যেন সে মৃতের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফুজে অভিশাপ দিল, 'জাহান্নামে যাও তোমরা!'

ঊনচল্লিশ

পারীতে থাকতে জেনারেল লোরিদো বলেছিল, "যে যুদ্ধে জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই, সে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কোনো অর্থ হয় না। এমনকি সেটা আমার মতে মূর্খতার পরিচয়।'

ব্রতেইর ইচ্ছে ছিল, যে প্রতিনিধি-দল সন্ধি-শর্তে স্বাক্ষর করবে তার মধ্যে লোরিদোও থাকুক। কিন্তু লোরিদোকে যকৃতের অসুখে বিছানা নিতে হল। এবং এই অসুখকে বরাত বলেই মনে করল সে। ইতিহাসের পাতায় এই শোচনীয় দলিলে স্বাক্ষর রাখবার ইচ্ছা তার ছিল না।

সরকারী পুনর্গঠনের সময় যুদ্ধাস্ত্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হল লোরিদো। লা বুরবুলের কাছে একটা পাহাড়ী স্বাস্থ্যকর জায়গায় যুদ্ধাস্ত্র-মন্ত্রীর দপ্তর। লা বুরবুল হাঁপানী রোগের চিকিৎসার জন্যে বিখ্যাত; শুনে সে রীতিমতো দুঃখিত হল। তার আশা ছিল ভিশিতে যাবে এবং সেখানে যকৃতের চিকিৎসা করাতে পারবে। তবুও সে রোজ ডাক্তারখানায় যাতায়াত করতে লাগল। বলল, 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন পুনর্গঠনের সময়। চিকিৎসা যে-অসুখেরই হোক না কেন, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।'

বৌকে আনিয়ে নিল নিজের কাছে। গোলাপী ড্রেসিং-গাউন পরা বৌকে দেখে সে যেন খুশিতে উপচে পড়ল। দুজনে থাকে একটা হোটেলে। বৌ আসবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রীহীন ঘরটায় একটা গৃহস্থালীর শ্রী ফিরে আসে যেন; উপকরণ বিশেষ কিছু নয়—বুনবার সাজসরঞ্জাম, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি আর জিনিসপত্রের চড়া দাম সম্পর্কে কথাবার্তা। কোনো দুঃখ নেই লোরিদার। তবু একটিমাত্র দুশ্চিন্তা রয়ে গিয়েছে, তা হচ্ছে নিজের

কাজের দায়িত্ব। সন্ধির শর্তানুযায়ী সমস্ত যুদ্ধ-উপকরণ জার্মানদের হাতে তুলে দিতে হবে। সে বলে, 'আমি মনে করতাম যে যুদ্ধাস্ত্রে সাজিয়ে তোলাটাই খুব একটা শক্ত কাজ।'

সে মনে করে যত বেশি সম্ভব যুদ্ধ-উপকরণ জার্মানদের কাছ থেকে গোপন রাখাই তার দায়িত্ব। কর্নেল মোরো তার সহকারী, তাকে সে বলে, '১৯৬০ সালের জন্যে এখন থেকেই তৈরি হতে হবে। হ্যাঁ, এখন থেকেই! গতবার হেরে যাবার পর জার্মানরা একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হতে শুরু করেছিল। প্রকৃতির নিয়মই এই।' কিন্তু মোরো প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে, 'কোনো চিন্তা নেই। চাঁদ কখনো সূর্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না।'

একদিন সকালবেলা ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এসে লোরিদো কফি খাচ্ছিল, এমন সময় দরজায় কে যেন ঘা দিল। বোধ হয় তার সহকারী কিংবা আর্দালি মনে করে জেনারেল বলল, 'ভেতরে এস!' ভেতরে ঢুকল ভাইস।

কোমার থেকে নির্বাচিত ভূতপূর্ব র‍্যাডিকালটি এখন লাভালের প্রাণের দোস্ত আর যুক্ত ফরাসী-জার্মান কমিশনের একজন সভ্য।

ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এসে জেনারেল তখনো ড্রেসিং গাউন ছাড়েনি। সেই বেশে তাকে মনে হচ্ছে যেন কার্নিভালের পুতুল। হাসি চাপতে পারে না ভাইস। লোরিদো কেমন বিব্রত বোধ করে; ভাবে, একজন জেনারেলের খেয়াল থাকা দরকার যাতে নিজের মর্যাদার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি হয়।

সে বলে, 'মফঃস্বলে এসে থাকতে হচ্ছে কিনা! তাছাড়া সঙ্গের লোকটিও আনাড়ী।'

'এত ভোরে এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে।'

মিনিট পনেরো পরে যখন জেনারেল লোরিদো আবার ভাইসের কাছে এল, তখন তার পরিপূর্ণ সাজপোশাক, বুকের ওপর ছটা সম্মানপদক।

ভাইস সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা জেনারেল, ক'পেলিএ-তে বিয়াল্লিশটা মাঝারি ট্যাংক ছিল না কি? কিন্তু মাত্র ষোলটি হস্তান্তর করা হয়েছে।'

লোরিদো মাথা নাড়ল, তারপর সরলভাবে উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই। জার্মানরা ষোলটার কথাই বলেছিল।'

'কিন্তু আমাদের শর্তটা কি?'

'মশিয় ভাইস, আমি মনে করি যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের কর্তব্য...'

বাধা দিয়ে ভাইস বলল, 'এই ঘটনার সঙ্গে অত সব বড়ো বড়ো কথার সম্পর্ক কি? ষোল মানে ষোল। বিয়াল্লিশ মানে বিয়াল্লিশ। ছাব্বিশটা ট্যাংক লুকিয়ে রাখবার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে?'

এবার লোরিদোও গলা চড়াল, 'কি বলতে চান আপনি? আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমি স্কুলের ছেলে। আমি একজন ফরাসী সৈনিক, মশিয়!'

কথাটা বলে সে টান হয়ে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো মানুষটি, তবুও তার মনে হল যেন ভাইসকে সে অবজ্ঞা করতে পেরেছে।

কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে ভাইস বলল, 'আপনি মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন, জেনারেল। আপনি এখানে যুদ্ধ করতে আসেননি। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি আপনার ওপরওলাকে বলব যেন আপনাকে একটু পাটিগণিত শিক্ষা দেওয়া হয়।'

কথাটা বলে ভাইস ঘর ছেড়ে চলে গেল। ধাক্কাটা সামলে উঠতে অনেকক্ষণ সময় লাগল লোরিদোর।

সোফির কাছে সে বলল, 'যারা আমাদের শত্রু ছিল তাদের হাতে কেন যে ছাব্বিশটা ট্যাংক তুলে দিতে হবে আমি বুঝি না। লাভালের বন্ধু, ব্রতৈইর অনুগত একজন ফরাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এমনভাবে সে আমার সঙ্গে কথা বলল যেন সে একজন জার্মান অফিসার। এমন যাচ্ছেতাই কাণ্ড আর দেখিনি।'

পরের দিন লেরিদো গেল জেনারেল পিকারের সঙ্গে দেখা করতে। সামরিক ব্যাপারে ভাইসের মতো রাজনীতিকদের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে এ-ধরনের হস্তক্ষেপের অর্থ মার্শালের নির্দেশ অমান্য করা।

কোনো রকম উৎসাহ না দেখিয়ে পিকার বলল, 'মনে হচ্ছে দ্য গলের প্রলাপ আপনাকে প্রভাবান্বিত করেছে। আপনি মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। জার্মানরা যে লণ্ডনে পৌঁছবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খুব দেরি হয় তো আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। আপনার বয়সটা কম নয়, অভিজ্ঞতাও হয়েছে অনেক। সৈনিকের জীবন আপনার, কাজেই কতকগুলো বাধ্যবাধকতা আপনাকে মানতে হবে বৈকি। আপনার পক্ষে বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখা চলে না।'

লেরিদো বিব্রত বোধ করল। মুখ ফুটে সে বলতে পারল না যে 'এই অভিযোগ আমার প্রাপ্য নয়।'

পিকার বুঝতে পেরেছে যে একটু বেশি বলা হয়ে গিয়েছে। বন্ধুভাবেই বিদায় নিল দুজনে। লা বুরবুল্-এ ফিরে এসে গণ্ডগোল দূর করবার কাজে মন দিল লেরিদো। সমানে ধমকাতে লাগল সাঙ্গপাঙ্গদের : 'ওই মেশিনগানগুলোর জন্যে তুমিই দায়ী মেজর! তুমি এমন ভাব করছ যেন দামী অলংকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রাক্তন শত্রুদের দেখিয়ে দিতে হবে যে তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারে পর্যন্ত আমরা চুক্তি মেনে চলি। ক্যাপ্টেন, দেখো যেন একটা বোতামের হিসেবেও ভুলচুক না হয়! বুঝলে তো?'

রাত্রিবেলা খাবার পরে মোরোর সঙ্গে খানিকটা রাজনীতি আলোচনা হল। লেরিদো বলল, 'ওই অপরিদামদর্শী দ্য গলটা ভুল ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছে। আমি এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। উপকূলের কাছে জার্মানরা বিরাট ফৌজ জড়ো করেছে। চ্যানেল পার হবে কি করে বলছ? ওসব বাজে কথা রাখ! সমুদ্র পার হয়ে কি ভাবে ফৌজ নামাতে হয় সে-সম্পর্কে সমস্ত ধারণা ওরা নার্ভিক-এ পালটে দিয়েছে। এক মাসের মধ্যে হিটলার লণ্ডনে হাজির হবে। এ তো অ-আ-ক-খর মতো সোজা! আমার মনে হয় লাভালের পথই ঠিক। অবশ্য আমরা সৈন্যবাহিনীর লোক, রাজনীতিতে অনধিকার চর্চা করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু এখন তো আর এটা পার্লামেণ্টারি তর্কবিতর্ক নয়, ফ্রান্সের ভাগ্য এর সঙ্গে জড়িত। তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলছি—জার্মানদের জয় হলে আমাদেরই সুবিধে। ইতালীর সঙ্গে সমপর্যায়ে আমরাও নতুন ইউরোপে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারব। ইংল্যাণ্ডকে শেষ করবার পর হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। অবশ্য রাশিয়ার লালফৌজ আছে। কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। তবে কথাটা কি জান, ওই দেশটা বড্ড বড়ো, বুঝলে বন্ধু, পেল্লায় দেশটা। আমার স্থির বিশ্বাস, এই কাজে আমাদের সাহায্য না নিয়ে হিটলারের উপায় নেই। তখন আমরা কিছু কিছু সুবিধে আদায় করে নিতে পারব। জেনারেল পিকার মনে করে হিটলার যদি কিয়েভ অধিকার করতে পারে তবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা লিল্ ফিরে পাব। আচ্ছা ধরা যাক ইংলণ্ড এই যুদ্ধে জিতবে। তা যদি হয় তো ফল ভীষণ খারাপ। আমরা জার্মানির সঙ্গে পৃথক সন্ধি করেছি এই অপরাধে চার্চিল কক্ষনো আমাদের ক্ষমা করবে না। আর দ্য গলের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ তারা তো সব অখ্যাত চুনোপুঁটি। ও যদি কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে যায় তবুও আমি আশ্চর্য হব না। আরে এসব লোক সব পারে! ব্যক্তিগতভাবে আমি জার্মানদের পছন্দ করি। ওরা

আমাদের শত্রু ছিল বটে কিন্তু মানুষ হিসাবে ওরা খাঁটি। পেরুতোঁ বা ভূতপূর্ব ডেপুটিদের মনে সন্দেহ আসতে পারে, কিন্তু আমি মন স্থির করে ফেলেছি। জার্মানদের সত্যিই আমাদের সাহায্য করতে হবে, আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, মনেপ্রাণে। কি মনে কর কর্নেল?'

অলস ভঙ্গিতে মোরো উত্তর দিল, 'আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে চাঁদের আলোটা নিজস্ব নয়, ধার করা। যা প্রত্যক্ষ তার বিরুদ্ধে যাওয়া সহজ নয়। এ কথা ঠিক যে ওরা যদি জার্মানদের হারিয়ে দেয় তাহলে আমাদের সঙ্গে ওরা খুব সদয় ব্যবহার করবে না। এ কথা আমিও মনে করি যে গাছের ডালে ঝোলার চেয়ে·লা বুরবুল্-এ থাকা ভালো।'

কয়েকদিন পরে জেনারেল লেরিদো একটা পিকনিকের আয়োজন করল। সোফি আর কর্নেলকে সঙ্গে নিয়ে সে গেল একটা পাহাড়ে লেকের ধারে। গা পর্যন্ত তারা গাড়িতে গেল, তারপর একটা সরু রাস্তা ধরে হেঁটে গেল লেক পর্যন্ত। চারপাশের দৃশ্য দেখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল লেরিদো। ছাইরঙা পাথরগুলো এলোমেলো স্তূপ বেধেছে মনে হতে পারে এটা একটা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। কোথাও ফুল নেই বা গাছ নেই—রুক্ষ কর্কশ প্রান্তর। শুধু এখানে ওখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কাঁটাগাছের জঙ্গল—চারপাশের অন্য সব কিছুর মতো পাঁশুটে। জলের রঙও পাঁশুটে। আত্মসমর্পণের পর পৃথিবীর চেহারাটা বোধ হয় এই রকমই হয়েছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল আরদেনের সবুজ জঙ্গল আর একটি খোঁড়া মেয়ের কথা...

সঙ্গে রান্না-করা খাবার ছিল। জেনারেলের বৌকে মোরো এক বাক্‌স বাদামের বরফি উপহার দিয়ে বলল, 'এটা এখানকার নামজাদা খাবার।' তীক্ষ্ণবুদ্ধি সোফি একবার ঢোঁক গিলে মনে মনে ভাবল, লোকটা নিশ্চয়ই পাগল, নইলে এই দুর্দিনে মিষ্টি কিনে আশি ফ্রাঁ খরচ করে!

সূর্য ওঠার পর লেকের জল গোলাপী হয়ে গেল। মনে মনে একটা প্রশান্তি ও পরিপূর্ণতা অনুভব করল লেরিদো, বলল, 'এই প্রকৃতি, একমাত্র প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত আবেগ ও অনুভূতির চূড়ান্ত স্থিতি।'

মিঞ'' থেকে একটা গান গাইতে লাগল সোফি। সোফির দিকে আদর ও রহস্য-ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মেরো ভাবল, 'আমার ছোট বুলবুলি, আমার কাছেই তুমি ধরা দেবে।' লেরিদো ঢুলছিল—বাতাস যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে, এই নেশায় মানুষ একই সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে ওঠে আর নেতিয়ে পড়ে। অ্যাড্‌জুটেন্টের উত্তেজিত গলার স্বর শোনবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত লেরিদোর বিহ্বল ভাবটা কাটল না। পুরোপুরি সজাগ হবার পর সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'এখানে আসবার অনুমতি তোমাকে কে দিল? আজ রবিবার। আর এটা তো আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়!'

'ভীষণ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, জেনারেল।'

যে দুর্ঘটনার জন্যে জেনারেলের রবিবারের আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল তার মূলে ছিল ২৮৭তম রেজিমেন্টের একজন কর্পোরাল, 'সিয়েন' কারখানার প্রাক্তন শ্রমিক, নাম ল্যাগ্র্যা।

মে মাস পর্যন্ত ল্যাগ্র্যাকে ব্রিয়াঁসোঁর কাছে একটা বন্দীশালায় আটক রাখা হয়েছিল। সেখানে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাকে পাথরের চাঁই টেনে তুলতে হত পাহাড়ের ওপর। পাথরগুলোকে কেন যে টেনে তুলতে হচ্ছে কেউ জানত না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা নির্জন রাস্তার ধারে পাথরগুলো পড়েছিল। ল্যাগ্র্যা অসহিষ্ণু হয়নি বা রক্ষী-সৈন্যদের সঙ্গে ঝগড়াও করেনি। তার মনের ভেতরে কি যেন একটা ভেঙে পড়েছিল। কথাবার্তা সে বড়ো একটা বলত না—শূন্য ও ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। মে মাসে আচমকা বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। বন্দীদের উদ্দেশে একটা বক্তৃতায় কর্নেল বারবার

বলল, 'ফ্রান্স পীড়িত।' মুক্ত বন্দীদের পাঠানো হল ইতালীয় সীমান্তে। এমনকি ল্যাগ্র্যা তার কর্পোরালের পদকও ফিরে পেল। ভাগ্যের এই পরিবর্তন ল্যাগ্র্যা মনে এতটু উৎসাহ জাগাল না। কিন্তু যেদিন সে খবরের কাগজে পড়ল যে জার্মানরা বেলজিয়মে ঢুকেছে, সেদিন থেকে তার নির্লিপ্ততা একেবারে কেটে গেল, পুরনো সংগ্রামী ও আন্দোলনকারীর রূপ অনেকটা ফিরে এল যেন। তখন সে রাইফেল ধরতে লাগল সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টি নিয়ে এবং উত্তর সীমান্তে তাকে পাঠানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ করতে লাগল বারবার।

একেবারে ফ্রন্টে যেতে চাইত সে, যদিও সে বিশ্বাস করত না যে এই যুদ্ধে জয় হবে। সমস্ত শীতকালটা ধরে তার মনে শুধু একটিমাত্র চিন্তাই ছিল—ফ্রান্স হৃতদৃষ্টি, মোহাচ্ছন্ন, প্রতারিত, বিরাট এক দেশ থেকে মনাকোর মতো ছোট্ট এক এলাকায় পরিণত! এত বড়ো একটা অন্যায় হতে দেখে তার সমস্ত আশাভরসা একেবারে নির্মূল হয়ে গেল, আবার উঠে দাঁড়ানো যাবে। এই বিশ্বাসটুকুও আর রইল না। তার এই ভয় বাস্তবে পরিণত হতে বেশি দিন সময় লাগল না। একমাস পরেই ইতালীয়রা ফ্রান্স আক্রমণ করে। ল্যাগ্র্যার বাহিনীকে রাখা হয়েছিল পোঁতি স্যাঁ-বের্নারের কাছে একটা জায়গায়। একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি প্রতিরোধ করে ল্যাগ্র্যা।

চারদিন ধরে অনবরত গোলাবর্ষণ করে গেল ইতালীয়রা। কিন্তু প্রতিরোধকারীদের এতটুকু হটানো গেল না। চারদিন পরে নিশ্বাস ফেলবার মতো একটু সময় পাওয়া যেতেই খাবার আনা হল। কিন্তু খবরের কাগজ ছিল না। শাঁবেরী থেকে ফিরে আসা একজন লেফটেনেন্ট বলল যে জার্মানরা পারী অধিকার করেছে। ফরাসী সরকার যে কোথায় কেউ জানে না।

সৈন্যদের ভেতর নানা রকম গুঞ্জন উঠল।

'ওসব সরকার-টরকার আর কিছু নেই।'

'বোধ হয় ফ্যাশিস্টরা ক্ষমতা লাভ করেছে—লাভাল, দোরিও, পুরো দলটাই।'

'তার মানে লাভালের জন্যে প্রাণ দিতে হবে? আমি এর মধ্যে নেই!'

ল্যাগ্র্যা জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'ভয় পাচ্ছ বুঝি তোমরা? লাভালের জন্যে কেউ প্রাণ দিতে চায় না। কিন্তু কি করে জানলে যে লাভালই এখন সরকারী কর্তা হয়ে বসেছে? লোকে বলছে? লোকে তো অনেক কথাই বলে। লাভাল তো আর যুদ্ধ করবে না। ও মুসোলিনীর হাতের পুতুল। কার হাতে ক্ষমতা গেছে তা আমরা জানি না।' তারপর পশ্চিম দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'কিন্তু ওদিকে আমাদের সামনে যে কারা রয়েছে তা আমরা জানি। এতে ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তোমরা যা খুশি ভাবতে পার কিন্তু আমি কিছুতেই ওই ফ্যাশিস্টদের দেশের ভেতরে ঢুকতে দেব না।'

মুহূর্তের জন্যে তার শূন্য চোখ দুটো রাগে ও ক্ষোভে জ্বলে উঠল।

সঙ্গীরা সমর্থন জানাল সবাই। পরদিন ইতালীয়রা আত্মসমর্পণ করতে বলল ফরাসীদের। ফরাসীরা রাজী না। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা আরও পাঁচ দিন প্রতিরোধ করল।

'সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে'—কথাগুলো প্রথম শুনে ল্যাগ্র্যার মনে হল যেন সে স্বপ্ন দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে সে গাল পাড়ল—'এ লাভালের কীর্তি! বাইরে বেরোতেই চোখ পড়ল দুজন ইতালীয়ের সঙ্গে একজন ফরাসী কর্নেল। কে যেন গজরাতে লাগল · 'ম্যাকারনি!' আবার নিরুৎসাহ ও গম্ভীর হয়ে গেল ল্যাগ্র্যা।

যে-সব বাহিনী অটুট রইল তার মধ্যে ল্যাগ্র্যার বাহিনী একটি। ক্লেরম-ফেরাাঁর কাছাকাছি একটা জায়গায় ওদের রাখা হল। শহরের কাছেই বিরাট এক অস্ত্রাগার, বারুদ আর যুদ্ধ-উপকরণে ঠাসা। একদিন ল্যাগ্র্যার কানে গেল লেফটেনেন্ট ব্রেজিএকে মেজর বলছে—

'আগামী বুধবার জার্মানদের হাতে সবকিছু তুলে দেব।' জলের ভেতরে সূর্যের আলো ঢোকবার মতো এই কথাগুলোও ল্যাগ্র্যার চেতনায় অস্পষ্ট একটা ছাপ রেখে গেল।

সেদিন রাত্রিটা বেশ গরম। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঠাণ্ডা পড়েনি। ল্যাগ্র্যার ডিউটি পড়েছে। সে ভাবছিল জোসেতের কথা। একটিও চিঠি লেখেনি জোসেৎ। হয়তো লিখেছে কিন্তু পৌঁছয়নি। আর এখন তো ডাক বলতে কিছু নেই। ট্রেন অচল। তার নিজের জীবনের মতো সব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মিশো কোথায়? পার্টির অস্তিত্ব আছে কি? হয়তো আছে, হয়তো এই কাছাকাছি কোথাও-কোন প্রতিবেশীরই মনের মধ্যে। কিংবা হয়তো অনেক দূরে। তারা যে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে : নাৎসীরা এসেছে এবং ফ্রান্সে তাদের বহু বন্ধু সাহায্যকারী পদলেহনকারীও জুটেছে। দু বছর আগে 'লুমানিতে' যে-সব কথা লিখেছিল তা এমন পরিপূর্ণভাবে ফলে যাবে তা কল্পনাও করা যায়নি। কী ভীষণ দুঃখের মধ্যেই না টেনে আনা হয়েছে দেশকে! জার্মানরা সর্বগ্রাসী—যন্ত্রপাতি, চিনি, জুতো, যা পাচ্ছে চালান দিচ্ছে। আর যুদ্ধবন্দীদের একজনকেও এখনো ছাড়েনি। মিশো যদি ওদের হাতে বন্দী হয়ে-থাকে? এবার ব্রিটিশদের পালা। তারপর রাশিয়ানদের। ইঁদুরের জাত ওরা, ক্ষুধার্ত ইঁদুর! কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না; কাজ, বীরত্ব, এমনকি সাধারণ মানবিক জীবনও ধ্বংস হবে—তাও কি সম্ভব?

এইভাবে দীর্ঘ দুশ্চিন্তার জাল বোনার মধ্যে দিয়ে রাত্রি শুরু হল। এই রকম রাত্রি ল্যাগ্র্যার জীবনে এই প্রথম নয়। দিনের বেলা সে কথা বলতে চেষ্টা করছে, শূন্য চোখের দৃষ্টি মেলে ভাঙা গলায় প্রশ্ন করেছে নানাজনকে। কেউ কিছু বলতে পারেনি। এই ঘটনার আঘাতে সবাই যেন থেঁতলে গেছে। আত্মীয়স্বজনের সন্ধানে বা খাবার আর আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। ঘটনার মর্মান্তিকতা নিয়ে চিন্তা করবার অবসর কারো নেই। এ তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

কিন্তু ভোরের আলোয় যখন গাছপালার ওপর থেকে অন্ধকার সরে গেল, ল্যাগ্র্যার মনেও একটা সিদ্ধান্ত দানা পাকিয়েছে। নিজের অজান্তেই সিদ্ধান্তটা তার মনে এসেছে। বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার অবসর আর হয়নি। এটা তার একটা প্রেরণা। গত কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির নিষ্ফল প্রতিরোধ, আশ্রয়প্রার্থীদের অভিযোগ, গৃহহীন পথাশ্রয়ী বুভুক্ষু সৈন্যদের গল্প, আর মেজরের কাপুরুষোচিত ও নির্লজ্জ উক্তি—'আগামী বুধবার আমরা জার্মানদের হাতে তুলে দেব'—এসব তাকে এই একটিমাত্র পথই দেখিয়েছে। না! জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, কিছুতেই না!

সৈন্য তিনজনকে ল্যাগ্র্যা পাঠিয়ে দিল শহরে। লেফটেনেন্ট ব্রেজিএ নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে, ল্যাগ্র্যা একাই প্রাণ দিল। তার জীবনের মতো তার মৃত্যুও হল সহজ, আড়ম্বরহীন, আন্তরিক। গোটা অঞ্চল কেঁপে উঠল সেই বিস্ফোরণে, ডাল ছেড়ে উড়ে গেল পাখিগুলো। পাঁচ মাইল দূরের ইঁটের কারখানার জানালাগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল থর থর করে।

সমস্ত ঘটনা শুনে জেনারেল লেরিদো দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। ফ্রান্সের পরাজয়ের চেয়েও বড়ো দুর্ঘটনা বলে মনে হল এই বিস্ফোরণকে। তাকেই এর জন্যে দায়ী করা হবে। জার্মানরা কক্ষনো বিশ্বাস করবে না যে এটা কোনো একজন দুর্বৃত্তের কাজ। আর পিকারও সমস্ত দোষ তার ঘাড়েই চাপাবে। হঠাৎ সেই অনাত্মীয় পাঁশুটে লেক ও স্তূপীকৃত পাথরের দৃশ্যটা মনে পড়ল লেরিদোর। সোফিকে বলল, 'সব উড়ে গেছে, সব জায়গায় বোমা ফেলা হয়েছে। প্রকৃতিও এ-আঘাত থেকে রক্ষা পায়নি। মানুষের হৃদয়ও নয়।'

চল্লিশ

জোলিও পারীতেই থেকে গেছে। সেখান থেকেই 'লা ভোয়া নুভেল' আবার প্রকাশিত হচ্ছে, ভিশি থেকে যেমন সে ফ্রাঁ পাচ্ছে, তেমন জার্মানদের কাছ থেকে পাচ্ছে মার্ক। কিন্তু বেঁটেখাটো মানুষটির মুখে সব সময়েই অনুযোগ শোনা যায় যে, জার্মান দূতাবাসের সীবার্গ লোকটি নাকি অর্থপিশাচ ও জঘন্য। সে বলে, 'খট্টাশের সঙ্গে ওকে এক খাঁচায় আটকে রাখ, দেখবে দম আটকে খট্টাশ মারা যাবে।'

জেনারেল ফন শাউমবর্গ্রে জোলিওর প্রতি সহৃদয়। মার্সাইএর এই লোকটির চটুল উচ্ছ্বাস আর চমকপ্রদ কল্পনাবিলাস জেনারেলের ভালো লাগে। কিন্তু জোলিও এখন মনমরা আর বিষণ্ণ, ঠাট্টাতামাসায় যোগ দেয় না, সামাজিকতার ধার ধারে না। আপিস থেকে বাড়ি ফিরে জামাজুতো না খুলেই বিছানার উপর বসে নিঃশব্দে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। বৌ যদি জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে? সে শুধু মাথা নাড়ে যেন সে বলতে চাইছে 'কিছু নয়।'

আগের দিন ব্রতৈই একটা প্রবন্ধ নিয়ে আপিসে এসেছিল। প্রবন্ধটা না পড়েই জোলিও লিখে দিল—'যাবে।' কিন্তু ব্রতৈই বলল, 'যা ব্যাপার দেখছি, মনে হয় আর কিছুদিন পরে আমাকে গির্জায় যাতায়াত শুরু করতে হবে।' চাঞ্চল্যকর হেডলাইনের কথা জোলিও এখন আর ভাবে না। কি লাভ ভেবে? কেউ কাগজ পড়বে না। পারীর লোকেরা এই কাগজকে ঘৃণা করে। জার্মানদের নিজেদের কাগজ আছে। জার্মানি থেকে অত্যন্ত কাঁচা অনুবাদ করা নানারকম প্রবন্ধ আসে মাঝে মাঝে। লেখাগুলোয় 'আমরা' কথাটার জায়গায় 'জার্মানরা' কথাটা সে বসিয়ে দেয় : 'লা ভোয়া নুভেল' যে ফরাসী কাগজ, অন্তত এ চরিত্রটুকু বজায় থাকুক। আর তাছাড়া জোলিও এজন্যে টাকা পায়। কিন্তু ব্রতৈইকে চায় কারা? অতীতের কথা ভাবতেও কষ্ট হয়—৬ই ফেব্রুয়ারি, 'মন্ত্রশিষ্য,' চেম্বারের বক্তৃতা। সবই অতীতের ঘটনা। ফ্রান্সের অস্তিত্ব ছিল তখন। আর এখন খরগোসের মতো লালচে-চোখ ওই জার্মান বড়কর্তা ফ্রাঙ্কেকে দেখা যাবে 'লা ভোয়া নুভেল'-এর আপিসে বসে থাকতে। জঘন্য লোকটার পান থেকে চুন খসে না।

জোলিও তার বৌকে বলল, 'ব্রতৈই এসে হাজির হয়েছে, একে একে আসুক সবাই! লাভাল আর তেসাকেও শিগ্‌গিরই দেখা যাবে।'

বৌ গজরাতে লাগল, 'তাতে আমাদের কি, আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। আজ সারা বাজার ঘুরেছি, কোথাও এক টুকরো সাবান নেই। কোনো কিছু পাওয়া যায় না, এ-দেশ থেকে সব লুটে নিয়ে গেছে ওরা।'

'সে তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কোথায় যাই বল তো? মার্সাইএর অবস্থাও এই। এই হতভাগা ইঁদুরগুলো গোটা ইউরোপটাকে এক টুকরো পনীরের মতো গিলে নিয়েছে। ব্রতৈইর কাছে শুনলাম, অভেরঞ্‌-র কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় দেসের বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে। এই হচ্ছে বীরের মতো কাজ—মার্ন বা ভের্দ্যা যখন নেই! কী অদ্ভুত! আমার কি মনে হচ্ছিল জান? ওরা যদি—' জানালাটা বন্ধ করে গলা নামিয়ে সে বলল, 'যদি ওরা হেরে যায় তাহলে কি হয় বল দেখি? সেটা যে কী ভীষণ

একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হবে তা তুমি কল্পনাও করতে পার না! এক সন্ধ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বিশেষ সংস্করণ বিক্রি হয়ে যাবে। আর ব্রতৈইর গলায় ফাঁসির দড়ি বেঁধে...'

'বলছ কি! ব্রিটিশরা যদি জেতে ওরা তোমাকেও খুন করবে।'

জাঁকালো ভাবে মাথা নেড়ে জোলিও বলল, 'নিশ্চয়ই! ভালোই হয় তাহলে! মাথার ওপরে ঈশ্বর আছেন, শয়তানরা কেউ-ই রেহাই পাবে না। এর জন্যে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাওয়াও ভালো!'

আপিসে যাবার পথে ঠিক করল, এক গ্লাশ হজমী মদ খেলে বেশ হয়—'এর পর তো সবই রাক্ষসগুলোর পেটে যাবে।' গলির ভেতর একটা ছোট্ট কাফে সে খুঁজে বার করল যেখানে জার্মানরা ঢোকে না বলেই মনে হয়।

যে মেয়েটি খাবার দিয়ে গেল, তার চোখ দুটি ভেজা। একটা খবরের কাগজ তুলে নিল জোলিও। কাগজটা সে পড়ল না, অন্য কিছু ভাবছিলও না সে। আজকাল প্রায়ই এই রকমের একটা আচ্ছন্নতায় সে ডুবে যায়; কোনো একটা দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে যেন সে। দরজাটা শব্দ করে উঠল, ভেতরে ঢুকল একজন জার্মান অফিসার, ভারী চোয়াল, বোকা বোকা চাউনি। ভদ্রভাবে সে সকলকে অভিবাদন জানাল, কেউ সাড়া দিল না। মেয়েটি এক পাত্র বিয়ার আনল তার জন্যে। বিয়ার হাতে নিয়ে সে বসতে বলল ওকে কিন্তু নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করল মেয়েটি। আর এক পাত্র বিয়ার খেয়ে সে মেয়েটিকে বলল, 'মুখে কথা নেই কেন সুন্দরী? কই, মুখ বন্ধ করে রইলে যে?'

হাতের ট্রে দিয়ে মুখ ঢেকে ও জবাব দিল, 'মঁশিয়, আমি ফরাসী মেয়ে।'

অফিসারটি চটে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে সে চিৎকার করে বলে গেল, 'আরসিতে নিজের মুখটা একবার ভালো করে দেখো। তোমার মা নিশ্চয়ই কোনো নিগ্রোর সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিল।'

অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল মেয়েটি : 'কেন, কেন আমাদের হাতে একটিও ট্যাঙ্ক ছিল না?'

জোলিও ওকে বলল, 'আমাদের ট্যাঙ্ক ছিল। সেগুলো ছিল তেসার হাতে। কেঁদে লাভ কি? চোখের জলে তো ওদের তুমি তাড়াতে পারবে না। ওগুলো হচ্ছে ইঁদুর, না মারলে রেহাই নেই। কিন্তু ওটা আমার কাজ নয়। না, কারণ আমি ওদের কাছ থেকে টাকা নিই। সবাই নেয়। আমি কি করতে পারি? এমন কি মার্সাই-এরও কোনো অস্তিত্ব নেই। ধরতে গেলে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই—খালি আছে ওই জার্মানগুলো আর কপালের দুঃখ। বাছুরের মতো তোমার এই কান্না থামাও দিকি। তার চেয়ে বরং দু গ্লাশ বিয়ারের দামটা রেখে দিতে চেষ্টা কোরো। হয়তো শেষ পরিণতি ভালোই হবে—ল্যাম্পপোস্টের দড়ি থেকে আমি ঝুলতে থাকব আর তুমি নাচতে থাকবে মার্সাই-এর কোনো লোকের সঙ্গে জানো তো, মার্সাই-এ আমরা বেপরোয়াভাবে নাচি।'

একচল্লিশ

নানা রকম তর্ক তুলে ন্যায়ের দোহাই দিয়ে ব্রতৈই চেষ্টা করল নিজের কথার যৌক্তিকতা বোঝাতে। কিন্তু জেনারেল ফন শাউমবের্গ অবিচলিত। গোল গোল নীল চোখে ব্রতৈইর

দিকে তাকিয়ে কড়া চুরুট টানতে টানতে জেনারেল মাঝে মাঝে বলে চলেছে, 'না, না!' যেন তার অভিধানে এই একটিমাত্র কথাই আছে।

জেনারেল ফন শাউমবের্গ মনে করে যে ফরাসীদের কথায় কোনো গুরুত্ব দিতে নেই। জোলিওকে পছন্দ হয় তার। সংগীত ভবনের একজন অভিনেত্রীকে সে লাঞ্চে আপ্যায়িত করে। 'ফ্রান্স হচ্ছে ছুটি কাটাবার পক্ষে চমৎকার দেশ, আর পারী সে-দেশের আশ্চর্য প্রমোদ-ভবন'—কথাগুলো বলতে সে ভারী ভালোবাসে। ব্রতেইকে সে মনে করে একজন 'গুরুগম্ভীর ফরাসী', অর্থাৎ এক কথায় বোকা।

ইতিপূর্বে বোর্দোতে জার্মানদের দাবির বহর দেখে ব্রতেই খানিকটা হতবুদ্ধি হয়েছে। সে মনে করেছিল, এটা একটা জুয়ো খেলা, হাতের তাস লুকিয়ে রেখে কূট বুদ্ধি চালাতে হবে। তার বদলে জার্মানরা তাকে শুধু হুমকি দিয়েছে। সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর সমস্ত বেতারকেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে—জার্মানদের এই দাবি শুনে সে তো থ'। কাঁধঝাকুনি দিয়ে সে বলেছে, 'ওরা চায় ফ্রান্স বোবা হয়ে থাক।' কিন্তু তবুও বোর্দোতে ব্রতেই আশা ছাড়েনি। বাইরের আড়ম্বর হিটলার ভালোবাসে, এবং কর্মাপিএঞর লজ্জাকর দৃশ্যটা এজন্যে তার কাছে প্রয়োজন ছিল। রক্তের ধার রক্তে শোধ করাটাই এতদিনের রীতি, কিন্তু হিটলার চায় চোখের জল দিয়ে চোখের জল মুছতে। যাই হোক, উৎসবের মত্ততা একদিন থামবে, স্তব্ধ হবে জার্মানীর আনন্দধ্বনি, পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় বিজয়ীদের জ্বালা আগুন যাবে নিভে—আর তখন সম্ভব হবে কিছু একটা আলাপ আলোচনা করা। ফ্রান্স পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু ফ্রান্সের শক্তি অতীতেও যেমন বিরাট ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। উপনিবেশ ছিল ফ্রান্সের, ছিল নৌশক্তি। আর হিটলারের গলায় এখনো ইংলন্ড আড় হয়ে রয়েছে। ফ্রান্সের সঙ্গে দহরম মহরম করতেই হবে হিটলারকে।

কতকগুলি জরুরী বিষয় স্থির করবার জন্যে ব্রতেইকে পারীতে পাঠিয়েছেন পেত্যাঁ। অনধিকৃত অংশে লক্ষ লক্ষ গৃহহীন লোক অনাহারে রয়েছে। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকৃত অংশে ঢুকতে দিতে জার্মানরা অনিচ্ছুক। বন্দীদের দিয়ে ওরা জোর করে ভারী কাজ করাচ্ছে। আহতদের জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেই।

এই সমস্ত কথা ব্রতেই জেনারেল ফন শাউমবের্গকে বুঝিয়ে বলল। মন দিয়ে ব্রতেইর কথা শুনল জেনারেল। কিন্তু ব্রতেই যখন জিজ্ঞেস করে, 'এ-সব বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে একমত তো?' জেনারেল নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয়, 'না।'

একথাও ব্রতেই উল্লেখ করে যে লোরেনের দখলকারী সৈন্যরা ফরাসী ভাষার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। কথাটা শুনে জেনারেল সজাগ হয়ে উঠে তারপর বলে, 'লোরেনে কোনো দখল-কারী সৈন্য নেই। লোরেন জার্মানির অংশ।'

ব্রতেই আর সহ্য করতে পারল না। এই প্রথম সে কোনো রকম কূটনীতিক ভাষার আশ্রয় না দিয়ে সোজাসুজি বলে উঠে, 'আমি একজন লোরেনবাসী।'

ফন শাউমবের্গ সযত্নে ছাইদানির প্রান্তে চুরুটটা ঠুকে ঠুকে ছাই ফেলে, কিন্তু কোনো কথা বলে না। আবার আশ্রয়প্রার্থীদের প্রসঙ্গে ফিরে যায় ব্রতেই। বিরক্ত হয়ে জেনারেল একটা উকো নিয়ে ঘষে হাতের নখ পরিষ্কার করতে থাকে, বারকয়েক হাই তোলে এবং অবশেষে এই বিরক্তিকর আলাপ-আলোচনা বন্ধ করবার জন্যে বলে :

'ওসব খুঁটিনাটি আলোচনায় আমি যেতে চাই না।'

'কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো খুঁটিনাটি নয়। লক্ষ লক্ষ ফরাসীর জীবনমরণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। জার্মান কর্তৃপক্ষের প্রত্যাখ্যান এই দুই জাতির সহযোগিতায় বাধা সৃষ্টি করবে। আমি আশা করি...'

'না।'

ব্রতৈই উঠে দাঁড়ায়। লম্বা, শুকনো চেহারা—দেখে মনে হয় জার্মান অফিসার। ফন শাউমবের্গ একটু বিব্রত বোধ করে। বলে, 'আপনি আমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। আপনি কথা বলেন কূটনীতিকের মতো। কিন্তু আমি একজন সামরিক লোক ছাড়া কিছু নই। কিন্তু আপনি যে-সমস্ত অনুরোধ করলেন সেগুলো আমার কাছে বিবেচনাযোগ্য বলে মনে হল না।' কথাটা বলে ব্রতৈইর দিকে একবার তাকিয়ে বিরক্তভাবে আবার বলে, 'না মশাই, না!'

বাইরে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ব্রতৈই সুস্থ হল না। প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ একটি অভিজাত হোটেলে ফন শাউমবের্গের হেডকোয়ার্টার। জনশূন্য প্রকাণ্ড স্কোপারটার দিকে ব্রতৈই তাকিয়ে দেখল। চারদিকে জার্মান পতাকা। রাস্তায় রাস্তায় জার্মান সৈন্য মার্চ করে চলেছে—রাইট্-লেফ্ট্, রাইট্-লেফ্ট্। পাঁশুটে সহজ রঙের ইউনিফর্ম...চারদিকে নীল রঙের সমারোহ—আকাশ, সিয়েন নদী, ঘরবাড়ি।

ফন শাউমবের্গের কথা মনে পড়তেই ব্রতৈই ভুরু কোঁচকাল : 'কী শয়তান লোকটা!' হ্যাঁ, এই জার্মানগুলো মনে করে যে ওরা বিজয়ী জাত। জয়ের নেশায় আকণ্ঠ ডুবে আছে ওরা, অন্তত দশ বছরের আগে ওরা প্রকৃতিস্থ হবে না। 'না! না!'...এই রকম লোকের সঙ্গে সহযোগিতা সম্পর্কে কথা বলে লাভ কি? কোনোদিন সে কারো কাছে নতজানু হয়নি আর আজ সে ফরাসী জাতিকে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করছে।

রয়ালের দিকে এগিয়ে গেল ব্রতৈই। নিজের চিন্তায় এমন ডুবে ছিল যে প্রহরীর হাঁক শুনতে পায়নি। জার্মান সৈন্যটি গালাগালি দিতে দিতে তার পেছনে ছুটে এসেছে : 'এই হাঁদারাম, রাস্তায় নাম!' কোনো প্রতিবাদ না করে ব্রতৈই ফুটপাথ থেকে নেমে আসে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে শুরু করে। এমনিতে সে বড়ো একটা হাসে না, নিজের বেখাপ্পা হাসি শুনে নিজেই ভয় পেয়ে গেল। আজ সব কিছুতেই তার হাসি পাচ্ছে—হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে ওরা তাকে ফুটপাথ থেকে নামিয়ে দিয়েছে, গ্রিস-নেকে একদিন সে খুন করেছিল, লোরেন জার্মানির অংশ, আর সব কথাতেই জেনারেলের সেই জবাব—'না!' সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে ফ্রান্সের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। পারী আছে—আছে পারীর পথঘাট, ঘরবাড়ি, দোকানের সাইনবোর্ড আর আছে বৃদ্ধ মার্শাল ও চার কোটি দুর্ভাগা মানুষ। কিন্তু ফ্রান্স নেই। আর এই একটি মাত্র বিষয়ে জেনারেলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন বলা চলে—'না! না!'

কিন্তু রইল কি? নিজের প্রশ্নে নিজেই ভয় পেয়ে যায় ব্রতৈই। জনশূন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঠোঁট নাড়তে থাকে—ছেলেবেলায় শেখা একটা প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করছে সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সান্ত্বনা পায় না। কথাগুলি মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পর ছাপ রেখে গেল না কিছু। স্যাঁ ওগুস্থ্যাঁ গির্জার কাছে এসে সে ভেতরে ঢুকল। ভেতরটা ঠাণ্ডা আর শান্ত—আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড় নেই, জার্মানরা নেই। দরজার সামনে একজন পাদ্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন, ব্রতৈইকে তিনি আশীর্বাদ করলেন। ব্রতৈই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন পাদ্রি সাহেব?'

তিনি বললেন, 'বড় ভালো নয়। আগাগোড়া আমি পারীতেই আছি। এত দুঃখকষ্ট আমরা কোনোদিন দেখিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্ধ শাসনকর্তাদের তিনি ক্ষমা করুন। জনসাধারণকে তারা ত্যাগ করেছে। আর জার্মানদের কথা যদি বলতে হয় তো বলব যে ওদের বিবেক বলে কিছু নেই।'

ব্রতৈই চোখ বুজল। পাদ্রী বুঝতে পারলেন না তাঁর কথায় এত বিচলিত হবার কি আছে।

ব্রতৈই বলল, 'ভগবান জানেন এ আমি চাইনি। কিন্তু এখন আর নিজের পক্ষ সমর্থন করার সময় নেই। আমার ছেলে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আবার বেঁচে উঠবে। কিন্তু আমি

পারব না। অর্থাৎ আমার আর কোনো অস্তিত্বই নেই। হয়তো কোনোকালেই আমার অস্তিত্ব ছিল না—প্রতিবিম্ব বা প্রতিরূপ...'

'এই আর একজন।' পাদ্রী ভাবলেন। বিভিন্ন ঘটনায় মানুষের মাথার ঠিক নেই। দিনের পর দিন তাঁকে বহু অসংলগ্ন প্রলাপ শুনতে হচ্ছে।

গির্জা থেকে বেরিয়ে এল ব্রতেই। দম দেওয়া যন্ত্রমানুষের মত দেখাচ্ছে তাকে—লম্বা অস্থিসার চেহারা, মাথায় কালো টুপি, 'মন্ত্রশিষ্য'দের নেতা। একাধিকবার তার আদেশে বহু লোককে অখ্যাত মৃত্যু বরণ করে নিতে হয়েছে। পরলোকে ছেলের সঙ্গে দেখা হবে এই আশা নিয়েই সে বেঁচে ছিল। লোরেনের লোক সে, কিন্তু লোরেন আর নেই। এখন কোনো কিছুই নেই, সব শেষ—'মন্ত্রশিষ্য', শেষ বিশ্বাস, এমনকি শেষ ফরাসী মাটিটুকু পর্যন্ত। রাস্তায় প্রাশিয়ানদের ভিড় আর তাদের ঘড়ঘড়ে ভাষায় কথাবার্তা। যা কিছু পাচ্ছে চালান দিচ্ছে ওরা—সসেজের মোড়ক, জুতো, মোজা, পুতুল, নতুন কনের জন্যে উপহার, ভোজের উপকরণ, দুর্দিনের সঞ্চয়, ফ্রান্সের রক্তমাংস। ফিসফিস করে ব্রতেই বলল, 'মাংসাশী, রক্তপায়ী।'

ভারী ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করছিল, 'লা ভোয়া নুভেল! টাটকা খবর।' অন্তত খবরের কাগজ কেনার কোনো বাধা নেই। কাগজটা খুলে ব্রতেই পড়ল, 'সহযোগিতার নীতি ফলপ্রসূ হচ্ছে।' গতকাল, ফন শাউমবের্গের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে এই প্রবন্ধটা সে নিজেই লিখেছিল। আর এর পরেও আগামী কাল সে লিখবে, 'সহ-যোগিতার নীতি ফলপ্রসূ হয়েছে।' আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ে আর কোনো গণ্ডগোল নেই, বন্দীরা চমৎকার সুখে দিন কাটাচ্ছে। জার্মান বুটের তলায় ফ্রান্সের কোনো দুঃখ নেই। জোলিও সম্পাদক, ব্রতেই লেখক।

লক্ষ্যহীনভাবে সে ঘুরতে লাগল। তারপর এক সময়ে লাউড-স্পীকারের আর্তনাদ শোনা গেল—'বাড়ি ফিরে যাও! সময় হয়েছে!'

পরিত্যক্ত বাড়িতে ফিরে সোফার ওপর ছড়ানো জামাকাপড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ব্রতেই সশব্দে হাই তোলে। তারপর ঠিক করে কাজে বসবে। এক টুকরো কাগজের ওপর ছোট্ট একটা ক্রুশ এঁকে লেখে 'মানবতার ক্লান্তি।' কলমটা রেখে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। শিশুর দোলনাটার সামনে থেমে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—মনের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা, কোনো চিন্তা নেই, কোনো প্রার্থনা নেই। ফিরে এসে আবার বসে টেবিলের সামনে।

তারপর দ্রুত লিখে যায় :

মহামান্য হের জেনারেল ফন শাউমবের্গ সমীপেষু—দ্য গল এবং ইংলণ্ডের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদের ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের দরুন আমি মনে করি যে জার্মান কর্তৃপক্ষের এমন মনোভাব অবলম্বন করা উচিত যাতে জনসাধারণ শান্ত থাকে—এবং এই উদ্দেশ্যে অন্তত সকল বৃহৎ পরিবারস্থিত গৃহিণীদের পারীতে প্রবেশ করবার অনুমতি দেওয়া উচিত।

ব্রিটিশ দালাল, কমিউনিস্ট ও দ্য গল পক্ষাবলম্বীয় ব্যক্তিদের নির্মূল করবার কাজে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। এই সঙ্গে দুষ্ট প্রকৃতির ফরাসী ব্যক্তিদের একটি তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করছি...

অনেকক্ষণ ধরে সে লেখে। টেবিলের ওপর নিশ্চল হয়ে থাকে তার ছায়াটা—বাঁশের ছায়ার মতো খাড়া ও ধারালো।

বিয়াল্লিশ

এতদিন পারীর লোকেরা বাইরে বেরোয়নি। রাস্তায় জার্মান সৈন্যের আবির্ভাবে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছিল না। সকালবেলা আনে বাজার করতে বেরুলো। কোনো কিছু নিয়ে ভাবনা না করার চেষ্টা করছে সবাই। মনকে অন্যমনস্ক করবার ব্যাপারে এক পাউণ্ড আলু বা এক বোতল দুধের সন্ধান করাটা বেশ কাজের। যদিও বা কোনো সময়ে দু-একটা কথা হয়, সেটা হয় হারানো আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে—কেউ স্বামী হারিয়েছে, কেউ ছেলে।

একবার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক বুড়ো বলে উঠেছিল, 'আর ফ্রান্স—ফ্রান্সের কি হল?'

কেউ কোনো জবাব দেয় না, সবাই ভাবে : 'ফ্রান্সও হারিয়ে গেছে!'

পারীর স্তম্ভগুলোর দিকে তাকিয়ে মৃতব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নের কথা মনে পড়ে লোকের। জল আসে চোখে। কবির হাতে নির্বাক বীণা। ফরাসী মার্শালরা মৃত অশ্বের পৃষ্ঠারোহী। পায়রার সঙ্গে কথা বলছে বক্তারা। পুরনো কথা মনে পড়ে লোকের : 'দাঁতে'র স্ট্যাচুর নিচে দাঁড়িয়ে আমি মাদেলিনের জন্যে অপেক্ষা করতাম।'

এই মিথ্যে জীবনের ভার বয়ে চলতে কেউ রাজী নয়। কিন্তু তবুও বেঁচে থাকতে হয়—দাঁড়াতে হয় লাইনে, রান্না করতে হয়, চিঠি লিখতে হয়। চিঠি লেখে সেই সব পুরনো ঠিকানায় যা এখন আর নেই। ডাক অচল। পরিত্যক্ত শহরে শুধু শোনা যায় জার্মান সৈন্যদের বিদঘুটে গান আর ছায়া ঢাকা স্কোয়ারে পাখির কিচির-মিচির।

যে স্কুলে আনে থাকে, তার কাছেই একটা স্কোয়ার। কয়েকটা প্লেন গাছ ছাড়া স্কোয়ারের ভেতর আর কিছু নেই। ছড়ানো গাছগুলোর নিচে দুদু খেলা করে, গুঁড়ো গুঁড়ো সোনার মতো বালি তোলে মুঠো মুঠো। তামাটে ছোট্ট ছেলেটি, পিয়েরের মতই ছটফটে ও চঞ্চল, আনের জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

প্রথমে আনে চেয়েছিল পারী ছেড়ে চলে যেতে। প্রথমেই মনে পড়েছিল দাক্স্-এর কথা, যেখানে তার বাবা থাকে। কিন্তু দাক্সেও জার্মান সৈন্য আছে শুনে ভুরু কুঁচকিয়েছিল। পালিয়ে যাবার শেষ আশ্রয়ও আর থাকেনি। মনে মনে বলেছিল, 'তার মানে জার্মানদের সঙ্গেই বসবাস করতে হবে!'

তার দিন চলত পুরনো জিনিসের দোকানে জামাকাপড়, বইপত্র, এটা-ওটা বিক্রি করে। বুনো জানোয়ারের শীতকালীন ঘুমের মতো বৈচিত্র্যহীন নিঃসাড় জীবন। এই-রকম জীবন তার একার নয়, গোটা পারীর মানুষের। সব জায়গায় এই নিয়ে কথা ওঠে, পারীর জীবন নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে, কেউ দুঃখ জানায়। কিন্তু পারীতে কারও কোনো অনুভূতি নেই। যেন অস্ত্রোপচারের টেবিলে রুগী শুয়ে আছে, ক্লোরোফর্মের ঠুলিটা খুলে ফেলবার ক্ষমতা তার নেই।

একদিন এক গুমোট সন্ধ্যায় দুদুকে বিছানায় শুইয়ে আনে জানলার কাছে বসেছিল। সময় যেন আর কাটতে চায় না। একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল।

এই সময়ে আর কে হতে পারে? ওরা ছাড়া কেউ নয়...জার্মানদের সম্পর্কে সে 'ওরা' ছাড়া আর কিছু বলে না। কেন ওরা এসেছে? একটা চিন্তা খুব স্পষ্টভাবেই তার মনে এল—'মরতে হবে নাকি? কিন্তু আমার যে এখনো বাঁচা দরকার!'

দরজা খুলে দেখল তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে।

'ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে।' যুবক তিনজন বলল।

শূন্য, অপরিষ্কার বসবার ঘরে আনে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

সবচাইতে বড়ো ছেলেটি বলল, 'আমি একজন সৈনিক। ও আমার ভাই আর ও ভাইয়ের বন্ধু। বোভ্যা থেকে আমরা এসেছি। এ পর্যন্ত আমরা নিরাপদেই আসছিলাম, কিন্তু মেট্রোর কাছে ওরা আমাদের আটকাল। আমরা ছুটে গেলাম দরজার দিকে। কত ধাক্কা দিলাম, ঘণ্টা টিপলাম, কিন্তু কেউ এল না। বোধ হয় সবাই পালিয়েছে।'

হঠাৎ নিচের দরজায় প্রচন্ড কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গেল। আঁতকে উঠে আনে ভাবল, এখন কি করা উচিত? হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভাঁড়ার-ঘরে কতগুলো বড়ো বড়ো বাক্‌স আছে। ছেলে তিনটিকে তাড়াতাড়ি বাক্‌সের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেগুলোর ওপরে আশ্রয়-প্রার্থীদের ফেলে-যাওয়া কাপড়চোপড় বিছিয়ে দিল তারপর কি মনে হতেই হঠাৎ দুদুকে কোলে নিয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে।

ভেতরে ঢুকল দুজন জার্মান ও একজন ফরাসী।

'কে থাকে এখানে?'

'আমি। আর আমার এই চার বছরের ছেলে।

'আর কেউ?'

'খুঁজে দেখতে পারেন...'

ফরাসী লোকটি প্রথমে ঘরটায় ঢুকে দেওয়াল-আলমারিটার ভেতর দেখল, তারপর কি মনে করে টেবিলের ওপর রাখা বইটা তুলে নিল। জার্মান দুজনের একজন বিনীতভাবে বলল, 'ক্ষমা করবেন, মাদাম। ভুল হয়ে গেছে।'

ওরা চলে যাবার পর দুদুকে বিছানায় শুইয়ে দিল আনে। দুদু ভীষণ চিৎকার করছিল—মাঝে মাঝে অকারণেই ও এ রকম করে। তারপর সে গেল ভাঁড়ার-ঘরে। প্রথমে বেরিয়ে এল একেবারে ছোট ছেলেটি, নাম জাক।

'আমার ভয় হচ্ছিল যে আমি হয়তো হেঁচে ফেলব। ভেতরে এত ধুলো যে ঝাঁটা আটকে যাবে!' জাক হাসল।

'দেখি তোমাদের কিছু খেতে দিতে পারি কিনা।' আনে বলল।

কপালগুণে তখনো কিছুটা ঝোল, ছোট রুটি আর খানিকটা সালাড ছিল।

এক টুকরো রুটি চিবোতে চিবোতে সৈন্যটি বলল, 'কাল থেকে কিচ্ছু খাওয়া হয়নি।'

'এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করো।' আনে বলল।

'না। ঘণ্টাখানেক এখানে থাকব! যতক্ষণ না গোলমালটা থেমে যায়। তারপর আবার আমাদের যেতে হবে। অন্তত শার্ৎরে পর্যন্ত আমরা যেতে চাই। সেখানে লোক আছে। সে আমাদের বার করে দেবে।

'কিন্তু শার্ৎরে থেকেই বা যাবে কোথায়? এমন জায়গা কোথায় যেখানে জার্মানরা নেই?'

পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল তিনজনে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই জানতে চাইছে কথাটা আনের কাছে ভেঙে বলা উচিত কিনা।

সৈন্যটি বলল, 'আমরা কিছু বলব না। কিন্তু আপনি ফরাসী মহিলা, আপনি বুঝতে পারবেন। আমরা যাচ্ছি লণ্ডনে, জেনারেলের কাছে, যুদ্ধ করতে।'

আনে বোকার মত বলল, 'কিন্তু সন্ধি তো হয়ে গেছে।'

ভীষণ রেগে উঠে জাক চিৎকার করে উঠল, 'কারা করেছে সন্ধি? বিশ্বাসঘাতকরা!'

'আস্তে! আস্তে!' তারপর আনের দিকে ফিরে সৈন্যটি বলল, 'যুদ্ধ শেষ হয়নি। আমি ডানকার্কে ছিলাম। আমার ভাই আর জাকের তখনো সৈন্যদলে ডাক পড়েনি। কিন্তু এখন সমস্ত সৎ লোককে এগিয়ে আসতে হবে যুদ্ধ করবার জন্যে। ফ্রান্সের কি অবস্থা দেখুন! বোভ্যাতে...এসব কথা থাক এখন...না, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। জেনারেল দ্য গল সবাইকে ডাক দিয়েছেন। রেডিওতে তার বক্তৃতা আমরা শুনেছি। শার্ৎরে থেকে ব্রিটানিতে যেতেই হবে আমাদের। সেটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়—বহু জেলে নৌকা পাব। আসল কাজ কোনো রকমে পারীর বাইরে যাওয়া। আমার একটা জামা আর ক্লোক আছে বটে কিন্তু এগুলো...'

বলে সে তার ফৌজী পাজামার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। ব্যস্ত হয়ে আনে খোঁজা-খুজি জুড়ে দিল। আশ্রয়প্রার্থীদের ফেলে-যাওয়া কাপড়চোপড় থেকে কয়েকটা পাজামা উদ্ধার করে আনল সে। গায়ে ঠিক হয় কিনা দেখবার জন্যে পরে দেখল তিনজনে। হেসে উঠল সবাই। একটু ছোট, কিন্তু কাজ চলবে।

হঠাৎ আনে বলল, 'আমার স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন। যুদ্ধজয়ে আমাদের লাভ কি?' আনের মনে হল সে পিয়েরের সঙ্গে তর্ক করছে, উত্তেজিত হয়ে বলে চলল, 'আসল কথাটা কি জান? তা হচ্ছে আত্মা। কিন্তু লোকে শুধু যুদ্ধক্ষেত্র আর মানচিত্রের কথাই ভাবে...'

'সে আত্মাকে আমরা চিনেছি!' জাক চিৎকার করে উঠল। (আবার সৈন্যটি বলল, 'আস্তে!') 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মা! মানচিত্রে কি ফ্রান্স নেই? আছে খুব স্পষ্টভাবেই আছে। ফ্রান্স না থাকলে আমি বাঁচব না। আঠারো বছর বয়স আমার, বেঁচে থাকতে চাই আমি, ভীষণভাবে বেঁচে থাকতে চাই...আমরা যদি মরে যাই তো ক্ষতি কি? আর একজনের প্রাণ বাঁচবে। আপনার একটি ছেলে আছে। সেই ছেলেই তো ফ্রান্সের প্রতীক, নয় কি?'

আনে মাথা নাড়ল, এখনো তার মত বদলায়নি। কিন্তু ছেলে তিনটিকে বিদায় জানাবার সময় গভীর আবেগে তিনজনকেই সে চুমু খেল। জল এল চোখে।

তারপর দুদুর বিছানার পাশে বসে সে কাঁদতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের কান্না, কিন্তু তার মনে হল যেন অনেকক্ষণ কেটে গেছে। হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে জানালার কাছে ছুটে এল আনে। খুব কাছেই দুবার গুলির শব্দ হয়েছে। ঘুম থেকে জেগে উঠে দুদু কাঁদতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দে দরজা ভেঙে জার্মান সৈন্যরা ছুটে এল ঘরের ভেতর।

ফরাসী পুলিশটিকে আনে চিনল, আগের বারেও সে এসেছিল। 'এই সেই!' চিৎকার করে উঠল পুলিশটা। জার্মান অফিসারটি কি যেন বলতে দুজন সৈন্য এগিয়ে এসে জাপটে ধরল তাকে। অফিসারটি ফরাসী লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, 'লোকগুলো পালাতে পারল কি করে?' দুদু কাঁদছিল। সৈন্যরা আনেকে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। দু হাত মুচড়ে ধরা সত্ত্বেও আর কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না, ভয়ও নয়। হঠাৎ একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল: 'দুদুর কি হবে?' অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

জার্মান অফিসারটি ধমকে উঠল, 'চুপ মাগী। আমরা তোর সোহাগের লোক নই!'

রাত্রিটা যেন আজ বেশি রকম অন্ধকার। আনের মনে হল যেন সে অরণ্য দেখছে—বাড়িগুলো যেন গাছ। একটা লম্বা সরু রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। চামড়া, কপি আর প্রস্রাবের গন্ধ! একটা খালি কামরার ভেতর তাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। 'এটা তো জেলখানা নয়,' ভাবে সে। কি ছিল এখানে? মেঝের ওপর কালির দাগ। হয়তো একটা স্কুল?...মনে হয় পিয়েরের তামাটে মুখটা যেন সে দেখতে পাচ্ছে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে পিয়ের তাকিয়ে রয়েছে খাতার দিকে আর চুমু খাচ্ছে তাকে। কী-ঝলসানো আলো!

একেবারে কড়িকাঠের সঙ্গে লাগানো। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝের ওপর সে বসে। মনে পড়ে, বাড়িতে দুদু একা রয়েছে। মনে পড়তেই দারুণ হতাশা আসে, আচমকা অজ্ঞান হয়ে পড়বার মতো ভারী আর বিশ্রী বোধ হয় শরীরটা। হঠাৎ সে কেঁপে ওঠে—দেওয়ালের গায়ে কি যেন লেখা রয়েছে, হাতের নখ বা পিন দিয়ে লেখা : 'বিদায় মা! বিদায় ফ্রান্স! রোবের।' আর ঠিক এই লেখাটার নিচে কেন সে লিখতে চাইছে—"বিদায় দুদু"? কেন তার মনে হচ্ছে যে এই কথা দুটো লিখতে পারলেই সে আরাম বোধ করবে? কিন্তু তার কাছে পিন নেই। হাতের ছোট ছোট নখের দিকে তাকিয়ে তার কান্না পায় হঠাৎ আরেকটা চিন্তা আসে—'ওরা বলাবলি করছিল যে তিনজনে পালিয়ে গেছে। তার মানে ওরা ধরা পড়েনি। ওদের জেনারেলের কাছে যেতে পারবে ওরা। চমৎকার ছেলে জাক।' মনে হতে থাকে, তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে ওরা পালাতে পেরেছে।

জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। জার্মান অফিসারটি ভালো ফরাসী বলতে পারে; দোভাষীর দরকার হল না। অফিসারটি প্রথমে কতকগুলো অপ্রাসঙ্গিক কথা তোলে : 'দু বছর আমি গ্রেনোবল-এ কাটিয়েছি। ভারী সুন্দর শহর।' লোকটির কথাবার্তা অত্যন্ত ভদ্র, আনেকে সে সান্ত্বনা দেয়—'আপনার ছেলে যত্নেই আছে।' তারপর সে চেষ্টা করে আনের মুখ থেকে কথা বার করতে—'আচ্ছা বলুন তো ওই লোক তিনজন কে? বললেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

আনেকে চুপ করে থাকতে দেখে সে চটে ওঠে : 'মাদাম, নষ্ট করবার মতো সময় আমার হাতে নেই। আপনি চুপ করে আছেন যে? তার মানে আপনি ইংরেজদের চর।'

আনে ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ'। চোখের দৃষ্টি হল স্নেহমাখা, ঠিক যেমনটি হয়েছিল পিয়েরের তর্জন গর্জন শুনে বেলভিলের জানলার নিচে দাঁড়িয়ে। বলল, 'হ্যাঁ। আমি চর। কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছ? সবাই তোমাদের বিরুদ্ধে। এমনকি বাচ্চারা পর্যন্ত। আমি বলব না এই তিনজন কে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোমরা ওদের ধরতে পারনি। সেটাই বড় কথা, এখন তোমরা ইচ্ছে করলে আমাকে মেরে ফেলতে পার। আমি আর কি কাজে আসব? বন্দুক ধরতে পর্যন্ত জানি না আমি।'

এখন তার মনে হল সে মরতে পারে। মনের এই ভাব তার উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনল। এই কিছুক্ষণ আগেও তিনটি ছেলের সঙ্গে সে তর্ক করেছে। আর এখন তার মনে হচ্ছে যে এই লালচে রঙের ফিটফাট অফিসারটির সামনে দাঁড়িয়ে একবারও না থেমে সেই ছেলে তিনটির কথা বারবার বলে যেতে পারে। কেমন পরিপাটি সিঁথি জার্মান অফিসারটির!

জার্মানটি কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। দোয়াতদানিটা ঠেলে সরিয়ে বলল, 'থাক, আর জাহির না করলেও চলবে। আপনাকে এখানে বক্তৃতা দেবার জন্যে ডাকা হয়নি। আপনি শুধু যেটুকু খবর জানেন বলবেন। ভালো চান তো জবাব দিন। আপনি ওদের চেনেন?'

'চিনি।'

'কে এরা?'

'ফরাসী!'

প্রচণ্ড রাগে অফিসারটির কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। সাধারণত তার ব্যবহার খুব ভদ্র, অমায়িক ব্যবহারের গুণে এই বছরখানেক আগেও সে সুইন্‌মণ্ড-এর মেয়েদের মুগ্ধ করেছে —কিন্তু আজ হঠাৎ সে ছুটে এসে আনেকে মুখের ওপর মারল। আনে কাঁদল না, নিজের অজান্তেই হাতটা উঠে এল মুখের কাছে, তারপর রক্তমাখা হাতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মানুষের ভেতরে যে-সব জন্মগত অনুভূতি থাকে তার বাইরে চলে গেছে সে এখন।

কোনো রকম ব্যথা সে টের পাচ্ছে না, এই ফিটফাট সেন্টমাখা অফিসারটির পশুর মতো ব্যবহারেও সে ক্ষুব্ধ হয়নি। কেমন একটা আপনভোলা বৈরাগ্য ও উল্লাস তাকে অভিভূত করেছে। আপন মনেই সে বলে চলেছে, 'ভালোবাসি, ভালোবাসি দুদুকে, ভালোবাসি পিয়েরকে, ভালোবাসি বাবাকে, ভালোবাসি জাককে, ভালোবাসি রোবেরকে, ভালোবাসি অন্য সবাইকে যারা গত কয়েকদিনে পারীর শেকলজড়ানো রাস্তায় টেনে টেনে পা ফেলে এগিয়ে গেছে।' তাদেরই একজন তাকে বলেছে, 'বিদায়!' 'না', মনে মনে সে বলে 'বিদায় নয়, বলতে হবে কেমন আছ, ভালো তো? আবার আমাদের মিলন হয়েছে! মিলন পিয়েরের সঙ্গে, মিলন পারীর সঙ্গে।'

বারান্দায় বসে এই কথাগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে সে। কর্নেলের কাছে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। কর্নেলের চিবুকে একটা কাটা দাগ, মাছের মতো চোখদুটো চরকিপাক খাচ্ছে। আনেকে বসতে বলল সে।

বলল, 'আমি আপনাকে বাঁচাতে চাই। আপনি শুধু বলুন, লোক তিনজন কে? নিজের ছেলের জন্যেও কি আপনার এতটুকু দরদ নেই? আমিও সন্তানের বাবা—দুটি মেয়ে আছে আমার।'

আনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। এই কথাগুলো তাকে অন্য এক জগৎ থেকে ফিরিয়ে এনেছে, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এই রকম চাপা গলায় সে বলে, 'ছেলের জন্যে কি আমার দুঃখ হচ্ছে? না। আজ আমি সবকিছু বুঝেছি। একজনের জীবন দেওয়া মানে অন্য একজনকে বাঁচানো। অন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বাঁচবে। জনসাধারণ...আমার দেশের জনসাধারণ...' হঠাৎ মনে পড়ে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। গোলগাল কাঁধদুটো টান হয়ে যায়, পিঠটা লোহার রডের মতো খাড়া হয়ে ওঠে, কথা বলে অন্য সুরে : 'আপনি নিজেকে সন্তানের বাবা বলছেন? কথাটা সত্যি নয়। শুনতে চান আপনি কি? আপনি হচ্ছেন জার্মান-পিশাচ! জার্মান-পিশাচ!'

শান্ত্রীকে ডেকে কর্নেল হুকুম দেয় : 'নিয়ে যাও ওকে।'

তারপর আনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে 'মাদাম', শেষ সময় উপস্থিত আপনার।'

কর্নেলের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আনে জবাব দেয়: 'ফ্রান্সের শেষ সময় নয়। শেষ হয়নি হতে পারে না।'

তেতাল্লিশ

দেনিস ছুটে যায় না, জড়িয়ে ধরে না। শুধু জলভরা চোখে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে যেমন ভয় তেমনি আনন্দ।

মিশো হাসছে। বোকার মতো হাসছে। তারপর বলে, 'কী হল দেনিস?'

দেনিসের সঙ্গে দেখা হওয়ার এই মুহূর্তটির জন্যে মিশো উদগ্রীব হয়ে ছিল। ন'দিন আগে শান্ত্রীকে একটা পাথর ছুঁড়ে সে মারে। রোদে পোড়া গরম পাথর। পড়ে গিয়ে লোকটি আর ওঠেনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা খানার ভেতর সে লুকিয়ে ছিল।

এক বৃদ্ধা তাকে কিছু জামাকাপড় দিয়েছিলেন, সকাল পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে থাকতেও বলেছিলেন। সাদা দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মিশো বসে ছিল আর বৃদ্ধা তার

জামার বোতাম বদলে দিয়েছিলেন। বোতামগুলো তাঁর মৃত স্বামীর, তিনি ছিলেন 'পাত্রোনাজ কাতোলিক্ দ্য স্যাঁ—জুস্ত'-এর পরিচালক। খবরের কাগজের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে বৃদ্ধা বলেছিলেন যে খবরের কাগজ তিনি পড়েন না কারণ কাগজগুলো সব জার্মান হয়ে গিয়েছে। ঘড়ির ঘণ্টা বেজেছিল অনেকক্ষণ পরে পরে। দুজনের কেউ ঘুমোতে চায়নি। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা হয়েছিল, কিন্তু সে-সব কথাও খাপছাড়া আর এলোমেলো। অদ্ভুত।

মিশো বলেছিল, 'তার নাম ল্যাগ্র্যা। সেও ছিল কমিউনিস্ট...'

'আমি অন্য জগতের মানুষ। আমি ধর্মবিশ্বাসী। কিন্তু হিটলার...'

'হিটলারকে আমি ঘৃণা করি!'

'সে জন্যেই তো তোমাকে ঘরে ডেকে আনলাম। স্যাঁ জুস্ত-এ ওরা নোটিশ টাঙিয়েছে। বন্দীদের যে কেউ সাহায্য করবে, গুলি করে মারা হবে তাকে।'

'ওরা আমাকে মারবার জন্যে বাইরে নিয়ে এসেছিল। তারপর একদিনের জন্যে পেছিয়ে দিয়েছিল। তখন সবে ভোর হয়েছে। পাখির...'

'আমার বয়স আটান্ন। কোনো রকমে দিনও কাটাচ্ছি, কিন্তু তবুও তো জীবন। সমস্ত ওলোটপালোট হয়ে গেছে। আমার স্বামী মনে করতেন যে তোমরা কমিউনিস্টরাই দেশের সর্বনাশ ডেনে আনবে। আমারও তাই ধারণা ছিল। তখনকার দিনে হয়তো এই ধারণাই ঠিক। কিন্তু এখন...আমি 'লোরদে' কাগজ নিতাম। দুকান লিখেছিল যে কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক।'

'দুকান কথাটা বড় দেরিতে বুঝেছে।'

'কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই বড় দেরি করেছ, আর ইতিমধ্যে জার্মানরা এসে গেছে। এখন আমি ভাবি, সত্য কি—সাময়িক সত্যের কথা বলছি না, চিরকালের সত্য।'

কথাটা বলে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টমূর্তির দিকে তাকিয়েছিলেন বৃদ্ধা। আবছা ভোরের আভাস এসেছিল জানলার ফাঁক দিয়ে। দেনিসের কথা—উচ্ছল জীবন্ত দেনিসের কথা—ভেবেছিল মিশো। তারপর টুপিটা হাতে নিয়ে বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আর এখন তার পাশেই দেনিস। তবুও দেনিসের মুখে হাসি নেই। দেনিসকে চুমু খেল মিশো। তবুও ঠান্ডা নিরুত্তাপ ঠোঁট দেনিসের।

'দেনিস! হল কি তোমার? এই দেখ আমি চলে এসেছি। পালিয়ে এসেছি ওখান থেকে!'

কান্নাভরা গলায় দেনিস বলল, 'মিশো, তুমি যখন আমাকে চুমু খেলে, আমার কেমন ভয় হল। বেঁচে আছি বলে বিশ্বাস হয় না আমার। বুঝতে পারলে না কথাটা? আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কেন জানি না আমার মনে হয় আমরা সবাই মরে গেছি, কিন্তু তবুও বেঁচে থাকবার ভান করছি। করতে হচ্ছে কারণ জার্মানদের আদেশ বেঁচে থাকতে হবে।'

মিশো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। এও সে স্বীকার করতে চাইল না যে আরাস-এর ঘটনার পর একথা সে নিজেও অনেকবার ভেবেছে। আর যতবার ভেবেছে, নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে ভীরুতার জন্যে। দেনিসের চিন্তাতেই এতকাল বেঁচে ছিল সে। তার ধারণা ছিল, দেনিস তার কাছে আসবে মুখে হাসি নিয়ে, শরীরে উত্তাপ নিয়ে, আর জীবন নিয়ে। দেনিসের নৈরাশ্য দেখে বিমূঢ় বোধ করল মিশো, নিঃশব্দে তার হাতটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

পোর্ৎ দ্য ভার্সাই-এর কাছাকাছি ছোট্ট লোহার দোকানটার ভেতরে দুজনের কথা হচ্ছিল। এখানেই দেনিস আর ক্লোদ ইস্তাহার ছাপে। মিশোর সঙ্গে দেখা হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেনিস শান্ত থেকেছে, ক্লোদের সঙ্গে কথা বলেছে সংগ্রাম শক্তি ও জয় সম্পর্কে। এখন মিশো আর সে ছাড়া কেউ নেই।

'কে'দো না, দেনিস,' মিশো বলল।

ঘরে ঢুকল ক্লোদ। মিশোকে সে প্রথমে দেখতে পায়নি। উত্তেজিতভাবে সে বলতে লাগল, 'কাল টাইপ্ পাওয়া যাবে। বুঝেছ?' তারপর হঠাৎ সে চে'চিয়ে ওঠে, 'মিশো! তুমি! আর আমাদের চিন্তা নেই! দেনিস, আমরা বে'চে গেলাম। বুঝেছ?'

মিশো এসে গিয়েছে তার মানেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। ক্লোদ তাই মনে করে। ক্লোদের আনন্দ দেখে মিশো আত্মশক্তি ফিরে পেল। সে বুঝতে পারল যে এতদিন ওরা তার অপেক্ষাতেই ছিল। নিজের জন্যে লজ্জিত বোধ করতে শুরু করেছিল সে। আর দেনিস ভাবছিল যে ওর জন্যেই মিশোর এই লজ্জা।

মিশো বলল, 'আমরা আবার কাজ শুরু করে দেব। ক্লোদ আমাদের সঙ্গে থাকাতে ভালো হয়েছে। আর ক্লোদ, এটা তোমার মস্ত কৃতিত্ব যে তুমি টাইপ যোগাড় করতে পেরেছ। এবার আমরা ইস্তাহার ছাপাতে পারব।'

'বড় জোর পাঁচশো।' দেনিস খেদের সঙ্গে বলে।

'এই দিয়েই শুরু করব। আর পাঁচশোই বা মন্দ কি! আমাদের আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। লুমানিতে পাঁচ লক্ষ বিক্রি হত, কিন্তু তবু আমরা হেরে গেলাম। এই সময়টুকুর জন্যে যে ক্ষতি হল তা পূরণ করে নিতে হবে আমাদের। ভালো লোক যারা আছে তারা সবাই বিভ্রান্ত। দুষ্কৃতিকারীদের জয় হচ্ছে। দোরিওর কাগজটা আজ দেখলাম। লোকটা ময়ূরের মতো পেখম ছড়িয়েছে। মনে হবে ও-ই পারী জয় করেছে। এসব মেনে নিতে হবে। ফ্যাশিজম-এর যুগে বে'চে থাকার অর্থটা কি বুঝতে পার? ইতিহাসের একটা যুগ হিসাবে এর ওপর হাজার হাজার বই লেখা হবে। এই একশো বছরের মধ্যেই...কিন্তু আমরা এই যুগেই বে'চে থাকব এবং জয়লাভও করব। আমি বলছি দেনিস, জয় আমাদের হবেই, ঠিক তাই!'

মিশোর হাতটা চেপে ধরে দেনিস, বলে, 'মিশো!'

মিশোকে দেখে এতক্ষণে দেনিসের মনে হচ্ছে, এই তার আগেকার চেনা মিশো। তার মানে দেনিস নিজেও বে'চে আছে। বে'চে আছে পারী। এত কিছুর পরেও বে'চে থাকা সম্ভব। বে'চে থাকা এবং জয়লাভ করা...

ক্লোদ বলল, 'ওদের শক্তি কিন্তু বিরাট। রোজ রাতে সৈন্য চলাচল করে। এখন ওরা চলেছে দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের দিকে। ইংলন্ড জয় করতে চায় ওরা।'

মিশো হাসল, 'ওরা চায়, কিন্তু দেখতে হবে ওরা পারবে কিনা। ওরা কি পারী জয় করেছিল? পারীকে সোজাসুজি ওদের গ্রাসে তুলে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক চার্চিল পেত্যাঁ নয়। আমি বলছি না যে জার্মানদের বিরাট শক্তি নেই। আমি দেখেছি কী প্রচুর পরিমাণ ট্যাঙ্ক আছে ওদের। আর আছে ওদের সংগঠন। ঠিক জার্মান রীতিতেই সব কিছু চলে। কিন্তু ওদেরও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, থাকবেই। হয়তো ইংলণ্ডে কিংবা অন্য কোনো জায়গায়। কোথায় আমি জানি না, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই হবে ওদের। আমাদের শক্তি অনেক বেশি।'

দেনিস চোখ তুলে তাকাল, 'কি করে আমাদের শক্তি অনেক বেশি?'

'হিসেব করে দেখ। ইংলন্ড—অর্থাৎ, নৌশক্তি, রাজকীয় বিমানবিহানী, জনসাধারণ। আমেরিকা। তারপর আছে জার্মান অধিকৃত দেশগুলো। এক এক করে ধর—নরওয়ে, হলান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পোলান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া। দেখ, গুনে গুনে সাতটা হল। এসব দেশের সেনাবাহিনী নেই বটে কিন্তু দেশের জনসাধারণও একটা বড়ো শক্তি। আর তুমি কি মনে কর জার্মানিতে আমাদের নিজেদের লোক নেই? আছে। দেখ না কি হয়। আর আসল শক্তি হচ্ছে রাশিয়া।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে তো অনাক্রমণ চুক্তি আছে,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লোদ বলল।

'তাতে কি হয়েছে? দেখো, হিটলার নিশ্চয়ই ওদের আক্রমণ করবে। এতবড় শক্তির অস্তিত্ব হিটলার কখনো মেনে নিতে পারে? একথা তো শিশুও বোঝে। রাশিয়ানরা ওদের খানিকটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। লালফৌজকে আমরা দেখতে পাব দেনিস। নিশ্চয়ই পাব।'

'বল, ঠিক তাই!' দেনিস হাসে।

'নিশ্চয়ই বলব—ঠিক তাই!'

কাগজ আনবার জন্য ক্লোদ বেরিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে মিশোর কথাগুলো সে ভেবে দেখল। মিশো যখন বলেছে না হয়ে যায় না। অর্ধমৃত পারী শহরের নোংরা পরিত্যক্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনের খুশিতে ক্লোদ হাসতে লাগল। হাসল জার্মান সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে। আসলে সে কিন্তু ওদের দেখছিল না, দেখছিল অন্য কিছু—সাদা কুয়াশার মাঝখানে ছোট একটা লাল তারা। বাড়াবাড়ি অসুখের দরুন আর নানা দুঃখকষ্টে রোগা শুকিয়ে-যাওয়া শরীর, তবুও শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠল সে। তারপর পকেট থেকে এক টুকরো খড়ি বার করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সামনের ছাইরঙা দেওয়ালের গায়ে লিখল, 'হিটলার শুরু করেছে, স্তালিন শেষ করবে।' লেখাটা শেষ করে রাস্তার নীল অ্যাস্-ফল্টের ওপর বসে থাকা কালো পাখিটার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। দোকানে লোক নেই। মিশো এবং দেনিস পরস্পরের বাহুবেষ্টনে নিঃশব্দে বসে আছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেনিস বলল, 'পারীর যে কি অবস্থা তা তুমি জান না। কাল একজন জার্মানকে দেখলাম রিভলবার দিয়ে একজন শ্রমিকের মাথায় বাড়ি মারতে। লোকটি পড়ে গেল, কিন্তু জার্মানটা ফিরেও তাকাল না। লণ্ডন বেতার শুনেছে বলে জেমিএকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। দু দিন সমানে অত্যাচার চলে ওর ওপর। একজন জার্মান অফিসার এসে মারিকে বলল,—'তোমার বাবার জামাটায় রক্ত লেগে গেছে। একটা নতুন জামা দাও।' নতুন জামা এনে দেবার পর অফিসারটি জামাটা নিয়ে চলে গেল। তারপর এক সময়ে ফিরে এসে বলল—'তুমি এখনো রয়েছ? কার জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি? তোমার বাবা অনেক আগেই ইংরেজদের স্বর্গে চলে গেছে। মিশো, ওরা কি মানুষ?'

'না। ওরা ফ্যাশিস্ট। আমিও ঠিক এমনি দৃশ্য দেখেছি। একটি শিশুকে ওরা খুন করেছিল। আচ্ছা ওকথা বরং থাক। কিন্তু আমি বলছি দেনিস, সুখের দিন আসছে, খুবই সুখের দিন! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? জয়লাভ যে আমাদের নিশ্চিত সেটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে। রাতের পর যেমন দিন, শীতের পর যেমন বসন্ত—তেমনি সহজ সত্য এটা। এ না হয়ে পারে না। আমাদের পক্ষে বিরাট জনসাধারণ, জীবন দিতেও তারা প্রস্তুত। কিন্তু ওদের দলে কারা? ডাকাত কিংবা বদমাইশ। নিশ্চয়ই আমরা জিতব! তারপর আসবে সুখের দিন। সেই দিনের জন্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই! মোটা সাধারণ সুখ, সামান্যতম সুখও যদি হয় তবুও—সহজভাবে বেঁচে থাকা, পায়ের শব্দ শুনেই ভয় না পাওয়া, সাইরেনের আর্তনাদ না শোনা, ছেলেমেয়েদের আদর করা আর ভালোবাসা—যেমন ভালবাসা আছে তোমার-আমার মধ্যে····সুখের দিন আসবে····'

গম্ভীর স্বরে বরদান করবার মতো দেনিস বলল, 'তথাস্তু।'

চয়াল্লিশ

সকালটা বেশ গরম। আঁদ্রে অনেকক্ষণ স্টুডিওর ভেতরে কাটাল। বাইরে যেতে ভয় হচ্ছিল। গতকাল লরিঅ নাকি খুন হয়েছে। কে যেন চিৎকার করে বলেছিল 'ইহুদী!' আর তারপরেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে লরিঅর অন্ধ চোখের ওপর থেকে কালো ব্যাণ্ডেজটা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলেছিল।

সারা রাত আঁদ্রে স্টুডিওর ভেতরে পায়চারি করেছে। আর বারবার প্রশ্ন নিজেকে করেছে—কি লাভ হল সেই পাহাড়ের জন্যে যুদ্ধ করে! কি লাভ এই বন্ধুত্বে? আঁদ্রে পার পেয়েছে, কিন্তু লরিঅকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এক-চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে এই ভয়ংকর শহরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। আর বিশ্বাসঘাতক।

কিন্তু তবুও আঁদ্রে কেন আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল? কেন সে ঘুরে বেড়াতে লাগল এই ঘৃণ্য শহরের রাস্তায় রাস্তায়?

সমস্ত বিরূপ মনোভাব ছাপিয়ে তার প্রিয় শহরের সৌন্দর্য আবার তাকে মুগ্ধ করেছে। এত কলঙ্ক সত্ত্বেও পারী এখনো সুন্দর। আঁদ্রের হাত দুটো মুঠো করা, কিন্তু চোখে সে যা দেখছে তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারছে না। ইল্ স্যাঁ লুই-এর সারি সারি থমথমে বাড়ি, লেথ-এর মতো চিররহস্যময়ী সিয়েন নদীর জল, আবছা ফ্যাকাশে আকাশ—অভিভূত হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। খানিকটা সান্ত্বনাও পেল যেন। মনে মনে ভাবল, এ ছাড়াও অন্য অনেক জিনিস আমরা দেখেছি। আমরা আছি, আমরা থাকব। আমরাই হলাম লুটেশিয়া জাহাজ, আমরাই পারী নগরী।

শাংলে পর্যন্ত সে হেঁটে গেল। অদ্ভুত লাগছে তার—এত নিঃশব্দ রাস্তায় সে অভ্যস্ত নয়। মোটরগাড়ি নেই। লোকে হাসে না, চাপা গলায় কথা বলে। রু দ্য রিভোলির খিলানের নিচে ধপ্ ধপ্ শব্দ হচ্ছে— জার্মান সৈন্যরা ঢুকছে দোকানে বা রেস্তোরাঁয়, এমনভাবে পা ঠুকছে যেন এটা কুচকাওয়াজের ময়দান। মেয়েদের চেহারা আগের চেয়েও ফ্যাকাশে। হয় তারা প্রসাধন করে না, কিংবা সত্যিই তাদের শরীর খারাপ। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে আরও বেশি সাদাসিধে হতে, আরও কম নজরে পড়তে, আরও নগণ্য হতে। কীটের মতো, আঁদ্রে ভাবল। যেন আত্মাহীন শরীর—পারীর কঙ্কাল। কিন্তু পারী এ নয়, এ অন্য এক বিদেশী শহর।

হঠাৎ শিঙার শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। প্লাস দ্য লোপেরা-তে যে সে পৌঁছে গেছে তা এতক্ষণ টের পায়নি। পাঁশুটে সবুজ রঙের পোশাক পরা জার্মান বাদকদল রঙ্গমঞ্চের সিঁড়ির ওপরে বসে শিঙা বাজাচ্ছে। জার্মান সামরিক বাদ্যে কোথায় যেন ভীষণ রকমের একটা দৈন্য আছে, অনেকটা খিলানের নিচে বাউণ্ডুলেপনার মতো—কুচকাওয়াজের তালে বাঁধা জীবনের তাল-ঠোকা। কাফের বারান্দায় বারান্দায় খানাপিনায় ব্যস্ত জার্মান অফিসার, তদের ঘিরে রয়েছে অতিরিক্ত রঙচঙে সাজপোশাক পরা মেয়ের দল। কিন্তু ঠিক আগের মতোই পারীর আকাশ।

একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আঁদ্রে দাঁড়াল। চোখের সামনে কী ঘটছে কিছুই সে বুঝতে পারছে না। আবার কেমন একটা ভোঁতা আচ্ছন্নভাব তাকে পেয়ে বসেছে। টুকরো টুকরো এলোমেলো কতগুলো ছবি ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে—এক চোখে লেন্স লাগানো একজন অফিসার, ফোয়ারার জলকন্যা-মূর্তি আর তার হাতের শূন্য পাত্র, তুইয়েরিসের রাস্তায় লম্বা লম্বা ঘাস, আর একটা পাহাড়, সেই যে পাহাড়····

একটি মেয়ের চিৎকারে সে সজাগ হয়ে উঠল। মেয়েটি সান্ধ্য কাগজ বিক্রি করছে। বিরক্ত হয়ে সে সরে যেতে বলল মেয়েটিকে। ষড়যন্ত্রকারীর মতো চাপা গলায় ফিসফিস করে মেয়েটি বলল, 'আমি জানি। কি করব, বাড়িতে আমার একটা ছোট্ট বোন আছে।'

মেয়েটিকে পয়সা দিয়ে কাগজটা সে মেলে ধরল। তারিখটার ওপর চোখ পড়তেই কিন্তু না হেসে থাকতে পারল না। ১৪ই জুলাই। বোধ হয় এই জন্যেই জার্মানরা শিঙা ফুঁকছে। আজ যে ছুটির দিন তা কারো মনে নেই। কেউ দাঁড়িয়ে আছে দুধের লাইনে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে।

একদিন এই পারীই বাস্তিল কারাগারকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল····

আরেক রাত্রির কথা মনে পড়ল—নাগরদোলা, চকচকে নীল হাতি, বাদাম গাছ আর চীনে লণ্ঠনের ঝাড়। জেনেৎ এখন কোথায়? সে কি এই অভিশপ্ত শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে? পরিচিত ঘরবাড়ি কি তার চোখে পড়ছে না? বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হয়ে বারবার দেখা হচ্ছে পাঁশুটে সবুজ জার্মানদের সঙ্গে? না কি সে পালিয়েছে কোনো নিরাপদ জায়গায়? কিন্তু এত দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়? নিরাপদ জায়গা কি আছে? 'প্রতারিত আমি তাই মৃত্যুপথগামী!' তখনকার দিনে এটা ছিল বিজ্ঞাপনের ভাষা। কেউ বুঝতে চায়নি যে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে রাত্রির আকাশের তলায় বসে বসে কেঁদেছে—আর রাস্তার ধুলো ও রক্ত মাখা মৃত ফ্রান্সেরও কান্না উঠেছে সেই সঙ্গে সঙ্গে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সে স্টুডিওর সিঁড়ি দিয়ে উঠে জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সামনে রু শেরস মিদি। জার্মান সৈন্যরা মার্চ করে চলেছে। যোসেফিন তাকে বলেছে, 'রেস্তোরাঁটা আবার খুলব ভাবছি। খেয়ে বাঁচতে হবে তো।' কথাটা বলে সংকুচিত হয়ে তাকিয়েছে আঁদ্রের দিকে—আঁদ্রে যে কিছু বলল না সেটা যেন তার পক্ষে অপমানজনক। হ্যাঁ, এবার থেকে ও জার্মানদের জন্যে খাবার তৈরি করবে। মুচিরা সেলাই করবে জার্মানদের জুতো। ফুলের দোকানের মেয়েটি মারা যাবে আর সে জায়গায় আর একজন এসে ফুলের তোড়া তুলে দেবে এক চোখে লেন্সলাগানো এক জার্মান অফিসারের হাতে। কিন্তু রাস্তাগুলো পারীর রাস্তাই থাকবে। এই চক্র থেকে কারো রেহাই নেই। দেওয়ালের ওই হুকটার গায়ে দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়লেও কিছু যায় আসে না। এই ছাইরঙা দেওয়ালের গায়ে কালো বিন্দুটা থেকে আঁদ্রে কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না।

হঠাৎ দরজায় টোকা শুনে কেমন যেন বিব্রত হয়ে ওঠে সে : যেন কেউ তাকে কোনো একটা অন্যায় করতে দেখে ফেলেছে। দরজার কাছাকাছি পৌঁছবার পর তার মনে চিন্তাটা আসে—কে হতে পারে? যদি জার্মানরা হয় কিন্তু তার চিন্তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

স্টুডিওর ভেতরে ঢোকে একজন জার্মান; পাঁশুটে সবুজ পোশাকটা দেখে আঁদ্রে হাসে। বলে, 'যাক, ভালোই হয়েছে। কোন্ দিকে যেতে হবে? সঙ্গে আমি কিছু নেব না।'

জার্মানটি বলে, 'আমাকে চিনতে পারছেন না? মাদাম কোয়াদের বাড়িতে আমি থাকতাম। আপনার আঁকা দৃশ্যপটগুলো আমার ভারি ভালো লাগত। 'তামাকখোর কুকুর'-এ আমাদের পরিচয় হয়েছিল।'

জার্মানটি করমর্দন করতে চায় কিন্তু আঁদ্রে হাত গুটিয়ে রাখে।

'এবার মনে পড়েছে,' আঁদ্রে বলে, 'মাছ সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে। আপনি হচ্ছেন····কি যেন কথাটা ভুলে গেছি।'

'মৎস্যবিজ্ঞানবিদ।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আপনি বলেছিলেন পারী ধ্বংস হবে। এখানে থাকবার সময় আপনার আগ্রহটা মাছের চেয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতেই বেশি ছিল হয়তো। বার্লিনের গুপ্ত খবর আপনার অজানা ছিল না। বেশ খুশি হয়েছেন তো? একথা সত্যি যে আপনারা পারী ধ্বংস করেননি।' জার্মানটির আরও কাছে সে সরে আসে : 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে পারী আপনারা অধিকার করতে পেরেছেন? ভুল মঁশিয়ে, এটা আপনাদের বিকৃত কল্পনা। পারী আপনাদের মুঠোয় নেই। আপনি হয়তো বলবেন যে ভবিষ্যতে আসবে। তাও আমি স্বীকার করি না। যোসেফিন তার দোকান খুলেছে, একে একে ফিরে আসছে সবাই—কিন্তু পারী নেই। পারীকে আপনারা ফিরে পাবেন না। পারীর অস্তিত্ব মুছে গেছে। একেবারে মুছে গেছে। যাক্ এসব কথা! চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন।'

'কোথায় নিয়ে যাব?'

'জানি না। আপনিই ভালো জানেন। সদর দপ্তরে কিংবা বধ্যশালায় কিংবা পাতালে—যে চুলোয় খুশি।'

জার্মানটি কথা বলে না। আঁদ্রে সমানে গালাগালি দিয়ে চলে।

অবশেষে জার্মানটি বলে, 'এত মেজাজ খারাপ করছেন কেন?'

'মেজাজ খারাপের প্রশ্নই ওঠে না। প্রথমত—আপনাদের ট্যাঙ্ক আছে। দ্বিতীয়ত—বোমারু বিমান, তৃতীয়ত—মেশিনগান, চতুর্থত—টমিগান। আর পঞ্চমত—আপনাদের ওই মোটা মোটা মাথা। আমার কথা যদি বলেন তো ওই হুকটা আছে। নিয়ে যাবেন তো চলুন, নইলে আপনার গলা টিপে ধরব।'

'আপনাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া বা না-যাওয়া আমার কাজ নয়। আমি কেন যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তা আমি নিজে জানি না। হয়তো আপনাকে মনে আছে বলেই ভেবেছিলাম যে দেখা করলে মন্দ হয় না। আজ লেফটেনেন্ট আমাকে বলছিল যে আমি নাকি জার্মান হিসেবে পরিচয় দেবার অযোগ্য। কী কাণ্ড বলুন তো—কাল হয়তো ওরা আমাকে গুলি করে মারবে।'

'তাই নাকি?' আঁদ্রের গলায় বিস্ময়ও নেই, সহানুভূতিও না। রেগে গিয়ে কাঁধ-ঝাঁকুনি দেয়। সে অপেক্ষা করছিল মৃত্যুর জন্যে আর সেই অপেক্ষার পরিণতি কিনা এক মৎস্যবিজ্ঞানবিদের ব্যক্তিগত অসন্তোষে! আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন, আপনার আটকাচ্ছে কিসে? খাবার? না চ্যানেল পার হতে গেলে আপনার মাছ আপনাকে খেয়ে ফেলবে?'

'কি করে বোঝাব জানি না। কিসে আমার আটকাচ্ছে জানেন? আটকাচ্ছে পারীর জার্মানদের সম্পর্কে। এই ফৌজী সাজ পরে যে আপনার স্টুডিওতে আমাকে আসতে হয়েছে, তাতেও আটকাচ্ছে।'

'তাই নাকি! তাহলে আপনি তো দেখছি রীতিমত সৌন্দর্যরসিক। ছাইরঙা-পাঁশুটে ছোপ—আরো কত কি! কিন্তু মঁশিয়ে, আপনার মনে রাখা উচিত যে আমি ফরাসী।'

'নিশ্চয়ই মনে আছে। আর মনে আছে বলেই মন খুলে কথা বলতে পারছি না। আমি মনে করতাম, আমরা একই সংস্কৃতির মানুষ। কিন্তু এখন দেখছি আমাদের ভেতর আকাশ-পাতাল তফাত। এই তফাত যে কি করে ঘুচবে আমি জানি না।'

'আমিও না।' আঁদ্রের গলার স্বর একটু কোমল—'রক্ত দিয়ে এই ফাঁককে ভরাট করতে হবে। রক্ত ছাড়া এখানে এই তফাত দূর করা অসম্ভব।'

'যথেষ্ট রক্তপাত কি হয়নি?'

'প্রচুর হয়েছে। কিন্তু ঠিকভাবে হয়নি। আচ্ছা, এবার আপনি যান।'

'জানি আমাকে যেতেই হবে। এ সমস্তই খাপছাড়া। এখানে আমার আসাটাই বোকামি হয়েছে। আর বোকার মতোই একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। কেন জানি না প্রশ্নটা আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। প্রশ্নটা ব্যাকরণের। আচ্ছা, এই রাস্তাটার নাম শেরস-মিদি—তার মানে, দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়। কেন?'

'তার কারণ এক সময়ে এই রাস্তার লোকদের ওই নামেই ডাকা হত। কোনো কিছু খরচ না করে কোথায় খাবার পাওয়া যায় তারই অপেক্ষায় থাকতে হত তাদের। ঠিক আপনাদের হিটলারের মতো। কিন্তু নামটা বেশ ভালো। দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়। কিন্তু শুধু এই রাস্তাটাই কোনোদিন দ্বিপ্রহরকে চায়নি। এখানকার লোকেরা জানলার খড়খড়ি বন্ধ করে নরম পালকের লেপ গায়ে দিয়ে আরামে ঘুমোত। রাত্রির প্রতীক্ষায় ছিল এই রাস্তা। আর এখন তো আপনারাই এসেছেন।'

জার্মানটি বলে, 'আপনি কি মনে করেন যে এজন্যে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই! এভাবে বাঁচা যায় না। সবাই আমাদের ঘৃণা করে। কাল আমি রুমে'জ দিয়ে হাঁটছিলাম। একটি স্ত্রীলোক আসছিল কিন্তু আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল—যেন আমি স্বয়ং মৃত্যু! ব্যক্তিগতভাবে আমি আজ পর্যন্ত কোনো লোককে খুন করিনি কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এ কথাও আমি বলতে পারতাম যে হিটলার দোষী। সেটা সবচেয়ে সহজ কাজ। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়, আমারও দোষ আছে। প্রত্যেককেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমিও সেই চেষ্টাই করব। আচ্ছা আসি, আবার দেখা হবে।'

'বিদায়। কাল হয়তো আপনি সত্যিই খুব ভালো লোক হয়ে উঠবেন, কিন্তু তখন আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আজকের দিনে সৌজন্যতাকে প্রমাণ করতে হবে রক্ত দিয়ে। এমনি সময়েই আমরা বাস করছি। এখন কোনো কিছুই মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আপনি কেন এখানে এসেছেন? কোনো অর্থ হয় না! আপনি যদি কমিউনিস্ট হতেন তো আলাদা কথা হত। ওরাই হয়তো কিছু করতে পারে। আরেকটু হলে এখানে ওদেরই জয় হত। তার বদলে জয় হয়েছে তেসার ও আপনাদের লেফটেনেণ্টের। কি করতে চান আপনি? এখানে আপনি একা। আমিও তাই। আর আমরা দুজনে মিলে দুই হই না, শূন্য হই। জীবন আমাদের বিরুদ্ধে। আপনি যদি ভালো লোক হন তো আপনার প্রতি আমার অভদ্র আচরণের জন্যে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি ছিলেন লুবেনের জার্মান, একটু মাথা-পাগলা গোছের, কালভাদো পান করতেন। আর এখন আপনি পাঁশুটে-সবুজ পোশাকী সৈন্য। আর এ সমস্ত কিছুর মূলে পারী।'

জার্মানটি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আঁদ্রে তার কথা ভুলে যায়—যেন কেউ কখনো আসেনি। কয়েকবার পায়চারি করে স্টুডিওর ভেতরে। জানলায় নীল গোধূলির ছোঁয়া লেগেছে। আর জানলাটার ঠিক উলটো দিকে একটা দৃশ্যপট। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আঁদ্রে তাকিয়ে দেখে : নাগরদোলা, বাদাম গাছ, লণ্ঠন, আর দূরের ছায়া। সেদিনটিও ছিল ১৪ই জুলাই। সেদিন পর্যন্ত হেসেছিল জেনেৎ, নাচ চলেছিল পারীর রাস্তায় রাস্তায়, মিছিল বেরিয়েছিল ঝাণ্ডা উড়িয়ে। আর ছিল আশা। সে এক অন্য জীবন। চমৎকার আঁকা হয়েছে ছবিটা। এই তার শ্রেষ্ঠ ছবি। আর এই ছিল পারী। আর এই পারীই এখনো আছে। ওরা মিউজিয়াম পুড়িয়ে ফেলবে, ছবি নষ্ট করবে—কিন্তু পারী থাকবে ঠিক আগের মতোই।

আঁদ্রে হাসে। তারপর এগিয়ে যায় জানলার কাছে। রু শেরস্ মিদির জানলার খড়খড়িগুলো তেমনি শক্তভাবে বন্ধ করা, বাড়ির সামনে জানলার খড়খড়িতে তেমনি কালো কালো দাগ। ওপাশে চিলেকোঠার জানলা থেকে নুয়ে পড়েছে একটা শুকিয়ে যাওয়া ফুল। উপোসী বেড়ালগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফুলের দোকানের স্ত্রীলোকটি কাঁদছে, একটি নবজাত শিশু চেঁচাচ্ছে। রু শেরস্‌মিদি—'দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়'....'এবং দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষাতেই থাকব আমি,' সে ভাবে, 'দ্বিপ্রহর আসবেই—আকাশে আলোর উৎসব—মধু, ফুল, আসমানী রং—দিনের পারী....'

লাউড-স্পীকারের হুংকার আঁদ্রে যেন শুনতেই পায় না : 'বাড়ি ফিরে যাও! সময় হয়েছে! সময় হয়েছে!'

আগস্ট ১৯৪০—জুলাই ১৯৪১